বিডিনিয়োগ.কম

লাল-সবুজে দাগানো

TEXT BOOK

প্রাণিবিজ্ঞান

উন্মেষ
মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার সকল তথ্য
এখন বিডিনিয়োগ.কম এ

ভর্তি পরীক্ষা তথ্য

ফলাফল

সিটপ্ল্যান

প্রশ্নব্যাংক

নিচে ক্লিক করুন

www.bdniyog.com

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL BDNIYOG.COM COPYRIGHT

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১ প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস
Animal Diversity & Classification

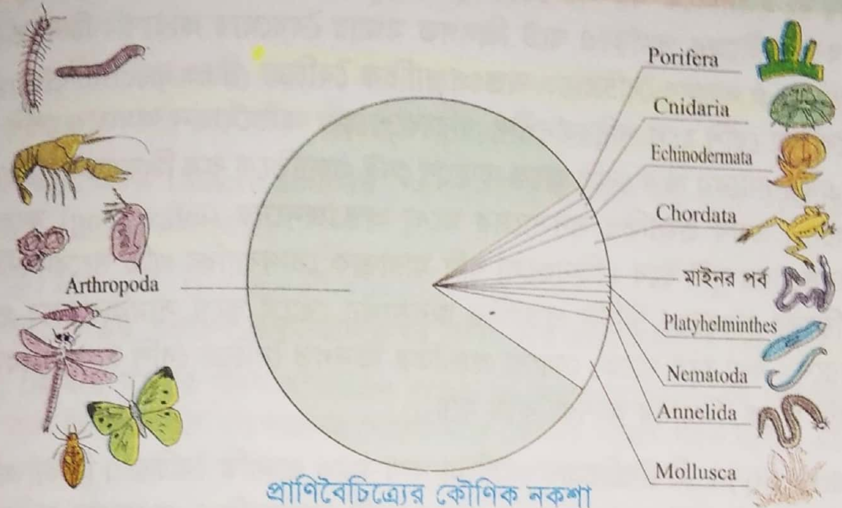

প্রাণিবৈচিত্র্যের কৌণিক নকশা

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- প্রাণিবৈচিত্র্য
- শ্রেণিবিন্যাস
- ট্যাক্সন
- প্রজাতি
- প্রতিসম
- হিমোসিল
- ননকর্ডাটা
- কর্ডাটা

জীববিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ২,৭০,০০০ ভাস্কুলার উদ্ভিদ এবং ১৫ লক্ষেরও বেশি প্রাণী-প্রজাতি শনাক্ত করেছেন। এসব প্রজাতির মধ্যে নানা কারণে ভিন্নতা দেখা যায়। ভিন্নতা সত্ত্বেও সহজভাবে অধ্যয়নের জন্য প্রাণিবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী এদের শ্রেণিবিন্যস্ত করেছেন। এ অধ্যায়ে প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

পিরিয়ড সংখ্যা–৭ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. প্রাণিজগতের বিভিন্নতা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. প্রাণীকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করার ভিত্তি ও নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বিভিন্ন ধরনের প্রাণীকে শ্রেণিতে বিন্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. নন-কর্ডাটা প্রাণীকে পর্ব (Phylum) পর্যন্ত বিন্যস্ত করতে পারবে। ৫. কর্ডাটা প্রাণীকে শ্রেণি (Class) পর্যন্ত বিন্যস্ত করতে পারবে। ৬. **ব্যবহারিক–** বিভিন্ন প্রাণী শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।	● প্রাণিজগতের ○ ভিন্নতা ○ শ্রেণিকরণের ভিত্তি ও নীতি ● নন-কর্ডাটা (প্রধান পর্ব পর্যন্ত শ্রেণিবিন্যাস) ● কর্ডাটা (শ্রেণি পর্যন্ত বিন্যাস) ● ব্যবহারিক ○ নন-কর্ডাটার বিভিন্ন পর্বের (যেকোনো পাঁচটি) এবং ভার্টিব্রাটার বিভিন্ন শ্রেণির (যেকোনো পাঁচটি) নমুনা পর্যবেক্ষণ।

প্রাণীর বিভিন্নতা বা প্রাণিবৈচিত্র্য (Animal Diversity)

পৃথিবীর সমস্ত জলচর, স্থলচর ও খেচর প্রাণীর মধ্যে যে জিনগত, প্রজাতিগত ও বাস্তুসংস্থানগত বিভিন্নতা দেখা যায় সেটিই হচ্ছে প্রাণীর বিভিন্নতা বা প্রাণিবৈচিত্র্য। দেহের গঠন, বসতি নির্বাচন প্রভৃতি থেকে শুরু করে চলন, খাদ্যগ্রহণ, প্রজনন, পরিযান (migration) সহ আরও অনেক বিষয়ে প্রাণিদের বৈচিত্র্য সুস্পষ্ট। প্রত্যেক প্রাণী নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত হয়ে অন্য প্রাণী থেকে ভিন্ন। পৃথিবীর বিচিত্র পরিবেশে দৃশ্য ও অদৃশ্যমান অসংখ্য প্রাণীর বিচরণ রয়েছে। কেউ দল বেঁধে অতল সমুদ্রে, মাঝ সমুদ্রে বা সমুদ্রপৃষ্ঠে সাঁতার কেটে চলছে, কেউ দ্রুত, কেউ-বা মন্থর লয়ে মাটির উপর হেঁটে বেড়াচ্ছে, কোনো প্রাণী হয়তো গাছের ডালে দোল খাচ্ছে, কেউ ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী হচ্ছে, আবার কেউ এত ছোট যে অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্য ছাড়া দেখাই যায় না। এদের কেউ তৃণভোজী, অন্যরা মাংসাশী বা সর্বভোজী কিংবা পরজীবী।

প্রাণিবৈচিত্র্যের প্রকারভেদ

প্রাণিবৈচিত্র্য তিন প্রকার : ১. জিনগত বৈচিত্র্য, ২. প্রজাতি বৈচিত্র্য এবং ৩. বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য।

১. জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic diversity) : জিনগত বৈচিত্র্য বলতে নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

সদস্যদের মধ্যে জিনগত উপাদানে বৈষম্যের মাত্রাকে বোঝায়। একটি জীব-প্রজাতির প্রত্যেক সদস্য জিনগতভাবে অন্য সদস্য থেকে পৃথক। জিনগত সাধারণ গঠন বা কোড (code)-এর কারণে একটি প্রজাতির প্রত্যেক সদস্যের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে। জীবদেহে অবস্থিত জিনগুলোর মধ্যে সীমাহীন সম্মিলনের ফলে জিনগত বৈষ্যম্যের সৃষ্টি হয়। এ কারণে সকল মানুষ *Homo sapiens* নামক প্রজাতির সদস্য হলেও একজন আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ ও অস্ট্রেলিয়ান শ্বেতাঙ্গ মানুষ দেহের আকৃতি, গায়ের ও চুলের রং ইত্যাদিতে পরস্পর থেকে সুস্পষ্ট পৃথক। অনুরূপভাবে, আম, ধান, আপেল, গম ইত্যাদির আকার, স্বাদ, ফুলের বর্ণ ও বীজের পার্থক্যও ঘটে জিনগত মাত্রায় বৈষম্যের কারণে। জিনগত বৈচিত্র্য নির্দিষ্ট এক প্রজাতির সদস্যভিত্তিক হওয়ায় এ ধরনের বৈচিত্র্যকে **অন্তঃপ্রজাতিক বৈচিত্র্য** (intraspecific diversity)-ও বলা হয়। কোনো প্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য বেশি হলে পরিবর্তনশীল পরিবেশে তার অভিযোজন ক্ষমতাও বেশি থাকে। কোনো প্রজাতির সকল সদস্যের যদি একই ধরনের জিন বেশি থাকে তাহলে সেই প্রজাতিকে **কম জিনগত বৈচিত্র্যসম্পন্ন** (low genetic diversity) প্রজাতি বলে। এসব প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে **অন্তঃজননের** (inbreeding) ফলে একই ধরনের কম জিনগত বৈচিত্র্যসম্পন্ন জনসংখ্যার সৃষ্টি হবে। জিনগুলো যদি মারাত্মক রোগব্যাধির প্রতি সংবেদনশীল হয়ে থাকে তাহলে বংশপরম্পরায় এসব জিনের সঞ্চারণে নির্দিষ্ট প্রজাতির জনসংখ্যা রোগে ভুগে সামগ্রিকভাবে প্রজাতির অস্তিত্ব সংকট বাড়িয়ে তুলবে। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে, কোনো প্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য বেশি হলে পরিবর্তনশীল পরিবেশে তার অভিযোজন ক্ষমতা বেশি থাকে, বিলুপ্তির আশঙ্কা কমে যায়।

২. প্রজাতি বৈচিত্র্য (Species diversity) : জীববৈচিত্র্যের মৌলিক ধাপ হচ্ছে প্রজাতি বৈচিত্র্য। বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যা যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও অঞ্চলে একসঙ্গে বসবাস করে এবং একটি **বাস্তুতান্ত্রিক সম্প্রদায়** (ecological community) গড়ে তোলে তাকে **প্রজাতি বৈচিত্র্য** বলে। প্রজাতি বৈচিত্র্যে ভাইরাসসহ পৃথিবীর সকল প্রজাতির জীব অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর সবখানে একই ধরনের জীব বাস করে না বরং কিছু অঞ্চলে নির্দিষ্ট প্রজাতির জনগোষ্ঠী (population) অন্যান্য জনগোষ্ঠী অপেক্ষা বেশি দেখা যায়। যেসব অঞ্চল পুষ্টি এবং আবহাওয়াগত উপাদানসমৃদ্ধ (যেমন মাঝারি তাপমাত্রা, পর্যাপ্ত আলো ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদি) সেসব অঞ্চলে জীববৈচিত্র্যের সমাহার থাকে অনেক বেশি। এ কারণে মরু ও মেরু অঞ্চলের চেয়ে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে জীববৈচিত্র্যের মাত্রা বেশি। যে অঞ্চলে প্রজাতি বৈচিত্র্য বেশি সে অঞ্চল সাধারণভাবে **জীববৈচিত্র্যের হটস্পট** (biodiversity hotspot) হিসেবে পরিচিত।

৩. বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য (Ecosystem diversity) : বাস্তুতন্ত্র হচ্ছে একটি জীবসম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রজাতি ও তাদের অজীবীয় ভৌত পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠা টেকসই পরিবেশ। প্রত্যেক বাস্তুতন্ত্র শক্তি ও পুষ্টি প্রবাহের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে এক বা একাধিক বাস্তুতন্ত্র থাকতে পারে। অতএব, **বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বলতে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ ও পুষ্টিচক্রের মাধ্যমে সংযুক্ত বিভিন্ন জীবসম্প্রদায়ভুক্ত প্রজাতির মধ্যে ভিন্নতাকে (জিনগত ও প্রজাতি বৈচিত্র্য) বোঝায়।** পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্র রয়েছে, যেমন–তৃণভূমি, বনভূমি, মরুভূমি, জলাভূমি ইত্যাদি। প্রত্যেক বাস্তুতন্ত্রে রয়েছে নির্দিষ্ট ধরনের উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবের সমাবেশ। স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রজাতির উপস্থিতি এবং এদের মধ্যে গতিশীল মিথস্ক্রিয়ার এক জটিল নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিত্ব করে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য। এভাবে লক্ষ বছর ধরে এককেটি বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রজাতির পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে গড়ে উঠে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য।

গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle, খৃষ্টপূর্ব ৩৮৪–৩২২) সর্বপ্রথম প্রাণিদের এ ভিন্নতাকে লক্ষ করে প্রাণিবিদ্যাকে বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। এ জন্য তাঁকে **'প্রাণিবিদ্যার জনক'** বলা হয়। তিনিই প্রথম প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিবেচনা করে প্রাণিকূলকে শ্রেণিবিন্যস্ত করতে উদ্যোগী হন। যেমন: তিনি লাল রক্তযুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণিদের Enaima ও লাল রক্তবিহীন অমেরুদণ্ডী প্রাণিদের Anaima নামে দুটি দলে ভাগ করেন। পরবর্তীতে Enaima-কে প্রজনন প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে ডিম্বজ (যারা ডিম পাড়ে, যেমন: মাছ, উভচর, সরীসৃপ ও পাখি) এবং জরায়ুজ (যারা সন্তান প্রসব করে, যেমন: স্তন্যপায়ী) এ রকম দুটি দলে ভাগ করা হয়। আবার অমেরুদণ্ডী Anaima দলভুক্ত প্রাণিদেরকেও কোষের সংখ্যা, বাহ্যিক আকার, সিলোম ও পরিপাকতন্ত্রের উপস্থিতিসহ আরো নানান বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করা হয়। প্রথম দিকে প্রাণীর এ ভিন্নতাকে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দেখা হলেও পরবর্তীতে আরো নানা বিষয়, যেমন–প্রাণীর বাসস্থান, জিনতত্ত্ব, কোষ ও টিস্যুতন্ত্র, ভ্রূণতত্ত্ব, অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থান ইত্যাদিও প্রাণীর ভিন্নতার কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Scanned with CamScanner Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি (Basis of Animal Classification)

প্রত্যেক প্রাণীরই নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ থাকে। এসব বৈশিষ্ট্য আকার, গঠন, দৈহিক প্রতিসাম্য, দেহের খণ্ডকায়ন, দেহগহ্বর, লিঙ্গ, জীবনচক্র প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনে প্রাণিদেহের এসব বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান ভিত্তিগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো–

১. দেহের আকার (Body shape)

ক. আণুবীক্ষণিক প্রাণী (Micro-animal): এসব প্রাণী এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। যেমন– মাছের ফুলকার প্রোটিস্টান জীবাণু *Trichodina anabasi*।

খ. বৃহত্তর প্রাণী (Macro-animal) : এসব প্রাণী আকারে বড় এবং খালি চোখে ভালোভাবে দেখা যায়। যেমন– *Cavia porcellus* (গিনিপিগ)।

২. সংগঠন ক্রমমাত্রা (Grades of organization)

প্রাণীর কোষীয় সংগঠন ক্রমমাত্রার উপর ভিত্তি করে প্রাণিজগতকে চার ধরনের প্রাণিগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়–

ক. কোষীয় মাত্রার গঠন (Cellular grade of organization): যে দেহগঠনে কিছু কোষ সম্মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট কাজের জন্য বিশেষিত হয় সে ধরনের দেহগঠনকে কোষীয় মাত্রার গঠন বলে। এক্ষেত্রে এক ধরনের শ্রম বিভাজন দেখা যায়, যেমন কিছু কোষ জনন কাজে, অন্য কোষগুলো পুষ্টি সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকে। Porifera পর্বভুক্ত প্রাণী এ ধরনের গঠন সম্বলিত সদস্য।

খ. কোষ-টিস্যু মাত্রার গঠন (Cell-tissue grade of organization) : সদৃশ কোষগুলো যখন একটি অভিন্ন কাজ সম্পন্নের জন্য সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ণ বা স্তরে গোষ্ঠীবদ্ধ বিন্যস্ত হয়ে টিস্যু নির্মাণ করে সে ধরনের গড়নকে কোষ-টিস্যু মাত্রার গঠন বলে। Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণীতে এধরনের গঠন মাত্রা দেখা যায়।

গ. টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠন (Tissue-organ grade of organization): স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপনের জন্য যখন একাধিক টিস্যু-নির্মিত বিভিন্ন অঙ্গের সমাহার ঘটে তখন সেই গঠনকে টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠন বলে। Platyhelminthes পর্বভুক্ত প্রাণিদেহে এ গঠন মাত্রা সর্বপ্রথম আবির্ভূত হয়েছে। এক্ষেত্রে চক্ষুবিন্দু, প্রোবোসিস, জননাঙ্গ ইত্যাদি টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠনের উদাহরণ।

ঘ. অঙ্গ-তন্ত্র মাত্রার গঠন (Organ-system grade of organization) : উচ্চতর প্রাণিগোষ্ঠীতে এ ধরনের গঠন দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে অঙ্গগুলো একত্রে কিছু কাজ সম্পাদনের জন্য **অঙ্গ-তন্ত্র** (organ system) সৃষ্টির মাধ্যমে দেহকে সর্বোচ্চ মাত্রার গঠনে উন্নত করেছে। তন্ত্রগুলো (systems) দেহে শ্বসন, সংবহন, পরিপাক প্রভৃতি মৌলিক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে। অধিকাংশ পর্বে (Phyla) এ ধরনের গঠন মাত্রা দেখা যায়। এ মাত্রার গঠন সর্বপ্রথম আবির্ভূত হয়েছে নিমারটিয়ান (Nemartean) নামক এক সামুদ্রিক প্রাণিগোষ্ঠীতে।

৩. জীবন পদ্ধতি (Way of living)

জীবন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিকূলকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়–

ক. মুক্তজীবী (Free living) : এসব প্রাণী স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এবং এরা পারস্পরিক সহযোগিতা বা সাহচর্যে বাস করে না। যেমন– কবুতর (*Columba livia*)।

খ. পরজীবী (Parasite) : এসব প্রাণী খাদ্যের জন্য অন্য প্রাণীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আশ্রয়দাতার দেহ থেকে খাদ্য শোষণ করে বেঁচে থাকে। যেমন– যকৃত কৃমি (*Fasciola hepatica*)।

৪. ক্লিভেজ ও ভ্রূণীয় বিকাশ (Cleavage and development)

যে পদ্ধতিতে যৌন জননকারী প্রাণীর এককোষী **জাইগোট** মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য বহুকোষী ভ্রূণ সৃষ্টি করে তাকে **ক্লিভেজ** বা **সম্ভেদ** বলে। ডিমে কুসুমের পরিমাণের ভিত্তিতে ক্লিভেজ সম্পূর্ণ বা **হলোব্লাস্টিক** (holoblastic) কিংবা আংশিক বা **মেরোব্লাস্টিক** (meroblastic) হতে পারে। ক্লিভেজের সময় ডিমের যে প্রান্তে কুসুম থাকে তাকে **ভেজিটাল পোল** (vegetal pole) এবং যে প্রান্তে নিউক্লিয়াস থাকে তাকে **অ্যানিমেল পোল** (animal pole) বলে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Scanned with CamScanner Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বিভাজন তলের উপর ভিত্তি করে ক্লিভেজ তিন প্রকার, যথা–

ক. অরীয় ক্লিভেজ (Radial cleavage) : এক্ষেত্রে বিভাজন তলগুলো জাইগোটকে সর্বদা অরীয় ও সুষমভাবে বিভক্ত করে। Arthropoda পর্বের প্রাণীতে ক্লিভেজ অরীয় ধরনের।

খ. দ্বিপার্শ্বীয় ক্লিভেজ (Bilateral cleavage) : এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিভাজন পর্যন্ত অরীয় ক্লিভেজের মতো কিন্তু পরবর্তী বিভাজন মধ্যরেখা বরাবর অনুপ্রস্থভাবে ঘটে বলে চারটি করে দুই সারি কোষের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্যতা দেখা যায়। Chordata পর্বের প্রাণীতে এ ধরনের ক্লিভেজ দেখা যায়।

গ. সর্পিল ক্লিভেজ (Spiral cleavage) : Annelida ও Mollusca পর্বের প্রাণিদের ক্ষেত্রে ঠিক তৃতীয় বিভাজনের সময় অ্যানিমেল পোলের ব্লাস্টোমিয়ারসমূহ ভেজিটাল পোলের ব্লাস্টোমিয়ারগুলোর সাথে চক্রাকারে সামান্য স্থান পরিবর্তন করে। এ ধরনের ক্লিভেজকে সর্পিল ক্লিভেজ বলে। পাখি, সরিসৃপ ও মাছে এধরনের ক্লিভেজ পাওয়া যায়।

৫. ভ্রূণস্তর (Germ layers)

যেসব প্রাণীর যৌন প্রজনন ঘটে সেগুলোর জাইগোট ক্লিভেজ (cleavage) প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে ব্লাস্টোমিয়ার (blastomere) নামক কোষ সৃষ্টি করে। কোষগুলো সজ্জিত হয়ে প্রথমে নিরেট **মরুলা** (morula) ও পরে ফাঁপা **ব্লাস্টুলা** (blastula) দশা অতিক্রম করে দ্বিস্তরী বা ত্রিস্তরী **গ্যাস্ট্রুলা** (gastrula)-য় পরিণত হয়। প্রাণীর প্রাথমিক শ্রেণিবিন্যাসে ভ্রূণস্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ভ্রূণস্তরের উপর ভিত্তি করে প্রাণিদের দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে:

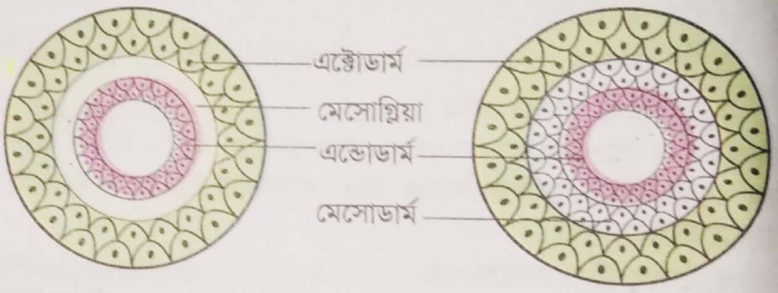

চিত্র ১.১ : দ্বিস্তরী (বামে) এবং ত্রীস্তরী (ডানে) কোষ বিন্যাস

ক. দ্বিস্তরী বা দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী (Diploblastic animal) : যেসব প্রাণীর ভ্রূণের গ্যাস্ট্রুলা পর্যায়ে কোষগুলো এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে, সেগুলোকে দ্বিস্তরী প্রাণী বলে। স্তরদুটির মাঝে থাকে আঠালো জেলির মতো অকোষীয় মেসোগ্লিয়া (mesoglea)। Cnidaria পর্বের প্রাণীরা দ্বিস্তরী (যেমন– *Hydra*)।

খ. ত্রিস্তরী বা ত্রিভ্রূণস্তরী প্রাণী (Triploblastic animal) : যেসব প্রাণীর ভ্রূণে গ্যাস্ট্রুলা পর্যায়ে কোষগুলো তিনটি কোষীয় স্তরে বিন্যস্ত থাকে তাদের ত্রিস্তরী প্রাণী বলে। তিনটি স্তরের মধ্যে বাইরের স্তরটিকে **এক্টোডার্ম** (ectoderm), মাঝেরটিকে **মেসোডার্ম** (mesoderm) এবং ভিতরেরটিকে **এন্ডোডার্ম** (endoderm) বলে। Platyhelminthes (ফিতাকৃমি-*Taenia solium*) থেকে শুরু করে Chordata (মানুষ-*Homo sapiens*) পর্ব পর্যন্ত সকল প্রাণী ত্রিস্তরী। এ স্তরগুলো থেকে প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হয়।

দ্বিস্তরী প্রাণী ও ত্রিস্তরী প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বৈশিষ্ট্য	দ্বিস্তরী প্রাণী	ত্রিস্তরী প্রাণী
১. ভ্রূণীয় কোষস্তর	দেহের কোষগুলো এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে।	দেহের কোষগুলো এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে।
২. মেসোগ্লিয়া	এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্মের মাঝখানে মেসোগ্লিয়া নামক অকোষীয় স্তর থাকে।	মেসোগ্লিয়া নেই।
৩. ভ্রূণস্তরের পরিণতি	কোষগুলো টিস্যু বা অঙ্গ গঠন করতে পারে না।	ভ্রূণস্তরের কোষগুলো বিভিন্ন টিস্যু, অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র গঠন করে।
৪. নেমাটোসিস্ট	উপস্থিত।	অনুপস্থিত।
৫. পলিপ ও মেডুসা দশা	উভয় দশা বা একটি দশা থাকে।	অনুপস্থিত।
৬. দেহ গহ্বর	গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর বা সিলেন্টেরন।	সিলোম।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৬. প্রতিসাম্য (Symmetry)

প্রতিসাম্য বলতে প্রাণিদেহের মধ্যরেখীয় তলের দুপাশে সদৃশ বা সমান আকার-আকৃতিবিশিষ্ট অংশের অবস্থানকে বোঝায়। যেসব প্রাণীর দেহকে কোনো না কোনো অক্ষ বা তল বরাবর সমান অংশে ভাগ করা যায় সেসব প্রাণীকে **প্রতিসম প্রাণী** (symmetrical animal) বলে। আর যেসব প্রাণীর দেহে এমন বিভাজন সম্ভব হয় না সেগুলোকে **অপ্রতিসম প্রাণী** (asymmetrical animal) বলে অভিহিত করা হয়। প্রাণিদেহে নিচে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের প্রতিসাম্য দেখা যায়।

ক. গোলীয় প্রতিসাম্য (Spherical symmetry) : একটি গোলককে যেভাবে কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত যে কোনো তল বরাবর সদৃশ বা সমান অংশে ভাগ করা যায়, তেমনিভাবে কোনো প্রাণিদেহকে যদি ভাগ করা যায়, তখন তাকে গোলীয় প্রতিসাম্য বলে। যেমন- *Volvox, Radiolaria, Heliozoa* প্রভৃতি এককোষী প্রোটিস্টান জীব।

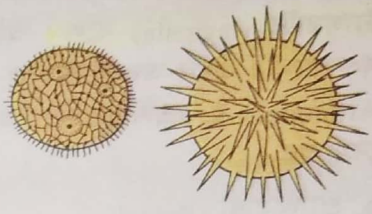

চিত্র ১.২ : গোলীয় প্রতিসাম্য

খ. অরীয় প্রতিসাম্য (Radial symmetry) : কোনো প্রাণীর দেহকে যদি কেন্দ্রীয় লম্ব অক্ষ বরাবর কেটে সদৃশ দুইয়ের বেশি সংখ্যক অর্ধাংশে ভাগ করা যায়, তখন সে ধরনের প্রতিসাম্যকে অরীয় প্রতিসাম্য বলে। হাইড্রা (*Hydra*), জেলিফিশ (*Aurelia*), সী অ্যানিমন (*Metridium*) ও সম্পর্কিত গোষ্ঠিভুক্ত প্রাণী যাদের অনুলম্ব অক্ষের এক প্রান্তে মুখ অবস্থিত সে সব প্রাণীতে অরীয় প্রতিসাম্য দেখা যায়।

চিত্র ১.৩ : অরীয় প্রতিসাম্য

গ. দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য (Biradial symmetry): কোনো প্রাণিদেহে যখন কোনো অঙ্গের সংখ্যা একটি কিংবা একজোড়া হওয়ায় অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ বরাবর শুধু দুটি তল পরস্পরের সমকোণে অতিক্রম করতে পারে, ফলে ঐ প্রাণিদেহ ৪টি সদৃশ অংশে বিভক্ত হতে পারে। এ ধরনের প্রতিসাম্য হচ্ছে দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য। Ctenophora (টিনোফোরা) পর্বভুক্ত প্রাণীর দেহ, যেমন-*Ceoloplana* মৌলিকভাবে অরীয় প্রতিসম হলেও দুটি কর্ষিকা থাকায় এগুলো দ্বিঅরীয় প্রতিসম প্রাণী।

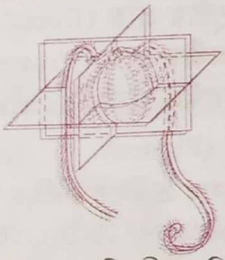

চিত্র ১.৪ : দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য

ঘ. দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য (Bilateral symmetry) : যখন কোনো প্রাণীর দেহকে কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর শুধু একবার ডান ও বামপাশে (অর্থাৎ স্যাজিটাল তল) দুটি সদৃশ অংশে ভাগ করা যায়, তখন তাকে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য বলে। যেমন- প্রজাপতি (*Pieris brassicae*), ব্যাঙ (*Fejervarya asmati*), মানুষ (*Homo sapiens*) প্রভৃতি।

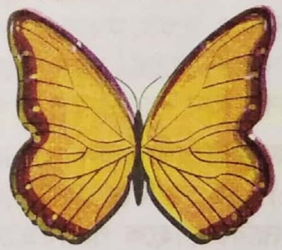

চিত্র ১.৫ : দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য

ঙ. অপ্রতিসাম্য (Asymmetry) : যখন কোনো প্রাণীর দেহকে অক্ষ বা দেহতল বরাবর ছেদ করলে একবারও দুটি সদৃশ অংশে ভাগ করা যায় না তখন তাকে অপ্রতিসাম্য বলে। উদাহরণ–স্পঞ্জ (*Cliona celata*), আপেল শামুক (*Pila globosa*) ইত্যাদি।

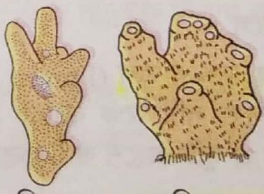

চিত্র ১.৬ : অপ্রতিসাম্য

৭. খণ্ডকায়ন (Metamerism or Segmentation)

কোনো প্রাণীর দেহ যদি লম্বালম্বি অক্ষ বরাবর একই রকম খণ্ডাংশের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে গঠিত হয়, তখন এ অবস্থাকে খণ্ডকায়ন বা মেটামেরিজম (metamerism) বলে। প্রতিটি খণ্ডককে বলা হয় মেটামিয়ার (metamere) বা সোমাইট (somite)। বিভিন্ন ধরনের খণ্ডকায়নবিশিষ্ট প্রাণী হতে পারে। যেমন–

ক. সমখণ্ডকায়নবিশিষ্ট (Homonomous metamere) : যে সব প্রাণীর দেহখণ্ডকগুলো সদৃশ বা একই ধরনের হয়, সেসব প্রাণীকে সমখণ্ডকায়নবিশিষ্ট বলে। উদাহরণ– কেঁচোর খণ্ডকায়ন।

খ. অসমখণ্ডকায়নবিশিষ্ট (Heteronomous metamere) : যে সব প্রাণীর দেহখণ্ডকগুলো অসম বা ভিন্ন ধরনের হয়, সেসব প্রাণীকে অসম খণ্ডকায়নবিশিষ্ট বলে। উদাহরণ– পতঙ্গের খণ্ডকায়ন।

গ. খণ্ডকায়নবিহীন (Asegmental) : এ ধরনের প্রাণীতে কোনো খণ্ডকায়ন নেই। উদাহরণ– সমুদ্রতারা, ঝিনুক ইত্যাদি।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৮. অঞ্চলায়ন বা ট্যাগমাটাইজেশন (Tagmatization)

Arthropoda পর্বের প্রাণিদেহ বাহ্যিকভাবে খণ্ডায়িত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খণ্ডকগুলো সুস্পষ্ট নয় বরং এক্ষেত্রে কিছু খণ্ডক একত্রে মিলিত হয়ে দেহে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চল সৃষ্টি করে। প্রতিটি অঞ্চলকে ট্যাগমাটা (tagmata) বলে। আর্থ্রোপোডের দেহ-খণ্ডকগুলোর এমন অঞ্চলীকরণকে বলে অঞ্চলায়ন। Arthropoda-র শ্রেণিবিন্যাসে অঞ্চলায়নের গুরুত্ব দেয়া হয়।

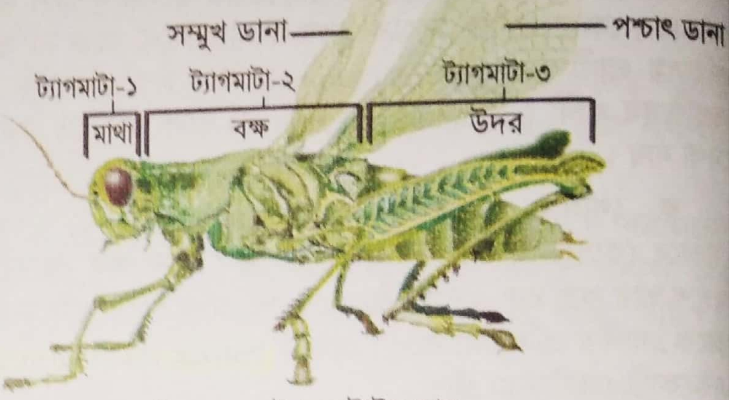

চিত্র ১.৭ : ট্যাগমাটাইজেশন

৯. প্রান্তিকতা (Polarity)

দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম প্রাণীর দেহের যে প্রান্তে মুখ থাকে তাকে মাথা ও তার বিপরীত প্রান্তকে পায়ু বা লেজ প্রান্ত বলা হয়। এরকমভাবে যেকোন প্রাণীর দেহের দুই প্রান্তের গঠনের ভিন্নতাই প্রান্তিকতা নামে পরিচিত। সাধারণত প্রাণিদেহের প্রান্তিকতা পাঁচ ধরনের।

ক. সম্মুখ প্রান্ত (Anterior end) : দেহের যে প্রান্তে মাথা থাকে।
খ. পশ্চাৎ প্রান্ত (Posterior end) : মাথার বিপরীত প্রান্ত।
গ. পৃষ্ঠীয় প্রান্ত (Dorsal end): দেহের উপরের দিকের তল।
ঘ. অঙ্কীয় প্রান্ত (Ventral end) : দেহের নিচের দিকের তল।
ঙ. পার্শ্বীয় প্রান্ত (Lateral end) : দেহের দুইপাশের তল।

১০. তল (Planes)

প্রতিসম প্রাণীতে দৈহিক তল শ্রেণিকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। যে অঞ্চল বরাবর প্রাণিদেহকে ডান ও বাম বা অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপ্রস্থ বা সম্মুখ ও পশ্চাৎ অঞ্চল বরাবর দুভাগে ভাগ করা যায়, তাকে তল বলে। প্রাণিদেহে সাধারণত তিন ধরনের তল দেখা যায়।

ক. মধ্যরেখীয় তল (Median or Sagittal plane) : যে তল দিয়ে কেন্দ্রীয়, পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় অক্ষ বরাবর দেহকে পার্শ্বীয়ভাবে সদৃশ ডান ও বাম অর্ধাংশে ভাগ করা যায়, তাকে মধ্যরেখীয় তল বলে।

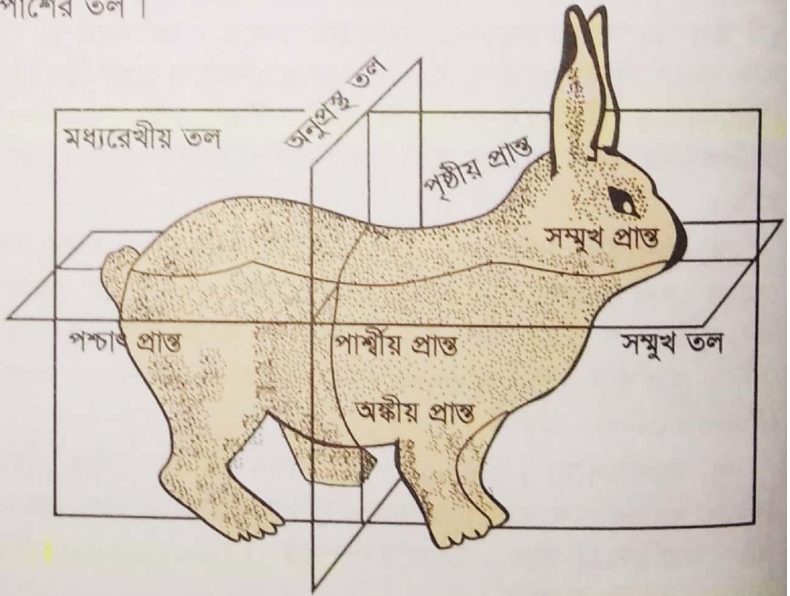

চিত্র ১.৮ : একটি দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম প্রাণীর বিভিন্ন প্রান্ত ও তল

খ. সম্মুখ তল (Frontal plane) : যে তল দিয়ে লম্বা লম্বি অক্ষ বরাবর দেহকে পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় এ দুটি অংশে ভাগ করা যায়, তাকে সম্মুখ তল বলে।

গ. অনুপ্রস্থ তল (Transverse plane) : যে তল দিয়ে দেহের মধ্যরেখীয় তলের সমকোণ বরাবর দেহকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ অর্ধাংশে ভাগ করা যায়, তাকে অনুপ্রস্থ তল বলে।

১১. সিলোম (Coelom)

ত্রিস্তরী প্রাণীর ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের সময় মেসোডার্ম স্তর থেকে সৃষ্ট যে গহ্বর মেসোডার্মাল কোষে নির্মিত পেরিটোনিয়াম (peritoneum) নামক ঝিল্লিতে আবৃত থাকে তাকে সিলোম বলে। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী, দেহাভ্যন্তরীণ সব গহ্বরই সিলোম নয়। বরং সিলোম ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের গহ্বর দেহের অভ্যন্তরে উপস্থিত। সিলোমের উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রাণিদের নিম্নোক্ত গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Scanned with CamScanner Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ক. অ্যাসিলোমেট (Acoelomate) : এসব প্রাণীর দেহে সিলোমের পরিবর্তে ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের সময় অন্তঃস্থ ফাঁকা স্থানটি (ব্লাস্টোসিল) মেসোডার্মাল স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা (spongy parenchyma) কোষে পূর্ণ থাকে। Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes প্রভৃতি পর্বভুক্ত প্রাণীরা অ্যাসিলোমেট।

খ. স্যুডোসিলোমেট (Pseudocoelomate) বা **অপ্রকৃত-সিলোমেট** : এসব প্রাণীও সিলোমবিহীন তবে ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের সময় অন্তঃস্থ ফাঁকা স্থানটিকে (ব্লাস্টোসিল) ঘিরে কখনও কখনও মেসোডার্মাল কোষস্তর অবস্থান করে। কিন্তু কোষগুলো কখনও পূর্ণ কোষস্তর বা পেরিটোনিয়াম সৃষ্টি করে ব্লাস্টোসিলকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করে না। Nematoda, Rotifera, Kinorhyncha প্রভৃতি পর্বভুক্ত প্রাণীরা স্যুডোসিলোমেট।

গ. ইউসিলোমেট (Eucoelomate) বা **প্রকৃত সিলোমেট** : এগুলো প্রকৃত সিলোমযুক্ত প্রাণী কারণ ভ্রূণীয় মেসোডার্মের অভ্যন্তর থেকে গহ্বররূপে সিলোম উদ্ভূত হয় এবং চাপা, মেসোডার্মাল এপিথেলিয়াল কোষে গঠিত পেরিটোনিয়াম স্তরে সম্পূর্ণ বেষ্টিত থাকে। ইউসিলোমেটদের অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রাণী মনে করা হয়। Mollusca, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, Hemichordata, Chordata প্রভৃতি পর্বভুক্ত প্রাণী ইউসিলোমেট।

চিত্র ১.৯ : বিভিন্ন ধরনের সিলোম

কাজ : স্যুডোসিলোমেট এবং ইউসিলোমেট প্রাণীর মধ্যে তুলনামূলক ছক তৈরি কর।

১২. নটোকর্ড (Notochord)

ভ্রূণাবস্থায় বা আজীবন দেহের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর অবস্থিত কিছুটা নমনীয়, স্থিতিস্থাপক ও ছিদ্রযুক্ত টিস্যুর দণ্ডকে নটোকর্ড বলে। নটোকর্ডের উপর ভিত্তি করে প্রাণিজগতকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. ননকর্ডেট (Nonchordate) : এদের দেহে কখনোই নটোকর্ড থাকে না। যেমন–কেঁচো, ঘাসফড়িং ইত্যাদি।

খ. কর্ডেট (Chordate) : এসব প্রাণীর দেহে আজীবন বা শুধু ভ্রূণ অবস্থায় নটোকর্ড থাকে। যেমন– অ্যাসিডিয়া, ব্যাঙ, সাপ, মানুষ ইত্যাদি।

১৩. পৌষ্টিকনালি (Alimentary canal)

পৌষ্টিকনালির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিদের দুভাগে ভাগ করা যায়–

ক. প্যারাজোয়া (Parazoa) : যেসব প্রাণীর দেহে কোনো নির্দিষ্ট পৌষ্টিকনালি বা গহ্বর থাকে না সেগুলোকে প্যারাজোয়া বলে। উদাহরণ– Porifera পর্বভুক্ত প্রাণী।

খ. এন্টেরোজোয়া (Enterozoa) : যেসব প্রাণীর দেহে নির্দিষ্ট পৌষ্টিকনালি বা গহ্বর থাকে সেগুলোকে এন্টেরোজোয়া বলে। উদাহরণ– Cnidaria থেকে Chordata পর্ব পর্যন্ত সকল প্রাণী।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

শ্রেণিবিন্যাসের নীতি (Principles of Animal Classification)

শ্রেণিবিন্যাস একটি সুসংঘবদ্ধ বিজ্ঞান। খুঁটিনাটি অনেক নীতি মেনে শ্রেণিবিন্যাস সম্পন্ন করতে হয়। নিচে প্রধান নীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

১. শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্য (Taxonomic character) **নির্ধারণ** : একটি ট্যাক্সন-সদস্যের যে বৈশিষ্ট্য অন্য ট্যাক্সন (শ্রেণিবদ্ধগত একক) থেকে তাকে পৃথক করতে পারে বা পৃথক করার সম্ভাবনা দেখাতে পারে সেটি ঐ ট্যাক্সনের শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্য। আধুনিক গবেষণায়, শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্য বলতে ট্যাক্সন-সদস্যদের অঙ্গসংস্থানিক, রাসায়নিক, শারীরবৃত্তিক, জিনগত, জননগত বা বাস্তুসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। শ্রেণিবিন্যাসের সময় প্রত্যেক ধাপে অন্তর্ভুক্ত ট্যাক্সনের শনাক্তকারী শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্যাবলির উল্লেখ করতে হয়।

২. শনাক্তকরণ (Identification) : শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে পর্যবেক্ষণে থাকা কোনো ট্যাক্সন-সদস্য পরিচিত বা আগে বর্ণিত হয়েছে এমন হতে পারে, কিংবা অপরিচিতও হতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে, এটি একটি নতুন ট্যাক্সন। এভাবে শ্রেণিকরণের উদ্দেশে সংগৃহীত যে কোনো নমুনা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য প্রাণীর প্রকাশিত বর্ণনার সাথে তুলনামূলক আলোচনা সাপেক্ষে ক্যাটাগরিকরণ সম্পন্ন করতে হবে।

৩. ক্যাটাগরিকরণ বা র‍্যাংকভুক্তি (Categorization or Ranking) : যেসব প্রাণী বা প্রাণিগোষ্ঠীকে শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশে বিভিন্ন ধাপ অর্থাৎ ক্যাটাগরি বা র‍্যাংক-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় সে সব প্রাণিগোষ্ঠীকে ট্যাক্সন (taxon; বহুবচনে taxa) বলে। ট্যাক্সন হচ্ছে শ্রেণিবদ্ধগত একক (taxonomic unit)। অর্থাৎ শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত প্রতিটি ক্যাটাগরিভুক্ত (র‍্যাংকভুক্ত) প্রাণীর জনগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীবর্গকে একেকটি ট্যাক্সন বলে। যেমন–Animalia, Chordata, Mammalia, Primates, Hominidae, *Homo*, *Homo sapiens* একেকটি ট্যাক্সন। বিবর্তনিকভাবে সম্পর্কিত এবং অভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলি বহনকারী প্রাণিগুলো (ট্যাক্সন)-কে একেকটি শ্রেণিবদ্ধগত ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শ্রেণিবিন্যাসের আবশ্যিক (mandatory) ধাপ (র‍্যাংক বা ক্যাটাগরি) হচ্ছে ৭টি, যথা:- Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus ও Species।

বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন প্রাণী আবিষ্কার হওয়ায় পরবর্তীতে প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়ার কারণে ঐ ৭টি স্তরের শ্রেণিবিন্যাস অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ অসুবিধা দূর করতে প্রাণিবিজ্ঞানীরা উপরের ৭টি মূলধারার সাথে Super (অধি), Sub (উপ), Infra (ইনফ্রা) ইত্যাদি নতুন স্তর যুক্ত করেন। তবে এগুলো আবশ্যিক ধাপ নয়।

i. **প্রজাতি** (Species) : শ্রেণিবিন্যাসের মূল বা ভিত্তি একক হচ্ছে প্রজাতি। Earnst Mayr (1969) এর মতে –"প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনো জীবগোষ্ঠী যদি নিজেদের মধ্যে যৌন মিলন ঘটিয়ে জননক্ষম সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয় কিন্তু অন্য কোনো গোষ্ঠীর সাথে প্রজননগতভাবে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা থাকে তখন ঐ ধরনের জীবগোষ্ঠীকে প্রজাতি বলে।" যেমন– পৃথিবীর সকল মানুষ, বানর, ব্যাঙ, আম, কাঁঠাল গাছ একেকটি প্রজাতির অন্তর্গত।

ক্যাটাগরি/ র‍্যাংক	ট্যাক্সন
Kingdom	Animalia
Phylum	Chordata
Class	Mammalia
Order	Primates
Family	Hominidae
Genus	*Homo*
Species	*Homo sapiens*

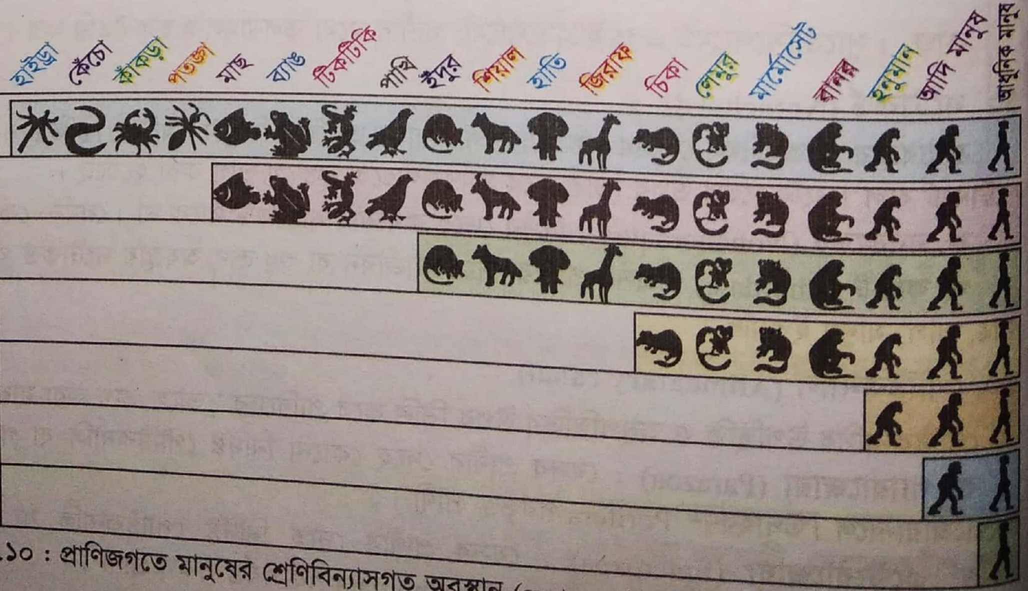

চিত্র ১.১০ : প্রাণিজগতে মানুষের শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান (systemetic position)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ii. **গণ** (Genus) : পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত একাধিক প্রজাতির সমন্বয়ে গঠিত একককে গণ বলে।
iii. **গোত্র** (Family) : পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এক বা একাধিক গণ মিলে গঠিত হয় একটি গোত্র।
iv. **বর্গ** (Order) : পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এক বা একাধিক গোত্র মিলে একটি বর্গ গঠন করে।
v. **শ্রেণি** (Class) : পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক বর্গ নিয়ে গঠিত একককে শ্রেণি বলে। সর্বাধিক প্রাণী থাকে
vi. **পর্ব** (Phylum) : কয়েকটি সাদৃশ্যপূর্ণ শ্রেণি নিয়ে গঠিত একককে বলা হয় পর্ব।
vii. **রাজ্য** (Kingdom) : এটি প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের সার্বজনীন স্তর। অর্থাৎ এ স্তরটিতে পৃথিবীর সকল প্রাণীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. নামকরণ (Nomenclature) : কোনো বিশেষ প্রাণী বা প্রাণিগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট নামে শনাক্তকরণের পদ্ধতিকে বলা হয় নামকরণ। ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানের পর কোন প্রাণী নতুন প্রমাণিত হলে উক্ত প্রাণীকে ICZN এর নিয়মানুযায়ী নামকরণ করতে হবে। সুইডিশ বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnaeus) সর্বপ্রথম নামকরণের একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এটি **দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি** (Binomial Nomenclature System) নামে পরিচিত। এ নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক জীবের বৈজ্ঞানিক নামের দুটি অংশ থাকে যার প্রথমটি গণ (genus) নাম এবং দ্বিতীয়টি **প্রজাতি** (species) নাম। গণ নামের প্রথম অক্ষর ইংরেজী বর্ণমালার বড় অক্ষরে এবং প্রজাতি নামের আদ্যক্ষর ছোট অক্ষরে লিখতে হয়। এভাবে দুটি ল্যাটিন বা রূপান্তরিত ল্যাটিন শব্দ দিয়ে প্রাণীর নামকরণের পদ্ধতিকে **দ্বিপদ নামকরণ** (binomial nomenclature) বলে।

অনেক সময় একটি প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অঙ্গসংস্থানিক পার্থক্য দেখা যায়। সে সব সদস্যকে ঐ নির্দিষ্ট প্রজাতির **উপপ্রজাতি** (subspecies) হিসেবে গণ্য করা হয়। তখন গণ ও প্রজাতি সমন্বিত **দ্বিপদ** নামটি উপপ্রজাতিসহ **ত্রিপদ** (trinomial) নামে পরিচিত হয়। এভাবে, উপপ্রজাতিসহ কোনো প্রাণীর নামকরণকে **ত্রিপদ নামকরণ** (trinominal nomenclature) বলে। যেমন: ইউরোপীয়ান চড়ুই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম-*Passer domesticus*; কিন্তু নীলনদ এলাকার চড়ুই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম- *Passer domesticus niloticus*। পাখি বিজ্ঞানী Schlegel (1844) সর্বপ্রথম ত্রিপদ নামকরণ পদ্ধতির প্রচলন করেন এবং এটি ICZN কর্তৃক স্বীকৃত পদ্ধতি।

কোনো জীবের নামকরণ পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল এবং তা কতকগুলো নিয়ম মেনে সমাধান করা হয়। প্রাণীর নামকরণের নিয়মগুলো প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক সংস্থা International Commission on Zoological Nomenclature (ICZN) প্রণয়ন করে থাকে এবং নিয়মগুলো International Code on Zoological Nomenclature-এ লিপিবদ্ধ করা হয়। নিচে নামকরণের প্রধান নিয়মাবলি উলেখ করা হলো।

i. প্রত্যেক প্রাণীর একটি বৈজ্ঞানিক নাম থাকবে এবং এ নামের দুটি অংশ থাকবে; একে **দ্বিপদ নামকরণ** বলা হবে।

ii. দ্বিপদ নামের প্রথম অংশটি ঐ জীবের **গণ** নাম ও দ্বিতীয় অংশটি **প্রজাতি** নামের নির্দেশক।

iii. প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নামটি অবশ্যই **ল্যাটিন** বা **ল্যাটিনকৃত** (latinized) হতে হবে। দ্বিপদ নামকরণ ছাপা অক্ষরে হলে সবসময় **ইটালিক** (ডান দিকে বাঁকা করে) হরফে হবে (যেমন-*Panthera tigris*, বাঘ)।

iv. গণ-নামটি বিশেষ্য ও এর আদ্যাক্ষরটি অবশ্যই বড় হরফে (capital letter) লিখতে হবে এবং প্রজাতি নামটি বিশেষণ যার আদ্যাক্ষরটি ছোট হরফে (small letter) লিখতে হবে।

v. যে বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম কোনো জীবের বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা দিবেন, তাঁর নাম বা নামের অংশ উক্ত জীবের দ্বিপদ নামের শেষে সংযোজিত হবে। যেমন- মাছের সিলিয়েট পরজীবী, *Paratrichodina lizae* Asmat, 2002; আসমতি ব্যাঙ, *Fejervarya asmati* Howlader, 2011।

৫. সংরক্ষণ (Preservation) : শ্রেণিবিন্যাসকৃত নমুনাকে বিস্তারিত তথ্যসহ (সংগ্রহকারীর নাম, সংগ্রহের স্থান, সময়, তারিখ ইত্যাদি) সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে অন্যান্য নমুনা শনাক্তকরণ সহায়ক হয়। এ কারণে বিভিন্ন দেশে প্রাপ্ত প্রাণীর নমুনা প্রাকৃতিক জাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের বিভাগীয় সংরক্ষণশালায় সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে সংরক্ষিত থাকে। নমুনাটি হতে পারে স্টাফ করা (stuffed) প্রাণী, চামড়া, কিংবা বিভিন্ন অংশ (শিং, লোম, মল ইত্যাদি)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Scanned with CamScanner Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বা কংকাল। প্রাণিদেহ শুকনো বা তরলেও সংরক্ষণ করা যায়। ফরমালিন ও অ্যালকোহল হচ্ছে সংরক্ষণের ভালো তরল মাধ্যম। বিভিন্ন প্রাণিগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন মাত্রার ফরমালিন ও অ্যালকোহল, কিংবা অন্যান্য বিশেষ সংরক্ষণ মাধ্যম নির্দিষ্ট রয়েছে। অতএব, শ্রেণিবিন্যাসে নমুনা সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল অধ্যায়।

প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Animal Classification)

তত্ত্বীয় ও ফলিত উভয় জীববিজ্ঞানেই শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা

- শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে কোনো প্রাণিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলে ঐ গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রাণী সম্বন্ধে ধারণা জন্মে।
- কম পরিশ্রম ও অল্প সময়ের মধ্যে প্রাণিজগতের অনেক সদস্য সম্পর্কে জানা ও শেখা যায়।
- প্রাণিকূলের পারস্পরিক সম্পর্ক বা জাতিজনির বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়।
- প্রাণিকূলের বিবর্তনিক ধারা নির্ণয়ে শ্রেণিবিন্যাস সাহায্য করে।
- নতুন প্রজাতি শনাক্ত করতে শ্রেণিবিন্যাস অপরিহার্য।

ফলিত প্রয়োজনীয়তা

- জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও বনের ক্ষতিকর প্রজাতি দমনের উদ্দেশে শ্রেণিবিন্যাস নির্দিষ্ট প্রজাতির সঠিক পরিচয় দান করে।
- শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রাণী বাছাই করা যায়।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সাহায্য করে।
- ভূতাত্ত্বিক ঘটনাবলির নিখুঁত চিত্র তুলে ধরতে জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাসের সাহায্য প্রয়োজন।
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাতের পশুপাখি উদ্ভাবন সহজতর হয়।

Hickman *et al.* (2017) অনুসরণে প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস

প্রাণিজগতের পর্বগুলোকে সাধারণভাবে **প্রধান পর্ব** (Major Phyla) এবং **গৌণ পর্ব** (Minor Phyla)-এ রকম দুটি দলে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। কোন বিবর্তনিক সম্পর্ক বা বৈশিষ্ট্যগত ভিত্তিতে দলবিভক্তি করা হয় না। তবে, প্রজাতি ও সদস্য সংখ্যা, বাস্তুতন্ত্রে এদের গুরুত্ব এবং পর্ব হিসেবে সুস্পষ্টতা অনুযায়ী এমন শ্রেণিবিন্যাস প্রচলিত আছে।

১. প্রধান পর্ব (Major Phyla) : যেসব পর্বের প্রজাতিসংখ্যা অনেক বেশি (পাঁচ হাজারের অধিক), প্রজাতির সদস্যরা বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সুস্পষ্টভাবে পর্ব হিসেবে পৃথক সত্তার অধিকারী সে সব পর্বকেই প্রধান (মুখ্য) পর্ব অর্থাৎ Major Phyla হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রধান পর্বগুলোর মধ্যে ৮টি ননকর্ডাটা (nonchordata) ও ১টি কর্ডাটা (chordata)।

২. গৌণ পর্ব (Minor Phyla) : যেসব পর্বের প্রজাতিসংখ্যা নগণ্য, প্রজাতির বাস্তুতাত্ত্বিক গুরুত্ব নেই বললেই চলে এবং শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান অস্পষ্ট অথবা বিতর্কিত সে সব পর্বই গৌণ পর্ব অর্থাৎ Minor Phyla হিসেবে স্বীকৃত। উদাহরণ– Placozoa, Ctenophora ইত্যাদি পর্ব।

Hickman *et al.* (2014) রচিত Integrated Principles of Zoology পুস্তকের বর্ণনায় প্রাণিজগতের ৩৩টি পর্বের মধ্যে প্রধান বা মেজর পর্বের সংখ্যা হলো ৯টি, এর ৮টি ননকর্ডাটা ও ১টি কর্ডাটা পর্ব। বাকি পর্বগুলো গৌণ বা মাইনর পর্ব। নিচে ৯টি প্রধান পর্বের নাম উল্লেখ করা হলো -

Phylum-1 : **PORIFERA**, Phylum-2 : **CNIDARIA**, Phylum-3 : **PLATYHELMINTHES**, Phylym-4: **NEMATODA**, Phylum -5: **MOLLUSCA**, Phylum- 6 : **ANNELIDA**, Phylum -7 : **ARTHROPODA**, Phylum -8 : **ECHINODERMATA**, Phylum -9 : **CHORDATA**.

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Scanned with CamScanner Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Hickman *et al.* (2017) অনুসরণে প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাসের ছক

Kingdom-ANIMALIA

Branch A. MESOZOA
(স্বল্প সংখ্যক কোষবিশিষ্ট প্রাণী; টিস্যু বা অঙ্গ গঠিত হয় না)
- 1. Phylum Mesozoa

Branch B. PARAZOA
(অসংখ্য কোষবিশিষ্ট প্রাণী; টিস্যু বা অঙ্গতন্ত্র গঠিত হয় না)
- * 2. Phylum **Porifera**
- 3. Phylum Placozoa

Branch C. EUMETAZOA
(অগণিত কোষবিশিষ্ট প্রাণী; টিস্যু, অঙ্গ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অঙ্গতন্ত্র গঠন করে)

Grade I. Radiata
(দ্বিস্তরী প্রাণী, টিস্যু গঠিত হলেও অঙ্গতন্ত্র অনুপস্থিত; দেহ অরীয় প্রতিসম)
- * 4. Phylum **Cnidaria**
- 5. Phylum Ctenophora

Grade II. Bilateria
(ত্রিস্তরী প্রাণী; সুগঠিত অঙ্গতন্ত্র উপস্থিত; দেহ প্রধানত দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম)

Acoelomates
(সিলোমবিহীন প্রাণী)
- * 6. Phylum **Platyhelminthes**
- 7. Phylum Gnathostomulida
- 8. Phylum Nemertea

Pseudocoelomates
(অপ্রকৃত সিলোমধারী প্রাণী)
- 9. Phylum Rotifera
- 10. Phylum Gastrotricha
- 11. Phylum Kinorhyncha
- * 12. Phylum **Nematoda**
- 13. Phylum Nematomorpha
- 14. Phylum Acanthocephala
- 15. Phylum Entoprocta
- 16. Phylum Priapulida
- 17. Phylum Loricifera

Eucoelomates
(প্রকৃত সিলোমধারী প্রাণী)
- * 18. Phylum **Mollusca**
- * 19. Phylum **Annelida**
- * 20. Phylum **Arthropoda**
- 21. Phylum Echiurida
- 22. Phylum Sipunculida
- 23. Phylum Tardigrada
- 24. Phylum Pentastomida
- 25. Phylum Onychophora
- 26. Phylum Pogonophora
- 27. Phylum Phoronida
- 28. Phylum Ectoprocta
- 29. Phylum Chaetognatha
- 30. Phylum Brachiopoda
- * 31. Phylum **Echinodermata**
- 32. Phylum Hemichordata
- * 33. Phylum **Chordata**

তারকা (*) চিহ্নিত পর্বগুলোকে (৯টি) প্রধান পর্ব (major phylum) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রাণিজগতের প্রধান বা মেজর (major) পর্বগুলোর নাম এবং এদের প্রজাতি সংখ্যা (Zhang 2013 অনুসরণে)।

	ক্র:নং	প্রধান পর্বের নাম	আবিষ্কৃত প্রজাতির সংখ্যা Zhang (2013)	বাংলাদেশে বর্ণিত প্রজাতির সংখ্যা Ahmed (2008-2009)
NON-CHORDATA	1.	Phylum **Porifera**	8,659	29
	2.	Phylum **Cnidaria**	10,203	102
	3.	Phylum **Platyhelminthes**	29,487	125
	4.	Phylum **Nematoda**	25,033	178
	5.	Phylum **Mollusca**	84,977	477
	6.	Phylum **Annelida**	17,388	98
	7.	Phylum **Arthropoda**	1,257,040	2,483
	8.	Phylum **Echinodermata**	7,550	49
	9.	Phylum **Chordata**	68,626	1,611
		মোট	1,508,963	5,152

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Scanned with CamScanner Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

লাল-সবুজে দাগানো

TEXT BOOK

প্রাণিবিজ্ঞান

উন্মেষ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১ প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস
Animal Diversity & Classification

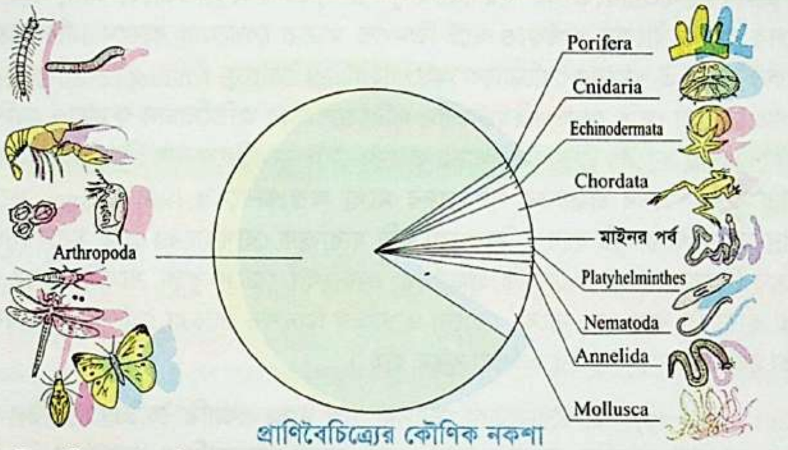

প্রাণিবৈচিত্র্যের কৌণিক নকশা

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- প্রাণিবৈচিত্র্য
- শ্রেণিবিন্যাস
- ট্যাক্সন
- প্রজাতি
- প্রতিসম
- হিমোসিল
- ননকর্ডাটা
- কর্ডাটা

জীববিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ২,৭০,০০০ ভাস্কুলার উদ্ভিদ এবং ১৫ লক্ষেরও বেশি প্রাণী-প্রজাতি শনাক্ত করেছেন। এসব প্রজাতির মধ্যে নানা কারণে ভিন্নতা দেখা যায়। ভিন্নতা সত্ত্বেও সহজভাবে অধ্যয়নের জন্য প্রাণিবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী এদের শ্রেণিবিন্যস্ত করেছেন। এ অধ্যায়ে প্রাণীর বিভিন্নতা ও শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

পিরিয়ড সংখ্যা–৭ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. প্রাণিজগতের বিভিন্নতা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. প্রাণীকে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করার ভিত্তি ও নীতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বিভিন্ন ধরনের প্রাণীকে শ্রেণিতে বিন্যস্ত করার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. নন-কর্ডাটা প্রাণীকে পর্ব (Phylum) পর্যন্ত বিন্যস্ত করতে পারবে। ৫. কর্ডাটা প্রাণীকে শ্রেণি (Class) পর্যন্ত বিন্যস্ত করতে পারবে। ৬. **ব্যবহারিক**– বিভিন্ন প্রাণী শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।	• প্রাণিজগতের ○ ভিন্নতা ○ শ্রেণিকরণের ভিত্তি ও নীতি • নন-কর্ডাটা (প্রধান পর্ব পর্যন্ত শ্রেণিবিন্যাস) • কর্ডাটা (শ্রেণি পর্যন্ত বিন্যাস) • ব্যবহারিক ○ নন-কর্ডাটার বিভিন্ন পর্বের (যেকোনো পাঁচটি) এবং ভার্টিব্রাটার বিভিন্ন শ্রেণির (যেকোনো পাঁচটি) নমুনা পর্যবেক্ষণ।

প্রাণীর বিভিন্নতা বা প্রাণিবৈচিত্র্য (Animal Diversity)

পৃথিবীর সমস্ত জলচর, স্থলচর ও খেচর প্রাণীর মধ্যে যে জিনগত, প্রজাতিগত ও বাস্তুসংস্থানগত বিভিন্নতা দেখা যায় সেটিই হচ্ছে প্রাণীর বিভিন্নতা বা **প্রাণিবৈচিত্র্য**। দেহের গঠন, বসতি নির্বাচন প্রভৃতি থেকে শুরু করে চলন, খাদ্যগ্রহণ, প্রজনন, পরিযান (migration) সহ আরও অনেক বিষয়ে প্রাণিদের বৈচিত্র্য সুস্পষ্ট। প্রত্যেক প্রাণী নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হয়ে অন্য প্রাণী থেকে ভিন্ন। পৃথিবীর বিচিত্র পরিবেশে দৃশ্য ও অদৃশ্যমান অসংখ্য প্রাণীর বিচরণ রয়েছে। কেউ দল বেঁধে অতল সমুদ্রে, মাঝ সমুদ্রে বা সমুদ্রপৃষ্ঠে সাঁতার কেটে চলছে, কেউ দ্রুত, কেউ-বা মন্থর লয়ে মাটির উপর হেঁটে বেড়াচ্ছে, কোনো প্রাণী হয়তো গাছের ডালে দোল খাচ্ছে, কেউ ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী হচ্ছে, আবার কেউ এত ছোট যে অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্য ছাড়া দেখাই যায় না। এদের কেউ তৃণভোজী, অন্যরা মাংসাশী বা সর্বভোজী কিংবা পরজীবী।

প্রাণিবৈচিত্র্যের প্রকারভেদ

প্রাণিবৈচিত্র্য তিন প্রকার : ১. জিনগত বৈচিত্র্য, ২. প্রজাতি বৈচিত্র্য এবং ৩. বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য।

১. জিনগত বৈচিত্র্য (Genetic diversity) : জিনগত বৈচিত্র্য বলতে নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে কোনো নির্দিষ্ট প্রজাতির

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

সদস্যদের মধ্যে জিনগত উপাদানে বৈষম্যের মাত্রাকে বোঝায়। একটি জীব-প্রজাতির প্রত্যেক সদস্য জিনগতভাবে অন্য সদস্য থেকে পৃথক। জিনগত সাধারণ গঠন বা **কোড** (code)-এর কারণে একটি প্রজাতির প্রত্যেক সদস্যের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য থাকে। জীবদেহে অবস্থিত জিনগুলোর মধ্যে সীমাহীন সম্মিলনের ফলে জিনগত বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। এ কারণে সকল মানুষ *Homo sapiens* নামক প্রজাতির সদস্য হলেও একজন আফ্রিকান **কৃষ্ণাঙ্গ** ও অস্ট্রেলিয়ান **শ্বেতাঙ্গ** মানুষ দেহের আকৃতি, গায়ের ও চুলের রং ইত্যাদিতে পরস্পর থেকে সুস্পষ্ট পৃথক। অনুরূপভাবে, আম, ধান, আপেল, গম ইত্যাদির আকার, স্বাদ, ফুলের বর্ণ ও বীজের পার্থক্যও ঘটে জিনগত মাত্রায় বৈষম্যের কারণে। জিনগত বৈচিত্র্য নির্দিষ্ট এক প্রজাতির সদস্যভিত্তিক হওয়ায় এ ধরনের বৈচিত্র্যকে **অন্তঃপ্রজাতিক বৈচিত্র্য** (intraspecific diversity)-ও বলা হয়। কোনো প্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য বেশি হলে পরিবর্তনশীল পরিবেশে তার অভিযোজন ক্ষমতাও বেশি থাকে। কোনো প্রজাতির সকল সদস্যের যদি একই ধরনের জিন বেশি থাকে তাহলে সেই প্রজাতিকে কম জিনগত বৈচিত্র্যসম্পন্ন (low genetic diversity) প্রজাতি বলে। এসব প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে **অন্তঃজননের** (inbreeding) ফলে একই ধরনের কম জিনগত বৈচিত্র্যসম্পন্ন জনসংখ্যার সৃষ্টি হবে। জিনগুলো যদি মারাত্মক রোগব্যাধির প্রতি সংবেদনশীল হয়ে থাকে তাহলে বংশপরম্পরায় এসব জিনের সঞ্চারণে নির্দিষ্ট প্রজাতির জনসংখ্যা রোগে ভুগে সামগ্রিকভাবে প্রজাতির অস্তিত্ব সংকট বাড়িয়ে তুলবে। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে, কোনো প্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য বেশি হলে পরিবর্তনশীল পরিবেশে তার অভিযোজন ক্ষমতা বেশি থাকে, বিলুপ্তির আশঙ্কা কমে যায়।

২. প্রজাতি বৈচিত্র্য (Species diversity) : জীববৈচিত্র্যের মৌলিক ধাপ হচ্ছে প্রজাতি বৈচিত্র্য। বিভিন্ন প্রজাতির সংখ্যা যা একটি নির্দিষ্ট সময়ে ও অঞ্চলে একসঙ্গে বসবাস করে এবং একটি **বাস্তুতান্ত্রিক সম্প্রদায়** (ecological community) গড়ে তোলে তাকে **প্রজাতি বৈচিত্র্য** বলে। প্রজাতি বৈচিত্র্যে ভাইরাসসহ পৃথিবীর সকল প্রজাতির জীব অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর সবখানে একই ধরনের জীব বাস করে না বরং কিছু অঞ্চলে নির্দিষ্ট প্রজাতির জনগোষ্ঠী (population) অন্যান্য জনগোষ্ঠী অপেক্ষা বেশি দেখা যায়। যেসব অঞ্চল পুষ্টি এবং আবহাওয়াগত উপাদানসমৃদ্ধ (যেমন মাঝারি তাপমাত্রা, পর্যাপ্ত আলো ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদি) সেসব অঞ্চলে জীববৈচিত্র্যের সমাহার থাকে অনেক বেশি। এ কারণে মরু ও মেরু অঞ্চলের চেয়ে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে জীববৈচিত্র্যের মাত্রা বেশি। যে অঞ্চলে প্রজাতি বৈচিত্র্য বেশি সে অঞ্চল সাধারণভাবে **জীববৈচিত্র্যের হটস্পট** (biodiversity hotspot) হিসেবে পরিচিত।

৩. বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য (Ecosystem diversity) : বাস্তুতন্ত্র হচ্ছে একটি জীবসম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রজাতি ও তাদের অজীবীয় ভৌত পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে উঠা টেকসই পরিবেশ। প্রত্যেক বাস্তুতন্ত্র শক্তি ও পুষ্টি প্রবাহের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকে। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে এক বা একাধিক বাস্তুতন্ত্র থাকতে পারে। অতএব, **বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বলতে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে শক্তিপ্রবাহ ও পুষ্টিচক্রের মাধ্যমে সংযুক্ত বিভিন্ন জীবসম্প্রদায়ভুক্ত প্রজাতির মধ্যে ভিন্নতাকে (জিনগত ও প্রজাতি বৈচিত্র্য) বোঝায়।** পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের বাস্তুতন্ত্র রয়েছে, যেমন–তৃণভূমি, বনভূমি, মরুভূমি, জলাভূমি ইত্যাদি। প্রত্যেক বাস্তুতন্ত্রে রয়েছে নির্দিষ্ট ধরনের উদ্ভিদ, প্রাণী ও অণুজীবের সমাবেশ। স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রজাতির উপস্থিতি এবং এদের মধ্যে গতিশীল মিথস্ক্রিয়ার এক জটিল নেটওয়ার্কের প্রতিনিধিত্ব করে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য। এভাবে লক্ষ বছর ধরে একেকটি বাস্তুতন্ত্রে বিভিন্ন প্রজাতির পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে গড়ে উঠে বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য।

গ্রিক দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** (Aristotle, খৃষ্টপূর্ব ৩৮৪–৩২২) সর্বপ্রথম প্রাণিদের এ ভিন্নতাকে লক্ষ করে প্রাণিবিদ্যাকে বিজ্ঞানের একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। এ জন্য তাঁকে **'প্রাণিবিদ্যার জনক'** বলা হয়। তিনিই প্রথম প্রাণীর বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য বিবেচনা করে প্রাণিকূলকে শ্রেণিবিন্যস্ত করতে উদ্যোগী হন। যেমন: তিনি লাল রক্তযুক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণিদের Enaima ও লাল রক্তবিহীন অমেরুদণ্ডী প্রাণিদের Anaima নামে দুটি দলে ভাগ করেন। পরবর্তীতে Enaima-কে প্রজনন প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে ডিম্বজ (যারা ডিম পাড়ে, যেমন: মাছ, উভচর, সরীসৃপ ও পাখি) এবং জরায়ুজ (যারা সন্তান প্রসব করে, যেমন: স্তন্যপায়ী) এ রকম দুটি দলে ভাগ করা হয়। আবার অমেরুদণ্ডী Anaima দলভুক্ত প্রাণিদেরকেও কোষের সংখ্যা, বাহ্যিক আকার, সিলোম ও পরিপাকতন্ত্রের উপস্থিতিসহ আরো নানান বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করা হয়। প্রথম দিকে প্রাণীর এ ভিন্নতাকে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে দেখা হলেও পরবর্তীতে আরো নানা বিষয়, যেমন–প্রাণীর বাসস্থান, জিনতত্ত্ব, কোষ ও টিস্যুতন্ত্র, ভ্রূণতত্ত্ব, অভ্যন্তরীণ অঙ্গসংস্থান ইত্যাদিও প্রাণীর ভিন্নতার কারণ হিসেবে পরিগণিত হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের ভিত্তি (Basis of Animal Classification)

প্রত্যেক প্রাণীরই নিজস্ব কতকগুলো বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ থাকে। এসব বৈশিষ্ট্য আকার, গঠন, দৈহিক প্রতিসাম্য, দেহের খণ্ডকায়ন, দেহগহ্বর, লিঙ্গ, জীবনচক্র প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনে প্রাণিদেহের এসব বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়। প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান ভিত্তিগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো–

১. দেহের আকার (Body shape)

ক. আণুবীক্ষণিক প্রাণী (Micro-animal): এসব প্রাণী এত ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণযন্ত্র ছাড়া এদের দেখা যায় না। যেমন– মাছের ফুলকার প্রোটিস্টান জীবাণু *Trichodina anabasi*।

খ. বৃহত্তর প্রাণী (Macro-animal) : এসব প্রাণী আকারে বড় এবং খালি চোখে ভালোভাবে দেখা যায়। যেমন– *Cavia porcellus* (গিনিপিগ)।

২. সংগঠন ক্রমমাত্রা (Grades of organization)

প্রাণীর কোষীয় সংগঠন ক্রমমাত্রার উপর ভিত্তি করে প্রাণিজগতকে চার ধরনের প্রাণিগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়–

ক. কোষীয় মাত্রার গঠন (Cellular grade of organization): যে দেহগঠনে কিছু কোষ সম্মিলিত হয়ে নির্দিষ্ট কাজের জন্য বিশেষিত হয় সে ধরনের দেহগঠনকে কোষীয় মাত্রার গঠন বলে। এক্ষেত্রে এক ধরনের শ্রম বিভাজন দেখা যায়, যেমন কিছু কোষ জনন কাজে, অন্য কোষগুলো পুষ্টি সংক্রান্ত কাজে ব্যস্ত থাকে। Porifera পর্বভুক্ত প্রাণী এ ধরনের গঠন সম্বলিত সদস্য।

খ. কোষ-টিস্যু মাত্রার গঠন (Cell-tissue grade of organization) : সদৃশ কোষগুলো যখন একটি অভিন্ন কাজ সম্পন্নের জন্য সুনির্দিষ্ট প্যাটার্ণ বা স্তরে গোষ্ঠীবদ্ধ বিন্যস্ত হয়ে **টিস্যু** নির্মাণ করে সে ধরনের গড়নকে কোষ-টিস্যু মাত্রার গঠন বলে। Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণীতে এধরনের গঠন মাত্রা দেখা যায়।

গ. টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠন (Tissue-organ grade of organization): স্বাচ্ছন্দ্য জীবন যাপনের জন্য যখন একাধিক টিস্যু-নির্মিত বিভিন্ন অঙ্গের সমাহার ঘটে তখন সেই গঠনকে টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠন বলে। Platyhelminthes পর্বভুক্ত প্রাণিদেহে এ গঠন মাত্রা সর্বপ্রথম আবির্ভূত হয়েছে। এক্ষেত্রে চক্ষুবিন্দু, প্রোবোসিস, জননাঙ্গ ইত্যাদি টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার গঠনের উদাহরণ।

ঘ. অঙ্গ-তন্ত্র মাত্রার গঠন (Organ-system grade of organization) : উচ্চতর প্রাণিগোষ্ঠীতে এ ধরনের গঠন দেখা যায়। এ ক্ষেত্রে অঙ্গগুলো একত্রে কিছু কাজ সম্পাদনের জন্য **অঙ্গ-তন্ত্র** (organ system) সৃষ্টির মাধ্যমে দেহকে সর্বোচ্চ মাত্রার গঠনে উন্নত করেছে। তন্ত্রগুলো (systems) দেহে শ্বসন, সংবহন, পরিপাক প্রভৃতি মৌলিক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকে। অধিকাংশ পর্বে (Phyla) এ ধরনের গঠন মাত্রা দেখা যায়। এ মাত্রার গঠন সর্বপ্রথম আবির্ভূত হয়েছে নিমারটিয়ান (Nemartean) নামক এক সামুদ্রিক প্রাণিগোষ্ঠীতে।

৩. জীবন পদ্ধতি (Way of living)

জীবন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিকূলকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়–

ক. মুক্তজীবী (Free living) : এসব প্রাণী স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায় এবং এরা পারস্পরিক সহযোগিতা বা সাহচর্যে বাস করে না। যেমন– কবুতর (*Columba livia*)।

খ. পরজীবী (Parasite) : এসব প্রাণী খাদ্যের জন্য অন্য প্রাণীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আশ্রয়দাতার দেহ থেকে খাদ্য শোষণ করে বেঁচে থাকে। যেমন– যকৃত কৃমি (*Fasciola hepatica*)।

৪. ক্লিভেজ ও ভ্রূণীয় বিকাশ (Cleavage and development)

যে পদ্ধতিতে যৌন জননকারী প্রাণীর এককোষী **জাইগোট** মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য বহুকোষী ভ্রূণ সৃষ্টি করে তাকে **ক্লিভেজ** বা **সম্ভেদ** বলে। ডিমে কুসুমের পরিমাণের ভিত্তিতে ক্লিভেজ সম্পূর্ণ বা **হলোব্লাস্টিক** (holoblastic) কিংবা আংশিক বা **মেরোব্লাস্টিক** (meroblastic) হতে পারে। ক্লিভেজের সময় ডিমের যে প্রান্তে কুসুম থাকে তাকে **ভেজিটাল পোল** (vegetal pole) এবং যে প্রান্তে নিউক্লিয়াস থাকে তাকে **অ্যানিমেল পোল** (animal pole) বলে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বিভাজন তলের উপর ভিত্তি করে ক্লিভেজ তিন প্রকার, যথা–

ক. অরীয় ক্লিভেজ (Radial cleavage) : এক্ষেত্রে বিভাজন তলগুলো জাইগোটকে সর্বদা অরীয় ও সুষমভাবে বিভক্ত করে। Arthropoda পর্বের প্রাণীতে ক্লিভেজ অরীয় ধরনের।

খ. দ্বিপার্শ্বীয় ক্লিভেজ (Bilateral cleavage) : এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিভাজন পর্যন্ত অরীয় ক্লিভেজের মতো কিন্তু পরবর্তী বিভাজন মধ্যরেখা বরাবর অনুপ্রস্থভাবে ঘটে বলে চারটি করে দুই সারি কোষের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্যতা দেখা যায়। Chordata পর্বের প্রাণীতে এ ধরনের ক্লিভেজ দেখা যায়।

গ. সর্পিল ক্লিভেজ (Spiral cleavage) : Annelida ও Mollusca পর্বের প্রাণিদের ক্ষেত্রে ঠিক তৃতীয় বিভাজনের সময় অ্যানিমেল পোলের ব্লাস্টোমিয়ারসমূহ ভেজিটাল পোলের ব্লাস্টোমিয়ারগুলোর সাথে চক্রাকারে সামান্য স্থান পরিবর্তন করে। এ ধরনের ক্লিভেজকে সর্পিল ক্লিভেজ বলে। পাখি, সরিসৃপ ও মাছে এধরনের ক্লিভেজ পাওয়া যায়।

৫. ভ্রূণস্তর (Germ layers)

যেসব প্রাণীর যৌন প্রজনন ঘটে সেগুলোর জাইগোট ক্লিভেজ (cleavage) প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে **ব্লাস্টোমিয়ার (blastomere)** নামক কোষ সৃষ্টি করে। কোষগুলো সজ্জিত হয়ে প্রথমে নিরেট **মরুলা (morula)** ও পরে ফাঁপা **ব্লাস্টুলা (blastula)** দশা অতিক্রম করে দ্বিস্তরী বা ত্রিস্তরী **গ্যাস্ট্রুলা (gastrula)**-য় পরিণত হয়। প্রাণীর প্রাথমিক শ্রেণিবিন্যাসে ভ্রূণস্তর বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ভ্রূণস্তরের উপর ভিত্তি করে প্রাণিদের দুভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে:

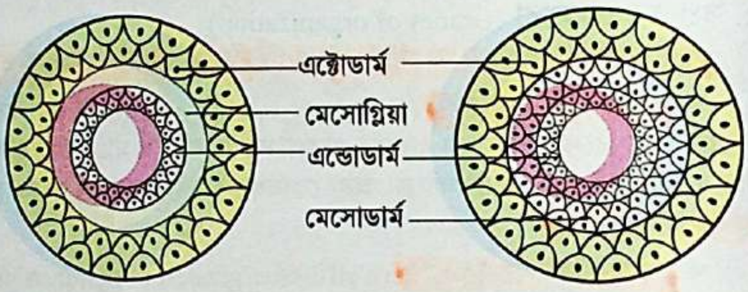

চিত্র ১.১ : দ্বিস্তরী (বায়ে) এবং ত্রীস্তরী (ডানে) কোষ বিন্যাস

ক. দ্বিস্তরী বা দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী (Diploblastic animal) : যেসব প্রাণীর ভ্রূণের গ্যাস্ট্রুলা পর্যায়ে কোষগুলো এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে, সেগুলোকে দ্বিস্তরী প্রাণী বলে। স্তরদুটির মাঝে থাকে আঠালো জেলির মতো অকোষীয় মেসোগ্লিয়া (mesoglea)। Cnidaria পর্বের প্রাণীরা দ্বিস্তরী (যেমন– *Hydra*)।

খ. ত্রিস্তরী বা ত্রিভ্রূণস্তরী প্রাণী (Triploblastic animal) : যেসব প্রাণীর ভ্রূণে গ্যাস্ট্রুলা পর্যায়ে কোষগুলো তিনটি কোষীয় স্তরে বিন্যস্ত থাকে তাদের ত্রিস্তরী প্রাণী বলে। তিনটি স্তরের মধ্যে বাইরের স্তরটিকে **এক্টোডার্ম** (ectoderm), মাঝেরটিকে **মেসোডার্ম** (mesoderm) এবং ভিতরেরটিকে **এন্ডোডার্ম** (endoderm) বলে। Platyhelminthes (ফিতাকৃমি-*Taenia solium*) থেকে শুরু করে Chordata (মানুষ-*Homo sapiens*) পর্ব পর্যন্ত সকল প্রাণী ত্রিস্তরী। এ স্তরগুলো থেকে প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি হয়।

দ্বিস্তরী প্রাণী ও ত্রিস্তরী প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বৈশিষ্ট্য	দ্বিস্তরী প্রাণী	ত্রিস্তরী প্রাণী
১. ভ্রূণীয় কোষস্তর	দেহের কোষগুলো এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক দুটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে।	দেহের কোষগুলো এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামক তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থাকে।
২. মেসোগ্লিয়া	এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্মের মাঝখানে মেসোগ্লিয়া নামক অকোষীয় স্তর থাকে।	মেসোগ্লিয়া নেই।
৩. ভ্রূণস্তরের পরিণতি	কোষগুলো টিস্যু বা অঙ্গ গঠন করতে পারে না।	ভ্রূণস্তরের কোষগুলো বিভিন্ন টিস্যু, অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র গঠন করে।
৪. নেমাটোসিস্ট	উপস্থিত।	অনুপস্থিত।
৫. পলিপ ও মেডুসা দশা	উভয় দশা বা একটি দশা থাকে।	অনুপস্থিত।
৬. দেহ গহ্বর	গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর বা সিলেন্টেরন।	সিলোম।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৬. প্রতিসাম্য (Symmetry)

প্রতিসাম্য বলতে প্রাণিদেহের মধ্যরেখীয় তলের দুপাশে সদৃশ বা সমান আকার-আকৃতিবিশিষ্ট অংশের অবস্থানকে বোঝায়। যেসব প্রাণীর দেহকে কোনো না কোনো অক্ষ বা তল বরাবর সমান অংশে ভাগ করা যায় সেসব প্রাণীকে প্রতিসম প্রাণী (symmetrical animal) বলে। আর যেসব প্রাণীর দেহে এমন বিভাজন সম্ভব হয় না সেগুলোকে অপ্রতিসম প্রাণী (asymmetrical animal) বলে অভিহিত করা হয়। প্রাণিদেহে নিচে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের প্রতিসাম্য দেখা যায়।

ক. গোলীয় প্রতিসাম্য (Spherical symmetry) : একটি গোলককে যেভাবে কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত যে কোনো তল বরাবর সদৃশ বা সমান অংশে ভাগ করা যায়, তেমনিভাবে কোনো প্রাণিদেহকে যদি ভাগ করা যায়, তখন তাকে গোলীয় প্রতিসাম্য বলে। যেমন- *Volvox, Radiolaria, Heliozoa* প্রভৃতি এককোষী প্রোটিস্টান জীব।

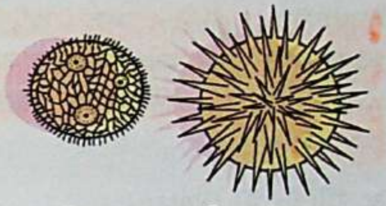

চিত্র ১.২ : গোলীয় প্রতিসাম্য

খ. অরীয় প্রতিসাম্য (Radial symmetry) : কোনো প্রাণীর দেহকে যদি কেন্দ্রীয় লম্ব অক্ষ বরাবর কেটে সদৃশ দুইয়ের বেশি সংখ্যক অর্ধাংশে ভাগ করা যায়, তখন সে ধরনের প্রতিসাম্যকে অরীয় প্রতিসাম্য বলে। হাইড্রা (*Hydra*), জেলিফিশ (*Aurelia*), সী অ্যানিমন (*Metridium*) ও সম্পর্কিত গোষ্ঠিভুক্ত প্রাণী যাদের অনুলম্ব অক্ষের এক প্রান্তে মুখ অবস্থিত সে সব প্রাণীতে অরীয় প্রতিসাম্য দেখা যায়।

চিত্র ১.৩ : অরীয় প্রাতিসাম্য

গ. দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য (Biradial symmetry): কোনো প্রাণিদেহে যখন কোনো অঙ্গের সংখ্যা একটি কিংবা একজোড়া হওয়ায় অনুদৈর্ঘ্য অক্ষ বরাবর শুধু দুটি তল পরস্পরের সমকোণে অতিক্রম করতে পারে, ফলে ঐ প্রাণিদেহ ৪টি সদৃশ অংশে বিভক্ত হতে পারে। এ ধরনের প্রতিসাম্য হচ্ছে দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য। Ctenophora (টিনোফোরা) পর্বভুক্ত প্রাণীর দেহ, যেমন-*Ceoloplana* মৌলিকভাবে অরীয় প্রতিসম হলেও দুটি কর্ষিকা থাকায় এগুলো দ্বিঅরীয় প্রতিসম প্রাণী।

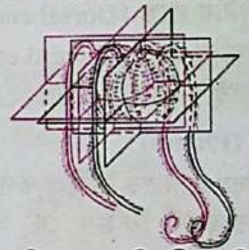

চিত্র ১.৪ : দ্বিঅরীয় প্রতিসাম্য

ঘ. দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য (Bilateral symmetry) : যখন কোনো প্রাণীর দেহকে কেন্দ্রীয় অক্ষ বরাবর শুধু একবার ডান ও বামপাশে (অর্থাৎ স্যাজিটাল তল) দুটি সদৃশ অংশে ভাগ করা যায়, তখন তাকে দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য বলে। যেমন- প্রজাপতি (*Pieris brassicae*), ব্যাঙ (*Fejervarya asmati*), মানুষ (*Homo sapiens*) প্রভৃতি।

চিত্র ১.৫ : দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসাম্য

ঙ. অপ্রতিসাম্য (Asymmetry) : যখন কোনো প্রাণীর দেহকে অক্ষ বা দেহতল বরাবর ছেদ করলে একবারও দুটি সদৃশ অংশে ভাগ করা যায় না তখন তাকে অপ্রতিসাম্য বলে। উদাহরণ-স্পঞ্জ (*Cliona celata*), আপেল শামুক (*Pila globosa*) ইত্যাদি।

চিত্র ১.৬ : অপ্রতিসাম্য

৭. খণ্ডকায়ন (Metamerism or Segmentation)

কোনো প্রাণীর দেহ যদি লম্বালম্বি অক্ষ বরাবর একই রকম খণ্ডাংশের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে গঠিত হয়, তখন এ অবস্থাকে খণ্ডকায়ন বা মেটামেরিজম (metamerism) বলে। প্রতিটি খণ্ডককে বলা হয় মেটামিয়ার (metamere) বা সোমাইট (somite)। বিভিন্ন ধরনের খণ্ডকায়নবিশিষ্ট প্রাণী হতে পারে। যেমন–

ক. সমখণ্ডকায়নবিশিষ্ট (Homonomous metamere) : যে সব প্রাণীর দেহখণ্ডকগুলো সদৃশ বা একই ধরনের হয়, সেসব প্রাণীকে সমখণ্ডকায়নবিশিষ্ট বলে। উদাহরণ– কেঁচোর খণ্ডকায়ন।

খ. অসমখণ্ডকায়নবিশিষ্ট (Heteronomous metamere) : যে সব প্রাণীর দেহখণ্ডকগুলো অসম বা ভিন্ন ধরনের হয়, সেসব প্রাণীকে অসম খণ্ডকায়নবিশিষ্ট বলে। উদাহরণ– পতঙ্গের খণ্ডকায়ন।

গ. খণ্ডকায়নবিহীন (Asegmental) : এ ধরনের প্রাণীতে কোনো খণ্ডকায়ন নেই। উদাহরণ– সমুদ্রতারা, ঝিনুক ইত্যাদি।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৮. অঞ্চলায়ন বা ট্যাগমাটাইজেশন (Tagmatization)

Arthropoda পর্বের প্রাণিদেহ বাহ্যিকভাবে খণ্ডায়িত হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খণ্ডকগুলো সুস্পষ্ট নয় বরং এক্ষেত্রে কিছু খণ্ডক একত্রে মিলিত হয়ে দেহে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চল সৃষ্টি করে। প্রতিটি অঞ্চলকে ট্যাগমাটা (tagmata) বলে। আর্থ্রোপোডের দেহ-খণ্ডকগুলোর এমন অঞ্চলীকরণকে বলে অঞ্চলায়ন। Arthropoda-র শ্রেণিবিন্যাসে অঞ্চলায়নের গুরুত্ব দেয়া হয়।

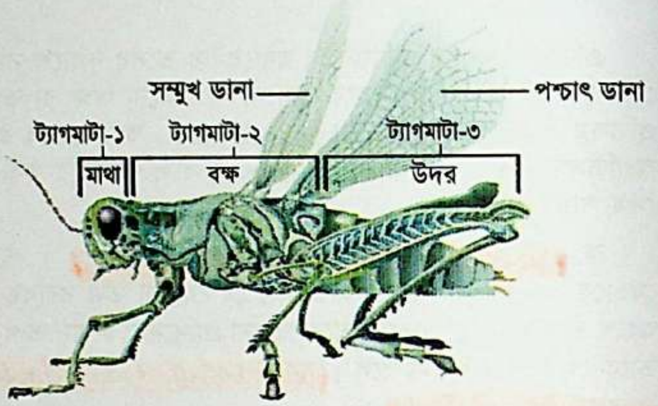

চিত্র ১.৭ : ট্যাগমাটাইজেশন

৯. প্রান্তিকতা (Polarity)

দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম প্রাণীর দেহের যে প্রান্তে মুখ থাকে তাকে মাথা ও তার বিপরীত প্রান্তকে পায়ু বা লেজ প্রান্ত বলা হয়। এরকমভাবে যেকোন প্রাণীর দেহের দুই প্রান্তের গঠনের ভিন্নতাই প্রান্তিকতা নামে পরিচিত। সাধারণত প্রাণিদেহের প্রান্তিকতা পাঁচ ধরনের।

ক. সম্মুখ প্রান্ত (Anterior end) : দেহের যে প্রান্তে মাথা থাকে।
খ. পশ্চাৎ প্রান্ত (Posterior end) : মাথার বিপরীত প্রান্ত।
গ. পৃষ্ঠীয় প্রান্ত (Dorsal end): দেহের উপরের দিকের তল।
ঘ. অঙ্কীয় প্রান্ত (Ventral end) : দেহের নিচের দিকের তল।
ঙ. পার্শ্বীয় প্রান্ত (Lateral end) : দেহের দুইপাশের তল।

১০. তল (Planes)

প্রতিসম প্রাণীতে দৈহিক তল শ্রেণিকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। যে অঞ্চল বরাবর প্রাণিদেহকে ডান ও বাম বা অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপ্রস্থ বা সম্মুখ ও পশ্চাৎ অঞ্চল বরাবর দুভাগে ভাগ করা যায়, তাকে তল বলে। প্রাণিদেহে সাধারণত তিন ধরনের তল দেখা যায়।

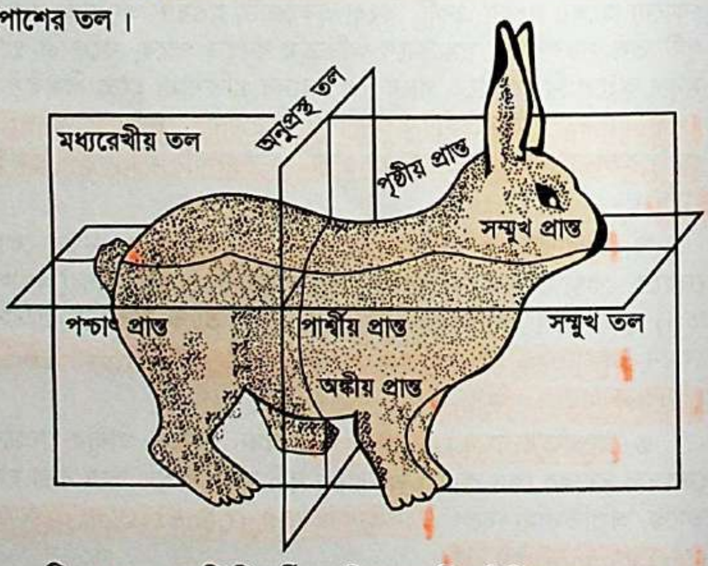

চিত্র ১.৮ : একটি দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম প্রাণীর বিভিন্ন প্রান্ত ও তল

ক. মধ্যরেখীয় তল (Median or Sagittal plane) : যে তল দিয়ে কেন্দ্রীয়, পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় অক্ষ বরাবর দেহকে পার্শ্বীয়ভাবে সদৃশ ডান ও বাম অর্ধাংশে ভাগ করা যায়, তাকে মধ্যরেখীয় তল বলে।

খ. সম্মুখ তল (Frontal plane) : যে তল দিয়ে লম্বা লম্বি অক্ষ বরাবর দেহকে পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় এ দুটি অংশে ভাগ করা যায়, তাকে সম্মুখ তল বলে।

গ. অনুপ্রস্থ তল (Transverse plane) : যে তল দিয়ে দেহের মধ্যরেখীয় তলের সমকোণ বরাবর দেহকে সম্মুখ ও পশ্চাৎ অর্ধাংশে ভাগ করা যায়, তাকে অনুপ্রস্থ তল বলে।

১১. সিলোম (Coelom)

ত্রিস্তরী প্রাণীর ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের সময় মেসোডার্ম স্তর থেকে সৃষ্ট যে গহ্বর মেসোডার্মাল কোষে নির্মিত পেরিটোনিয়াম (peritoneum) নামক ঝিল্লিতে আবৃত থাকে তাকে সিলোম বলে। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী, দেহাভ্যন্তরীণ সব গহ্বরই সিলোম নয়। বরং সিলোম ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের গহ্বর দেহের অভ্যন্তরে উপস্থিত। সিলোমের উপস্থিতির ভিত্তিতে প্রাণিদের নিম্নোক্ত গোষ্ঠীভুক্ত করা হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ক. অ্যাসিলোমেট (Acoelomate) : এসব প্রাণীর দেহে সিলোমের পরিবর্তে ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের সময় অন্তঃস্থ ফাঁকা স্থানটি (ব্লাস্টোসিল) মেসোডার্মাল স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা (spongy parenchyma) কোষে পূর্ণ থাকে। Porifera, Cnidaria, Ctenophora, Platyhelminthes প্রভৃতি পর্বভুক্ত প্রাণীরা অ্যাসিলোমেট।

খ. স্যুডোসিলোমেট (Pseudocoelomate) বা অপ্রকৃত-সিলোমেট : এসব প্রাণীও সিলোমবিহীন তবে ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের সময় অন্তঃস্থ ফাঁকা স্থানটিকে (ব্লাস্টোসিল) ঘিরে কখনও কখনও মেসোডার্মাল কোষস্তর অবস্থান করে। কিন্তু কোষগুলো কখনও পূর্ণ কোষস্তর বা পেরিটোনিয়াম সৃষ্টি করে ব্লাস্টোসিলকে সম্পূর্ণ বেষ্টন করে না। Nematoda, Rotifera, Kinorhyncha প্রভৃতি পর্বভুক্ত প্রাণীরা স্যুডোসিলোমেট।

গ. ইউসিলোমেট (Eucoelomate) বা প্রকৃত সিলোমেট : এগুলো প্রকৃত সিলোমযুক্ত প্রাণী কারণ ভ্রূণীয় মেসোডার্মের অভ্যন্তর থেকে গহ্বররূপে সিলোম উদ্ভূত হয় এবং চাপা, মেসোডার্মাল এপিথেলিয়াল কোষে গঠিত পেরিটোনিয়াম স্তরে সম্পূর্ণ বেষ্টিত থাকে। ইউসিলোমেটদের অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রাণী মনে করা হয়। Mollusca, Annelida, Arthropoda, Echinodermata, Hemichordata, Chordata প্রভৃতি পর্বভুক্ত প্রাণী ইউসিলোমেট।

চিত্র ১.৯ : বিভিন্ন ধরনের সিলোম

কাজ : স্যুডোসিলোমেট এবং ইউসিলোমেট প্রাণীর মধ্যে তুলনামূলক ছক তৈরি কর।

১২. নটোকর্ড (Notochord)

ভ্রূণাবস্থায় বা আজীবন দেহের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর অবস্থিত কিছুটা নমনীয়, স্থিতিস্থাপক ও ছিদ্রযুক্ত টিস্যুর দণ্ডকে নটোকর্ড বলে। নটোকর্ডের উপর ভিত্তি করে প্রাণিজগতকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক. ননকর্ডেট (Nonchordate) : এদের দেহে কখনোই নটোকর্ড থাকে না। যেমন–কেঁচো, ঘাসফড়িং ইত্যাদি।

খ. কর্ডেট (Chordate) : এসব প্রাণীর দেহে আজীবন বা শুধু ভ্রূণ অবস্থায় নটোকর্ড থাকে। যেমন– অ্যাসিডিয়া, ব্যাঙ, সাপ, মানুষ ইত্যাদি।

১৩. পৌষ্টিকনালি (Alimentary canal)

পৌষ্টিকনালির উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিদের দুভাগে ভাগ করা যায়–

ক. প্যারাজোয়া (Parazoa) : যেসব প্রাণীর দেহে কোনো নির্দিষ্ট পৌষ্টিকনালি বা গহ্বর থাকে না সেগুলোকে প্যারাজোয়া বলে। উদাহরণ– Porifera পর্বভুক্ত প্রাণী।

খ. এন্টেরোজোয়া (Enterozoa) : যেসব প্রাণীর দেহে নির্দিষ্ট পৌষ্টিকনালি বা গহ্বর থাকে সেগুলোকে এন্টেরোজোয়া বলে। উদাহরণ– Cnidaria থেকে Chordata পর্ব পর্যন্ত সকল প্রাণী।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

শ্রেণিবিন্যাসের নীতি (Principles of Animal Classification)

শ্রেণিবিন্যাস একটি সুসংঘবদ্ধ বিজ্ঞান। খুঁটিনাটি অনেক নীতি মেনে শ্রেণিবিন্যাস সম্পন্ন করতে হয়। নিচে প্রধান নীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

১. শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্য (Taxonomic character) **নির্ধারণ :** একটি ট্যাক্সন-সদস্যের যে বৈশিষ্ট্য অন্য ট্যাক্সন (শ্রেণিবদ্ধগত একক) থেকে তাকে পৃথক করতে পারে বা পৃথক করার সম্ভাবনা দেখাতে পারে সেটি ঐ ট্যাক্সনের শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্য। আধুনিক গবেষণায়, শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্য বলতে ট্যাক্সন-সদস্যদের অঙ্গসংস্থানিক, রাসায়নিক, শারীরবৃত্তিক, জিনগত, জননগত বা বাস্তুসংস্থানিক বৈশিষ্ট্যকে বুঝায়। শ্রেণিবিন্যাসের সময় প্রত্যেক ধাপে অন্তর্ভুক্ত ট্যাক্সনের শনাক্তকারী শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্যাবলির উল্লেখ করতে হয়।

২. শনাক্তকরণ (Identification) **:** শ্রেণিবদ্ধগত বৈশিষ্ট্যের আলোকে পর্যবেক্ষণে থাকা কোনো ট্যাক্সন-সদস্য পরিচিত বা আগে বর্ণিত হয়েছে এমন হতে পারে, কিংবা অপরিচিতও হতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে, এটি একটি নতুন ট্যাক্সন। এভাবে শ্রেণিকরণের উদ্দেশে সংগৃহীত যে কোনো নমুনা নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য প্রাণীর প্রকাশিত বর্ণনার সাথে তুলনামূলক আলোচনা সাপেক্ষে ক্যাটাগরিকরণ সম্পন্ন করতে হবে।

৩. ক্যাটাগরিকরণ বা র‍্যাংকভুক্তি (Categorization or Ranking) **:** যেসব প্রাণী বা প্রাণিগোষ্ঠীকে শ্রেণিবিন্যাসের উদ্দেশে বিভিন্ন ধাপ অর্থাৎ ক্যাটাগরি বা র‍্যাংক-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয় সে সব প্রাণিগোষ্ঠীকে ট্যাক্সন (taxon; বহুবচনে taxa) বলে। ট্যাক্সন হচ্ছে শ্রেণিবদ্ধগত একক (taxonomic unit)। অর্থাৎ শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত প্রতিটি ক্যাটাগরিভুক্ত (র‍্যাংকভুক্ত) প্রাণীর জনগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠীবর্গকে এককেটি ট্যাক্সন বলে। যেমন–Animalia, Chordata, Mammalia, Primates, Hominidae, *Homo*, *Homo sapiens* এককেটি ট্যাক্সন। বিবর্তনিকভাবে সম্পর্কিত এবং অভিন্ন বৈশিষ্ট্যাবলি বহনকারী প্রাণিগুলো (ট্যাক্সন)-কে এককেটি শ্রেণিবদ্ধগত ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শ্রেণিবিন্যাসের আবশ্যিক (mandatory) ধাপ (র‍্যাংক বা ক্যাটাগরি) হচ্ছে ৭টি, যথা:- Kingdom, Phylum, Class, Order, Family, Genus ও Species।

বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নতুন প্রাণী আবিষ্কার হওয়ায় পরবর্তীতে প্রাণীর সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়ার কারণে ঐ ৭টি স্তরের শ্রেণিবিন্যাস অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ অসুবিধা দূর করতে প্রাণিবিজ্ঞানীরা উপরের ৭টি মূলধারার সাথে Super (অধি), Sub (উপ), Infra (ইনফ্রা) ইত্যাদি নতুন স্তর যুক্ত করেন। তবে এগুলো আবশ্যিক ধাপ নয়।

i. **প্রজাতি** (Species) **:** শ্রেণিবিন্যাসের মূল বা ভিত্তি একক হচ্ছে প্রজাতি। Earnst Mayr (1969) এর মতে –"প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনো জীবগোষ্ঠী যদি নিজেদের মধ্যে যৌন মিলন ঘটিয়ে জননক্ষম সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয় কিন্তু অন্য কোনো গোষ্ঠীর সাথে প্রজননগতভাবে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা থাকে তখন ঐ ধরনের জীবগোষ্ঠীকে প্রজাতি বলে।" যেমন– পৃথিবীর সকল মানুষ, বানর, ব্যাঙ, আম, কাঁঠাল গাছ এককেটি প্রজাতির অন্তর্গত।

ক্যাটাগরি/র‍্যাংক	ট্যাক্সন
Kingdom	Animalia
Phylum	Chordata
Class	Mammalia
Order	Primates
Family	Hominidae
Genus	*Homo*
Species	*Homo sapiens*

চিত্র ১.১০ : প্রাণিজগতে মানুষের শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান (systemetic position)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ii. **গণ** (Genus) : পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত একাধিক প্রজাতির সমন্বয়ে গঠিত একককে গণ বলে।
iii. **গোত্র** (Family) : পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এক বা একাধিক গণ মিলে গঠিত হয় একটি গোত্র।
iv. **বর্গ** (Order) : পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এক বা একাধিক গোত্র মিলে একটি বর্গ গঠন করে।
v. **শ্রেণি** (Class) : পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক বর্গ নিয়ে গঠিত একককে শ্রেণি বলে।
vi. **পর্ব** (Phylum) : কয়েকটি সাদৃশ্যপূর্ণ শ্রেণি নিয়ে গঠিত একককে বলা হয় পর্ব।
vii. **রাজ্য** (Kingdom) : এটি প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসের সার্বজনীন স্তর। অর্থাৎ এ স্তরটিতে পৃথিবীর সকল প্রাণীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. নামকরণ (Nomenclature) : কোনো বিশেষ প্রাণী বা প্রাণিগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট নামে শনাক্তকরণের পদ্ধতিকে বলা হয় নামকরণ। ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানের পর কোন প্রাণী নতুন প্রমাণিত হলে উক্ত প্রাণীকে ICZN এর নিয়মানুযায়ী নামকরণ করতে হবে। সুইডিশ বিজ্ঞানী **ক্যারোলাস লিনিয়াস** (Carolus Linnaeus) সর্বপ্রথম নামকরণের একটি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। এটি **দ্বিপদ নামকরণ পদ্ধতি** (Binomial Nomenclature System) নামে পরিচিত। এ নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক জীবের বৈজ্ঞানিক নামের দুটি অংশ থাকে যার প্রথমটি **গণ** (genus) নাম এবং দ্বিতীয়টি **প্রজাতি** (species) নাম। গণ নামের প্রথম অক্ষর ইংরেজী বর্ণমালার বড় অক্ষরে এবং প্রজাতি নামের আদ্যক্ষর ছোট অক্ষরে লিখতে হয়। এভাবে দুটি ল্যাটিন বা রূপান্তরিত ল্যাটিন শব্দ দিয়ে প্রাণীর নামকরণের পদ্ধতিকে **দ্বিপদ নামকরণ** (binomial nomenclature) বলে।

অনেক সময় একটি প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য অঙ্গসংস্থানিক পার্থক্য দেখা যায়। সে সব সদস্যকে ঐ নির্দিষ্ট প্রজাতির **উপপ্রজাতি** (subspecies) হিসেবে গণ্য করা হয়। তখন গণ ও প্রজাতি সমন্বিত **দ্বিপদ** নামটি উপপ্রজাতিসহ **ত্রিপদ** (trinomial) নামে পরিচিত হয়। এভাবে, উপপ্রজাতিসহ কোনো প্রাণীর নামকরণকে ত্রিপদ **নামকরণ** (trinominal nomenclature) বলে। যেমন: ইউরোপীয়ান চড়ুই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম-*Passer domesticus*; কিন্তু নীলনদ এলাকার চড়ুই পাখির বৈজ্ঞানিক নাম- *Passer domesticus niloticus*। পাখি বিজ্ঞানী Schlegel (1844) সর্বপ্রথম ত্রিপদ নামকরণ পদ্ধতির প্রচলন করেন এবং এটি ICZN কর্তৃক স্বীকৃত পদ্ধতি।

কোনো জীবের নামকরণ পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল এবং তা কতকগুলো নিয়ম মেনে সমাধান করা হয়। প্রাণীর নামকরণের নিয়মগুলো প্রাণী নামকরণের আন্তর্জাতিক সংস্থা International Commission on Zoological Nomenclature (ICZN) প্রণয়ন করে থাকে এবং নিয়মগুলো International Code on Zoological Nomenclature-এ লিপিবদ্ধ করা হয়। নিচে নামকরণের প্রধান নিয়মাবলি উলেখ করা হলো।

i. প্রত্যেক প্রাণীর একটি **বৈজ্ঞানিক নাম** থাকবে এবং এ নামের **দুটি অংশ** থাকবে; একে **দ্বিপদ নামকরণ** বলা হবে।
ii. দ্বিপদ নামের প্রথম অংশটি ঐ জীবের **গণ** নাম ও দ্বিতীয় অংশটি **প্রজাতি** নামের নির্দেশক।
iii. প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নামটি অবশ্যই **ল্যাটিন** বা **ল্যাটিনকৃত** (latinized) হতে হবে। দ্বিপদ নামকরণ ছাপা অক্ষরে হলে সবসময় **ইটালিক** (ডান দিকে বাঁকা করে) হরফে হবে (যেমন–*Panthera tigris*, বাঘ)।
iv. গণ-নামটি বিশেষ্য ও এর আদ্যাক্ষরটি অবশ্যই বড় হরফে (capital letter) লিখতে হবে এবং প্রজাতি নামটি বিশেষণ যার আদ্যাক্ষরটি ছোট হরফে (small letter) লিখতে হবে।
v. যে বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম কোনো জীবের বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনা দিবেন, তাঁর নাম বা নামের অংশ উক্ত জীবের দ্বিপদ নামের শেষে সংযোজিত হবে। যেমন– মাছের সিলিয়েট পরজীবী, *Paratrichodina lizae* Asmat, 2002; আসমতি ব্যাঙ, *Fejervarya asmati* Howlader, 2011।

৫. সংরক্ষণ (Preservation) : শ্রেণিবিন্যাসকৃত নমুনাকে বিস্তারিত তথ্যসহ (সংগ্রহকারীর নাম, সংগ্রহের স্থান, সময়, তারিখ ইত্যাদি) সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে অন্যান্য নমুনা শনাক্তকরণ সহায়ক হয়। এ কারণে বিভিন্ন দেশে প্রাপ্ত প্রাণীর নমুনা প্রাকৃতিক জাদুঘর, বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের বিভাগীয় সংরক্ষণশালায় সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে সংরক্ষিত থাকে। নমুনাটি হতে পারে স্টাফ করা (stuffed) প্রাণী, চামড়া, কিংবা বিভিন্ন অংশ (শিং, লোম, মল ইত্যাদি)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বা কংকাল। প্রাণিদেহ শুকনো বা তরলেও সংরক্ষণ করা যায়। ফরমালিন ও অ্যালকোহল হচ্ছে সংরক্ষণের ভালো তরল মাধ্যম। বিভিন্ন প্রাণিগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন মাত্রার ফরমালিন ও অ্যালকোহল, কিংবা অন্যান্য বিশেষ সংরক্ষণ মাধ্যম নির্দিষ্ট রয়েছে। অতএব, শ্রেণিবিন্যাসে নমুনা সংরক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও দায়িত্বশীল অধ্যায়।

প্রাণীর শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Animal Classification)

তত্ত্বীয় ও ফলিত উভয় জীববিজ্ঞানেই শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

তাত্ত্বিক প্রয়োজনীয়তা

- শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে কোনো প্রাণিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলে ঐ গোষ্ঠীর অন্যান্য প্রাণী সম্বন্ধে ধারণা জন্মে।
- কম পরিশ্রম ও অল্প সময়ের মধ্যে প্রাণিজগতের অনেক সদস্য সম্পর্কে জানা ও শেখা যায়।
- প্রাণিকূলের পারস্পরিক সম্পর্ক বা জাতিজনির বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়।
- প্রাণিকূলের বিবর্তনিক ধারা নির্ণয়ে শ্রেণিবিন্যাস সাহায্য করে।
- নতুন প্রজাতি শনাক্ত করতে শ্রেণিবিন্যাস অপরিহার্য।

ফলিত প্রয়োজনীয়তা

- জনস্বাস্থ্য, কৃষি ও বনের ক্ষতিকর প্রজাতি দমনের উদ্দেশে শ্রেণিবিন্যাস নির্দিষ্ট প্রজাতির সঠিক পরিচয় দান করে।
- শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রাণী বাছাই করা যায়।
- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সাহায্য করে।
- ভূতাত্ত্বিক ঘটনাবলির নিখুঁত চিত্র তুলে ধরতে জীবজগতের শ্রেণিবিন্যাসের সাহায্য প্রয়োজন।
- কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে উন্নত জাতের পশুপাখি উদ্ভাবন সহজতর হয়।

Hickman *et al.* (2017) অনুসরণে প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাস

প্রাণিজগতের পর্বগুলোকে সাধারণভাবে প্রধান পর্ব (Major Phyla) এবং গৌণ পর্ব (Minor Phyla)-এ রকম দুটি দলে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। কোন বিবর্তনিক সম্পর্ক বা বৈশিষ্ট্যগত ভিত্তিতে দলবিভক্তি করা হয় না। তবে, প্রজাতি ও সদস্য সংখ্যা, বাস্তুতন্ত্রে এদের গুরুত্ব এবং পর্ব হিসেবে সুস্পষ্টতা অনুযায়ী এমন শ্রেণিবিন্যাস প্রচলিত আছে।

১. প্রধান পর্ব (Major Phyla) : যেসব পর্বের প্রজাতিসংখ্যা অনেক বেশি (পাঁচ হাজারের অধিক), প্রজাতির সদস্যরা বাস্তুতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সুস্পষ্টভাবে পর্ব হিসেবে পৃথক সত্ত্বার অধিকারী সে সব পর্বকেই প্রধান (মুখ্য) পর্ব অর্থাৎ Major Phyla হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রধান পর্বগুলোর মধ্যে ৮টি ননকর্ডাটা (nonchordata) ও ১টি কর্ডাটা (chordata)।

২. গৌণ পর্ব (Minor Phyla) : যেসব পর্বের প্রজাতিসংখ্যা নগণ্য, প্রজাতির বাস্তুতাত্ত্বিক গুরুত্ব নেই বললেই চলে এবং শ্রেণিবিন্যাসগত অবস্থান অস্পষ্ট অথবা বিতর্কিত সে সব পর্বই গৌণ পর্ব অর্থাৎ Minor Phyla হিসেবে স্বীকৃত। উদাহরণ– Placozoa, Ctenophora ইত্যাদি পর্ব।

Hickman *et al.* (2014) রচিত Integrated Principles of Zoology পুস্তকের বর্ণনায় প্রাণিজগতের ৩৩টি পর্বের মধ্যে প্রধান বা মেজর পর্বের সংখ্যা হলো ৯টি, এর ৮টি ননকর্ডাটা ও ১টি কর্ডাটা পর্ব। বাকি পর্বগুলো গৌণ বা মাইনর পর্ব। নিচে ৯টি প্রধান পর্বের নাম উল্লেখ করা হলো -

Phylum-1 : **PORIFERA**, Phylum-2 : **CNIDARIA**, Phylum-3 : **PLATYHELMINTHES**, Phylym-4: **NEMATODA**, Phylum -5: **MOLLUSCA**, Phylum- 6 : **ANNELIDA**, Phylum -7 : **ARTHROPODA**, Phylum -8 : **ECHINODERMATA**, Phylum -9 : **CHORDATA**.

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Hickman *et al.* (2017) অনুসরণে প্রাণিজগতের শ্রেণিবিন্যাসের ছক

Kingdom-ANIMALIA

Branch A. MESOZOA
(স্বল্প সংখ্যক কোষবিশিষ্ট প্রাণী; টিস্যু বা অঙ্গ গঠিত হয় না)
- 1. Phylum Mesozoa

Branch B. PARAZOA
(অসংখ্য কোষবিশিষ্ট প্রাণী; টিস্যু বা অঙ্গতন্ত্র গঠিত হয় না)
- * 2. Phylum **Porifera**
- 3. Phylum Placozoa

Branch C. EUMETAZOA
(অগণিত কোষবিশিষ্ট প্রাণী; টিস্যু, অঙ্গ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অঙ্গতন্ত্র গঠন করে)

Grade I. Radiata
(দ্বিস্তরী প্রাণী, টিস্যু গঠিত হলেও অঙ্গতন্ত্র অনুপস্থিত; দেহ অরীয় প্রতিসম)
- * 4. Phylum **Cnidaria**
- 5. Phylum Ctenophora

Grade II. Bilateria
(ত্রিস্তরী প্রাণী; সুগঠিত অঙ্গতন্ত্র উপস্থিত; দেহ প্রধানত দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম)

Acoelomates
(সিলোমবিহীন প্রাণী)
- * 6. Phylum Platyhelminthes
- 7. Phylum Gnathostomulida
- 8. Phylum Nemertea

Pseudocoelomates
(অপ্রকৃত সিলোমধারী প্রাণী)
- 9. Phylum Rotifera
- 10. Phylum Gastrotricha
- 11. Phylum Kinorhyncha
- *12. Phylum **Nematoda**
- 13. Phylum Nematomorpha
- 14. Phylum Acanthocephala
- 15. Phylum Entoprocta
- 16. Phylum Priapulida
- 17. Phylum Loricifera

Eucoelomates
(প্রকৃত সিলোমধারী প্রাণী)
- * 18. Phylum **Mollusca**
- * 19. Phylum **Annelida**
- * 20. Phylum **Arthropoda**
- 21. Phylum Echiurida
- 22. Phylum Sipunculida
- 23. Phylum Tardigrada
- 24. Phylum Pentastomida
- 25. Phylum Onychophora
- 26. Phylum Pogonophora
- 27. Phylum Phoronida
- 28. Phylum Ectoprocta
- 29. Phylum Chaetognatha
- 30. Phylum Brachiopoda
- *31. Phylum **Echinodermata**
- 32. Phylum Hemichordata
- *33. Phylum **Chordata**

তারকা (*) চিহ্নিত পর্বগুলোকে (৯টি) প্রধান পর্ব (major phylum) হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রাণিজগতের প্রধান বা মেজর (major) পর্বগুলোর নাম এবং এদের প্রজাতি সংখ্যা (Zhang 2013 অনুসরণে)।

	ক্র :নং	প্রধান পর্বের নাম	আবিষ্কৃত প্রজাতির সংখ্যা Zhang (2013)	বাংলাদেশে বর্ণিত প্রজাতির সংখ্যা Ahmed (2008-2009)
NON-CHORDATA	1.	Phylum **Porifera**	8,659	29
	2.	Phylum **Cnidaria**	10,203	102
	3.	Phylum **Platyhelminthes**	29,487	125
	4.	Phylum **Nematoda**	25,033	178
	5.	Phylum **Mollusca**	84,977	477
	6.	Phylum **Annelida**	17,388	98
	7.	Phylum **Arthropoda**	1,257,040	2,483
	8.	Phylum **Echinodermata**	7,550	49
	9.	Phylum **Chordata**	68,626	1,611
		মোট	1,508,963	5,152

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

প্রাণিজগতের প্রধান পর্বসমূহ (Major Phyla of Animal Kingdom)

ভ্রূণাবস্থায় বা আজীবন দেহের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর দণ্ডাকার, স্থিতিস্থাপক ও নিরেট নটোকর্ড (notochord)-এর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রাণিজগতকে দুটি গ্রুপ (group)-এ ভাগ করা হয়েছে, যেমন-**ননকর্ডাটা** (nonchordata) এবং **কর্ডাটা** (chordata)। যেসব প্রাণীর জীবনে কখনও নটোকর্ড উপস্থিত থাকে না, তাদের **ননকর্ডাটা** বলে। এদের স্নায়ুরজ্জু (nerve cord) অঙ্কীয়, নিরেট ও গ্রন্থিযুক্ত; গলবিলীয় ফুলকারন্ধ্র ও পায়ুপশ্চাৎ লেজ অনুপস্থিত। অন্যদিকে যেসব প্রাণীর দেহে নটোকর্ড থাকে, স্নায়ুরজ্জু পৃষ্ঠীয় ও ফাঁপা, গলবিলীয় ফুলকারন্ধ্র ও পায়ুপশ্চাৎ লেজ উপস্থিত সেগুলোকে **কর্ডাটা** বলে।

ননকর্ডাটা প্রাণিদের শ্রেণিবিন্যাস (পর্ব পর্যন্ত)

ননকর্ডাটা প্রাণিদের নিচে বর্ণিত আটটি (১ থেকে ৮) প্রধান পর্বের (Phylum) অধীনে বর্ণনা করা হয়।

প্রত্যেক পর্বের গ্রিক ও ল্যাটিন নামের শব্দার্থ Hickman *et al.* 2017 অনুসরণে উদ্ধৃত।

Phylum–1 : Porifera (পরিফেরা) বা ছিদ্রাল প্রাণী

[ল্যাটিন, *porus* = pore, ছিদ্র + *fer* = to bear, বহনকারী। ১৮৩৬ সালে Robert Grant সর্বপ্রথম পর্বটির নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ৮,৬৫৯টি।]

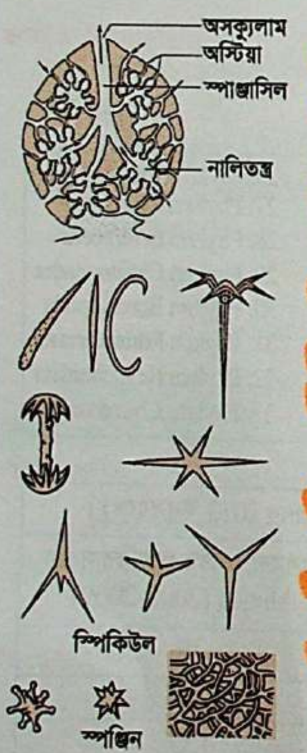

চিত্র ১.১১ : Porifera-র বৈশিষ্ট্য

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : প্রাণিদের মধ্যে Porifera পর্বের সদস্যরা প্রাচীনতম ও সরল প্রকৃতির। দেহে অসংখ্য ছিদ্র থাকায় এদের **ছিদ্রাল প্রাণী** বলে। সাধারণভাবে এরা **স্পঞ্জ** (sponge) নামে পরিচিত। এরা দেখতে ডাল-পালাযুক্ত গাছ, ফুলদানি, ঘণ্টা বা বাটির মতো এবং দৈহিক ব্যাস এক মিলিমিটার থেকে প্রায় দুই মিটার। কারও রং অনুজ্জ্বল ধূসর, আবার কোনটি লাল, কমলা, নীল, বেগুনি প্রভৃতি উজ্জ্বল বর্ণের। অধিকাংশ সামুদ্রিক। কেবলমাত্র Spongilidae গোত্রের প্রাণীরা মিঠাপানির বাসিন্দা।

পর্ব Porifera-র বৈশিষ্ট্য

১. দেহ অসংখ্য কোষে নির্মিত হলেও কোষগুলো সুবিন্যস্ত হয়ে টিস্যু (tissue) গঠন করে না অর্থাৎ এরা **কোষীয় মাত্রার গঠনবিশিষ্ট প্রাণী**।
২. দেহপ্রাচীর **অস্টিয়া** (ostia) নামক অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত।
৩. দেহে সংবহনতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে পানি প্রবাহের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ **নালিতন্ত্র** (canal system) দেখা যায়। অস্টিয়াপথে নালিকার মধ্য দিয়ে পানিস্রোতের মাধ্যমে খাদ্য, অক্সিজেন ও শুক্রাণু দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।
৪. **স্পিকিউল** (spicule) নামক অসংখ্য চুনময় ক্ষুদ্র কাঁটা অথবা **স্পঞ্জিন** (spongin) নামক এক ধরনের জৈবতন্তু দেহের কাঠামো গঠন করে।
৫. অন্তঃপ্রাচীরে **কোয়ানোসাইট** (choanocyte) নামে বিশেষ ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোষে পরিবেষ্টিত এক বা একাধিক প্রকোষ্ঠ রয়েছে। প্রকোষ্ঠগুলো নালিতন্ত্রে মুক্ত।
৬. নালিতন্ত্র দেহের ভিতরে অবস্থিত **স্পঞ্জোসিল** (spongocoel) নামে একটি প্রশস্ত গহ্বরে মিলিত হয়, এবং শীর্ষপ্রান্তে **অসক্যুলাম** (osculum) নামে একটি বড় প্রান্তিক ছিদ্রপথে দেহের বাইরে উন্মুক্ত হয়।
৭. পূর্ণাঙ্গ প্রাণীরা **নিশ্চল** (sessile); অর্থাৎ কোন বস্তুর সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত থাকে।
৮. জীবনচক্রে সঞ্চরণশীল Amphiblastula অথবা Parenchymula লার্ভা দশা বিদ্যমান।

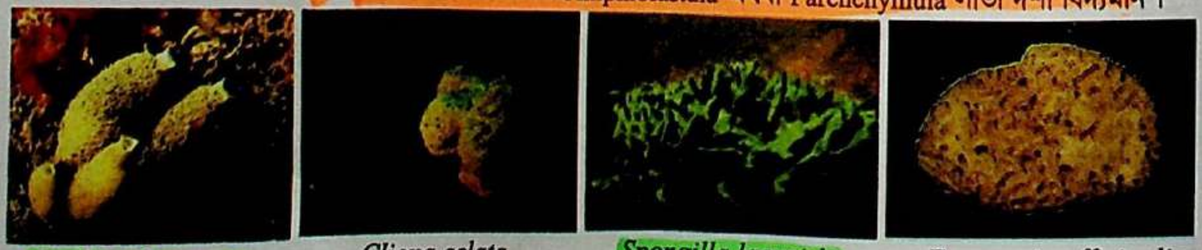

Scypha gelatinosum (মটকা স্পঞ্জ) *Cliona celata* (লাল স্পঞ্জ) *Spongilla lacustris* (মিঠাপানির স্পঞ্জ) *Euspongia officinalis* (গোসল স্পঞ্জ)

চিত্র ১.১২ : Porifera পর্বের কয়েকটি প্রাণী

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Phylum–2 : Cnidaria (নিডারিয়া)

[গ্রিক *knide* = nettle, রোম বা কাঁটা + ল্যাটিন *aria* = connected with, সংযুক্ত । ১৮৮৮ সালে Hatschek পর্বটির নামকরণ করেন । এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ১০,২০৩টি ।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : Cnidaria পর্বভুক্ত প্রাণীরা একদিকে অরীয় প্রতিসম, অন্যদিকে কোষ-টিস্যু মাত্রার (cell-tissue grade) গাঠনিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাণী । প্রাণিগুলোর অধিকাংশ নিশ্চল, কিছু প্রজাতি মুক্ত সাঁতারু । সমুদ্র উপকূলে পড়ে থাকা গোল থকথকে জেলির মতো প্রাণিগুলো জেলিফিশ, Cnidaria পর্বেরই মুক্ত সাঁতারু সদস্য । বিচিত্র বর্ণময়তার কারণে এ পর্বের সদস্যরা সমুদ্রকে বর্ণিল রূপদানে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে । প্রবাল ও প্রবাল প্রাচীর গঠনকারী প্রাণীরা এ পর্বেরই সদস্য । এজন্য নিডারিয়ান প্রাণিদের সমুদ্রের ফুল (flower of the sea) বলা হয় । পৃথিবীর প্রবাল প্রাচীরগুলোতে বাস করে সামুদ্রিক প্রজাতির ২৫% জীব । প্রবাল প্রাচীর তাই পৃথিবীর অন্যতম রত্নভান্ডার হিসেবে পরিচিত এবং সমুদ্রের Rain Forest নামে অভিহিত ।

পর্ব Cnidaria-র বৈশিষ্ট্য

১. প্রাণিগুলো সামান্য **টিস্যু মাত্রার** (tissue grade) বহুকোষী ও অরীয় প্রতিসম প্রাণী ।

২. দেহপ্রাচীর দ্বিস্তরী কোষযুক্ত বা **ডিপ্লোব্লাস্টিক** (diploblastic); বাইরের স্তরটি **এপিডার্মিস** এবং ভিতরের স্তর এন্ডোডার্মিস বা **গ্যাস্ট্রোডার্মিস** নামে পরিচিত । উভয় স্তরের মধ্যবর্তীস্থানে থাকে আঠালো জেলির মতো অকোষীয় **মেসোগ্লিয়া** (mesoglea) ।

৩. **নেমাটোসিস্ট** (nematocyst) ধারণকারী **নিডোসাইট** (cnidocyte) নামক বিশেষ ধরনের কোষ উপস্থিত । কর্ষিকায় এগুলো সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় । নিডারিয়ানদের দংশন অঙ্গাণু (stinging organelles) হচ্ছে নেমাটোসিস্ট । প্রাণী এর সাহায্যে আত্মরক্ষা, খাদ্য গ্রহণ ও দেহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজ করে ।

৪. দেহাভ্যন্তরে **সিলেন্টেরন** (coelenteron) নামে একমাত্র **পরিপাক সংবহন গহ্বর** (gastro-vuscular cavity) থাকে যা একটি ছিদ্রপথে বাইরে উন্মুক্ত । ছিদ্রটি মুখ ও পায়ুর কাজ করে ।

৫. খাদ্যবস্তু বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় উভয়ভাবেই পরিপাক হয় ।

৬. অনেক প্রজাতি বহুরূপিতা প্রদর্শন করে । বহুরূপী সদস্যদের মৌলিক একক **পলিপ** (polyp) ও **মেডুসা** (medusa) । পলিপ স্থবির ও অযৌন জননক্ষম এবং মেডুসা মুক্ত ও যৌন জননে সক্ষম ।

৭. জীবনচক্রে সিলিয়াযুক্ত Plannula লার্ভা দশা রয়েছে ।

৮. বিশ প্রজাতির নিডারিয়ান স্বাদু পানির, বাকী সবাই সামুদ্রিক ।

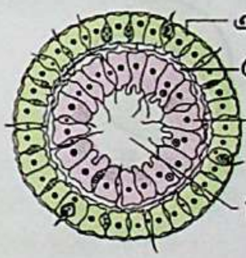

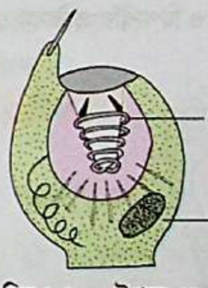

চিত্র ১.১৩ : উপরে-*Hydra*-র প্রস্থচ্ছেদ এবং নিচে-নিডোসাইট

Aurelia aurita (জেলি ফিশ)

Tubularia rosa

Porpita porpita (নীল বুতাম)

Gorgonia ventalina (সমুদ্রের পাখা)

Physalia physalis (ভাসমান সন্ত্রাস)

Cerianthus filiformis (টিউব অ্যানিমন)

Pennatula sulcata (সমুদ্রের কলম)

চিত্র ১.১৪ : Cnidaria পর্বের কয়েকটি প্রাণী

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Phylum – 3 : Platyhelminthes (প্লাটিহেলমিনথেস) বা চ্যাপ্টা কৃমি

[গ্রিক, *platys* = flat, চ্যাপ্টা + *helminth* = worm, কৃমি । ১৮৭৬ সালে Minot এ পর্বের নামকরণ করেন । এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ২৯,৪৮৭টি ।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : প্রাণিদের মধ্যে এ পর্বের প্রাণীরাই সরলতম প্রথম ত্রিস্তরী প্রাণী (triploblastic animal) । এদের দেহে সর্বপ্রথম টিস্যু-অঙ্গ মাত্রার (tissue-organ grade) গঠন দেখা যায় । এসব প্রাণী পাতার মতো উপর-নিচে চাপা বা ফিতার মতো লম্বা বলে চ্যাপ্টা কৃমি (flat worms) নামে পরিচিত । অধিকাংশ চ্যাপ্টা কৃমি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণিদেহে অন্তঃপরজীবী হিসেবে বাস করে । কিছু কৃমি পানিতে অথবা ভেজা মাটিতে স্বাধীনভাবে অবস্থান করে । অনেক চ্যাপ্টা কৃমি আণুবীক্ষণিক, তবে ৩০ মিটার পর্যন্ত লম্বা চ্যাপ্টা কৃমির কথাও জানা গেছে ।

চিত্র ১.১৫ : Platyhelminthes পর্বের বৈশিষ্ট্য

পর্ব Platyhelminthes-এর বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নরম, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম ও পাতা বা ফিতার মতো পৃষ্ঠ-অঙ্কীয়ভাবে চাপা ।

২. দেহত্বক সিলিয়াযুক্ত **এপিডার্মিস** (ciliated epidermis) অথবা **কিউটিকল** (cuticle)-এ আবৃত ।

৩. ত্রিস্তরী প্রাণী হলেও এরা অ্যাসিলোমেট (সিলোমবিহীন) ।

৪. একমাত্র পরিপাকনালি ছাড়া অন্তঃস্থ আর কোন গহ্বর নেই ।

৫. বিভিন্ন অঙ্গের মাঝে ফাঁকা স্থানগুলো **প্যারেনকাইমা** (parenchyma) নামক যোজক টিস্যু বা **মেসেনকাইম** (mesenchyme)-এ পূর্ণ থাকে ।

৬. অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিক **চোষক** (sucker) বা **হুক** (hook) অথবা উভয়ই উপস্থিত ।

৭. রক্ত সংবহন ও শ্বসনতন্ত্র অনুপস্থিত; রেচনতন্ত্র শাখা-প্রশাখাযুক্ত **রেচননালি** ও **শিখা কোষ** (flame cell) নিয়ে গঠিত ।

৮. অধিকাংশ পরজীবী । অনেক সদস্য সরাসরি দেহতলের সাহায্যে পুষ্টি গ্রহণ করে । কিছুসংখ্যক মুক্তজীবী ।

৯. এ পর্বের প্রাণীরা উভলিঙ্গ; নিষেক অভ্যন্তরীণ এবং পরিস্ফুটন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ধরনের ।

১০. চ্যাপ্টা কৃমির জীবনচক্রে অনেক ধরনের লার্ভা (larva) দশা থাকে ।

Schistosoma mansoni (রক্ত কৃমি) — *Bipalium kewense* (হাতুরীমস্তক চ্যাপ্টা কৃমি) — *Fasciola hepatica* (ভেড়ার যকৃত কৃমি) — *Gyrodactylus corti* (স্যালমন কৃমি) — *Taenia solium* (শূকরের ফিতা কৃমি)

চিত্র ১.১৬ : Platyhelminthes পর্বের কয়েকটি প্রাণী

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Phylum – 4 : Nematoda/Nemathelminthes (নেমাটোডা/নেমাথেলমিনথেস) বা গোল কৃমি

[গ্রিক, *nematos* = thread, সুতা + *eidos* = form, আকৃতি + *helminth* = worm, কৃমি। ১৮৫৯ সালে Gogenbaur পর্বটির নামকরণ করেন। Nematoda পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ২৫,০৩৩টি।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : Nematoda পর্বের প্রাণিগুলো **সুতা কৃমি** (thread worm) **বা গোল কৃমি** (round worm) নামে পরিচিত। এরা অঙ্গ-তন্ত্র গঠন মাত্রার (organ-system grade) প্রাণী। এ পর্বের শনাক্তকৃত প্রায় ২৫,০০০ প্রজাতির কৃমি আছে যার অধিকাংশই বিভিন্ন জীবদেহে পরজীবী। অপ্রকৃত সিলোমেট প্রাণীর মধ্যে নেমাটোডের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। বাস্তুতান্ত্রিক সকল পরিবেশে গোল কৃমি বিস্তৃত। এ পর্বের পরজীবী সদস্যরা মানুষ, গবাদি পশু ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। মুক্তজীবী প্রাণীরা ব্যাকটেরিয়া, ঈস্ট, ছত্রাক ও শৈবাল খেয়ে জীবনধারণ করে।

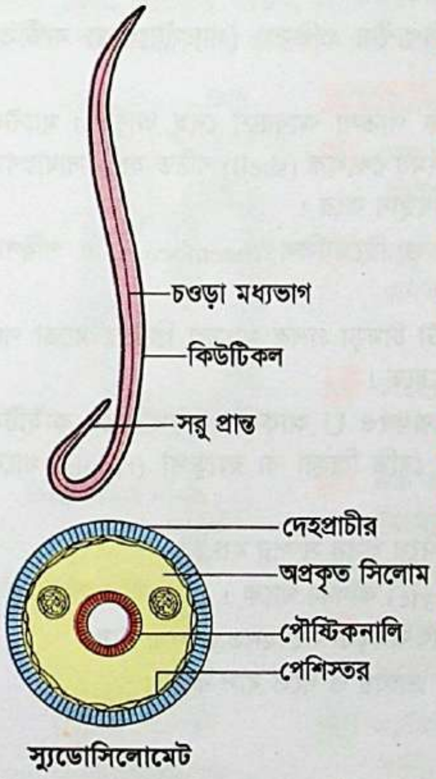

চিত্র ১.১৭ : Nematoda পর্বের বৈশিষ্ট্য

পর্ব Nematoda-র বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নলাকার, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, উভয় প্রান্তই ক্রমশ সরু ও মধ্যভাগ চওড়া; আণুবীক্ষণিক থেকে এক মিটার পর্যন্ত লম্বা।

২. প্রাণীরা স্যুডোসিলোমেট (অপ্রকৃত সিলোমযুক্ত) ও **অখণ্ডকায়িত** (unsegmented)।

৩. দেহ নমনীয়; **ইলাস্টিন** (elastin) নির্মিত অকোষীয়, পুরু প্রতিরোধক্ষম **কিউটিকল** (cuticle)-দিয়ে আবৃত।

৪. পৌষ্টিকনালি সোজা ও শাখাহীন এবং মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত প্রসারিত। এ কারণে এসব প্রাণীর দেহকে 'নলের ভিতর নল' ('tube within a tube') ধরনের গঠনের মতো দেখায়।

৫. মুখছিদ্র সাধারণত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ওষ্ঠে পরিবৃত।

৬. শ্বসনতন্ত্র ও সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত।

৭. অধিকাংশ প্রাণী একলিঙ্গ, যৌন দ্বিরূপতা (sexual dimorphism) দেখা যায়।

৮. স্থলচর বা জলচর, মুক্তজীবী বা পরজীবী প্রাণী।

[যৌন দ্বিরূপতা : একই প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ সদস্য বর্ণ, আকার, আকৃতি বা গাঠনিকভাবে পৃথক হলে তাকে যৌন দ্বিরূপতা বলে।]

Loa loa (চোখ কৃমি) | *Ascaris lumbricoides* (গোল কৃমি) | *Trichinella spiralis* (ট্রাইকিনেলা কৃমি) | *Wuchereria bancrofti* (ফাইলেরিয়া কৃমি)

চিত্র ১.১৮ : Nematoda পর্বের কয়েকটি প্রাণী

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Phylum – 5 : Mollusca (মলাস্কা) বা কম্বোজ প্রাণী

[ল্যাটিন, *molluscus* = soft, নরম। ১৭৫৮ সালে Linnaeus এ পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ৮৪,৯৭৭টি।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : Mollusca প্রাণিজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্ব। প্রাণীর বর্তমান সংখ্যাগত দিক থেকে Arthropoda পর্বের পরেই এদের অবস্থান। এ পর্বের সদস্যরা অনন্য ধরনের খোলকবাহী ননকর্ডেট প্রাণী। ঝিনুক, শামুক, অক্টোপাস, সেপিয়া, ললিগো এ পর্বের পরিচিত সদস্য। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে স্বচ্ছল ব্যক্তিরা খোলক সংগ্রহ করতেন। এক সময় বাংলাদেশের স্বনামধন্য স্কুলের পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীদের জন্য খোলক সংগ্রহের প্রচলন ছিল।

পর্ব Mollusca-র বৈশিষ্ট্য

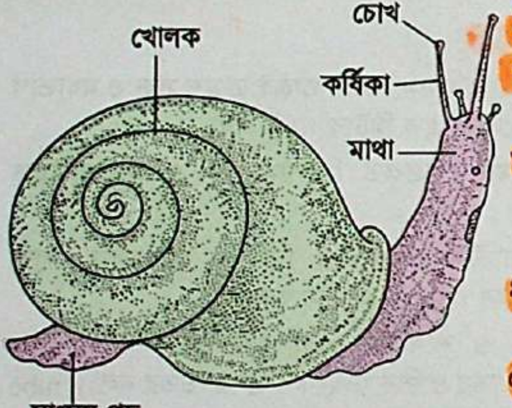

চিত্র ১.১৯ : Mollusca-র বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নরম, মাংসল ও অখণ্ডকায়িত।
২. সিলোমেট, অধিকাংশ দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম (গ্যাস্ট্রোপোডা ব্যতীত) এবং সুস্পষ্ট মাথাবিশিষ্ট।
৩. **ম্যান্টল** (mantle) নামক পাতলা আবরণে দেহ আবৃত। ম্যান্টল থেকে ক্ষরিত পদার্থে চুনময় **খোলক** (shell) গঠিত হয়। সাধারণত খোলকের মধ্যে প্রাণী অবস্থান করে।
৪. দেহগহ্বর খুব সংক্ষিপ্ত ও **হিমোসিল** (haemocoel)-এ পরিণত হয়েছে।
৫. দেহের অঙ্কীয়দেশে মোটা চামড়া প্রশস্ত মাংসল পিন্ডের মতো **পদ** (foot)-এ রূপান্তরিত হয়েছে।
৬. পৌষ্টিকনালি প্যাঁচানো; কখনও U আকৃতির। মুখবিবরে **কাইটিন** (chitin) নির্মিত একটি রেতি-জিহ্বা বা **র‍্যাডুলা** (radula) থাকে (Bivalvia ব্যতীত)।
৭. ফুলকা (টেনিডিয়া) অথবা ফুসফুস অথবা উভয় অংশ, অথবা ম্যান্টল দিয়ে শ্বসন সম্পন্ন হয়।
৮. রক্তে **হিমোসায়ানিন** (haemocyanin) ও **অ্যামিবোসাইট** (amoebocyte) কণিকা থাকে।
৯. পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত হৃৎযন্ত্র, রক্তনালি ও হিমোসিল উভয়ই উপস্থিত অর্থাৎ অর্ধমুক্ত সংবহনতন্ত্র দেখা যায়।
১০. অধিকাংশ প্রাণী সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে ও কিছু সদস্য স্বাদু পানিতে, ডাঙ্গায় ও গর্তে বাস করে।

Uroteuthis duvaucelli (সমুদ্রের তীর)

Lamellidens marginalis (স্বাদু পানির ঝিনুক)

Pinctada vulgaris (মুক্তা ঝিনুক)

Pila globosa (আপেল শামুক)

Octopus vulgaris (অক্টোপাস)

চিত্র ১.২০ : Mollusca পর্বের কয়েকটি প্রাণী

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL BDNIYOG.COM COPYRIGHT

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Phylum – 6 : Annelida (অ্যানিলিডা) বা অঙ্গুরীমাল

[ল্যাটিন, *annelus* = little ring, ছোট আংটি + *ida* = form, আকৃতি। ১৮০৯ সালে Lamarck এ পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ১৭,৩৮৮টি।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : অ্যানিলিড প্রাণী দৈহিক গড়নের দিক থেকে অনন্য। অঙ্গ-তন্ত্র মাত্রার গঠন ছাড়াও প্রাণিগুলো দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম ও ত্রিস্তরবিশিষ্ট। অ্যানিলিডে আগের পর্বগুলোর চেয়ে অধিকতর কেন্দ্রীভূত স্নায়ুতন্ত্র এবং জটিলতর সংবহনতন্ত্র বিবর্তনের গতিপথে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। পৃথিবীতে অ্যানিলিড সদস্যরা ব্যাপক বিস্তৃত, কিছু প্রজাতি পৃথিবীর সব দেশেই পাওয়া যায়। পলিকিটজাতীয় অ্যানিলিডগুলো অধিকাংশই সামুদ্রিক, সমুদ্রের তলদেশে বা পৃষ্ঠতলে বিচরণ করে। কেঁচো ও জোঁক জাতীয় সদস্যরা স্বাদুপানিবাসী বা স্থলচর। স্থলচর সদস্যগুলো কাদা বা বালিতে গর্তবাসী, কিংবা ভেজা জায়গায় পাতার নিচে বাস করে। অনেক জোঁক প্রজাতি রক্তপায়ী। বিভিন্ন প্রজাতির অ্যানিলিড গোষ্ঠী পৃথিবীর বাস্তুতন্ত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে চলেছে।

পর্ব Annelida-র বৈশিষ্ট্য

১. দেহ লম্বা, নলাকার, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, এপিথেলিয়াম নিঃসৃত পাতলা **কিউটিকল**-এ আবৃত এবং প্রকৃত সিলোমযুক্ত।

২. **প্রকৃত খন্ডকায়ন** (true segmentation) উপস্থিত, আংটির মতো অনেকগুলো একই রকম খণ্ডক নিয়ে দেহ গঠিত। এদের চলন অঙ্গ কাইটিনময় **সিটি** (setae) বা পেশল **প্যারাপোডিয়া** (parapodia)।

৩. দেহের প্রায় প্রতিটি খণ্ডকে অবস্থিত **নেফ্রিডিয়া** (nephridia) নামক প্যাঁচানো নালিকা প্রধান রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

৪. রক্ত সংবহনতন্ত্র **বদ্ধ** (closed) প্রকৃতির, রক্তের বর্ণ লাল। রক্তরসে হিমোগ্লোবিন, হিমোএরিথ্রিন অথবা ক্লোরোক্রুয়োরিন দ্রবীভুত অবস্থায় থাকে।

৫. পৌষ্টিকনালি নলাকার ও সম্পূর্ণ; মুখ ও পায়ুছিদ্র সমন্বিত।

৬. পরোক্ষ পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে মুক্ত সাঁতারু **ট্রোকোফোর** (trochophore) নামক লার্ভার বিকাশ ঘটে।

৭. অ্যানিলিড সদস্যরা মিঠা পানি, নোনা পানি বা স্থলে বাস করে। অনেকে স্বাধীনজীবী, কিছু সংখ্যক পরজীবীও বটে।

চিত্র ১.২১ : Annelida পর্বের বৈশিষ্ট্য

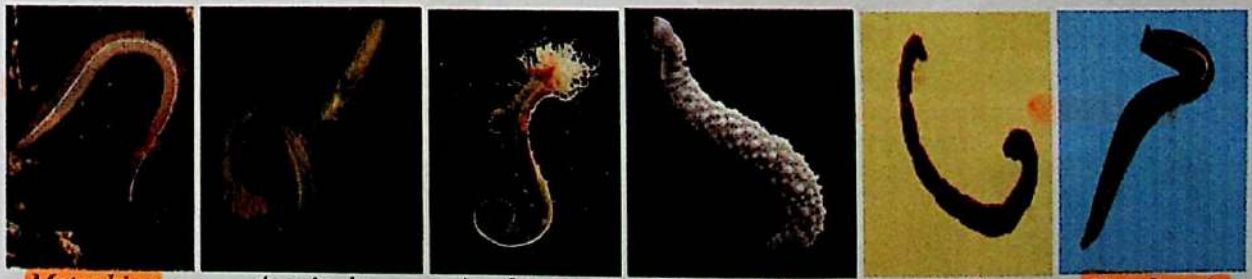

Metaphire posthuma (কেঁচো) | *Arenicola marina* (স্যান্ড ওয়ার্ম) | *Amphitrite ornata* (অরনেট ওয়ার্ম) | *Pontopdella muricata* (সামুদ্রিক চোষক) | *Tubifex tubifex* (রক্তকীট) | *Hirudinaria medicinalis* (জোঁক)

চিত্র ১.২২ : Annelida পর্বের কয়েকটি প্রাণী

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Phylum – 7 : Arthropoda (আর্থ্রোপোডা) বা সন্ধিপদী প্রাণী

[গ্রিক, *arthron* = joint, সন্ধি + *podos* = foot, পা। ১৮৪৮ সালে von Siebold এ পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ১,২৫৭,০৪০টি।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : Arthropoda হচ্ছে প্রাণিজগতের **বৃহত্তম পর্ব**। এপর্যন্ত নথিভুক্ত পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ প্রাণী এ পর্বের অন্তর্গত। শুধু সংখ্যাগত দিক থেকে নয়, দেহগঠন, বর্ণময়তা, বসতি, স্বভাব প্রভৃতি বৈচিত্র্যেও এসব প্রজাতি অনন্য অবস্থান দখল করে আছে। পৃথিবীর নদী-নালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র-মোহনা, বরফ-মরুজ এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আর্থ্রোপোড সদস্য পাওয়া যাবে না। এরা সর্বভূক, মুক্তজীবী বা পরজীবী। এদের চলন, শ্বসন, রক্ত-সংবহন প্রভৃতি তন্ত্রও বৈচিত্র্যময়। আর্থ্রোপোডের সামাজিক জীবন প্রাণিজগতে অনন্য ও বিস্ময়কর নজির স্থাপন করেছে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত কার্যক্ষম বলে আর্থ্রোপোড সদস্যরা পরিবেশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে পেরেছে।

পর্ব Arthropoda-র বৈশিষ্ট্য

১. দেহ সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গবিশিষ্ট, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, খণ্ডকায়িত এবং **ট্যাগমাটা** (tagmata)-য় (বিভিন্ন অংশ যেমন-মস্তক, বক্ষ ও উদর) বিভক্ত।

২. মস্তকে একজোড়া বা দুজোড়া **অ্যান্টেনা** (antenna) ও সাধারণত একজোড়া **পুঞ্জাক্ষি** (compound eyes) থাকে।

৩. বহিঃকঙ্কাল **কাইটিন** (chitin) নির্মিত এবং নিয়মিত মোচিত হয়।

৪. সিলোম সংক্ষিপ্ত ও অধিকাংশ দেহগহ্বর রক্তে পূর্ণ **হিমোসিল** (haemocoel)।

৫. পৌষ্টিকতন্ত্র সম্পূর্ণ। উপাঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে **মুখোপাঙ্গ** (mouth parts) গঠিত হয় যা বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণে অভিযোজিত।

৬. রক্ত সংবহনতন্ত্র **উন্মুক্ত** (open); এটি পৃষ্ঠীয় সংকোচনশীল হৃৎযন্ত্র, ধমনি এবং হিমোসিল নিয়ে গঠিত।

চিত্র ১.২৩ : Arthropoda -র বৈশিষ্ট্য

৭. রেচন অঙ্গ **ম্যালপিজিয়ান নালিকা** (malpighian tubule)। এছাড়াও রয়েছে **কক্সাল** (coxal), **অ্যান্টেনাল** (antennal) বা **ম্যাক্সিলারি** (maxillary) গ্রন্থি।

৮. স্ত্রী-পুরুষ পৃথক, সাধারণত অন্তঃনিষেক সম্পন্ন হয় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই **রূপান্তর** (metamorphosis) ঘটে।

৯. এরা স্থলচর, পানিচর, মুক্তজীবী, নিশ্চল, সহবাসী বা পরজীবী হিসেবে বাস করে।

Limulus polyphemus (রাজ কাঁকড়া)

Carcinus manius (কাঁকড়া)

Musca domestica (গৃহ মাছি)

Culex pipiens (কিউলেক্স মশা)

Pieris brassicae (প্রজাপতি)

Periplaneta americana (তেলাপোকা)

Scolopendra gigantea (শতপদী)

Lycosa lenta (মাকড়সা)

চিত্র ১.২৪ : Arthropoda পর্বের কয়েকটি প্রাণী

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Phylum-8 : Echinodermata (একাইনোডার্মাটা) বা কন্টকত্বক প্রাণী

[ল্যাটিন, *echinatus* = spinous, কাঁটাময় + গ্রিক, *derma* = skin, ত্বক + *ata* = to bear, বহন করা। ১৭৩৪ সালে Jacob Klein এর নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ৭,৫৫০টি।]

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : সমুদ্র তারার (sea star) ছবির মধ্য দিয়েই Echinodermata পর্ব সবচেয়ে বেশি পরিচিতি পেয়েছে। সমুদ্র তারা ছাড়াও এ পর্বে রয়েছে ব্রিটল তারা, সাগর আর্চিন, সমুদ্র শসা, সমুদ্র পদ্ম প্রভৃতি প্রাণী। কোনোটি গোল, অন্যগুলো শসা বা তারার মতো দেখতে। এসব প্রাণী ত্রিস্তরী, প্রকৃত-সিলোমেট ও অঙ্গ-তন্ত্র মাত্রার গঠন সম্বলিত প্রজাতি। সকল একাইনোডার্ম সদস্য কাঁটাময় ত্বকবিশিষ্ট। ত্বকের নিচে শায়িত চুনময় অন্তঃকঙ্কালিক প্লেট (calcareous endoskeletal plates) থেকে এসব কাঁটা উদগত হয়। কাঁটাগুলো বহিঃকঙ্কাল, আর প্লেটগুলো হচ্ছে অন্তঃকঙ্কাল। এ পর্বের প্রজাতিগুলো অসমোরেগুলেশনে অক্ষম বলে মোহনায় খুব কম পাওয়া যায়, বরং সব সমুদ্রের পৃষ্ঠতল থেকে শুরু করে অতল পর্যন্ত সবখানে বিস্তৃত। গভীর সমুদ্রে একাইনোডার্ম ধরনের প্রাণী বেশি দেখা যায়। মুক্তজীবী ও সহজীবী প্রজাতি থাকলেও পরজীবী একাইনোডার্ম নেই।

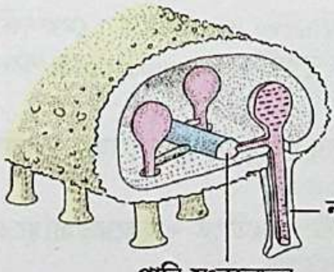

চিত্র ১.২৫ : Echinodermata পর্বের বৈশিষ্ট্য

পর্ব Echinodermata-র বৈশিষ্ট্য

১. পূর্ণাঙ্গ প্রাণী **পঞ্চঅরীয় প্রতিসম** (pentaradial symmetry), অখণ্ডকায়িত, তারকাকার, গোলাকার, চাকতির মতো অথবা লম্বাকৃতির, কিন্তু লার্ভা দশায় দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম।
২. দেহ **কন্টকময়**, স্পাইন (spine) ও পেডিসিলারি (pedicellariae) নামক বহিঃকঙ্কালযুক্ত।
৩. দেহ **মৌখিক** (oral) ও **বিমৌখিক** (aboral) তলে বিন্যস্ত; মৌখিক তলে পাঁচটি **অ্যাম্বুল্যাক্রাল খাদ** (ambulacral grooves) উপস্থিত।
৪. দেহের ভিতরে সিলোম থেকে সৃষ্ট অনন্য গড়নের **পানি সংবহনতন্ত্র** (water vuscular system) রয়েছে। এর সংশ্লিষ্ট নালিকা পদ বা **টিউব ফিট** (tube feet) এদের চলন অঙ্গ। এ তন্ত্রটি চলন ছাড়াও শ্বসন, খাদ্য আহরণেও সাহায্য করে।
৫. রক্ত সংবহনতন্ত্র অনুপস্থিত তবে **হিমাল** (haemal) ও **পেরিহিমালতন্ত্র** সংবহনতন্ত্রের কাজ করে।
৬. রেচনতন্ত্র নেই।
৭. ত্বকীয় ফুলকা, নালিকা পা বা শ্বসনবৃক্ষ ইত্যাদি দিয়ে শ্বসন সম্পন্ন হয়।
৮. একলিঙ্গ প্রাণী, নিষেক বাহ্যিক, জীবনচক্রে মুক্ত সাঁতারু লার্ভা আছে।
৯. **সকল সদস্যই সামুদ্রিক।**

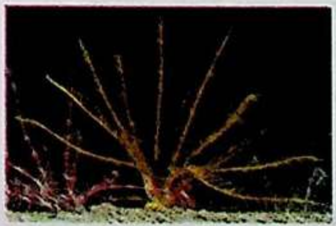
Antedon bifida (পালক স্টার)

Ophiothrix fragilis (কাঁটাযুক্ত ব্রিটল স্টার)

Astropecten euryacanthus (সাধারণ স্টার ফিশ)

Crossaster papposus (সূর্য তারা)

Cucumaria planci (সমুদ্র শশা)

Echinus esculentus (সাগর আর্চিন)

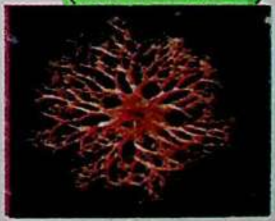
Gorgonocephalus arcticus (বাস্কেট স্টার)

Clypeaster rosaceus (সমুদ্রের বিস্কুট)

চিত্র ১.২৬ : Echinodermata পর্বের কয়েকটি প্রাণী

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Phylum – 9 : Chordata (কর্ডাটা)

[ল্যাটিন, *chorda* = cord, রজ্জু + গ্রিক *ata* = to bear, বহন করা। ১৮৮৫ সালে Bateson সর্বপ্রথম এ পর্বের নামকরণ করেন। এ পর্বের শনাক্তকৃত জীবন্ত প্রজাতির সংখ্যা ৬৮,৬২৬টি।]

যেসব প্রাণীর জীবনে কোন না কোন পর্যায়ে পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর দণ্ডাকার ও স্থিতিস্থাপক 'নটোকর্ড' থাকে তাদের কর্ডাটা বলে। এদের স্নায়ুরজ্জু পৃষ্ঠীয় ও ফাঁপা। জীবনের যেকোন পর্যায়ে গলবিলের দুপাশে কয়েকজোড়া **ফুলকা রন্ধ্র** (gill slits) থাকে। এদের হৃৎপিণ্ড অঙ্কীয়দেশে অবস্থান করে। একটি মাত্র ও সর্বশেষ পর্বের অধীনে কর্ডাটা প্রাণিদের বর্ণনা করা হয়।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি : মানুষের কাছে Chordata পর্বের প্রাণীই সবচেয়ে বেশি পরিচিত। ক্ষুদ্রাকায় **কাচকি মাছ** থেকে **মানুষ** পর্যন্ত সব প্রাণী এ পর্বের অন্তর্ভুক্ত। বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় আপাতত শেষ প্রান্তে রয়েছে এ পর্ব। তবে উৎপত্তির সময়কার প্রাণিদের দেহগড়ন বর্তমান পর্যায়ের স্তন্যপায়ীতে এসে যে জটিল রূপ ধারণ করেছে তা সুস্পষ্ট। এ পর্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত পর্ব হচ্ছে Echinodermata এবং Hemichordata। অন্তঃকঙ্কাল, ছিদ্রাল গলবিল, উন্নত **মস্তিষ্ক**, জোড় বিশেষ সংবেদ অঙ্গ ও জোড় উপাঙ্গসমৃদ্ধ এ প্রাণিকূল উৎপত্তির পর দ্রুত পৃথিবীর সমস্ত বাস্তুতন্ত্রে ছড়িয়ে এক শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে। তার ফলশ্রুতিতে সবশেষে মানুষের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে পৃথিবী জয় সমাপ্ত হয়েছে।

পর্ব Chordata-র বৈশিষ্ট্য

১. **নটোকর্ড :** ভ্রূণাবস্থায় অথবা আজীবন কর্ডেটের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর দণ্ডাকার ও স্থিতিস্থাপক নিরেট নটোকর্ড (notochord; গ্রিক, *noton* = back, পিঠ + ল্যাটিন, *chorda* = cord, রজ্জু) থাকে। উন্নত প্রাণিদের পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এটি **মেরুদণ্ড** (vertebral column) দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। এসব প্রাণিকে তখন **মেরুদণ্ডী প্রাণী** (vertebrates) নামে অভিহিত করা হয়।

২. **স্নায়ুরজ্জু :** নটোকর্ডের ঠিক উপরে লম্ব অক্ষ বরাবর ফাঁপা, নলাকার, **স্নায়ুরজ্জু** (nerve cord) থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণিদের ক্ষেত্রে স্নায়ুরজ্জুটি পরিবর্তিত হয়ে সম্মুখপ্রান্তে **মস্তিষ্ক** (brain) ও পশ্চাতে **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord) গঠন করে।

৩. **গলবিলীয় ফুলকা রন্ধ্র :** জীবনের যে কোনো দশায় বা আজীবন কর্ডেটে গলবিলের দুপাশে কয়েক জোড়া **ফুলকা রন্ধ্র** (gill slits) থাকে (উন্নত কর্ডেটে ফুলকা রন্ধ্রের বিলোপ ঘটে)।

৪. **এন্ডোস্টাইল :** গলবিলের নিচে **এন্ডোস্টাইল** (endostyle) নামক অঙ্গ থাকে, এটি পরবর্তীতে থাইরয়েড গ্রন্থিতে রূপান্তরিত হয়।

৫. **রক্ত সংবহন তন্ত্র :** কর্ডেটদের রক্ত সংবহনতন্ত্র বদ্ধ ধরনের; অর্থাৎ রক্ত সর্বদাই রক্ত বাহিকা ও হৃৎযন্ত্রের ভিতর আবদ্ধ থেকেই প্রবাহিত হয়, কখনোই দেহগহ্বরে মুক্ত হয় না। রক্তের লোহিত কণিকায় **হিমোগ্লোবিন** থাকে। এদের সংবহনতন্ত্রে **পোর্টালতন্ত্র** বিদ্যমান।

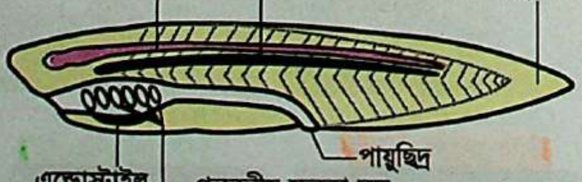

চিত্র ১.২৭ : কর্ডেটদের মৌলিক দেহগঠন

৬. **হৃৎপিণ্ডের অবস্থান :** কর্ডেটে হৃৎপিণ্ড অঙ্কীয়দেশে অবস্থান করে।

৭. **পার্শ্বপদ :** মেরুদণ্ডীদের দুজোড়া পার্শ্বপদ থাকে যা অন্তঃকঙ্কালে অবলম্বিত।

৮. **লেজ :** ভ্রূণ দশায় পায়ুর পশ্চাতে পেশল স্থিতিস্থাপক লেজ (post-anal tail) থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এটিও পরবর্তীতে বিলীন হয়ে যায়।

৯. **খণ্ডকায়ন :** কর্ডেটের খণ্ডকায়ন দেহপ্রাচীর, মস্তিষ্ক ও লেজে সীমাবদ্ধ থাকে, সিলোম পর্যন্ত পৌঁছায় না।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

প্রাণিজগতের প্রধান পর্বসমূহের অনন্য বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ

পর্বের নাম	অনন্য বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
Porifera	১. দেহ প্রাচীর **অস্টিয়া** নামক অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত; অন্তঃপ্রাচীরে কোয়ানোসাইট নামক কোষ থাকে। ২. দেহাভ্যন্তরে বিশেষ ধরনের **নালিতন্ত্র** দেখা যায়। ৩. দেহে চুনময় **স্পিকিউল** ও **স্পঞ্জিন** নামক জৈবতন্তু বিদ্যমান।	*Spongilla locustris* (মিঠা পানির স্পঞ্জ) *Euspongia officinalis* (গোসল স্পঞ্জ)
Cnidaria	১. দ্বিস্তরী প্রাণী; বাইরের এপিডার্মিস ও ভিতরের এন্ডোডার্মিস নিয়ে দেহ প্রাচীর গঠিত। ২. নেমাটোসিস্ট ধারণকারী **নিডোসাইট** কোষ পাওয়া যায়। ৩. দেহাভ্যন্তরে **সিলেন্টেরন** নামের একটি কেন্দ্রীয় গহ্বর থাকে।	*Aurelia aurita* (জেলি ফিশ) *Pennatula sulcata* (সমুদ্রের কলম)
Platyhelminthes	১. দেহ পৃষ্ঠ-অঙ্কীয়ভাবে চাপা, **চোষক** বা **হুক** যুক্ত। ২. নরম **কিউটিকুলার এপিডার্মিস** দিয়ে দেহ আবৃত। ৩. সিলোমবিহীন প্রাণী; রেচন অঙ্গে **শিখাকোষ** থাকে।	*Fasciola hepatica* (যকৃত কৃমি) *Taenia solium* (ফিতা কৃমি)
Nematoda	১. দেহ কীট আকৃতির, নলাকার এবং উভয় প্রান্ত ক্রমশ সরু। ২. দেহ নমনীয় ইলাস্টিন নির্মিত **কিউটিকল** দিয়ে আবৃত। ৩. প্রাণীরা **অপ্রকৃত সিলোমযুক্ত** ও অখন্ডকায়িত।	*Ascaris lumbricoides* (গোল কৃমি) *Loa loa* (চোখ কৃমি)
Mollusca	১. দেহ নরম, অখন্ডকায়িত এবং **ম্যান্টল** নামক পর্দা দিয়ে আবৃত। ২. দেহের অঙ্কীয় দিকে পেশিবহুল পদ বিদ্যমান। ৩. পৌষ্টিকনালি প্যাঁচানো; কখনও "U" আকৃতির।	*Pila globosa* (আপেল শামুক) *Octopus vulgaris* (অক্টোপাস)
Annelida	১. প্রকৃত সিলোমযুক্ত প্রাণী; দেহ আংটির মতো একাধিক সদৃশ **খন্ডক** নিয়ে গঠিত। ২. চলনাঙ্গ **সিটি** বা **প্যারাপোডিয়া** অথবা অনুপস্থিত। ৩. দেহের প্রায় প্রত্যেক খন্ডকে **নেফ্রিডিয়া** নামক রেচন অঙ্গ রয়েছে।	*Metaphire posthuma* (কেঁচো) *Hirudinaria medicinalis* (জোঁক)
Arthropoda	১. দেহ **কাইটিন** নির্মিত শক্ত বহিঃকঙ্কাল দিয়ে আবৃত এবং সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গবিশিষ্ট। ২. দেহ গহ্বর রক্ত দিয়ে পূর্ণ থেকে **হিমোসিল** গঠন করে। ৩. মস্তকে সাধারণত একজোড়া অ্যান্টিনি ও একজোড়া **পুঞ্জাক্ষি** থাকে।	*Periplaneta americana* (তেলাপোকা) *Musca domestica* (গৃহ মাছি)
Echinodermata	১. দেহ **কন্টকময়** ও পেডিসিলারিযুক্ত অমসৃণ বহিঃকঙ্কাল দিয়ে আবৃত। ২. পূর্ণাঙ্গ প্রাণী অরীয় বা পঞ্চঅরীয় প্রতিসম, লার্ভা দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম। ৩. অনন্য গড়নের পানি সংবহনতন্ত্র রয়েছে এবং এর সংশ্লিষ্ট **নালিকা পদ** এদের চলন অঙ্গ।	*Astropecten euryacanthus* (স্টার ফিশ) *Antedon bifida* (পালক স্টার)
Chordata	১. জীবনের যেকোন দশায় একটি স্থিতিস্থাপক **নটোকর্ড** থাকে। ২. একটি পৃষ্ঠীয় ফাঁপা ও নলাকার **স্নায়ুরজ্জু** পৌষ্টিকনালির পৃষ্ঠদেশে প্রসারিত থাকে। ৩. জীবনের কোন দশায় গলবিলীয় **ফুলকা রন্ধ্র** উপস্থিত।	*Tenualosa ilisha* (ইলিশ মাছ) *Homo sapiens* (মানুষ)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Chordata পর্বের শ্রেণিবিন্যাস (শ্রেণি পর্যন্ত)

Hickman *et al.* (2017) অনুসৃত প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী Chordata পর্বের শ্রেণিবিন্যাসটি ছক আকারে দেখানো হলো। প্রাণিগোষ্ঠীগুলোর প্রজাতি সংখ্যাও Hickman *et al.* (2017) অনুসৃত। Amphibia থেকে Mammalia-র প্রজাতি-সংখ্যা মূল উৎস সংখ্যা থেকে নেয়া হয়েছে।

Phylum : Chordata

- **Subphylum-1 : Urochordata**
  - Class-1 : Ascidiacea
  - Class-2 : Thaliacea
  - Class-3 : Larvacea
- **Subphylum-2 : Cephalochordata**
- **Subphylum-3 : Vertebrata**
  - **Superclass : Cyclostomata**
    - Class-1 : Myxini
    - Class-2 : Petromyzontida
  - **Superclass : Gnathostomata**
    - Class-1 : Chondrichthyes
    - Class-2 : Actinopterygii
    - Class-3 : Sarcopterygii
    - Class-4 : Amphibia
    - Class-5 : Reptilia
    - Class-6 : Aves
    - Class-7 : Mammalia

> Urochordata ও Cephalochordata-র অন্তর্গত প্রাণিদের দেহ সরল প্রকৃতির এবং এদের মেরুদণ্ড গঠিত হয় না বলে এদেরকে প্রোটোকর্ডাটা (Protochordata) বা আদি কর্ডাটা বলা হয়।

উপপর্ব বা Subphylum –1 : Urochordata (ইউরোকর্ডাটা ; গ্রিক, *oura* = লেজ + *chorda* = রজ্জু)

প্রায় ৩,০০০ টি প্রজাতি নিয়ে এ উপপর্ব গঠিত। পৃথিবীর সব সমুদ্র উপকূলে অগভীর পানিতে এদের পাওয়া যায়। কিছু প্রজাতি সাইফন (siphon) দিয়ে সজোরে পানি উৎসারিত করে বলে এদের সাগর ফোয়ারা (sea squirt) নামে ডাকা হয়।

বৈশিষ্ট্য

১. পরিণত প্রাণীতে নটোকর্ড থাকে না, লার্ভা দশায় কেবল লেজে নটোকর্ড থাকে।
২. পরিণত প্রাণী নিশ্চল এবং স্থায়ীভাবে নিমজ্জিত কোনো বস্তুর সঙ্গে আটকে থাকে, কিন্তু লার্ভা মুক্ত সাঁতারু।
৩. দেহ সেলুলোজ নির্মিত টিউনিক (tunic) বা টেস্ট (test) নামক আচ্ছাদনে আবৃত।
৪. সকলেই সামুদ্রিক এবং সমুদ্রের তলদেশে একক বা কলোনি গঠন করে বাস করে।

Subphylum Urochordata নিচে বর্ণিত ৩টি Class বা শ্রেণিতে বিভক্ত।

Class – 1: Ascidiacea (অ্যাসিডিয়াসিয়া) : এ শ্রেণিভুক্ত প্রাণীর দেহ স্ফীতকায় বা নলাকার। দেহের আবরণ স্থায়ী, পুরু ও অর্ধস্বচ্ছ। পরিণত প্রাণীতে লেজ থাকে না। যেমন– *Ascidia mentula, Molgula tubifera* প্রভৃতি।

Class – 2: Thaliacea (থ্যালিয়েসিয়া) : এ শ্রেণিভুক্ত সদস্যরা দেখতে লেবু বা পিপে আকৃতির। দেহের আবরণ পাতলা ও স্বচ্ছ। পরিণত প্রাণী লেজবিহীন। যেমন– *Salpa maxima, Doliolum rarum* প্রভৃতি।

Class –3: Larvacea (লার্ভেসিয়া) : এ শ্রেণির প্রজাতিরা বাঁকা ব্যাঙাচি আকৃতির। দেহের আবরণ সাময়িক, জিলেটিনের মতো ও স্বচ্ছ। পরিণত প্রাণীতে লেজ থাকে। যেমন– *Oikopleura dioica, Appendicularia* প্রজাতি প্রভৃতি।

Ascidia mentula — *Molgula tubifera* — *Salpa maxima* — *Oikopleura dioica*

চিত্র ১.২৮ : কয়েকটি ইউরোকর্ডেট প্রাণী

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Subphylum – 2 : Cephalochordata (সেফালোকর্ডাটা; গ্রিক, *kephale* = মাথা + *chorda* = রজ্জু)

পৃথিবীর সব উপকূলীয় পানির বালুময় তলদেশে এরা বাস করে। কর্ডেটের সবকটি বৈশিষ্ট্যের আদি ও সরল রূপ দেখতে পাওয়া যায় এসব প্রাণীতে। পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত ৩৩ প্রজাতির সেফালোকর্ডেট শনাক্ত করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ লম্বা, পার্শ্বীয়ভাবে চাপা ও স্বচ্ছ; এবং উভয় প্রান্ত সরু।
২. দেহের সামনে অঙ্কীয়ভাবে **ওরাল হুড** (oral hood) এবং তাতে **ওরাল সিরি** (oral cirri) থাকে।
৩. আজীবন স্থায়ী নটোকর্ড ও নার্ভকর্ড (স্নায়ুরজ্জু) দেহের সম্মুখ থেকে পশ্চাৎপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত।
৪. গলবিলে অসংখ্য ফুলকা রন্ধ্র উপস্থিত, ফুলকাগুলো **অ্যাট্রিয়াম** (atrium)-এ উন্মুক্ত।
৫. দেহের দুপাশে ">" আকারের **মায়োটোম পেশি** পরপর সজ্জিত।

উদাহরণ– *Branchiostoma lanceolatum* (অ্যাম্ফিঅক্সাস)।

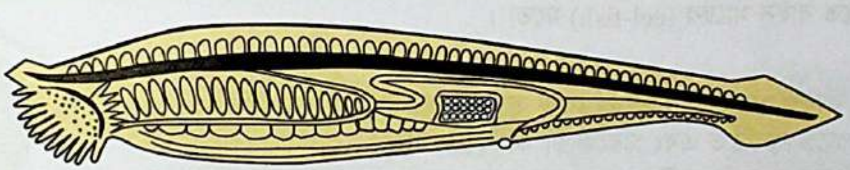

চিত্র ১.২৯ : *Branchiostoma lanceolatum*

কর্ডাটা (chordata) এবং ননকর্ডাটা (nonchordata)-র মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	কর্ডাটা	ননকর্ডাটা বা অকর্ডাটা
১. নটোকর্ড	জীবনের কোন সময় বা আজীবন পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা বরাবর উপস্থিত।	কখনোই থাকে না।
২. ফুলকা রন্ধ্র	জীবনের যে কোন দশায় বা আজীবন গলবিলের দুপাশে অবস্থান করে।	ফুলকা থাকলেও জীবনের কোন অবস্থাতে ফুলকারন্ধ্র থাকে না।
৩. স্নায়ুরজ্জু	নটোকর্ডের উপরে ফাঁপা, নলাকার সূত্রবিশেষ।	অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত নিরেট কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র।
৪. লেজ	জীবনের শুরুতে কিংবা আজীবন থাকে।	প্রকৃত লেজ থাকে না।
৫. হৃৎযন্ত্র	পৌষ্টিকনালির অঙ্কীয়দেশে উপস্থিত।	নাও থাকতে পারে; থাকলে পৌষ্টিকনালির পৃষ্ঠদেশে।
৬. হিমোগ্লোবিন	লোহিত কণিকার অভ্যন্তরে অবস্থিত।	নাও থাকতে পারে, থাকলে রক্তরসে দ্রবীভূত।

Subphylum – 3 : Vertebrata (ভার্টিব্রাটা; ল্যাটিন, *vertebratus* = মেরুদণ্ডবিশিষ্ট)

কর্ডেটের তৃতীয় উপপর্ব হচ্ছে Vertebrata। এটি বিরাট ও বৈচিত্র্যময় প্রাণিগোষ্ঠী নিয়ে গঠিত। কর্ডেটের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো ছাড়াও আরও কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য ধারণ করায় এ উপপর্ব প্রাধান্যকারী গোষ্ঠী হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। অস্থিময় বা তরুণাস্থিময় ক্রেনিয়াম (cranium)-এর ভিতর মস্তিষ্ক অবস্থান করে বলে এ উপপর্বের আরেক নাম Craniata।

বৈশিষ্ট্য

১. নটোকর্ড অস্থিময় বা তরুণাস্থিময় কশেরুকাবিশিষ্ট **মেরুদণ্ড** দিয়ে প্রতিস্থাপিত।
২. পৃষ্ঠীয় ফাঁপা স্নায়ুরজ্জু **মস্তিষ্ক** ও **সুষুম্নাকাণ্ড** গঠন করে।
৩. অস্থিময় অথবা তরুণাস্থিময় কশেরুকা সুষুম্নাকাণ্ডকে ঘিরে রাখে এবং কঙ্কাল সম্মুখপ্রান্তে পরিবর্তিত হয়ে **করোটি** (skull) গঠনের মাধ্যমে মস্তিষ্ককে সুরক্ষিত রাখে।
৪. গলবিলের উভয় পাশে ৫–১৫ জোড়া ফুলকা রন্ধ্র থাকে। উন্নত মেরুদণ্ডীতে গলবিলীয় ফুলকা রন্ধ্র কেবল ভ্রূণদশায় উপস্থিত থাকে।
৫. পার্শ্বীয় জোড় উপাঙ্গ (পাখনা বা পদ) চলন অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Vertebrata বা মেরুদণ্ডী প্রাণিদের শ্রেণিবিন্যাস

আধুনিক শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী উপপর্ব Vetebrata দুটি Superclass বা অধিশ্রেণিতে বিভক্ত : যেমন–

(I) Cyclostomata এবং (II) Gnathostomata.

Superclass – I : Cyclostomata (সাইক্লোস্টোমাটা; গ্রিক *cyclos* = round, গোল + *stoma* = mouth, মুখ)

প্রকৃত চোয়াল ও জোড় উপাঙ্গবিহীন; মুখ গোলাকার ও কেরাটিনময় দাঁতযুক্ত; এবং পরিণত প্রাণীতে মেরুদণ্ড ক্ষয়িষ্ণু বা অনুপস্থিত। এ Superclass-এর অধীনে দুধরনের মৎস্যগোষ্ঠী রয়েছে– একটি হচ্ছে Class–Myxini, অন্যটি Class–Petromyzontida.

Class-1 : Myxini (মিক্সিনি; গ্রিক *myxa* = slime, পিচ্ছিল আবরণ)

এ শ্রেণিভুক্ত মাছগুলো হ্যাগফিশ (hagfish) নামে পরিচিত। এরা স্বাধীনজীবী, প্রধানত অ্যানিলিড, মলাস্ক, ক্রাস্টাসিয়ান আর্থ্রোপোড বা মৃতপ্রায় মাছ আহার করে। বর্তমানে প্রায় ৭০ প্রজাতির হ্যাগফিশ রয়েছে, সবাই সামুদ্রিক। হ্যাগফিশ দেখতে বাইন মাছের (eel-fish) মতো।

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ আঁইশবিহীন, পিচ্ছিল গ্রন্থিযুক্ত ত্বকে আবৃত, পৃষ্ঠীয় পাখনাবিহীন।
২. মুখ প্রান্তে অবস্থিত এবং চারজোড়া কর্ষিকায় পরিবৃত।
৩. গলবিলের দুপাশে মোট ৫–১৫ জোড়া ফুলকা রন্ধ্র অবস্থিত।
৪. হ্যাগফিশের নাসিকা-থলি মুখবিবরে উন্মুক্ত।
৫. কোনো লার্ভা দশা নেই।

Myxine glutinosa
(আটলান্টিক হ্যাগফিশ)

চিত্র ১.৩০ : Myxini শ্রেণির একটি মাছ

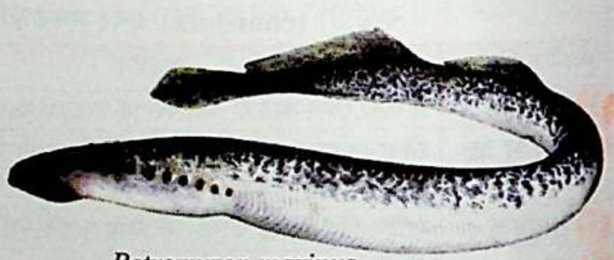

Petromyzon marinus
(পেট্রোমাইজন)

চিত্র ১.৩১ : Petromyzontida শ্রেণির একটি মাছ

Class–2: Petromyzontida (পেট্রোমাইজনটিডা; গ্রিক, *petros* = stone, পাথর + *myzon* = sucking, চোষণ)

এ শ্রেণিভুক্ত মাছগুলো ল্যামপ্রে (lamprey) নামে পরিচিত। অনেকে পরজীবী জীবন যাপন করে। বর্তমানে প্রায় ৪১ প্রজাতির ল্যামপ্রে রয়েছে। সবাই সামুদ্রিক হলেও ডিম পাড়ার জন্য মিঠাপানির হ্রদে আসতে হয়। ডিম ছাড়ার পর কয়েক দিনের মধ্যেই মারা যায়। ডিম ফুটে অ্যামোসিট (ammocete) লার্ভা বেরিয়ে রূপান্তর শেষে সমুদ্রে যাত্রা করে।

বৈশিষ্ট্য

১. পরিণত ল্যামপ্রের দেহ সরু, দেখতে বাইন মাছের মতো, আঁইশবিহীন, একটি বা দুটি পৃষ্ঠীয় পাখনাযুক্ত।
২. মৌখিক চাকতিটি (oral disc) চোষকের ভূমিকা পালন করে। এর চারদিকে কেরাটিনময় দাঁত অবস্থান করে।
৩. পৃথক ফুলকা রন্ধ্রসহ সাতজোড়া ফুলকা রয়েছে।
৪. ল্যামপ্রের নাসিকা-থলি মুখবিবরে উন্মুক্ত নয়।
৫. লার্ভা দশা আছে।

Superclass–II : Gnathostomata (ন্যাথোস্টোমাটা; গ্রিক *gnathos* =jaw, চোয়াল + *stoma* = mouth, মুখ)

প্রকৃত চোয়াল ও জোড় উপাঙ্গবিশিষ্ট এবং তরুণাস্থি ও অস্থিময় প্রাণিগোষ্ঠী হিসেবে Superclass বা অধিশ্রেণি Gnathostomata অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণীর সমাবেশ ঘটেছে এ অধিশ্রেণিতে। এসব প্রাণীকে ৭টি Class বা শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Class –1 : Chondrichthyes (কন্ড্রিকথিস; গ্রিক *chondros* = cartilage, তরুণাস্থি + *ichthys* = fish, মাছ)

এটি Gnathostomata-র প্রথম শ্রেণি। বর্তমানে এ শ্রেণিতে প্রায় ১০০০ প্রজাতির তরুণাস্থিময় মাছ শনাক্ত করা হয়েছে। এটি প্রাচীন হলেও বেশ উন্নত গোষ্ঠী। সুগঠিত সংবেদ অঙ্গ, শক্তিশালী লেজ ও সাঁতার-পেশি এবং শিকারী স্বভাব সব মিলিয়ে জলজ পরিবেশের এক দাপুটে গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। এদের অধিকাংশই সামুদ্রিক।

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র প্ল্যাকয়েড (placoid); নামক সূক্ষ্ম কাঁটার মতো আঁইশে আবৃত।
২. অন্তঃকঙ্কাল সম্পূর্ণ তরুণাস্থিময়।
৩. মাথার দুপাশে ৫–৭ জোড়া ফুলকা রন্ধ্র পৃথকভাবে দেহের বাইরে উন্মুক্ত।
৪. পুচ্ছ-পাখনা হেটারোসার্কাল (heterocercal) ধরনের; অর্থাৎ পুচ্ছ–পাখনার অংশ দুটি অসমান।
৫. মুখছিদ্র ও নাসারন্ধ্র মস্তকের অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত। চোয়ালে অসংখ্য সারিবদ্ধ দাঁত থাকে।

Plesiobatis daviesi (স্টিং রে)
Scoliodon laticaudus (খুট্রি হাঙ্গর)
Eusphyrna blochii (হাতুড়ী হাঙ্গর)

চিত্র ১.৩২ : Chondrichthyes শ্রেণির কয়েকটি মাছ

Class – 2 : Actinopterygii (অ্যাকটিনোপটেরিজি; গ্রিক *actis* = rays, রশ্মি + *pteryx* = fin, পাখনা)

এ শ্রেণিভুক্ত মাছগুলো রশ্মিময় পাখনাবিশিষ্ট মাছ (ray-finned fishes) নামে পরিচিত। এ শ্রেণিতে ৩১,০৪৫ প্রজাতির মাছ রয়েছে। জীবিত মাছের প্রায় ৯৬% এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। ঝর্ণা, হ্রদ, গুহা, গর্ত, বরফ, গভীর সাগর সবখানে এ জাতীয় মাছ বিস্তৃত।

বৈশিষ্ট্য

১. ত্বক গ্রন্থিময় এবং সাধারণত সাইক্লয়েড (cycloid; গোলাকার) বা টিনয়েড (ptenoid; কাঁটাযুক্ত) ধরনের আঁইশে আবৃত। কিছু ক্ষেত্রে আঁইশ নেই।
২. অন্তঃকঙ্কাল অস্থিময়।
৩. মাথার দুপাশে একটি করে ফুলকা রন্ধ্র অবস্থিত যা কানকো (operculum) দিয়ে আবৃত।
৪. পৌচ্ছিক-পাখনা হোমোসার্কাল (homocercal) ধরনের অর্থাৎ পুচ্ছ-পাখনার অংশদুটি সমান এবং রশ্মিযুক্ত।
৫. বায়ুথলি বা পটকা (swim bladder) দেহকে পানিতে ভেসে থাকতে সাহায্য করে।

Tenualosa ilisha (ইলিশ মাছ)
Anabas testudineus (কই মাছ)
Channa punctatus (টাকি মাছ)

চিত্র ১.৩৩ : Actinopterygii শ্রেণির কয়েকটি মাছ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Class –3 : Sarcopterygii (সার্কোপটেরিজি; *sarkos* = flesh, মাংসল + *pteryx* = fin, পাখনা)

এ শ্রেণিভুক্ত মাছকে **পিণ্ডাকার-পাখনাবিশিষ্ট মাছ** (lobe-finned fishes) বলে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এ শ্রেণিরই কোনো মাছ থেকে চতুষ্পদী ও স্থলচর প্রাণী হিসেবে উভচর গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে। বর্তমানে মাত্র ৮ প্রজাতির মাছ জীবিত আছে। এ গোষ্ঠীর **লাংফিশ** (lungfish) আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় বিস্তৃত। অন্যদিকে, **সিলাকান্থ** (Coelacanth) নামে পরিচিত দুই প্রজাতি ভারত মহাসাগর ও ইন্দোনেশিয়ার উপকূলে বিস্তৃত।

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ গ্যানয়েড (ganoid; বহিঃস্তর গ্যানয়েনে গঠিত) ধরনের আঁইশে আবৃত।
২. অন্তঃকঙ্কাল অস্থিময়।
৩. মাথার দুপাশে একটি করে ফুলকা রন্ধ্র থাকে যা কানকো দিয়ে আবৃত।
৪. এদের **পটকা** (swim bladder) রক্তজালিকা-সমৃদ্ধ এবং শ্বসন ও ভেসে থাকতে সাহায্য করে।
৫. লেজ **ডাইফাইসার্কাল** (diphycercal) ধরনের অর্থাৎ পুচ্ছপাখনার অংশ দুটি একীভূত হয়ে অভিন্ন ও নমনীয় পাখনা হিসেবে লেজ ঘিরে অবস্থিত।

Latimeria chalumnae (সিলাকান্থ মাছ)

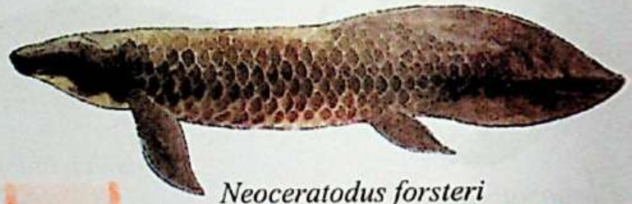

Neoceratodus forsteri (অস্ট্রেলিয়ান লাংফিশ)

চিত্র ১.৩৪ : Sarcopterygii শ্রেণির দুটি মাছ

Class – 4 : Amphibia (অ্যাম্ফিবিয়া; গ্রিক *amphi* = both, উভয় +*bios* = life, জীবন)

এ শ্রেণির সদস্যরা স্থলভাগ জয়ের উদ্দেশে সর্বপ্রথম চার পা নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। তখন থেকে এসব প্রাণী চতুষ্পদী (tetrapod) নামে পরিচিত। মূলত স্থলচর হলেও জননকালে এরা ডিম পাড়তে পানিতে আসতে বাধ্য হয় এবং পানিতেই ডিমের পরিস্ফুটন ঘটে। এ কারণে এ গোষ্ঠীর সদস্যরা উভচর (ডাঙ্গা + পানিতে বিচরণ) নামে অভিহিত। বর্তমানে জীবিত উভচর প্রজাতির সংখ্যা ৭,৭০০টি। এর মধ্যে লেজবিশিষ্ট উভচর প্রজাতি ৭১৫টি, আর পাবিহীন প্রজাতি রয়েছে ২০০টি। বাকিগুলো (৬,৭৮৫টি) চার-পাবিশিষ্ট উভচর (ব্যাঙ ইত্যাদি)।

বৈশিষ্ট্য

১. গ্রন্থিময় ত্বকবিশিষ্ট, **এক্টোথার্মিক** (ectothermic; দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে উঠানামা করে) চতুষ্পদী মেরুদণ্ডী প্রাণী। লার্ভা অবস্থায় জলচর, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় জলচর বা স্থলচর।
২. ত্বক মসৃণ, আর্দ্র, গ্রন্থিময়; শ্বসনেও সাহায্য করে।
৩. অগ্রপদে চারটি ও পশ্চাৎপদে পাঁচটি করে নখরবিহীন আঙ্গুল থাকে।
৪. লার্ভা দশায় ফুলকা ও পরিণত অবস্থায় ফুসফুস, ত্বক ও মুখবিবরীয় মিউকাস ঝিল্লির মাধ্যমে শ্বসন ঘটে।
৫. হৃৎপিণ্ড তিন প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট– দুটি অ্যাট্রিয়া (অলিন্দ) এবং একটি ভেন্ট্রিকল (নিলয়)।

Salamandra salamandra (স্যালামান্ডার)

Rhacophorous fergusonil (উড়ুক্কু ব্যাঙ)

Hoplobatrachus tigerinus (সোনাব্যাঙ)

চিত্র ১.৩৫ : Amphibia শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Class–5 : Reptilia (রেপটিলিয়া বা সরিসৃপ; ল্যাটিন *repto* = creep, হামাগুড়ি দিয়ে চলন)

ভূভাগ জয়ের নেশায় চতুষ্পদী প্রাণিদের অক্লান্ত অভিযান আরও গতিময় হয়েছে সরিসৃপ প্রজাতির উৎপত্তি ও বিকাশের মাধ্যমে। উভচরে যে গাঠনিক ও শারীরবৃত্তিক বাধা ছিল সরিসৃপে তা অপসারিত হওয়ায় দ্রুত পৃথিবী জয় করতে পেরেছে। শুষ্কতা ও ডিমের পরিস্ফুটনজনিত সমস্যাসহ নিষেক, পানি ধরে রাখা, স্থলে বিচরণ, খাদ্য গ্রহণ ও রক্তসংবহনজনিত সমস্ত বাধা অতিক্রম করে সরিসৃপ প্রজাতিরা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে জীবিত সরিসৃপ প্রজাতির সংখ্যা ১০,৪৫০টি।

বৈশিষ্ট্য

১. সরিসৃপের দেহ শুষ্ক ও এপিডার্মিস উদ্ভূত **আঁইশ** (scale) বা শক্ত **প্লেট** (plate)-এ আবৃত।
২. পায়ে ৫টি করে নখরযুক্ত আঙ্গুল থাকে।
৩. হৃৎপিন্ডের ভেন্ট্রিকল (নিলয়) অসম্পূর্ণভাবে দ্বিধাবিভক্ত থাকায় হৃৎপিণ্ড অসম্পূর্ণভাবে চার-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট (ব্যতিক্রম-কুমিরে সম্পূর্ণভাবে চার-প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট)। ফুসফুসই এদের একমাত্র শ্বসন অঙ্গ।
৪. সরিসৃপের ডিম চামড়ার মতো বা চুনময় খোলসে আবৃত থাকে।
৫. ভ্রূণের পরিস্ফুটনের সময় বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লি সৃষ্টি হয়, এ কারণে কোনো লার্ভা দশা নেই।

Gavialis gangeticus (ঘড়িয়াল)

Lissemys punctata (কচ্ছপ)

Naja naja (গোখরা সাপ)

চিত্র ১.৩৬ : Reptilia শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

কাজ : একটি ব্যাঙ ও একটি টিকটিকির মধ্যে যে সব পার্থক্য তুমি খুঁজে পাও তা ছকের মাধ্যমে দেখাও।

Class – 6 : Aves (অ্যাভিস; ল্যাটিন, *avis* = bird, পাখি)

পানি ও ডাঙ্গা ছেড়ে যে মেরুদণ্ডীগোষ্ঠী আকাশচারী হয়েছে তা পাখি নামে পরিচিত। এদের উৎপত্তি, বিকাশ ও বৈচিত্র্য এত বিচিত্র যে কারণে পাখি নিয়ে আলোচনাও বেশি। আকাশ, মাটি, পানি সবখানে পাখির অবাধ বিচরণ অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর কাছে ঈর্ষণীয় মনে হওয়া স্বাভাবিক। মেরু অঞ্চলসহ পৃথিবীর সমস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে পাখি বিস্তৃত। অনেক প্রজাতির পাখি আবার এতটাই সুযোগ সন্ধানী যে বছরের নির্দিষ্ট সময়কাল ভিন্ন দেশে কাটিয়ে স্বদেশে ফেরত আসে। বর্তমানে পৃথিবীতে ১০ হাজারের বেশি প্রজাতির পাখি রয়েছে। পাখি হওয়ার জন্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর এ নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর আপাদমস্তকে পরিবর্তনের ঝড় বয়ে গেছে। পরিবর্তনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে দেহকে হালকা করে উড্ডয়ন সফল **অভিযোজন** (adaptation) সম্পন্ন করা।

বৈশিষ্ট্য

১. দেহ **পালক** (feather)–এ আবৃত; গ্রীবা প্রলম্বিত এবং "S" আকৃতির।
২. উড্ডয়ন অঙ্গ হিসেবে অগ্রপদ দুটি ডানা (wing)-য় রূপান্তরিত হয়েছে।

Corvus splendens (কাক)

Columba livia (কবুতর)

Copsychus saularis (দোয়েল)

Passer domesticus (চড়ুই পাখি)

চিত্র ১.৩৭ : Aves শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৩. চোয়াল দাঁতবিহীন চঞ্চু (beak) তে পরিণত হয়েছে।
৪. অস্থিগুলো বায়ুগহ্বরপূর্ণ (pneumatic) ও হালকা, অনেক হাড় একীভূত হয়েছে।
৫. ফুসফুসের সঙ্গে পাতলা বায়ুথলি (air sac) যুক্ত হয়েছে, এমনকি হাড়ের ভিতরেও বায়ুথলি প্রবিষ্ট হয়।
৬. শক্তিদায়ক খাদ্যের দ্রুত বিপাকের জন্য রয়েছে কার্যকর পরিপাকতন্ত্র।
৭. হৃৎপিন্ড ৪ প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট– দুটি অ্যাট্রিয়া (অলিন্দ) ও দুটি ভেন্ট্রিকল (নিলয়)।
৮ পাখির শরীরেই প্রথম সমোষ্ণশোণিত (warm blooded) বা এন্ডোথার্মিক (endothermic) অবস্থা দেখা দিয়েছে।

Class–7 : Mammalia (ম্যামালিয়া বা স্তন্যপায়ী; ল্যাটিন *mamma* = breast, স্তন)

প্রাণিজগতে বিবর্তনের পরিক্রমায় সর্বোন্নত প্রাণিগোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে Mammalia শ্রেণি। দেড় গ্রাম ওজনের বাদুর থেকে শুরু করে ১৩০ মেট্রিক টন ওজনের নীল তিমিসহ বিচিত্র আকার, আকৃতি ও গড়নের স্তন্যপায়ী রয়েছে। শারীরিক গঠনের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তা ও তাৎক্ষণিক সক্রিয়তার কারণে স্তন্যপায়ীরা আজ সংখ্যাগত দিক থেকে কম হলেও (পাখি, মাছ, পতঙ্গের তুলনায়) পৃথিবীর কর্তৃত্ব দখল করে নিয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৬ হাজার প্রজাতির স্তন্যপায়ী রয়েছে। মানুষও এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সদস্য।

Ornithorhynchus anatinus (প্লাটিপাস)

Macropus rufa (কাঙ্গারু)

Pteropus gigantius (বাদুর)

Balaenoptera musculus (নীল তিমি)

Panthera leo (সিংহ)

Panthera tigris (বাঘ)

Dicerorhinus sumatrensis (দ্বিশৃংগ গণ্ডার)

Homo sapiens (মানুষ)

চিত্র ১.৩৮ : Mammalia শ্রেণির কয়েকটি প্রাণী

বৈশিষ্ট্য

১. দেহত্বক বিভিন্ন গ্রন্থিযুক্ত (ঘর্মগ্রন্থি, সেবাসিয়াস ইত্যাদি) এবং লোম (hair)-এ আবৃত (তিমি ব্যতীত)।
২. পরিণত স্ত্রী প্রাণীর কার্যকরি স্তনগ্রন্থি (mammary gland) থেকে ক্ষরিত মাতৃদুগ্ধে নবজাতক লালিত হয়।
৩. বহিঃকর্ণে পিনা (pinna) ও মধ্যকর্ণে তিনটি ক্ষুদ্রাস্থি থাকে। চোয়াল বিভিন্ন ধরনের দাঁতযুক্ত।
৪. মাংসল ডায়াফ্রাম (diaphragm) বা মধ্যচ্ছদা দিয়ে বক্ষ ও উদর গহ্বর পৃথক থাকে।
৫. পরিণত লোহিত রক্তকণিকা নিউক্লিয়াসবিহীন।
৬. হৃৎপিন্ড সম্পূর্ণ চারপ্রকোষ্ঠী।
৭. স্তন্যপায়ীরা আজ সবধরনের পরিবেশ ছাড়াও স্থলচর ও জলচর বাসস্থানে ব্যাপক বিস্তৃত। একটি উপগোষ্ঠী আবার উড্ডয়নেও সক্ষম (বাদুর)।
৮. এন্ডোথার্মিক (দেহের তাপমাত্রা পরিবেশের তাপমাত্রার সাথে উঠানামা করেনা) প্রাণী।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর উল্লেখযোগ্য পার্থক্য

আলোচ্য বিষয়	মেরুদণ্ডী প্রাণী	অমেরুদণ্ডী প্রাণী
১. মেরুদণ্ড	পৃষ্ঠ মধ্যরেখা বরাবর থাকে এবং কশেরুকাযুক্ত।	অনুপস্থিত।
২. স্নায়ুরজ্জু	ফাঁপা, দেহের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত।	নিরেট, দেহের অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত।
৩. প্রতিসাম্য	দ্বিপার্শ্বীয়।	অপ্রতিসম, অরীয় বা দ্বিপার্শ্বীয়।
৪. হৃৎপিণ্ড	দেহের অঙ্কীয়দেশে।	যদি থাকে তবে পৃষ্ঠদেশে।
৫. হিমোগ্লোবিন	সবসময় লোহিত কণিকার অভ্যন্তরে।	যদি থাকে তবে রক্তরসে দ্রবীভূত অবস্থায়।
৬. মস্তিষ্ক	সবসময়ই থাকে এবং করোটির অভ্যন্তরে সুরক্ষিত।	যদি থাকে, তবে তা করোটি দিয়ে আবৃত নয়।
৭. অন্তঃকঙ্কাল	অস্থি ও তরুণাস্থি নিয়ে গঠিত।	থাকে না, থাকলেও অস্থি ও তরুণাস্থি দিয়ে তৈরি নয়।

মেরুদণ্ডী প্রাণিদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য

বিষয়	মৎস্য	উভচর	সরিসৃপ	পাখি	স্তন্যপায়ী
১. ত্বক	ভেজা, গ্রন্থিময় ও সাধারণত ডার্মাল আঁইশযুক্ত।	ভেজা, গ্রন্থিময় ও নগ্ন।	শুষ্ক ও এপিডার্মাল আঁইশ দিয়ে আবৃত।	শুষ্ক ও পালক দিয়ে আবৃত।	শুষ্ক, গ্রন্থিময় ও লোম দিয়ে আবৃত।
২. চলন অঙ্গ	পাখনা।	দুজোড়া পদ।	দুজোড়া পদ।	একজোড়া ডানা ও একজোড়া পদ।	দুজোড়া পদ।
৩. শ্বসন অঙ্গ	ফুলকা।	ফুসফুস।	ফুসফুস।	ফুসফুস।	ফুসফুস।
৪. হৃৎপিণ্ড	দ্বিপ্রকোষ্ঠী।	তিন প্রকোষ্ঠী।	অসম্পূর্ণভাবে বিভক্ত চার প্রকোষ্ঠী।	সম্পূর্ণরূপে চার প্রকোষ্ঠী।	সম্পূর্ণরূপে চার প্রকোষ্ঠী।
৫. রক্ত	শীতল।	শীতল।	শীতল।	উষ্ণ।	উষ্ণ।
৬. করোটিক স্নায়ু	১০ জোড়া।	১০ জোড়া।	১২ জোড়া।	১২ জোড়া।	১২ জোড়া।
৭. অক্ষিপল্লব	থাকে না।	তিনটি।	তিনটি।	তিনটি	দুটি।
৮. অবসারণী	অনুপস্থিত।	উপস্থিত।	উপস্থিত।	উপস্থিত।	অনুপস্থিত।
৯. নিষেক	বহিঃনিষেক।	বহিঃনিষেক।	অন্তঃনিষেক।	অন্তঃনিষেক।	অন্তঃনিষেক।
১০. প্রসব	অনিষিক্ত ডিম।	অনিষিক্ত ডিম।	নিষিক্ত ডিম ও বাচ্চা।	নিষিক্ত ডিম।	বাচ্চা (হংসচঞ্চুতে নিষিক্ত ডিম)।

সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীই কর্ডেট, কিন্তু সকল কর্ডেট মেরুদণ্ডী নয়

কর্ডেট প্রাণীর তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-স্থিতিস্থাপক **নটোকর্ড**, পৃষ্ঠীয় ফাঁপা **স্নায়ুরজ্জু** এবং গলবিলীয় **ফুলকা রন্ধ্র**। এসব বৈশিষ্ট্য সবধরনের কর্ডেট প্রাণীর জীবনের যে কোনো দশায় কিংবা আজীবন পাওয়া যায়। Chordata পর্বের দুটি উপপর্ব যেমন-Urochordata ও Cephalochordata (অর্থাৎ Protochordata)-র সদস্যদের ক্ষেত্রে কর্ডাটার বৈশিষ্ট্যগুলো আজীবন পাওয়া যায়। কিন্তু Vertebrata উপপর্বের ক্ষেত্রে ভ্রূণাবস্থায় নটোকর্ড থাকলেও পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় তা কশেরুকা নির্মিত মেরুদণ্ড দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়। সেজন্য এদের **মেরুদণ্ডী প্রাণী** বলে। তাছাড়া স্নায়ুরজ্জুটি মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়; ফুলকা রন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং ফুলকা বা ফুসফুসের আবির্ভাব ঘটে। তাই বলা যায়- **সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীই কর্ডেট** (কারণ ভ্রূণাবস্থায় কর্ডাটার সকল বৈশিষ্ট্য থাকে) **কিন্তু সকল কর্ডেট মেরুদণ্ডী নয়** (কারণ Urochordata ও Cephalochordata উপপর্বের প্রাণিদের নটোকর্ড কখনোই মেরুদণ্ড দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয় না)।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

নিচের ছকে Vertebrata উপপর্বের শ্রেণিগুলোর নাম, প্রধান বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ উল্লেখ করা হলো।

অধিশ্রেণি ১ : Cyclostomata (সাইক্লোস্টোমাটা) : প্রকৃত চোয়াল ও জোড় উপাঙ্গ অনুপস্থিত		
শ্রেণির নাম	**বৈশিষ্ট্য**	**উদাহরণ**
শ্রেণি–১ : Myxini	১. মুখ প্রান্তীয় ও ৪ জোড়া কর্ষিকাযুক্ত। ২. ৫–১৫ জোড়া গলবিলীয় ফুলকা রন্ধ্র থাকে।	*Myxine glutinosa* (আটলান্টিক হ্যাগফিশ) *Eptatretus stouti* (প্যাসিফিক হ্যাগফিশ)
শ্রেণি–২ : Petromyzontida	১. কেরাটিনময় দাঁতযুক্ত, চোষন ক্ষমতাসম্পন্ন মুখ। ২. ৭ জোড়া ফুলকা রন্ধ্র থাকে।	*Petromyzon marinus* (ল্যামপ্রে) *Lampetra tridentatus* (ল্যামপ্রে)

অধিশ্রেণি ২ : Gnathostomata (ন্যাথোস্টোমাটা) : প্রকৃত চোয়াল ও সাধারণত জোড় উপাঙ্গ (পাখনা/পদ) উপস্থিত		
শ্রেণির নাম	**বৈশিষ্ট্য**	**উদাহরণ**
শ্রেণি ১ : Chondrichthyes	১. অন্তঃকঙ্কাল তরুণাস্থিময় এবং দেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র প্ল্যাকয়েড আঁইশে আবৃত। ২. লেজ **হেটেরোসার্কাল** অর্থাৎ পৌচ্ছিক পাখনার অংশদুটি অসমান।	*Hydrologus collei* (র‍্যাটফিশ) *Scoliodon laticaudus* (হাঙর মাছ) *Plesiobatis daviesi* (স্টিং রে)
শ্রেণি ২ : Actinopterygii	১. অন্তঃকঙ্কাল অস্থিময় এবং দেহ **সাইক্লয়েড** ও টিনয়েড ধরনের আঁইশে আবৃত। ২. লেজ **হোমোসার্কাল** ধরনের অর্থাৎ পৌচ্ছিক পাখনার অংশদুটি সমান।	*Tenualosa ilisha* (ইলিশ মাছ) *Labeo rohita* (রুই মাছ) *Channa punctatus* (টাকি মাছ)
শ্রেণি ৩ : Sarcopterygii	১. অন্তঃকঙ্কাল অস্থিময় এবং দেহ গ্যানয়েড ধরনের আঁইশে আবৃত। ২. লেজ **ডাইফিসার্কাল** ধরনের অর্থাৎ পৃষ্ঠীয় ও অংকীয় পাখনা একীভূত হয়ে অভিন্ন ও নমনীয় পাখনা হিসেবে লেজ ঘিরে অবস্থিত।	*Latimeria chalumnae* (সিলাকান্থ) *Neoceratodus forsteri* (অস্ট্রেলিয়ান লাংফিশ) *Protopterus annectens* (আফ্রিকান লাংফিশ)
শ্রেণি ৪ : Amphibia	১. দেহত্বক নগ্ন, গ্রন্থিময় ও সিক্ত। ২. অগ্রপদে ৪টি ও পশ্চাৎপদে ৫টি করে আঙ্গুল থাকে।	*Salamandra salamandra* (স্যালামান্ডার) *Hoplobatracus tigerinus* (সোনাব্যাঙ) *Fejervarya asmati* (আসমতিব্যাঙ) *Chiromantis simus* (গেছোব্যাঙ)
শ্রেণি ৫ : Reptilia	১. দেহ শুষ্ক এবং এপিডার্মিস উদ্ভূত **আঁইশ** বা শক্ত প্লেট দিয়ে আবৃত। ২. প্রতি পায়ে ৫টি করে নখরযুক্ত আঙ্গুল থাকে।	*Kachuga sylhetensis* (কড়িকাইট্টা) *Hemidactylus frenatus* (টিকটিকি) *Gavialis gangeticus* (ঘড়িয়াল)
শ্রেণি ৬ : Aves	১. দেহ **পালক**-এ আবৃত এবং অগ্রপদদুটি ডানায় রূপান্তরিত। ২. চোয়াল দন্তহীন চঞ্চুতে পরিণত হয়েছে।	*Francolinus gularis* (তিতির) *Copsychus saularis* (দোয়েল) *Centropus bengalensis* (কুকা)
শ্রেণি ৭ : Mammalia	১. দেহ **লোম**-এ আবৃত এবং বহিঃকর্ণ পিনাযুক্ত। ২. পরিণত স্ত্রী প্রাণীতে সক্রিয় **স্তনগ্রন্থি** থাকে।	*Panthera tigris* (বাঘ) *Homo sapiens* (মানুষ)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ব্যবহারিক অংশ : মিউজিয়াম স্পেসিমেন পর্যবেক্ষণ
(Study of Museum Specimen)

ড্রইং সিটে সাদা-কালো ছবি আঁকতে হবে

পাঠ্যসূচীতে ননকর্ডাটা (Nonchordata) থেকে যেকোন ৫টি এবং ভার্টিব্রাটা (Vertebrata) থেকে যে কোন ৫টি প্রাণী (মোট ১০টি প্রাণী) পর্যবেক্ষণের জন্য বলা হয়েছে। শিক্ষক মহোদয় ১০টি প্রাণী বাছাই করে দেবেন। ছাত্রছাত্রীরা প্রাণীগুলো পর্যবেক্ষণ করে শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসহ ড্রইং সিটে পেন্সিল দিয়ে প্রাণীগুলোর ছবি এঁকে সেগুলো লেবেলিং করবে।

ননকর্ডাটা ও ভার্টিব্রাটার কতকগুলো প্রাণী পর্যবেক্ষণ

ননকর্ডাটা (Nonchordata)

Phylum - Porifera

স্কাইফা—*Scypha (= Sycon) gelatinosum*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum - Porifera
Class - Calcarea
Order - Heterocoela
Family - Sycettidae
Genus - *Scypha*
Species - *Scypha gelatinosum*

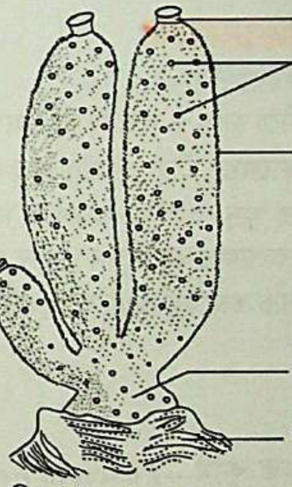

চিত্র : *Scypha gelatinosum*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. ফুলদানি আকৃতির সরু দেহ।
২. প্রত্যেক ফুলদানির মধ্যভাগ স্ফীত।
৩. দেহপ্রাচীর অস্টিয়া নামক অসংখ্য ছিদ্রযুক্ত।
৪. ফুলদানির মুক্ত উর্দ্ধপ্রান্ত অসক্যুলাম পথে উন্মুক্ত।
৫. ফুলদানির বদ্ধ নিম্নপ্রান্ত স্টোলনের সাহায্যে অবলম্বন বস্তুর সঙ্গে আবদ্ধ।

Phylum – Cnidaria

হাইড্রা—*Hydra viridis*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum - Cnidaria
Class - Hydrozoa
Order - Hydroida
Family - Hydridae
Genus - *Hydra*
Species - *Hydra viridis*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নলাকার; একপ্রান্ত খোলা ও অন্যপ্রান্ত বদ্ধ।
২. মুক্তপ্রান্তে অবস্থিত মোচাকার হাইপোস্টোমের চূড়ায় মুখছিদ্র অবস্থিত।
৩. হাইপোস্টোমকে ঘিরে কয়েকটি সুতাকৃতি কর্ষিকা রয়েছে।
৪. দেহের বদ্ধ (নিম্ন) প্রান্তে গোলাকার পাদ-চাকতি অবস্থিত।
৫. দেহে এক বা একাধিক শিশু *Hydra* বা মুকুল বিদ্যমান।

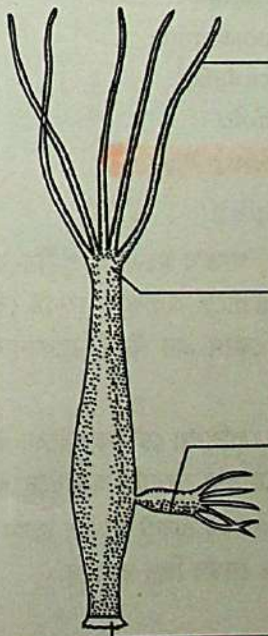

চিত্র : *Hydra viridis*

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Phylum – Platyhelminthes

শূকরের ফিতাকৃমি-*Taenia solium*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Platyhelminthes
Class—Cestoda
Order—Cyclophyllidea
Family—Taeniidae
Genus—*Taenia*
Species—*Taenia solium*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. উপর-নিচে চাপা ও লম্বা ফিতার মতো দেহ।
২. দেহ **স্কোলেক্স**, গ্রীবা ও **স্ট্রোবিলা**-য় বিভক্ত।
৩. স্কোলেক্স ক্ষুদ্র, আলপিনের মাথার মতো; এতে ৪টি **চোষক**, চূড়ায় কোণাকার **রস্টেলাম** ও এর চতুর্দিকে **হুক** আছে।
৪. স্ট্রোবিলায় খন্ডকের মতো অসংখ্য প্রোগ্লোটিড রয়েছে।

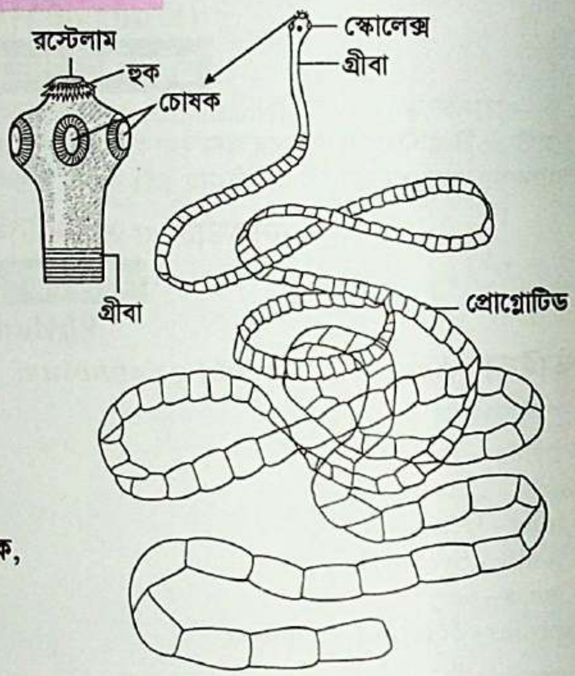

চিত্র : *Taenia solium*

ভেড়ার যকৃত কৃমি—*Fasciola hepatica*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Platyhelminthes
Class— Trematoda
Order—Echinostomida
Family—Fasciolidae
Genus—*Fasciola*
Species—*Fasciola hepatica*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নরম, পাতার মতো ও পৃষ্ঠীয়-অঙ্কীয়ভাবে চাপা।
২. দেহের অগ্রপ্রান্তে অবস্থিত সুস্পষ্ট কৌণিক অভিক্ষেপ বা **ওরাল কোণ**-এর শীর্ষে ত্রিকোণাকার **মুখছিদ্র** অবস্থিত।
৩. দেহে দুটি পেশিময় **চোষক** থাকে; একটি অগ্রপ্রান্তে **মৌখিক চোষক**, অন্যটি অঙ্কীয়দেশে **অ্যাসিটাবুলাম**।
৪. অ্যাসিটাবুলামের একটু সামনে জনন ছিদ্র ও দেহের শেষ প্রান্তে **রেচন ছিদ্র** রয়েছে।

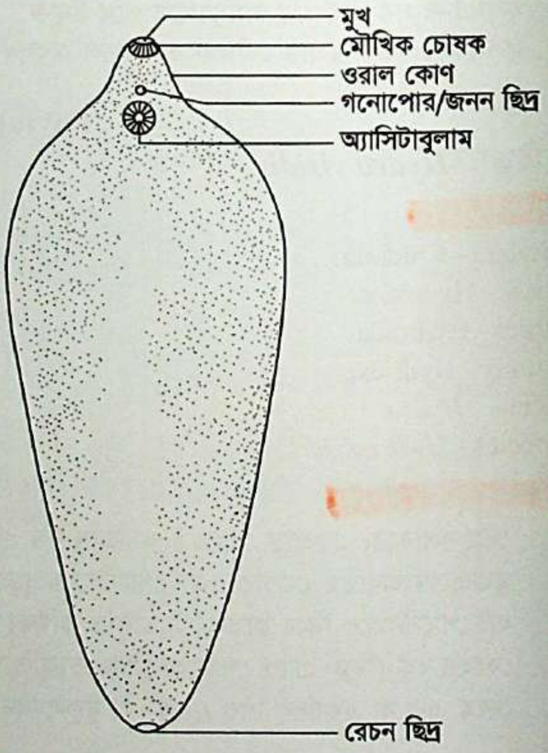

চিত্র : *Fasciola hepatica* (অঙ্কীয় দৃশ্য)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Phylum – Nematoda

কেঁচোকৃমি বা গোলকৃমি— *Ascaris lumbricoides*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Nematoda
Class—Phasmida
Order—Ascarida
Family—Ascaridae
Genus—*Ascaris*
Species—*Ascaris lumbricoides*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নলাকার এবং দু'প্রান্ত সরু ও মধ্যভাগ চওড়া।
২. দেহ মসৃণ, শক্ত ও স্থিতিস্থাপক **কিউটিক্‌ল**-এ আবৃত।
৩. দেহের অগ্রপ্রান্তে তিনটি ওষ্ঠ দিয়ে পরিবৃত **মুখছিদ্র** রয়েছে।
৪. অগ্রপ্রান্তের সামান্য পেছনে অঙ্কীয়দেশে **রেচনরন্ধ্র** অবস্থিত।
৫. পুরুষ কৃমির পশ্চাৎপ্রান্ত বাঁকানো ও **পিনিয়াল সিটিযুক্ত**।

চিত্র : *Ascaris lumbricoides*
(বায়ে-পুরুষ এবং ডানে-স্ত্রী কৃমি)

Phylum – Annelida

কেঁচো—*Metaphire posthuma*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Annelida
Class—Oligochaeta
Order—Haplotaxida
Family—Megascolecidae
Genus—*Metaphire*
Species—*Metaphire posthuma*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নলাকার ও অসংখ্য খন্ডক বা **সেগমেন্ট**-এ বিভক্ত যা আন্তঃখন্ডকীয় খাঁজের সাহায্যে পরস্পর পৃথক।
২. ১৪–১৬তম দেহ খন্ডকের উপরে চামড়ার মতো বেষ্টনী বা **ক্লাইটেলাম** আছে।
৩. ১৪তম দেহ খন্ডকের অঙ্কীয়দেশে একটি **স্ত্রী জননরন্ধ্র** এবং ১৮তম দেহ খন্ডকের অংকীয়দেশে একজোড়া **পুং জননরন্ধ্র** থাকে।
৪. প্রত্যেক খন্ডকে একসারি সূক্ষ্ম সুতার মতো **সিটি** দেখা যায়।
৫. ত্বক পাতলা হওয়ায় পৃষ্ঠীয় মধ্যরেখা বরাবর **পৃষ্ঠীয় রক্তনালি** দেখা যায়।

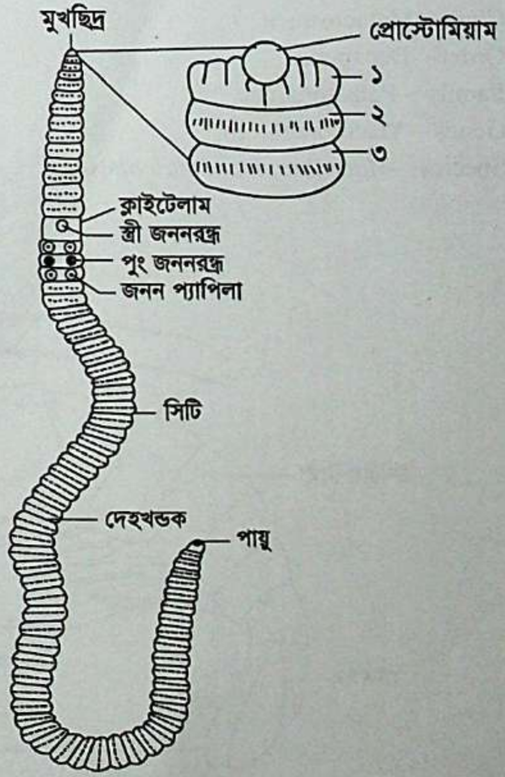

চিত্র : *Metaphire posthuma*

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

জোঁক—*Hirudinaria manillensis*

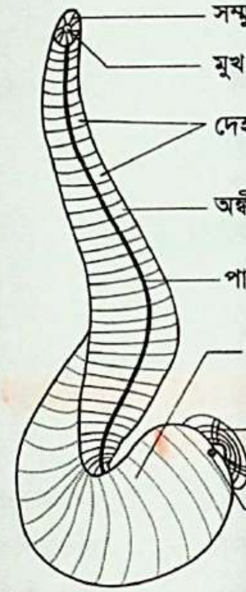

চিত্র : *Hirudinaria manillensis*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Annelida
Class—Hirudinea
Order—Gnathobdellida
Family—Hirudidae
Genus—*Hirudinaria*
Species—*Hirudinaria manillensis*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. পেশিবহুল দেহটি পৃষ্ঠ-অঙ্কীয়ভাবে চাপা ও ৩৩টি খন্ডকে বিভক্ত।
২. প্রত্যেক দেহখন্ডকে কয়েকটি অ্যানুলি আছে।
৩. অগ্রপ্রান্তের অঙ্কীয়দেশে একটি সম্মুখ চোষক থাকে।
৪. প্রথম ৫ দেহখন্ডকে ৫ জোড়া ওসেলি রয়েছে।
৫. পশ্চাৎপ্রান্তে একটি থালার মত পশ্চাৎ চোষক রয়েছে।

Phylum – Arthropoda

চিংড়ি—*Macrobrachium (= Palaemon) malcolmsonii*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Arthropoda
Class—Malacostraca
Order—Decapoda
Family—Palaemonidae
Genus—Macrobrachium
Species—*Macrobrachium malcolmsonii*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ লম্বাটে, দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম এবং দুটি অংশে বিভক্ত-শিরোবক্ষ ও উদর।
২. শিরোবক্ষ অখন্ডিত, শক্ত ও ক্যারাপেস দিয়ে আবৃত।
৩. ক্যারাপেসের অগ্রভাগে করাতের মতো রোস্ট্রাম আছে।
৪. দুজোড়া অ্যান্টেনা ও বৃন্তযুক্ত একজোড়া পুঞ্জাক্ষি বিদ্যমান।

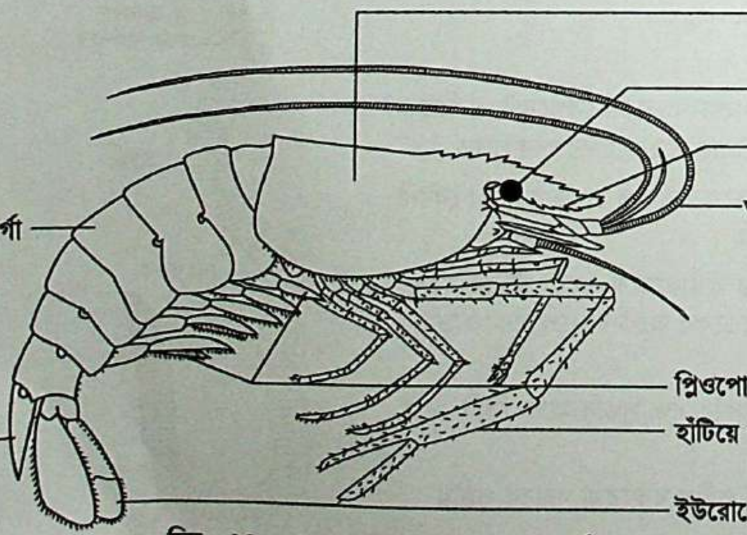

চিত্র : *Macrobrachium malcolmsonii* (পার্শ্বদৃশ্য)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কাঁকড়া—*Portunus pelagicus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Arthropoda
Class—Malacostraca
Order—Decapoda
Family—Portunidae
Genus—*Portunus*
Species—*Portunus pelagicus*

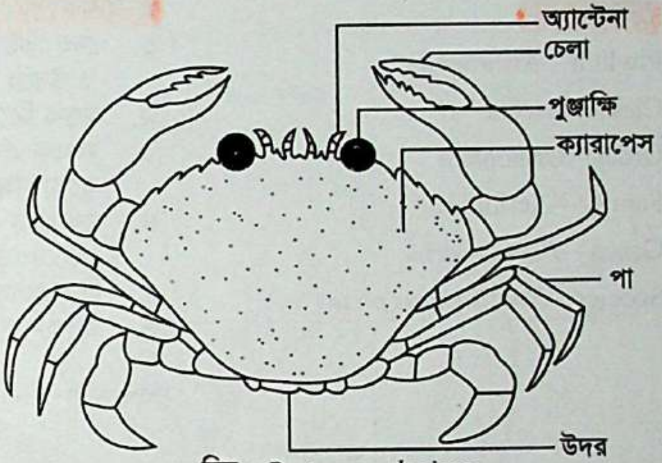

চিত্র : *Portunus pelagicus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ ডিম্বাকার, চাপা ও শক্ত **কিউটিকল**-এ আবৃত।
২. **ক্যারাপেস** সমগ্র দেহ জুড়ে অবস্থিত।
৩. উদর ক্যারাপেসের অংকীয়ভাগে অবস্থিত।
৪. পাঁচজোড়া পায়ের মধ্যে প্রথম জোড়া সুগঠিত চিমটার মতো **চেলাবিশিষ্ট**।
৫. দুজোড়া **অ্যান্টেনা** ও একজোড়া বৃন্তযুক্ত **পুঞ্জাক্ষি** বিদ্যমান।

আরশোলা—*Periplaneta americana*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Arthropoda
Class—Insecta
Order—Dictyoptera
Family—Blattidae
Genus—*Periplaneta*
Species—*Periplaneta americana*

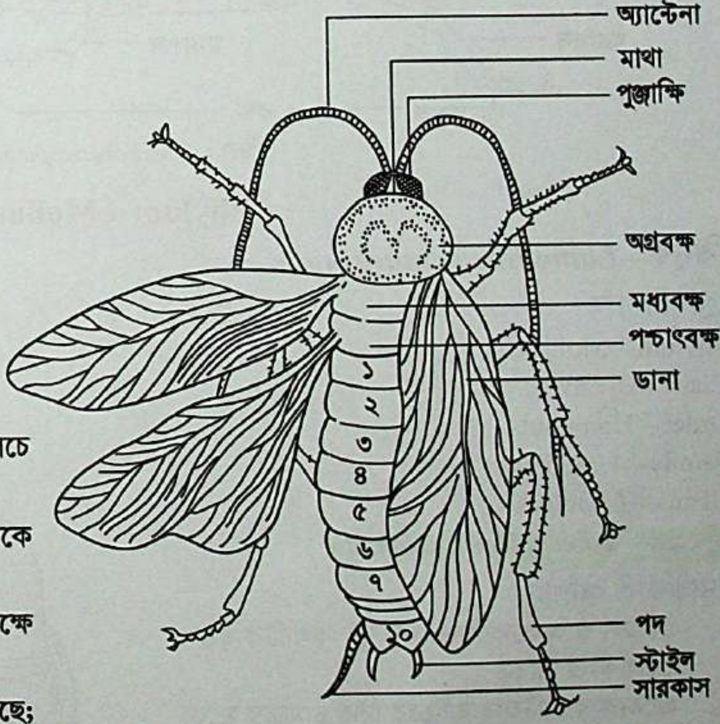

চিত্র : *Periplaneta americana*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ সরু, লম্বাটে, তেলতেলে ও লালচে বাদামী বর্ণের।
২. দেহ **কিউটিকল**-এ আবৃত এবং নির্দিষ্ট খন্ডকে বিভক্ত।
৩. দেহ **মস্তক, বক্ষ** ও **উদর**-এ বিভক্ত; বক্ষে তিনটি ও উদরে ১০টি খন্ড রয়েছে।
৪. মাথায় দুটি **পুঞ্জাক্ষি**, দুটি **অ্যান্টেনা** আছে; বক্ষে তিন জোড়া পদ ও দুজোড়া ডানা রয়েছে।
৫. উদরের শেষ প্রান্তে **অ্যানাল সারকি** (একবচনে-সারকাস) রয়েছে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ঘাস ফড়িং—*Poekilocerus pictus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Arthropoda
Class—Insecta
Order—Orthoptera
Family—Acrididae
Genus—*Poekilocerus*
Species—*Poekilocerus pictus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ কিউটিকলে আবৃত, হলদে-সবুজ রংয়ের এবং মস্তক, বক্ষ ও উদরে বিভক্ত।
২. মস্তক ত্রিকোণাকার ও নিম্নমুখী উল্লম্বভাবে অবস্থিত।
৩. মস্তকে একজোড়া পুঞ্জাক্ষি, ওসেলি ও অ্যান্টেনা এবং **চর্বনক্ষম মুখোপাঙ্গ** রয়েছে।
৪. মধ্যবক্ষে একজোড়া সরু ও শক্ত এবং পশ্চাৎবক্ষে একজোড়া বড়, চওড়া ও ঝিল্লিময় ডানা আছে।
৫. তিন জোড়া **সন্ধিল** পদ রয়েছে।
৬. উদর সরু, লম্বা ও ১১টি খন্ডকে বিভক্ত।

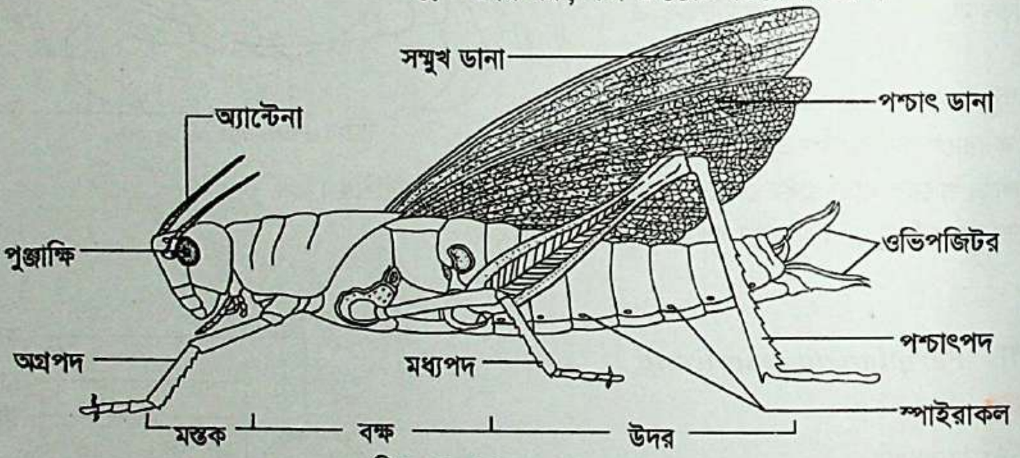

চিত্র : *Poekilocerus pictus*

Phylum – Mollusca

ঝিনুক—*Lamellidens marginalis*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Mollusca
Class—Bivalvia
Order—Unionoida
Family—Unionidae
Genus—*Lamellidens*
Species—*Lamellidens marginalis*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. কোমল ও অখন্ডকায়িত দেহ দুই কপাটিকাযুক্ত খোলক-এ আবৃত।
২. প্রত্যেক কপাটিকার বাইরের দিক চামচের মতো উত্তল ও অভ্যন্তর ভাগ অবতল।
৩. প্রত্যেক কপাটিকা দু'পাশে চাপা, পশ্চাদঅংশ সবচেয়ে বেশি স্থূল এবং কব্জা রেখায় সংযুক্ত।
৪. কব্জা রেখা সংলগ্ন পৃষ্ঠ-পার্শ্বভাগে আম্বো নামে একটি করে উঁচু অংশ আছে।
৫. আম্বোকে ঘিরে বৃদ্ধি রেখা অবস্থিত।

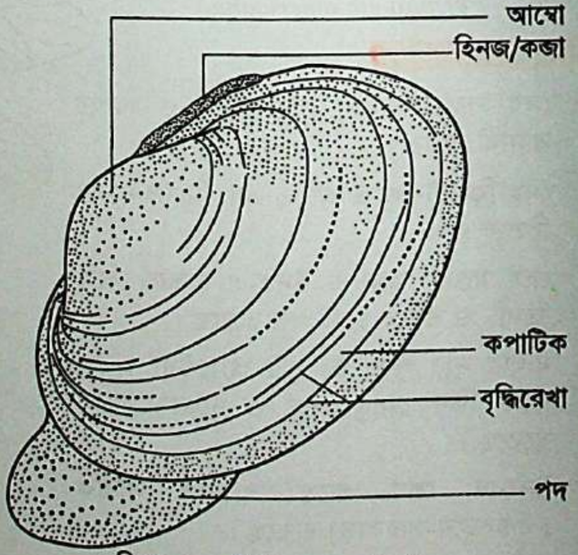

চিত্র : *Lamellidens marginalis*

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

আপেল শামুক—*Pila globosa*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Mollusca
Class—Gastropoda
Order—Mesogastropoda
Family—Pilidae
Genus—*Pila*
Species—*Pila globosa*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. কোমল দেহ একটি আপেল আকৃতির শক্ত খোলক-এ আবৃত।
২. খোলকের পৃষ্ঠদেশ ৪ আবর্তের প্যাঁচযুক্ত এবং শীর্ষে চূড়া অবস্থিত।
৩. খোলকের মুখে বাংলা '৫' সংখ্যার মতো অপারকুলাম নামে একটি ঢাকনা আছে।
৪. খোলকে ও অপারকুলামে বৃদ্ধিরেখা উপস্থিত।
৫. দেহের অঙ্কীয়দেশে মাংসল পিন্ডাকার পদ এবং পদের পৃষ্ঠদেশে অপারকুলাম যুক্ত।

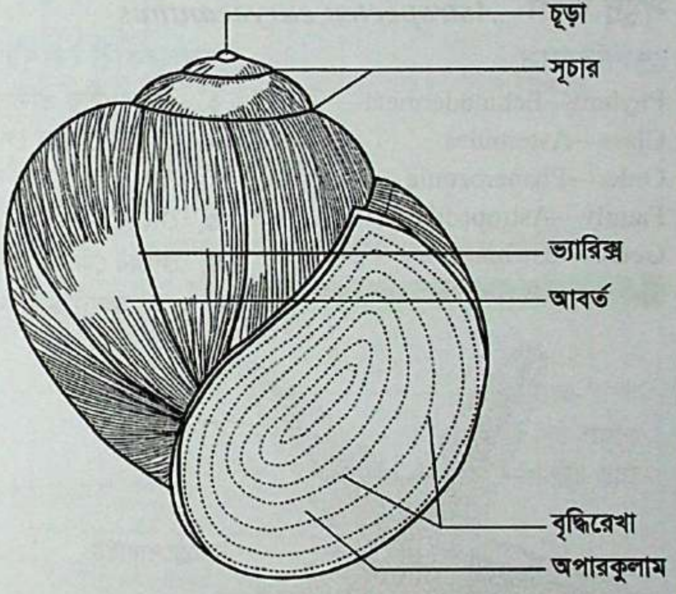

চিত্র : *Pila globosa*

ডেভিল ফিশ—*Octopus macropus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Mollusca
Class—Cephalopoda
Order—Octopoda
Family—Octopodidae
Genus—*Octopus*
Species—*Octopus macropus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১ দেহ ম্যান্টল-এ আবৃত, কোমল, ডিম্বাকার এবং প্রকৃত খোলকবিহীন।
২. মুখছিদ্র ৮টি মৌখিক বাহুতে পরিবৃত।
৩. বাহুগুলো শরীরের চেয়ে লম্বা, একই আকৃতির ও চোষকযুক্ত এবং গোড়ার দিকে পরস্পরের সাথে লিপ্তপাদ (web) দিয়ে যুক্ত।
৪. ডান পাশের ৩য় বাহুটি জননের উদ্দেশ্যে বিশেষ গড়নের (হেক্টোকটিল)।

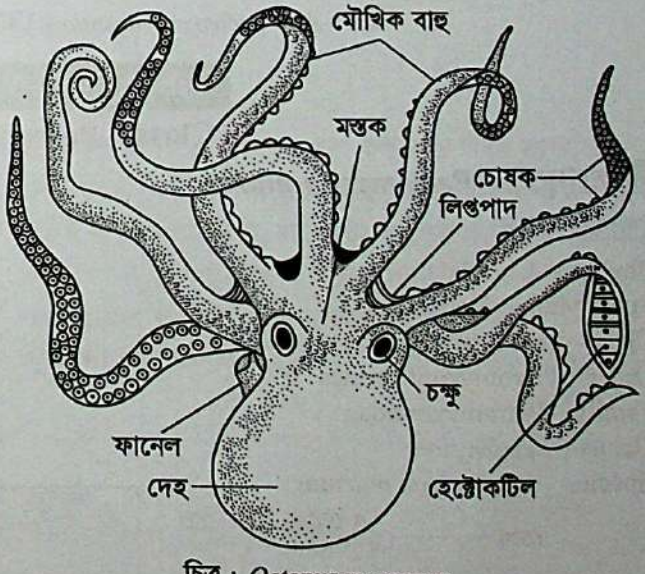

চিত্র : *Octopus macropus*

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Phylum – Echinodermata

সমুদ্র তারা—*Astropecten euryacanthus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Echinodermata
Class—Asteroidea
Order—Phanerozonia
Family—Astropectinidae
Genus—*Astropecten*
Species—*Astropecten euryacanthus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ অরীয় প্রতিসম, চাপা ও তারকাসদৃশ এবং কাঁটাময় ত্বকে আবৃত।
২. দেহের কেন্দ্রে গোল কেন্দ্রীয় চাকতি থেকে পাঁচটি বাহু সমদূরত্বে পাঁচদিকে প্রসারিত।
৩. দেহের বিমৌখিক তলে ম্যাড্রেপোরাইট ও পায়ু রয়েছে।
৪. দেহের মৌখিক তলে প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য বরাবর অ্যাম্বুল্যাক্রাল খাদ আছে।
৫. অ্যাম্বুল্যাক্রাল খাদের উভয় পাশে সারিবদ্ধ নালিকাপদ অবস্থিত।

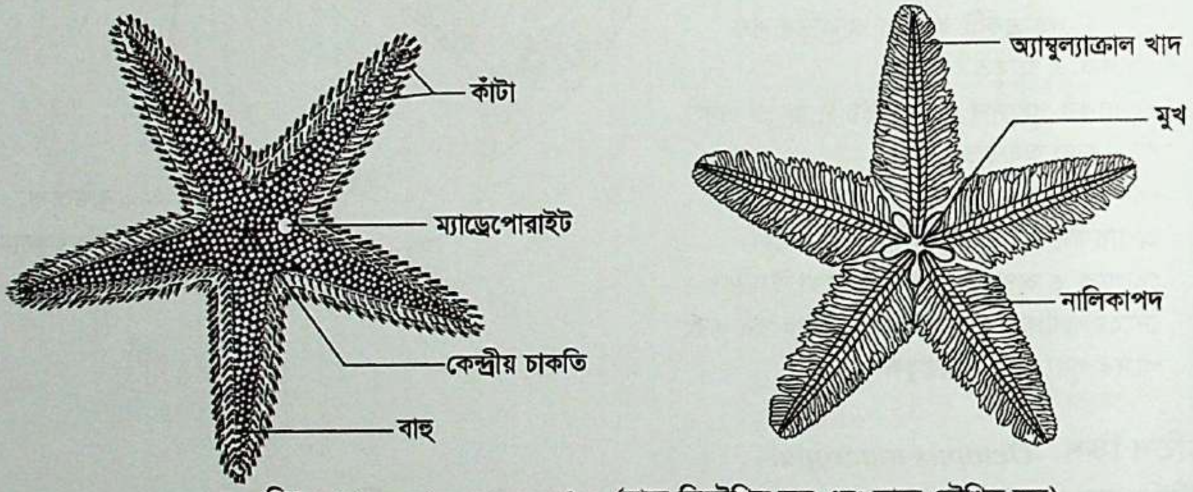

চিত্র : *Astropecten euryacanthus* (বায়ে-বিমৌখিক তল এবং ডানে-মৌখিক তল)

Subphylum–Vertebrata

Class – Petromyzontida

সী ল্যাম্প্রে— *Petromyzon marinus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum—Vertebrata
Class—Petromyzontida
Order—Petromyzontiformes
Family—Petromyzontidae
Genus—*Petromyzon*
Species—*Petromyzon marinus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ নলাকার, আঁইশ ও জোড় পাখনাবিহীন।
২. মুখ চোয়ালবিহীন, তীক্ষ্ণ হর্ণি দাঁত যুক্ত।
৩. সাতজোড়া বৃত্তাকার ফুলকারন্ধ্র অবস্থিত।
৪. দুটি পৃষ্ঠ-পাখনাযুক্ত।

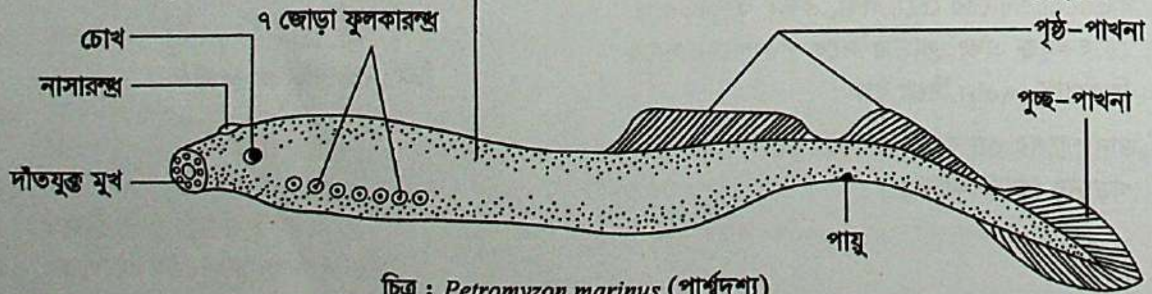

চিত্র : *Petromyzon marinus* (পার্শ্বদৃশ্য)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Class – Chondrichthyes

হাঙর—*Scoliodon laticaudus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum—Vertebrata
Class—Chondrichthyes
Order—Carcharhiniformes
Family—Carcharhinidae
Genus—*Scoliodon*
Species—*Scoliodon laticaudus*
(আগের নাম—*Scoliodon sorrakowah*)

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ লম্বা ও দুপাশে চাপা এবং মস্তক, ধড় ও লেজ অঞ্চলে বিভক্ত।
২. ত্বক প্লাকয়েড আঁইশে আবৃত।
৩. লেজ হেটেরোসার্কাল ধরনের।
৪. মস্তক উপর-নিচে চাপা এবং সম্মুখে সূঁচালো তুন্ডে সমাপ্ত।
৫. মাথার অঙ্কীয়দেশে মুখছিদ্র এবং চোখের পেছনে প্রতিপাশে পাঁচটি করে মোট পাঁচজোড়া ফুলকারন্ধ্র।

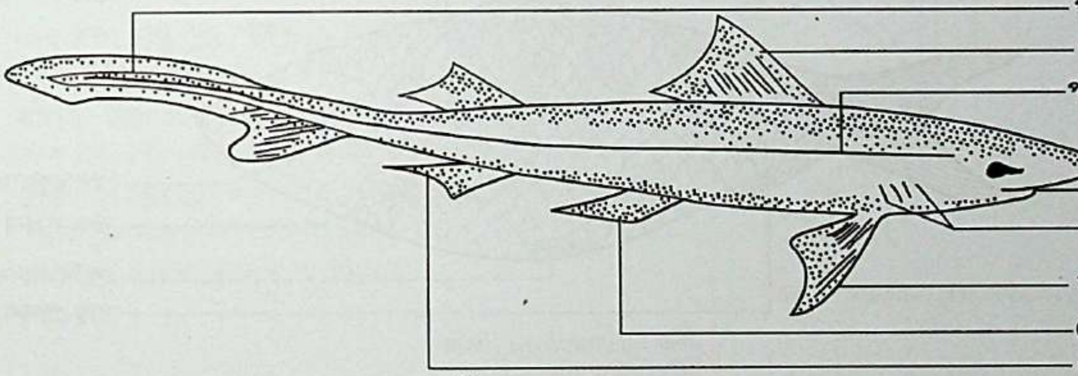

চিত্র : *Scoliodon laticaudus*

Class – Actinopterygii

টাকি মাছ—*Channa punctatus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum —Vertebrata
Class—Actinopterygii
Order—Channiformes
Family—Channidae
Genus—*Channa*
Species—*Channa punctatus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ কালচে ধূসর রঙের, দুপাশ হলদে ও উদর দাগযুক্ত।
২. দেহ লম্বাটে ও নলাকার এবং সাইক্লয়েড আঁইশ-এ আবৃত।
৩. মস্তক উপর-নিচে চাপা, অনেকটা সাপের মতো দেখতে।
৪. পৃষ্ঠ-পাখনা ও পায়ু-পাখনা অনেক লম্বা।
৫. বক্ষ-পাখনা ও শ্রোণি-পাখনা কাছাকাছি অবস্থিত।
৬. পুচ্ছ-পাখনা গোলাকার।

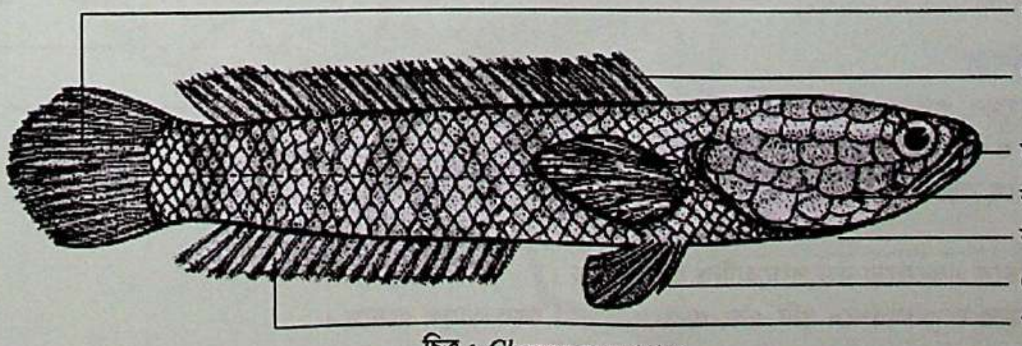

চিত্র : *Channa punctatus*

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ইলিশ মাছ— *Tenualosa ilisha*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum—Vertebrata
Class—Actinopterygii
Order—Clupeiformes
Family—Clupeidae
Genus—*Tenualosa*
Species—*Tenualosa ilisha*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম, চাপা, মাকুর মতো দেহ, ঝকঝকে **রূপালী রঙ**।
২. মাথা বেশ বড় ও চাপা, প্রান্তীয় মুখছিদ্রযুক্ত।
৩. চোখদুটি বেশ বড় ও স্বচ্ছ অ্যাডিপোজ আবরণী দিয়ে ঢাকা।
৪. উপরের চোয়ালের সম্মুখভাগে একটি খাঁজ আছে।
৫. পুচ্ছ-পাখনা হোমোসার্কাল।

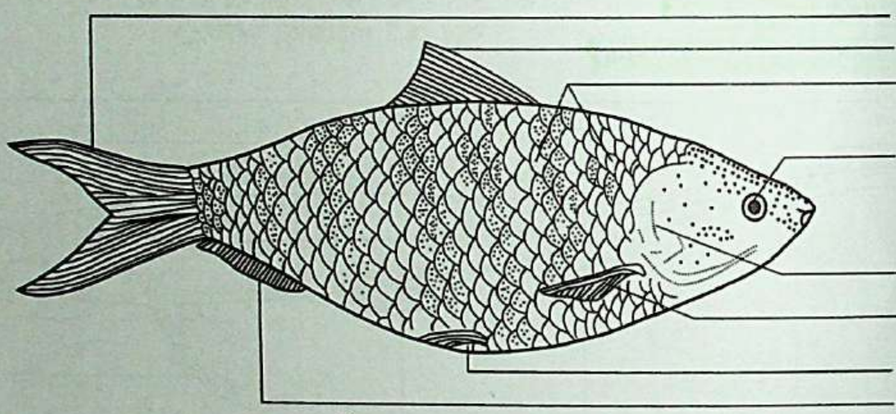

চিত্র : *Tenualosa ilisha*

Class – Amphibia

কুনোব্যাঙ—*Duttaphrynus melanostictus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum—Vertebrata
Class—Amphibia
Order—Anura
Family—Bufonidae
Genus—*Duttaphrynus*
Species—*Duttaphrynus melanostictus*
(আগের নাম—*Bufo melanostictus*)

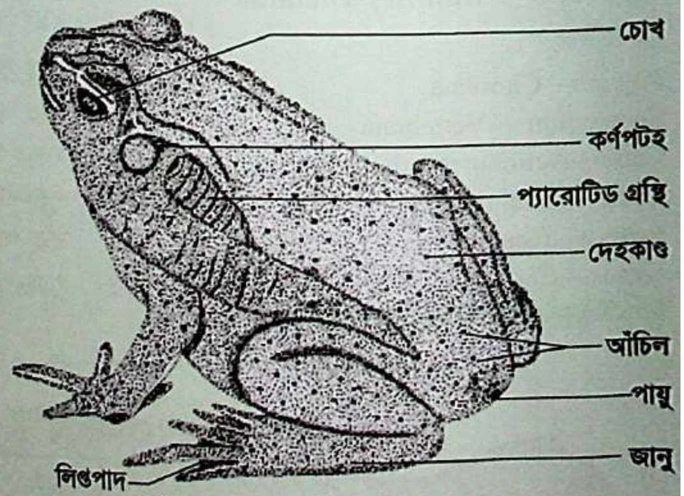

চিত্র : *Duttaphrynus melanostictus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহত্বক অমসৃণ, শুষ্ক ও আঁচিলযুক্ত।
২. দেহ মস্তক ও ধড়-এ বিভক্ত।
৩. মস্তকে রয়েছে বড় ও উঁচু চোখ, নাসারন্ধ্র ও কর্ণপটহ।
৪. চোখের পেছনে একজোড়া বড় প্যারোটিড গ্রন্থি আছে।
৫. দুজোড়া পদের মধ্যে অগ্রপদে ৪টি এবং পশ্চাৎপদে ৫টি করে আঙ্গুল রয়েছে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Class—Reptilia

টিকটিকি—*Hemidactylus brookii*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum—Vertebrata
Class—Reptilia
Order—Squamata
Family—Gekkonidae
Genus—*Hemidactylus*
Species—*Hemidactylus brookii*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ সরু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঁইশ-এ আবৃত এবং তিনটি অংশে বিভক্ত-মাথা, দেহকান্ড ও লেজ।
২. মাথাটি ত্রিকোণাকার এবং একজোড়া চোখ, একজোড়া নাসারন্ধ্র এবং একজোড়া কর্ণপটহ বহন করে।।
৩. দেহকান্ডে দুজোড়া পা আছে। প্রতি পায়ে পাঁচটি করে প্যাডযুক্ত নখরবিশিষ্ট আঙ্গুল আছে।
৪. অবসারণী ছিদ্র আড়াআড়ি অবস্থিত।
৫. লেজ লম্বা।

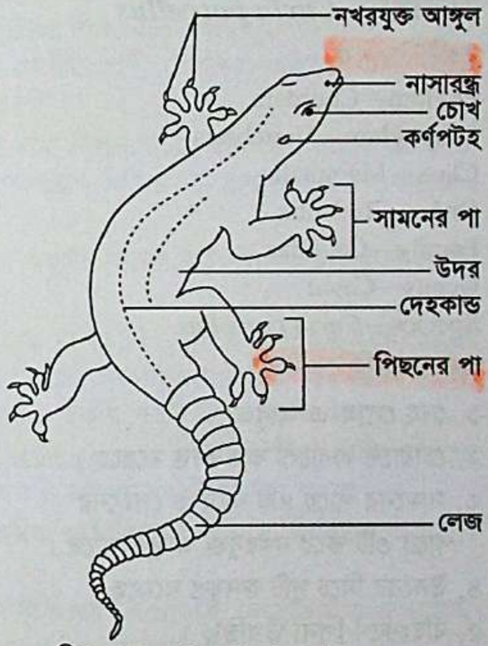

চিত্র : *Hemidactylus brookii*

Class – Aves

দোয়েল পাখি—*Copsychus saularis*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum—Vertebrata
Class—Aves
Order—Passeriformes
Family—Muscicapidae
Genus—*Copsychus*
Species—*Copsychus saularis*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ পালক-এ আবৃত; পালকগুলো সাদা-কালো বর্ণযুক্ত (স্ত্রী দোয়েলে নীলচে-ধূসর)।
২. লেজ বেশ লম্বা ও তির্যকভাবে অবস্থিত।
৩. ডানা লম্বা সাদা দাগসহ কালচে-বাদামি।
৪. লেজ কালো, কিন্তু বাইরের পালক সাদা।
৫. গলা ও বুক নীলচে-কালো (স্ত্রী দোয়েলে নীলচে-ধূসর)।

চিত্র : *Copsychus saularis*

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Class—Mammalia

গিনিপিগ—*Cavia porcellus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum—Vertebrata
Class—Mammalia
Order—Rodentia
Family—Caviidae
Genus—*Cavia*
Species—*Cavia porcellus*

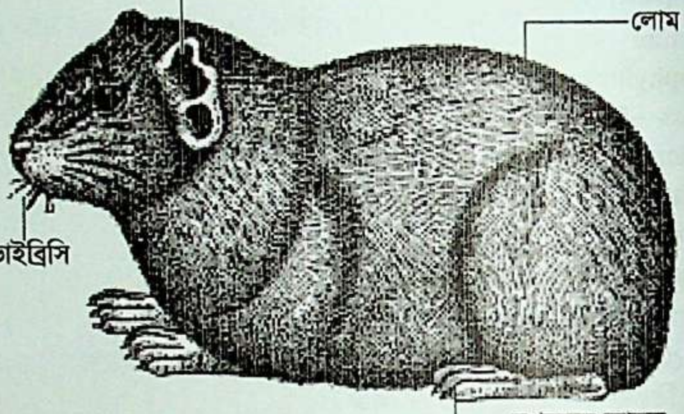

চিত্র : *Cavia porcellus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ লোম-এ আবৃত।
২. চোয়ালে ধারালো কর্তনদন্ত রয়েছে।
৩. সামনের পায়ে ৪টি করে ও পেছনের পায়ে ৩টি করে নখরযুক্ত আঙ্গুল আছে।
৪. উদরের নিচে দুটি স্তনবৃন্ত রয়েছে।
৫. বহিঃকর্ণে পিনা উপস্থিত।

বাদুড় (Fruit Bat)—*Pteropus giganteus*

শ্রেণিবিন্যাস

Phylum—Chordata
Subphylum—Vertebrata
Class—Mammalia
Order—Chiroptera
Family—Pteropodidae
Genus—*Pteropus*
Species—*Pteropus giganteus*

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. দেহ লোমে আবৃত এবং পিনা ও স্তনগ্রন্থিযুক্ত।
২. অগ্রপদের আঙ্গুলগুলো লম্বা ও প্যাটাজিয়াম (patagium) নামক পর্দায় অবলম্বিত হয়ে ডানায় রূপান্তরিত।
৩. বড় আকৃতির, লেজবিহীন বাদুর।
৪. মাথা লালচে বাদামী, তুন্ড কালো।
৫. পায়ের আঙ্গুল বাঁকা ও ধারালো নখরযুক্ত।

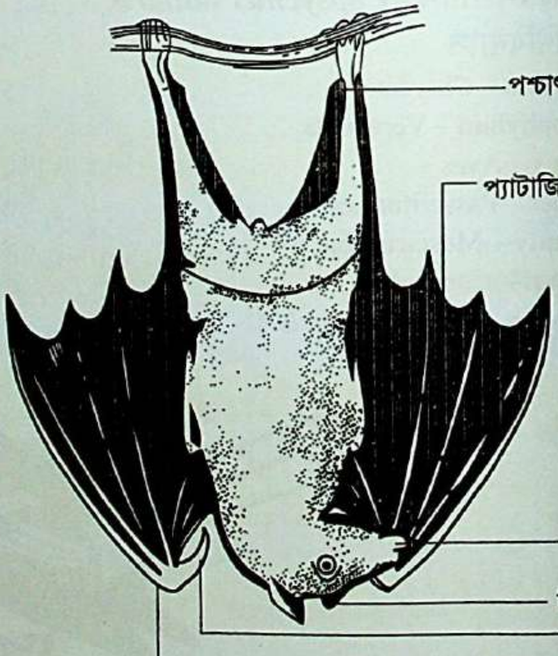

চিত্র : *Pteropus giganteus*

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ট্যাক্সন : ট্যাক্সন হচ্ছে শ্রেণিবদ্ধগত একক। কোনো প্রাণীকে শ্রেণিবিন্যাসের কোনো স্তরে স্থান দিলে সেটি যে নাম প্রাপ্ত হয় তাই ঐ প্রাণীর ট্যাক্সন। যেমন-Mammalia, Primates ইত্যাদি।

ক্যাটাগরি : এটি শ্রেণিবিন্যাসের ধাপ। যে নির্দিষ্ট ধাপে বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রাণী (ট্যাক্সন) অবস্থান করে তাকে ক্যাটাগরি বলে। যেমন-Phylum, Class, Order ইত্যাদি।

প্রজাতি : প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনো জীবগোষ্ঠী যদি নিজেদের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে জননক্ষম সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হয় কিন্তু অন্য কোনো গোষ্ঠীর সাথে প্রজননগতভাবে বিচ্ছিন্ন বা আলাদা থাকে তখন সেই জীবগোষ্ঠীকে প্রজাতি বলে।

দ্বিপদ নামকরণ : জীবের নামকরণে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে গণ ও প্রজাতি নামের দুটি পদ ব্যবহার করে প্রাণীর যে নামকরণ করা হয় তাকে দ্বিপদ নামকরণ বলে।

ত্রিপদ নামকরণ : অনেক সময় একটি প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বৈচিত্র্য বা ভিন্নতা সুস্পষ্ট ও প্রকট হলে তাদের শ্রেণিবিন্যাসে উপ-প্রজাতি পদের প্রয়োজন হয়। উপ-প্রজাতির নামকরণে তিন পদ ব্যবহার করা হয়। প্রথম পদটি গণ-নাম, দ্বিতীয় পদটি প্রজাতি-নাম ও তৃতীয় পদটি উপ-প্রজাতি নাম।

ICZN : International Commission on Zoological Nomenclature. এটি পৃথিবীর প্রাণিসদস্যদের শ্রেণিকরণ ও নামকরণে প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকারী সর্বোচ্চ সংস্থা।

লিনিয়ান হায়ারার্কি : প্রাণী শ্রেণিবিন্যাসে ব্যবহৃত বিভিন্ন স্তরবিশিষ্ট অনুক্রমিক শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো লিনিয়ান হায়ারার্কি নামে পরিচিত।

ভ্রূণস্তর : একটি প্রাণিভ্রূণে গ্যাস্ট্রুলেশন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট তিনটি মৌলিক স্তর (এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্ম) যা থেকে প্রাণীর বিভিন্ন অঙ্গ ও টিস্যু সৃষ্টি হয় সেই স্তরগুলির নাম ভ্রূণস্তর।

খণ্ডকায়ন : সদৃশ দেহখণ্ডের রৈখিক বা অনুদৈর্ঘ্যিক পুনরাবৃত্তিকে খণ্ডকায়ন বা মেটামেরিজম বলে।

প্রতিসাম্য : অক্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সুষম বণ্টনকে প্রতিসাম্য বলে।

সিলোম : পৌষ্টিকনালি ও দেহপ্রাচীরের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান, যা মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়ামে আবৃত থাকে তাকে সিলোম বলে।

অঞ্চলায়ন : কিছু প্রাণিদেহ বাহ্যিকভাবে খণ্ডায়িত হলেও অনেকক্ষেত্রে খণ্ডগুলো স্পষ্ট নয়। বরং খণ্ডকগুলো একত্রে মিলিত হয়ে দেহে সুনির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চল বা ট্যাগমায় বিভক্ত হয়। এ ধরনের বিভাজনকে অঞ্চলায়ন বা ট্যাগমাটাইজেশন বলে।

পলিপ : Cnidaria-র জীবনচক্রের নিশ্চল দশাকে পলিপ বা অযৌন দশা বলে। এর দণ্ডাকার দেহের একপ্রান্ত ভিত্তির সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং অন্যপ্রান্ত কর্ষিকায় ঘেরা মুখছিদ্র বহন করে।

মেডুসা : Cnidaria-র জীবনচক্রের সাঁতারু দশাকে মেডুসা বা যৌন দশা বলে।

সিলেন্টেরন : Cnidaria পর্বের প্রাণীর দেহের অভ্যন্তরে যে লম্বাকার একটি গহ্বর থাকে তাকে সিলেন্টেরন বা গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর বলে।

নিডোসাইট : Cnidaria পর্বের প্রাণীর এপিডার্মিসে অবস্থিত নেমাটোসিস্ট বহনকারী, শিকার ধরা ও আত্মরক্ষায় সাহায্যকারি বিশেষ ধরনের কোষ হচ্ছে নিডোসাইট।

নেফ্রিডিয়া : Annelida পর্বের প্রাণিদের রেচন অঙ্গকে নেফ্রিডিয়া বলে।

পুঞ্জাক্ষী : Arthropoda পর্বের প্রাণিদের মস্তকের একজোড়া উত্তল, কালো অংশকে পুঞ্জাক্ষী বলে।

সাইক্লয়েড আঁইশ : যে ধরনের আঁইশ চাকতির মতো, প্রায় গোলাকার এবং মসৃণ কিনারাযুক্ত হয়, সে ধরনের আঁইশকে সাইক্লয়েড আঁইশ বলে। যেমন- রুই, কাতল, মৃগেল, ইলিশ ইত্যাদি মাছের আঁইশ।

ডায়াফ্রাম : যে মাংসল স্থিতিস্থাপক অনুপ্রস্থ পর্দা স্তন্যপায়ী প্রাণীর বক্ষ গহ্বরকে উদর গহ্বর থেকে পৃথক করে রাখে তার নাম ডায়াফ্রাম। এটি প্রাণীর শ্বাসকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL BDNIYOG.COM COPYRIGHT

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২ প্রাণীর পরিচিতি
Animal Identity

বৈচিত্র্যময় এ পৃথিবীতে নানা ধরনের প্রাণীর বাস। বৈচিত্র্য রয়েছে এদের বসতি, গঠন, চলন, খাদ্যগ্রহণ, আচার-ব্যবহার, প্রজনন ইত্যাদিতে। এসব প্রাণীর মধ্যে কোনটা সরল প্রকৃতির কেউ জটিল গঠনের অধিকারী। এ অধ্যায়ে আমরা হাইড্রা, ঘাসফড়িং এবং রুই মাছ সম্বন্ধে আলোচনা করব। প্রাণিজগত সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে হলে প্রাণীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। প্রাণিজগতের সকল সদস্যকে আলাদাভাবে অধ্যয়ন করা সম্ভব নয়। এজন্য বেশি সাদৃশ সম্পন্ন প্রাণিদের নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন পর্ব। এসব পর্বের একটি প্রাণী সম্পর্কে অধ্যয়ন করে সার্বিকভাবে সকল প্রাণীর পরিচিতি লাভ করা যায়।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

❑ দ্বিস্তরী প্রাণী	❑ সিলেন্টেরন
❑ মেসোগ্লিয়া	❑ নেমাটোসিস্ট
❑ মুকুলোদগম	❑ মিথোজীবিতা
❑ অ্যান্টেনা	❑ পুঞ্জাক্ষি
❑ ওমাটিডিয়া	❑ র‍্যাবডোম
❑ ওভিপজিটর	❑ ওভারিওল
❑ ডায়াপজ	❑ রূপান্তর
❑ স্ট্রীমলাইন্ড	❑ বৃদ্ধিরেখা
❑ ভেনাস হার্ট	❑ ফুলকা
❑ বায়ুথলি	❑ রেণুপোনা
❑ মৎস্য খনি	❑ মৎস্য অভয়াশ্রম

পিরিয়ড সংখ্যা-২৫ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. হাইড্রার গঠন (দেহপ্রাচীরের কোষের বৈশিষ্ট্যসহ) বর্ণনা করতে পারবে। ২. হাইড্রার খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ৩. হাইড্রার চলন ও জনন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ৪. হাইড্রার মিথোজীবিতা বর্ণনা করতে পারবে। ৫. ব্যবহারিক-হাইড্রা পর্যবেক্ষণ করে চিত্র অঙ্কন করতে পারবে। ৬. ঘাসফড়িং-এর গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ৭. ঘাসফড়িং-এর পরিপাকতন্ত্র ও পরিপাক পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ৮. ব্যবহারিক-ঘসিফড়িং/ আরশোলার মুখোপাঙ্গ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে। ঘাসফড়িং/আরশোলা ব্যবচ্ছেদ করে এর পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ শনাক্ত করতে পারবে। ৯. ঘাসফড়িং-এর সংবহন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১০. ঘাসফড়িং-এর শ্বসন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১১. ঘাসফড়িং-এর রেচন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১২. ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষির গঠন ও দর্শন কৌশল পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১৩. ঘাসফড়িং-এর প্রজনন প্রক্রিয়া ও রূপান্তর পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবে। ১৪. রুই মাছের গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ১৫. রুই মাছের রক্ত সংবহনতন্ত্রের বর্ণনা করতে পারবে। ১৬. ব্যবহারিক- রুই/কাতলা/মৃগেল মাছ ব্যবচ্ছেদ করে রক্ত সংবহনতন্ত্র শনাক্ত এবং চিত্র অংকন করতে পারবে। ১৭. রুই মাছের শ্বসন ও বায়ুথলির গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ১৮. ব্যবহারিক : রুই/কাতলা/মৃগেল মাছের শ্বসনতন্ত্র ব্যবচ্ছেদ করে ফুলকা ও পটকা (বায়ুথলি) শনাক্ত করতে পারবে। ১৯. প্রকৃতিতে রুই মাছের প্রজনন ও নিষেক বর্ণনা করতে পারবে। ২০. রুই জাতীয় মাছের সংরক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● হাইড্রা (*Hydra*) ○ গঠন (দেহপ্রাচীরের কোষের বৈশিষ্ট্যসহ) ○ খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া ○ চলন ও জনন ○ মিথোজীবিতা ● ব্যবহারিক ○ হাইড্রার স্থায়ী স্লাইড/মডেল পর্যবেক্ষণ ● ঘাসফড়িং (*Poekilocerus pictus*) ○ গঠন (বাহ্যিক) ○ পরিপাকতন্ত্র-মুখ উপাঙ্গ, পরিপাক গ্রন্থি ● ব্যবহারিক ○ ঘাসফড়িং/আরশোলার মুখ উপাঙ্গ ○ ঘাসফড়িং/আরশোলার পরিপাকতন্ত্র ও গ্রন্থি পর্যবেক্ষণ ● ঘাসফড়িং ○ সংবহন পদ্ধতি ○ শ্বসন পদ্ধতি ○ রেচন পদ্ধতি ○ প্রজনন প্রক্রিয়া ও রূপান্তর ● ঘাসফড়িং এর পুঞ্জাক্ষি ○ গঠন ○ দর্শন কৌশল ● রুই মাছ (*Labeo*) ○ দেহ গঠন ○ রক্ত সংবহন ○ শ্বসন ● ব্যবহারিক ○ রুই/কাতলা/মৃগেল মাছের শ্বসনতন্ত্র, ফুলকা ও বায়ুথলি পর্যবেক্ষণ ○ জীবনচক্র ○ সংরক্ষণ (প্রাকৃতিক)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২.১ প্রতীক প্রাণী : *Hydra*

Hydra হচ্ছে নিডারিয়া (Cnidaria) পর্বভুক্ত সরল গড়নের জলজ প্রাণী। প্রাণিজগতের দুটি পর্ব দ্বিস্তরী বা ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণী (diploblastic animal) নামে পরিচিত। একটি হচ্ছে নিডারিয়া, অন্যটি টিনোফোরা (Ctenophora)। সুইজারল্যান্ডের প্রকৃতিবিজ্ঞানি আব্রাহাম ট্রেম্বলে (Abraham Trembley, 1710-1784)। ১৭৪৪ সালে হাইড্রার প্রচন্ড পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা প্রকাশের মাধ্যমে এর প্রাণিপ্রকৃতিকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যার ফলে হাইড্রার ব্যাপক পরিচিতি ঘটে। ১৭৫৮ সালে ক্যারোলাস লিনিয়াস (Carolus Linnaeus, 1707-1778) এর নাম দেন *Hydra*। গ্রিক রূপকথার নয় মাথাওয়ালা ড্রাগনের নামানুসারে *Hydra*-র নামকরণ করা হয়। ঐ ড্রাগনটির একটি মাথা কাটলে তার বদলে দুই বা তার বেশি মাথা গজাতো। *Hydra* ঐ ড্রাগনের মতো হারানো বা ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনরায় সৃষ্টি করতে পারে, তাই অনেক সময় বহু মাথাওয়ালা সদস্য আবির্ভূত হয়। মহাবীর হারকিউলিস (Hercules) অবশেষে এ দানবকে বধ করেন।

চিত্র ২.১.১ : হাইড্রা ড্রাগন

বাংলাদেশে *Hydra*-র বিভিন্ন প্রজাতি

বর্তমানে পৃথিবীতে *Hydra*-র প্রজাতি-সংখ্যা ৪০টির মতো। গায়ের রং, কর্ষিকার সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য এবং জননাঙ্গের অবস্থান ও আকৃতির ভিত্তিতে হাইড্রার শ্রেণিবিন্যাস করা হয়। ২০০৮ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশের উদ্ভিদ ও প্রাণী জ্ঞানকোষের চতুর্দশ খণ্ডের (Bangladesh Encyclopedia of Flora and Fauna, vol. 14) তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ৩ প্রজাতির হাইড্রার উল্লেখ পাওয়া যায়: ১. বাদামী বর্ণের *Hydra oligactis* (=*H. fusca*), ২. সবুজ বর্ণের *Hydra viridissima* (=*H. viridis, Chlorohyda viridissima*) এবং ৩. বর্ণহীন বা হলুদ-বাদামী *Hydra vulgaris*।

চিত্র ২.১.২ : *Hydra vulgaris* (প্রাকৃতিক পরিবেশে)

বিভিন্ন প্রজাতির *Hydra*-র মধ্যে বাংলাদেশে *Hydra vulgaris* সুলভ বলে এখানে এ প্রজাতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বাসস্থান ও স্বভাব : *Hydra* একটি একক মুক্তজীবী প্রাণী। মিঠাপানিতে (খাল, বিল, পুকুর, হ্রদ, ঝর্ণা) নিমজ্জিত কঠিন বস্তু এবং জলজ উদ্ভিদের পাতার নিম্নপৃষ্ঠে সংলগ্ন থেকে নিম্নমুখী হয়ে ঝুলে থাকে। স্থির, শীতল ও পরিষ্কার পানিতে এদের বেশি পাওয়া যায়। ঘোলা, উষ্ণ ও চলমান পানিতে এদের খুব কম পাওয়া যায়। ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেহ ও কর্ষিকাকে সর্বোচ্চ প্রসারিত করে পানিতে দুলতে থাকে। কোন কিছুর সংস্পর্শে দেহকে সঙ্কুচিত করে ফেলে। এরা মাংসাশী (অর্থাৎ অন্য কোনো প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করে)। কর্ষিকার সাহায্যে খাদ্য গ্রহণ করে। চলাফেরা করে দেহের সংকোচন-প্রসারণ ও কর্ষিকার সাহায্যে। দেহপ্রাচীরের মাধ্যমে ব্যাপন (diffusion) প্রক্রিয়ায় শ্বসন ও রেচন সম্পন্ন করে। মুকুলোদগম ও দ্বিবিভাজনের মাধ্যমে অযৌন জনন এবং জননকোষ সৃষ্টির মাধ্যমে যৌন জনন সম্পন্ন করে। ***Hydra*-র পুনরুৎপত্তি** (regeneration) ক্ষমতা প্রচন্ড।

শ্রেণিতাত্ত্বিক অবস্থান (Systematic Position)

Kingdom : Animalia (প্রাণী)
Phylum : Cnidaria (নিডোসাইট ও সিলেন্টেরন উপস্থিত)
Class : Hydrozoa (অবিভক্ত সিলেন্টেরন)
Order : Hydroida (পলিপ দশা প্রধান)
Family : Hydridae (এককভাবে বসবাস করে)
Genus : *Hydra* (পুনরুৎপত্তি ক্ষমতাসম্পন্ন)
Species : *Hydra vulgaris*

Hydra-র বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য

আকার-আকৃতি : *Hydra*-র দেহ নরম ও অনেকটা নলাকার। দেহের একপ্রান্ত খোলা (ওরাল বা মৌখিক প্রান্ত) এবং অপরপ্রান্ত বন্ধ (অ্যাবওরাল বা বিমৌখিক প্রান্ত)। খোলা প্রান্তে মুখছিদ্র অবস্থিত, আর বন্ধ প্রান্তটি কোনো বস্তুর সাথে যুক্ত থাকে। দেহ অরীয় প্রতিসম (radial symmetry) এবং ১০ থেকে ৩০ মিলিমিটার পর্যন্ত লম্বা ও প্রায় ১ মিলিমিটার চওড়া।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বর্ণ : প্রজাতিভেদে *Hydra*-র বর্ণ বিভিন্ন হয়ে থাকে। *Hydra vulgaris* প্রায় বর্ণহীন (হালকা হলুদ–বাদামী), তবে গৃহীত খাদ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ণ বৈষম্য দেখা যায়।

বহির্গঠন : একটি পরিণত *Hydra*-র দেহকে প্রধানত তিনটি অংশে ভাগ করা যায় : **১. হাইপোস্টোম, ২. দেহকান্ড ও ৩. পদতল বা পাদ-চাকতি**। নিচে এসব অংশের বর্ণনা দেয়া হলো।

১. হাইপোস্টোম (Hypostome) : এটি দেহের মুক্ত প্রান্তে অবস্থিত, মোচাকৃতি, ছোট ও সংকোচন-প্রসারণশীল অংশ। এর চূড়ায় বৃত্তাকার **মুখছিদ্র** অবস্থিত। মুখছিদ্রপথে খাদ্য গৃহীত ও অপাচ্য অংশ বহিষ্কৃত হয়।

২. দেহকান্ড (Trunk) : হাইপোস্টোমের নিচ থেকে পাদ-চাকতির উপর পর্যন্ত সংকোচন- প্রসারণশীল অংশটি দেহকাণ্ড। এতে নিচে বর্ণিত অংশগুলো পাওয়া যায়।

- **কর্ষিকা** (Tentacle) : হাইপোস্টোমের গোড়ার চতুর্দিক ঘিরে ৬-১০টি সরু, সংকোচনশীল, দেহ অপেক্ষা লম্বা ও ফাঁপা সুতার মতো কর্ষিকা অবস্থিত। কর্ষিকার বহিঃপ্রাচীরে অসংখ্য ছোট টিউমারের মতো **নেমাটোসিস্ট ব্যাটারী** (nematocyst battery) থাকে। প্রত্যেক ব্যাটারীতে থাকে কয়েকটি করে বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট। কর্ষিকা ও নেমাটোসিস্ট পারস্পরিক সহযোগিতায় আহার সংগ্রহ, চলন এবং আত্মরক্ষায় অংশ নেয়।

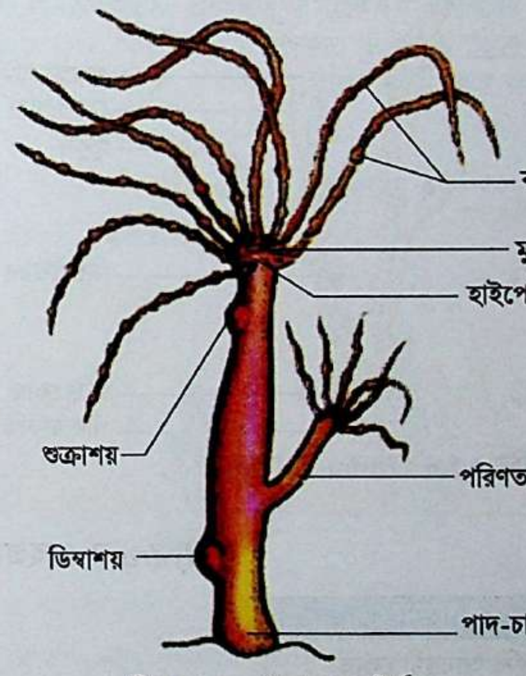

চিত্র ২.১.৩ : *Hydra*-র বহির্গঠন

- **মুকুল** (Bud) : গ্রীষ্মকালে যখন পর্যাপ্ত আহার পাওয়া যায় তখন মুকুল সৃষ্টিরও অনুকূল সময়। এমন পরিবেশে দেহের প্রায় মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে এক বা একাধিক মুকুল সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক মুকুল একেকটি নতুন সদস্যের জন্ম দেয়। মুকুলোদগম *Hydra*-র অন্যতম অযৌন জনন প্রক্রিয়া।
- **জননাঙ্গ** (Gonad) : হেমন্ত ও শীতকালে দেহকাণ্ডের উপরের অর্ধাংশে এক বা একাধিক কোণাকার **শুক্রাশয়** (testes) এবং নিচের অর্ধাংশে এক বা একাধিক গোলাকার **ডিম্বাশয়** (ovaries) নামক অস্থায়ী জননাঙ্গ দেখা যায়। জননাঙ্গ যৌন জননে অংশগ্রহণ করে।

৩. পাদ-চাকতি (Pedal disc) : দেহকাণ্ডের নিম্নপ্রান্তে অবস্থিত গোল ও চাপা অংশটি পাদ-চাকতি বা পদতল। পাদ-চাকতি থেকে ক্ষরিত আঠাল রসের সাহায্যে প্রাণী কোনো তলের সাথে লেগে থাকে। এ চাকতি **বুদবুদ** (bubble) সৃষ্টি করে প্রাণীকে ভাসিয়ে রাখতেও সাহায্য করে। চাকতির ক্ষণপদ গঠনকারী কোষের সাহায্যে **গ্লাইডিং চলন** সম্পন্ন হয়।

দ্বিস্তরী বা দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী (Diploblastic animal)

ভ্রূণাবস্থায় যেসব প্রাণীর দেহপ্রাচীরের কোষগুলো কেবল **এক্টোডার্ম** ও **এন্ডোডার্ম** নামক দুটি নির্দিষ্ট স্তরে বিন্যস্ত থাকে, সেগুলোকে **দ্বিস্তরী বা দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী** বলে। পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে স্তরদুটি যথাক্রমে **এপিডার্মিস** ও **গ্যাস্ট্রোডার্মিস**-এ পরিণত হয়। এই দুই স্তরের মাঝখানে **মেসোগ্লিয়া** নামক **অকোষীয়** ও **জেলির মতো** (কখনও কিছু কোষ ও তন্তুযুক্ত) একটি স্তর থাকে। *Hydra* দ্বিস্তরী বা ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণীর এক আদর্শ উদাহরণ।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Hydra -র অন্তর্গঠন (Internal Structure of Hydra)

Hydra দ্বিভ্রূণস্তরী (diploblastic) প্রাণী অর্থাৎ এর ভ্রূণাবস্থার এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম কোষীয় স্তরদুটি পরিণত দেহে এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস নামক দুটি কোষস্তরে পরিবর্তিত হয়ে বিন্যস্ত থাকে। এ দুটি কোষস্তরের মাঝে মেসোগ্লিয়া (mesoglea) নামে একটি অকোষীয় জেলির মতো স্তর থাকে। *Hydra*-র দেহ মূলত দেহপ্রাচীর ও কেন্দ্রীয় পরিপাকসংবহন গহ্বর (gastrovascular cavity) বা সিলেন্টেরন (coelenteron) নিয়ে গঠিত।

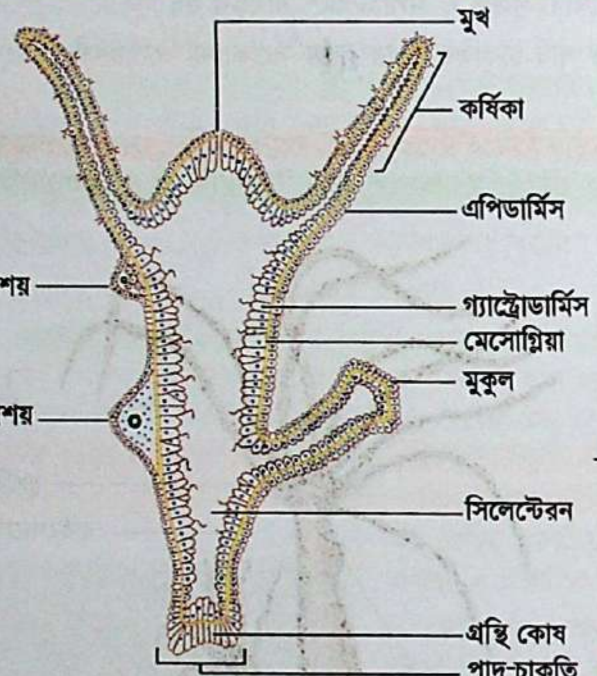

চিত্র ২.১.৪ : *Hydra*--র লম্বচ্ছেদ

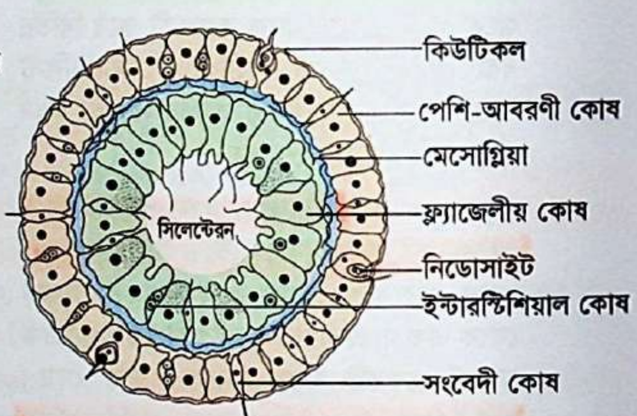

চিত্র ২.১.৫ : *Hydra*--র প্রস্থচ্ছেদ

Hydra-র দেহপ্রাচীরের কোষসমূহ

কোষসমূহ
১. পেশি-আবরণী কোষ ২. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ ৩. সংবেদী কোষ ৪. স্নায়ু কোষ ৫. গ্রন্থি কোষ ৬. জনন কোষ এবং ৭. নিডোসাইট
কোন কোষস্তর নয়, একে সংযোগকারী স্তর বলা হয়।
১. পুষ্টি কোষ ২. গ্রন্থি কোষ ৩. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ, ৪. সংবেদী কোষ এবং ৫. স্নায়ু কোষ।

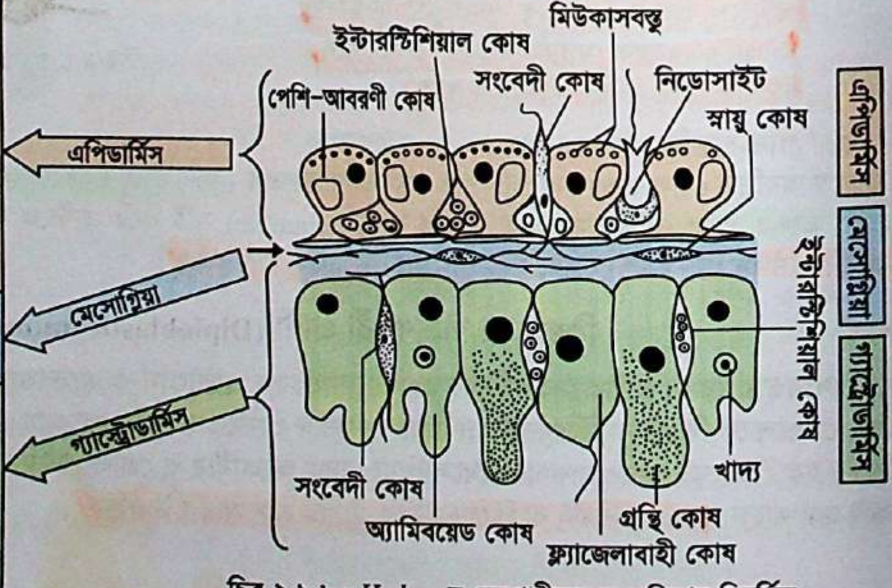

চিত্র ২.১.৬ : *Hydra*--র দেহপ্রাচীরের অংশবিশেষ বিবর্ধিত

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

এপিডার্মিস (বা বহিঃত্বক)–এর কোষসমূহ

কাজের ভিন্নতা অনুযায়ী *Hydra*-র এপিডার্মিসের কোষের গঠনে বৈচিত্র্য দেখা যায়। একটি পাতলা ও নমনীয় কিউটিকল (cuticle)-এ আবৃত এপিডার্মিস *Hydra*-র বহিরাবরণ গঠন করে। *Hydra*-র এপিডার্মিস নিচে বর্ণিত সাত ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত।

১. পেশি-আবরণী কোষ (Musculo-Epithelial cell) : এপিডার্মিসের সম্পূর্ণ অংশ জুড়ে এ কোষ অবস্থান করে। বহির্মুখী চওড়া ও অন্তর্মুখী সরু প্রান্তবিশিষ্ট এ কোষগুলো দেখতে কোণাকার। এগুলোর চওড়া প্রান্ত গহ্বরযুক্ত সাইটোপ্লাজোমে পূর্ণ, মিউকাস-বস্তুযুক্ত এবং পরস্পর মিলিত হয়ে একটি অভিন্ন আবরণ গঠন করে। ভিতরের সরু প্রান্তের শেষে মায়োনিম (এক ধরনের নমনীয় ও সংকোচন-প্রসারণশীল তন্তু) নির্মিত দুটি পেশি-প্রবর্ধন দেহ অক্ষের সমান্তরালে অবস্থান করে। কর্ষিকায় কোষগুলো বেশ বড় ও চাপা এবং কয়েকটি করে নিডোব্লাস্ট (পরিস্ফুটনরত নিডোসাইট) ধারণ করে।

কাজ : আবরণী কোষের মতো দেহাবরণ সৃষ্টি করে দেহকে রক্ষা করে। প্রবর্ধনগুলো সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে দেহের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে পেশির মতো কাজ করে। মিউকাস দানা কিউটিকল ক্ষরণ করে ও দেহ পিচ্ছিল রাখে। কোষগুলো একাধিক নেমাটোসিস্ট বহন করে। একদিকে দেহাবরণ হিসেবে, অন্যদিকে পেশির মতো কাজ করে বলে এসব কোষকে ''পেশি-আবরণী কোষ'' বলা হয়ে থাকে।

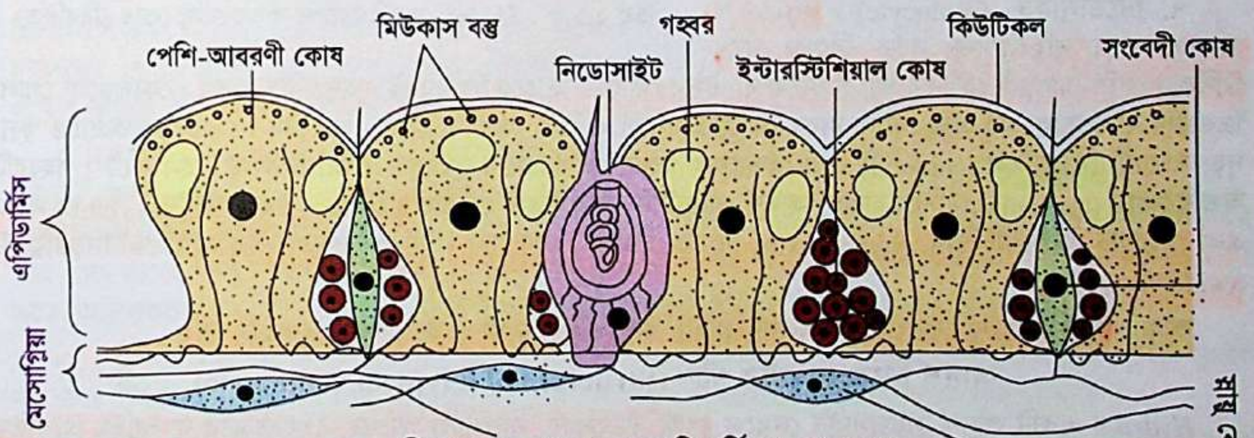

চিত্র ২.১.৭ : *Hydra*--র এপিডার্মিসের কোষসমূহ

২. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ (Interstitial cell) : পেশি-আবরণী কোষের অন্তর্মুখী সরু প্রান্তের ফাঁকে ফাঁকে, গুচ্ছাকারে, মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে এসব কোষ অবস্থান করে। এগুলো গোল বা তিনকোণা এবং সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস, মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা, রাইবোজোম ও কিছু মাইটোকন্ড্রিয়া যুক্ত।

কাজ : এসব কোষ প্রয়োজনে অন্য যে কোনো ধরনের বহিঃত্বকীয় কোষে পরিণত হয়; পুনরুৎপত্তি ও মুকুল সৃষ্টিতে অংশ নেয় এবং কিছুদিন পরপর অন্যান্য কোষে পরিণত হয়ে দেহের পুরনো কোষের স্থান পূরণ করে।

৩. সংবেদী কোষ (Sensory cell) : এগুলো পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে, সমকোণে ও বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো থাকে, তবে কর্ষিকা, হাইপোস্টোম ও পদতলের চারদিকে বেশি দেখা যায়। প্রতিটি কোষ লম্বা ও সরু। এর মুক্ত প্রান্ত থেকে সূক্ষ্ম সংবেদী রোম (sensory hair) বেরোয় এবং অপর প্রান্ত থেকে গুটিকাময় বা নোডিওলযুক্ত (nodulated) সূক্ষ্ম তন্তু নির্গত হয়ে স্নায়ুতন্তুর সাথে যুক্ত হয়।

কাজ : পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উদ্দীপনা (যেমন আলো, তাপ প্রভৃতি) গ্রহণ করে স্নায়ুকোষে সরবরাহ করে।

৪. স্নায়ু কোষ (Nerve cell) : এসব কোষ মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে অবস্থিত, অনিয়ত আকারবিশিষ্ট এবং একটি ক্ষুদ্র কোষদেহ ও দুই বা ততোধিক লোডিওলযুক্ত সূক্ষ্ম শাখান্বিত স্নায়ুরোম নিয়ে গঠিত। তন্তুগুলো পরস্পর মিলে স্নায়ু-জালিকা গঠন করে।

কাজ : সংবেদী কোষে সংগৃহীত উদ্দীপনা দেহের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৫. গ্রন্থি কোষ (Gland cell) : এগুলো ক্ষরণকারী দানাবিশিষ্ট এক ধরনের পরিবর্তিত লম্বাকার এপিডার্মাল কোষ মুখছিদ্রের চারদিকে ও পাদ-চাকতিতে এদের প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

কাজ : মিউকাস ক্ষরণ করে দেহকে কোনো বস্তুর সঙ্গে লেগে থাকতে সাহায্য করে; বুদবুদ সৃষ্টি করে ভাসতে সাহায্য করে; ক্ষণপদ সৃষ্টির মাধ্যমে চলনে অংশগ্রহণ করে এবং মুখছিদ্রের গ্রন্থিকোষের ক্ষরণ খাদ্য গলাধঃকরণে সাহায্য করে।

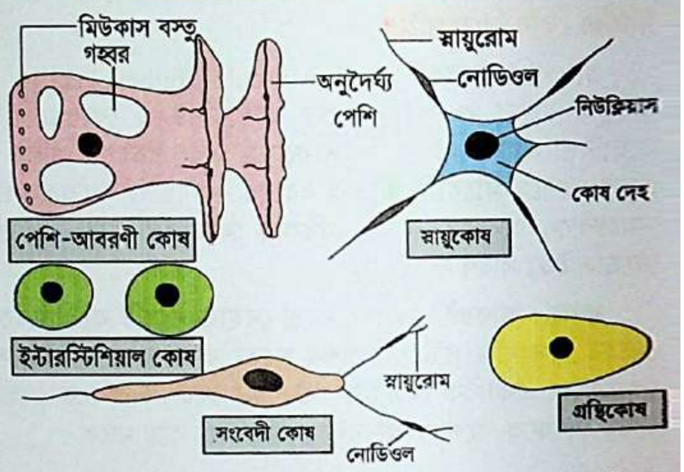

চিত্র ২.১.৮ : *Hydra*--র বহিঃত্বকের কতকগুলো কোষ (বিবর্ধিত)

৬. জনন কোষ (Germ cell) : এসব কোষ জননাঙ্গে অবস্থান করে। জননকোষ দুধরনের: **শুক্রাণু ও ডিম্বাণু**। পরিণত শুক্রাণু অতি ক্ষুদ্র এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত একটি স্ফীত **মস্তক**, সেন্ট্রিওলযুক্ত একটি সংকীর্ণ **মধ্যখন্ড** ও একটি লম্বা বিচলনক্ষম **লেজ** নিয়ে গঠিত। পরিণত ডিম্বাণুটি বড় ও গোল; এর সাথে তিনটি **পোলার বডি** (polar bodies) যুক্ত থাকে।

কাজ : যৌন জননে অংশগ্রহণ করা।

৭. নিডোসাইট (Cnidocyte) : *Hydra*-র পদতল ছাড়া বহিঃত্বকের সর্বত্র বিশেষ করে কর্ষিকার পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে বা ঐসব কোষের ভিতরে নিডোসাইট অনুপ্রবিষ্ট থাকে। কোষগুলো গোল, ডিম্বাকার বা পেয়ালাকার এবং নিচের দিকে নিউক্লিয়াসবাহী ও দ্বৈত আবরণবেষ্টিত বড় কোষ। কোষের মুক্তপ্রান্তে **ক্ষুদ্র**, দৃঢ়, সংবেদী **নিডোসিল** (cnidocil) এবং অভ্যন্তরে গহ্বর ও প্যাঁচানো সুতাযুক্ত **নেমাটোসিস্ট** বহন করে। গহ্বরটি **অপারকুলাম** (operculum) দিয়ে ঢাকা। আদর্শ নেমাটোসিস্টের সুতার গোড়ায় ৩টি বড় কাঁটার মতো **বার্ব** (barb) থাকে এবং গহ্বরটি **হিপনোটক্সিন** (hypnotoxin) নামক বিষাক্ত রসে পূর্ণ। পরিস্ফুটনরত নিডোসাইটকে **নিডোব্লাস্ট** (cnidoblast) বলে।

কাজ : নিডোসাইটের নেমাটোসিস্ট অঙ্গাণু প্রাণীর খাদ্য গ্রহণ, চলন ও আত্মরক্ষায় ব্যবহৃত হয়।

আদর্শ নিডোসাইটের গঠন (Structure of a typical Cnidocyte)

Hydra-র একটি আদর্শ নিডোসাইট দেখতে গোল, ডিম্বাকার, নাশপাতি আকার, পেয়ালাকার বা লাটিম আকৃতির এবং নিচে বর্ণিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

১. আবরণ (Membrane) : প্রতিটি কোষ দ্বিস্তরী আবরণে আবৃত। স্তর দুটির মাঝখানে দানাদার সাইটোপ্লাজম এবং কোষের গোড়ার দিকে একটি নিউক্লিয়াস থাকে।

২. নেমাটোসিস্ট (Nematocyst) : নিডোসাইটের অভ্যন্তরে অবস্থিত, কাইটিনের মতো পদার্থে নির্মিত আবরণে আবৃত ও সূত্রকযুক্ত একটি ক্যাপসুলের নাম নেমাটোসিস্ট। আদর্শ নিডোসাইটে ক্যাপসুলটি প্রোটিন ও ফেনল-এর সমন্বয়ে গঠিত বিষাক্ত তরল **হিপনোটক্সিন** (hypnotoxin)-এ পূর্ণ থাকে। লম্বা, সরু, ফাঁপা সূত্রকটি যা প্রকৃতপক্ষে ক্যাপসুলেরই অগ্রপ্রান্তের অভিন্ন প্রসারিত অংশ সেটি অবস্থান করে। সূত্রকের চওড়া গোড়াটিকে **বাট** (butt) বা **শ্যাফট** (shaft) বলে। এতে তিনটি বড় তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো **বার্ব** (barb) এবং সর্পিল সারিতে বিন্যস্ত ক্ষুদ্রতর কাঁটার মতো অসংখ্য **বার্বিউল** (barbules) দেখা যায়। স্বাভাবিক অবস্থায় সূত্রকটি বাট ও কাঁটাসহ থলির ভিতর ঢুকানো থাকে।

চিত্র ২.১.৯ : নিডোসাইট: বায়ে-স্বাভাবিক অবস্থায় এবং ডানে-সূত্রকটি উন্মুক্ত

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৩. **অপারকুলাম** (Operculum) : স্বাভাবিক অবস্থায় নেমাটোসিস্টের সূত্রক ও ক্যাপসুল যে ঢাকনা দিয়ে আবৃত থাকে তার নাম অপারকুলাম। উন্মুক্ত অবস্থায় এটি পাশে সরে যায়। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি রূপান্তরিত **সিলিয়াম** (cilium)।

৪. **নিডোসিল** (Cnidocil) : নিডোসাইট কোষের মুক্ত প্রান্তের শক্ত, দৃঢ়, সংবেদনশীল কাঁটাটি নিডোসিল। নিডোসিল ট্রিগারের মতো কাজ করে ফলে অপারকুলাম সরে যায় এবং প্যাঁচানো সূত্রকটি বাইরে বেরিয়ে আসে।

৫. পেশিতন্তু ও ল্যাসো (Muscle fibre & Lasso) : কোষের সাইটোপ্লাজম ও নেমাটোসিস্টের প্রাচীরে সংকোচনশীল কিছু পেশিতন্তু থাকে। এছাড়াও কোষের নিচের প্রান্তে ল্যাসো নামের একটি প্যাঁচানো সূত্রক দেখা যায়।

নেমাটোসিস্টের প্রকারভেদ (Types of nematocysts)

নিক্ষিপ্ত সূত্রকের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানী **ভার্ণার** (Werner) ১৯৬৫ সালে নিডারিয়া জাতীয় প্রাণিদের দেহ থেকে ২৩ ধরনের নেমাটোসিস্ট শনাক্ত করেছেন। এর মধ্যে নিম্নোক্ত চার ধরনের নেমাটোসিস্ট *Hydra*-য় পাওয়া যায়।

১. **স্টিনোটিল বা পেনিট্র্যান্ট** (Stenotile or Penetrant) : *Hydra*-র চার ধরনের নেমাটোসিস্টের মধ্যে বার্বিওল এগুলোই বৃহত্তম। এদের সূত্রক লম্বা, ফাঁপা, শীর্ষ উন্মুক্ত, বাট প্রশস্ত এবং তিনটি বড় তীক্ষ্ণ বার্ব ও তিন সারি সর্পিলাকারে সজ্জিত অতি ক্ষুদ্র বার্বিউলযুক্ত। এর ভিতরে **হিপনোটক্সিন** (hypnotoxin) নামক বিষাক্ত তরল থাকে। শিকারের দেহে সূত্রক বিদ্ধ করে বিষাক্ত হিপনোটক্সিন প্রবেশ করিয়ে তাকে অজ্ঞান ও অবশ করে ফেলে।

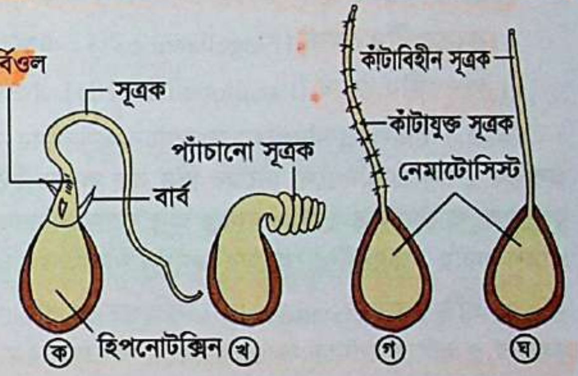

চিত্র ২.১.১০ : বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট; ক. স্টিনোটিল, খ. ভলভেন্ট, গ. স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট ও ঘ. স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট

২. **ভলভেন্ট** (Volvent) : এগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট। সূত্রকটি খাটো, মোটা, স্থিতিস্থাপক, কাঁটাবিহীন এবং বন্ধ শীর্ষযুক্ত নেমাটোসিস্ট। ক্যাপসুলের ভিতর সূত্রকের একটি মাত্র প্যাঁচ থাকে, কিন্তু নিক্ষিপ্ত হওয়ার সাথে সাথে কর্ক-স্ক্রুর মতো অনেকগুলো প্যাঁচের সৃষ্টি করে। এটি শিকার কিংবা কোন বস্তুকে আঁকড়ে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

৩. **স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট** (Streptoline glutinant) : এর সূত্রক লম্বা, সর্পিলাকারে সজ্জিত কাঁটাযুক্ত, বাট সুগঠিত নয় এবং শীর্ষদেশ উন্মুক্ত। এগুলো আঠালো রস ক্ষরণ করে চলনে এবং শিকার আটকাতে সাহায্য করে।

৪. **স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট** (Stereoline glutinant) : এগুলো ক্ষুদ্রতম নেমাটোসিস্ট; সূত্রক লম্বা, কাঁটাবিহীন, বাট সুগঠিত নয় এবং শীর্ষদেশ উন্মুক্ত। এগুলোও এক ধরনের আঠালো রস ক্ষরণ করে চলন ও শিকার আটকে রাখতে সাহায্য করে।

নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপের কৌশল
(Mechanism of discharge of Nematocyst-thread)

নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপ যুগপৎভাবে একটি রাসায়নিক ও যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। শিকারের বা শত্রুর সন্ধান অথবা অন্য যেকোনো কারণে নিডোসাইট উদ্দীপ্ত হলে এ প্রক্রিয়াটি শুরু হয়। কোন শিকার *Hydra*-র কর্ষিকার নিকটবর্তী হলে শিকার-দেহের রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে নেমাটোসিস্ট প্রাচীরের পানিভেদ্য ক্ষমতা বেড়ে যায়। এতে থলির ভিতরে দ্রুত পানি প্রবেশ করায় ভিতরের অভিস্রবণিক চাপও বেড়ে যায়। এসময় শিকার নিডোসাইটের নিডোসিল স্পর্শ করামাত্র এর অপারকুলাম খুলে যায় এবং তখন দ্রুত পানি ভিতরে প্রবেশ করায় হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপ (hydrostatic pressure) বেড়ে গেলে নেমাটোসিস্ট-সূত্রক ক্ষিপ্র গতিতে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

চিত্র ২.১.১১ : নেমাটোসিস্টের সূত্রক নিক্ষেপ প্রক্রিয়া

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

নেমাটোসিস্টের সূত্রক একবার নিক্ষিপ্ত হলে সেটাকে আর নিডোসাইটে ফিরিয়ে আনা যায় না বা আবার ব্যবহার করা যায় না কিংবা ঐ একই নিডোসাইট আর কোনো নেমাটোসিস্ট সৃষ্টিও করতে পারে না। এ ধরনের নিডোসাইট ধীরে ধীরে গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বরে প্রবেশ করে এবং অন্যান্য খাদ্যবস্তুর সাথে হজম হয়ে যায়। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নতুন নিডোসাইট সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যবহৃত নিডোসাইট প্রতিস্থাপিত হয়।

গ্যাস্ট্রোডার্মিস (বা অন্তঃত্বক)-এর কোষসমূহ

এপিডার্মিস অপেক্ষা গ্যাস্ট্রোডার্মিস-এর গঠন অনেকটা সরল এবং নিচের পাঁচ ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত।

১. পুষ্টি কোষ বা পেশি-আবরণী কোষ (Nutritive cell or Musculo-Epithelial Cells) : গ্যাস্ট্রোডার্মিসের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে অবস্থিত স্তম্ভাকার এবং বড় নিউক্লিয়াস ও গহ্বরযুক্ত কোষ। কোষের সংযুক্ত প্রান্ত থেকে **মায়োফাইব্রিল** নামক সূক্ষ্ম, সংকোচনশীল তন্তুবিশিষ্ট পেশি প্রবর্ধন সৃষ্টি হয়ে মেসোগ্লিয়ার সমকোণে অবস্থান করে।

ভিতরের মুক্ত প্রান্তের গঠনের উপর ভিত্তি করে পুষ্টি কোষগুলো দুরকম, যথা–

i. **ফ্ল্যাজেলীয় কোষ** (Flagellated cell) : এগুলোর মুক্ত প্রান্তে ১–৪টি সুতার মতো ফ্ল্যাজেলা সংযুক্ত থাকে।

ii. **ক্ষণপদীয় কোষ** (Pseudopodial cell) : এগুলোর মুক্ত প্রান্ত ক্ষণপদযুক্ত।

কাজ : পেশি প্রবর্ধনগুলো সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে দেহকে সরু ও মোটা করে। মুখ ও কর্ষিকার গোড়ায় অবস্থিত পেশি-প্রবর্ধনগুলো নিজের ছিদ্র বন্ধ করতে **স্ফিংক্টার** (sphincter)-এর মতো কাজ করে। ফ্ল্যাজেলীয় কোষের ফ্ল্যাজেলা আন্দোলিত হয়ে খাদ্যবস্তু ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে। প্রয়োজনে এ কোষ আন্দোলিত হয়ে মুখছিদ্রপথে পানি প্রবেশ করায়। ক্ষণপদীয় কোষের ক্ষণপদ খাদ্যকণা গলাধঃকরণ করে অন্তঃস্থ খাদ্যগহ্বরে পরিপাক করে।

২. গ্রন্থি কোষ (Gland cell) : বিক্ষিপ্তভাবে পুষ্টি কোষের ফাঁকে ফাঁকে এসব কোষ অবস্থান করে। এগুলোর সংখ্যা মূলদেহ ও হাইপোস্টোমে সবচেয়ে বেশি, পদতলে কম এবং কর্ষিকায় অনুপস্থিত।

গ্রন্থিকোষ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও পেশি-প্রবর্ধনবিহীন। এগুলো দুরকম হয়ে থাকে–

i. **মিউকাস ক্ষরণকারী** (Mucous secreting) : এগুলো প্রধানত হাইপোস্টোম অঞ্চলে অবস্থিত এবং পিচ্ছিল মিউকাস ক্ষরণ করে।

ii. **এনজাইম ক্ষরণকারী** (Enzyme secreting) : অন্যান্য স্থানের কোষগুলো এ ধরনের যা থেকে পরিপাকের জন্য এনজাইম ক্ষরিত হয়।

কাজ : হাইপোস্টোমের গ্রন্থিকোষ নিঃসৃত **মিউকাস** খাদ্যদ্রব্য পিচ্ছিল করে গলাধঃকরণে সাহায্য করে। অন্যান্য স্থানে গ্রন্থিকোষ সিলেন্টেরনে **এনজাইম**-এর ক্ষরণ ঘটিয়ে পরিপাকে সাহায্য করে।

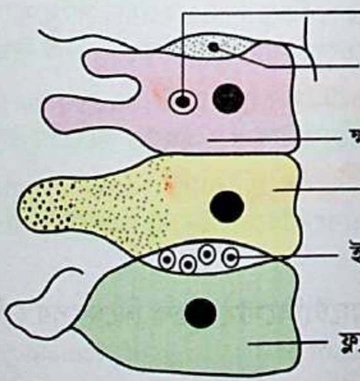

চিত্র ২.১.১২ : *Hydra*-র অন্তঃত্বকের কোষসমূহ

৩. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ (Interstitial cell) : এগুলো পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থান করে। প্রকৃতপক্ষে এসব কোষ এপিডার্মিস থেকে আগত কোষ। এগুলো গোল বা ত্রিকোণাকার এবং সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াস, মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক জালিকা, মুক্ত রাইবোজোম ও কিছু মাইটোকন্ড্রিয়া বহন করে।

কাজ : এন্ডোডার্মিসের প্রয়োজনীয় যে কোনো কোষ গঠন করাই এর কাজ।

৪. সংবেদী কোষ (Sensory cell) : এগুলো পেশি-আবরণী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত লম্বা ও সরু কোষ। কোষের মুক্ত প্রান্ত থেকে নির্গত সূক্ষ্ম সংবেদী রোম সিলেন্টেরনে উদগত এবং মেসোগ্লিয়া সংলগ্ন প্রান্ত থেকে নির্গত রোম স্নায়ুতন্তুর সাথে যুক্ত থাকে।

কাজ : সম্ভবত পানির সাথে সিলেন্টেরনে প্রবেশিত খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থের গুণাগুণ যাচাই করে স্নায়ুকোষে প্রেরণ করে এবং স্নায়ুকোষ উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৫. **স্নায়ু কোষ** (Nerve cell) : এসব কোষ মেসোগ্লিয়া ঘেঁষে অবস্থিত, সংখ্যায় খুব কম। অনিয়ত আকারবিশিষ্ট এবং একটি ক্ষুদ্র কোষদেহ ও দুই বা ততোধিক সূক্ষ্ম শাখান্বিত তন্তু নিয়ে গঠিত। তন্তুগুলো পরস্পর মিলে স্নায়ু-জালিকা গঠন করে।

কাজ : সংবেদী কোষে সংগৃহীত উদ্দীপনা স্থানান্তর করাই এর কাজ।

হাইড্রার এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মধ্যে পার্থক্য

আলোচ্য বিষয়	এপিডার্মিস	গ্যাস্ট্রোডার্মিস
১. উৎপত্তি ও অবস্থান	ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উৎপন্ন এবং দেহের বাইরের দিকে অবস্থিত।	এন্ডোডার্ম থেকে উৎপন্ন এবং দেহের ভিতরের দিকে অর্থাৎ সিলেন্টেরনকে ঘিরে অবস্থান করে।
২. পুষ্টি কোষ	ক্ষণপদযুক্ত কোষ ও ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোষ দেখা যায় না।	ক্ষণপদযুক্ত ও ফ্ল্যাজেলাযুক্ত কোষ পুষ্টির কাজে নিয়োজিত।
৩. কিউটিকল	পেশি-আবরণী কোষের নিঃসৃত রসে সৃষ্টি হয়।	অনুপস্থিত।
৪. নিডোসাইট	উপস্থিত এবং প্রতিরক্ষা ও আত্মরক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়।	অনুপস্থিত।
৫. জনন অঙ্গ ও মুকুল	দেখতে পাওয়া যায়।	নেই।
৬. কার্যকারিতা	দেহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে এবং পরিবেশ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে।	মূলত পুষ্টির কাজে নিয়োজিত।

মেসোগ্লিয়া (Mesogloea)

Hydra-র এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মাঝখানে অবস্থিত জেলির মতো, স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক স্তরকে মেসোগ্লিয়া বলে। মেসোগ্লিয়া স্তরটি দেহ ও কর্ষিকা উভয় স্থানে বিস্তৃত, তবে কর্ষিকায় সবচেয়ে পাতলা এবং পাদ-চাকতিতে সর্বাধিক পুরু। মেসোগ্লিয়ার এ ধরনের বিন্যাস পাদ-চাকতির অতিরিক্ত যান্ত্রিক প্রসারণ প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং কর্ষিকাকে অধিকতর নমনীয়তা দান করে। *Hydra*-র মেসোগ্লিয়া প্রায় ০.১ মাইক্রোমিটার পুরু। এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস উভয় স্তরের কোষ মেসোগ্লিয়া গঠনে অংশ গ্রহণ করে।

কাজ : (i) মেসোগ্লিয়া দেহের অবলম্বনে সহায়তা করে এবং এক ধরনের নমনীয় **কঙ্কাল** হিসেবে কাজ করে। (ii) মেসোগ্লিয়া দুটি কোষস্তরের ভিত্তিরূপে কাজ করে। (iii) স্নায়ুকোষ ও সংবেদী কোষতন্তুসমূহ এবং পেশি-আবরণী কোষের সংকোচনশীল মায়োফাইব্রিল ধারণ করে। (iv) মেসোগ্লিয়ায় অবস্থিত পেশি-আবরণী কোষের সংকোচনশীল মায়োফাইব্রিলের সংকোচনে দেহ বা কর্ষিকা খাটো হয় ফলে দেহ বাঁকানো সম্ভব হয়।

সিলেন্টেরন (Coelenteron)

Hydra-র দেহের কেন্দ্রভাগে অবস্থিত ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসে পরিবৃত্ত ফাঁকা গহ্বরকে সিলেন্টরন বলে। এতে খাদ্যের বহিঃকোষীয় পরিপাক ঘটে এবং খাদ্যসার, শ্বসন ও রেচন পদার্থ পরিবাহিত হয় বলে একে **গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর** (gastrovascular cavity) বা **পরিপাক সংবহন গহ্বর** বলা হয়। কর্ষিকায় সিলেন্টরন প্রসারিত থাকে বলে এগুলো ফাঁপা হয়। সিলেন্টেরনকে অনেকসময় **ব্লাইন্ড গাট** (blind gut) বা **ব্লাইন্ড স্যাক** (blind sac) বলা হয়। কারণ দেহের উপরিভাগে অবস্থিত একটি মাত্র ছিদ্র, অর্থাৎ মুখছিদ্রের মাধ্যমে এটি খাদ্যগ্রহণ ও বর্জ্য পরিত্যাগ করে।

সিলোম ও সিলেন্টেরনের মধ্যে পার্থক্য

সিলোম	সিলেন্টেরন
১. ত্রিভ্রূণস্তরী প্রাণিদেহে মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়ামে আবৃত যেকোন ফাঁকা বা গহ্বরকে সিলোম বলে।	১. দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণিদেহের অভ্যন্তরীণ প্রশস্ত গহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে।
২. এর বাইরের ও ভিতরের দিক মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়াম দ্বারা আবৃত।	২. এর চতুর্দিক গ্যাস্ট্রোডার্মিস দ্বারা আবৃত।
৩. এটি সিলোমিক তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে।	৩. এটি পানি, খাদ্য ও বর্জ্য পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে।
৪. এতে বিভিন্ন অঙ্গ যেমন-হৃৎপিন্ড, যকৃত, ফুসফুস ইত্যাদি অবস্থান করে।	৪. এতে কোন অঙ্গ অবস্থান করে না।
৫. এটি শুধু দেহগহ্বরের কাজ করে।	৫. এটি দেহগহ্বর ও পরিপাক গহ্বরের কাজ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Hydra-র খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক প্রক্রিয়া (Feeding and Digestion)

পুষ্টি (Nutrition) : যে জৈবনিক প্রক্রিয়ায় প্রাণী নিজ পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় জটিল জৈব খাদ্য গ্রহণ করে বিভিন্ন এনজাইমের সহায়তায় কোষে পরিবহন ও শোষণ উপযোগী সরল ও দ্রবনীয় খাদ্যে পরিণত করে পরিপাককৃত খাদ্যসার শোষণের মাধ্যমে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ অক্ষুণ্ন রাখে এবং খাদ্যের অপাচ্য অংশ দেহ থেকে বের করে দেয় তাকে **পুষ্টি** বলে।

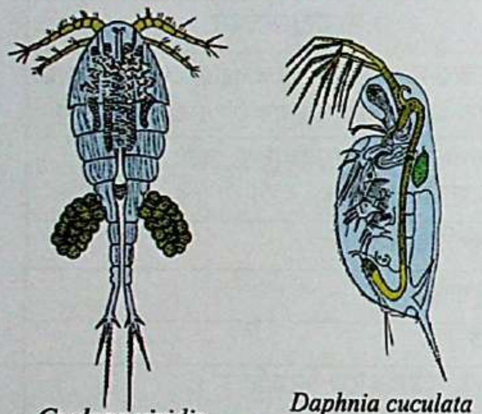

চিত্র ২.১.১৩ : *Hydra*--র প্রধান খাদ্য

Hydra-র খাদ্য : *Hydra* মাংসাশী (carnivorous) প্রাণী। যে সব ক্ষুদ্র জলজ প্রাণীকে নেমাটোসিস্ট দিয়ে সহজেই কাবু করা যায়, সে সব প্রাণী *Hydra*-র প্রধান খাদ্য। *Hydra*-র খাদ্য তালিকার বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে বিভিন্ন পতঙ্গের লার্ভা, *Cyclops* (সাইক্লপস) ও *Daphnia* (ড্যাফনিয়া) নামক ক্রাস্টাসীয় সন্ধিপদী প্রাণী (arthropods), ছোট ছোট কৃমি, খণ্ডকায়িত প্রাণী (annelids) ও মাছের ডিম। তবে প্রধান খাদ্য হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্রাস্টাসীয় সন্ধিপদী।

খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি : ক্ষুধার্ত *Hydra* পদতলকে ভিত্তির সাথে আটকে নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে মূলদেহ ও কর্ষিকাগুলো ভাসিয়ে শিকারের অপেক্ষায় থাকে। কোনো খাদ্যপ্রাণী বা শিকার কাছে আসামাত্র কর্ষিকার নেমাটোসিস্টগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে এবং ঐ শিকার কর্ষিকা স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের নেমাটোসিস্ট-সূত্র নিক্ষিপ্ত হয়।

ভলভেন্ট নেমাটোসিস্ট-সূত্রক শিকারের উপাঙ্গ জড়িয়ে গতিরোধ করে এবং গ্লুটিন্যান্টগুলো আঠালো রস ক্ষরণ করে আটকে ফেলে। স্টিনোটিল নেমাটোসিস্ট তখন শিকারের দেহে হিপনোটক্সিন প্রবেশ করিয়ে শিকারকে অবশ করে দেয়। এরপর কর্ষিকা সেটিকে মুখের কাছে নিয়ে আসে। মুখছিদ্র স্ফীত ও চওড়া হয়ে তা গ্রহণ করে। মুখের চারদিকে অবস্থিত গ্রন্থিকোষ নিঃসৃত মিউকাসে সিক্ত ও পিচ্ছিল হয়ে এবং হাইপোস্টোম ও দেহপ্রাচীরের সংকোচন-প্রসারণের ফলে খাদ্য সিলেন্টেরনে এসে পৌঁছে।

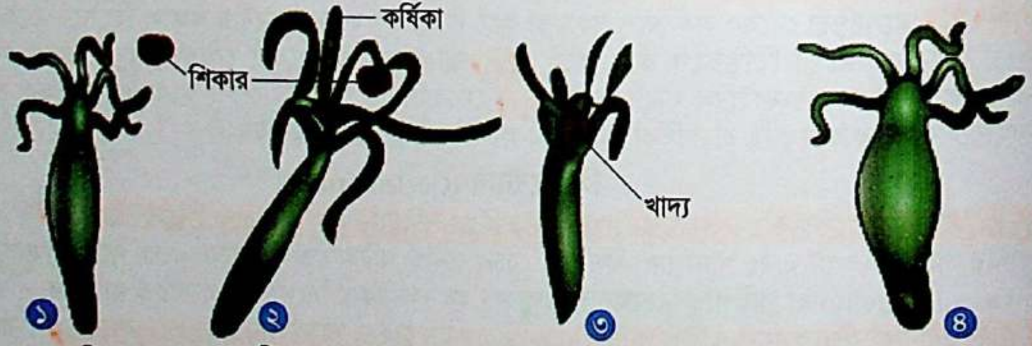

চিত্র ২.১.১৪ : *Hydra*--র শিকার ধরার কৌশল

***Hydra*-র খাদ্য পরিপাক প্রণালী** (Process of Digestion) : যে জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিল জৈব খাদ্যবস্তু বিভিন্ন এনজাইমের সাহায্যে ভেঙ্গে তরল, সরল ও কোষের শোষণ উপযোগী অণুতে পরিণত হয়, তাকে পরিপাক বলে। *Hydra*-র খাদ্য পরিপাকের সময় অন্তঃত্বকের গ্রন্থিকোষ থেকে এনজাইম নিঃসৃত হয়। পরিপাক দুটি ধাপে সম্পন্ন হয়:

১. **বহিঃকোষীয় পরিপাক** (Extracellular digestion): কোষের বাইরে খাদ্যবস্তুর পরিপাককে বহিঃকোষীয় বা আন্তঃকোষীয় পরিপাক বলে। খাদ্য সিলেন্টেরনে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে মুখছিদ্র বন্ধ হয়ে যায় এবং অন্তঃত্বকীয় গ্রন্থিকোষগুলো সক্রিয় হয়। কোষগুলো বড় ও দানাদার হয়ে উঠে এবং এনজাইম ক্ষরণ করে। প্রথমে এনজাইমের প্রভাবে শিকারের মৃত্যু ঘটে। দেহপ্রাচীরের প্রবল সংকোচন-প্রসারণের ফলে শিকারটি ছোট ছোট কণায় পরিণত হয়। এ সময় অন্তঃত্বকীয় কোষের ফ্ল্যাজেলা সঞ্চালিত হয়ে খাদ্যকণাকে এনজাইমের সাথে ভালভাবে মিশ্রিত করে। গ্রন্থিকোষ থেকে নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে খাদ্যকণা পরিপাক হতে থাকে। পেপসিন নিঃসৃত হয়ে প্রোটিনকে পলিপেপটাইড-এ পরিণত করে, তবে লিপিড ও শর্করা খাদ্যাংশের কোনো পরিবর্তন হয় না।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. **অন্তঃকোষীয় পরিপাক (Intracellular digestion) :** দেহের সংকোচন-প্রসারণের ফলে খাদ্য আরও ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়। তখন পেশি-অন্তঃআবরণীর ক্ষণপদীয় কোষগুলো ক্ষণপদ বের করে কিছু খাদ্যকণা সামান্য তরল পদার্থের সাথে কোষীয় ভক্ষণ প্রক্রিয়ায় (ফ্যাগোসাইটোসিস) গলাধঃকরণ করে। খাদ্যকণা তখন কোষের অভ্যন্তরে খাদ্যগহ্বরে সাইটোপ্লাজম থেকে নিঃসৃত এনজাইমের সাহায্যে পরিপাক হয়। খাদ্যগহ্বরে প্রথমে সাইটোপ্লাজম থেকে এসিড ক্ষরিত হয়ে খাদ্যকে আম্লিক করে। পরে ক্ষারীয় রস নিঃসৃত হয়ে ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি হলে সাইটোপ্লাজম থেকে বিভিন্ন এনজাইম নিঃসৃত হয়। **ট্রিপসিন** আমিষ জাতীয় খাদ্যকে অ্যামিনো এসিডে, **লাইপেজ** স্নেহজাতীয় খাদ্যকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে এবং **অ্যামাইলেজ** শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে। খাদ্যগহ্বরে খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হয়। *Hydra* আমিষ, স্নেহ ও কিছু শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে পারে কিন্তু শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য পরিপাক করতে পারে না।

পরিশোষণ, আত্মীকরণ ও বর্জন : খাদ্যের পরিপাককৃত সারাংশ সাইটোপ্লাজমে পরিশোষিত হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় প্রাণিদেহের বিভিন্ন কোষে বাহিত হয়। অপাচ্য খাদ্যাংশ দেহপ্রাচীরের সংকোচন-প্রসারণ ও ফ্ল্যাজেলার সঞ্চালনের ফলে মুখছিদ্র দিয়ে বহিঃগামী পানির স্রোতের সঙ্গে মিশে দেহের বাইরে বর্জিত হয়।

Hydra-র চলন (Locomotion)

যে প্রক্রিয়ায় জীবদেহ জৈবিক প্রয়োজনে নিজ চেষ্টায় স্থানান্তরিত হয়, তাকে চলন বলে। সাধারণত এটি প্রাণীর এক স্বতঃস্ফূর্ত সহজাত আচরণ। প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবিলায়, জনন, খাদ্য সংগ্রহ, আত্মরক্ষা, বিনোদন প্রভৃতি কারণে জীব স্থানান্তরে গমন করে। *Hydra* সাধারণত নিমজ্জিত বস্তু বা উদ্ভিদের গায়ে সংলগ্ন থাকে, তবে বিভিন্ন উত্তেজকে সাড়া দেয়ার জন্য বা খাদ্য গ্রহণের জন্য স্থান ত্যাগ করতে হয়। কোনো নির্দিষ্ট চলন অঙ্গ না থাকায় সমগ্র প্রক্রিয়াটি বিভিন্নভাবে প্রধানত পদতল, দেহের সংকোচন–প্রসারণশীল পেশিতন্তু ও নেমাটোসিস্টের সাহায্যে সম্পন্ন হয়। চলনের সময় প্রথমে সংবেদী কোষ সাড়া দেয় এবং সে বার্তা বহিঃত্বক ও তিন ধরনের অন্তঃত্বকের স্নায়ু-জালকের ভিতর সঞ্চালিত হয়। ফলে পেশিতন্তু সঙ্কুচিত হয় এবং চলন প্রক্রিয়া শুরু হয়। *Hydra*-য় নিচে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের চলন দেখতে পাওয়া যায়।

১. **লুপিং (Looping) বা ফাঁসাচলন :** লম্বা দূরত্ব অতিক্রমের জন্য *Hydra* সাধারণত লুপিং চলনের আশ্রয় নেয়। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে এক পাশের পেশি-আবরণী কোষগুলো সঙ্কুচিত হয় এবং অপর পাশের অনুরূপ কোষগুলো সম্প্রসারিত হয়। ফলে *Hydra* গতিপথের দিকে দেহকে প্রসারিত করে ও বাঁকিয়ে মৌখিক তলকে ভিত্তির কাছাকাছি নিয়ে আসে এবং কর্ষিকার গ্লুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্টের সাহায্যে ভিত্তিকে আটকে ধরে। এরপর পাদ-চাকতিকে মুক্ত করে মুখের কাছাকাছি এনে স্থাপন করে এবং কর্ষিকা বিযুক্ত করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। এ পদ্ধতির পুনারাবৃত্তি ঘটিয়ে *Hydra* স্থান ত্যাগ করে। জোঁক বা শুঁয়াপোকা চলার সময় যেভাবে ক্রমান্বয়িক লুপ বা ফাঁসের সৃষ্টি হয় হাইড্রার এ চলনও দেখতে অনেকটা একই রকম হওয়ায় ফাঁসাচলনকে জোঁকা চলন বা শুঁয়াপোকা চলন নামেও অভিহিত করা যায়।

চিত্র ২.১.১৫ : লুপিং চলন

২. **সমারসল্টিং (Somersaulting) বা ডিগবাজী :** এটি *Hydra*-র সাধারণ ও দ্রুত চলন প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে *Hydra* দেহকে বাঁকিয়ে চলনের গতিপথে কর্ষিকায় অবস্থিত গ্লুটিন্যান্ট জাতীয় নেমাটোসিস্টের আঠালো ক্ষরণের সাহায্যে গতিপথকে স্পর্শ করে। এ সময় গন্তব্যস্থলমুখী পেশি-আবরণী কোষের সংকোচন ও অপর পাশের অনুরূপ কোষের সম্প্রসারণ ঘটে। পরে পাদ-চাকতি বিযুক্ত করে কর্ষিকার উপর ভর দিয়ে দেহকে সোজা করে দেয়। পুনরায় দেহকে বাঁকিয়ে পাদ-চাকতির সাহায্যে গতিপথকে স্পর্শ করে। পরে কর্ষিকা মুক্ত করে দেহকে সোজা করে দেয়। এ প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে *Hydra* দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

চিত্র ২.১.১৬ : সমারসল্টিং চলন

৩. **গ্লাইডিং (Gliding) বা অ্যামিবয়েড চলন** : এ প্রক্রিয়ায় *Hydra* পদতলের বহিঃত্বকীয় কোষগুলো থেকে পিচ্ছিল রস ক্ষরণ করে। পরে ঐ স্থান থেকেই প্রক্ষিপ্ত কোষীয় ক্ষণপদের অ্যামিবয়েড চলনের সাহায্যে দেহটি অত্যন্ত ধীরগতিতে মসৃণতলে খুব সামান্য দূরত্বে স্থানান্তরিত হয়।

৪. **ভাসা (Floating)** : মাঝে মাঝে *Hydra* পাদ-চাকতির বহিঃত্বকীয় কোষ থেকে গ্যাসীয় বুদবুদ সৃষ্টি করে, ফলে প্রাণী ভিত্তি থেকে বিচ্যুত, হালকা ও উপুড় হয়ে পানির পৃষ্ঠতলে ভেসে উঠে। এখানে বুদবুদ ফেটে মিউকাস ভেলার মতো ছড়িয়ে গেলে *Hydra* নিম্নমুখী হয়ে ভেসে থাকে। এভাবে প্রাণী ঢেউয়ের আঘাতে কিছুদূর ভেসেও যেতে পারে।

৫. **সাঁতার (Swimming)** : কর্ষিকাগুলোকে ঢেউয়ের মতো আন্দোলিত করে এবং দেহকে ভিত্তি থেকে মুক্ত করে *Hydra* সহজেই দেহকে ঢেউয়ের মতো আন্দোলিত করে সাঁতার কাটতে পারে।

৬. **হামাগুড়ি (Crawling)** : এ প্রক্রিয়ায় *Hydra* কর্ষিকার সাহায্যে কাছাকাছি কোনো বস্তুকে আঁকড়ে ধরে। পরে পাদ-চাকতি মুক্ত ও কর্ষিকা সংকুচিত করে পাদ-চাকতিকে নতুন জায়গায় স্থাপন করে। এ প্রক্রিয়ায় *Hydra*-র আরোহণ ও অবরোহণ সম্পন্ন হয়।

চিত্র ২.১.১৭ : *Hydra*--র বিভিন্ন ধরনের চলন

৭. **হাঁটা (Walking)** : এ ক্ষেত্রে *Hydra* তার দেহের ভার পাদ-চাকতির উপর না রেখে কর্ষিকার উপর স্থাপন করে এবং কর্ষিকাকে পায়ের মতো ব্যবহার করে উল্টোভাবে ধীর গতিতে চলতে পারে।

৮. **দেহের সংকোচন- প্রসারণ (Body contraction and expansion)** : এ প্রক্রিয়ায় *Hydra* দেহকে মুক্ত করে দেহপ্রাচীরের পেশি-আবরণী কোষের সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে দেহের আকার দ্রুত খাটো ও লম্বা করে, ফলে এক ধরনের চলনের সৃষ্টি হয়।

Hydra-র জনন (Reproduction of *Hydra*)

যে প্রক্রিয়ায় জীব নিজ বংশধর রক্ষার জন্য প্রজননক্ষম অনুরূপ জীব সৃষ্টি করে তাকে জনন বলে। এ প্রক্রিয়ায় জীব দেহাংশের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে (অযৌন) বা একই প্রজাতির অন্য সদস্যের সহযোগিতায় ও গ্যামেট সৃষ্টির মাধ্যমে পরোক্ষভাবে (যৌন) নিজ আকৃতিসদৃশ বংশধর সৃষ্টি করে। *Hydra* অযৌন ও যৌন উভয় প্রক্রিয়ায় বংশ বৃদ্ধি করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

অযৌন জনন (Asexual reproduction)

গ্যামেট উৎপাদন ছাড়াই যে জনন সম্পাদিত হয় তাকে অযৌন জনন বলে। এ ধরনের জনন পদ্ধতিতে একটি মাত্র জনিতা থেকেই নতুন জীবের সৃষ্টি হয়। *Hydra* দু'ভাবে অযৌন জনন সম্পন্ন করে, যথা– **মুকুলোদগম** ও **বিভাজন**।

চিত্র ২.১.১৮ : *Hydra*-র মুকুলোদগমের ধাপসমূহ

১. মুকুলোদগম (Budding) : এটি অযৌন জননের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। বছরের সব ঋতুতেই বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহ থাকায় এটি বেশি ঘটে। নিম্নোক্ত বেশ কয়েকটি ধাপে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়।

i. প্রক্রিয়ার শুরুতে দেহের মধ্যাংশ বা নিম্নাংশের কোন স্থানের এপিডার্মিসের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ দ্রুত বিভাজিত হয়ে একটি ক্ষুদ্র **স্ফীত** অংশের সৃষ্টি করে।

ii. স্ফীত অংশটি ক্রমশ বড় হয়ে ফাঁপা, নলাকার **মুকুল** (bud)-এ পরিণত হয়। এতে এপিডার্মিস, মেসোগ্লিয়া ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস সৃষ্টি হয়।

iii. মাতৃহাইড্রার সিলেন্টেরন মুকুলের কেন্দ্রে প্রসারিত হয়।

iv. মুকুলটি মাতৃহাইড্রা থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে বড় হয় এবং শীর্ষপ্রান্তে গঠিত হয় মুখছিদ্র, হাইপোস্টোম ও কর্ষিকা।

v. এসময় মাতৃহাইড্রা ও মুকুলের সংযোগস্থলে একটি বৃত্তাকার খাঁজের সৃষ্টি হয়। খাঁজটি ক্রমে গভীর হয়ে মুকুল তথা অপত্য হাইড্রাকে মাতৃহাইড্রা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

vi. অপত্য হাইড্রার বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রান্তে পাদ-চাকতি গঠিত হয়।

vii. শিশু হাইড্রা কিছুক্ষণ বিচরণের পর নিমজ্জিত কোনো বস্তুর সংলগ্ন হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন শুরু করে।

ঘটনাক্রমে একটি *Hydra*-য় বেশ কয়েকটি মুকুলের সৃষ্টি হতে পারে। এসব মুকুল আবার নতুন মুকুল সৃষ্টি করতে পারে। সম্পূর্ণ মাতৃ *Hydra*-কে তখন একটি দলবদ্ধ প্রাণীর মতো দেখায়। মুকল সৃষ্টি এবং মাতৃ *Hydra* থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করতে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগে।

২. বিভাজন (Fission) : বিভাজন কোনো স্বাভাবিক জনন প্রক্রিয়া নয় কারণ এটি দৈবাৎ সংঘটিত হয়। কোন বাহ্যিক কারণে হাইড্রার দেহ দুই বা ততোধিক খণ্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যেক খণ্ড থেকে নতুন হাইড্রা জন্মায়। একে **পুনরুৎপত্তি** (regeneration) বলে, কারণ এ প্রক্রিয়ায় দেহের হারানো বা বিনষ্ট অংশ পুনর্গঠিত হয়। প্রকৃতিবিজ্ঞানী **ট্রেম্বলে** (Trembley) ১৭৪৪ সালে সর্বপ্রথম *Hydra*-র পুনরুৎপত্তি ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেন। এ ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন অংশের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ অতিদ্রুত বিভক্ত ও রূপান্তরিত হয়ে বিভিন্ন কোষ সৃষ্টি করে। এসব কোষ দিয়ে দেহের বিভিন্ন অংশ গঠনের মাধ্যমে অপত্য হাইড্রার বিকাশ ঘটে। সুতরাং হাইড্রার স্বাভাবিক মৃত্যু নেই। বিভাজন দুভাবে হতে পারে, যথা-অনুদৈর্ঘ্য বিভাজন ও অনুপ্রস্থ বিভাজন।

i. **অনুদৈর্ঘ্য বিভাজন** : হাইড্রার দেহ কোনো কারণে লম্বালম্বি দুই বা ততোধিক খন্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যেক খন্ড থেকে পৃথক হাইড্রার উৎপত্তি হয়।

ii. **অনুপ্রস্থ বিভাজন** : কোনো কারণে হাইড্রার দেহ অনুপ্রস্থভাবে একাধিক খণ্ডে বিভক্ত হলে প্রত্যেক খণ্ড থেকে পুনরুৎপত্তি প্রক্রিয়ায় নতুন হাইড্রা জন্ম লাভ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

যৌন জনন (Sexual reproduction)

নিষেকের মাধ্যমে জাইগোট সৃষ্টির উদ্দেশে দুটি পরিণত জননকোষের (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) নিউক্লিয়াসের একীভবন প্রক্রিয়াকে যৌন জনন বলে।

Hydra-র যৌন জননকে আলোচনার সুবিধার জন্য তিনটি শিরোনামভুক্ত করা যায়, যেমন–অস্থায়ী জননাঙ্গ সৃষ্টি, নিষেক ও পরিস্ফুটন।

১. অস্থায়ী জননাঙ্গ সৃষ্টি : অধিকাংশ হাইড্রা একলিঙ্গ (dioecious), তবে কিছু সংখ্যক উভলিঙ্গ (monoecious)-ও আছে। উভলিঙ্গ হলেও এদের স্বনিষেক ঘটে না, কারণ জননাঙ্গগুলো বিভিন্ন সময়ে পরিপক্কতা লাভ করে। প্রধানত শরৎকালে খাদ্য স্বল্পতার মতো প্রতিকূল পরিবেশে এদের দেহে অস্থায়ী জননাঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং যৌন জনন ঘটে। পুরুষ ও স্ত্রী জননাঙ্গকে যথাক্রমে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় বলে।

নিচে জননাঙ্গের উৎপত্তি ও এগুলো অভ্যন্তরে জননকোষ সৃষ্টির প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

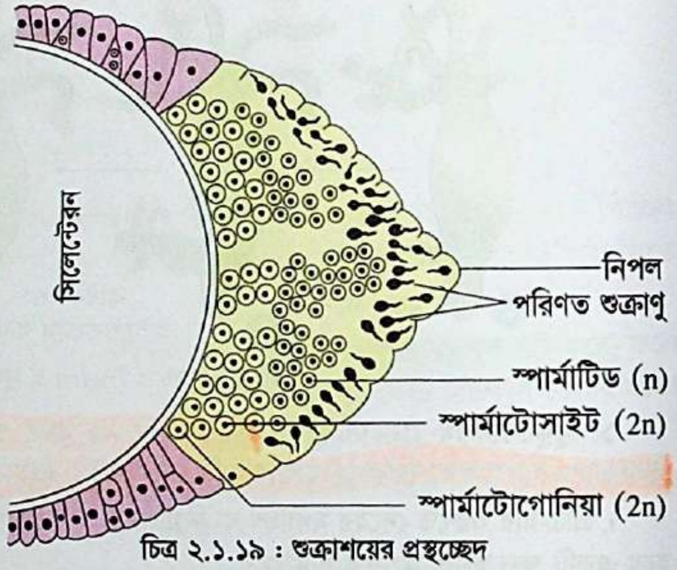

চিত্র ২.১.১৯ : শুক্রাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ

ক. শুক্রাশয়ের উৎপত্তি : প্রজনন ঋতুতে সাধারণত দেহের উপরের অর্ধাংশে ও হাইপোস্টোমের কাছাকাছি স্থানের এপিডার্মাল ইন্টারস্টিশিয়াল কোষের দ্রুত বিভাজনের ফলে এক বা একাধিক মোচাকার **শুক্রাশয়** (testis) সৃষ্টি হয়। এর শীর্ষে একটি বোঁটা বা **নিপল** (nipple) এবং পরিণত শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরে থাকে অসংখ্য **শুক্রাণু**। শুক্রাশয়ে শুক্রাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **স্পার্মাটোজেনেসিস** (spermatogenesis) বা **শুক্রাণুজনন** বলে। শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ বারংবার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে **স্পার্মাটোগোনিয়া** (spermatogonia) সৃষ্টি করে। পরে এগুলো বৃদ্ধিলাভ করে **স্পার্মাটোসাইট** (spermatocyte)-এ পরিণত হয়। প্রত্যেক স্পার্মাটোসাইট মিয়োসিস বিভাজনের ফলে ৪টি করে হ্যাপয়েড **স্পার্মাটিড** (spermatid) উৎপন্ন করে। প্রত্যেক স্পার্মাটিড এককেটি **শুক্রাণু** (sperm)-তে পরিণত হয়। প্রত্যেক পরিণত শুক্রাণু নিউক্লিয়াসযুক্ত একটি স্ফীত **মস্তক** (head), সেন্ট্রিওলযুক্ত একটি সংকীর্ণ **মধ্যখন্ড** (middle piece) এবং একটি লম্বা, সরু, বিচলনক্ষম **লেজ** (tail) নিয়ে গঠিত।

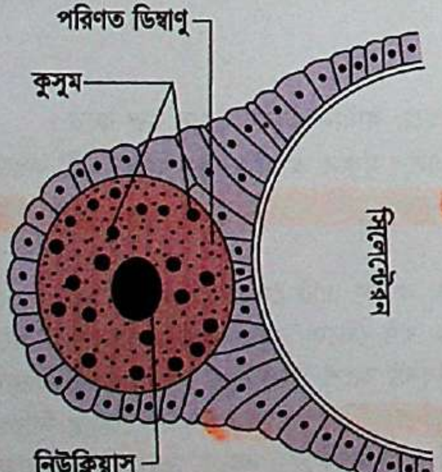

চিত্র ২.১.২০ : ডিম্বাশয়ের প্রস্থচ্ছেদ

খ. ডিম্বাশয়ের উৎপত্তি : প্রজনন ঋতুতে দেহের নিচের অর্ধাংশে, কিন্তু পদতলের সামান্য উপরে এপিডার্মিসের একটি বা দুটি স্থানের কিছু ইন্টারস্টিশিয়াল কোষের বারংবার বিভাজনের ফলে সাধারণত একটি বা দুটি গোলাকার **ডিম্বাশয়** (ovary) সৃষ্টি করে। প্রত্যেক ডিম্বাশয় থেকে একটি করে **ডিম্বাণু** (ovam) সৃষ্টি হয়। ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে ডিম্বাণু সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **উওজেনেসিস** (oogenesis) বা **ডিম্বাণুজনন** বলে। প্রথমে ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে **উওগোনিয়া** (oogonia) গঠন করে। এগুলোর মধ্যে কেন্দ্রস্থ একটি কোষ বড় হয়ে **উওসাইট** (oocyte)-এ পরিণত হয় এবং ছোট কোষগুলোকে গলাধঃকরণ করে। এটি তখন মিয়োসিস বিভাজন ঘটিয়ে ৩টি ক্ষুদ্র **পোলার বডি** (polar body) ও ১টি বড় সক্রিয় **উওটিড** (ootid) সৃষ্টি করে। উওটিডটি রূপান্তরিত হয়ে ডিম্বাণুতে পরিণত হয়। পোলার বডিগুলো বিলুপ্ত হয়ে যায়। ডিম্বাণুর পরিপূর্ণ বৃদ্ধির ফলে ডিম্বাশয়ের বহিরাবরণ ছিঁড়ে যায় এবং ডিম্বাণুকে উন্মুক্ত করে দেয়। এর চারদিকে তখন জিলেটিনের পিচ্ছিল আস্তরণ থাকে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. **নিষেক** (Fertilization) : শুক্রাণু পরিণত হলে শুক্রাশয়ের নিপল বিদীর্ণ করে ডিম্বাণুর সন্ধানে পানিতে ঝাঁকে ঝাঁকে সাঁতরাতে থাকে। ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে না পারলে এগুলো বিনষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে, উন্মুক্ত হওয়ার পর অল্পদিনের মধ্যে নিষিক্ত না হলে ডিম্বাণুও নষ্ট হয়ে ক্রমশ ধ্বংস হতে থাকে। শুক্রাণুর ঝাঁক একেকটি ডিম্বাণুর চারদিক ঘিরে ফেলে। একাধিক শুক্রাণু ডিম্বাণুর আবরণ ভেদ করলেও একটিমাত্র শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসই ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের সাথে একীভূত হয়ে **নিষেক** সম্পন্ন করে এবং একটি ডিপ্লয়েড (2n) জাইগোট (zygote) গঠন করে।

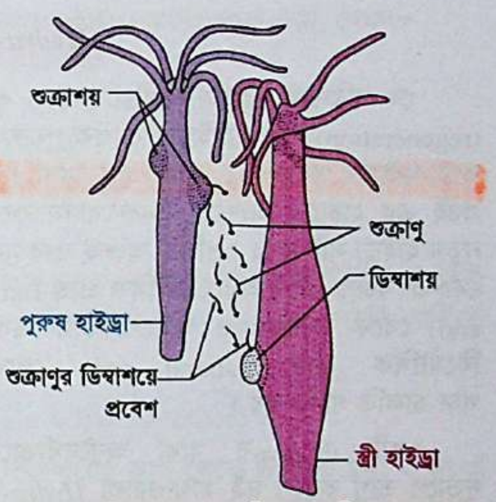

চিত্র ২.১.২১ : নিষেক প্রক্রিয়া

৩. **পরিস্ফুটন** (Development) : যেসব ক্রমান্বয়িক পরিবর্তনের মাধ্যমে জাইগোট থেকে শিশু প্রাণীর উৎপত্তি ঘটে তাকে **পরিস্ফুটন** বলে। জাইগোট নানা ধরনের পরিস্ফুটন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ হাইড্রায় পরিণত হয়।

হাইড্রার পরিস্ফুটনকালে নিম্নোক্ত পর্যায়সমূহ দেখা যায়।

ক. **মরুলা** (Morula) : জাইগোট মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বারবার বিভক্ত হয়ে বহুকোষী, নিরেট ও গোলাকার কোষপিণ্ডে পরিণত হয়। এর নাম **মরুলা**।

খ. **ব্লাস্টুলা** (Blastula) : শীঘ্রই মরুলার কোষগুলো একস্তরে সজ্জিত হয়ে একটি ফাঁপা, গোল ভ্রূণে পরিণত হয়। এর নাম ব্লাস্টুলা। ব্লাস্টুলার কোষগুলোকে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere) এবং কেন্দ্রে ফাঁকা গহ্বরকে **ব্লাস্টোসিল** (blastocoel) বলে।

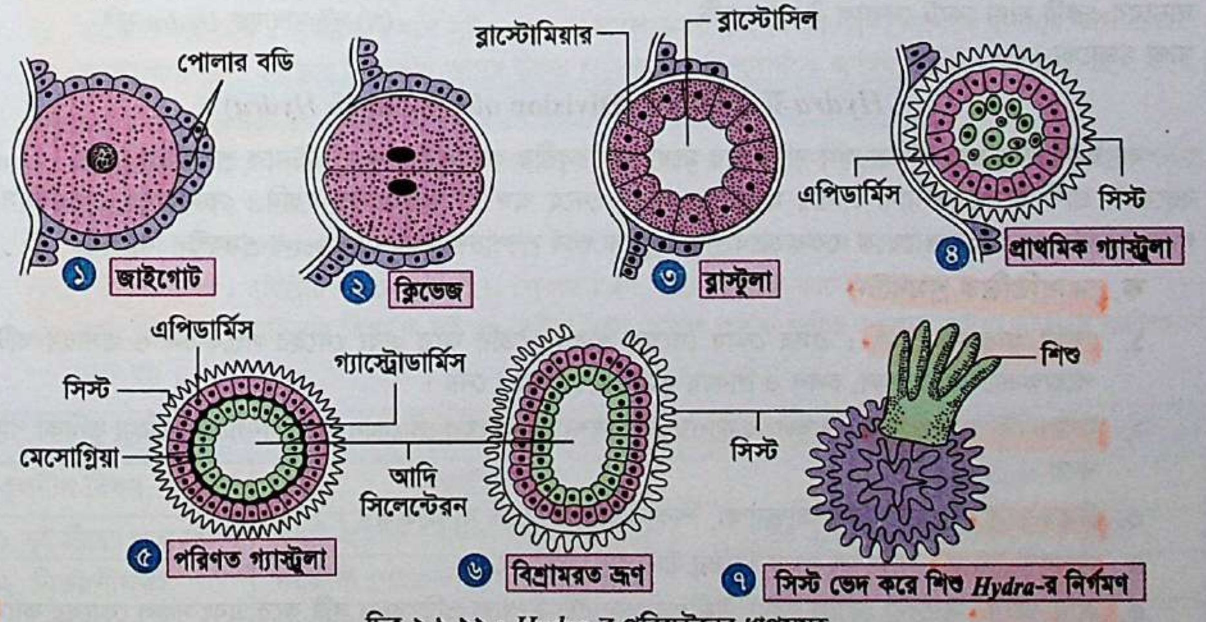

চিত্র ২.১.২২ : *Hydra*-র পরিস্ফুটনের ধাপসমূহ

গ. **গ্যাস্ট্রুলা** (Gastrula) : ব্লাস্টুলা **গ্যাস্ট্রুলেশন** (gastrulation) প্রক্রিয়ায় দ্বিস্তরবিশিষ্ট গ্যাস্ট্রুলায় পরিণত হয়। এটি এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম ও আদি সিলেন্টেরন নিয়ে গঠিত। মাতৃদেহের সাথে সংযুক্ত এ গ্যাস্ট্রুলাকে **স্টেরিওগ্যাস্ট্রুলা** (stereogastrula) বলে। গ্যাস্ট্রুলার চারদিকে একটি কাইটিন নির্মিত কাঁটাযুক্ত সিস্ট (cyst) আবরণী গঠিত হয়। সিস্টবদ্ধ ভ্রূণটি মাতৃহাইড্রা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পানির তলদেশে চলে যায়।

ঘ. **হাইড্রুলা** (Hydrula) : বসন্তের শুরুতে অনুকূল তাপমাত্রায় সিস্টের মধ্যেই ভ্রূণটি ক্রমশ লম্বা হতে থাকে এবং এর অগ্রপ্রান্তে হাইপোস্টোম, মুখছিদ্র ও কর্ষিকা এবং পশ্চাৎপ্রান্তে পাদ-চাকতি গঠিত হয়। ভ্রূণের এ দশাকে হাইড্রুলা বলে। হাইড্রুলা সিস্টের আবরণী বিদীর্ণ করে পানিতে বেরিয়ে আসে এবং স্বাধীন জীবন যাপন শুরু করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

Hydra-র পুনরুৎপত্তি (Regeneration)

যে প্রক্রিয়ায় কোনো প্রাণীর হারানো বা নষ্ট হয়ে যাওয়া দেহাংশকে দেহে পুনর্গঠন করে তাকে **পুনরুৎপত্তি** (regeneration) বলে। হাইড্রায় ব্যাপক পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা রয়েছে। আব্রাহাম ট্রেমলে (Abraham Trembley, 1744) প্রথম হাইড্রার পুনরুৎপত্তি ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করেন। কোনো হাইড্রাকে যদি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত করা হয় তাহলে প্রত্যেক খণ্ডই এর হারানো অংশকে পুনরুৎপাদন করে নতুন হাইড্রা সৃষ্টি করে। প্রতিটি অংশই তার মূল মেরুতা বজায় রাখে অর্থাৎ **মৌখিক প্রান্ত** (oral end) থেকে কর্ষিকা ও হাইপোস্টোম এবং **বিমৌখিক প্রান্ত** (aboral end) থেকে পাদ-চাকতি গঠিত হয়।

একটি *Hydra*-র মাথা অনুদৈর্ঘ্যভাবে দুভাগে ভাগ করলে দুই মাথাওয়ালা *Hydra*-র আবির্ভাব ঘটে।

Hydra-র এ ধরনের স্বভাবের জন্য রূপকথার দানব **হাইড্রা**-র নামানুসারেই এর নামকরণ করা হয়েছে। এ দানবের নয়টি মাথা ছিল। রূপকথা অনুযায়ী **হারকিউলিস** (Hercules) নামক এক শক্তিধর মানব এ দানবের একটি মাথা কেটে ফেললে ঐ স্থানে দুটি মাথা গজাতো।

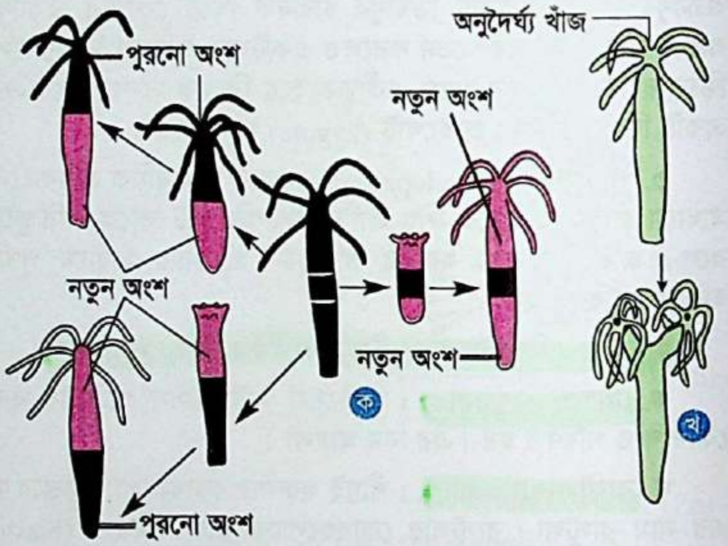

চিত্র ২.১.২৩ : (ক) একটি *Hydra* থেকে তিনটি (খ) দুই মাথাযুক্ত *Hydra* সৃষ্টি

Hydra-য় শ্রমবণ্টন (Division of Labour in *Hydra*)

বহুকোষী জীবদেহে বিভিন্ন অঙ্গ বা তন্ত্রের মধ্যে শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীর সুষম বণ্টনকে **শ্রমবণ্টন** বুঝায়। *Hydra* বহুকোষী প্রাণী হলেও অন্যান্য প্রাণীর মতো *Hydra*-র দেহে অঙ্গ বা তন্ত্র গঠিত হয়নি। কোষগুলো এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিস স্তরে বিন্যস্ত থেকে এককভাবে পৃথক পৃথক কার্য সম্পাদন করে। *Hydra*-র শ্রমবণ্টন নিম্নরূপ:

ক. কোষভিত্তিক শ্রমবণ্টন

১. **পেশি-আবরণী কোষ** : এসব কোষ দেহের আবরণ তৈরি করে এবং দেহের সংকোচন ও প্রসারণ ঘটিয়ে পরোক্ষভাবে আত্মরক্ষা, চলন ও শিকার ধরার কাজে অংশ নেয়।

২. **ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ** : মুকুল, শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়সহ দেহের যে কোন অংশ পুনর্গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৩. **নিডোসাইট** : এসব কোষ আত্মরক্ষা, শিকার ধরা ও চলনে ব্যবহৃত হয়।

৪. **সংবেদী কোষ** : পরিবেশ থেকে বিভিন্ন উদ্দীপনা গ্রহণ করে।

৫. **স্নায়ু কোষ** : সংবেদী কোষে গৃহীত উদ্দীপনা অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করে এবং সকল কোষের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।

৬. **গ্রন্থিকোষ** : গ্যাস্ট্রোডার্মিসের গ্রন্থিকোষ মিউকাস ও বিভিন্ন প্রকার এনজাইম ক্ষরণ করে পরিপাকে সাহায্য করে। পাদ-চাকতিতে উপস্থিত গ্রন্থিকোষ থেকে নিঃসৃত আঠালো রস হাইড্রাকে কোন বস্তুর সাথে আটকে থাকতে সহায়তা করে এবং বুদবুদ গঠনের মাধ্যমে ভেসে চলতে সাহায্য করে।

৭. **পুষ্টি-পেশিকোষ** : বহিঃকোষীয় ও অন্তঃকোষীয় পরিপাক সম্পন্ন করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

খ. কার্যভিত্তিক শ্রমবণ্টন : *Hydra*-র দেহে উপস্থিত বিভিন্ন অংশগুলো বিভিন্ন কাজে অংশ নেয়, যেমন–

১. **মুখছিদ্র :** খাদ্য গ্রহণ ও বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনে দায়িত্ব পালন করে।
২. **সিলেন্টেরন :** পরিপাক ও পরিবহন গহ্বর হিসেবে শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পাদন করে।
৩. **কর্ষিকাসমূহ :** আত্মরক্ষা, শিকার ধরা, চলন প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়।
৪. **পাদ-চাকতি :** কোন বস্তুর সাথে আটকে থাকতে এবং চলনে সহায়তা করে।
৫. **দেহকাণ্ড :** জনন অঙ্গ এবং মুকুল ধারণ করে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, *Hydra*-র দেহে উপস্থিত বিভিন্ন ধরনের কোষ এককভাবে যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করে। অর্থাৎ বলা যায় *Hydra*-য় শ্রমবণ্টন উল্লেখযোগ্য। প্রাণিরাজ্যে *Hydra* তথা Cnidaria পর্বের প্রাণীতে সর্বপ্রথম কোষের গঠনমূলক বৈষম্য ও শ্রমবণ্টন দেখা যায়।

মিথোজীবিতা (Symbiosis; গ্রিক. *symbioum* = live together)

যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতিভুক্ত জীব ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়, তখন এ ধরনের সাহচর্যকে মিথোজীবিতা বলে। এ অবস্থায় জীবদুটিকে **মিথোজীবী** (symbiont) বলা হয়। *Hydra viridissima* (=*Chlorohydra viridissima*) নামক সবুজ হাইড্রা ও *Zoochlorella* নামক শৈবালের মধ্যে এ সম্পর্ক সুস্পষ্ট দেখা যায়। *Zoochlorella* বা সবুজ শৈবাল হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মিসে বাস করে। হাইড্রা অর্ধস্বচ্ছ প্রাণী হওয়ায় এ শৈবালের অন্তঃস্থ উপস্থিতি এ হাইড্রাকে সবুজ বর্ণ প্রদান করে এবং এজন্য হাইড্রাটিও বাইরে থেকে সবুজ দেখায়। নিম্নোক্তভাবে এরা পরস্পরের কাছ থেকে উপকৃত হয়।

শৈবালের প্রাপ্ত উপকার

i. **আশ্রয় :** শৈবাল হাইড্রার গ্যাস্ট্রোডার্মাল (অন্তঃকোষীয়) পেশি-আবরণী কোষে আশ্রয় পায়;
ii. **সালোকসংশ্লেষণ :** হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ট CO_2-কে সালোকসংশ্লেষণের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে এবং
iii. **খাদ্যোৎপাদন :** হাইড্রার বিপাকীয় কাজে উদ্ভূত N_2 জাত বর্জ্য পদার্থকে আমিষ তৈরির কাজে ব্যবহার করে।

Hydra-র প্রাপ্ত উপকার

i. **খাদ্যপ্রাপ্তি :** সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শৈবাল যে খাদ্য প্রস্তুত করে তার উদ্বৃত্ত অংশ গ্রহণ করে হাইড্রা শর্করা জাতীয় খাদ্যের অভাব পূরণ করে;
ii. **শ্বসন :** সালোকসংশ্লেষণকালে শৈবাল যে O_2 নির্গত করে হাইড্রা তা শ্বসনে ব্যবহার করে;
iii. **CO_2 শোষণ :** হাইড্রার শ্বসনে সৃষ্ট CO_2 শৈবাল গ্রহণ করে প্রাণীকে ঝামেলামুক্ত করে এবং
iv. **বর্জ্য নিষ্কাশন :** হাইড্রার বিপাকে সৃষ্ট N_2-ঘটিত বর্জ্য শৈবাল কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় হাইড্রা সহজেই বর্জ্যপদার্থ মুক্ত হয়।

পরজীবিতা ও মিথোজীবিতার মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	পরজীবিতা	মিথোজীবিতা
১. দুই জীবের মধ্যে সম্পর্ক	একটি প্রজাতি পোষক, অন্যটি পরজীবী।	উভয় প্রজাতিই পরস্পরের মিথোজীবী।
২. নির্ভরশীলতা	পরজীবী পোষকের উপর নির্ভরশীল।	মিথোজীবীরা পরস্পর নির্ভরশীল।
৩. ঘনিষ্ঠতা	পরজীবী পোষকের সাথে সবসময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত নাও থাকতে পারে।	মিথোজীবিতায় একটি সদস্য সব সময় অন্যটির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে।
৪. উপকারিতা	পোষকের ক্ষতির বিনিময়ে পরজীবী আশ্রয়, খাদ্য ও জনন বিষয়ে উপকৃত হয়।	উভয়ে নানাভাবে উপকৃত হয়।
৫. অভিযোজন	অভিযোজনের কারণে পরজীবীদের বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে।	অভিযোজনের কারণে মিথোজীবীদের কোন অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে না।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ব্যবহারিক অংশ

পরীক্ষণ : ১. *Hydra*-র পূর্ণ মাউন্ড পর্যবেক্ষণ

প্রয়োজনীয় উপকরণ : *Hydra*-র স্থায়ী স্লাইড, কিংবা মডেল, অণুবীক্ষণযন্ত্র, চিত্র আঁকার জন্য শীট, পেন্সিল, রাবার ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি : শিক্ষার্থীরা গবেষণাগারে অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে *Hydra*-র স্থায়ী স্লাইড অথবা শিক্ষক প্রদত্ত *Hydra*-র মডেল পর্যবেক্ষণ করে, এটি শনাক্ত করবে, এর শ্রেণিবিন্যাস জানবে, ড্রইং শীটে এর চিহ্নিত চিত্র আঁকবে ও শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখবে।

শনাক্তকরণ

১. দেহটি নলাকার; একপ্রান্ত খোলা ও অন্যপ্রান্ত বন্ধ।
২. মুক্ত প্রান্তে অবস্থিত মোচাকৃতি হাইপোস্টোমের চূড়ায় **মুখছিদ্র** অবস্থিত।
৩. হাইপোস্টোমকে ঘিরে কয়েকটি সুতার মতো **কর্ষিকা** রয়েছে।
৪. দেহের বন্ধ (নিম্ন) প্রান্তে গোলাকার পাদ-চাকতি অবস্থিত।
৫. দেহে **মুকুল** দেখা যায়।

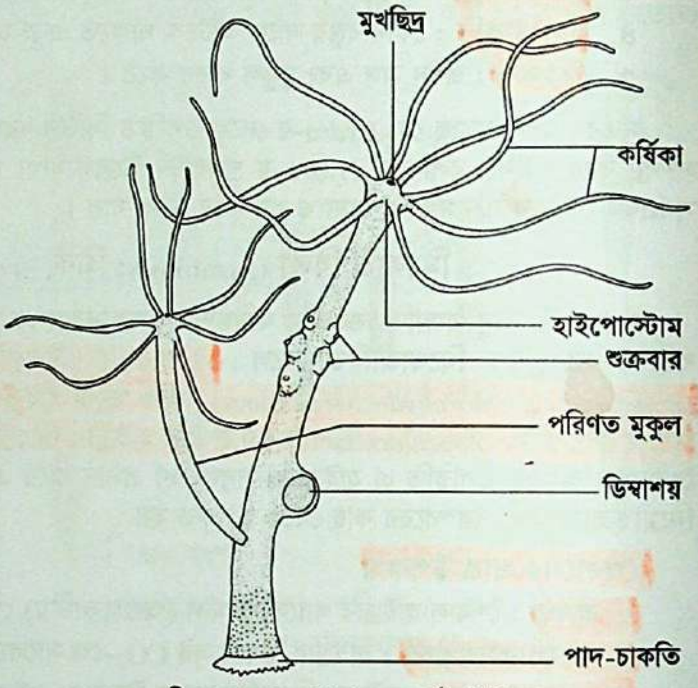

চিত্র ২.১.২৪ : *Hydra*-র পূর্ণ মাউন্ট

[**গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য *Hydra* সংগ্রহ :** গবেষণাগারে পরীক্ষার জন্য খুব সহজেই *Hydra* সংগ্রহ করা যায়। শীতের শুরুতে যখন পুকুর, ডোবা, হ্রদ বা খালের পানি কমতে শুরু করে তখন এসব জলাশয়ের মাত্র ৩০ সেন্টিমিটার গভীর থেকে কিছু ডালপালা বা জলজ উদ্ভিদ কিংবা অন্য কোনো জলজ বস্তু তুলে আনতে হবে। যেহেতু *Hydra* সাধারণত কোনো বস্তুর সাথে আটকানো থাকে তাই পানি থেকে শুধু *Hydra* তুলে আনা সম্ভব নয়। জলাশয় থেকে সংগৃহিত এসব বস্তু পানিপূর্ণ একটি কাঁচের জার (Jar)-এ রেখে সেটি কিছু সময়ের জন্য আলোকিত স্থানে রাখতে হবে। কিছুক্ষণ পর দেখা যাবে *Hydra* গুলো (যদি সংগৃহীত বস্তুগুলোতে থেকে থাকে) জারের তলদেশ বা পার্শ্বপ্রাচীরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। তখন পিপেট (pipette)-এর সাহায্যে এদেরকে পেট্রিডিস বা স্লাইডে উঠিয়ে অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে নিরীক্ষণ করা হয়।]

পরীক্ষণ : ২. *Hydra*-র প্রস্থচ্ছেদের স্লাইড (T. S. of *Hydra*) পর্যবেক্ষণ

প্রদত্ত নমুনাটি *Hydra*-র প্রস্থচ্ছেদ

কারণ–

১. এটি দেখতে আংটির মতো এবং দ্বিস্তরবিশিষ্ট অর্থাৎ **এক্টোডার্ম** ও এণ্ডোডার্ম নিয়ে গঠিত।
২. দুইস্তরের মাঝখানে অকোষীয় মেসোগ্লিয়া আছে।
৩. কেন্দ্রে গোলাকার **সিলেন্টেরন** উপস্থিত।
৪. এক্টোডার্ম ও এণ্ডোডার্মে বিভিন্ন ধরনের কোষ, যেমন-পেশি-আরবণী, ইন্টারস্টিশিয়াল, গ্রন্থিকোষ, স্নায়ুকোষ, সংবেদী কোষ, নিডোসাইট ইত্যাদি দেখা যায়।

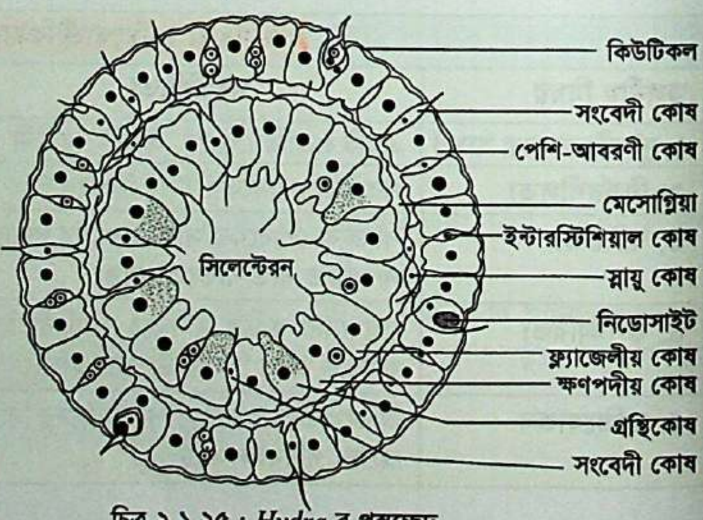

চিত্র ২.১.২৫ : *Hydra*-র প্রস্থচ্ছেদ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL BDNIYOG.COM COPYRIGHT

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২.২ প্রতীক প্রাণী : ঘাসফড়িং (The Grasshopper, *Poekilocerus pictus*)

আরশোলার মতো ঘাসফড়িংও একটি অতিপরিচিত **পতঙ্গ** (insect)। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সবখানে সবুজ শস্যক্ষেত বা সবজির বাগানে বিভিন্ন ধরনের ঘাসফড়িং একা বা দলবদ্ধ হয়ে বিচরণ করে। ঘাসফড়িং-এর কিছু প্রজাতি **পঙ্গপাল** (locust) নামে পরিচিত। এগুলো বাদামি বর্ণের মাঝারি আকৃতির পতঙ্গ এবং ঝাঁক বেঁধে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ঘুরে বেড়ায়। কখনও কখনও এদের সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে মুহূর্তের মধ্যে একটি ক্ষেতের সমস্ত ফসল খেয়ে সাবাড় করে ফেলতে পারে। পঙ্গপাল গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশের শস্যক্ষেতের জন্য মারাত্মক হুমকি।

ঘাসফড়িং যেহেতু একটি করে কাইটিনময় **বহিঃকঙ্কাল**, একটি তিনখণ্ডবিশিষ্ট দেহ (মস্তক, বক্ষ ও উদর), তিনজোড়া সন্ধিযুক্ত পা, জটিল **পুঞ্জাক্ষি** এবং একজোড়া অ্যান্টেনা বহন করে সে কারণে এদের **Insecta শ্রেণিভুক্ত** সদস্য বা পতঙ্গ নামে অভিহিত করা হয়। ঘাস ও লতাপাতার মধ্যে থেকে সেখানেই লাফিয়ে চলে, তাই এর নাম হয়েছে "ঘাসফড়িং"। ঘাসফড়িং দুধরনের, যথা–লম্বা অ্যান্টিনাযুক্ত ঘাসফড়িং-এরা Tettinonidae গোত্রের এবং খাটো অ্যান্টেনাযুক্ত ঘাসফড়িং–এরা Acrididae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত *Poekilocerus pictus* আমাদের দেশের খাটো অ্যান্টিনাযুক্ত ঘাসফড়িংয়ের অন্যতম।

পৃথিবীতে প্রায় বিশ হাজার প্রজাতির ঘাসফড়িং শনাক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে **বিশ প্রজাতির** ঘাসফড়িংয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলো হচ্ছে–*Acrida exaltata, Phlaeoba infumata, Choroedocus robustus, Xenocatantops humilis, Chondracris rosea, Cyrtacanthacris tatarica, Eyprepocnemis rosea, Aulacobothrus luteipes, Hieroglyphus banian, Gastrimargus marmoratus, Oedaleus abruptus, Sphingonotus longipennis, Trilophidia annulata, Gesonula punctifrons, Oxya fuscovittata, Spathosternum prasiniferum, Atractomorpha crenulata, Chrotogonus trachypterus,* এবং *Poekilocerus pictus.*

[*Reference:* Srinivasan, G. and Prabakar, D. 2013. A Pictorial Handbook on Grasshoppers of Western Himalayas.]

শ্রেণিতাত্ত্বিক অবস্থান

Phylum : Arthropoda (সন্ধিপদী, কাইটিননির্মিত বহিঃকঙ্কাল)
Class : Insecta (তিনজোড়া সন্ধিযুক্ত পদ)
Subclass : Pterygota (ডানাবিশিষ্ট পতঙ্গ)
Order : Orthoptera (দুজোড়া ডানাবিশিষ্ট)
Family : Acrididae (খাটো অ্যান্টেনা)
Genus : *Poekilocerus*
Species : *Poekilocerus pictus*

চিত্র ২.২.১ : *Poekilocerus pictus* (প্রাকৃতিক পরিবেশে)

বাসস্থান (Habitat) : ঘাসফড়িং যেহেতু ঘাস, পাতা, শস্য ও শস্যের কচিপাতা আহার করে সে কারণে এমন ধরনের নিচু বসতি এদের পছন্দ। মূলত সব ধরনের আবাসেই (তৃণভূমি, বারিবন, চারণভূমি, মাঠ, মরুভূমি, জলাভূমি প্রভৃতি) বিভিন্ন প্রজাতির ঘাসফড়িং দেখা যায়। স্বাদুপানির ও ম্যানগ্রোভ জলাশয়ে যেহেতু পানির উঠানামা বেশি হয় এবং ডিম পাড়ার জায়গা প্লাবিত হয়ে যায় সে কারণে এসব বসতিতে ঘাসফড়িং কম বাস করে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় ঘাসফড়িং বিপুল সংখ্যায় পরিযায়ী (migratory) হয়, তখন দিনে প্রায় ১৫ কিলোমিটার পর্যন্ত যেতে পারে।

খাদ্য (Food) : ঘাসফড়িং **তৃণভোজী** বা **শাকাশী** (herbivorous) প্রাণী। ডিম থেকে ফোটার পরপরই, নিম্ফ অবস্থায় ঘাসফড়িং চার পাশের যে কোন ছোট ছোট, সহজপাচ্য গাছ, ঘাস বা নতুন কোমল শাখা-প্রশাখা খেতে শুরু করে। দু'একবার খোলস মোচনের পর একটু বড় হলে শক্ত উদ্ভিজ খাবার গ্রহণ করে। তরুণ ঘাসফড়িং পূর্ণাঙ্গদের মতোই নির্দিষ্ট উদ্ভিজ খাবার গ্রহণ করে। তখন খাদ্য তালিকায় ঘাস, পাতা ও শস্য প্রধান খাবার হিসেবে উঠে আসে। বেশির ভাগ ঘাসফড়িং অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ থেকে আহার সংগ্রহ করে, দু'একটি প্রজাতি সুনির্দিষ্ট উদ্ভিদ থেকে আহার গ্রহণ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বাহ্যিক অঙ্গসংস্থান (External Morphology)

ঘাসফড়িং-এর দেহ সরু, লম্বাটে, বেলনাকার (cylindrical) এবং দ্বিপার্শ্বীয় প্রতিসম। পূর্ণাঙ্গ প্রাণী লম্বায় ৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। দেহের রঙ অনেকটা হলদে-সবুজ (yellowish green) ধরনের অথবা বাদামি রঙের মাঝে নানা ধরনের ফোঁটা (spots) বা ডোরাকাটা (markings) হতে পারে। মিশ্রিত এ রঙ তাদের পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলতে এমনকি শত্রুর হাত থেকেও রক্ষা করতে সাহায্য করে। এছাড়াও কিছু ঘাসফড়িং আছে উজ্জ্বল নীল-হলুদ রঙের (যেমন-*Poekilocerus pictus*)।

ঘাসফড়িং-এর সারাদেহ কাইটিনযুক্ত **কিউটিকল** (cuticle)-এ আবৃত। বহিঃকঙ্কাল **হাইপোডার্মিস** (hypodermis) নিঃসৃত পদার্থে সৃষ্ট এবং প্রত্যেক দেহখন্ডকে **স্ক্লেরাইট** (sclerite) নামক কঠিন প্লেটের মতো গঠন সৃষ্টি করে। স্ক্লেরাইটগুলোর সংযোগস্থল **সূচার** (suture) নামে পাতলা নরম ঝিল্লিতে আবৃত। সূচারের উপস্থিতির কারণে দেহখণ্ডক ও উপাঙ্গগুলো সহজেই নড়াচড়া করতে পারে। কিউটিকলের ভিতরে ও নিচে নানা ধরনের রঞ্জক পদার্থ (pigments) থাকায় ঘাসফড়িং-এ বর্ণময়তা দেখা যায়।

চিত্র ২.২.২ : ঘাসফড়িং-এর বাহ্যিক গঠন (পার্শ্বদৃশ্য)

ঘাসফড়িং-এর দেহ খণ্ডকায়িত এবং অন্যসব পতঙ্গের মতো তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত, যেমন–

ক. মস্তক (Head)–পুঞ্জাক্ষি, অ্যান্টেনা ও মুখোপাঙ্গ বহন করে।

খ. বক্ষ (Thorax)–তিনজোড়া পা ও দুজোড়া ডানার সংযোগ সাধন করে এবং বহন করে।

গ. উদর (Abdomen)-শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল (spiracle) এবং জনন অঙ্গসমূহ (genitaliae) ধারণ করে।

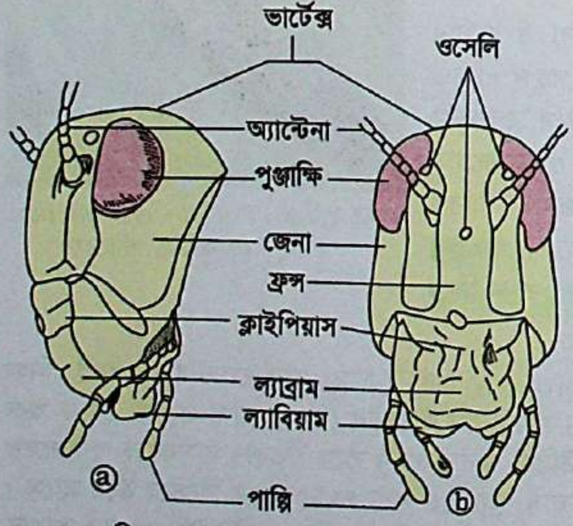

চিত্র ২.২.৩ : ঘাসফড়িং-এর মস্তক;
a. পার্শ্বদৃশ্য এবং b. সম্মুখদৃশ্য

ক. মস্তক (Head)

বাইরে থেকে অখণ্ডকিত (একক) মনে হলেও মূলত ৬টি ভ্রূণীয় খণ্ডকের (embryonic segments) সমন্বয়ে মস্তক গঠিত। এটি দেখতে নাশপাতি আকৃতির এবং হাইপোগন্যাথাস (hypognathous) ধরনের অর্থাৎ মুখছিদ্র নিম্নমুখী হয়ে মস্তকের নিচে অবস্থান করে। মস্তক একটি ছোট ও স্থিতিস্থাপক গ্রীবার সাহায্যে বক্ষলগ্ন হয়ে দেহের সমকোণে অবস্থান করে। ঘাসফড়িং গ্রীবার মাধ্যমে মস্তককে বিভিন্ন দিকে ঘোরাতে পারে। মস্তকের বহিঃকঙ্কালের নাম **হেড ক্যাপস্যুল** (head capsule) বা **এপিক্রেনিয়াম** (epicranium)। মস্তকের বহিঃকঙ্কাল কয়েকটি অংশে বিভক্ত, যেমন– পৃষ্ঠদেশের ত্রিকোণাকার অঞ্চলটি **ভার্টেক্স** (vertex), দুপাশে অবস্থিত **জেনা** (gena), কপালের দিকে চওড়া **ফ্রন্স** (frons) এবং ফ্রন্সের নিচে আয়তাকার প্লেটটি **ক্লাইপিয়াস** (clypeus)। ঘাসফড়িং-এর মস্তক একজোড়া পুঞ্জাক্ষি, তিনটি

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

সরলাক্ষি বা ওসেলি (ocilli), একজোড়া অ্যান্টেনা (antenna) ও এক সেট মুখোপাঙ্গ বহন করে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. পুঞ্জাক্ষি (Compound eye) : ঘাসফড়িং-এর মস্তকের উভয়দিকে পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশে, ১ম খণ্ডকে একজোড়া পুঞ্জাক্ষি থাকে। এগুলো অবৃন্তক এবং মস্তকের এক বিরাট অংশ দখল করে থাকে। দৃষ্টিশক্তির দিক থেকে ঘাসফড়িং যে কোনো আর্থোপোড অপেক্ষা উন্নত। এরা সম্ভবত রঙিন বস্তুও সঠিকভাবে দেখতে পায়। গঠনগত ও কার্যকারিতার দিক থেকে ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষি আরশোলা, চিংড়ি প্রভৃতি আর্থোপোড প্রাণীর মতো। অসংখ্য **ওমাটিডিয়া** (ommatidia)-র সমন্বয়ে এককেটি পুঞ্জাক্ষি গঠিত হয়। ওমাটিডিয়াই পুঞ্জাক্ষির গঠন ও কাজের একক।

২. ওসেলি (Ocelli; একবচনে-ocellus) : ঘাসফড়িং-এর দুটি পুঞ্জাক্ষির মাঝখানে তিনটি সরলাক্ষি বা ওসেলি থাকে। প্রত্যেক ওসেলাস পুরু, স্বচ্ছ কিউটিকলনির্মিত লেন্স ও একগুচ্ছ আলোক সংবেদী কোষ নিয়ে গঠিত। প্রতিটি কোষ রঞ্জক পদার্থসমৃদ্ধ। ওসেলাসের তলদেশে মস্তিষ্কে গমনকারী **স্নায়ুতন্তু** (nerve fibre) অবস্থিত। এর অভ্যন্তরে আলোক সংবেদী কোষ থাকে যারা রেটিনার মতো কাজ করে।

৩. অ্যান্টেনা (Antenna; বহুবচনে-antennae) বা **শুঙ্গ** : ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষির সামনে, মাথার দুপাশে দুটি লম্বা অ্যান্টেনি প্রসারিত থাকে। অ্যান্টেনিদুটি সামনে রেখে চলাফেরা করে এবং ইচ্ছামতো এগুলোকে নাড়াতে পারে। এদুটি নাড়িয়ে এরা স্পর্শ, ঘ্রাণ ও শব্দতরঙ্গ অনুভব করে। **স্কেপ, পেডিসেল ও ফ্লাজেলাম**-এ তিনটি অংশ নিয়ে প্রত্যেক অ্যান্টেনা গঠিত। পেডিসেল খাটো ও অবিভক্ত। ফ্লাজেলাম বেশ লম্বা ও প্রায় ২৫টি খণ্ডকে বিভক্ত।

৪. মুখোপাঙ্গ (Mouth parts) : মুখের চারদিক ঘিরে অবস্থিত নড়নক্ষম, সন্ধিযুক্ত উপাঙ্গগুলোকে একত্রে মুখোপাঙ্গ বলে। ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গ মস্তকের অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত। কচিপাতা বা কাণ্ড চর্বনে ব্যবহৃত হয় বলে ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গকে **চর্বন–উপযোগী** (chewing) বা **ম্যান্ডিবুলেট** (mandibulate) মুখোপাঙ্গ বলে। পাঁচটি অংশের সমন্বয়ে মুখোপাঙ্গ গঠিত– ল্যাব্রাম, ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলা, ল্যাবিয়াম ও হাইপোফ্যারিংক্স।

ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের বিভিন্ন অংশ

❒ **ল্যাব্রাম** (Labrum) : এটি দেখতে অনেকটা চাপা চাকতির মতো এবং উপরের **ওষ্ঠ** (lip) গঠন করে। রঙ সবুজ, বাদামি বা অন্য ধরনের হতে পারে। এর মাঝ বরাবর অংশে একটি খাঁজ দেখা যায়। খাঁজটি খাবার ধরে রাখতে, ম্যান্ডিবলের দিকে ঠেলে দিতে ও স্বাদ নিতে সাহায্য করে।

❒ **ম্যান্ডিবল** (Mandible) : মুখছিদ্রের দুপাশে অবস্থিত, তিনকোণা ও কালো বা বাদামি রঙের বেশ শক্ত ও ভিতরের দিকে সুঁচালো করাতের মতো দাঁতযুক্ত দুটি উপাঙ্গের নাম **ম্যান্ডিবল** বা **চোয়াল**। খাদ্য কেটে চিবানোয় চোয়াল সাহায্য করে।

❒ **ম্যাক্সিলা** (Maxilla) : ম্যান্ডিবলের পিছনে ও বাইরের দিকে প্রতিপাশে একটি করে লম্বাকার ম্যাক্সিলা থাকে। প্রত্যেক ম্যাক্সিলা কয়েকটি খন্ডে বিভক্ত। সবচেয়ে গোড়ার খণ্ডটিকে **কার্ডো** (cardo) ও এরপর অবস্থিত খণ্ডককে **স্টাইপস** (stipes) বলে। স্টাইপসের অগ্রভাগে নখের মতো **ল্যাসিনিয়া** (lacinia) ও ঢাকনির মতো **গ্যালিয়া** (galea) নামক দুটি খণ্ড পাশাপাশি অবস্থান করে। গ্যালিয়ার পাশে পাঁচ অংশবিশিষ্ট **ম্যাক্সিলারি পাল্প** (maxillary palp) রয়েছে। এর উপর থাকে সূক্ষ্ম রোম। খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ, এটি ধরে রাখতে, মুখের ভিতর প্রবেশ করাতে এবং খাদ্য চূর্ণকরণে সাহায্য করা ম্যাক্সিলার কাজ। ম্যাক্সিলারি পাল্প অ্যান্টেনা ও পায়ের অগ্রভাগ পরিষ্কারে অংশ নেয়, খাদ্যবস্তু হরণ প্রতিরোধ করে এবং সংবেদী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

চিত্র : ২.২.৪ : ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের বিভিন্ন অংশের অবস্থান

❒ **ল্যাবিয়াম** (Labium) : ঘাসফড়িং-এর মুখছিদ্রের নিচে মধ্যাংশ বরাবর স্থানে বহুসন্ধিল একটি ল্যাবিয়াম বা **অধঃওষ্ঠ** রয়েছে। ল্যাবিয়ামকে দ্বিতীয় জোড়া ম্যাক্সিলির প্রতিনিধি মনে করা হয়। এটি মূলত

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

দুটি খণ্ডে বিভক্ত, যথা–**মেন্টাম** (mentum) ও **সাবমেন্টাম** (submentum)। প্রতিপাশে মেন্টামের মুক্ত প্রান্তে দুটি নড়নশীল **লিগুলি** (ligulae) এবং তিন সন্ধিযুক্ত **ল্যাবিয়াল পাল্প** (labial palp) থাকে। এটি খাবার ফসকে যাওয়া রোধ করে ও চর্বিত খাদ্য মুখে প্রবেশ করায়। ল্যাবিয়াল পাল্প সংবেদনশীল অঙ্গ হিসেবে কাজ করায় এটি উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচনে সাহায্য করে।

চিত্র ২.২.৫ : ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের বিভিন্ন অংশের চিত্ররূপ

❑ **হাইপোফ্যারিংক্স** (Hypopharynx) : ল্যাব্রামের নিচে ক্ষুদ্র, মাংসল হাইপোফ্যারিংক্স বা উপজিহ্বাটি অবস্থিত। এটি চারদিকে ম্যান্ডিবল, ম্যাক্সিলা ও ল্যাবিয়াম দিয়ে পরিবৃত থাকে। ল্যাবিয়ামের ভিতরের কিনারা থেকে সৃষ্ট একটি ঝিল্লি হাইপোফ্যারিংক্সের অংকীয়তলের সাথে যুক্ত থাকে। খাদ্যবস্তুকে নাড়াচাড়া করে লালার সাথে মেশাতে সাহায্য করাই এর কাজ।

খ. বক্ষ (Thorax)

মস্তকের পিছনে মাংসল বক্ষ একটি খাটো, সরু ও নমনীয় গ্রীবা (neck)-র সাহায্যে যুক্ত। ঘাসফড়িং-এর বক্ষাঞ্চল তিনটি অংশে বিভক্ত; যথা–**অগ্রবক্ষ** (prothorax), **মধ্যবক্ষ** (mesothorax) এবং **পশ্চাৎবক্ষ** (metathorax)। প্রত্যেক অংশের পৃষ্ঠদেশ **টার্গাম** (tergum), অঙ্কীয়দেশ **স্টার্নাম** (sternum) ও পার্শ্বদেশ **প্লিউরন** (pleuron)-এ গঠিত। এগুলো পাতলা কিউটিকলের পর্দা দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত। অগ্রবক্ষের টার্গাম অংশটি বেশ বড়, চওড়া এবং পিছনে ও পাশে প্রসারিত। এর নাম **প্রোনোটাম** (pronotum)। বক্ষাঞ্চলে রয়েছে শ্বাসরন্ধ্র, ডানা ও পা।

১. শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল (Spiracle) : বক্ষের অঙ্কীয়-পার্শ্বদেশে দুজোড়া শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল অবস্থিত। প্রথম জোড়া প্রোনোটামের নিচে অগ্র ও মধ্যবক্ষের মাঝে এবং দ্বিতীয় জোড়া মধ্য ও পশ্চাৎবক্ষের মাঝে অবস্থিত।

২. ডানা (Wings) : মধ্য ও পশ্চাৎবক্ষের পিঠের দিকে অর্থাৎ টার্গাম ও প্লিউরনের মধ্যবর্তীস্থান থেকে একজোড়া করে, মোট দুজোড়া পাতলা কিউটিকল নির্মিত ডানা রয়েছে। ডানাগুলো প্রথম অবস্থায় দ্বিস্তরবিশিষ্ট প্রাচীর হিসেবে থলির মতো সৃষ্টি হয়, পরে পূর্ণাঙ্গ ডানায় পরিণত হয়। প্রত্যেক ডানা অসংখ্য ছোট নালির মতো ও রক্তে পূর্ণ শিরা-উপশিরায় গঠিত। দুজোড়া ডানার গঠন ও কাজ পৃথক ধরনের। মধ্যবক্ষীয় (mesothoracic) ডানা অর্থাৎ সামনের ডানাদুটি বেশ শক্ত, ছোট, সরু এবং কখনও উড়তে সাহায্য করে না। এগুলো পিছনের দুই ডানাকে ঢেকে রাখে। সেজন্য এগুলোকে **এলিট্রা** (elytra), ডানার আবরণ (wing covers) বা **টেগমিনা** (tegmina) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পিছনের বা পশ্চাৎবক্ষীয় (metathoracic) ডানাদুটি বেশ বড়, চওড়া, পর্দার মতো (membranous), স্বচ্ছ এবং উড়তে সাহায্য করে। বিশ্রামের সময় পিছনের ডানাজোড়া অগ্র ডানার নিচে গুটানো থাকে।

চিত্র ২.২.৬ : ঘাসফড়িং-এর ডানা

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৩. পা (Legs) : বক্ষের প্রত্যেক অংশে একজোড়া করে মোট তিনজোড়া পা রয়েছে। প্রতিটি পা পাঁচখণ্ডে বিভক্ত: একেবারে গোড়ায় স্থূল, তিনকোণা কক্সা (coxa); এর পরের ত্রিভুজাকার ক্ষুদ্র ট্রোক্যান্টার (trochanter); পরের লম্বা, নলাকার ও দৃঢ় ফিমার (femur); তার পরবর্তী সরু টিবিয়া (tibia); এবং সবশেষে টার্সাস (tarsus)। টার্সাস তিনটি ছোট উপখণ্ডকে বিভক্ত। এগুলোকে টার্সোমিয়ার (tarsomeres) বলে। টার্সাসের মাথায় সূঁচালো নখর (claws) থাকে। এ ছাড়াও প্রত্যেক পায়ের টিবিয়া ও টার্সাস অংশের পার্শ্বদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূঁচালো কাঁটা থাকে। ঘাসফড়িং-এর পা হাঁটা ও আরোহণে ব্যবহৃত হয়। তবে ফিমার অংশ অনেক বড় ও মাংসল গড়নের হওয়ায় এরা লাফিয়ে দূরের পথ অতিক্রম করতে পারে। টিবিয়া ও টার্সাস শক্ত কাঁটাযুক্ত হওয়ায় খাদ্য ধরতে সাহায্য করে।

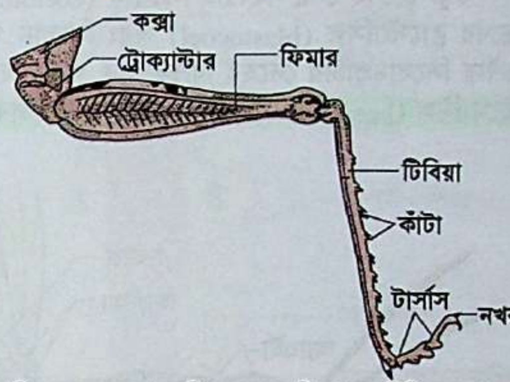

চিত্র ২.২.৭ : ঘাসফড়িং-এর একটি পায়ের বিভিন্ন অংশ

গ. উদর (Abdomen)

ঘাসফড়িং-এর উদর বেশ লম্বা, সরু এবং ১১টি খণ্ডকে বিভক্ত। প্রত্যেক খণ্ডকের পৃষ্ঠদেশে টার্গাম (tergum) এবং অঙ্কীয়দেশে স্টার্নাম (sternum) থাকে, কোন প্লিউরন থাকে না। ১ম উদরীয় খণ্ডকটি অসম্পূর্ণ; কারণ, এর স্টার্নাম পশ্চাৎবক্ষের সাথে যুক্ত থাকে। এতে শুধু টার্গাম থাকে।

ঘাসফড়িং-এর উদরাঞ্চল নিচে বর্ণিত অঙ্গসমূহ বহন করে।

১. টিমপেনাম (Tympanum) : ১ম খণ্ডকের প্রতিপাশে একটি করে পর্দা রয়েছে যা শ্রবণ অঙ্গ বা শ্রবণ থলি (auditory sac)-কে আবৃত রাখে। এর নাম টিমপেনিক পর্দা বা টিমপেনাম।

২. শ্বাসরন্ধ্র (Spiracle) : ১ম থেকে ৮ম দেহখণ্ডক পর্যন্ত প্রতিটি খন্ডকের পার্শ্বদেশে একজোড়া করে মোট আটজোড়া শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল থাকে যার প্রথমটি অন্যগুলো হতে আকারে বড়।

৩. পায়ু ও বহিঃজনন অঙ্গ : ৯ম ও ১০ম উদরীয় খণ্ডকের টার্গাম আংশিকভাবে ও স্টার্নাম পুরোপুরি একীভূত। ১১শ খণ্ডকের টার্গাম পায়ুর উপরে প্লেটের মতো একটি আবরণ (supra anal plate) তৈরি করে। পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের উদর অঞ্চলের গঠনে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। পুরুষ ঘাসফড়িং-এর ১০ম খন্ডের পেছন দিকের উভয় পাশে একজোড়া ছোট প্রক্ষেপক রয়েছে যা অ্যানাল সারকাস (anal cercus; বহুবচনে anal cerci) নামে পরিচিত। স্ত্রী ঘাসফড়িং-এর ৯ম স্টার্নাম লম্বাকৃতির যা স্ত্রীজননরন্ধ্র ধারণ করে। এদের উদরের শেষ প্রান্তে ৮ম ও ৯ম খন্ড অঙ্কীয়ভাবে একটি নলাকৃতি বিশেষ অঙ্গ তৈরি করে, যার নাম ওভিপজিটর (ovipositor)।

পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের পার্থক্য

পুরুষ ঘাসফড়িং	স্ত্রী ঘাসফড়িং
১. পুরুষ ঘাসফড়িং তুলনামূলকভাবে আকারে ছোট।	১. স্ত্রী ঘাসফড়িং তুলনামূলকভাবে আকারে বড়।
২. পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের উদর সরু।	২. স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের উদর কিছুটা প্রশস্ত।
৩. পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের উদরের ৯ম খণ্ডাংশে পুংজনন ছিদ্র বিদ্যমান।	৩. স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের উদরের ৮ম ও ৯ম খণ্ডাংশ মিলে জননছিদ্র গঠন করে।
৪. পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের নবম খণ্ডকের স্টার্নাম প্রলম্বিত হয়ে **সাবজেনিটাল প্লেট** গঠন করে যা উক্ত খণ্ডকের শেষে বিদ্যমান জনন ছিদ্রকে ঢেকে রাখে।	৪. স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের নবম খণ্ডকের স্টার্নাম প্রলম্বিত ও রূপান্তরিত হয়ে ডিম পাড়ার অঙ্গ **ওভিপজিটর** (ovipositor) গঠন করে।
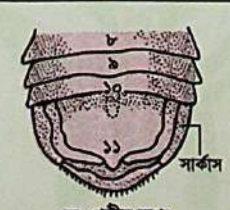 ক. পৃষ্ঠীয় দৃশ্য 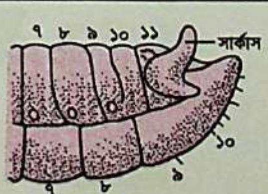 খ. পার্শ্বীয় দৃশ্য	গ. পৃষ্ঠীয় দৃশ্য 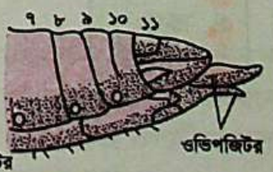 ঘ. পার্শ্বীয় দৃশ্য

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ঘাসফড়িং-এর সিলোম ও অন্তর্গঠন (Coelom and Internal structures of Grasshopper)

শুধু ভ্রূণেই দেহ গহ্বরটি সিলোম (coelom) আকারে অবস্থান করে। পরিণত প্রাণীতে যে গহ্বর দেখা যায় তা ভ্রূণের **ব্লাস্টোসিল** (blastocoel) এবং সিলোম গহ্বরের সংযুক্তির ফলে সৃষ্ট। এর নাম **মিক্সোসিল** (mixocoel)। ভ্রূণীয় সিলোমপ্রাচীর দেহের বিভিন্ন অঙ্গ গঠনে ব্যবহৃত হয়। মিক্সোসিলের ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয় বলে এটি **হিমোসিল** (haemocoel) নামে অভিহিত এবং প্রবাহমান তরল পদার্থ হচ্ছে **হিমোলিম্ফ** (haemolymph)।

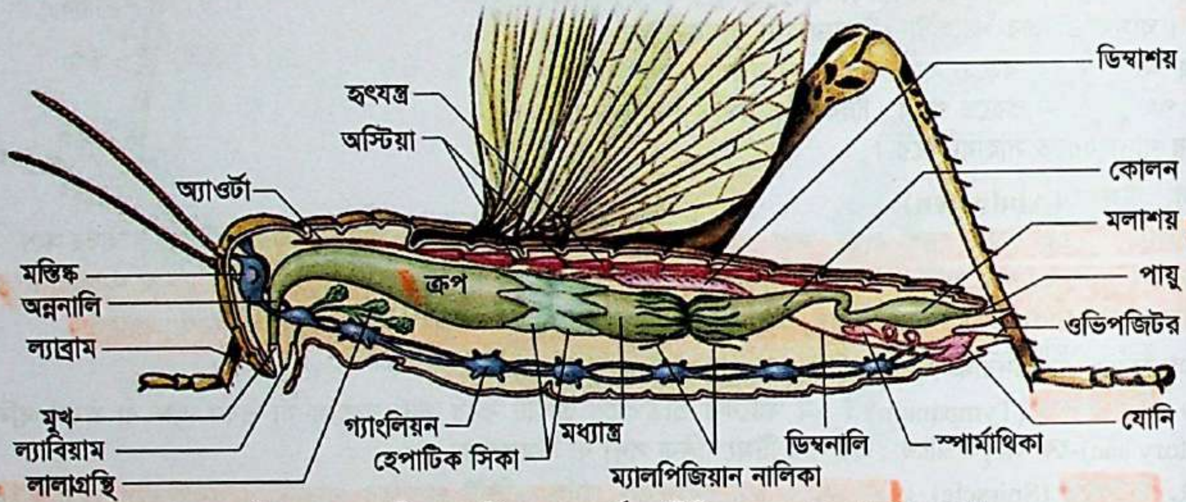

চিত্র ২.২.৮ : স্ত্রী ঘাসফড়িং-এর অন্তর্গঠন (বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্র দেখানো হয়েছে)

দেহের পৃষ্ঠদেশে রক্ত সংবহনতন্ত্রের **অ্যাওর্টা** ও **হৃৎযন্ত্র**; অঙ্কীয়দেশে **স্নায়ুরজ্জু** এবং দেহের মাঝ বরাবর পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশ অবস্থান করে। সম্মুখ অংশের তলদেশে **লালাগ্রন্থি** প্রসারিত থাকে। মধ্য ও পশ্চাৎ-পৌষ্টিকনালির সংযোগস্থলে অসংখ্য সুতার মতো **ম্যালপিজিয়ান নালিকা** হিমোসিলে বিস্তৃত। হিমোসিলের অভ্যন্তরে অন্যান্য অঙ্গাণু দেখা যায়।

ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্র (Digestive System of Grasshopper)

ঘাসফড়িং-এর খাদ্যাভ্যাসের সাথে পৌষ্টিকতন্ত্র অভিযোজিত এবং প্রধান দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। যথা-**পৌষ্টিকনালি** ও **পৌষ্টিকগ্রন্থি**। ছকের মাধ্যমে পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ দেখানো হলো।

পৌষ্টিকতন্ত্র
- পৌষ্টিকনালি
  - স্টোমোডিয়াম
    1. মুখছিদ্র
    2. গলবিল
    3. গ্রাসনালি
    4. ক্রপ
    5. গিজার্ড
  - মেসেন্টেরন
  - প্রোক্টোডিয়াম
    1. ইলিয়াম
    2. কোলন
    3. রেকটাম
    4. পায়ুছিদ্র
- পৌষ্টিকগ্রন্থি
  - লালাগ্রন্থি
  - মেসেন্টেরনের অন্তঃআবরণ
  - হেপাটিক সিকা

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

নিচে ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

পৌষ্টিকনালি (Alimentary Canal)

ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকনালি সরল প্রকৃতির এবং **মুখছিদ্র** থেকে **পায়ুছিদ্র** পর্যন্ত দেহের মধ্যরেখা বরাবর সোজা নালি হিসেবে অবস্থিত। বর্ণনার সুবিধার জন্য পৌষ্টিকনালিকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে: স্টোমোডিয়াম, মেসেন্টেরন ও প্রোক্টোডিয়াম।

১. স্টোমোডিয়াম বা অগ্র-পৌষ্টিকনালি (Stomodaeum or Foregut) : এটি মুখছিদ্র থেকে গিজার্ড পর্যন্ত বিস্তৃত পৌষ্টিকনালির প্রথম অংশ। ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উদ্ভূত এ অংশটির অন্তঃপ্রাচীর **কাইটিন** (chitin) নির্মিত শক্ত আবরণে আবৃত। এটি প্রধানত নিচে উল্লেখিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

ক. **মুখছিদ্র** (Mouth) : এটি প্রাকমৌখিক প্রকোষ্ঠ (preoral cavity) বা **সিবেরিয়াম** (cibarium) নামক প্রকোষ্ঠের গোড়ায় অবস্থিত ছিদ্রবিশেষ। প্রকোষ্ঠটি মুখোপাঙ্গে বেষ্টিত থাকে।

কাজ : সিবেরিয়ামে খাদ্যবস্তু গৃহীত হয় এবং মুখছিদ্র পথে খাদ্য দেহে প্রবেশ করে।

খ. **গলবিল** (Pharynx) : মুখছিদ্রটি ছোট নলাকার ও পেশিবহুল গলবিলে উন্মুক্ত।

কাজ : এর মাধ্যমে খাদ্যবস্তু গ্রাসনালিতে প্রবেশ করে।

গ. **গ্রাসনালি** (Oesophagus) : এটি গলবিলের পিছনে সরু, সোজা, নলাকার পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট নালি।

কাজ : খাদ্যবস্তু মুখ থেকে বহন করে ক্রপে পৌঁছায়।

ঘ. **ক্রপ** (Crop) : গ্রাসনালি স্ফীত হয়ে মোচাকার থলির মতো ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত ক্রপ গঠন করে।

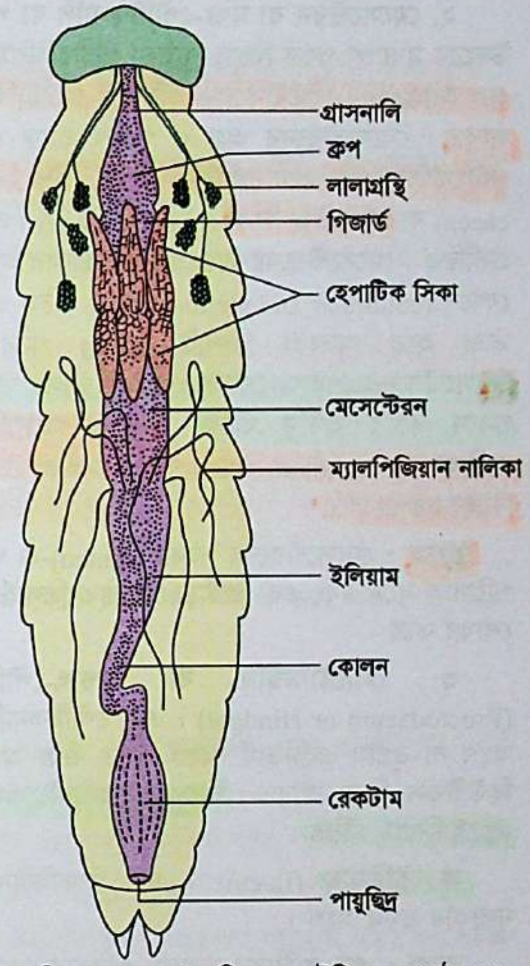

চিত্র ২.২.৯ : ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্র (পৃষ্ঠদৃশ্য)

কাজ : খাদ্যবস্তু কিছু সময়ের জন্য এখানে জমা থাকে। ক্রপের সংকোচন প্রসারণে খাদ্য কিছুটা চূর্ণ হয় এবং লালার এনজাইম পরিপাকের সূত্রপাত ঘটায়।

ঙ. **গিজার্ড বা প্রোভেন্ট্রিকুলাস** (Gizzard or Proventriculus): এটি ক্রপের পরবর্তী ত্রিকোণাকার বেশ শক্ত, পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট এবং অন্তঃপ্রাচীরের কাইটিনময় ছটি দাঁত ও ছটি অনুলম্ব ভাঁজ নিয়ে গঠিত অংশ। দাঁতের পিছনে চুল ও ছটি প্যাড থাকে। এর পরের অংশে থাকে পিছনে প্রসারিত কপাটিকা।

কাজ : গিজার্ডের দৃঢ় সংকোচন-প্রসারণ খাদ্যকে চূর্ণ করে; প্যাডের চুলগুলো খাদ্যকণাকে মেসেন্টেরনে প্রবেশের সময় ছাঁকনির কাজ করে; এবং কপাটিকাগুলো খাদ্যকে বিপরীতদিকে আসতে বাধা দেয়।

চিত্র ২.২.১০ : স্টোমোডিয়াম ও মেসেন্টেরনের লম্বচ্ছেদ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. মেসেন্টেরন বা মধ্য-পৌষ্টিকনালি বা পাকস্থলি (Mesenteron or Midgut) : গিজার্ডের পর থেকে শুরু করে উদরের মধ্যাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট অংশটি মেসেন্টেরন। এটি ভ্রূণীয় এন্ডোডার্ম স্তর থেকে সৃষ্টি হয় এবং এর অন্তঃপ্রাচীর কিউটিকলের পরিবর্তে **পেরিট্রফিক পর্দা** (peritrophic membrane) নামক বৈষম্যভেদ্য পর্দা দিয়ে আবৃত। মেসেন্টেরনের অগ্র ও পশ্চাৎ প্রান্তে **পেশির বলয় বা স্ফিংক্টার** (sphincter) থাকে। মেসেন্টেরন এবং স্টোমোডিয়ামের সংযোগস্থলে ৬ জোড়া ফাঁপা, লম্বা মোচাকার থলি থাকে। সেগুলো হচ্ছে **গ্যাস্ট্রিক সিকা** (gastric caeca) বা **হেপাটিক সিকা** (hepatic caeca)। প্রতিজোড়া হেপাটিক সিকার একটি সামনের দিকে অন্যটি পিছন দিকে প্রসারিত। মেসেন্টেরনের অন্তঃপ্রাচীর স্তম্ভাকার অন্তঃত্বকীয় কোষে (columnar endodermal cells) গঠিত এবং এটি ভাঁজ হয়ে অসংখ্য **ভিলাই** (villi) গঠন করে। মেসেন্টেরনের শেষ অংশে অসংখ্য সূক্ষ্ম চুলের মতো এবং হলদে বর্ণের অঙ্গাণু থাকে। এগুলো **ম্যালপিজিয়ান নালিকা** (malpighian tubules) যা মূলত রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

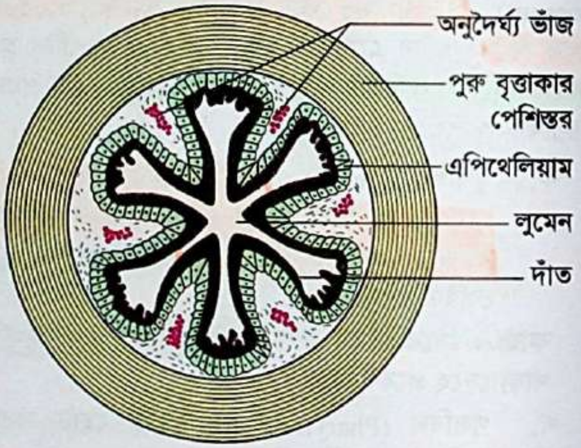

চিত্র ২.২.১১ : গিজার্ডের প্রস্থচ্ছেদ

কাজ : মেসেন্টেরনের গহ্বর (lumen)-এ খাদ্যবস্তুর পরিপাক ঘটে এবং এর প্রাচীরে অবস্থিত ভিলাই খাদ্যরস শোষণ করে।

৩. প্রোক্টোডিয়াম বা পশ্চাৎ-পৌষ্টিকনালি (Proctodaeum or Hindgut) : এটি পৌষ্টিকনালির শেষ অংশ যা ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে উদ্ভূত এবং অন্তঃপ্রাচীর কিউটিকল দিয়ে আবৃত। নিচে বর্ণিত ৪টি অংশ নিয়ে প্রোক্টোডিয়াম গঠিত।

ক. ইলিয়াম (Iluem) : এটি প্যাঁচবিহীন, চওড়া নলাকার প্রথম অংশ।

কাজ : এর প্রাচীরের মাধ্যমে পরিপাককৃত খাদ্যরস শোষিত হয়।

খ. কোলন (Colon) : এটি ইলিয়ামের পিছনে অবস্থিত সরু নলাকার অংশ।

কাজ : পাচিত খাদ্যবস্তুর অবশিষ্টাংশ পানিসহ শোষিত হয়।

গ. রেকটাম বা মলাশয় (Rectum) : এটি পৌষ্টিকনালির সর্বশেষ স্ফীত ও পুরু প্রাচীরযুক্ত অংশ। এর অন্তঃস্থ প্রাচীরে ছয়টি **রেকটাল প্যাপিলা** (rectal papilla; বহুবচনে-papillae) নামক অনুলম্ব ভাঁজ রয়েছে।

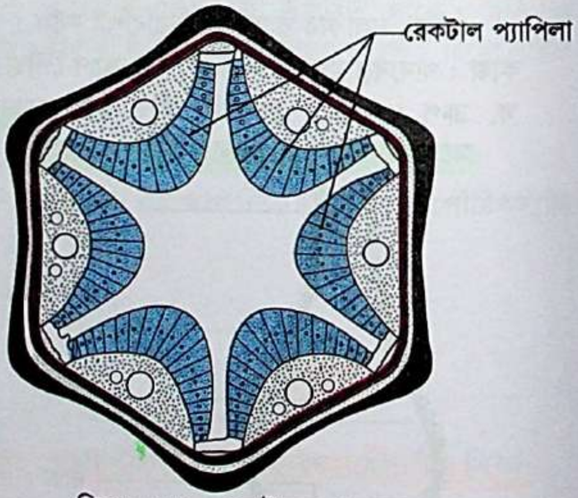

চিত্র ২.২.১২ : রেকটামের প্রস্থচ্ছেদ

কাজ : মল থেকে অতিরিক্ত পানি, খনিজ লবণ, অ্যামিনো এসিড শোষণ করা এবং অপাচ্য অংশ সাময়িক জমা রাখা এর কাজ।

ঘ. পায়ুছিদ্র (Anus) : এটি মলাশয়ের শেষপ্রান্তে অবস্থিত ছিদ্রপথ। এটি দশম দেহখণ্ডকের অঙ্কীয়দেশে উন্মুক্ত হয়।

কাজ : অপাচ্য অংশ মল (faeces) হিসেবে দেহ থেকে অপসারণ করা।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

পৌষ্টিকগ্রন্থি (Digestive Glands)

ঘাসফড়িং-এর লালাগ্রন্থি, মেসেন্টেরনের অন্তঃআবরণ এবং হেপাটিক সিকা পৌষ্টিকগ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। নিচে এসব অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. লালাগ্রন্থি (Salivary glands) : এটি ঘাসফড়িং-এর প্রধান পৌষ্টিকগ্রন্থি। ক্রপের নিচে ক্ষুদ্র, শাখাপ্রশাখা-যুক্ত একজোড়া লালাগ্রন্থি অবস্থিত। লালাগ্রন্থির নালি ল্যাবিয়ামের গোড়ায় গলবিলে উন্মুক্ত হয়।

কাজ : লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত **লালরস** (saliva) খাদ্য গলাধঃকরণ ও চর্বণে সাহায্য করে। কিছু শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাকেও এটি ভূমিকা পালন করে।

২. মেসেন্টেরন বা মধ্য-পৌষ্টিকনালির অন্তঃআবরণ : মেসেন্টেরনের অন্তঃপ্রাচীরে বেশ কিছু ক্ষরণকারী কোষ (secretary cells) আছে যা থেকে পাচকরস ক্ষরিত হয়।

কাজ : ক্ষরিত পাচকরস খাদ্য পরিপাকে অংশ নেয়।

৩. হেপাটিক সিকা (Hepatic caeca) : অগ্র ও মধ্য-পৌষ্টিকনালির সংযোগস্থলে অবস্থিত কোণ (cone) আকৃতির ছয়জোড়া লম্বা স্বচ্ছ নালিকাকে হেপাটিক বা গ্যাস্ট্রিক সিকা বলে।

কাজ : হেপাটিক সিকার অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত ক্ষরণকারী কোষ থেকে পাচকরস ক্ষরিত হয়ে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।

খাদ্য গ্রহণ ও পরিপাক (Feeding & Digestion)

খাদ্য : ঘাসফড়িং সম্পূর্ণ তৃণভোজী বা শাকাশী (herbivorous) প্রাণী। ঘাস, শস্যদানা, লতা-পাতা খেয়ে এরা জীবনধারণ করে। এদের খাবারে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় সমস্ত উপাদানই থাকে।

খাদ্য গ্রহণ পদ্ধতি : ঘাসফড়িংয়ের যে মুখোপাঙ্গ তা শুধু চিবানোর কাজে ব্যবহৃত হয় বলে, এদের খাদ্য গ্রহণকে **চর্বণ** (chewing) এবং মুখোপাঙ্গকে চর্বণ-উপযোগী বা ম্যান্ডিবুলেট (chewing or mandibulate) মুখোপাঙ্গ বলে।

ঘাসফড়িং প্রথমে ম্যাক্সিলারি ও ল্যাবিয়াল পাল্পের মাধ্যমে খাদ্য নির্বাচন করে। অগ্রপদ, ল্যাব্রাম এবং ল্যাবিয়াম খাদ্যবস্তু আটকে ধরে। ম্যান্ডিবল এবং ম্যাক্সিলি খাদ্যবস্তুর ক্ষুদ্র অংশ কেটে চোষণ করে।

পরিপাক : খাদ্য প্রাকমৌখিক প্রকোষ্ঠে পৌঁছার পরই লালাগ্রন্থি নিঃসৃত **লালারস**-এর সাথে মিশ্রিত হয়। লালারসে অ্যামাইলেজ, কাইটিনেজ ও সেলুলেজ এনজাইম থাকে যা বিভিন্ন ধরনের শর্করাকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করে। খাদ্যবস্তু প্রাকমৌখিক প্রকোষ্ঠ থেকে ক্রপে পৌঁছায়, এখান থেকে গিজার্ডে প্রেরিত হয়। আংশিক পরিপাককৃত খাদ্য গিজার্ডে প্রবেশ করলে কাইটিনময় দাঁতে পিষ্ট হয়ে অতি সূক্ষ্ম কণাসমৃদ্ধ **পেস্ট** (paste)-এ পরিণত হয়। এগুলো গিজার্ডে অবস্থিত সূক্ষ্ম রোমে পরিস্রুত হয়ে মেসেন্টেরনে প্রবেশ করে। মেসেন্টেরনের অন্তঃগাত্র এবং হেপাটিক সিকা ক্ষরণ ও শোষণতলরূপে কাজ করে। মেসেন্টেরনে মলটেজ, ট্রিপটেজ, অ্যামাইলেজ, ইনভার্টেজ, লাইপেজ প্রভৃতি এনজাইমের উপস্থিতিতে খাদ্যবস্তু সরল, তরল খাদ্যরসে পরিণত হয়। পরিপাককৃত খাদ্যবস্তু মেসেন্টেরনের কোষীয় প্রাচীরের মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে হিমোসিলে প্রবেশ করে সারা দেহে পরিবাহিত হয়।

অজীর্ণ খাদ্যবস্তু কোলনের ভিতর দিয়ে মলাশয়ে পৌঁছার আগেই কোলনের প্রাচীর তা থেকে পানি, লবণ, অ্যামিনো এসিড ও অজৈব আয়ন শোষণ করে নেয়। পরে কঠিন অপাচ্য বস্তু মলরূপে পায়ু পথে বাইরে নির্গত হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ব্যবহারিক অংশ

আরশোলা ও ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গ পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি

১. ঘাসফড়িং বা আরশোলার মাথাটি বাম হাতের বৃদ্ধ ও তর্জনী আঙ্গুলের মাঝখানে চেপে ধরে প্রথমেই বিভিন্ন উপাঙ্গগুলোকে শনাক্ত করতে হবে।

২. একটি চিমটার সাহায্যে প্রতিটি উপাঙ্গের গোড়ায় চাপ দিয়ে প্রথমে ল্যাব্রাম, পরে একে একে ম্যান্ডিবল ম্যাক্সিলা, হাইপোফ্যারিংক্স এবং সর্বশেষে ল্যাবিয়াম তুলে ফেলতে হবে।

৩. একটি স্লাইডে আগে থেকে রক্ষিত কিছু গ্লিসারিনে এগুলো ডুবিয়ে রাখতে হবে।

৪. সরল অণুবীক্ষণযন্ত্রে স্লাইডটি স্থাপন করে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে চিহ্নিত চিত্র আঁকতে হবে।

ঘাসফড়িং-এর মুখোপাঙ্গের চিত্রঃ ২.২.৫

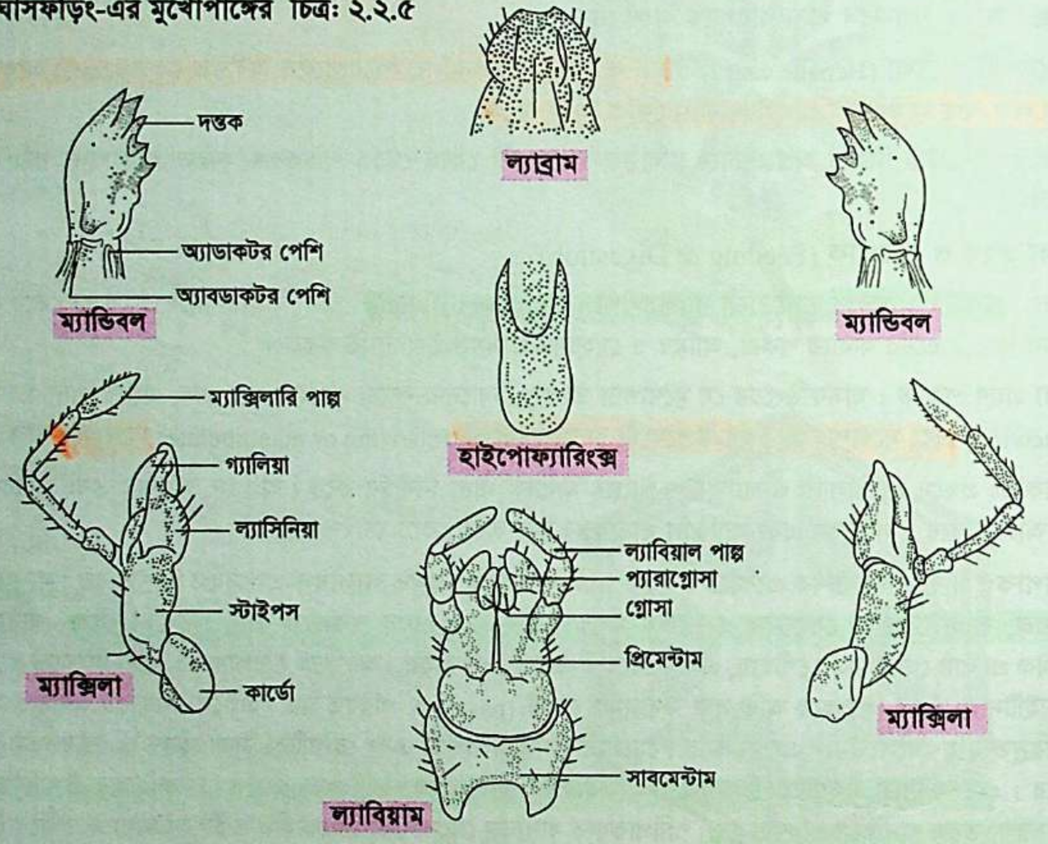

চিত্র ২.২.১৩ : আরশোরার মুখোপাঙ্গ

পর্যবেক্ষণ

১. **ল্যাব্রাম :** এটি চওড়া পাতের মতো এবং মস্তকের সম্মুখে আটকানো থাকে।

২. **ম্যান্ডিবল :** এরা শক্ত, মজবুত, বাঁকা ও দাঁতযুক্ত।

৩. **প্রথম ম্যাক্সিলাঃ** এটি ম্যান্ডিবলের পিছনে অবস্থিত। এর গোড়ার অংশ কার্ডো, স্টাইপস ও ল্যাসিনিয়া নিয়ে গঠিত।

৪. **দ্বিতীয় ম্যাক্সিলা বা ল্যাবিয়াম :** ১ম ম্যাক্সিলার পিছনে অবস্থিত। সাবমেন্টাম, মেন্টাম ইত্যাদি নিয়ে গঠিত। ল্যাবিয়াল পাল্প দেখা যায়।

৫. **হাইপোফ্যারিংক্স :** এটি লম্বা নলের মতো উপজিহ্বা।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ঘাসফড়িং / আরশোলার পৌষ্টিকতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

একটি সদ্যমৃত বা নিস্তেজ ঘাসফড়িং বা আরশোলার ডানা কেটে বাম হাতে ধরে বক্ষ উদরের টার্গা ও স্টার্ণা পৃথক করার জন্য দেহের দুপাশ বরাবর সূক্ষ্ম কাঁচি প্রবেশ করিয়ে কাটতে হবে। প্রাণিটিকে এখন পানিপূর্ণ ট্রেতে পিঠ উপরে রেখে পিন দিয়ে আটকে দিতে হবে। চিমটার সাহায্যে একটির পর একটি টার্গা ছাড়াতে হবে। এভাবে বক্ষ ও উদর উন্মুক্ত করার পর ব্যবহৃত পানি ফেলে পরিষ্কার পানি দিয়ে ট্রে ভর্তি করতে হবে। পৌষ্টিকনালিকে একটু টেনে একপাশে পিন দিয়ে আটকে বিভিন্ন অংশ পর্যবেক্ষণ (তত্ত্বীয় অংশে বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে) করে চিত্র এঁকে চিহ্নিত করতে হবে। ঘাসফড়িং-এর পৌষ্টিকতন্ত্রের চিত্র নং-২.২.৯।

লালাগ্রন্থি পর্যবেক্ষণ

পৌষ্টিকনালি ব্যবচ্ছেদ করার সময় অন্ননালি পর্যন্ত বের করে ধীরে ধীরে সুঁচ এবং চিমটার সাহায্যে চর্বি ও মাংসপেশিগুলো ছাড়াতে হবে। সাদা পাতার মতো দেখতে **লালাগ্রন্থি** দেখার সাথে সাথে লালাগ্রন্থি নালির অবস্থান লক্ষ করে ধীরে ধীরে উপরের দিকে উপ-জিহ্বা (হাইপোফ্যারিংক্স) পর্যন্ত অগ্রসর হতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যে

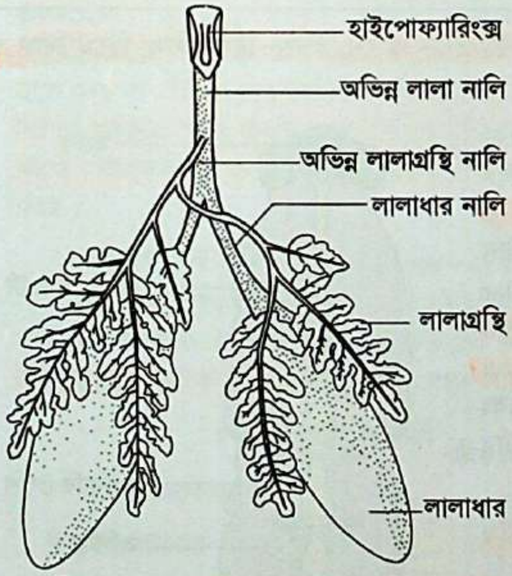

চিত্র ২.২.১৪ : আরশোলার লালাগ্রন্থি

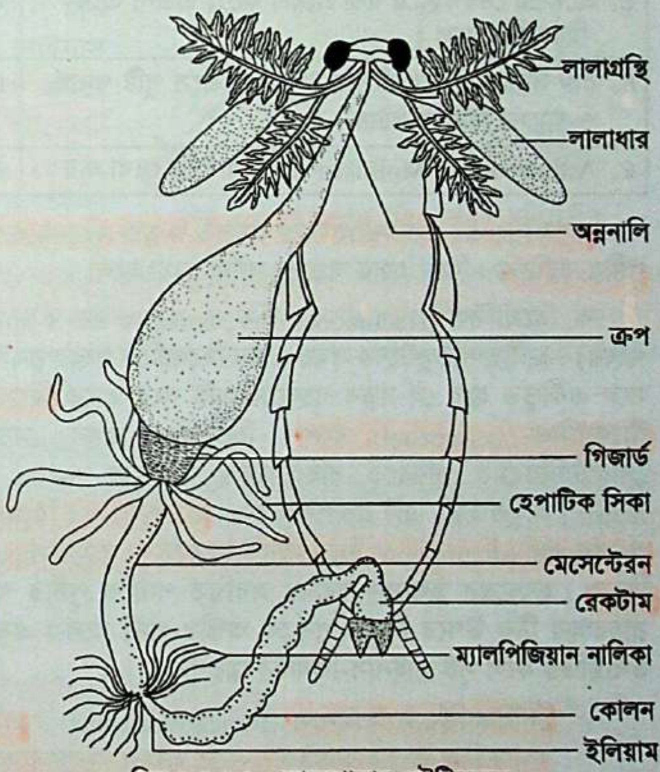

চিত্র ২.২.১৫ : আরশোলার পৌষ্টিকতন্ত্র

লালাগ্রন্থিগুলোর মাঝখানে উভয় পাশে একটি করে বেলুনের মতো যে **লালাধার** রয়েছে তা যেন ছিঁড়ে না যায়। **হাইপোফ্যারিংক্স**সহ অভিন্ন **লালাগ্রন্থি নালি, লালাগ্রন্থি** ও **লালাধার** তুলে একটি স্লাইডে রাখতে হবে। এবার স্লাইডকে সরল অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে রেখে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে চিহ্নিত চিত্র আঁকতে হবে।

ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র (Blood Circulatory System)

জীবদেহের প্রয়োজনীয় উপাদান, পুষ্টি দ্রব্য, হরমোন ইত্যাদি রক্তের মাধ্যমে দেহকোষে পৌছানো এবং দেহকোষ থেকে বিপাকে সৃষ্ট বর্জ্য একইভাবে রেচন অঙ্গে নিয়ে আসার প্রক্রিয়ার নামই **সংবহন**। রক্তের পথ অনুসারে প্রাণিদেহে দুধরনের রক্ত সংবহনতন্ত্র দেখা যায়, যেমন-**মুক্ত** (open) বা **ল্যাকুনার** (lacunar) এবং **বদ্ধ** (closed) সংবহনতন্ত্র।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মুক্ত সংবহন : যে সংবহনতন্ত্রে রক্ত হৃৎযন্ত্র থেকে নালিকা পথে বেরিয়ে উন্মুক্ত দেহগহ্বরে প্রবেশ করে এবং দেহগহ্বর থেকে পুনরায় নালিকা পথে হৃৎযন্ত্রে ফিরে আসে তার নাম মুক্ত সংবহন। অর্থাৎ রক্ত সবসময় রক্তবাহিকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় না। চিংড়ি, পতঙ্গ, মলাস্কা প্রভৃতি প্রাণীর দেহে এ ধরনের সংবহন দেখা যায়।

বদ্ধ সংবহন : যে সংবহনতন্ত্রে রক্ত সবসময় রক্তবাহিকা ও হৃৎযন্ত্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আবদ্ধ থেকে প্রবাহিত হয় এবং কখনোই দেহ গহ্বরে মুক্ত হয় না তাকে বলে বদ্ধ সংবহন। অ্যানিলিড জাতীয় ননকর্ডেট প্রাণিদেহে এবং কর্ডেট প্রাণীতে এ ধরনের সংবহন দেখা যায়।

মুক্ত ও বদ্ধ সংবহনতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য

মুক্ত সংবহনতন্ত্র	বদ্ধ সংবহনতন্ত্র
১. এ ধরনের সংবহনতন্ত্রে রক্ত হৃৎযন্ত্র, রক্তবাহিকা ও বিভিন্ন সাইনাসে অবস্থান করে।	১. এ ধরনের সংবহনতন্ত্রে রক্ত হৃৎযন্ত্র ও রক্তবাহিকার অভ্যন্তরে অবস্থান করে।
২. হৃৎযন্ত্র, সংক্ষিপ্ত রক্তনালি ও সাইনাস নিয়ে এটি গঠিত।	২. হৃৎযন্ত্র, শিরা, ধমনি ও কৈশিকজালিকা সমন্বয়ে এটি গঠিত।
৩. এক্ষেত্রে দেহগহ্বরে রক্ত প্রবেশ করে; এজন্য একে হিমোসিল বলে।	৩. এক্ষেত্রে দেহগহ্বরে রক্ত প্রবেশ করে না।
৪. রক্ত সরাসরি কোষ-টিস্যুর সংস্পর্শে এসে পুষ্টি পদার্থ ও গ্যাসের বিনিময় ঘটায়।	৪. রক্ত কোষ-টিস্যুর সরাসরি সংস্পর্শে আসে না। টিস্যুরসের মাধ্যমে পুষ্টি পদার্থ ও গ্যাসের বিনিময় ঘটে।
৫. Arthropoda ও Mollusca পর্বের প্রাণীতে দেখা যায়।	৫. Annelida ও Chordata পর্বের প্রাণীতে দেখা যায়।

ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র অনুন্নত ও মুক্ত ধরনের এবং তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত–**হিমোসিল, হিমোলিম্ফ** ও **পৃষ্ঠীয় বাহিকা**। নিচে এসব অংশের বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. হিমোসিল (Haemocoel; গ্রিক, *haima* = রক্ত + *koiloma* = গহ্বর) : ভ্রূণীয় পরিস্ফুটনের সময় প্রধান সিলোমিক গহ্বর ব্লাস্টোসিলের সঙ্গে একীভূত হয়ে যে নতুন গহ্বরের সৃষ্টি করে তাকে **হিমোসিল বা মিক্সোসিল** (mixocoel) বলে। হিমোসিল তখন মেসোডার্মাল পেরিটোনিয়ামের পরিবর্তে বহিঃকোষীয় মাতৃকায় (extra cellular matrix) আবৃত হয়। এটি রক্তপূর্ণ থাকে। ঘাসফড়িং-এর হিমোসিল দুটি অনুপ্রস্থ পর্দা (diaphragm) দিয়ে তিনটি প্রকোষ্ঠ বা সাইনাস (sinus)-এ বিভক্ত। হৃৎযন্ত্রের তলদেশ বরাবর অবস্থিত পর্দাকে **পৃষ্ঠীয় পর্দা** এবং স্নায়ুরজ্জুর ঠিক উপরে বিস্তৃত পর্দাকে **অঙ্কীয় পর্দা** বলে। এসব পর্দার উপস্থিতির ফলে সৃষ্ট সাইনাস-তিনটি নিম্নরূপ–

i. **পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস** (Pericardial sinus) : এটি পৃষ্ঠীয় পর্দার ঠিক উপরে অবস্থিত। এতে হৃৎযন্ত্র অবস্থান করে।

ii. **পেরিভিসেরাল সাইনাস** (Perivisceral sinus) : এটি পৃষ্ঠীয় পর্দার নিচে অবস্থিত এবং পৌষ্টিকনালিকে ধারণ করে।

iii. **পেরিনিউরাল সাইনাস** (Perineural sinus) : এটি অঙ্কীয় পর্দার নিচে অবস্থিত গহ্বর। এতে স্নায়ুরজ্জু অবস্থান করে।

পর্দাগুলো ছিদ্রযুক্ত হওয়ায় রক্ত প্রয়োজন মতো এক সাইনাস থেকে অন্য সাইনাসে যাতায়াত করতে পারে। অঙ্কীয় পর্দাটি পায়ের ভিতরেও বিস্তৃত।

চিত্র ২.২.১৬ : ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহনতন্ত্র

কাজ : হিমোসিল দেহের বিভিন্ন অঙ্গ, রক্ত ও লসিকা ধারণ করে। এর মাধ্যমে খাদ্যরস ও বর্জ্যবস্তু পরিবাহিত হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

খ. হিমোলিম্ফ (Haemolymph) বা রক্ত : বর্ণহীন প্লাজমা এবং এর মধ্যে ভাসমান অসংখ্য বর্ণহীন রক্তকণিকা বা **হিমোসাইট** (haemocyte) নিয়ে ঘাসফড়িং-এর রক্ত গঠিত। রক্ত হিমোসিল নামক গহ্বরে **লসিকা** (lymph)-র সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে বলে ঘাসফড়িংসহ বিভিন্ন পতঙ্গের রক্তকে **হিমোলিম্ফ** বলে। হিমোগ্লোবিন বা অন্য কোন ধরনের শ্বাসরঞ্জক না থাকায় এর রক্ত বর্ণহীন, শ্বসনে তেমন কোন ভূমিকা রাখে না।

কাজ : খাদ্যসার, রেচনদ্রব্য, হরমোন ইত্যাদি পরিবহনে; অ্যামিনো এসিড, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি জমা রাখা; জীবাণু ধ্বংস করা; তঞ্চনে সাহায্য করা এবং ডানার সঞ্চালন ও খোলস মোচনে সহায়তা করা হিমোলিম্ফের কাজ।

গ. পৃষ্ঠীয় বাহিকা (Dorsal vessel) : দেহের মধ্য-পৃষ্ঠীয় অবস্থানে রক্ষিত এটি প্রধান **স্পন্দনশীল অঙ্গ**। এ অঙ্গ দুটি অংশে বিভক্ত– (i) অস্টিয়াবিহীন সোজা নলাকার **সম্মুখ ও পশ্চাৎ অ্যাওর্টা** এবং (ii) **হৃৎযন্ত্র**। ঘাসফড়িং-এ একটি লম্বাটে, নলাকার হৃৎযন্ত্র থাকে। এটি বক্ষ ও উদরীয় অঞ্চলের পৃষ্ঠদেশে মাঝ বরাবর যে গহ্বরে থাকে তাকে **পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস** (pericardial sinus) বলে। হৃৎযন্ত্রটি সাতটি ফানেল আকার প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে পার্শ্বীয় দিকে একটি করে মোট একজোড়া ছিদ্র রয়েছে। ছিদ্রগুলোকে **অস্টিয়া** (ostia, একবচনে- ostium) বলে। প্রতিটি অস্টিয়ামে **কপাটিকা** (valve) থাকে, যা রক্তকে হৃৎযন্ত্রে শুধু প্রবেশ করতে দেয়, বের হতে দেয় না। টারগামের অঙ্কীয় তলের দুপাশ থেকে **অ্যালারি পেশি** (alary muscle) নামক ত্রিকোণাকার পাখার মতো বিশেষ ধরনের পেশি উৎপন্ন হয়ে পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসের প্রাচীরে যুক্ত হয় এবং হৃৎযন্ত্রের পার্শ্বীয়-অঙ্কীয় দেশেও যুক্ত থাকে। ঘাসফড়িংয়ে ৬ জোড়া অ্যালারি পেশি থাকে। এগুলোর সংকোচন-প্রসারণ রক্ত সংবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

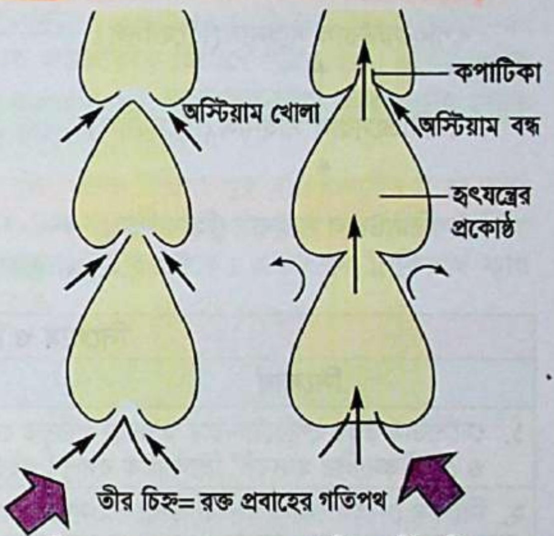

চিত্র ২.২.১৭ : হৃৎযন্ত্রের আংশিক বর্ধিত চিত্র

রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া (Mechanism of Blood Circulation)

হৃৎযন্ত্র ও অ্যালারি পেশির সংকোচন-প্রসারণের ফলেই ঘাসফড়িং-এর দেহের বিভিন্ন অঞ্চলে রক্ত প্রবাহিত হয়। হৃৎযন্ত্রের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ ক্রমাগত ঢেউয়ের মতো সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয়। ঘাসফড়িং-এর হৃৎযন্ত্রের স্পন্দন প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১১০ বার। রক্ত সংবহন প্রক্রিয়াটি নিম্নোক্তভাবে সম্পাদিত হয়।

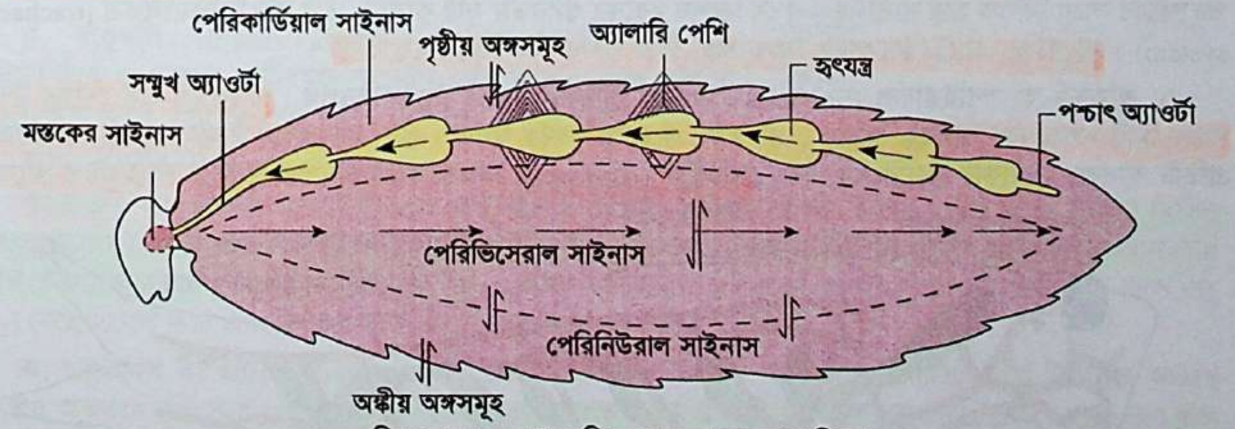

চিত্র ২.২.১৮ : ঘাসফড়িং-এর রক্ত সংবহন প্রক্রিয়া

অ্যালারি পেশির সংকোচনের ফলে রক্ত পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস থেকে অস্টিয়ার মাধ্যমে হৃৎযন্ত্রে প্রবেশ করে। পরে হৃৎযন্ত্র পর্যায়ক্রমে পিছন দিক থেকে সামনের দিকে সংকুচিত হওয়ায় রক্ত সম্মুখে প্রবাহিত হয় এবং অ্যাওর্টার ভিতর দিয়ে হিমোসিলে পৌঁছে। অস্টিয়ায় কপাটিকা থাকায় রক্ত হৃৎযন্ত্র থেকে বাইরে আসতে পারে না। একইভাবে হৃৎযন্ত্রের

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

প্রকোষ্ঠসমূহের সংযোগস্থলে কপাটিকা থাকায় রক্ত পিছন দিকে প্রবাহিত হতে পারে না। রক্ত প্রথমে মস্তকে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে পিছন দিকে প্রবাহিত হয়। হৃৎযন্ত্র যখন আবার প্রসারিত হয় তখন হিমোসিল থেকে পেরিকার্ডিয়ামের প্রাচীরের ছিদ্রপথে রক্ত পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে ফিরে আসে।

ঘাসফড়িং-এর সমগ্র দেহে একবার রক্তপ্রবাহ সম্পন্ন হতে ৩০ থেকে ৬০ মিনিট সময় লাগে।

পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস (হিমোসিল) → হৃৎযন্ত্রের প্রসারণ → হৃৎযন্ত্র → হৃৎযন্ত্রের সংকোচন → সম্মুখ অ্যাওর্টা → মস্তকের সাইনাস (হিমোসিল) → পেরিনিউরাল সাইনাস (হিমোসিল) → পেরিভিসেরাল সাইনাস (হিমোসিল) → পেরিকার্ডিয়াল সাইনাস (হিমোসিল)

চিত্র ২.২.১৯ : ঘাসফড়িং-এর রক্ত প্রবাহের গতিপথ

সিলোম ও হিমোসিল-এর মধ্যে পার্থক্য

সিলোম	হিমোসিল
১. মেসোডার্ম উদ্ভূত পেরিটোনিয়াম আবরণে পরিবৃত দেহপ্রাচীর ও পৌষ্টিকনালির মধ্যবর্তী সিলোমিক রসপূর্ণ গহ্বর।	১. মেসোডার্ম উদ্ভূত পেরিটোনিয়াম আবরণবিহীন দেহপ্রাচীর ও পৌষ্টিকনালির মধ্যবর্তী রক্তপূর্ণ গহ্বর।
২. সিলোম দেহের কোন অঙ্গ বা উপাঙ্গে প্রসারিত হয় না।	২. হিমোসিল দেহের সকল উপাঙ্গে প্রসারিত হয়।
৩. সিলোম রক্ত সংবহনতন্ত্রের অংশ গঠন করে না।	৩. হিমোসিল রক্ত সংবহনতন্ত্রের অংশ গঠন করে।
৪. সিলোমে পুষ্টি পদার্থ পরিবাহিত হয় না।	৪. হিমোসিলে পুষ্টি পদার্থ পরিবাহিত হয়।
৫. Annelida ও Chordata পর্বের প্রাণীতে সিলোম পাওয়া যায়।	৫. Arthropoda ও Mollusca পর্বের প্রাণীতে হিমোসিল পাওয়া যায়।

ঘাসফড়িং-এর শ্বসনতন্ত্র (Respiratory system)

অন্যান্য স্থলচর পতঙ্গের মতো ঘাসফড়িংও শ্বসনের জন্য বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। এদের শ্বসনতন্ত্র বেশ উন্নত হওয়ায় রক্তের অক্সিজেন বহনে অক্ষমতার ঘাটতি অনেকখানি পূরণ হয়েছে। ট্রাকিয়া নামক এক ধরনের সূক্ষ্ম শ্বাসনালির শাখা-প্রশাখার মাধ্যমে পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেন সরাসরি দেহকোষে প্রবেশ করে এবং দেহকোষে উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড একই পথে দেহনির্গত হয়। শ্বসন সম্পাদনের জন্য ট্রাকিয়া ও এর শাখা-প্রশাখাগুলো পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে ঘাসফড়িং-এ যে বিশেষ ধরনের শ্বসনতন্ত্র সৃষ্টি করেছে, তার নাম ট্রাকিয়ালতন্ত্র (trachaeal system)। ঘাসফড়িং-এর ট্রাকিয়ালতন্ত্র (শ্বসনতন্ত্র) নিচে বর্ণিত অঙ্গগুলো নিয়ে গঠিত।

১. শ্বাসরন্ধ্র বা স্পাইরাকল (Spiracle) : এগুলো ট্রাকিয়ালতন্ত্রের উন্মুক্ত ছিদ্রপথ। ঘাসফড়িং-এর দেহের উভয় পাশে মোট দশজোড়া শ্বাসরন্ধ্র রয়েছে। এর মধ্যে দুজোড়া বক্ষীয় অঞ্চলে এবং আটজোড়া উদরীয় অঞ্চলে অবস্থিত। প্রতিটি শ্বাসরন্ধ্র ডিম্বাকার ছিদ্রবিশেষ এবং পেরিট্রিম (peritreme) নামক কাইটিননির্মিত প্রাচীরে পরিবেষ্টিত থাকে।

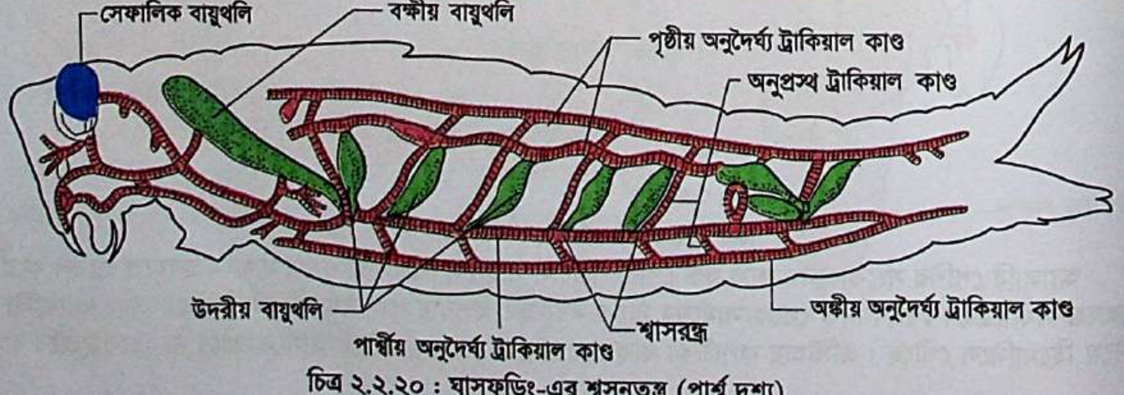

চিত্র ২.২.২০ : ঘাসফড়িং-এর শ্বসনতন্ত্র (পার্শ্ব দৃশ্য)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

রন্ধ্রগুলোর মুখে সূক্ষ্ম রোমযুক্ত ছাঁকনি যন্ত্র (filtering apparatus) থাকায় ধূলাবালি, জীবাণু, পানি ইত্যাদি ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। পেশি নিয়ন্ত্রিত কপাটিকার সাহায্যে রন্ধ্রগুলো খোলে বা বন্ধ হয়। শ্বাসরন্ধ্র বন্ধ থাকলে দেহ থেকে জলীয় বাষ্প বেরোতে পারে না।

২. **শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া** (Tracheae) : প্রতিটি শ্বাসরন্ধ্র **অ্যাট্রিয়াম** (atrium) নামক একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উন্মুক্ত। এখান থেকেই উৎপন্ন হয় সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখাযুক্ত, স্থিতিস্থাপক, বহিঃত্বকীয় (ectodermal) ট্রাকিয়া যা ঘাসফড়িং-এর প্রধান শ্বসন অঙ্গ এবং সারাদেহে জালিকাকারে বিস্তৃত। ট্রাকিয়া ত্বকের অন্তঃপ্রবর্ধক হিসেবে গঠিত হয়। এদের প্রাচীর তিন স্তরবিশিষ্ট। বাইরের এপিডার্মিস গঠিত **ভিত্তিঝিল্লি** (basement membrane), মাঝখানে চাপা বহুভূজাকার কোষে গঠিত **এপিথেলিয়াম** (epithelium) এবং ভিতরের কিউটিকল নির্মিত **ইন্টিমা** (intima)।

ট্রাকিয়ার অন্তঃস্থ গহ্বর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়। এ গহ্বরে কিছুটা পরপর ইন্টিমা পুরু হয়ে আংটির মতো বলয় গঠন করে। এগুলোর নাম **টিনিডিয়া** (ctenidia)। টিনিডিয়া থাকায় ট্রাকিয়া কখনও চুপসে যায় না। দেহে ট্রাকিয়া জালিকাকারে বিন্যস্ত থাকলেও প্রধান কয়েকটি নালি অনুদৈর্ঘ্য ও অনুপ্রস্থ বিন্যস্ত থাকে। এগুলোকে **ট্রাকিয়াল কাণ্ড** (tracheal trunk) বলে। মোট তিনজোড়া অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত থাকে। যেমন–

- একজোড়া পার্শ্বীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড (lateral longitudinal tracheal trunk),
- একজোড়া পৃষ্ঠীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড (dorsal longitudinal tracheal trunk) এবং
- একজোড়া অঙ্কীয় অনুদৈর্ঘ্য ট্রাকিয়াল কাণ্ড (ventral longitudinal tracheal trunk)।

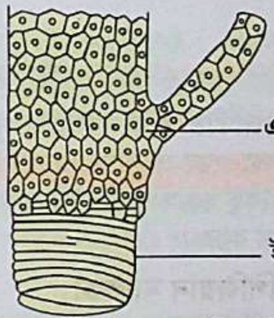

চিত্র ২.২.২১ : ট্রাকিয়ার অংশবিশেষ বিবর্ধিত

দেহের প্রতিপাশে অবস্থিত পার্শ্বীয় ট্রাকিয়াল কাণ্ড থেকে পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয়দিকে কতগুলো **অনুপ্রস্থ ট্রাকিয়াল কাণ্ড** (transeverse tracheal trunk) সৃষ্টি হয়ে যথাক্রমে পৃষ্ঠীয় ও অঙ্কীয় ট্রাকিয়াল কাণ্ডকে যুক্ত করে। ট্রাকিয়া সমগ্র দেহে শ্বসনিক গ্যাস পরিবহন করে।

৩. **ট্রাকিওল** (Tracheole) : ট্রাকিয়া থেকে ট্রাকিওল নামে সূক্ষ্ম শাখা সৃষ্টি হয়। এগুলো এককোষী নালিকা, মাত্র ১μm ব্যাসবিশিষ্ট, প্রাচীর ইন্টিমা ও টিনিডিয়াবিহীন কিন্তু এগুলোর অভ্যন্তর টিস্যুরসে পূর্ণ থাকে। এ টিস্যুরসই অন্যান্য প্রাণীর রক্তের মতো শ্বসনে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। এ রসের মাধ্যমে দেহকোষে গ্যাসীয় আদান-প্রদান ঘটে।

৪. **বায়ুথলি** (Air sac) : ট্রাকিয়ার কিছু শাখা প্রসারিত হয়ে বড়, ইন্টিমাবিহীন ও পাতলা প্রাচীরযুক্ত বায়ুথলি গঠন করে। এসব থলিতে বাতাস জমা থাকে এবং শ্বসনের সময় বায়ু প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

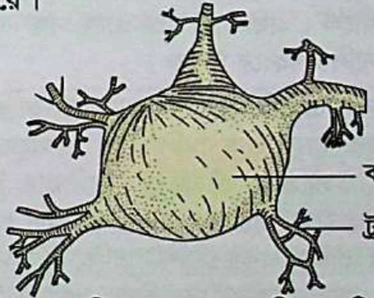

চিত্র ২.২.২২ : একটি বায়ুথলি

শ্বসন পদ্ধতি (Process of Respiration)

শ্বাসরঞ্জক না থাকায় ঘাসফড়িং-এর রক্ত শ্বসনে তেমন ভূমিকা পালন করতে পারে না। দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে জালিকার মতো ছড়িয়ে থাকা ট্রাকিয়া ও ট্রাকিওলের মাধ্যমে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে। শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ উভয় প্রক্রিয়া প্রধানত শ্বাসরন্ধ্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। পেশির কার্যকারিতায় উদরের ছন্দময় সংকোচন-প্রসারণের ফলে বায়ু (O_2) দেহে প্রবেশ করে এবং ট্রাকিয়ালতন্ত্র থেকে বায়ু (CO_2) বেরিয়ে আসে।

ক. শ্বাসগ্রহণ বা প্রশ্বাস (Inspiration) : পেশির প্রসারণে উদরীয় খণ্ডকগুলো প্রসারিত হলে ট্রাকিয়ার অন্তঃস্থ গহ্বরও আয়তনে বৃদ্ধি পায়। এ সময় প্রথম চারজোড়া শ্বাসরন্ধ্র অর্থাৎ প্রশ্বাসী শ্বাসরন্ধ্রগুলো (inhalatory spiracle) খুলে যায় ফলে O_2-যুক্ত বায়ু প্রথমে শ্বাসরন্ধ্রের মাধ্যমে ট্রাকিয়ায় পৌঁছে, পরে সেখান থেকে ট্রাকিওল (টিস্যুরসে দ্রবীভূত হয়) ও বায়ুথলির মাধ্যমে অন্তঃকোষীয় স্থানে পৌঁছায়।

খ. শ্বাসত্যাগ বা নিঃশ্বাস (Expiration) : দেহকোষে বিপাকের ফলে সৃষ্ট CO_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বায়ুথলি ও ট্রাকিওল হয়ে ট্রাকিয়ায় প্রবেশ করে। এসময় পেশির সংকোচনে উদরীয় খণ্ডকগুলো সংকুচিত হলে ট্রাকিয়ার অন্তঃস্থ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

গহ্বরের আয়তন কমে যায় এবং বাকি ছয়জোড়া শ্বাসরন্ধ্র অর্থাৎ নিঃশ্বাসী শ্বাসরন্ধ্রগুলো (exhalatory spiracle) খুলে যায়। ফলে ট্রাকিয়ায় অবস্থিত CO_2 সজোরে শ্বাসরন্ধ্র পথে বাইরে নির্গত হয়।

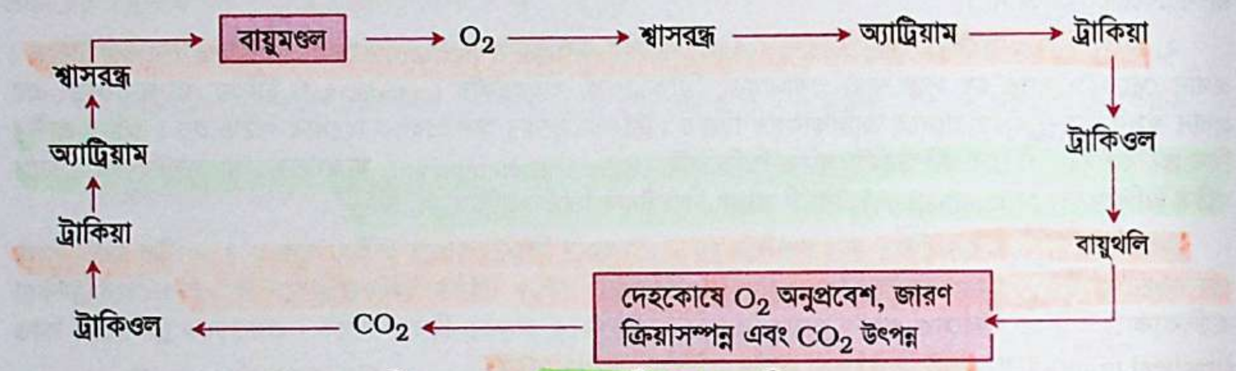

চিত্র ২.২.২৩ : শ্বসনের গতিপথের রেখাচিত্র

ঘাসফড়িং-এর রেচন তন্ত্র (Excretory System)

আমিষজাতীয় খাদ্য বিপাকে সৃষ্ট নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের প্রক্রিয়াকে রেচন (excretion) বলে। অন্যসব পতঙ্গের মতো ঘাসফড়িং-এর প্রধান রেচন অঙ্গও ম্যালপিজিয়ান নালিকা (malpighian tubule)। তবে মেদপুঞ্জের কিছু কোষ অর্থাৎ ইউরেট কোষ, ইউরিকোজ গ্রন্থি, নেফ্রোসাইট এবং কিউটিকল অতিরিক্ত রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

ম্যালপিজিয়ান নালিকা

নামকরণ : Marcello Malpighi (1628–1694) নামক এক ইতালীয় চিকিৎসক ও জীববিজ্ঞানী সর্বপ্রথম ১৬৬৯ সালে এ নালিকা আবিষ্কার করলে তাঁর নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়।

অবস্থান : মধ্য ও পশ্চাৎ-পৌষ্টিকনালির সংযোগস্থলে অসংখ্য সুতার মতো ম্যালপিজিয়ান নালিকা হিমোসিলে বিস্তৃত থাকে। এগুলোর মুক্ত প্রান্ত বদ্ধ এবং হিমোসিল গহ্বরে হিমোলিম্ফের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। অন্যপ্রান্ত পৌষ্টিকনালির গহ্বরে উন্মুক্ত।

গঠন : প্রতিটি ম্যালপিজিয়ান নালিকা প্রায় ২৫ মিলিমিটার লম্বা, এক মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত, সরু, নলাকার, ইলাস্টিক ও ফাঁপা। নালিকার ভিতরের ফাঁপা গহ্বরকে **লুমেন** (lumen) বলে। প্রতিটি নালিকার প্রাচীর একস্তরবিশিষ্ট এপিথেলিয়াম কোষে গঠিত। কোষস্তরের বাইরের দিক একটি ভিত্তি পর্দা (basement membrane)-য় এবং ভিতরের দিক অসংখ্য **মাইক্রোভিলাই** (microvilli) দিয়ে আবৃত। মাইক্রোভিলাই সম্মিলিতভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ **ব্রাশ বর্ডার** (brush border) গঠন করে। নালিকাগুলো নিজে ততটা নড়নক্ষম নয় বরং হিমোসিলে হিমোলিম্ফের আন্দোলনে এগুলো রেচন সম্পন্ন করে।

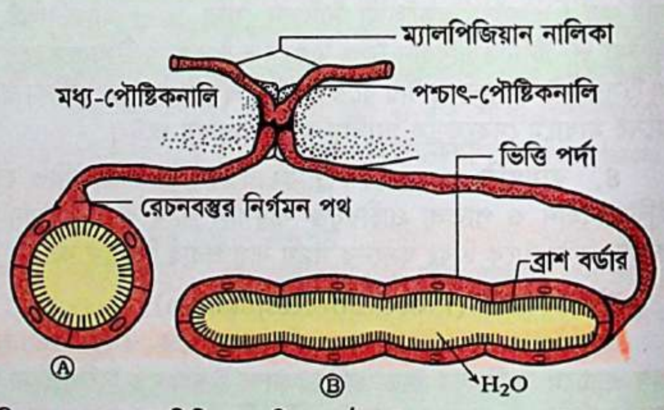

চিত্র ২.২.২৪ : ম্যালপিজিয়ান নালিকার গঠন; Ⓐ প্রস্থচ্ছেদ এবং Ⓑ লম্বচ্ছেদ

রেচন প্রক্রিয়া : ম্যালপিজিয়ান নালিকার বদ্ধ প্রান্ত হিমোলিম্ফে ভাসমান অবস্থায় থেকে রক্ত থেকে পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে। পরে পটাসিয়াম ইউরেট নালিকার কোষের মধ্যে পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে, পটাসিয়াম বাই-কার্বনেট ও ইউরিক এসিড উৎপন্ন করে। পটাসিয়াম বাইকার্বনেট ও পানি পুনঃশোষিত হয়ে হিমোলিম্ফে ফিরে আসে। কিন্তু ইউরিক এসিড নালিকার গহ্বর বা **লুমেন** (lumen)-এ রয়ে যায়। ইউরিক এসিড সিলিয়ার আন্দোলনের ফলে ম্যালপিজিয়ান নালিকার গোড়ার অংশ হয়ে পৌষ্টিকনালিতে প্রবেশ করে এবং পশ্চাৎঅন্ত্রে গমন করে। মলাশয়ে অবস্থানকালে ইউরিক এসিড থেকে অতিরিক্ত পানি শোষণের ফলে শুষ্ক ইউরিক এসিড দানা হিসেবে মলের সাথে বেরিয়ে যায়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

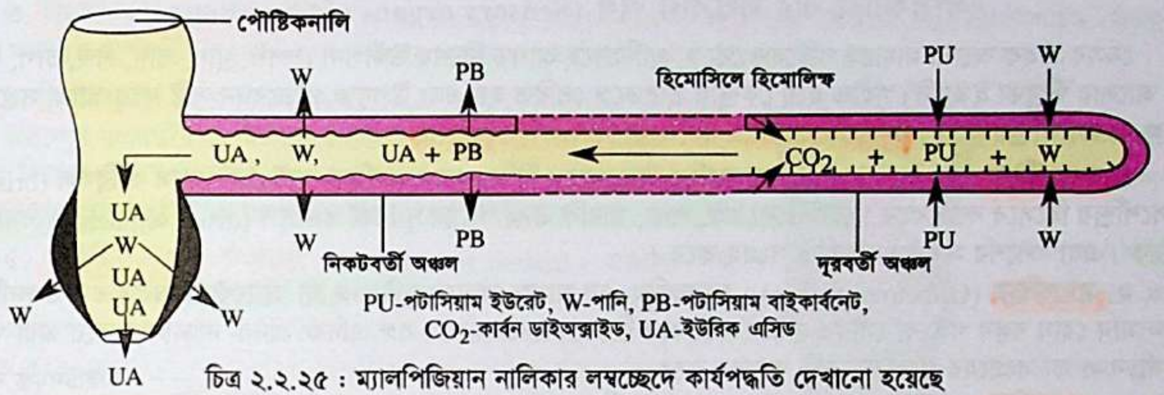

চিত্র ২.২.২৫ : ম্যালপিজিয়ান নালিকার লম্বচ্ছেদে কার্যপদ্ধতি দেখানো হয়েছে

অতিরিক্ত বা আনুষঙ্গিক রেচন অঙ্গ (Accessory Excretory Organ)

i. ইউরেট কোষ (Urate cell) : ঘাসফড়িং-এর দেহে অসংখ্য ফ্যাট বডি বা চর্বিকোষ থাকে। এগুলো প্রধানত শর্করা, আমিষ ও স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে পরিবর্তিতরূপে জমা রাখে। তাছাড়া এগুলো হিমোলিম্ফে বিদ্যমান কিছু ইউরিক এসিড ও ইউরেট কোষের মধ্যেই আজীবন জমা করে রাখে। এসব পদার্থ সঞ্চয়ের কারণে কোষগুলো **ইউরেট কোষ** নামে পরিচিত।

ii. ইউরিকোজ গ্রন্থি (Uricose glands) : পুরুষ ঘাসফড়িংয়ের মাশরুম গ্রন্থিতে ইউরিকোজ গ্রন্থি অবস্থান করায় হিমোসিল থেকে রেচন দ্রব্য শোষণ করে ইউরিক এসিডরূপে জমা করে। সংগমের সময় এসব বর্জ্য শুক্রাণুর সাথে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

iii. নেফ্রোসাইট (Nephrocyte) : পেরিকার্ডিয়াল সাইনাসে হৃৎযন্ত্রের পার্শ্বদেশে অবস্থিত নেফ্রোসাইট রেচন দ্রব্য সংগ্রহ করে রক্তের মাধ্যমে নিষ্কাশন করে।

iv. কিউটিকল (Cuticle) : নিম্ফ দশায় হিমোসিলে ভাসমান অ্যামিবা সদৃশ কিছু অ্যামিবোসাইট (amoebocyte) কোষ রক্ত থেকে রেচন দ্রব্য সংগ্রহ করে কিউটিকলের নিচে সঞ্চয় করে। খোলস মোচনের সময় পুরাতন কিউটিকলসহ সঞ্চিত রেচন দ্রব্য পরিত্যক্ত হয়।

ম্যালপিজিয়ান নালিকা ও ম্যালপিজিয়ান বডির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ম্যালপিজিয়ান নালিকা	ম্যালপিজিয়ান বডি
১. প্রকৃতি	ঘাসফড়িংসহ সকল পতঙ্গের প্রধান রেচন অঙ্গ।	মানুষসহ সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর রেচন অঙ্গের অংশ।
২. অবস্থান	প্রাণীর অন্ত্রের প্রাচীরে গুচ্ছাকারে অবস্থান করে।	প্রাণীর বৃক্কের নেফ্রনে এককভাবে অবস্থান করে।
৩. সংখ্যা	অল্প, প্রতি ঘাসফড়িংয়ে প্রায় ১০০টি।	অসংখ্য, মানুষের দুই বৃক্কে প্রায় ২০ লক্ষ।
৪. গঠন	সূক্ষ্ম সুতার মতো, নলাকার; এপিথেলিয়াম আবরণ ও ভিত্তি পর্দা নিয়ে গঠিত।	গোলাকার; কাপের মতো বোম্যানস ক্যাপস্যুল এবং কৈশিকজালিকার পিণ্ড গ্লোমেরুলাস নিয়ে গঠিত।
৫. সংযুক্তি	এর একপ্রান্ত হিমোসিলে মুক্ত থাকে, অন্যপ্রান্ত অন্ত্রের সাথে সংযুক্ত থাকে।	এর একপ্রান্ত নেফ্রনের প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকার সাথে এবং অন্যপ্রান্ত রক্তনালিকার সাথে যুক্ত থাকে।
৬. কার্যপদ্ধতি	হিমোসিলে বিদ্যমান হিমোলিম্ফ থেকে রেচনবর্জ্য সংগ্রহ করে পৌষ্টিকনালিতে প্রেরণ করে।	রক্ত থেকে সূক্ষ্ম ছাঁকনের মাধ্যমে রেচনবর্জ্যসহ অনেক প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করে নেফ্রন নালিকায় প্রেরণ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ঘাসফড়িং-এর সংবেদী অঙ্গ (Sensory organs of Grasshopper)

যেসব গ্রাহক অঙ্গের মাধ্যমে পরিবেশ থেকে প্রাণিদেহে আগত বিশেষ উদ্দীপনা (স্পর্শ, ঘ্রাণ, স্বাদ, শব্দ, চাপ, তাপ ও আলোর তীব্রতা ইত্যাদি) গৃহীত হয়ে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরিত হয় এবং উপযুক্ত প্রতিবেদন সৃষ্টি করে তাকে **সংবেদী অঙ্গ** বা **জ্ঞানেন্দ্রিয়** বলে। ঘাসফড়িংয়ে নিচে বর্ণিত সংবেদী অঙ্গ দেখা যায় –

১. স্পর্শেন্দ্রিয় (Tactile organs) : ঘাসফড়িং-এর দেহের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত ছোট ছোট রোম ও ব্রিসল (bristle) স্পর্শেন্দ্রিয় হিসেবে কাজ করে। রোমগুলো শুঙ্গ, পাল্প, সারকি এবং পায়ের দূরবর্তী খণ্ডাংশে (distal segments) বিদ্যমান থাকে। এরা স্পর্শের মাধ্যমে অনুভূতি সংগ্রহ করে।

২. ঘ্রাণেন্দ্রিয় (Olfactory organs) : ঘাসফড়িং-এর মাথার সামনে দুটি শুঙ্গ বা অ্যান্টেনা অবস্থিত। শুঙ্গদুটিতে বিদ্যমান রোম বস্তুর গন্ধ বা সৌরভ সংগ্রহকারী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে। শুঙ্গ এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করে এরা খাদ্য নির্বাচন ও তা সংগ্রহের প্রয়োজনানুভূতি অনুভব করে।

৩. স্বাদেন্দ্রিয় (Gustatory organs) : ঘাসফড়িং অতি সহজেই খাদ্যবস্তুর স্বাদ নিতে পারে। এদের স্বাদগ্রহণ ক্ষমতা বেশ প্রখর। স্বাদানুভূতি অঙ্গ প্রধানত মুখোপাঙ্গে থাকে। ম্যাক্সিলারি পাল্প ও ল্যাবিয়ামে অবস্থিত রোমের মাধ্যমে এরা খাদ্যবস্তুর স্বাদ গ্রহণ করে।

৪. দর্শনেন্দ্রিয় (Visual organs) : ঘাসফড়িং-এ দর্শনাঙ্গ হিসেবে ওসেলি ও পুঞ্জাক্ষি উভয়ই উপস্থিত থাকে। ওসেলির সাহায্যে ঘাসফড়িং আলোর তীব্রতার পরিবর্তন অনুধাবন করে। পুঞ্জাক্ষিতে দর্শনীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

৫. শ্রবণেন্দ্রিয় (Auditory organs) : ঘাসফড়িং-এর ১ম উদরীয় খণ্ডকের প্রতিপাশে একটি করে ডিম্বাকার **টিমপেনিক পর্দা** (tympanic membrane) রয়েছে যা শ্রবণের জন্য ব্যবহৃত **শ্রবণ থলি** বা **টিমপেনাম** (tympanum)কে ঢেকে রাখে। এছাড়া পায়ু সারকিতে অবস্থিত রোমও শ্রবণানুভূতি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।

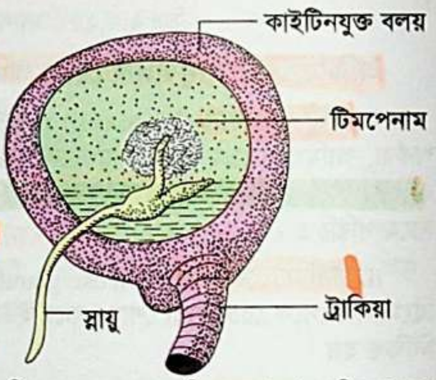

চিত্র ২.২.২৬ : ঘাসফড়িং-এর শ্রবণাঙ্গ (টিমপেনাম)

ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষি (Compound Eye) — গঠন ও দর্শন কৌশল

ঘাসফড়িংয়ের মাথার পৃষ্ঠভাগের উভয় পাশে অবস্থিত বড়, বৃন্তহীন, বৃক্কাকার, উত্তল, কালো অংশকে **পুঞ্জাক্ষি** বলে। প্রত্যেক পুঞ্জাক্ষি প্রায় দুহাজার (প্রজাতিভেদে সংখ্যা বিভিন্ন) ষড়ভূজাকার **ওমাটিডিয়া** (ommatidia) নিয়ে গঠিত। প্রতিটি ওমাটিডিয়াম (একবচনে) একেকটি দর্শন একক হিসেবে কাজ করে। সমগ্র পুঞ্জাক্ষির উপরিভাগ স্বচ্ছ **কিউটিকল** (cuticle)-এ আবৃত থাকে। পুঞ্জাক্ষিতে অবস্থিত প্রতিটি ওমাটিডিয়ামের গঠন ও কার্যপদ্ধতি অভিন্ন ধরনের। নিচে একটি ওমাটিডিয়ামের গঠন ও এর বিভিন্ন অংশের কাজ উল্লেখ করা হলো।

১. কর্নিয়া (Cornea) : এটি ওমাটিডিয়ামের বাইরের দিকের বর্ণহীন, স্বচ্ছ, উত্তল ও ছয়কোণা কিউটিকল আবরণী। এটি লেন্সের মতো কাজ করে।

২. কর্নিয়াজেন কোষ (Corneagen cell) : এরা কর্নিয়ার নিচে একজোড়া চাপা ও পাশাপাশি অবস্থিত কোষ। এদের ক্ষরণ থেকে কর্নিয়া সৃষ্টি হয়।

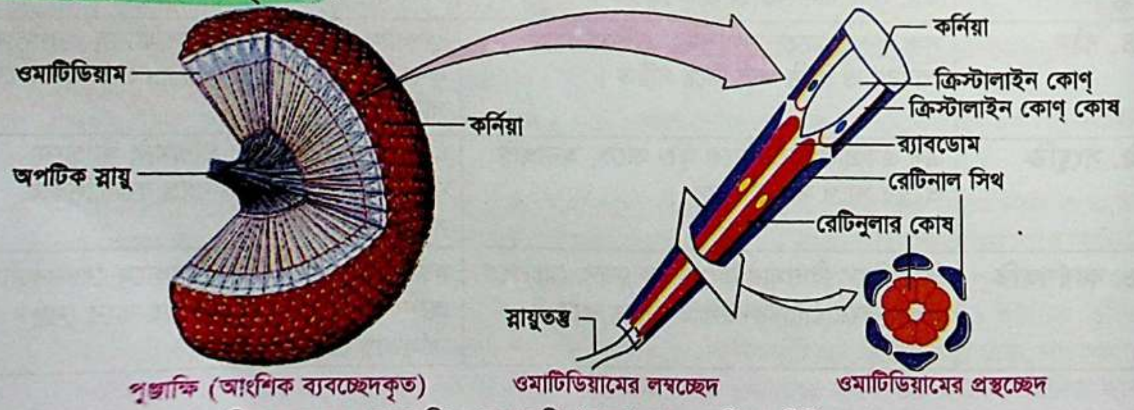

চিত্র ২.২.২৭ : ঘাসফড়িং-এর পুঞ্জাক্ষি (বাঁয়ে) এবং একটি ওমাটিডিয়াম (ডানে)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৩. **ক্রিস্টালাইন কোণ কোষ** (Crystalline cone cell): এগুলো কর্নিয়াজেন কোষের নিচে ক্রিস্টালাইন কোণকে ঘিরে অবস্থিত দীর্ঘ ৪টি কোষ। এসব কোষের ক্ষরণ থেকে ক্রিস্টালাইন কোণ গঠিত হয়।

৪. **ক্রিস্টালাইন কোণ** (Crystalline cone) : এটি কোণ কোষে পরিবেষ্টিত এবং এগুলোর মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত একটি স্বচ্ছ, মোচাকৃতি অঙ্গ। কোণ কোষ থেকে নিঃসৃত পদার্থে ক্রিস্টালাইন কোণ গঠিত হয়। এটি প্রতিসরণশীল অঙ্গ হিসেবে কাজ করে ওমাটিডিয়ামে আলো প্রবেশে সাহায্য করে।

৫. **আইরিশ রঞ্জক আবরণী** (Iris pigment sheath) : এগুলো দীর্ঘ রঙিন (কালো কণিকা বহনকারী) কোষ যা কোণ কোষগুলোকে ঘিরে রাখে। তীব্র আলোতে এ আবরণ প্রসারিত হয়ে কোণ কোষগুলোকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে, আবার মৃদু আলোকে সংকুচিত হয়ে আংশিক উন্মুক্ত রাখে।

৬. **রেটিনুলার কোষ** (Retinular cell) : কোণ কোষগুলোর নিচে বৃত্তাকারে ৭/৮টি লম্বা রেটিনুলার কোষ অবস্থিত। এগুলোর নিউক্লিয়াস কোণ কোষ সংলগ্ন প্রান্তে অবস্থিত। এসব কোষ একদিকে কোণ কোষের সাথে অন্যদিকে স্নায়ুতন্তুর সাথে যুক্ত। এসব কোষের ক্ষরণ থেকে র‍্যাবডোম গঠিত। তাছাড়া এগুলো আলোক সংবেদীও বটে।

৭. **র‍্যাবডোম** (Rhabdome) : ক্রিস্টালাইন কোণের নিচে অবস্থিত স্বচ্ছ প্রলম্বিত এ অংশটি অনুপ্রস্থভাবে রেখান্বিত। একে ঘিরে অবস্থিত রেটিনুলার কোষগুলোর ক্ষরণ থেকেই র‍্যাবডোম গঠিত ও পুষ্ট হয়। এর মাধ্যমে আলো গৃহীত হয়।

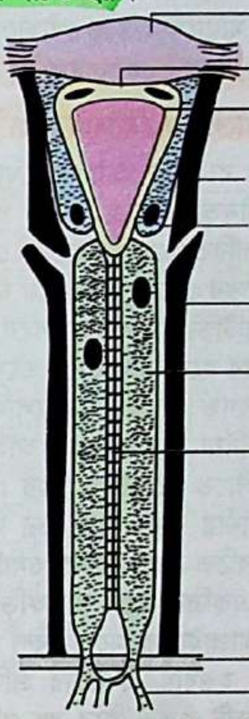

চিত্র ২.২.২৮ : একটি ওমাটিডিয়াম (লম্বচ্ছেদ)

৮. **রেটিনাল রঞ্জক আবরণী** (Retinal pigment sheath) : এটি রেটিনুলার কোষকে ঘিরে রঞ্জকময় কোষে গঠিত কালো পর্দার একটি আবরণ। এটি প্রত্যেক ওমাটিডিয়ামকে পরস্পর থেকে পৃথক করে রাখে। এ পর্দার রঞ্জক পদার্থ আলোর তীব্রতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন দিকে সঞ্চালিত হতে পারে।

৯. **ভিত্তিপর্দা** (Basal membrane) : ওমাটিডিয়াম যে পাতলা পর্দার উপর অবস্থান করে তার নাম ভিত্তিপর্দা। এটি ওমাটিডিয়ামকে ধারণ করে।

১০. **স্নায়ুতন্তু** (Nerve fibre) : প্রতিটি রেটিনুলার কোষ থেকে স্নায়ুতন্তু বেরিয়ে অপটিক স্নায়ুর সাথে যুক্ত হয়। এসব তন্তু ওমাটিডিয়ার মাধ্যমে গৃহীত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।

পুঞ্জাক্ষি (জটিল চোখ) এবং সরলাক্ষি (সরল চোখ)-র মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	পুঞ্জাক্ষি	সরলাক্ষি
১. অবস্থান	আর্থ্রোপোডদের মাথার পৃষ্ঠ বা পার্শ্ব দিকে।	মেরুদণ্ডী প্রাণিদের মাথার দুপাশে, কোটরের ভিতরে।
২. গঠন	গোল বা বৃক্কাকার, অসংখ্য ওমাটিডিয়া একক নিয়ে গঠিত।	প্রায় গোল, সরলাক্ষি নিজেই একটি একক।
৩. এককের উপাদান	কর্নিয়া, কর্নিয়াজেন কোষ, কোণ কোষ, ক্রিস্টালাইন কোণ, আইরিশ আবরণী, রেটিনাল আবরণী, র‍্যাবডোম ইত্যাদি।	কর্নিয়া, আইরিশ, লেন্স, রেটিনা, কোরয়েড, স্ক্লেরা, পেশি, প্রকোষ্ঠ ইত্যাদি।
৪. আইরিশ আবরণী	অসংখ্য ও লম্বা।	একটি এবং গোল।
৫. স্ক্লেরা ও কোরয়েড	অনুপস্থিত।	উপস্থিত।
৬. প্রতিবিম্ব	মৃদু আলো ও উজ্জ্বল আলোতে ভিন্ন ধরনের প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।	সবক্ষেত্রে একই ধরনের প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

দর্শন কৌশল (Mechanism of Vision)

প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে প্রাণী বস্তুকে অবলোকন করে। ঘাসফড়িং **দিবাচর শস্যভোজী** প্রাণী। দিনের **উজ্জ্বল** (তীব্র) আলো ও দিনের শেষে **স্তিমিত** (মৃদু) আলো– দুসময়েই এদের দৃষ্টিশক্তি কার্যকর থাকে। এজন্য দুটো ভিন্ন দর্শন কৌশল রয়েছে। এরা মানুষের চেয়ে স্পষ্টভাবে কোনো চলমান বস্তু দেখতে পারে। সাধারণত ঘাসফড়িং একটি ওমাটিডিয়াম

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

দিয়ে পূর্ণাঙ্গ বস্তুকে দেখতে পায়না। প্রতিটি ওমাটিডিয়ামে বস্তুর খণ্ডিত প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। সকল ওমাটিডিয়ামের সম্মিলিত প্রতিবিম্ব বস্তুটিকে সম্পূর্ণরূপে দেখতে সাহায্য করে। সম্পূর্ণভাবে গঠিত প্রতিবিম্বের সংবেদন **অপটিক স্নায়ু** (optic nerve)-র মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছালে ঘাসফড়িং তা দেখতে পায়। **আলোর তীব্রতা অনুসারে পুঞ্জাক্ষিতে দুধরনের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়, যথা– মোজাইক প্রতিবিম্ব এবং সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব।**

১. উজ্জ্বল আলোতে মোজাইক বা অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব (Mosaic or Apposition Image)

দিনে উজ্জ্বল বা তীব্র আলোতে ঘাসফড়িং-এর ওমাটিয়ামে **মোজাইক প্রতিবিম্ব** সৃষ্টি হয় এবং এতে প্রত্যেক ওমাটিডিয়াম স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। উজ্জ্বল আলোতে আইরিশ রঞ্জক আবরণী ও রেটিনাল রঞ্জক আবরণী অবিচ্ছিন্নভাবে প্রসারিত হয়ে কর্নিয়াজেন কোষ ও ক্রিস্টালাইন কোণ কোষগুলোকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করে। ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়াম পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। এ অবস্থায় দর্শনীয় বস্তুর কোন বিন্দু থেকে আগত কেবল লম্বভাবে পতিত আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রবেশ করে এবং কর্নিয়া ও ক্রিস্টাইলাইন কোণ হয়ে র‍্যাবডোমে এসে পড়ে। কিন্তু ঐ বিন্দু থেকে আগত তির্যক আলোকরশ্মি পার্শ্ববর্তী ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়া ভেদ করলেও আইরিশ ও রেটিনাল অবিচ্ছিন্ন আবরণীতে শোষিত হয়। ফলে প্রতিটি ওমাটিডিয়ামে দর্শনীয় বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পৃথক ও সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়। সকল ওমাটিডিয়ামের এসব খন্ডিত প্রতিবিম্ব একত্রিত হলে ঘাসফড়িং বস্তুটিকে স্পষ্ট দেখতে পায়। মোজাইকের মতো বিন্দু বিন্দু করে পুরো প্রতিবিম্বটি গঠিত হওয়ায় এধরনের প্রতিবিম্ব **মোজাইক প্রতিবিম্ব** এবং একটি একটি করে বহু প্রতিবিম্বের সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব তৈরি হওয়ায় এধরনের প্রতিবিম্বকে **অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্ব** বলা হয়ে থাকে।

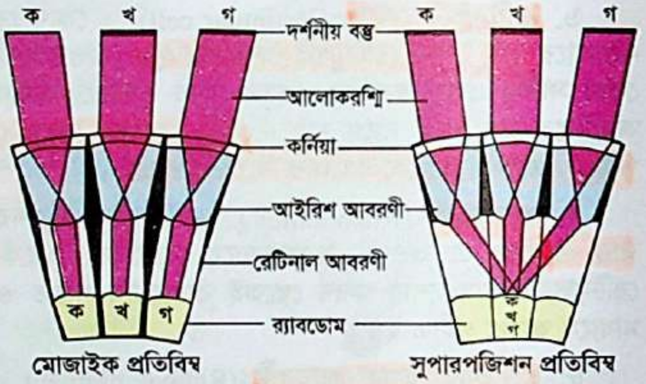

চিত্র ২.২.২৮ : ঘাস ফড়িংয়ের দর্শন কৌশল

২. অনুজ্জ্বল বা স্তিমিত আলোতে সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব (Superposition Image)

সাধারণত বিকেলে, সন্ধ্যায় বা রাতে অর্থাৎ অনুজ্জ্বল আলোতে ঘাসফড়িং-এর ওমাটিডিয়ামে **সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব** সৃষ্টি হয়। অনুজ্জ্বল বা স্তিমিত আলোতে ওমাটিডিয়ামের আইরিশ রঞ্জক আবরণী কর্নিয়ার দিকে এবং রেটিনাল রঞ্জক আবরণী ভিত্তি পর্দার দিকে সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে পুরো ওমাটিডিয়াম অর্থাৎ ক্রিস্টালাইন কোণ ও র‍্যাবডোম অনাবৃত হয়ে যায়। এসময় দর্শন বস্তু হতে সরাসরি আসা আলোকরশ্মি সোজাসুজি কর্নিয়া, ক্রিস্টালাইন কোণ হয়ে র‍্যাবডোমে পৌঁছায়। আবার দর্শন বস্তু থেকে তির্যকভাবে আসা আলোকরশ্মি একটি ওমাটিডিয়ামের কর্নিয়ার মাধ্যমে প্রবেশ করে পাশের ওমাটিডিয়ামের র‍্যাবডোমে এসে পড়ে। রঞ্জক আবরণীদুটির বাধা না থাকায় আলোকরশ্মির এধরনের চলাচল সম্ভব হয়। ফলে একটি ওমাটিডিয়ামে একাধিক দিক থেকে আসা আলোকরশ্মি দিয়ে একের উপর আরেকটি এভাবে একাধিক প্রতিবিম্ব পড়ে। ফলে সম্পূর্ণ বস্তুর একটি অস্পষ্ট ও ঝাপসা প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। একটির উপর আরেকটি প্রতিবিম্ব পড়ার ফলে সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হওয়ায় এধরনের প্রতিবিম্বকে **সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব** বলা হয়ে থাকে।

সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব ও অ্যাপোজিশন প্রতিবিম্বের তুলনা

তুলনীয় বিষয়	সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব	মোজাইক প্রতিবিম্ব
১. আলোর অবস্থা	মৃদু বা স্তিমিত আলোতে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।	তীব্র বা উজ্জ্বল আলোতে প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।
২. রঞ্জক আবরণী	রেটিনাল ও আইরিশ আবরণী সংকুচিত হয়।	রেটিনাল ও আইরিশ আবরণী প্রসারিত হয়।
৩. আলোকরশ্মি	তির্যক ও উলম্বিক উভয় আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।	কেবল উলম্বিক আলোকরশ্মি ওমাটিডিয়ামে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে।
৪. প্রতিবিম্বের ধরণ	বস্তুর সম্পূর্ণ অংশের অস্পষ্ট, সামগ্রিক ও ঝাপসা প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।	বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অংশের পৃথক ও সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ঘাসফড়িং-এর প্রজনন প্রক্রিয়া ও রূপান্তর (Process of Reproduction and Metamorphosis)

প্রজননতন্ত্র (Reproductive System)

ঘাসফড়িং একলিঙ্গ প্রাণী। এদের যৌন দ্বিরূপতা সুস্পষ্ট। একটি পুরুষ ও স্ত্রী ঘাসফড়িং বাইরে থেকে দেখে খুব সহজে চেনা যায়। স্ত্রী ফড়িং-এর উদরের **ওভিপজিটর** (ovipositor) দেখে পুরুষ সদস্য আলাদা করা হয়। নিচে ঘাসফড়িং-এর পুরুষ ও স্ত্রী জননতন্ত্র সম্বন্ধে আলাদাভাবে বর্ণনা করা হলো।

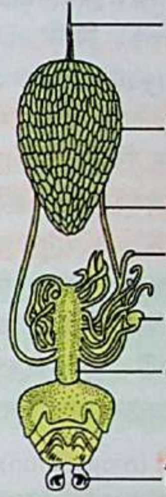

চিত্র ২.২.২৯ : পুংজননতন্ত্র

পুংজননতন্ত্র : ঘাসফড়িং-এর পুংজননতন্ত্র একজোড়া করে শুক্রাশয়, শুক্রনালি বা ভাস ডিফারেন্স, সহায়ক গ্রন্থি, সেমিনাল ভেসিকল, একটি করে ক্ষেপননালি ও পুরুষাঙ্গ নিয়ে গঠিত। **শুক্রাশয়** (testis) পুংজননতন্ত্রের মুখ্য অঙ্গ। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম উদর খণ্ডকে অন্ত্রের উপরে একটি **মিডিয়ান লিগামেন্ট** (median ligament) দ্বারা পৃষ্ঠীয় প্রাচীরের সাথে শুক্রাশয় সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। প্রতিটি শুক্রাশয় কতগুলো ক্ষুদ্র স্বচ্ছ **ফলিকল** (follicle) নিয়ে গঠিত। ফলিকলের মধ্যে উৎপন্ন শুক্রাণু সূক্ষ্ম নালিকার (ভাসা ইফারেন্সিয়া) মাধ্যমে লম্বা শুক্রনালি বা **ভাস ডিফারেন্স** (vas deferens)-এ প্রবেশ করে। নবম উদর খণ্ডকে দুপাশের দুটি ভাসা ডিফারেন্সিয়া (বহুবচনে) মিলিত হয়ে একটি **ক্ষেপননালি** (ejaculatory duct) গঠন করে। এটি পুরুষাঙ্গে অবস্থিত ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয়। একজোড়া **সহায়ক গ্রন্থি** (accessory gland) ক্ষেপন নালিতে উন্মুক্ত হয়ে তরল পদার্থ ক্ষরণ করে। এ তরলে শুক্রাণু নিমজ্জিত থাকে। সহায়ক গ্রন্থির সঙ্গে প্যাঁচানো, লম্বা **সেমিনাল ভেসিকল** (seminal vesicle) যুক্ত থাকে।

চিত্র ২.২.৩০ : স্ত্রীজননতন্ত্র

স্ত্রীজননতন্ত্র : স্ত্রীজননতন্ত্র ডিম্বাশয়, ডিম্বনালি, যোনি, স্পার্মাথিকা বা সেমিনাল রিসেপ্টেকল, স্ত্রীজননরন্ধ্র ও আনুষঙ্গিক গ্রন্থি নিয়ে গঠিত। দুটি **ডিম্বাশয়** (ovary) স্ত্রীজননতন্ত্রের মুখ্য অঙ্গ এবং অন্ত্রের উপরে **মিডিয়ান লিগামেন্ট** (median ligament) দ্বারা পৃষ্ঠীয় প্রাচীরের সাথে আটকানো থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয় নলের মতো অনেক অণুডিম্বাশয় বা **ওভারিওল** (ovarioles) নিয়ে গঠিত। অণুডিম্বাশয়গুলো একত্রে মিলিত হয়ে একটি করে চওড়া ডিম্বনালি গঠন করে। দুটি ডিম্বনালি একীভূত হয়ে **যোনি** (vagina) নামে একটি ছোট প্রকোষ্ঠ গঠন করে। যোনি দেহের ৭ম উদরীয় খন্ডে অবস্থিত একটি পেশিবহুল প্রকোষ্ঠ যা ওভিপজিটর এর দুটি অংশের মাঝে অবস্থিত। এটি ওভিপজিটর হয়ে জননছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত হয়। যোনিতে একজোড়া ডিম্বনালি ছাড়াও একটি কুন্ডলীকৃত **স্পার্মাথিকাল নালি** যুক্ত থাকে। এ কুন্ডলীকৃত নালির শেষ প্রান্তে একটি থলির মতো **স্পার্মাথিকা** (spermatheca) থাকে যা অল্প সময়ের জন্য শুক্রাণুকে স্ত্রীদেহে জমা করে রাখে। ডিম্বাশয়ের উপরিভাগে একজোড়া **সহায়ক গ্রন্থি** রয়েছে যা ডিম্বনালির মাধ্যমে যোনিতে এসে সংযুক্ত হয়। এ সহায়ক গ্রন্থি নিঃসৃত তরল দেহের বাইরে আসার আগে ডিমকে গুচ্ছবদ্ধ রাখতে সহায়তা করে।

চিত্র ২.২.৩১ : যৌনমিলন

প্রজনন প্রক্রিয়া (Process of Reproduction)

ঘাসফড়িং **যৌন** (sexual) প্রক্রিয়ায় প্রজনন ঘটায়। এর প্রজনন প্রক্রিয়া নিচে বর্ণিত কয়েকটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়।

১. **যৌনমিলন** (Copulation) : গ্রীষ্মের শেষদিকে ঘাসফড়িং-এর যৌনমিলন ঘটে। এ সময় পুরুষ-ফড়িং স্ত্রী-ফড়িং-এর পিঠে উঠে আটকে থাকে এবং এ অবস্থায় শিশ্নপথে স্ত্রী-ফড়িং-এর যোনিতে সেমিনাল ফ্লুইড ত্যাগ করে। সেমিনাল ফ্লুইডে শুক্রাণু থাকে। ডিম না পাড়া পর্যন্ত শুক্রাণুগুলো স্পার্মাথিকায় জমা থাকে। ডিম পাড়ার আগে কয়েকবার মিলন হতে পারে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. **নিষেক** (fertilization) : যৌন মিলনের এক পর্যায়ে পুরুষ-প্রাণিদেহ থেকে শুক্রাণু স্ত্রী-প্রাণিদেহে স্থানান্তরিত হয় এবং শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াসের পরস্পর একীভবনে নিষেক সম্পন্ন হয়। ঘাসফড়িং-এর নিষেক অন্তঃস্থ (internal)। ৩–৫ মি.মি. লম্বা ডিম্বাণুটি **কুসুম** (yolk) সমৃদ্ধ এবং ডিম্বনালি দিয়ে বেরিয়ে আসার সময় নরম **ভাইটেলাইন ঝিল্লি** (vitelline membrane) ও শক্ত-নমনীয় বহিঃস্থ **কোরিওন** (chorion)-এ আবৃত হয়। স্পার্মাথিকা রন্ধ্রের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় ডিম নিষিক্ত হয়। কোরিওনের একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে শুক্রাণু ডিম্বাণুতে প্রবেশ করে। এ ছিদ্রটিকে **মাইক্রোপাইল** (micropyle) বলে।

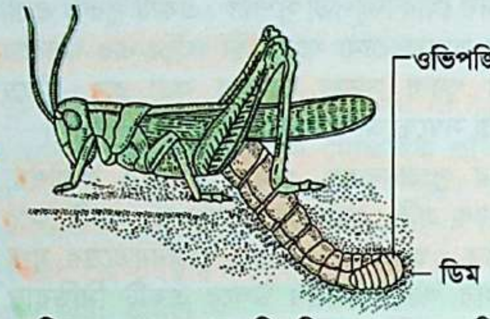

চিত্র ২.২.৩২ : ঘাসফড়িং ডিম পাড়ছে

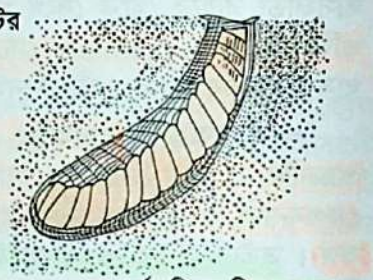
চিত্র ২.২.৩৩ : গর্তের ভিতর ডিমের গুচ্ছ

৩. **ডিমপাড়া** (oviposition) : মিলনের পর থেকে কিছুদিন পর পর স্ত্রী ঘাসফড়িং লম্বা, বাদামি রংয়ের ডিম পাড়তে শুরু করে। শরৎকাল পর্যন্ত ডিমপাড়া অব্যাহত থাকে। স্ত্রী ফড়িং ওভিপজিটরের সাহায্যে ১০ সে.মি. গভীর একটি গর্ত করে এর ভিতরে গুচ্ছাকারে ২০টি ডিম পাড়ে। আঠালো পদার্থের সাহায্যে ডিমগুলো পরস্পর আটকে থাকে। একটি স্ত্রী-ফড়িং এভাবে ১০টি গুচ্ছে মোট ২০০টি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর পুরুষ ও স্ত্রী উভয় ঘাসফড়িংই মারা যায়।

৪. **পরিস্ফুটন** (Development) : ঘাসফড়িং-এর ডিম্বাণু **সেন্ট্রোলেসিথাল** (centrolecithal) ধরনের অর্থাৎ এর কুসুম কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ থাকে। নিষিক্ত ডিম্বাণুর ক্লিভেজ (বিভাজন) শুরু হওয়ার পর প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে পরিস্ফুটন অব্যাহত থাকে। শীতকালে পরিস্ফুটন বন্ধ থাকে। এ সময়কালটি ডায়াপজ (diapause) নামে পরিচিত। তখন শীতকালীন প্রতিকূল অবস্থার (প্রচন্ড শীত ও খাদ্যাভাব) মুখোমুখি যেন শিশু ফড়িংকে পড়তে না হয় সে কারণে ডায়াপজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বসন্তের আগমনে উষ্ণ পরিবেশ ফিরে এলে আবার বৃদ্ধি শুরু হয় এবং অতি ক্ষুদ্রাকায় শিশু ঘাসফড়িং-এর জন্ম হয়।

রূপান্তর (Metamorphosis)

পতঙ্গের ভ্রূণ যখন কয়েকটি ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ দশা প্রাপ্ত হয় তখন এ ধরনের ভ্রূণোত্তর পরিস্ফুটনকে রূপান্তর বলে। রূপান্তর প্রধানত দুধরনের– ১. অসম্পূর্ণ ও ২. সম্পূর্ণ রূপান্তর।

১. **অসম্পূর্ণ রূপান্তর** (Incomplete metamorphosis) : যে রূপান্তরে একটি পতঙ্গ ডিম ফুটে বেরিয়ে কয়েকটি নিম্ফ (শিশু) দশা অতিক্রমের পর পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে পরিণত হয় তাকে অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলে। প্রত্যেক নিম্ফ দশা দেখতে প্রায় পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গের ক্ষুদ্র প্রতিরূপের মতো, কিন্তু এগুলো ডানা ও জননাঙ্গবিহীন থাকে এবং স্পষ্ট বর্ণপার্থক্য প্রদর্শন করে। অসম্পূর্ণ রূপান্তরে শিশু অবস্থায় প্রাণীকে **নিম্ফ** (nymph) বলে। উদাহরণ– ঘাসফড়িং ও তেলাপোকার রূপান্তর।

২. **সম্পূর্ণ রূপান্তর** (Complete metamorphosis) : যে রূপান্তরে শিশু প্রাণী ও পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মধ্যে কোনো আঙ্গিক মিল থাকে না এবং ব্যাপক পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশুপ্রাণী পূর্ণাঙ্গ অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, সে ধরনের রূপান্তরকে সম্পূর্ণ রূপান্তর বলে। এ ক্ষেত্রে রূপান্তরের ৪টি সুস্পষ্ট ধাপ হচ্ছে ডিম → **লার্ভা** → **পিউপা** → **ইমোগো** (পূর্ণাঙ্গ)। সম্পূর্ণ রূপান্তরে শিশু অবস্থায় প্রাণীকে **লার্ভা** (larva) বলে। উদাহরণ– মৌমাছি ও প্রজাপতির রূপান্তর।

ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর

ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর অসম্পূর্ণ বা **হেমিমেটাবোলাস** (hemimetabolous) ধরনের, কারণ এদের অপরিণত নিম্ফ আংশিক পরিস্ফুটনের মাধ্যমে কয়েকটি নিম্ফ দশা পেরিয়ে পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-য়ে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ ঘাসফড়িংয়ের জীবন ইতিহাসে তিনটি ধাপ রয়েছে: **ডিম → নিম্ফ → পূর্ণাঙ্গ প্রাণী**।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ডিম ফুটে যে তরুণ ঘাসফড়িং বেরিয়ে আসে তাকে **নিম্ফ** (nymph) বলে। বহির্গঠনের দিক থেকে নিম্ফ এবং পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং দেখতে প্রায় এক রকম, অন্ততঃ মুখোপাঙ্গ, সরলাক্ষি ও পুঞ্জাক্ষি, অ্যান্টেনি, পায়ু প্রভৃতি। অনুরূপভাবে, নিম্ফের জীবনধারণ, খাদ্যাভ্যাস, খাদ্য ও বসতিও এক রকম। নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-এ পার্থক্য হচ্ছে নিম্ফে ডানা ও জননাঙ্গ থাকে না, তা ছাড়া দেহের আকার-আকৃতি ছোট থাকে। পূর্ণাঙ্গ হলে ডানা ও জননাঙ্গের পরিস্ফুটন ঘটে, দেহের আকারও বড় হয়।

সদ্য পরিস্ফুটিত নিম্ফের কাইটিন নির্মিত বহিঃকঙ্কাল থাকে স্বচ্ছ, ক্রমশ গাঢ় হয়। একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ের এ নিম্ফ একটু বড় হলে বহিঃকঙ্কাল আঁটসাট হয়ে দেহবৃদ্ধি রহিত করে দেয়। তখন দেহবৃদ্ধি স্বাভাবিক রাখতে পুরনো বহিঃকঙ্কাল মোচন বা **মোল্টিং** (molting) প্রক্রিয়ায় ত্যাগ করে ২য় ধাপের নিম্ফে পরিণত হয়। পরবর্তীতে আরও ৩ বার

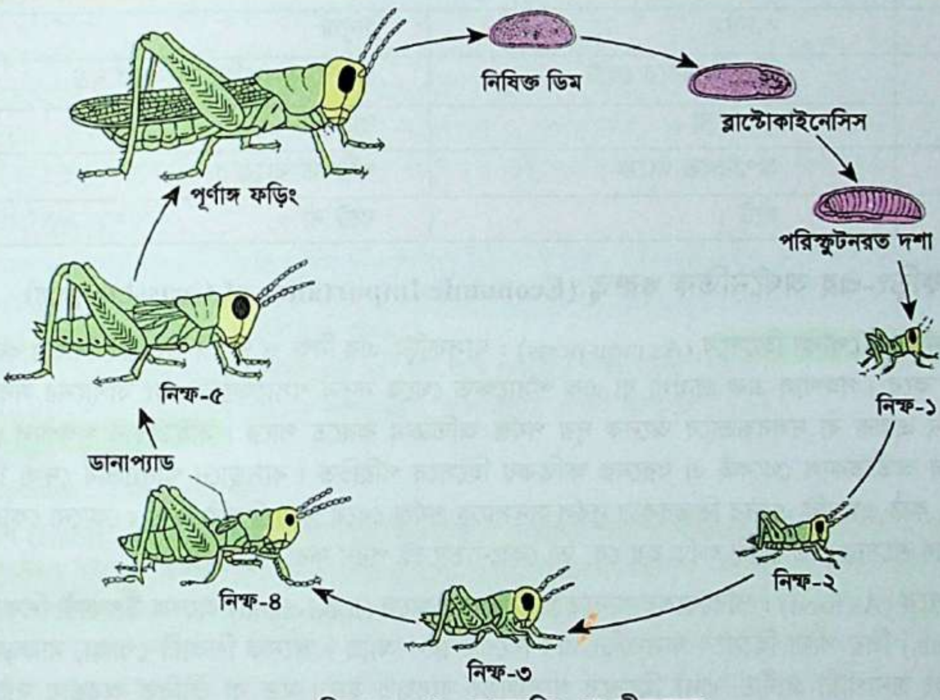

চিত্র ২.২.৩৪ : ঘাসফড়িং-এর জীবনচক্র

খোলস মোচনের পর পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-এ রূপান্তরিত হয়। দ্বিতীয় ধাপের নিম্ফে ক্ষুদ্রাকায় ডানা প্যাড (wing pad) থেকে ডানা সৃষ্টির সূত্রপাত ঘটে। প্রতিবার খোলস মোচনের পর নিম্ফ দেখতে ছোট আকৃতির পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং-এর মতো দেখায়। তা ছাড়া, এদের পরিস্ফুটনে কোনো বিশ্রাম দশাও নেই। পঞ্চম বার খোলস মোচনের মাধ্যমে নিম্ফ পরিণত ঘাসফড়িং হয়ে উঠে। দুটি মোচনের মধ্যবর্তী দশাকে **ইনস্টার** (instar) বলে। ঘাসফড়িং-এর রূপান্তর সম্পন্ন হতে প্রায় দুমাস সময় লাগে।

রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা

ঘাসফড়িং-এর দেহে ৪ ধরনের অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি পাওয়া যায়– **ইন্টারসেরিব্রাল গ্রন্থিকোষ, প্রোথোরাসিক গ্রন্থি, করপোরা অ্যালাটা** এবং **করপোরা কার্ডিয়াক**। এগুলোর মধ্যে প্রথম ৩টি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন ঘাসফড়িং-এর রূপান্তরে প্রধান ভূমিকা পালন করে। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. **ইন্টারসেরিব্রাল গ্রন্থিকোষ** (Intercerebral gland cells) : মস্তিষ্কে অবস্থানকারী এ গ্রন্থিকোষগুলো প্রোথোরাসিকোট্রপিক হরমোন বা **মস্তিষ্ক হরমোন** (Prothoracicotropic hormone or Brain hormone) ক্ষরণ করে যা প্রোথোরাসিক গ্রন্থিকে হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপিত করে।

২. **প্রোথোরাসিক গ্রন্থি** (Prothoracic gland) : অগ্রবক্ষে অবস্থিত এ গ্রন্থিগুলো একডাইসোন হরমোন (ecdysone hormone) ক্ষরণ করে যা নিম্ফ দশায় খোলস মোচন বা **মোল্টিং** (ecdysis or moulting) নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে দেহে টিস্যুর বৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৩. করপোরা অ্যালাটা (Corpora allata) **:** নিম্ফ দশায় এ গ্রন্থি থেকে জুভেনাইল হরমোন (Juvenile hormone -neotinin) ক্ষরিত হয় করে যা নিম্ফদশার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে এ হরমোনের প্রভাবেই ঘাসফড়িং- এর নিম্ফ দশা দীর্ঘ হয়। প্রাপ্তবয়স্ক ঘাসফড়িং-এর করপোরা অ্যালাটা থেকে গোনাডোট্রপিক হরমোন (Gonadotropic hormone) নিঃসৃত হয় যা প্রাপ্তবয়স্কদের জনন অঙ্গের পরিণতি ঘটায়।

৪. করপোরা কার্ডিয়াকা (Corpora cardiaca) **:** মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগে গ্রাসনালির দুপাশে অবস্থিত এ গ্রন্থিগুলো গ্রোথ হরমোন (Growth hormone) নিঃসরণ করে।

নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং- এর মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	নিম্ফ (Nymph)	পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং (Adult Grasshopper)
১. দেহবর্ণ	বাদামি।	সবুজ।
২. আকার	নিম্ফ আকারে ছোট।	পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং আকারে বড়।
৩. পাখা	থাকে না।	থাকে।
৪. জননাঙ্গ	অপরিণত থাকে।	পরিণত থাকে।
৫. মোল্টিং	ঘটে।	ঘটে না।

ঘাসফড়িং-এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Economic Importance of Grasshopper)

১. শস্যের ক্ষতিকর পোকা হিসেবে (As crop pests) **:** ঘাসফড়িং-এর নিম্ফ ও পূর্ণাঙ্গ উভয়েই বিভিন্ন ধরনের শস্য খেয়ে প্রভূত ক্ষতি করে। পঙ্গপাল এক জায়গা বা এক শস্যক্ষেত থেকে নতুন শস্যক্ষেতে এবং বাগানের সবজি ক্ষেত্রে গমন করে। গমনে একক বা দলবদ্ধভাবে অনেক দূর পর্যন্ত অতিক্রম করতে পারে। মাইগ্রেটরি পঙ্গপাল (*Locusta migratoria*) সুদূর অতীতকাল থেকেই এ ধরনের ক্ষতিকর হিসেবে পরিচিত। বাসস্থানে খাদ্যাভাব দেখা দিলে এরা লতা, গাছের ডাল, কাঠ এমনকি এদের ভিতরকার দুর্বল সদস্যকে পর্যন্ত খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। কোনো কোনো সময়ে ফড়িং-এর আক্রমণে শস্যের এত বেশি ক্ষতি হয় যে, তা কোনোভাবেই পূরণ করা সম্ভব হয় না।

২. খাদ্য হিসেবে (As food) **:** পরিবেশের খাদ্যতন্ত্র বা খাদ্যশৃঙ্খলে (food chain) অনেক উপকারী শিকারী প্রাণীর (predatory animals) প্রিয় খাদ্য হিসেবে ঘাসফড়িং-এর বিশেষ স্থান আছে। অনেক শিকারী পোকা, মাকড়সা, ব্যাঙ, সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর খাদ্য হিসেবে ঘাসফড়িং ব্যবহৃত হয়। মৃত বা জীবিত অবস্থায় মাছের টোপ (fish-bait) হিসেবেও ঘাসফড়িং-এর ব্যবহার রয়েছে।

পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে এরা মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গ্রিক পঙ্গপাল (Greek Ground Locust) গুঁড়া করে অনেকে ময়দা বানিয়ে খায়। মেক্সিকো, জাপান এবং ফিলিপাইনে প্রিয় খাদ্য হিসেবে ঘাসফড়িং ব্যবহৃত হয়। আমেরিকা, ভারত ও অন্যান্য দেশের আদিবাসীরা সচরাচর সকল সময়েই খাবার হিসেবে এটি খেয়ে থাকে।

৩. পরিবেশ বাসযোগ্য রাখতে : গাছের পচন ও সেই মাটিকে উর্বর করে পুনর্জন্ম ঘটিয়ে, আগাছা খেয়ে বিভিন্ন উদ্ভিদের পুষ্টি রক্ষায়, মলত্যাগ করে এবং মৃত্যুর পর নিজেকে বিলীন করে দিয়ে মাটির উর্বরতা বাড়াতে ঘাসফড়িং অবদান রাখে।

৪. মাধ্যমিক পোষক হিসেবে (As intermediate host) **:** কিছু চ্যাপ্টাকৃমি ও গোলকৃমি ঘাসফড়িংকে আক্রমণ করে এদের দেহে জীবনচক্রের একটি পর্যায় অতিক্রম করে। পোকাগুলো ক্রিমির মাধ্যমিক পোষক হিসেবে কাজ করে। যদি কোনো পাখি বা সরীসৃপ কখনও খাদ্য হিসেবে ঘাসফড়িং খায় তখন এরা মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে। এভাবে মেরুদণ্ডী পোষক আক্রান্ত হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

আহছানুল হক আবির

২.৩ প্রতীক প্রাণী : রুই মাছ (*Labeo rohita*)

বাংলাদেশের তিনটি (রুই, কাতলা ও মৃগেল) বড় কার্প জাতীয় প্রজাতির মধ্যে **রুই মাছ** (*Labeo rohita*) স্বাদুপানির চাষযোগ্য, সুলভ, জনপ্রিয় ও প্রোটিনসমৃদ্ধ সুস্বাদু মাছ। এটি একটি দ্রুত বর্ধনশীল মাছ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় খামারে বছরে ৩৫–৪৫ সেন্টিমিটার (১–১.৫ ফুট) লম্বা, ৭০০–৮০০ গ্রাম ওজনবিশিষ্ট হয়। কিন্তু হালদা নদীর রুইয়ের পোনার বৃদ্ধি ২–২½ কেজি পর্যন্ত বাড়ে। এ কারণে হালদা নদীর রুইয়ের রেণু পোনা / ডিম পোনা (৪ দিনের বয়সের পোনা) প্রতি কেজি সর্বনিম্ন ৬০–৬৫ হাজার টাকা (যখন বিপুল পরিমাণ ডিম পাওয়া যায়), সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা। শুধু বৃদ্ধি হারের জন্যই নয়, বিভিন্ন চাষ বা লালন কেন্দ্রগুলোতে অন্তঃপ্রজননের ফলে বামনত্ব, বিকলাঙ্গতাসহ বিভিন্ন জিনগত সমস্যা দেখা দেওয়ায় হালদা-র প্রাকৃতিক ও বিশুদ্ধ জিনের পোনা এখন আরও দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে।

বসতি (Habitat) : রুই মাছ ইন্ডিয়া (মূল ভূখন্ড), পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের নদীতন্ত্রের প্রাকৃতিক প্রজাতি। স্বাদুপানির পুকুর, নদী, হ্রদ ও মোহনায় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বিভিন্ন বড় নদীতে বিচরণ করে, ডিম ছাড়ার সময় প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করে। স্বাদ, সহজ চাষপদ্ধতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণে ও পুষ্টি ঘাটতি মেটাতে শ্রীলংকা, নেপাল, চায়না, রাশিয়ান ফেডারেশন, জাপান, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া ও আফ্রিকান দেশগুলোতে রুই মাছের চাষ হচ্ছে। ইন্ডিয়ান আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মিঠাপানির নদীতেও অনুপ্রবেশিত রুইয়ের সফল চাষ হচ্ছে।

শ্রেণিতাত্ত্বিক অবস্থান

Phylum : Chordata (জীবনের কোন না কোন দশায় নটোকর্ড, পৃষ্ঠীয় স্নায়ুরজ্জু ও গলবিলীয় ফুলকা রন্ধ্র থাকে)
Sub-Phylum : Vertebrata (নটোকর্ড মেরুদণ্ড দিয়ে প্রতিস্থাপিত)
Class : Actinopterygii (রশ্মিযুক্ত পাখনা)
Order : Cypriniformes (পার্শ্বরেখা সংবেদী অঙ্গ লেজের শীর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত)
Family : Cyprinidae (ভোমার দাঁতবিহীন, গলবিলীয় কর্তন আল উপস্থিত)।
Genus : *Labeo*
Species : *Labeo rohita*

স্বভাব (Habit) : জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে রুইয়ের পছন্দের আহার হচ্ছে প্ল্যাংকটন জাতীয় (প্রাণিপ্ল্যাংকটন ও উদ্ভিদপ্ল্যাংকটন) জীব। **আঙ্গুলিপোনা** দশায় (fingerling stage) প্রধানত প্রাণিপ্ল্যাংকটন গ্রহণ করলেও ডেসমিড (desmids), ফাইটোফ্ল্যাজেলেট (phytoflagellate), শৈবাল রেণু (algal spore) প্রভৃতিও গ্রহণ করে। তরুণ ও পূর্ণবয়স্ক মাছ পানির মাঝ স্তরের শৈবাল ও নিমজ্জিত উদ্ভিদ বেশি গ্রহণ করে (অর্থাৎ প্রধানত শাকাশী)। পৌষ্টিকনালিতে পচনশীল জৈব পদার্থ ও বালু, কাদা প্রভৃতি দেখে তলদেশি খাদকও মনে হয়। খুঁটে খাওয়ার উপযোগী নরম ঝালরযুক্ত ঠোঁট এবং মুখ-গলবিলীয় অঞ্চলে দাঁতের বদলে ধারাল **কর্তন আল** (edge) দেখে বোঝা যায় রুই মাছ নরম জলজ উদ্ভিদ আহার করে। ফুলকায় সরু চুলের মতো **ফুলকা-রেকার** (gill-raker) দেখে প্রমাণ পাওয়া যায় এ মাছ অতিক্ষুদ্র প্ল্যাংকটনও ছেঁকে খায়। মাছের পোনাগুলো ঝাঁক বেঁধে চলে, বয়স্ক মাছ পৃথক জীবন অতিবাহিত করে। রুই মাছ 14° সেলসিয়াসের কম তাপমাত্রায় বাঁচতে পারে না।

Labeo rohita-র বাহ্যিক গঠন

রুই (*Labeo*) একটি অস্থিময় মাছ। এর দেহ অনেকটা মাকু আকৃতির অর্থাৎ মধ্যভাগ চওড়া ও দুই প্রান্ত ক্রমশ সরু। প্রস্থ অপেক্ষা উচ্চতা বেশি, প্রস্থচ্ছেদ ডিম্বাকার। চলনের সময় পানির ভিতর গতি বাধা প্রাপ্ত হয় না বলে এ ধরনের আকৃতিকে **স্ট্রিমলাইন্ড** (streamlined) বলে। রুই মাছের দেহ তিন অংশে বিভক্ত, যথা–**মাথা, দেহকাণ্ড ও লেজ**।

১. মাথা (Head)

দেহের অগ্রপ্রান্ত থেকে কানকোর পশ্চাৎপ্রান্ত পর্যন্ত অংশটি মাথা। মাথা ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা ও পৃষ্ঠভাগ উত্তল। তুণ্ড (snout) ভোঁতা, নিচু, কিন্তু চোয়ালের সামনে বাড়ানো এবং কোনো পার্শ্বীয় খণ্ডবিহীন। মুখ অর্ধচন্দ্রাকার, নিচের দিকে উপপ্রান্তীয়ভাবে অবস্থিত ও আড়াআড়ি বিস্তৃত এবং মোটা ঝালরের মতো উর্ধ্ব ও নিম্নোষ্ঠে আবৃত। উর্ধ্বচোয়ালের পিঠের দিকে একজোড়া নরম ও ছোট **ম্যাক্সিলারি বার্বেল** (maxillary barbels) থাকে। তুণ্ডের পৃষ্ঠদেশে দুচোখের একটু সামনে একজোড়া **নাসারন্ধ্র** (nostrils) অবস্থিত। প্রত্যেক নাসারন্ধ্রের পেছনে ও মাথার দুপাশে একটি করে বড় গোল চোখ রয়েছে। চোখে পাতা থাকে না, কিন্তু কর্ণিয়া স্বচ্ছ ত্বকীয় আবরণে আবৃত। মাথা আঁইশবিহীন, দেহকাণ্ড ও লেজ মিউকাসময় **সাইক্লয়েড** (cycloid) আঁইশে আবৃত।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

আহছানুল হক আবির

মাথার পিছন দিকে দুপাশে ফুলকা-প্রকোষ্ঠকে ঢেকে অবস্থান করে দুটি বেশ বড় ও পাতলা কানকো (operculum)। কানকোর নিচের কিনারায় একটি করে পাতলা ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দা (branchiostegal membrane) যুক্ত থাকে, এটি ফুলকা-প্রকোষ্ঠের বড় অর্ধচন্দ্রাকার ছিদ্রকে ঢেকে রাখে।

২. দেহকাণ্ড (Trunk)

কানকোর শেষভাগ থেকে পায়ু পর্যন্ত দেহের মধ্য অংশটি দেহকাণ্ড। এ অংশটি চওড়া এবং বিভিন্ন ধরনের পাখনা (fin) বহন করে। পাখনাগুলো পূর্ণ বিকশিত এবং অস্থিময় পাখনা-রশ্মি (fin rays) যুক্ত। দেহকাণ্ডের পশ্চাৎপ্রান্তের অঙ্কীয়দিকে ঠিক মাঝ বরাবর তিনটি ছোট ছিদ্র থাকে : প্রথমে পায়ুছিদ্র, মাঝে জননছিদ্র এবং সবশেষে রেচনছিদ্র।

চিত্র ২.৩.১ : *Labeo rohita*-র বাহ্যিক গঠন (পার্শ্ব দৃশ্য)

পাখনাসমূহ (Fins) : মাছের চলনাঙ্গকে পাখনা বলে। পাখনা সাধারণত চাপা ও পাখনা-রশ্মিযুক্ত। পাখনার ভিতরে অবস্থিত সমান্তরালভাবে সজ্জিত সূক্ষ্ম শলাকার অন্তঃকঙ্কালকে **পাখনা-রশ্মি** (fin rays) বলে। রুই মাছে মোট পাঁচ ধরনের পাখনা দেখা যায়–

- **পৃষ্ঠ-পাখনা** (Dorsal fin) : দেহকাণ্ডের মাঝ বরাবরের পেছনে বড়, কিছুটা রম্বস আকারের একটি মাত্র পৃষ্ঠ-পাখনা অবস্থিত। এর উপরের দিকের মধ্যভাগ অবতল। এতে ১৪-১৬ টি পাখনা-রশ্মি থাকে।
- **বক্ষ-পাখনা** (Pectoral fin) : কানকোর ঠিক পেছনে দেহকাণ্ডের সম্মুখ পার্শ্বদিকে একজোড়া বক্ষ-পাখনা রয়েছে। প্রতিটি পাখনা ১৭-১৮টি পাখনা-রশ্মিযুক্ত।
- **শ্রোণি-পাখনা** (Pelvic fin) : একজোড়া শ্রোণি-পাখনা বক্ষ-পাখনার সামান্য পেছনে অবস্থিত এবং ৯টি করে পাখনা-রশ্মিযুক্ত।
- **পায়ু-পাখনা** (Anal fin) : পায়ুর ঠিক পেছনে দেহের অঙ্কীয়দেশের মধ্যরেখা বরাবর একটি পায়ু-পাখনা থাকে। এটি ৬-৭টি পাখনা-রশ্মিযুক্ত।
- **পুচ্ছ-পাখনা** (Caudal fin) : লেজের পশ্চাতে অবস্থিত পাখনাই পুচ্ছ-পাখনা। এতে আছে ১৯টি পাখনা-রশ্মি। পুচ্ছ–পাখনা রুই মাছের চলাচলে এবং অন্যান্য পাখনা দেহের ভারসাম্য রক্ষায় কাজ করে।

দেহের দুপাশে একসারি ছোট গর্ত আছে যা আঁইশের নিচে অবস্থিত একটি লম্বা খাদের সঙ্গে যুক্ত। এ খাদ ও গর্তের সমন্বয়ে মাছের **পার্শ্বরেখা** অঙ্গ (lateral line organ) গঠিত হয়। এতে অবস্থিত সংবেদী কোষ পানির তরঙ্গ থেকে পানির গুণাগুণ সংক্রান্ত রাসায়নিক সংবেদ গ্রহণ করে।

৩. লেজ (Tail)

পায়ুর পরবর্তী অংশটি লেজ। এর শীর্ষে রয়েছে হোমোসার্কাল (homocercal) ধরনের পুচ্ছ-পাখনা। এটি উল্লম্বতলে (vertical plane) প্রসারিত এবং পেছনে, উপরে ও নিচে দুটি প্রতিসম বাহ্যিক খণ্ডে বিভক্ত। ডার্সাল রশ্মিগুলো উপরে ও নিচের খণ্ডে বড়, মাঝখানে ছোট।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

আঁইশ (Scales)

রুই মাছের দেহকাণ্ড ও লেজ মিউকাসময় সাইক্লয়েড (cycloid) ধরনের (কারণ গোলাকৃতি) আঁইশে আবৃত। এগুলো পাতলা, প্রায় গোল ও রূপালি চকচকে। পৃষ্ঠদেশীয় আঁইশের কেন্দ্র লালচে, প্রান্ত কালো রংয়ের। কেন্দ্রের লালচে রং জনন ঋতুতে আরও গাঢ় ও উজ্জ্বল হয়। জলচর উদ্ভিদসমৃদ্ধ পরিবেশের রুই মাছে পৃষ্ঠদেশের রং লালচে-সবুজ হতে পারে। আঁইশে এককেন্দ্রিক বৃত্তাকার স্তরে স্তরে অস্থি-উপাদান জমা হওয়ায় আঁইশের উপরিভাগে বৃত্তাকার উঁচু আল ও নিচু খাদ সৃষ্টি হয়। স্তরগুলোর কেন্দ্রটি হচ্ছে ফোকাস (focus)। এটি সাধারণত একপাশে থাকে। উঁচু আলগুলোকে বলে সার্কুলাস (বহুবচনে–সার্কুলি) বা বৃদ্ধিরেখা। এগুলোর সাহায্যে বাৎসরিক বৃদ্ধির ও বিভিন্ন ঋতুতে বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা পাওয়া যায়। সাধারণত বসন্তকালে ও গ্রীষ্মে আঁইশের বৃদ্ধি বেশি হয়। আঁইশের সম্মুখভাগ তন্তুময় যোজক টিস্যু-নির্মিত এবং ডার্মিসের পকেটে প্রবিষ্ট থাকে। পশ্চাৎভাগ ডেন্টিন-নির্মিত ও উন্মুক্ত। উন্মুক্ত অংশে থাকে স্পষ্ট বৃদ্ধিরেখা ও অনেক রঞ্জক কোষ। আঁইশগুলো পরস্পরকে আংশিক ঢেকে লম্বালম্বি ও কোণাকুণি সারিতে বিন্যস্ত থাকে। আঁইশগুলো সবসময় মিউকাসের পাতলা পিচ্ছিল আস্তরণে আবৃত থাকে।

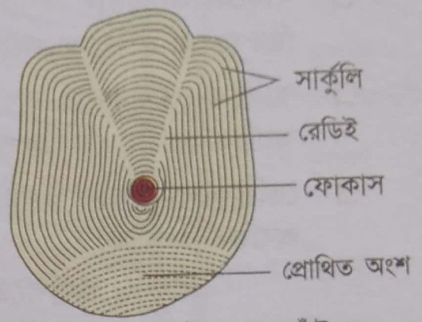

চিত্র ২.৩.২ : রুই মাছের আঁইশ

Labeo rohita-র রক্ত সংবহনতন্ত্র

রক্তবাহিকাবিস্তৃত এবং হৃৎপিণ্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত এ তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়। রুই মাছের রক্ত লাল। এটি **রক্তরস** (plasma) ও **রক্তকণিকা** (blood corpuscles) নিয়ে গঠিত। রক্তকণিকা দুধরনের–**লোহিতকণিকা** ও **শ্বেতকণিকা**। লোহিতকণিকা প্রায় ডিম্বাকার ও নিউক্লিয়াসযুক্ত। শ্বেতকণিকা দেখতে অ্যামিবার মতো (amoeboid)। হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালির সমন্বয়ে *Labeo*-র রক্ত সংবহনতন্ত্র গঠিত।

হৃৎপিণ্ড (Heart)

রুই মাছের ফুলকাদুটির পেছনে **পেরিকার্ডিয়াল গহ্বর** (pericardial cavity) নামে এক বিশেষ ধরনের গহ্বরে হৃৎপিণ্ড অবস্থান করে। **পেরিকার্ডিয়াম** (pericardium) নামক আবরণে হৃৎপিণ্ডটি আবৃত থাকে। অন্যান্য মাছের মতো রুই মাছের হৃৎপিণ্ডটিও দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট–একটি **অলিন্দ** বা **অ্যাট্রিয়াম** (atrium) এবং অন্যটি **নিলয়** বা **ভেন্ট্রিকল** (ventricle)। এছাড়া **সাইনাস ভেনোসাস** (sinus venosus) নামে একটি উপপ্রকোষ্ঠ রয়েছে। নিচে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন উপ-প্রকোষ্ঠ ও প্রকোষ্ঠসমূহের বর্ণনা দেয়া হলো।

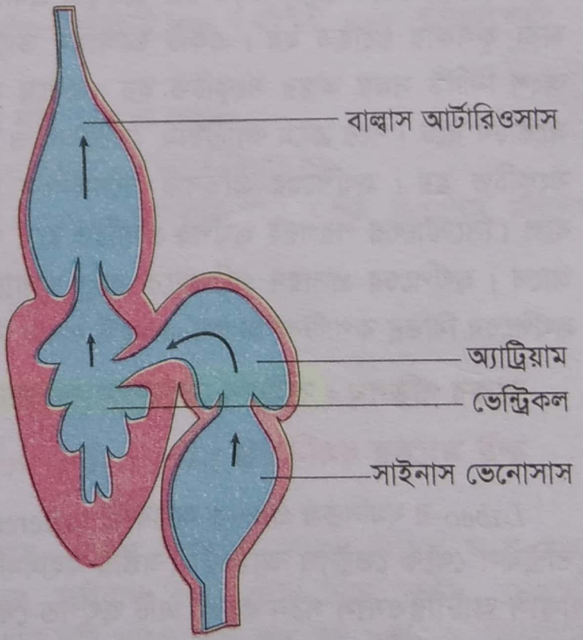

চিত্র ২.৩.৩ : রুই মাছের হৃৎপিণ্ড (লম্বচ্ছেদ)

- **সাইনাস ভেনোসাস** : এটি পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট উপপ্রকোষ্ঠ যা হৃৎপিণ্ডের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত এবং **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল** (sino-atrial) ছিদ্রপথে অ্যাট্রিয়ামের সাথে যুক্ত। এ পথে শিরা থেকে সংগৃহীত CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে।
- **অ্যাট্রিয়াম (অলিন্দ)** : এটি পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরের সম্মুখ পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট বৃহত্তম প্রকোষ্ঠ। এটি একদিকে সাইনাস ভেনোসাস অন্যদিকে **অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার** (atrio-ventricular) ছিদ্রপথে ভেন্ট্রিকলে উন্মুক্ত।
- **ভেন্ট্রিকল (নিলয়)** : এটি হৃৎপিণ্ডের সর্বশেষ প্রকোষ্ঠ। পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরের অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত এ প্রকোষ্ঠটির প্রাচীর পুরু ও মাংসল এবং সম্মুখে **বাল্বাস আর্টারিওসাস** (bulbus arteriosus)-তে উন্মুক্ত।

বাল্বাস আর্টারিওসাস : রুই মাছের হৃৎপিণ্ডে **কোনাস আর্টারিওসাস** (conus arteriosus) নেই। তার পরিবর্তে বাল্বাস আর্টারিওসাস নামক একটি গঠন দেখা যায় যা মূলত ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার স্ফীত হওয়া গোড়া বা মূল। এটি হৃৎপিণ্ড থেকে ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টায় রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। এটি হৃৎপিণ্ডের কোন অংশ নয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL BDNIYOG.COM COPYRIGHT

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কপাটিকাসমূহ (Valves)

হৃৎপিণ্ডের উপপ্রকোষ্ঠ ও প্রকোষ্ঠগুলোর সংযোগ ছিদ্রে **কপাটিকা** (valve) থাকে। কপাটিকাগুলো শুধু সামনের দিকে খুলে, ফলে রক্তের পশ্চাৎগতি রুদ্ধ হওয়ায় রক্তের প্রবাহ থাকে একমুখি। বিপরীত প্রবাহে কপাটিকাগুলো বাধা দেয়। রুই মাছের হৃৎপিন্ডে নিচে বর্ণিত কপাটিকাগুলো পাওয়া যায়।

- **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল কপাটিকা** (sino-atrial valve) : সাইনাস ভেনোসাস ও অ্যাট্রিয়ামের মাঝে অবস্থিত ছিদ্রপথে এ কপাটিকা থাকে।
- **অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা** (Atrio-ventricular valve) : অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের মাঝে অবস্থিত অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রপথে এ কপাটিকা অবস্থান করে।
- **ভেন্ট্রিকুলো-বাল্বাস কপাটিকা** (Ventriculo-bulbus valve) : এটি ভেন্ট্রিকল ও বাল্বাস অ্যাওর্টার মাঝে অবস্থিত কপাটিকা।

হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন (Blood circulation)

কপাটিকাসমূহের নিয়ন্ত্রণের ফলে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড রক্ত পরিবহন করে। প্রকোষ্ঠগুলোর মধ্যে রক্ত সংবহনের একমুখিতা দেখা যায় এবং এ ধরনের হৃৎপিণ্ডকে **এক চক্র হৃৎপিণ্ড** (single circuit heart) বলে। হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে কেবল CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত বাহিত হয় বলে রুই মাছের হৃৎপিণ্ডকে **ভেনাস হার্ট** (venous heart) বা **শিরা হৃৎপিন্ড** বলা হয়ে থাকে।

হৃৎপিণ্ড থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত একমুখী প্রবাহে O_2-সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য ফুলকায় প্রেরিত হয়। একটি ছন্দোময় তালে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশ নির্দিষ্ট সময় অন্তর সংকুচিত হয়। প্রথমে সাইনাস ভেনোসাসে সংকোচন ঘটে। পরে ক্রমে অ্যাট্রিয়াম, ভেন্ট্রিকল ও বাল্বাস আর্টারিওসাস সংকুচিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রতিবার সঙ্কোচনকে **সিস্টোল** (systole) বলে। সিস্টোলের পরপরই হৃৎপিণ্ড প্রসারিত হয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ প্রক্রিয়াকে বলে **ডায়াস্টোল** (diastole)। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কপাটিকা রক্তের একমুখী প্রবাহ নিশ্চিত করে।

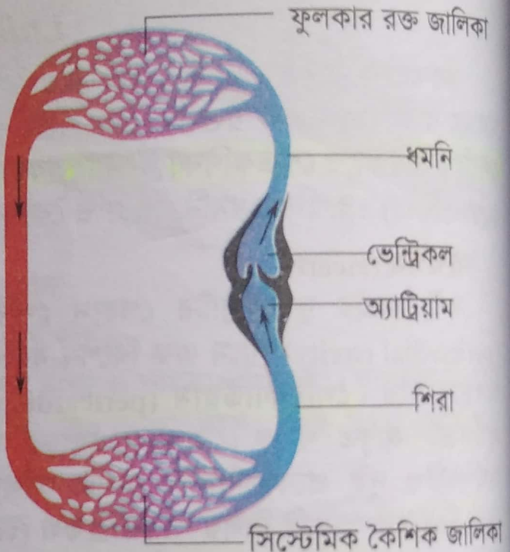

চিত্র ২.৩.৪ : রুই মাছের রক্ত সংবহন

রক্তের গতিপথ : সাইনাস ভেনোসাস ⟶ অ্যাট্রিয়াম ⟶ ভেন্ট্রিকল ⟶ বাল্বাস আর্টারিওসাস ⟶ ফুলকা

রুই মাছের ধমনিতন্ত্র (Arterial System)

Labeo-র ধমনিতন্ত্র প্রধানত **অন্তর্বাহী** (afferent) ও **বহির্বাহী** (efferent) **ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি** নিয়ে গঠিত। হৃৎপিণ্ডের ভেন্ট্রিকল থেকে **ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা** (অঙ্কীয় মহাধমনি) সৃষ্টি হয়ে সামনের দিকে বিস্তৃত। এ ধমনির গোড়া স্ফীত হয়ে **বাল্বাস আর্টারিওসাস** গঠন করে। এটি হৃৎপিন্ড থেকে ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টায় রক্তের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা থেকে যেসব পার্শ্বীয় রক্তনালি পথে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত দুপাশের ফুলকায় বাহিত হয় সেগুলো **অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি**। ফুলকায় CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত O_2-সমৃদ্ধ হওয়ার পর যে পার্শ্বীয় নালিগুলো দিয়ে ঐ রক্ত **ডর্সাল অ্যাওর্টা** (পৃষ্ঠীয় মহাধমনি)-তে বাহিত হয় সেগুলো **বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি**।

ক. অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি (Afferent Branchial Artery) : বাল্বাস অ্যার্টারিওসাস থেকে সৃষ্ট ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা বা অঙ্কীয় মহাধমনির প্রতিপাশ থেকে ৪টি করে মোট ৪ জোড়া অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি বের হয়। ১ম জোড়া ধমনি প্রথম ফুলকা-জোড়ায় প্রবেশ করে। অনুরূপভাবে, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ জোড়া ধমনি যথাক্রমে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ফুলকা-জোড়ায় CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

খ. বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি (Efferent Branchial Artery) : চারজোড়া ফুলকা থেকে চারজোড়া বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনির সৃষ্টি হয়। প্রথম বহির্বাহী ধমনি অঙ্কীয়দেশে হাইঅয়েড আর্চের সিউডোব্রাঙ্কে রক্ত বহন করে এবং সিউডোব্রাঙ্কের সম্মুখে অপথ্যালমিক ধমনি (ophthalmic artery) হিসেবে বিস্তৃত হয়। প্রতি পাশের ১ম ও ২য় বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি মিলে লম্বালম্বি পার্শ্বীয় ধমনি বা ল্যাটেরাল অ্যাওর্টা (lateral aorta) গঠন করে। ৩য় ও ৪র্থ বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি ল্যাটেরাল আওর্টায় উন্মুক্ত হওয়ার আগে একত্রে মিলিত হয়। ল্যাটেরাল অ্যাওর্টা সম্মুখে ক্যারোটিড ধমনিরূপে বিস্তৃত হয় এবং করোটিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। দুপাশের ল্যাটেরাল অ্যাওর্টা পশ্চাতে একীভূত হয়ে ডর্সাল অ্যাওর্টা (dorsal aorta) গঠন করে এবং পেছন দিকে বিস্তৃত হয়। দুই পাশের ল্যাটেরাল অ্যাওর্টা ও ক্যারোটিড ধমনি মিলে গলবিল অঞ্চলের পৃষ্ঠীয়দেশে একটি ডিম্বাকার ধমনি বলয় সৃষ্টি করে। এর নাম সারকিউলাস সেফালিকাস (circulus cephalicus)।

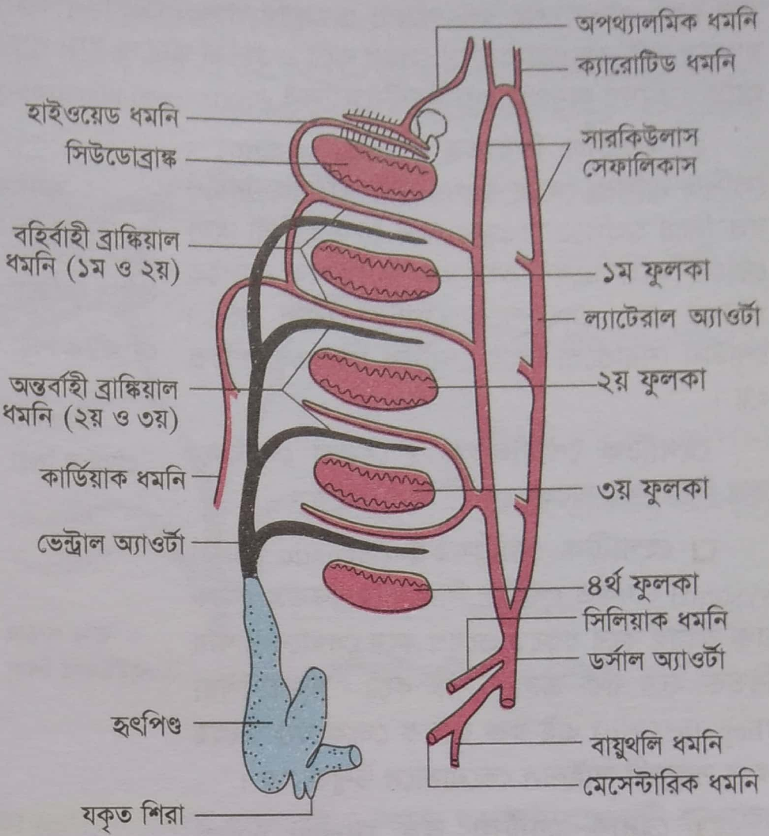

চিত্র ২.৩.৫ : *Leabeo*-র অন্তর্বাহী (▬) ও বহির্বাহী (▬) ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি

ডর্সাল অ্যাওর্টা মেরুদণ্ডের নিচে মধ্যরেখা বরাবর লেজ পর্যন্ত প্রসারিত। যাত্রাপথে এটি যে সব প্রধান নালিকা সৃষ্টি করে তা হচ্ছে–

১. **সাবক্ল্যাভিয়ান ধমনি** (Subclavian artery) : বক্ষপাখনা ও বক্ষচক্রের দিকে বিস্তৃত হয়।

২. **সিলিয়াকো-মেসেন্টারিক ধমনি** (Coeliaco-mesenteric artery) : পাকস্থলি, অন্ত্র, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, মলাশয় প্রভৃতি আন্ত্রিক অঙ্গে রক্ত পরিবহন করে।

৩. **প্যারাইটাল ধমনি** (Parietal artery) : দেহ প্রাচীরে রক্ত সরবরাহ করে।

৪. **রেনাল ধমনি** (Renal artery) : বৃক্কে রক্ত বহন করে।

৫. **ইলিয়াক ধমনি** (iliac artery) : শ্রোণি-পাখনায় রক্ত পরিবহন করে।

৬. **কডাল ধমনি** (caudal artery): লেজে রক্ত সরবরাহ করে।

রুইমাছের শিরাতন্ত্র (Venous System)

কৈশিক জালিকা (blood capillaries) থেকে উৎপন্ন হয়ে, যেসব রক্তনালি দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে অক্সিজেনবিহীন (deoxygenated) রক্ত সংগ্রহ করে হৃৎপিন্ডের সাইনাস ভেনোসাসে নিয়ে আসে, সেগুলোই সম্মিলিতভাবে **শিরাতন্ত্র** গঠন করে। রুইমাছের শিরাতন্ত্রকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-**১. সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র** এবং **২. পোর্টাল শিরাতন্ত্র**। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র (Systemic Venus System) : যেসব শিরার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বা তন্ত্র থেকে রক্ত সরাসরি হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে সেগুলোকে **সিস্টেমিক শিরা** বলে। সিস্টেমিক শিরার সমন্বয়ে গঠিত হয় সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র। একজোড়া **সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা**, একজোড়া **জুগুলার শিরা** ও একজোড়া **পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা** রুই মাছের সিস্টেমিক শিরাতন্ত্রের প্রধান অংশ গঠন করে। শরীরের সম্মুখ অংশ থেকে সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা ও জুগুলার শিরা রক্ত সংগ্রহ করে সেপাশের **ডাক্টাস ক্যুভিয়ে** (ductus cuvieri)-তে উন্মুক্ত হয়। পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা দেহের পশ্চাৎভাগ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে এবং সেপাশের ডাক্টাস ক্যুভিয়েতে উন্মুক্ত হয়। উভয় পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা **সেগমেন্টাল শিরা, রেনাল শিরা, জেনিটাল শিরা** ইত্যাদি থেকেও রক্ত গ্রহণ করে। উভয় ডাক্টাস ক্যুভিয়ে হৃৎপিণ্ডের সাইনাস ভেনোসাসে

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মুক্ত হয়। প্রতিপাশের বক্ষ-পাখনা ও শ্রোণি-পাখনা থেকে **সাবক্ল্যাভিয়ান শিরা** রক্ত সংগ্রহ করে ডাক্টাস কুভিয়ে-এর মাধ্যমে সাইনাস ভেনোসাসে প্রেরণ করে। এছাড়া ডান ও বাম পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা কতিপয় অনুপ্রস্থ শিরা দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এদের **অনুপ্রস্থ অ্যানাস্টোমোসিস** (transverse anastomosis) বলে।

২. পোর্টাল শিরাতন্ত্র (Portal system) : কৈশিক নালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে অক্সিজেনবিহীন রক্ত নিয়ে হৃৎপিণ্ডে যাওয়ার পথে যে সব শিরা অন্য কোনো অঙ্গে প্রবেশ করে আবার কৈশিক নালিতে পরিণত হয়, সেগুলোকে **পোর্টাল শিরা** বলে। পোর্টাল শিরাগুলো নিয়ে **পোর্টাল শিরাতন্ত্র** গঠিত হয়।

হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র ও **রেনাল পোর্টালতন্ত্র** নিয়ে রুই মাছের পোর্টালতন্ত্র গঠিত।

❑ **হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র** (Hepatic portal system) : যকৃত পোর্টাল শিরা পরিপাকতন্ত্র থেকে রক্ত সংগ্রহ করে যকৃতে প্রবেশ করে সেখানে শাখায় বিভক্ত হয়ে রক্ত জালক সৃষ্টি করে। **যকৃত শিরা** (hepatic vein) এই রক্ত জালক থেকে রক্ত সংগ্রহ করে সরাসরি সাইনাস ভেনোসাসে উন্মুক্ত হয়।

❑ **রেনাল পোর্টাল তন্ত্র** (Renal portal system) : দেহের লেজ অঞ্চল থেকে **কডাল শিরা** (caudal vein) রক্ত সংগ্রহ করে দেহকাণ্ডে প্রবেশ করে এবং দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। ডান শাখাটি ডান পশ্চাৎ **কার্ডিনাল শিরা** হিসেবে সম্মুখে অগ্রসর হয়, বাম শাখাটি বৃক্কে প্রবেশ করে বিভক্ত হয়ে জালিকা সৃষ্টি করে। একে **রেনাল পোর্টাল শিরা** বলে। বৃক্ক থেকে রক্ত বাম পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা দিয়ে সংগৃহীত হয়ে ডাক্টাস কুভিয়ের মাধ্যমে সাইনাস ভেনোসাসে পৌঁছায়।

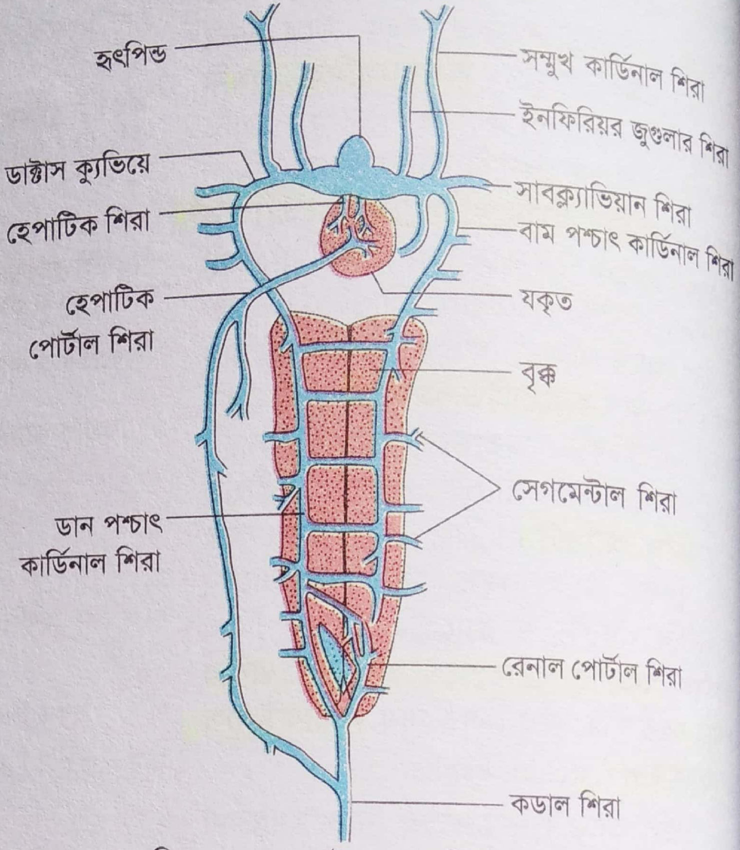

চিত্র ২.৩.৬ : রুই মাছের শিরাতন্ত্র

ব্যবহারিক অংশ

১. রুই / কাতলা / মৃগেল মাছের অন্তর্বাহী বা অ্যাফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনিতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি : একটি রুই মাছকে চিৎ করে ট্রেতে রেখে বক্ষ অস্থিচক্র সাবধানে কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে। অঙ্কীয়দেশে দেহত্বক ও পেশি কেটে ফেলতে হবে। হৃৎপিণ্ড বহনকারী পেরিকার্ডিয়াম অপসারণ করে হৃৎপিণ্ডকে উন্মুক্ত করতে হবে। এরপর হৃৎপিণ্ডের সম্মুখ প্রান্তে অবস্থিত **ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা** (ventral aorta; অঙ্কীয় মহাধমনি)-র উৎপত্তি ও গন্তব্য অনুসরণ করে পেশি কেটে পরিষ্কার করার পর দেখা যাবে উভয় পাশে চারটি করে অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি বেয়ে সেই পাশের ফুলকায় প্রবেশ করেছে। পেশিপর্দা ও ফুলকা ঝিল্লি পরিষ্কার করলে এগুলো স্পষ্ট দেখা যাবে। এবার ঘোলাটে পানি পাল্টে পরিষ্কার পানির নিচে ধমনিগুলো যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণের পর চিত্র দেখে ব্যবহারিক খাতায় চিহ্নিত চিত্র আঁকতে হবে।

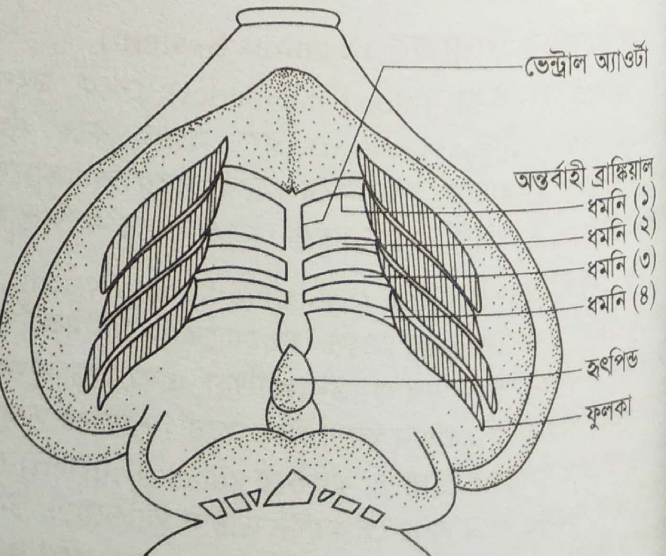

চিত্র ২.৩.৭ : *Labeo*-র অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনিতন্ত্র

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. রুই /কাতলা / মৃগেল মাছের বহির্বাহী বা ইফারেন্ট ধমনিতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি : অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি শনাক্তের পর রুই মাছের মুখগহ্বরের এক পাশের ফুলকা ও কানকো কেটে ফেলতে হবে। হৃৎপিন্ডের পিছনে গলবিলের নিচের দিকে আড়াআড়িভাবে কেটে মুখগহ্বরকে উন্মুক্ত করতে হবে এবং সাবধানে মুখগহ্বরের ছাদের ঝিল্লি অপসারণ করলে **ডর্সাল অ্যাওর্টা** (dorsal aorta; পৃষ্ঠীয় মহাধমনি) দেখা যাবে। পিছনদিক থেকে ডর্সাল অ্যাওর্টা অনুসরণ করে সামনে অগ্রসর হলে বহির্বাহী ধমনিগুলো পাওয়া যাবে। এখন অপরিষ্কার পানি পাল্টে ধমনিগুলো পরিষ্কার পানির নিচে যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণের পর চিত্র দেখে ব্যবহারিক খাতায় চিহ্নিত চিত্র আঁকতে হবে।

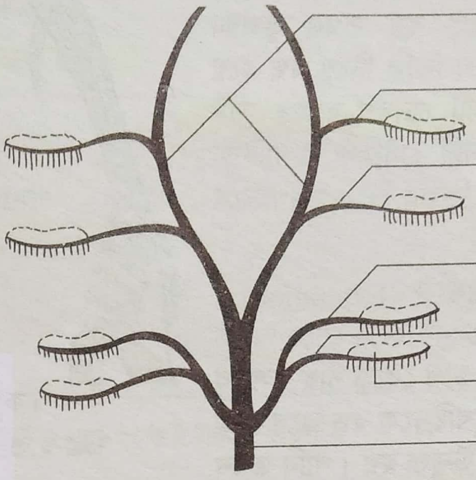

চিত্র ২.৩.৮ : *Labeo*-র বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনিতন্ত্র

Labeo rohita-র শ্বসনতন্ত্র

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় কোষমধ্যস্থ খাদ্য জারিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত করে এবং খাদ্যের স্থিতিশক্তিকে গতিশক্তিরূপে মুক্ত করে, সে প্রক্রিয়া **শ্বসন** (respiration) নামে পরিচিত।

Labeo একটি অস্থিময় মাছ। **চারজোড়া ফুলকা** (gill) এ মাছের শ্বসন অঙ্গ। এগুলো মাথার দুপাশে দুটি **কানকো** (operculum)-তে আবদ্ধ **ফুলকা-প্রকোষ্ঠ** (branchial chamber)-এর ভিতর রক্ষিত এবং গলবিলের পার্শ্বপ্রাচীরে ও মেঝেয় অবস্থিত। কানকোর পশ্চাৎ কিনারা একটি পাতলা **ব্রাঙ্কিওস্টেগাল ঝিল্লি** (branchiostegal membrane) যুক্ত যা মাথার অঙ্কীয়দেশে সেঁটে থাকে। ঝিল্লিটি কতকগুলো অস্থিনির্মিত দণ্ড বহন করে। এটি কানকোকে দেহপৃষ্ঠে আটকে রেখে ফুলকা প্রকোষ্ঠ বাইরে থেকে বন্ধ রাখে, এভাবে "শ্বাস পানি" আবদ্ধ রেখে মাছকে শ্বসনে সাহায্য করে।

চিত্র ২.৩.৯ : *Labeo*-র (ক) বামপাশের ফুলকা; (খ) ফুলকা-সূত্রের সাধারণ গঠন; (গ) একটি ফুলকা সূত্রের লম্বচ্ছেদ

ফুলকার গঠন (Structure of Gill)

প্রত্যেকটি ফুলকা দেখতে **সুতার মতো** এবং একেকটি **হোলোব্রাঙ্ক (পূর্ণফুলকা)**, কারণ প্রত্যেক ফুলকা দুটি সদৃশ অর্ধাংশ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক অর্ধাংশকে বলে **হেমিব্রাঙ্ক (অর্ধফুলকা)**। প্রত্যেক হেমিব্রাঙ্ক একসারি করে **ফুলকা সূত্র** (gill filament) বা **ফুলকা ল্যামেলা** (gill lamella) বহন করে। এগুলো গোড়ায় যুক্ত, শীর্ষে মুক্ত। প্রতিটি সূত্র এপিথেলিয়ামে আবৃত অসংখ্য অনুপ্রস্থ প্লেট বহন করে। এপিথেলিয়াম রক্ত-জালিকা সমৃদ্ধ। প্রত্যেক ফুলকা একেকটি অস্থিময় **ফুলকা আর্চ** (gill arch)-এ অবলম্বিত। এভাবে প্রত্যেক আর্চে দুটি ফুলকা-সারি যুক্ত থাকে। আর্চের অন্তঃকিনারা প্রসারিত হয়ে কাঁটাযুক্ত পাতলা **ফুলকা রেকার** (gill raker) গঠন করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

শ্বসন কৌশল (Mechanism of Respiration)

রুই মাছে দুই ধাপে শ্বাসক্রিয়া ঘটে– **শ্বাসগ্রহণ** ও **শ্বাসত্যাগ**। এক্ষেত্রে ফুলকা প্রকোষ্ঠ চোষণ পাম্প (suction pump) হিসেবে কাজ করে।

১. শ্বাসগ্রহণ বা প্রশ্বাস (Inspiration) : কানকোদুটি যখন উত্তোলিত হয় তখন ফুলকা প্রকোষ্ঠের মুখ ব্রাঙ্কিওস্টেগাল ঝিল্লি দিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এতে গলবিলে একটি চোষণ-বলের সৃষ্টি হয়। ফলে মুখছিদ্র রক্ষাকারী মৌখিক কপাটিকা খুলে যায় এবং পানি মুখের ভিতর দিয়ে মুখগহ্বরে প্রবেশ করে।

২. শ্বাসত্যাগ বা নিঃশ্বাস (Expiration) : কানকো যখন পেশি-সংকোচনের ফলে নেমে আসে তখন গলবিল ও মুখগহ্বরে চাপ বেড়ে যায়। সাথে সাথেই মৌখিক কপাটিকা মুখছিদ্রকে বন্ধ করে দেয় এবং ফুলকা-প্রকোষ্ঠের ছিদ্র উন্মুক্ত হয়। পানি তখন এ ছিদ্রপথেই বেরিয়ে যায়। মুখ ও গলবিলের ভিতর দিয়ে অতিক্রমের সময় স্রোতপ্রবাহ নিচে অবস্থিত ফুলকাগুলোকে ভিজিয়ে দেয়।

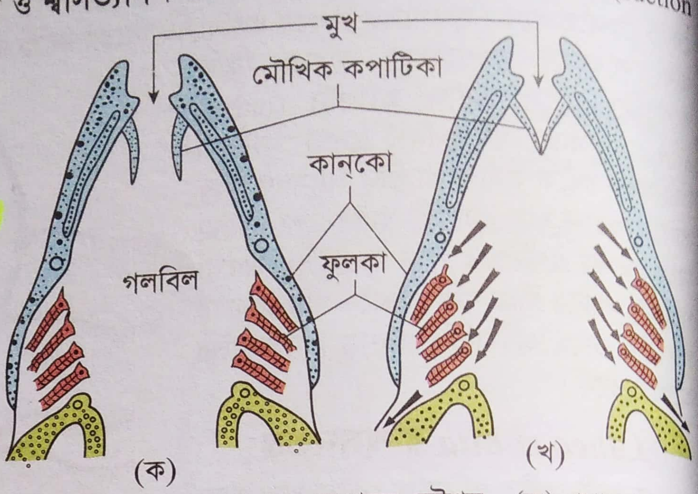

চিত্র ২.৩.১০ : *Labeo*-র শ্বসন কৌশল : (ক) প্রশ্বাস; (খ) নিঃশ্বাস। তীরচিহ্ন পানির গতি নির্দেশক

শ্বসনের শারীরতত্ত্ব (Physiology of respiration)

অন্তর্বাহী ফুলকা ধমনি CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত বয়ে এনে ফুলকা সূত্রকের কৈশিক জালকে ছেড়ে দেয়। এসময় শ্বাস গ্রহণকালে নেয়া O_2-সমৃদ্ধ পানি ফুলকা সূত্রকের উপর দিয়ে বয়ে গেলে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে। রক্ত পানিতে CO_2 ত্যাগ করে ও পানি থেকে O_2 গ্রহণ করে। O_2-সমৃদ্ধ রক্ত তখন বহিঃফুলকা ধমনির সাহায্যে গৃহীত হয় এবং সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে।

বায়ুথলি বা পটকা (Air bladder / Swim bladder)

Labeo-র মেরুদণ্ডের নিচে এবং পৌষ্টিকনালির উপরে অবস্থিত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট থলির নাম বায়ুথলি বা **পটকা**। এটি দেখতে চকচকে সাদা থলির মতো এবং বিভিন্ন ধরনের গ্যাসে (অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড) পূর্ণ থাকে। বায়ুথলিটি সম্মুখস্থ ছোট ও পেছনের বড় প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। দুটি প্রকোষ্ঠের মাঝখানে একটি খাঁজ রয়েছে। সম্মুখ প্রকোষ্ঠ একটি সরু নল দিয়ে অন্ননালির সাথে যুক্ত থাকে। এ নলের নাম **নিউম্যাটিক নালি** (pneumatic duct)। এটি অন্তঃকর্ণের **ওয়েবেরিয়ান অসিকল** (weberian ossicle)-এর সাথে যুক্ত থাকে। বায়ুথলির বাইরের দিক ঘনসন্নিবিষ্ট রক্তজালক সমৃদ্ধ। এর প্রাচীর দুটি স্তর নিয়ে গঠিত। বাইরে যোজক টিস্যু দিয়ে গঠিত স্তরটি **টিউনিকা এক্সটার্না** (tunica externa) এবং ভিতরে মসৃণ পেশি নির্মিত স্তর **টিউনিকা ইন্টারনা** (tunica interna)। বায়ুথলির অন্তঃপ্রাচীরের এপিথেলিয়াম সংলগ্ন একটি লাল রঙের গ্যাস গ্রন্থি থাকে। এ গ্রন্থিতে ঘনসন্নিবিষ্ট অসংখ্য কৈশিকনালি থাকে যা **রেটিয়া মিরাবিলিয়া** (retia mirabilia) নামে পরিচিত। সামনের প্রকোষ্ঠের এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত গ্যাসে বায়ুথলি পূর্ণ হয়। কিন্তু পিছনের প্রকোষ্ঠে অবস্থিত এ গ্রন্থি গ্যাস শোষণ করে।

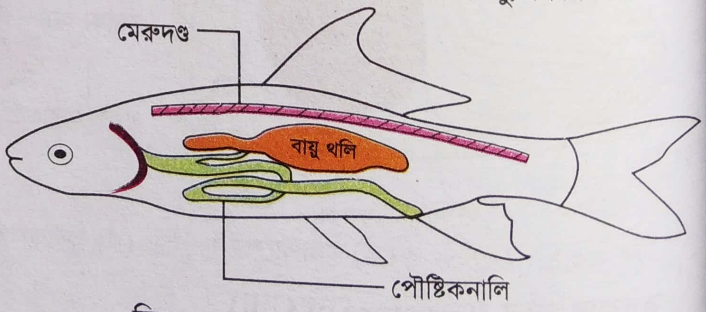

চিত্র ২.৩.১১ : মাছের দেহে বায়ুথলির অবস্থান

বায়ুথলির কাজ

১. বায়ুথলি প্লাবতা রক্ষাকারী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।
২. বায়ুথলির প্রাচীরে অবস্থিত কৈশিকনালি থেকে বায়ুথলিতে অতিরিক্ত গ্যাস সরবরাহ করে অথবা বায়ুথলি থেকে রক্তে গ্যাস শোষণ করে মাছ তার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৩. বায়ুথলি মাছের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করে পানির নিচে বিভিন্ন গভীরতায় মাছকে স্থির থাকতে সাহায্য করে।
৪. মাছ বায়ুথলির মাধ্যমে শব্দ গ্রহণ করতে পারে। বায়ুথলির সাথে ওয়েবেরিয়ান অসিকল (Weberian ossicles) এর মাধ্যমে অন্তঃকর্ণের সংযোগ থাকে। শব্দ তরঙ্গ বায়ুথলি থেকে ওয়েবেরিয়ান অসিকলের মাধ্যমে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে।
৫. অনেক মাছের বায়ুথলি শব্দ উৎপাদনে সক্ষম।
৬. অক্সিজেনের ভান্ডার হিসেবে বায়ুথলি ব্যবহৃত হয়।

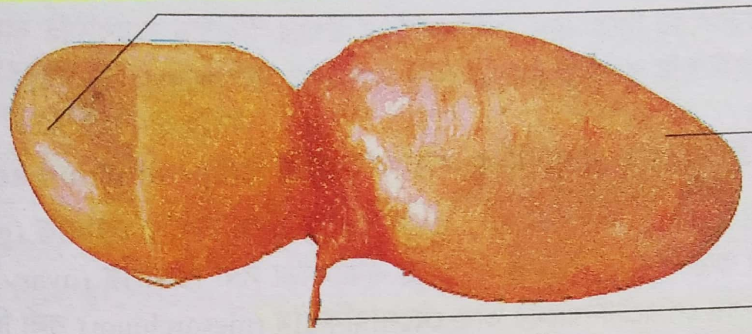

চিত্র ২.৩.১২: রুইমাছের বায়ুথলি

ব্যবহারিক অংশ

১. রুই মাছের ফুলকা পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি : একটি রুই মাছ নিয়ে এর এক পাশের কানকো বা অপারকুলামটি সাবধানে কেটে ফেললে ফুলকা উন্মুক্ত হবে।

পর্যবেক্ষণ

১. ফুলকা (gill) হচ্ছে রুই মাছের শ্বসন অঙ্গ। এটি গাঢ় লাল বর্ণের এবং এর এক প্রান্ত চিরুনির দাঁতের মতো সূক্ষ্ম করে চেরা। প্রতিটি ফুলকা দুটি অনুরূপ অর্ধাংশ দিয়ে গঠিত।
২. কানকো দিয়ে আবৃত প্রতিটি ফুলকা প্রকোষ্ঠতে চারটি করে ফুলকা পর পর সজ্জিত থাকে।
৩. গলবিলের প্রাচীরের উভয় দিকে পাঁচটি করে ফুলকা ছিদ্র থাকে। ফুলকা ছিদ্রগুলো চারটি ফুলকা আর্চ (gill arch) দিয়ে বিভক্ত।
৪. প্রতিটি ফুলকা আর্চের ভিতরের অবতল প্রান্তে দাঁতের মতো ফুলকা-র‍্যাকার এবং বাইরের উত্তল প্রান্তে দুই সারি ফুলকা সূত্র (gill filament) থাকে।

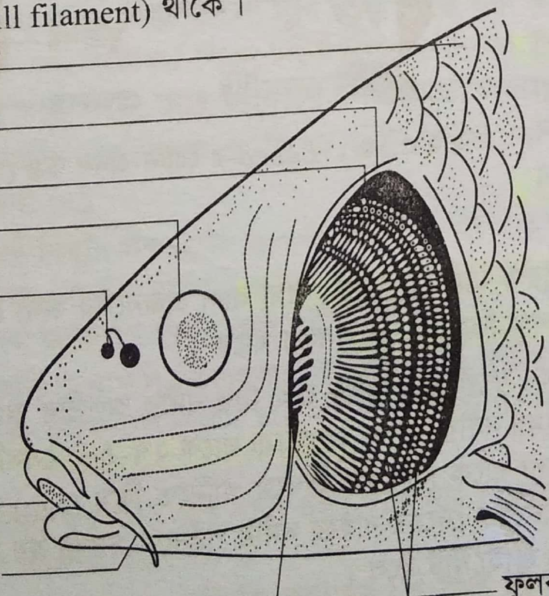

চিত্র ২.৩.১৩ : রুই মাছের ফুলকা

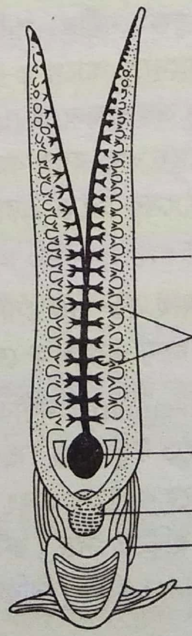

চিত্র ২.৩.১৪ : রুই মাছের ফুলকা সূত্র

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. রুই মাছের বায়ুথলি বা পটকা পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি : একটি রুই মাছ চিৎ করে ট্রের উপর রেখে লেজ ও কানকোর দিকে পিন দিয়ে আটকে দিতে হবে। একটি ধারালো স্কালপেলের সাহায্যে পেটের দিকে ছিদ্র করে লম্বালম্বি পায়ু থেকে গলবিল পর্যন্ত চিরে মাংসপেশি ও ত্বক কেটে নিতে হবে। অন্ত্রের উপরের মিউকাস পর্দাটি ফরসেপস দিয়ে ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে অন্ত্রের প্যাঁচ খুলে বিভিন্ন অংশ পিন দিয়ে আটকে দিতে হবে। পৌষ্টিকতন্ত্রের অঙ্গগুলো লক্ষ করে দেহাভ্যন্তরের অন্যান্য অংশ সরিয়ে নিলে বায়ুথলি দেখা যাবে (চিত্র : ২.৩.১২)।

পর্যবেক্ষণ : মেরুদণ্ডের নিচে এবং পৌষ্টিকনালির উপরে অবস্থিত বায়ুথলিটি বায়ুপূর্ণ এবং দেখতে চকচকে সাদা থলির মতো। বায়ুথলিটি দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। দুই প্রকোষ্ঠের মাঝখানে একটি গভীর খাঁজ রয়েছে।

রুই মাছের প্রজনন ও জীবনবৃত্তান্ত (Reproduction and Life-history)

প্রজনন তন্ত্র (Reproductive system) : জনন ঋতুতে **জনন অঙ্গ** বা **গোনাড** (gonad) পূর্ণ বিকশিত হয়। পুরুষ মাছে একজোড়া লম্বা **শুক্রাশয়** (testis) ও স্ত্রী মাছে একজোড়া লম্বা **ডিম্বাশয়** (ovary) পটকার নিচে উদরীয় গহ্বরের পিছনে শায়িত। শুক্রাশয় পেরিটোনিয়ামের ভাঁজ **মেসোরকিয়াম** (mesorchium) পর্দা দিয়ে দেহপ্রাচীরে ঝুলানো থাকে। ডিম্বাশয় পেরিটোনিয়ামের ভাঁজ **মেসোভেরিয়াম** (mesovarium) দিয়ে দেহপ্রাচীরে ঝুলানো থাকে। প্রত্যেক শুক্রাশয় থেকে একটি করে শুক্রনালি সৃষ্টি হয়। দুটি শুক্রাশয়ের দুটি শুক্রনালি পেছন দিকে এক হয়ে রেচনজনন রন্ধ্র পথে বাইরে মুক্ত। স্ত্রী মাছে ডিম্বাশয় জোড়া আকারে বড় ও ডিম্বনালিহীন। পরিপক্ক ডিম্বাশয় থেকে জনন ঋতুতে ডিম দেহগহ্বরে মুক্ত হয়। এখান থেকে ডিম রেচন-জনন সাইনাসের অগ্রপ্রাচীর থেকে অস্থায়ীভাবে গঠিত একজোড়া **জনন রন্ধ্র** (genital aperture) পথে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়। রুই মাছের ডিম প্রচুর কুসুম (yolk) সমৃদ্ধ।

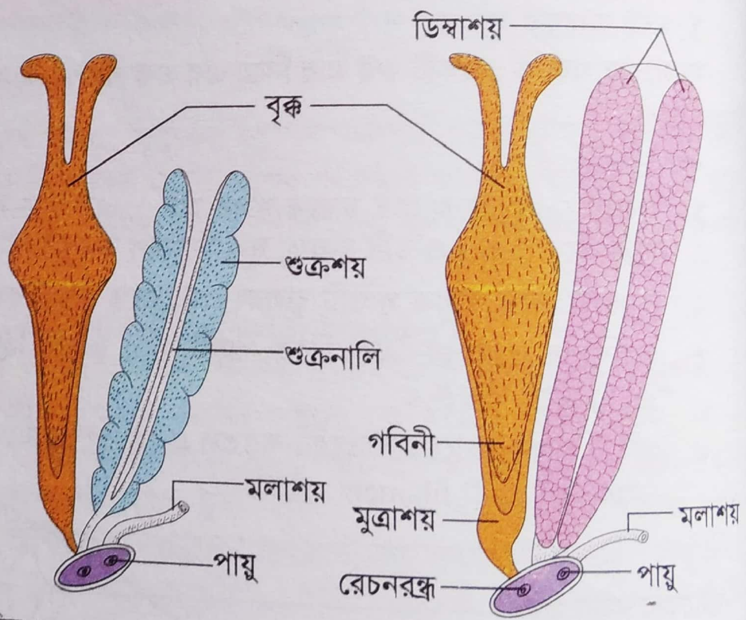

চিত্র ২.৩.১৫ : *Labeo*-র রেচন-জনন তন্ত্র (বায়ে-পুরুষ ও ডানে-স্ত্রী)

প্রজনন (Reproduction) : রুই মাছ সাধারণত দুবছর বয়সে জননক্ষম হয়ে ওঠে। জনন ঘটে স্রোতযুক্ত নদীর পানিতে, বদ্ধ পানিতে নয়। বাংলাদেশে আগে ৩ বছর বয়সে জননক্ষম হতো। কিন্তু অন্তঃপ্রজননের (inbreeding) কারণে এখন রুই মাছে এক বছর বয়সেই জনন ঘটে। জুন-জুলাই মাসের দিকে এরা প্রজননের জন্য তৈরি হয়।

সাধারণত স্ত্রী মাছ ৫১–৭০ সেমি এবং পুরুষ মাছ ৬৫ সেমি. লম্বা হলে প্রজননের জন্য তৈরি হয়। এ মাছ প্রতি কেজি দেহ ওজনের জন্য এক লক্ষ থেকে চার লক্ষ ডিম উৎপাদন করে থাকে।

নিষেক (Fertilization) : নদীর পানি যখন ফুলে ওঠে তখন রুই মাছ নদীর অগভীর অংশে প্রবল বর্ষণের মধ্যে ঝাঁক বেঁধে ডিম ছাড়তে উদ্বুদ্ধ হয়। প্রজননের সময় নদীর পানির তাপমাত্রা থাকে ২৭-৩০° সেলসিয়াসের মধ্যে। এসময় পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন থাকে এবং পানি ঘোলা থাকে। স্ত্রী মাছ প্রথমে পানিতে **ডিম** (egg) ছাড়লে পুরুষ মাছ তার উপর **বীর্য** (sperm) ছড়িয়ে দেয়। রুই মাছের নিষেক দেহের বাইরে নদীর পানিতে সম্পন্ন হয় বলে একে বহিঃনিষেক (external fertilization) বলে। নিষিক্ত ডিমকে **জাইগোট** বলে।

আহছানুল হক আবির

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

রুই মাছের জীবন চক্র (Life cycle)

জাইগোট সৃষ্টির ৩০-৪৫ মিনিট পরই ক্লিভেজ শুরু হয়। ক্লিভেজ মেরোব্লাস্টিক ধরনের। কোনো প্রাণীর ডিমে যখন ভেজিটাল পোলে (মেরুতে) বেশি পরিমাণে কুসুম থাকায় সম্পূর্ণ ডিমটি ক্লিভেজ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হতে পারেনা তখন নিষিক্ত নিউক্লিয়াসটি কুসুমের পৃষ্ঠতলে একটি ক্ষুদ্র অংশে আশ্রয় নিয়ে ক্লিভেজের প্রস্তুতি নেয়। অংশটি ক্রমশ একটি ছোট ঢিবির মতো দেখায়। এ অংশের ভিতর ক্লিভেজ ঘটে। এ ধরনের ক্লিভেজকে মেরোব্লাস্টিক ক্লিভেজ (meroblastic cleavage) বলে।

ক্লিভেজ শুরু হওয়ার পর নিউক্লিয়াসটি ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ এমন সংখ্যক কোষে বিভক্ত হতে থাকে। ক্লিভেজের ফলে সৃষ্ট প্রতিটি কোষকে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere) বলে। ভ্রূণটি এসময় এক থোকা আঙ্গুরের মতো দেখায়। এর নাম **মরুলা** (morula)। ভ্রূণের পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে মরুলা ধাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বেশি ঝাঁকুনিতে ভ্রূণ কুসুম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে। ব্লাস্টোমিয়ারগুলো আরও বিভক্ত ও সুশৃঙ্খল হয়ে **ব্লাস্টোডার্ম** (blastoderm) নামক এককোষীয় স্তরে বিন্যস্ত হয়। ক্লিভেজ এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্লাস্টোমিয়ারগুলোর মাঝে একটি ফাঁপা জায়গা সৃষ্টি হয়ে বৃদ্ধি পায়। এ ফাঁপা স্থানটি হচ্ছে **ব্লাস্টোসিল** (blastocoel)। ভ্রূণটিকে তখন **ব্লাস্টুলা** (blastula) বলে।

ব্লাস্টোডার্মের কোষগুলো প্রথম দিকে কুসুমের উপর টুপির মতো বিন্যস্ত থাকে। কোষ বিভাজন অব্যাহত থাকায় কোষগুলো কুসুমকে ঘিরে প্রসারিত হয় এবং এক পর্যায়ে **ব্লাস্টোপোর** (blastopore) নামক একটি ছিদ্রপথ ছাড়া সমগ্র কুসুমপিন্ড আবৃত হয়ে পড়ে। পরে অবশ্য ব্লাস্টোপোরও বন্ধ হয়ে যায়। ব্লাস্টুলা ধীরে ধীরে দ্বিস্তরী **গ্যাস্ট্রুলা** (gastrula)-য় পরিবর্তিত হয়।

গ্যাস্ট্রুলার পিছন দিক থেকে লেজ ও সামনের দিক থেকে বিভিন্ন অঙ্গের সূচনা হয়। যে প্রক্রিয়ায় গ্যাস্ট্রুলা থেকে বিভিন্ন অঙ্গ তৈরি হয় তার নাম **অর্গানোজেনেসিস** (organogenesis)। ভ্রূণের মধ্যে নানা ধরনের পরিবর্ধন দেখা দেয় এবং ১৫–১৮ ঘন্টার মধ্যে ডিমের ভিতর থেকে **লার্ভা** (larva) বেরিয়ে আসে। এ লার্ভাকে **ডিমপোনা বা রেণুপোনা** বলে। এমন অবস্থায় পোনা কোন খাদ্য গ্রহণ করে না এবং কুসুম থেকে পুষ্টি নেয়। লার্ভা দশার পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ।

- ৬ ঘন্টা পর লার্ভা মাঝে মধ্যে উপরে-নিচে নড়া-চড়া করে। কুসুমের দুই প্রান্ত তখন সরু হয় এবং লার্ভার হৃৎপিন্ডের কুসুম থলির সামনে অবস্থান নেয়। তখন কুসুম থলি বেশ বড় থাকে। এ অবস্থায় লার্ভা পানির তলদেশে বেশ সময় কাটায় এবং কুসুম থলি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে।
- ১২ ঘন্টা পর লার্ভার চোখের রঙ কালো হতে থাকে। ক্রোমাটোফোর উৎপন্ন হওয়ায় এমন হয়। এসময় কুসুম থলি সরু ও লম্বা হয়।
- ২৪ ঘন্টা পর কুসুম থলির পিঠে কালো দাগ দেখা দিতে শুরু করে। লার্ভায় ফুলকা আর্চ দৃশ্যমান হয়। চোখ মাথার উপরে অবস্থান নেয় এবং নটোকর্ড পিছন দিকে (লেজের দিকে) উর্ধ্বমুখী হয়। তখন লেজ ও পায়ু-পাখনা স্পষ্ট দেখা যায়। এ সময় লার্ভা স্বচ্ছ থাকে, তবে ফ্যাকাশে হলদে রঙেরও হতে পারে।
- ৩৬ ঘন্টা পর লার্ভায় বক্ষ-পাখনা ও নিচের ঠোঁট স্পষ্ট দেখা যায়। পৃষ্ঠ-পাখনায় কিছু কালো দাগ এবং পুচ্ছ-পাখনায় পুচ্ছ দণ্ড দেখা দেয়।
- ৪৮ ঘন্টা পর লার্ভা কিছুটা লম্বা হয়ে ৬.০–৬.৪ মি.মি. হয়। এ সময় কুসুম থলি সামনের দিকে সামান্য উত্তল হয় এবং বায়ু থলি দেখা দেয়। লার্ভার মাথায় ক্রোমাটোফোর উৎপন্ন হতে থাকে, তাই মাথা কালো রঙ ধারণ করে। তখন ফুলকা আর্চ স্পষ্ট এবং দেহ ফ্যাকাশে হলদে রঙে পরিবর্তিত হয়।
- ৭২ ঘন্টা পর লার্ভার বায়ু থলি ডিম্বাকার ধারণ করে এবং বক্ষীয়-পাখনা স্পষ্ট হতে শুরু করে। পিঠের দু'পাশ উজ্জ্বল হলুদ রঙ ধারণ করে, কুসুম থলি বিলীন হয়ে যায় এবং **লার্ভা দশার সমাপ্তি ঘটে**। তাপমাত্রার কারণে এ সময়ের কম-বেশি হতে পারে।
- ৯৬ ঘন্টা পর লার্ভার মুখ স্পষ্ট হয়ে খাদ্য গ্রহণ শুরু করে। কুসুম থলি প্রায় মিলিয়ে যায় এবং এটি **ধানীপোনা** বা **আঙ্গুলিপোনা** হিসেবে পরিচিত হয়।
- ৫ দিন বয়সের পোনা ৮.০–৮.৫ মি.মি. লম্বা হয়। এ সময় লেজের কাছে লাল দাগ দেখা যায়, যা দেখে একে রুই মাছের পোনা বলে শনাক্ত করা যায়। কানকোর রেখা সুস্পষ্ট গঠিত হয়, নটোকর্ডের শেষ প্রান্ত কিছুটা বেঁকে যায় এবং পাখনাগুলোতে রশ্মি আরও স্পষ্ট হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

হয়। নাসারন্ধ্র দেখা যায় এবং অন্তঃস্থ বিভাজন স্পষ্ট হয়।

❒ ১০ দিন বয়সে পোনার দৈর্ঘ্য হয় ১৫–১৮ মি.মি.। সবগুলো পাখনায় পূর্ণাঙ্গ সংখ্যক পাখনা-রশ্মি বিকশিত হয়। নাসারন্ধ্র দেখা যায় এবং অন্তঃস্থ বিভাজন স্পষ্ট হয়।

❒ ১৫ দিন বয়সের পোনার দৈর্ঘ্য হয় ২৩ মি.মি.। তখন মুখের দুপাশে একটি করে বার্বেল (barbel) দেখা দেয়, পায়ুর অবস্থান ও খাদ্যনালি স্পষ্ট হয়। এ অবস্থায় আঁইশ দৃশ্যমান না হলেও পোনার দৈহিক গড়ন মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়।

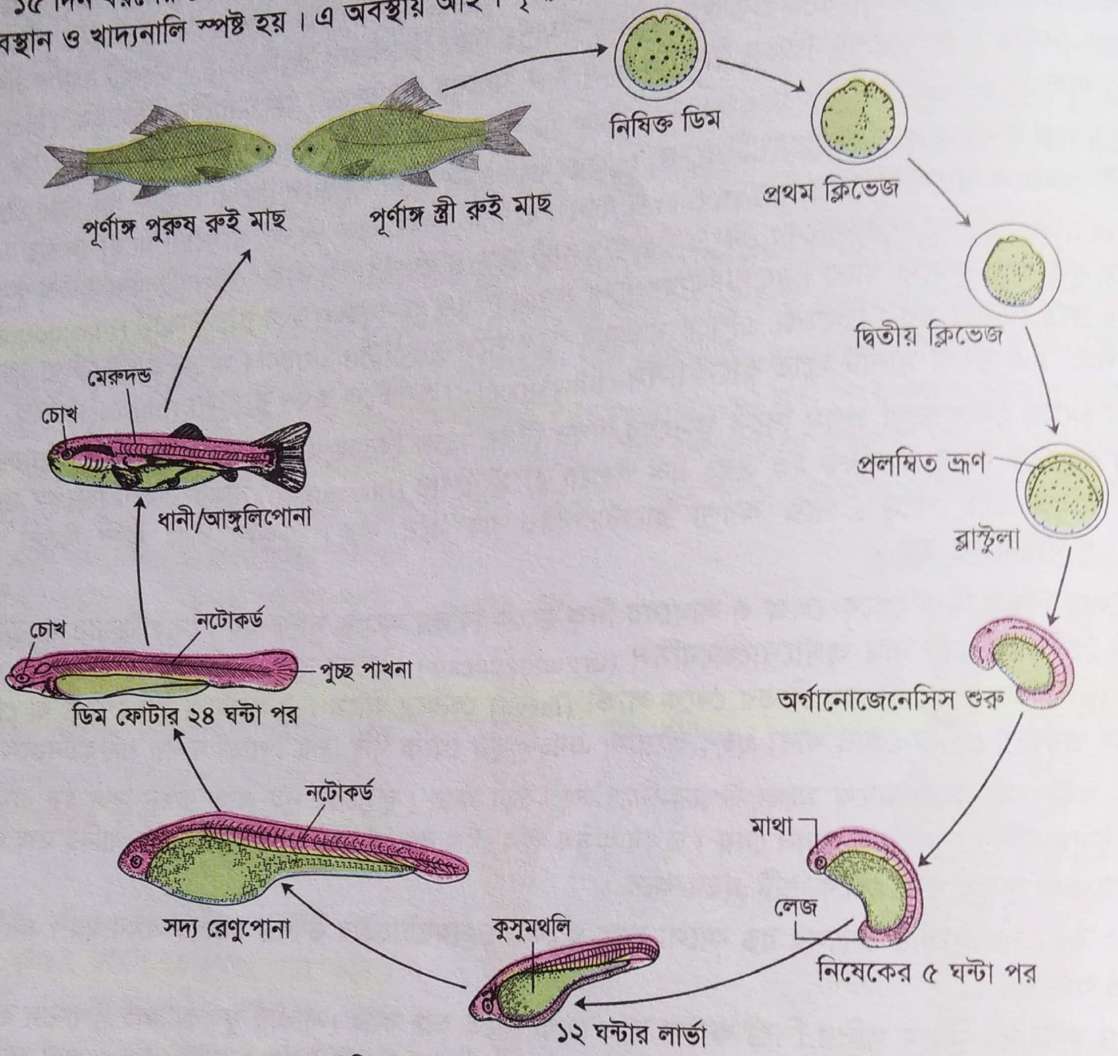

চিত্র ২.৩.১৬ : রুই মাছের জীবন চক্রের ধাপসমূহ

❒ এর পর মাছটির কেবল আঙ্গিক পরিবর্তন ও আকারের পরিবর্ধন ঘটে। স্ত্রীমাছ আকারে পুরুষ অপেক্ষা বড় হয়। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষ মাছ যৌন পরিপক্কতা লাভ করে ও প্রজননে সক্ষম হয়।

রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ (Natural conservation of *Labeo*)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুষ্টির যোগান দিতে, ঝামেলাবিহীন মাছ পেতে ও স্বাদের দিকে নজর রাখতে রুই মাছের চাষ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যাপকহারে বেড়েছে। বিভিন্ন খামারে যতো উন্নত পদ্ধতিতেই চাষ করা হোক না কেন তাকে ছাপিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক সংরক্ষণের দাবী ও প্রচার বেড়েছে অনেক গুণ বেশি। বিভিন্ন হ্যাচারিতে চাষের কারণে সীমিত ও নির্দিষ্ট মাছের মধ্যে যেভাবে অন্তঃপ্রজনন ঘটে তার ফলে যে কোনো মাছের ভাল গুণাবলী হারিয়ে যায়, জিনগত বৈচিত্র্য বিনষ্ট হয়, রোগাক্রান্ত মাছের আধিক্য দেখা দেয় ও স্বাদবিহীন মাছের প্রাচুর্যে বাজার সয়লাব হয়ে যায়। মাছ থেকে 'মাছের' স্বাদ পেতে হলে মাছকে 'মাছ' হিসেবে বড় হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, ভূখন্ড বাড়েনি। অতএব, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি অব্যাহত রাখতে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্টের পাশাপাশি প্রাকৃতিক জীবের সংকটও বেড়েছে, নদী প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং হাওর-বিল-বাওর ভরাট ও দখল হয়ে যাওয়ায় মাছের প্রাকৃতিক জননক্ষেত্র ও লালনভূমি বহুগুণ কমে গেছে। তবে এর

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মধ্যেও কিছু নদী বা তার আশ-পাশ নিয়ে সতর্ক হলে হয়তো কিছু বিশুদ্ধ জিনধারী মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ সম্ভব হতে পারে। তাই পরিবেশগত, প্রজাতিগত ও জিনগত বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ রেখে মাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে।

রুই মাছ বাংলাদেশের অতিপরিচিত, সুস্বাদু ও জনপ্রিয় মাছ। এটি Cypriniformes বর্গের Cyprinidae গোত্রভুক্ত প্রজাতি। এ গোত্রের মাছগুলো **কার্প জাতীয় মাছ** (carps) নামে পরিচিত। বাংলাদেশে রুই ছাড়া কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস প্রভৃতি কার্প জাতীয় মাছও পাওয়া যায়। এগুলোকে **বড় কার্প জাতীয় মাছ** বলে। বাংলাদেশের প্রায় সব বড় বড় নদী (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী, হালদা) ও মূল শাখা নদীতে, কাপ্তাই হ্রদ এবং বিভিন্ন হাওরে রুই মাছ বিস্তৃত।

বড় নদীগুলো হচ্ছে রুই মাছের প্রজনন ক্ষেত্র। গ্রীষ্ম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালবৈশাখি ও ভরা অমাবস্যা-পূর্ণিমায় রুই মাছ নদীতে ডিম ছাড়ে। ডিম থেকে মাছের পোনা যখন আঙ্গুলের সমান বড় হয় (আঙ্গুলিপোনা) তখন সংগ্রহ করে মাছের খামারে লালন-পালন শেষে বাজারজাত করা হয়। বাংলাদেশের এসব অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক উৎস ক্রমশ কমে আসছে (নদী দখল, ভরাট, অপরিকল্পিত বাঁধ, দূষণ ইত্যাদি কারণে), পানির গুণগতমানও নষ্ট হচ্ছে। ফলে মাছের জিনগত বৈশিষ্ট্যও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। হ্যাচারির মাছ কখনও প্রাকৃতিক মাছের প্রতিনিধিত্ব করে না। বিজ্ঞানীরা তাই প্রাকৃতিক পরিবেশ ও রুই মাছের আবাসস্থলের যথাযথ সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। অভ্যন্তরীণ নদীগুলো থেকে প্রাকৃতিক রুই মাছ পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছে। এ কারণে, অন্ততঃ বিশুদ্ধ রুই মাছের সংরক্ষণে সবার নজর এখন বাংলাদেশের হালদা নদীর দিকে।

হালদা নদী বাংলাদেশের একমাত্র দেশি নদী নয়, এটি একমাত্র জোয়ার-ভাটার নদী যেখান থেকে মাছচাষীরা পোনার বদলে রুই মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে নিয়ে যান। এসব ডিম থেকে ফোটানো পোনার বৃদ্ধি যতো দ্রুত ও বেশি হয় অন্য কোনো জায়গা থেকে সংগৃহীত পোনায় তা হয় না, হ্যাচারীতেতো হয়ই না। এ জন্য এক কেজি রেণুপোনার দাম প্রায় ৬০ হাজার টাকা, যা দেশের অন্য জায়গার পোনার দামের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। হালদা নদীকে তাই প্রাকৃতিক জিনব্যাংক সমৃদ্ধ **'মৎস্য খনি'** নামে অভিহিত করা হয়। এ নদীসহ অন্যান্য স্থানে রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণে প্রথম কাজ হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রুই মাছের প্রাকৃতিক বিচরণ স্থলগুলোকে মৎস্য **অভয়াশ্রম** ঘোষণা করা। লক্ষ ও উদ্দেশ্য এবং জলাশয় ভেদে মৎস্য অভয়াশ্রম নিচে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

১. মৌসুমি অভয়াশ্রম : নির্দিষ্ট প্রজাতির মাছ বছরের নির্দিষ্ট সময়ে উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট প্রজনন ক্ষেত্রে বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে নির্দিষ্ট আবাসে বিচরণ করে থাকে। তাই অবাধ প্রজনন ও বিচরণের জন্য সুনির্দিষ্ট জলাশয় বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মাছের অভয়াশ্রম হিসেবে সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়। যেমন- হালদা নদীর মদুনা ঘাট এলাকা, কাপ্তাই লেকের লং জাদু ও বিলাইছড়ি এলাকা। এখানে হালদা নদীর সামান্য একটি অংশকে (মদুনা ঘাট এলাকা) অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। তাও মৌসুমি অভয়াশ্রম। কিন্তু এ নদীতে সারা বছরই কম-বেশি রুই মাছের আনাগোনা দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময় এ নদী অরক্ষিত থাকে তাই মানুষ গোপনে সারা বছরই মা-রুই মাছ আহরণে ব্যস্ত থাকে। অতএব বিষয়টি পর্যালোচনা করে যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পূর্ণ হালদা নদীকে **সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম** ঘোষণা করে কঠোর নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে। দেশের অন্যান্য নদীতে মৌসুমি অভয়াশ্রম কার্যকর হলেও হালদা নদীকে রুই মাছের জন্য সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম ঘোষণা করতে হবে।

২. বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা : হালদা নদী রুই মাছের বিশুদ্ধ জিন সংরক্ষণে অবদান রেখে চলেছে। তাছাড়া, এটি একমাত্র জোয়ার ভাটার নদী যা দেশেরই এক প্রান্তে উৎপত্তি লাভ করে দেশেরই এক স্থানে সমাপ্ত হয়েছে। জোয়ার-ভাটা সমৃদ্ধ অঞ্চল এমনিতেই খুব সমৃদ্ধ কিন্তু অত্যন্ত সংবেদনশীল অঞ্চল। সংবেদনশীলতা ধরে রাখতে পারলে রুইয়ের প্রজনন ও বিচরণ অব্যাহত থাকবে। এ কারণে হালদা নদীকে **বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা** হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

অন্ততঃ হালদা নদীতে রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ করতে হলে নদীপাড়ে প্রতিষ্ঠিত দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন বন্ধ করতে হবে, মা-মাছ শিকারে কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে, অপরিকল্পিত বাঁধ, ড্যাম ও স্লুইস গেইট নির্মাণ বন্ধ করতে হবে এবং রুই মাছের ডিম ছাড়ার যে নির্দিষ্ট বাঁক রয়েছে তার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে হবে। এ বিষয় পর্যবেক্ষণে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি অবশ্যই থাকতে হবে। যে সব নদীতে প্রাকৃতিক রুই মাছ পাওয়া যায় সে সব নদীর পাশে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ যথাযথ হবে বলে আশা করা যায়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

হাইড্রা – *Hydra vulgaris*

ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণী: ভ্রূণ অবস্থায় যে সব প্রাণীর দেহে এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামের দুটি কোষস্তর থাকে, তারাই ডিপ্লোব্লাস্টিক বা দ্বিস্তরী বা দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী। যেমন– হাইড্রা।

হাইপোস্টোম : *Hydra*-র দেহের সম্মুখ প্রান্তের উঁচু, ছোট, মোচাকার অংশ যা মুখছিদ্রকে ঘিরে রাখে তার নাম হাইপোস্টোম।

নিডোসাইট : *Hydra* সহ Cnidaria পর্বের সকল প্রাণীতে এপিডার্মিসের পেশি–আবরণী কোষের মধ্যবর্তী স্থানে গোল, ডিম্বাকার বা নাসপাতি আকারের কোষকে নিডোসাইট বলে। বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এসব কোষ শিকার ধরা, চলাচল, আত্মরক্ষা, দেহকে কোনো বস্তুর সঙ্গে আটকে রাখতে সাহায্য করে।

নেমাটোসিস্ট : *Hydra*-র নিডোসাইটের স্ফীত মধ্যাংশের তরল পদার্থ পূর্ণ ও প্যাঁচানো সূত্রক সম্বলিত ক্ষুদ্র থলিকে নেমাটোসিস্ট বলে।

হিপ্নোটক্সিন : নেমাটোসিস্টের ভিতরের আমিষ ও ফেনলে গঠিত বিষাক্ত তরল পদার্থকে হিপ্নোটক্সিন বলে।

মেসোগ্লিয়া : *Hydra*-র দেহপ্রাচীরের এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক, কোষবিহীন, জেলির মতো আঠালো পদার্থকে মেসোগ্লিয়া বলে। এটি এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের ভিত্তিতল এবং পেশি প্রবর্ধনগুলোর সংযুক্তিতল হিসেবে কাজ করে এক ধরনের স্থিতিস্থাপক কঙ্কালের সৃষ্টি করে।

গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর: *Hydra*-র দেহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ফাঁকা গহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে। সিলেন্টেরনে খাদ্যবস্তুর বহিঃকোষীয় পরিপাক ঘটে। এর মাধ্যমে খাদ্যসার, শ্বসন ও রেচন পদার্থ পরিবাহিত হয়। সে কারণে সিলেন্টেরনকে গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর (পরিপাক-সংবহন গহ্বর) বলা হয়।

ঘাসফড়িং – *Poekilocerus pictus*

কিউটিকল : পতঙ্গের দেহের বহিঃস্থ এপিথেলিয়াম (হাইপোডার্মিস) থেকে নিঃসৃত অকোষীয় জৈবিক স্তরে নির্মিত দেহের প্রতিরক্ষা আবরণকে কিউটিকল বলে।

স্ক্লেরাইট : পতঙ্গের বহিঃকংকাল গঠনকারী প্রতিটি প্লেটকে স্ক্লেরাইট বলে।

প্লুরা : ঘাসফড়িংসহ অন্যান্য পতঙ্গের প্রতি দেহখন্ডকের পৃষ্ঠদেশীয় স্ক্লেরাইট অর্থাৎ **টার্গাম** এবং অঙ্কীয়দেশীয় স্ক্লেরাইট অর্থাৎ **স্টার্নাম** দেহের পার্শ্বদেশে প্লুরা নামের পর্দা দিয়ে পরস্পর যুক্ত থাকে।

ক্রপ : ঘাসফড়িংসহ অন্যান্য পতঙ্গের পৌষ্টিকনালির পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট থলির মতো অংশ যেখানে খাদ্য সাময়িকভাবে জমা থাকে।

ওভিপজিটর : স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের উদরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত ডিম পাড়ার অঙ্গকে ওভিপজিটর বলে।

নিম্ফ : ঘাসফড়িং, আরশোলা ইত্যাদি পতঙ্গে ডিম ফুটে যে শিশু দশা বেরিয়ে আসে তাকে নিম্ফ বলে। নিম্ফ এর গঠন, খাদ্যরুচি প্রায় পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতোই তবে এরা আকৃতিতে ছোট, মস্তক তুলনামূলকভাবে বড়, অ্যান্টিনা খাটো, জননঅঙ্গ অসম্পূর্ণ ও এদের ডানা থাকে না।

ইনস্টার : ঘাসফড়িংয়ের জীবনচক্রে নিম্ফগুলো কয়েকবার খোলস নির্মোচনের পর পূর্ণাঙ্গ দশা প্রাপ্ত হয়। পরপর দুটি নির্মোচনের মধ্যবর্তী অবস্থাকে ইনস্টার বলে।

পুঞ্জাক্ষি : ঘাসফড়িংয়ের (পতঙ্গের) মস্তকের উভয় পাশে কালো, বৃন্তহীন, বৃত্তাকার উত্তল গঠনকে পুঞ্জাক্ষি বলে। পুঞ্জাক্ষি দর্শন ইন্দ্রিয়। প্রতিটি পুঞ্জাক্ষি প্রায় বিশ হাজার দর্শন একক বা ওমাটিডিয়া নিয়ে গঠিত।

ওমাটিডিয়াম : স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে প্রতিবিম্ব গঠনে সক্ষম পুঞ্জাক্ষির প্রতিটি সরলাক্ষি বা দর্শন একক বা একক আলোক সংবেদী অঙ্গকে ওমাটিডিয়াম বলে।

অসম্পূর্ণ রূপান্তর : যে ধারাবাহিক ও দ্রুত পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশু অবস্থা থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী সৃষ্টি হয় তাকে রূপান্তর বলে। যে রূপান্তরে শিশু দশার প্রাণীটি গঠন, বসতি, খাদ্য, খাদ্যাভ্যাস পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতোই তবে এরা আকৃতিতে ছোট, ডানা ও জনন অঙ্গ থাকে না এবং আংশিক পরিবর্তনের মাধ্যমে কয়েকবার খোলস

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বদলানোর মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ দশা প্রাপ্ত হয় সেই ধরনের রূপান্তরকে অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলে। অসম্পূর্ণ রূপান্তরের শিশু দশাকে নিম্ফ (nymph) বলে। যেমন- ঘাসফড়িং, আরশোলা ইত্যাদি।

রুই মাছ - *Labeo rohita*

কার্প : মিঠাপানির যেসব মাছের মাথায় আঁইশ থাকে না কিন্তু সারাদেহ সাইক্লয়েড আঁইশ দিয়ে আবৃত থাকে, দেহগহ্বরে পটকা থাকে যে সব মাছকে কার্পজাতীয় মাছ বলে। কার্পজাতীয় মাছের মধ্যে যেগুলো আকৃতিতে বড়, দ্রুত বর্ধনশীল এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোকে বলা হয় **মেজর কার্প**। যেমন- রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস ইত্যাদি।

সাইক্লয়েড আঁইশ : রুই মাছের দেহ যে ধরনের আঁইশ দিয়ে আবৃত থাকে তাকে সাইক্লয়েড আঁইশ বলে। আঁইশগুলো পাতলা, স্বচ্ছ ও মোটামুটি গোল। আঁইশের কেন্দ্রস্থলের স্বচ্ছ অংশকে **ফোকাস** বলে। ফোকাসকে ঘিরে বৃত্তাকার **বৃদ্ধি রেখা** থাকে। এই বৃদ্ধি রেখা দেখে মাছের বার্ষিক বৃদ্ধি, বয়স নির্ণয় করা যায়।

পার্শ্বরেখা : রুই মাছের মস্তকের পিছন থেকে লেজ পর্যন্ত দুপাশে দুটি লম্বা দাগ থাকে। দাগদুটিকে পার্শ্বরেখা বলে। এতে সংবেদী কোষ থাকে। পার্শ্বরেখার সাহায্যে মাছ পানির কম্পন অনুভব করে পানির বিভিন্ন স্তরে এদের আবাসস্থল নিরূপণ করতে পারে।

ভেনাস হার্ট : যে ধরনের হৃৎপিন্ডের মধ্য দিয়ে কখনই অক্সিজেনযুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় না বরং শুধু কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে ভেনাস হার্ট বলে। অর্থাৎ এধরনের হৃৎপিন্ড শিরার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। যেমন - মাছের হৃৎপিন্ড।

স্পনিং : ডিম পাড়া ও শুক্রাণু নিঃসরণ প্রক্রিয়াকে স্পনিং বলে। স্রোতযুক্ত স্বাদু পানিতে রুই মাছের স্পনিং ঘটে।

রেণুপোনা : ডিম ফুটে বের হওয়া সদ্যজাত লার্ভাকে রেণুপোনা বা হ্যাচলিং বলে। রেণুপোনার দেহের অঙ্কীয়দেশে কুসুমথলি থাকে। কুসুমথলির সঞ্চিত খাদ্য খেয়ে এরা পুষ্টি লাভ করে ও বৃদ্ধি পায়। ডিমপোনার বয়সকাল ৭২ ঘন্টা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি হাইড্রার দেহে দেখা যায়?
ক) মেসোগ্লিয়া খ) হিমোসিল
গ) স্ক্লেরাইট ঘ) মায়োফাইব্রিল

২. হাইড্রার নিডোসাইট সবচেয়ে বেশি থাকে কোথায়?
ক) দেহকাণ্ডে খ) কর্ষিকায়
গ) হাইপোস্টোমে ঘ) পাদ-চাকতিতে

৩. হাইড্রার পরিস্ফুটনের সঠিক ধাপ কোনটি?
ক) জাইগোট → ব্লাস্টুলা → মরুলা → গ্যাস্ট্রুলা
খ) জাইগোট → গ্যাস্ট্রুলা → মরুলা → হাইড্রুলা → ব্লাস্টুলা → পূর্ণাঙ্গ
গ) জাইগোট → মরুলা → ব্লাস্টুলা → গ্যাস্ট্রুলা → হাইড্রুলা → পূর্ণাঙ্গ
ঘ) জাইগোট → গ্যাস্ট্রুলা → মরুলা → হাইড্রুলা → ব্লাস্টুলা → পূর্ণাঙ্গ

৪. কোন নিমাটোসিস্টে হিপনোটক্সিন থাকে?
ক) পেনিট্রান্ট খ) ভলভেন্ট
গ) স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট ঘ) স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট

৫. বার্ব এবং বার্বিউল যুক্ত নেমাটোসিস্ট কোনটি?
ক) পেনিট্রান্ট খ) ভলভেন্ট
গ) স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট ঘ) স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট

৬. কোনটি মিথোজীবী প্রজাতি?
ক) *Hydra vulgaris* খ) *Hydra oligactis*
গ) *Hydra gangetica* ঘ) *Chlorohydra viridissima*

৭. দন্তক কোন উপাঙ্গের অংশ?
ক) ম্যান্ডিবল খ) ল্যাব্রাম গ) ল্যাবিয়াম ঘ) ম্যাক্সিলা

৮. ম্যাক্সিলারি পাল্পের কাজ হলো -
ক) রেচনে সাহায্য করে খ) খাদ্যের স্বাদ গ্রহণে সাহায্য করে
গ) দর্শনে সাহায্য করে ঘ) শ্বসনে সাহায্য করে

৯. কোনটি ঘাসফড়িং-এর স্পাইরাকলকে পরিবেষ্টিত করে রাখে?
ক) টিনিডিয়া খ) ইন্টিমা গ) অপারকুলাম ঘ) পেরিট্রিম

১০. ঘাসফড়িং- এর বক্ষ অঞ্চলে কত জোড়া শ্বাসরন্ধ্র থাকে?
ক) ২ খ) ৫ গ) ৮ ঘ) ১০

১১. মৎস্য খনি কোন নদীকে বলা হয়?
ক) পদ্মা খ) হালদা গ) পশুর ঘ) রুপসা

১২. পাশের চিত্রের প্রাণীটির খাদ্যাভ্যাস কোন ধরনের? [ঢা.বো.১৮]
ক) তৃণভোজী খ. মাংসাশী গ) মৃতজীবী ঘ. সর্বভুক

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১৩. একবার ব্যবহৃত নেমাটোসিস্টের পরিণতি কী হয় ? [ব.বো. ১৭]
ক) দেহে পরিপাক হয় খ) দেহের বাইরে নিষ্ক্রান্ত হয়
গ) পুনরায় কর্মক্ষম হয় ঘ) অন্যকোষে পরিবর্তিত হয়

১৪. হাইড্রা শিকার ধরা, আত্মরক্ষা ও চলনে কোন কোষ ব্যবহার করে ?
ক) স্নায়ু কোষ খ) ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ
গ) নিডোব্লাস্ট কোষ ঘ) গ্রন্থি কোষ

১৫. নিচের কোন কোষটি প্রয়োজনে যে কোন ধরনের কোষে রূপান্তরিত হতে পারে ?
ক) পেশি আবরণী খ) ইন্টারস্টিশিয়াল
গ) সংবেদী ঘ) গ্রন্থি

১৬. ইন্টারসিস্টশিয়াল কোষের অন্য কোষে রূপান্তরিত হওয়ার ক্ষমতাকে কী বলে ?
ক) পলিপোটেন্সি খ) এপিপোটেন্সি
গ) টটিপোটেন্সি ঘ) সেরিব্রোটেন্সি

১৭. *Hydra* -এর গ্যাস্ট্রুলা দশার কেন্দ্রের গহ্বরের নাম কী ?
ক) মেসেন্টেরন খ) মেসোগ্লিয়া
গ) আর্কেনটেরন ঘ) সিলেন্টেরন

১৮. ঘাসফড়িং এ ল্যাসিনিয়া পাওয়া যায় মুখোপাঙ্গের কোনটিতে ? [রা.বো. দি.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো., ব.বো. ১৮]
ক) ল্যাব্রাম খ) ম্যান্ডিবল গ) ম্যাক্সিলা ঘ) ল্যাবিয়াম

১৯. ঘসিফড়িং এর মুখ গহ্বরের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত পর্দার মত ক্ষুদ্র উপাঙ্গ থাকে। একে কী বলে ?
ক) ল্যাব্রাম খ) হাইপোফ্যারিংকস
গ) ম্যাক্সিলা ঘ) ম্যান্ডিবল

২০. কোন অংশটি ঘাসফড়িংয়ের পৌষ্টিকনালির প্রোক্টোডিয়ামের অন্তর্ভুক্ত ? [ঢা.বো. ১৮]
ক) ক্রপ খ) গলবিল গ) গিজার্ড ঘ) রেকটাম

২১. ঘাসফড়িং এর উদর অঞ্চলে কত জোড়া শ্বাসরন্ধ্র বিদ্যমান ?
ক) ৬ খ) ৮ গ) ১০ ঘ) ১২

২২. রেটিনুলার এর প্রচ্ছচ্ছেদে কতটি রেটিনুলার কোষের উপস্থিতি দেখা যায় ?
ক) ৪-৫ খ) ৫-৬ গ) ৬-৭ ঘ) ৬-৮

২৩. ঘাসফড়িং এর পুঞ্জাক্ষির প্রতিটি এককে কী বলে ?
ক) স্ক্লেরাইট খ) কর্ণিয়া
গ) রেটিনা ঘ) ওমাটিডিয়াম

২৪. ঘসিফড়িং এর ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নয় ? [ঢা.বো. ১৫]
ক) যৌনদ্বিরূপতা বিদ্যমান খ) ডিম সেন্ট্রোলেসিথাল
গ) রূপান্তর সম্পূর্ণ ঘ) শরৎকালে ডিম দেয়

২৫. ঘাসফড়িং এর জীবনচক্রে নিচের কোন ক্রমটি সঠিক ? [চ.বো. ১৭]
ক) ডিম→ লার্ভা→ইমাগো
খ) ডিম →লার্ভা→ পিউপা →ইমাগো
গ) ডিম→ নিম্ফ→ ইমাগো
ঘ) ডিম→ লার্ভা →নিম্ফ→ ইমাগো

২৬. রুই মাছের কানকুয়ার পিছনের পাখনাকে বলা হয়- [য.বো. ১৭]
ক) শ্রোণি পাখনা খ) পৃষ্ঠীয় পাখনা
গ) বক্ষ পাখনা ঘ) পায়ু পাখনা

২৭. রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক ? [য.বো. ১৫]
ক) O_2 যুক্ত রক্ত পাম্প করে
খ) CO_2 যুক্ত রক্ত পাম্প করে
গ) O_2 ও CO_2 যুক্ত রক্ত পাম্প করে
ঘ) মিশ্রিত রক্ত পাম্প করে

২৮. রুইমাছের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক ? [রা.বো., দি.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো. ব.বো. ১৮]
ক) অলিন্দ→ নিলয়→ বাল্বাস অ্যাওর্টা→ ফুলকা
খ) ফুলকা→ অলিন্দ→ নিলয়→ বাল্বাস→ অ্যাওর্টা
গ) বাল্বাস→ অ্যাওর্টা→ নিলয়→ অলিন্দ→ ফুলকা
ঘ) ফুলকা→ অলিন্দ→ বাল্বাস→ অ্যাওর্টা→ নিলয়

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

২৯. হাইড্রার বহিঃত্বকের গ্রন্থি কোষ সাহায্য করে -
i) ভাসতে ii) খাদ্য গলাধঃকরণে
iii) বস্তুর সঙ্গে আটকে রাখতে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩০. হিপনোটক্সিনে উপস্থিত থাকে ?
i) ফেনল ii) লিপিড iii) প্রোটিন
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩১. নিডোসাইট কোষ অনুপস্থিত ?
i) এপিডার্মিসে ii) পদতলে iii) এন্ডোডার্মিসে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩২. ঘাস ফড়িং এর বক্ষ অঞ্চলের ক্ষেত্রে –
i) একজোড়া শুঙ্গ থাকে ii) তিনজোড়া পা থাকে
iii) দুইজোড়া শ্বাসছিদ্র থাকে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩৩. ম্যাক্সিলারি পাল্পের কাজ হলো –
i) পায়ের অগ্রভাগ পরিষ্কার করা
ii) খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করা iii) খাদ্য ধরা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩৪. রুই মাছের হৃৎপিন্ডের অংশগুলো হলো –
i) সাইনাস ভেনোসাস ii) কোনাস আর্টারিওসাস
iii) বাল্বাস আর্টারিওসাস
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩৫. রুই মাছের বায়ুথলির কাজ হলো –
i) শব্দ উৎপাদন করা ii) প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করা
iii) শ্বসনে সাহায্য করা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৩৬. রুই মাছের পটকায় বিদ্যমান গ্যাস হলো –
i) অক্সিজেন ii) কার্বন ডাইঅক্সাইড iii) হাইড্রোজেন
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

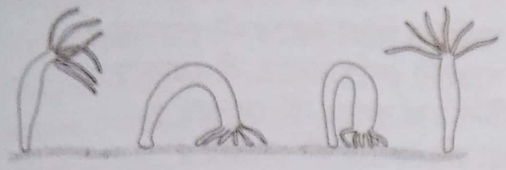

৩৭. উদ্দীপকের চলন প্রক্রিয়াটিতে ভূমিকা রাখে –
i) পেশি আবরণী কোষ ii) গ্লুটিন্যান্ট নেমাটোসিস্ট
iii) ক্ষণপদীয় কোষ
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩৮. উক্ত চলন প্রক্রিয়ায় প্রাণীটি –
i) লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করে
ii) দ্রুত গতিতে চলতে পারে
iii) প্রতিবারে দেহের দৈর্ঘ্যের অর্ধেক দূরত্ব অতিক্রম করে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩৯ ও ৪০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

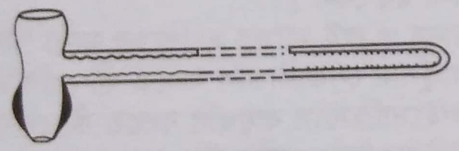

৩৯. উদ্দীপকে উল্লিখিত অঙ্গটি পাওয়া যায় –
i) ঘাসফড়িং ii) আরশোলা iii) রুই মাছে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৪০. উল্লিখিত অঙ্গ –
i) পরিপাকনালিতে উন্মুক্ত
ii) রেচন পদার্থ নিষ্কাশন করে
iii) হিমোসিল হতে বিপাকীয় বর্জ্য সংগ্রহ করে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪১ ও ৪২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

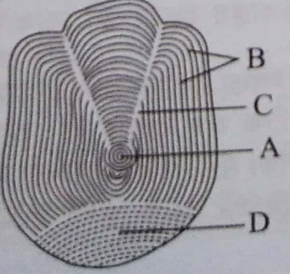

৪১. উদ্দীপকের 'D' নির্দেশিত অংশটি –
ক) ডার্মিসে প্রোথিত খ) এপিডার্মিসে প্রোথিত থাকে
গ) অনাবৃত থাকে ঘ) আঁইশের নিচে আবৃত থাকে

৪২. উদ্দীপকের 'A', 'B' ও 'C' দ্বারা মাছের –
i) বৃদ্ধি নির্ণয় করা যায়
ii) বয়স নির্ণয় করা যায়
iii) খাদ্যের প্রাচুর্য্য সম্পর্কে জানা যায়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নের উত্তর দাও:

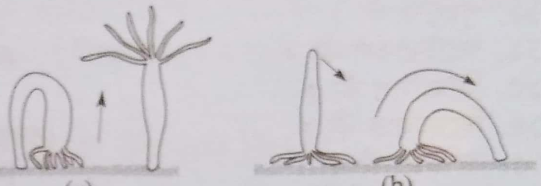

ক) নিডোসাইট কী ?
খ) হাইড্রার খাদ্য গ্রহণে নেমাটোসিস্ট কীভাবে কাজ করে ?
গ) উদ্দীপকে 'b' চিত্রটি কি নির্দেশ করে ব্যাখ্যা কর ।
ঘ) লম্বা দূরত্ব অতিক্রমের জন্য উদ্দিপকের 'b' থেকে 'a' শ্রেয়তর বিশ্লেষণ কর ।

২. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বললেন এক ধরনের পতঙ্গ আছে যা শস্যক্ষেত, সব্জির বাগানে থাকে। এদের সমান্তরাল অনেক প্রজাতি এক নিমিষেই ক্ষেতের ফসল বিনাশ করে। এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য প্রতীক প্রাণী হিসাবে তোমার জীববিদ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
ক) রেচন কী ?
খ) হিমোসিল বলতে কী বুঝ ?
গ) উদ্দীপকের প্রাণিটির রক্তসংবহন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর ।
ঘ) প্রাণিটির সুষ্ঠু রূপান্তরে হরমোনের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর ।

৩. 'কার্প জাতীয় মাছের মধ্যে রুই বাংলাদেশের অতি পরিচিত একটি মাছ। খাদ্যগ্রহণ ও চলাফেরার জন্য মাছটি একটি বিশেষ অঙ্গের সাহায্যে পানির বিভিন্ন গভীরতায় শরীরের আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক রেখে অনায়াসে বিচরণ করে। বর্তমানে নদী ও জলাশয়ের গভীরতা কমে যাওয়ায় মাছটির বাসস্থান ও প্রজননক্ষেত্র হুমকির মুখে পড়েছে।
ক) লার্ভা কী ?
খ) ভেনাস হার্ট বলতে কী বুঝায় ?
গ) উদ্দীপকের মাছটি কিভাবে পানির বিভিন্ন গভীরতায় শরীরের আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক রেখে বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমে অনায়াসে বিচরণ করে ? ব্যাখ্যা কর ।
ঘ) উদ্দীপকে উলেখিত মাছটির প্রাকৃতিক বাসস্থান ও প্রজননক্ষেত্র হুমকির মুখে কেন– আলোচনা কর ।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

জ্ঞানমূলক

১. হাইপোস্টোম কী ? [য.বো. ১৭, ঢা.বো. ১৬]
২. ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ কী ?
৩. নিডোসাইট কী ? [দি.বো. ১৭, ব.বো. ১৫]
৪. মেসোগ্লিয়া কী ?
৫. মিথোজীবিতা কী ? [দি.বো. ১৭, চ.বো. ১৫]
৬. যৌন দ্বিরূপতা কী ?
৭. বহুরূপিতা কী ? [সি.বো. ১৭]
৮. পঙ্গপাল কী ?
৯. স্ক্লেরাইট কী ? [সি.বো. ১৭]
১০. হাইপোগন্যাথাস মস্তক কী ?
১১. পুঞ্জাক্ষি কী ? [চ.বো. ১৭]
১২. স্পাইরাকল কী ? [সি.বো. ১৭]
১৩. হিমোসিল কী ?
১৪. হিমোলিম্ফ কী ? [সকল বোর্ড ১৮]
১৫. অস্টিয়া কী ? [রা.বো. ১৭]
১৬. ভেনাস হার্ট কী ?
১৭. ওমাটিডিয়াম কী ? [দি.বো. ১৭, কু.বো. ১৭, য.বো. ১৫]
১৮. ব্রাঙ্কিওস্টেগাল ঝিল্লি কী ? [সি.বো. ১৭]
১৯. রূপান্তর কী ? [দি.বো. ১৭]
২০. অসম্পূর্ণ রূপান্তর কী ? [ঢা.বো.১৬]
২১. লার্ভা কী ?
২২. নিম্ফ কী ?
২৩. কার্প মাছ কী ? [ব.বো. ১৭]
২৪. রুই মাছের বৈজ্ঞানিক নাম লিখ।
২৫. রুই মাছের শ্রেণির নাম লিখ।

অনুধাবনমূলক

২৬. হাইড্রাকে মাথাওয়ালা ড্রাগন বলা হয় কেন ?
২৭. হিপনোটক্সিন বলতে কী বোঝায় ?
২৮. নিডোসাইট কোষকে ব্যাটারি বলা হয় কেন ?
২৯. ডেসমোনিম নেমাটোসিস্ট বলতে কী বোঝায় ?
৩০. *Hydra* এর পর্বটি পূর্বে Coelenterata নামে পরিচিত ছিল কেন ?
৩১. *Hydra* এর গ্লাইডিং চলন বলতে কী বোঝায় ?
৩২. আর্কেনটেরন বলতে কী বোঝায় ?
৩৩. গ্যাস্ট্রুলা-স্টেরিওগ্যাস্ট্রুলা বলতে কী বোঝায় ?
৩৪. হাইড্রুলা বলতে কী বোঝায় ?
৩৫. মিথোজীবিতায় হাইড্রা কীভাবে উপকৃত হয় ?
৩৬. শৈবাল কেন হাইড্রার সাথে মিথোজীবিতা সম্পর্ক স্থাপন করে ?
৩৭. ডিপ্লোব্লাস্টিক প্রাণী বলতে কী বোঝায় ?
৩৮. হাইড্রাকে দ্বিস্তরী প্রাণী বলা হয় কেন ? [দি.বো. ১৭]
৩৯. সিলেন্টেরন বলতে কী বোঝায় ?
৪০. লুপিং চলন বলতে কী বোঝায় ?
৪১. *Hydra* র লুপিং ও সমারসল্টিং চলনের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
৪২. মিথোজীবিতা বলতে কী বোঝায় ? [ঢা.বো., য.বো. ১৫, ব.বো. ১৬, য.বো. ১
৪৩. পঙ্গপাল বলতে কী বোঝায় ?
৪৪. ঘাসফড়িং এর পা-কে স্যালটাটোরিয়াল পা বলা হ কেন ?
৪৫. টিম্পেনাম বলতে কী বোঝায় ?
৪৬. গ্যাস্ট্রিক সিকা বলতে কী বোঝায় ?
৪৭. অ্যালারি পেশি বলতে কী বোঝায় ?
৪৮. টিনিডিয়া বলতে কী বোঝায় ?
৪৯. ওসেলি বলতে কী বোঝায় ?
৫০. ঘাসফড়িংকে ইউরিকটিলিক প্রাণী বলা হয় কেন
৫১. ঘাসফড়িং-এর চর্বিকোষকে ইউরেট কোষ বলা হ কেন ?
৫২. জুভেনাইল হরমোন বলতে কী বোঝায় ?
৫৩. মোল্টিং বলতে কী বোঝায় ?
৫৪. হিমোসিল বলতে কী বোঝায় ? [ঢা.বো. ১৭, কু.বো.
৫৫. হিমোলিম্ফের কাজ উল্লেখ কর।
৫৬. সাইনাস বলতে কী বোঝায় ? [রা.বো.
৫৭. ট্রাকিয়া ও ট্রাকিওলের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
৫৮. সুপারপজিশন প্রতিবিম্ব বলতে কী বোঝায় ?
৫৯. ওভিপজিটর এর কাজ লিখ। [সি.বো.
৬০. রুই মাছের রক্ত সংবহনকে একচক্রীয় রক্ত সংব বলা হয় কেন ?
৬১. মানুষ ও রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে পার্থক্য লি
৬২. সার্কুলাস সেফালিকাস বলতে কী বোঝায় ?
৬৩. ফাইসোক্লিস্টাস বায়ুথলি বলতে কী বোঝায় ?
৬৪. রিটিমিরাবিলি বলতে কী বোঝায় ?
৬৫. অ্যাটরেশিয়া বলতে কী বোঝায় ?
৬৬. রুই মাছ কেন স্রোতহীন বদ্ধ জলাশয়ে ডিম পাড়ে
৬৭. রুই মাছের ক্লিভেজকে কেন মেরোব্লাস্টিক বলা হ
৬৮. অর্গানোজেনেসিস বলতে কী বোঝায় ?
৬৯. রেণু পোনা বলতে কী বোঝায় ?
৭০. কার্প জাতীয় মাছ বলতে কী বোঝায় ?
৭১. ল্যাটারাল লাইনের কাজ উল্লেখ কর।
৭২. রুই মাছের বায়ুথলি গ্রাসনালির সাথে যুক্ত থাকে কেন ? [সি.বো.
৭৩. ভেনাস হার্ট বলতে কী বোঝায় ? [কু.বো., সি.বো., য.বো. ১৫, দি.বো.
৭৪. অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলতে কী বোঝায় ? [ঢা.বো. ১৬, সি.বো.
৭৫. হলোব্রাঙ্ক ফুলকা বলতে কী বোঝায় ?
৭৬. হাইড্রোস্টাটিক অঙ্গ বলতে কী বোঝায় ?
৭৭. যৌন দ্বিরূপতা বলতে কী বোঝায় ?
৭৮. হালদা নদীতে রুই মাছের স্বাভাবিক প্রজনন ঘটে কে

আহছানুল হক আবির

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

লাল-সবুজে দাগানো

TEXT BOOK

প্রাণিবিজ্ঞান

উন্মেষ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৩ মানব শারীরতত্ত্ব : পরিপাক ও শোষণ
Human Physiology : Digestion & Absorption

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- ❐ পরিপাক ❐ টায়ালিন
- ❐ পিত্তরস ❐ গ্যাস্ট্রিন
- ❐ BMI ❐ স্থূলতা

মানবদেহের বিভিন্ন জৈবনিক কাজ পরিচালনা, শক্তি সরবরাহ, দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা এবং রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে পুষ্টি (nutrition)। খাদ্য (food)−ই মানবদেহে পুষ্টির যোগান দেয়। পরিপাক প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রথমে সরল দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার পরে কোষে প্রবেশের উপযোগী হয়। সবশেষে রক্ত এ পরিপাককৃত খাদ্যকে শরীরের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করে।

পিরিয়ড সংখ্যা−৭ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাকের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ২. পাকস্থলির বিভিন্ন অংশে সংঘটিত যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরিপাকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। ৩. যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে ক্ষুদ্রান্ত্রের বিভিন্ন অংশের মুখ্য ক্রিয়াসমূহ (major actions) বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. ক্ষুদ্রান্ত্রের লুমেন থেকে রক্তনালিকা ও ভিলাই পর্যন্ত পরিপাককৃত দ্রব্যের শোষণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. বৃহদন্ত্রের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. ব্যবহারিক : পরিপাক সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কোষসমূহ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে। ১০. স্থূলতার ধারণা, কারণ ও প্রতিরোধ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাক− ○ যান্ত্রিক ○ রাসায়নিক ● পাকস্থলির বিভিন্ন অংশে সংঘটিত পরিপাক− ○ যান্ত্রিক ○ রাসায়নিক ● পরিপাক গ্রন্থির কাজ− ○ যকৃত ○ অগ্ন্যাশয় ● পরিপাকে স্নায়ু ও হরমোনের ভূমিকা ● ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যদ্রব্যের- ○ পরিপাক ○ শোষণ ● বৃহদন্ত্রের কাজ ● ব্যবহারিক ○ যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, পাকস্থলি ও ক্ষুদ্রান্ত্রের অনুচ্ছেদ (section) এর স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ ● স্থূলতা- ○ ধারণা ○ কারণ ○ প্রতিরোধ

পরিপাক (Digestion)

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিল খাদ্যবস্তু বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে ও এনজাইমের সহায়তায় ভেঙ্গে দ্রবণীয় সরল ও তরল এবং দেহকোষের গ্রহণীয় ক্ষুদ্র অণুতে পরিণত হয় তাকে পরিপাক বলে। যে তন্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর পরিপাক ও শোষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে পৌষ্টিকতন্ত্র (digestive system) বলা হয়।

পরিপাক প্রক্রিয়া কতগুলো ধারাবাহিক যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

১. যান্ত্রিক পরিপাক (Mechanical digestion) : পরিপাকের সময় যে প্রক্রিয়ায় গৃহীত খাদ্যের পরিশোষণযোগ্য অংশ চিবানো, গলাধঃকরণ ও পৌষ্টিকনালি অতিক্রমের সময় নালির বিভিন্ন অংশের পেশল সঞ্চালনের ফলে গাঠনিক ভাঙনের (physical breakdown) মাধ্যমে অতি ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত হয়ে এবং এনজাইমের ক্রিয়াতলের বৃদ্ধি ঘটিয়ে (increases the surface area for the action of the digestive enzymes) সহজ ও সম্ভব করে তোলে তাকে যান্ত্রিক পরিপাক বলে।

২. রাসায়নিক পরিপাক (Chemical digestion) : পরিপাকের সময় গৃহীত খাদ্যের পরিপাকযোগ্য অংশ যান্ত্রিক পরিপাকের পরপরই মুখ, পাকস্থলি ও অন্ত্রে এসিড, ক্ষার ও এনজাইমের সহায়তায় রাসায়নিক ভাঙনের (chemical

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

breakdown) মাধ্যমে দেহকোষের গ্রহণীয় উপাদানে পরিণত হওয়াকে রাসায়নিক পরিপাক বলে। মানবদেহের পৌষ্টিকতন্ত্র **পৌষ্টিকনালি** এবং সংশ্লিষ্ট **পৌষ্টিকগ্রন্থি** নিয়ে গঠিত।

পৌষ্টিকতন্ত্র

পৌষ্টিকনালি

১. মুখছিদ্র
২. মুখগহ্বর
৩. গলবিল (দৈর্ঘ্য-১২.৫ সেমি)
৪. অন্ননালি (দৈর্ঘ্য-২৫ সেমি)
৫. পাকস্থলি (দৈর্ঘ্য-৩০.৫ সেমি, প্রস্থ ১৫.২ সেমি)
   ক. কার্ডিয়া
   খ. ফানডাস
   গ. বড় বাঁক
   ঘ. ছোট বাঁক
   ঙ. পাইলোরাস
৬. ক্ষুদ্রান্ত্র (দৈর্ঘ্য ৬-৭ মিটার)
   ক. ডিওডেনাম
   খ. জেজুনাম
   গ. ইলিয়াম
৭. বৃহদন্ত্র (দৈর্ঘ্য ১.৫ মিটার)
   ক. সিকাম
   খ. কোলন
      i) ঊর্ধ্বমুখী
      ii) অনুপ্রস্থ
      iii) নিম্নমুখী
      iv) সিগময়েড
   গ. মলাশয়
৮. পায়ু

পৌষ্টিকগ্রন্থি

১. লালাগ্রন্থি
২. যকৃত
৩. অগ্ন্যাশয়
৪. গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি
৫. আন্ত্রিকগ্রন্থি

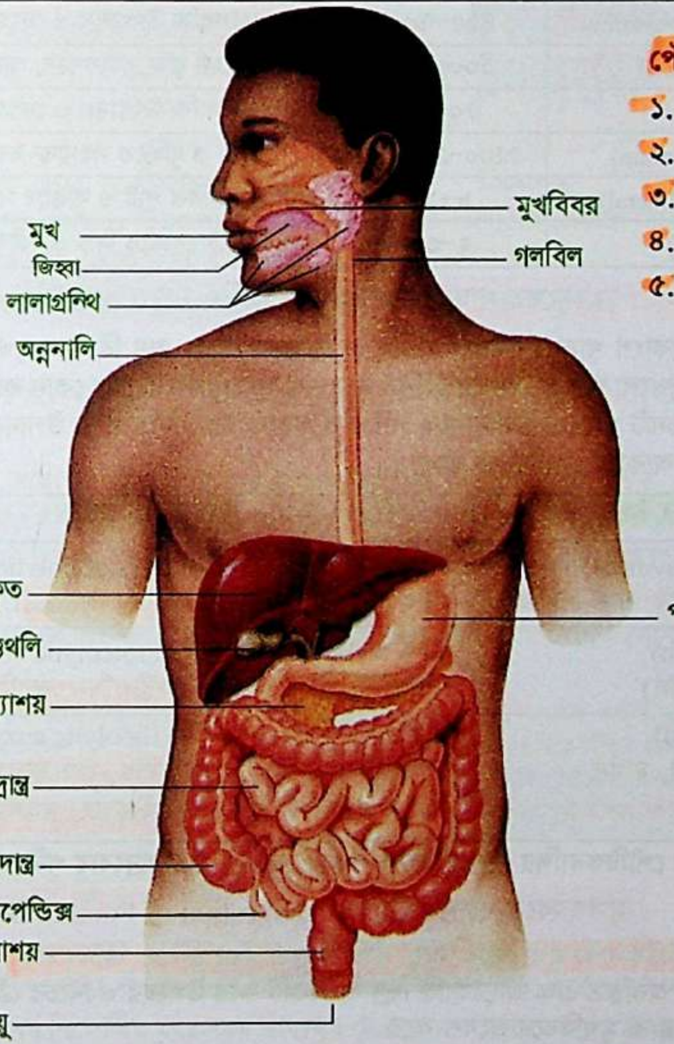

চিত্র ৩.২ : মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্র

মানুষের পৌষ্টিকনালিতে বিভিন্ন ধরনের জটিল খাদ্যের পরিপাক নিম্নোক্ত ৬টি ধাপে সম্পন্ন হয়।

১. খাদ্য ও পানি গলাধঃকরণ (Ingestion of food & water)
২. পৌষ্টিকনালিতে খাদ্যের সঞ্চালন (Movement of food along the alimentary canal)
৩. খাদ্যের যান্ত্রিক পরিপাক (Mechanical digestion of food)
৪. খাদ্যের রাসায়নিক পরিপাক (Chemical digestion of food)
৫. পরিপাককৃত খাদ্য ও পানি পরিশোষণ (Absorption of digested food & water)
৬. বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন (Elimination of undigested materials)

মানুষ সর্বভুক (omnivorus) প্রাণী। উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উভয় ধরনের খাদ্যই এরা গ্রহণ করে থাকে। এদের খাদ্য তালিকায় ছয়টি খাদ্য উপাদানই রয়েছে। তবে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাদ্য জটিল হওয়ার কারণে এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয়। বাকি তিনটি খাদ্যোপাদান, যেমন-ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি কোষে সরাসরি গৃহীত

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

হওয়ায় এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয় না। সঠিক পরিমাণ শর্করা, আমিষ, স্নেহদ্রব্য, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি নিয়ে গঠিত যে খাদ্য কোনো ব্যক্তির স্বাভাবিক পুষ্টি ও প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে, তাকে **সুষম খাদ্য** (balanced diet) বলে। নিচে একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের সুষম খাদ্যের তালিকা দেয়া হলো।

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ	প্রধান কাজ
১. শর্করা (Carbohydrate)	৪১৫–৬০০ গ্রাম	তাপশক্তি উৎপাদন ও দেহে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি।
২. আমিষ (Protein)	১০০–১৫০ গ্রাম	দেহের বৃদ্ধি, কোষগঠন, ক্ষয়পূরণ, এনজাইম ও হরমোন উৎপাদন।
৩. স্নেহদ্রব্য (Lipid)	৫০–৫৫ গ্রাম	তাপশক্তি উৎপাদন ও দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ।
৪. ভিটামিন (Vitamin)	৫৫০০–৫৬০০ মিলিগ্রাম	পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ানো।
৫. খনিজ লবণ (Mineral)	৮–১০ গ্রাম	স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা।
৬. পানি (Water)	২–৩ লিটার	প্রোটোপ্লাজমকে সিক্ত ও সজীব রাখা এবং কোষের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ।

মানুষের খাদ্য পরিপাক প্রণালী (Process of Human Digestion)

মানুষে অধিকাংশ খাদ্য (শর্করা, আমিষ ও স্নেহদ্রব্য) বৃহৎ অণু হিসেবে মুখগহ্বরে গৃহীত হয়। খাদ্যবস্তুর এমন বৃহত্তর জটিল অণুগুলো ক্ষুদ্রতম অণুতে বিশ্লিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মানবদেহের কোন কাজে আসে না। সেজন্য শর্করা, আমিষ ও স্নেহদ্রব্য এ তিনটি খাদ্যের উপাদানকে পরিপাক করতে হয়। নিচে খাদ্য উপাদানের নাম, পরিপাককারী এনজাইম ও উৎপন্ন দ্রব্য ছক আকারে উপস্থাপিত হলো।

খাদ্যের উপাদান	প্রধান এনজাইম	উৎপন্ন দ্রব্য
শর্করা (Carbohydrate) (ভাত, রুটি, চিনি, শাক-সবজি)	অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইম (Amylolytic enzymes) (টায়ালিন, অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ)	গ্লুকোজ
আমিষ (Protein) (মাছ, মাংস, ডাল)	প্রোটিওলাইটিক এনজাইম (Proteolytic enzymes) (পেপসিন, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, অ্যামিনোট্রিপসিন)	অ্যামিনো এসিড
স্নেহদ্রব্য (Lipid) (ভোজ্যতেল, ঘি, মাখন, প্রাণিজ চর্বি)	লাইপোলাইটিক এনজাইম (Lipolytic enzymes) (পাকস্থলিয় ও আন্ত্রিক লাইপেজ, ফসফোলাইপেজ, কোলেস্টেরল ও গ্লিসারল এস্টারেজ, লেসিথিনেজ)	ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল

নিচে মানুষের পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে শর্করা, আমিষ ও স্নেহদ্রব্যের পরিপাক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাক (Digestion of Food in Buccal Cavity)

মানুষের পৌষ্টিকনালি মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ৮–১০ মিটার লম্বা। পৌষ্টিকনালির শুরু মুখ থেকে। এটি নাসাছিদ্রের নিচে অবস্থিত এক আড়াআড়ি ছিদ্র যা একটি করে উপরের ও নিচের ঠোঁটে বেষ্টিত থাকে। মুখছিদ্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তু মুখগহ্বর বা মুখবিবরে প্রবেশ করে।

মুখপরবর্তী গহ্বরটি মুখগহ্বর। একে ঘিরে এবং এর ভিতরে কয়েকটি অঙ্গ অবস্থিত। এসব অঙ্গের মধ্যে গাল, দাঁত, মাড়ি, জিহ্বা ও তালু প্রধান।

মুখগহ্বরের উর্ধ্বপ্রাচীর তালুর অস্থি ও পেশি দিয়ে, সামনের প্রাচীর ঠোঁটের পেশি দিয়ে এবং পাশের প্রাচীর গালের পেশি নিয়ে গঠিত। তালুর অগ্রভাগ অস্থিনির্মিত ও শক্ত, পশ্চাৎভাগ পেশল ও নরম। কোমল তালুর পিছনের প্রান্তের মধ্যভাগ থেকে একটি পেশল আলজিভ (uvula) মুখগহ্বরে ঝুলে থাকে।

নিম্ন চোয়ালের অস্থির সাথে জিহ্বা যুক্ত থাকে। এর পৃষ্ঠতলে থাকে ফ্লাস্ক আকৃতির স্বাদকুঁড়ি (taste buds)। স্বাদকুঁড়িগুলো খাদ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বস্তুর প্রতি সংবেদনশীল। যেমন-জিহ্বার অগ্রপ্রান্তে মিষ্টি, অগ্রভাগের দুপাশে নোনা, পশ্চাৎভাগের দুপাশে টক (অম্লতা) এবং পিছন দিকে তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করে। ঝাল জাতীয় খাবারের

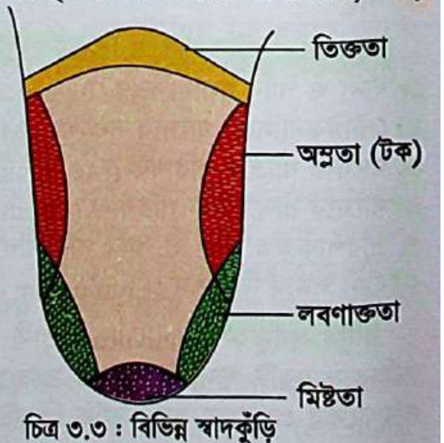

চিত্র ৩.৩ : বিভিন্ন স্বাদকুঁড়ি

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

অন্য কোন স্বাদকুঁড়ি নাই। তবে ঝালজাতীয় খাদ্য জিহ্বায় জ্বালা (irritation) ঘটায়। পাঁচ-দশ দিনের মধ্যে খাদ্যের ঘসায় স্বাদকুঁড়ি নষ্ট বা ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রতিস্থাপিত হয়।

মানুষের মুখগহ্বরের দুপাশে তিনজোড়া **লালাগ্রন্থি** (salivary gland) অবস্থিত। এগুলো হচ্ছে দুপাশের কানের নিচে **প্যারোটিড গ্রন্থি** (parotid gland), নিচের চোয়ালের ভিতর দিকে **সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি** (submandibular gland) এবং জিহ্বার তলায় **সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি** (sublingual gland)। গ্রন্থিগুলো রস ক্ষরণকারী এবং এপিথেলিয়ামে আবৃত গোল বা ডিম্বাকার **থলি** (sac) বিশেষ। থলির প্রাচীরে যে সেরাস কোষ ও মিউকাস কোষ রয়েছে তা থেকে রস ক্ষরিত হয়। লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত **লালা** (saliva) কিছুটা অম্লীয় এবং এর অধিকাংশই পানি (৯৫.৫%-৯৯.৫%)। একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন ১২০০-১৫০০ মিলিলিটার লালা ক্ষরণ করে।

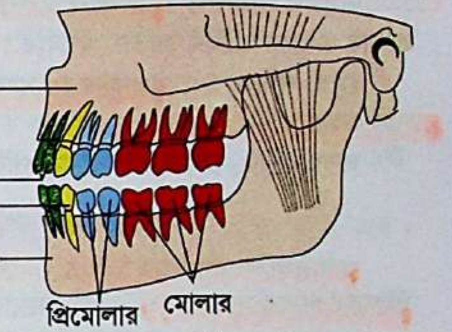

চিত্র ৩. ৪ : মানুষের চোয়ালে দাঁতের বিন্যাস

মুখগহ্বরে খাদ্যবস্তু দুভাবে পরিপাক হয়– যান্ত্রিক (mechanical) ও রাসায়নিক (chemical)।

যান্ত্রিক পরিপাক

- সামান্যতম স্বাদ, গন্ধ ও খাদ্য গ্রহণে স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্ক যে সংকেত পায় তার প্রেক্ষিতে মস্তিষ্ক লালাগ্রন্থিগুলোতে **লালা** ক্ষরণের বার্তা পাঠায়। লালা মূলত পানিতে গঠিত এবং খাদ্যকে এমনভাবে নরম ও মসৃণ করে যাতে দাঁতের কাজ দ্রুত ও সহজ হয়। তাছাড়া গৃহীত খাদ্যে ব্যাকটেরিয়া থাকলে তাও বিনষ্ট হয়।
- চার ধরনের দাঁত যেমন- **ইনসিসর** (Incisor), **ক্যানাইন** (Canine), **প্রিমোলার** (Pre-molar) ও **মোলার** (Molar)-এর নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে বড় খাদ্যখণ্ড কাটা-ছেঁড়া, পেষণ-নিষ্পেষণ শেষে হজম উপযোগী ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হয়।

দন্ত সংকেত (Dental formula) : স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মোট দাঁতের সংখ্যা ও ধরণ যে সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে দন্ত সংকেত বা **ডেন্টাল ফর্মুলা** বলে। মানুষের চোয়ালে চার ধরনের দাঁত থাকে। একটি সরল রেখার উপর ও নিচে বিভিন্ন প্রকার দাঁতের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর লিখে ঐ ধরনের দাঁত প্রতি চোয়ালের অর্ধাংশে কয়টি আছে তা লেখা হয়। এরপর প্রতি চোয়ালের অর্ধাংশের মোট দাঁতের সংখ্যাকে ২ দিয়ে গুণ করে উভয় চোয়ালের দাঁতের সংখ্যা যোগ করলে মোট দাঁতের সংখ্যা পাওয়া যায়। এ নিয়ম অনুযায়ী মানুষের দন্ত সংকেত হচ্ছে:

$$\frac{I_2C_1P_2M_3}{I_2C_1P_2M_3} = \frac{8 \times 2}{8 \times 2} = 16 + 16 = 32$$

- জিহ্বা নড়া-চড়া ও সংকোচন-প্রসারণক্ষম পেশল অংশ। এটি স্বাদ নেয়া ছাড়াও দাঁতে আটকে থাকা খাদ্যকণা সরাতে, মুখের চারপাশে ঘুরিয়ে বিভিন্ন দাঁতের নিচে পৌঁছাতে, লালা মিশ্রণে এবং সবশেষে গিলতে সাহায্য করে।
- যান্ত্রিক পরিপাকের সময় খাদ্যখণ্ড নিষ্পেষিত হয়ে নরম **খাদ্যমণ্ড** (bolus)-তে পরিণত হয়। জিহ্বার উপরতল যখন খাদ্যমণ্ডকে **শক্ত তালুর** (hard palate) বিপরীতে রেখে চাপ দেয় তখন খাদ্যমণ্ড পেছন দিকে যেতে বাধ্য হয়।
- পেছনে **কোমল তালু** (soft palate) থাকায় খাদ্যমণ্ড নাসাছিদ্রপথে প্রবেশে বাধা পায়।
- কোমল তালু পার হলেই খাবার গলবিলে এসে পৌঁছায়। গলবিল থেকে দুটি নালি চলে গেছে– একটি **শ্বাসনালি** (trachea), অন্যটি **অন্ননালি** (oesophagus)।
- জিহ্বার গোড়ার দিকে শ্বাসনালির অংশে ছোট উদগত অংশ হিসেবে অবস্থিত **এপিগ্লটিস** (epiglottis) অন্ননালির উপর এমন এক উর্ধ্বগামী বলপ্রয়োগ করে যাতে চিবানো খাদ্য শ্বাসনালির ভিতর প্রবেশ না করে অন্ননালির ভিতর প্রবেশ করে।

রাসায়নিক পরিপাক

শর্করা পরিপাক : লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসে **টায়ালিন** ও **মল্টেজ** (অল্প) নামে শর্করাবিশ্লেষী এনজাইম পাওয়া যায়। এগুলো জটিল শর্করাকে মল্টোজ এবং সামান্য মল্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে। টায়ালিনের ক্রিয়া মুখগহ্বরে শুরু হলেও এর পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয় পাকস্থলিতে।

১. জটিল শর্করা $\xrightarrow{\text{টায়ালিন}}$ মল্টোজ। ২. মল্টোজ $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

আমিষ পরিপাক : মুখগহ্বরের লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসে প্রোটিওলাইটিক (আমিষ বিশ্লেষী) এনজাইম না থাকায় এখানে আমিষ জাতীয় খাদ্যের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেনা।

স্নেহ পরিপাক : মুখগহ্বরে স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাকের জন্য কোন এনজাইম না থাকায় এধরনের খাদ্যের পরিপাকও ঘটেনা।

লালামিশ্রিত, চর্বিত ও আংশিক পরিপাককৃত শর্করা গলবিল ও অন্ননালির মাধ্যমে পাকস্থলিতে পৌঁছায়।

পাকস্থলিতে খাদ্য পরিপাক (Digestion of Food in Stomach)

পাকস্থলিটি ডায়াফ্রামের নিচে উদরের উপরের অংশে অবস্থিত প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৫ সেন্টিমিটার চওড়া বাঁকানো থলির মতো অংশ। এটি নিম্নোক্ত কয়েকটি অংশে বিভক্ত –

i. যে অংশে অন্ননালি উন্মুক্ত হয় তা কার্ডিয়া (cardia)।

ii. কার্ডিয়ার বাম পাশে পাকস্থলি-প্রাচীর যা গম্বুজাকার ধারণ করে তা ফানডাস (fundus)।

iii. ডান অবতল ও বাম উত্তল কিনারা যথাক্রমে ছোট ও বড় বাঁক (lesser and greater curvatures)।

iv. যে অংশটি ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়েছে তা পাইলোরাস (pylorus) নামে পরিচিত।

কার্ডিয়াক ও পাইলোরিক অংশে একটি করে বৃত্তাকার পেশিবলয় আছে। বলয়দুটি যথাক্রমে কার্ডিয়াক ও পাইলোরিক স্ফিংক্টার।

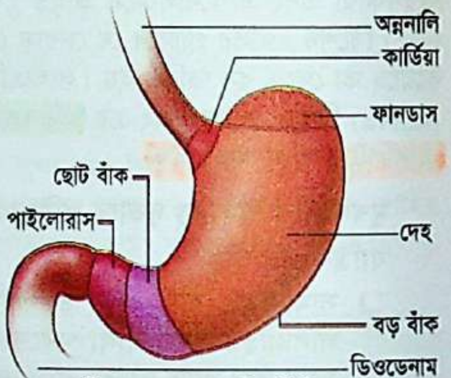

চিত্র ৩.৫ : পাকস্থলির বিভিন্ন অংশ

যান্ত্রিক পরিপাক

- মুখ থেকে চর্বিত খাদ্য অন্ননালিপথে পাকস্থলিতে এসে ২-৬ ঘন্টাকাল অবস্থান করে।
- এসময় প্যারাইটাল কোষ থেকে HCl ক্ষরিত হয়ে খাদ্য বাহিত অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে দেয়।
- মসৃণ পেশির ৩টি স্তর নিয়ে পাকস্থলি গঠিত। পেশিস্তর বিভিন্ন দিকমুখি হওয়ায় পাকস্থলি প্রাচীর নানাদিকে সঞ্চালিত হয়ে (মোচড় দিয়ে, সংকুচিত হয়ে কিংবা চাপা হয়ে) মুখগহ্বর থেকে আসা অর্ধচূর্ণ খাদ্যকে পিষে পেস্ট (paste)-এ পরিণত করে।
- এসময় গ্যাস্ট্রিক জুস (gastric juice) ক্ষরিত হয়ে পাকস্থলির যান্ত্রিক চাপে পিষ্ট খাদ্যের সঙ্গে মিশে ঘন স্যুপের মতো মিশ্রণে পরিণত হয়। খাদ্যের এ অবস্থা কাইম (chyme) বা মন্ড নামে পরিচিত। এর উপর গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত বিভিন্ন এনজাইমের পরিপাক কাজ শুরু হয়ে যায়।

রাসায়নিক পরিপাক

পাকস্থলির প্রাচীর পেশিবহুল এবং গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (gastric gland) সমৃদ্ধ। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এক ধরনের নলাকার গ্রন্থি এবং চার ধরনের কোষে গঠিত। প্রত্যেক ধরনের কোষের ক্ষরণ আলাদা। সম্মিলিতভাবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির ক্ষরণকে ''গ্যাস্ট্রিক জুস'' বলে। এর ৯৯.৪৫%ই পানি। গ্যাস্ট্রিন (gastrin) নামক হরমোন এ জুস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

শর্করা পরিপাক : পাকস্থলি থেকে শর্করাবিশ্লেষী কোন এনজাইম নিঃসৃত হয় না। ফলে শর্করা জাতীয় খাদ্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

আমিষ পরিপাক : গ্যাস্ট্রিক জুসে পেপসিনোজেন ও প্রোরেনিন নামক নিষ্ক্রিয় প্রোটিওলাইটিক (আমিষ বিশ্লেষী) এনজাইম থাকে। এ দুটি নিষ্ক্রিয় এনজাইম গ্যাস্ট্রিক জুসের HCl-এর সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে পেপসিন ও রেনিন নামক সক্রিয় এনজাইমে পরিণত হয়। পেপসিন অম্লীয় মাধ্যমে জটিল আমিষের আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটিয়ে প্রোটিওজ ও পেপটোন-এ পরিণত করে। রেনিন দুগ্ধ আমিষ কেসিনকে প্যারাকেসিনে পরিণত করে।

১. আমিষ + পানি $\xrightarrow{\text{পেপসিন}}$ প্রোটিওজ + পেপটোন

২. কেসিন (দুগ্ধ আমিষ)+ পানি $\xrightarrow{\text{রেনিন}}$ প্যারাকেসিন

৩. প্যারাকেসিন $\xrightarrow{\text{পেপসিন}}$ পেপটোন

স্নেহ পরিপাক : অম্লীয় মাধ্যমে স্নেহ বিশ্লিষ্টকারী এনজাইম কাজ করতে পারে না কিন্তু পাকস্থলিতে গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ নামক খুব দুর্বল স্নেহ বিশ্লিষ্টকারী এনজাইম থাকে। লাইপোলাইটিক (স্নেহ বিশ্লিষ্টকারী) এনজাইমের মধ্যে এরা ব্যতিক্রম এ অর্থে যে, এগুলো একমাত্র অম্লীয় মাধ্যমে কাজ করতে সক্ষম। এ এনজাইমটি কেবল মাখনের চর্বির (butter fat) উপর কাজ করে বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

অর্ধপাচিত এ খাদ্য ধীরে ধীরে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। পাকস্থলির পাইলোরিক প্রান্তে অবস্থিত স্ফিংক্টার (sphincter = পেশির বেড়ী যা ছিদ্রপথকে বেষ্টন করে থাকে) পাকস্থলি থেকে ডিওডেনামে খাদ্যের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

পাকস্থলি নিজেই এনজাইম দ্বারা পরিপাক হয়ে যায় না। কারণ–

পাকস্থলির সমগ্র অন্তর্গাত্র গ্যাস্ট্রিক মিউকোসা (এপিথেলিয়াল আবরণ)-য় আবৃত। এ আবরণ HCl, মিউকাস, বিভিন্ন প্রোএনজাইম ও বাইকার্বোনেট ক্ষরণ করে। পাকস্থলি যেন নিজেই হজম হয়ে না যায় সেকারণে নিম্নোক্ত ৪টি প্রক্রিয়া ঘটতে দেখা যায় :

১. পাকস্থলির অন্তর্গাত্র থেকে নিঃসৃত পুরু মিউকাস স্তর HCl এর আক্রমণ রোধকারী ভৌত প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।
২. পাকস্থলির অন্তর্গাত্র থেকে ক্ষরিত বাইকার্বনেট প্রকৃতপক্ষে একটি বেস এবং এটি HCl কে প্রশমিত করে।
৩. এনজাইম পেপসিন প্রথমে পেপসিনোজেন নামক প্রোএনজাইম হিসেবে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ক্ষরিত হয়। HCl এর সংস্পর্শে এলে এটি সক্রিয় পেপসিনে পরিণত হয়।
৪. পাকস্থলির অন্তঃস্থ এপেথেলিয়ামের কোষগুলো ঘন সংলগ্ন থাকায় ও দৃঢ় সংবদ্ধ থাকায় HCl কিছুতেই এপিথেলিয়ামের ক্ষতি করতে পারেনা।

এভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় পাকস্থলির প্রোটিন নির্মিত অন্তঃপ্রাচীর কখনওই নিজের ক্ষরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। তবে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়ার (*Helicobacter pylori*) সংক্রমণে কিংবা NSAID ধরনের ওষুধের প্রভাবে পাকস্থলিতে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে যা গ্যাস্ট্রিক আলসার নামে বহুল পরিচিত।

ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক (Digestion of Food in Small Intestine)

পাকস্থলির পাইলোরিক স্ফিংক্টারের পর থেকে বৃহদন্ত্রের সূচনায় ইলিওকোলিক স্ফিংক্টার (iliocolic sphincter) পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৬-৭ মিটার লম্বা, প্যাঁচানো অংশকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলে। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা **ডিওডেনাম** (duodenum), **জেজুনাম** (jejunum) এবং **ইলিয়াম** (ileum)। ডিওডেনাম হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ যা দেখতে "U"-আকৃতির ও ২৫-৩০ সেন্টিমিটার লম্বা। জেজুনাম মধ্যাংশ, লম্বায় আড়াই মিটার। শেষ অংশটি ইলিয়াম যা ক্ষুদ্রান্ত্রের তিন-পঞ্চমাংশ গঠন করে।

সব ধরনের খাদ্যের চূড়ান্ত পরিপাক ক্ষুদ্রান্ত্রেই সংঘটিত হয়। খাদ্যের উপর তিন ধরনের রস, যেমন-**পিত্তরস** (bile), **অগ্ন্যাশয় রস** (pancreatic juice) ও **আন্ত্রিক রস** (intestinal juice) ক্রিয়াশীল।

যান্ত্রিক পরিপাক

- আন্ত্রিক রসের মিউসিনের ক্রিয়ায় ক্ষুদ্রান্ত্রে অবস্থিত খাদ্যবস্তু পিচ্ছিল হয়ে স্থানান্তরিত হয়।
- **ব্রুনার্স গ্রন্থি** (brunner's gland) ও **গবলেট কোষ** (goblet cell) থেকে মিউকাস উৎপন্ন হয়। মিউকাস ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরকে এনজাইমের কার্যকারিতা থেকে রক্ষা করে।
- পিত্তরস পরোক্ষভাবে অন্ত্রে জীবাণুর কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়।
- পিত্তলবণগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রের পেশির ক্রমসংকোচন বাড়িয়ে বৃহদন্ত্রের দিকে খাদ্যের গতি বৃদ্ধি করে।
- **কোলেসিস্টোকাইনিন** (cholecystokinin) নামক হরমোন পিত্তাশয়ের সংকোচন ঘটিয়ে পিত্তাশয়ে সঞ্চিত পিত্তরস ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছে দেয়।
- পিত্তলবণ স্নেহদ্রব্যকে অবদ্রবণের মাধ্যমে (emulsification) সাবানের ফেনার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে।

রাসায়নিক পরিপাক

পাকস্থলি থেকে আগত অম্লীয় কাইম (chyme) অর্ধ-পাচিত শর্করা ও আমিষ এবং প্রায় অপরিপাককৃত স্নেহদ্রব্য নিয়ে গঠিত। কাইম ক্ষুদ্রান্ত্রের গহ্বরে পৌঁছালে অন্ত্রের প্রাচীর থেকে এন্টেরোকাইনিন (enterokinin), সিক্রেটিন (secretin) ও কোলেসিস্টোকাইনিন (cholecystokinin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। এসব হরমোনের প্রভাবে পিত্তথলি, অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে যথাক্রমে পিত্তরস, অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রস নিঃসৃত হয়।

পিত্তরস ক্ষার জাতীয় তরল পদার্থ। এতে কোন এনজাইম থাকে না। পিত্তরসের সোডিয়াম বাইকার্বোনেট উপাদানটি পাকস্থলি থেকে আগত HCl-কে প্রশমিত করে অন্ত্রের অভ্যন্তরে একটি ক্ষারীয় মাধ্যম তৈরি করে যা ক্ষুদ্রান্ত্রে বিভিন্ন এনজাইমের কার্যকারিতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

শর্করা পরিপাক

অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত রসে শর্করা পরিপাকের জন্য নিচে বর্ণিত এনজাইমগুলো ক্রিয়াশীল হয়।

১. অ্যামাইলেজ এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন জাতীয় জটিল শর্করাকে মল্টোজে পরিণত করে।

$$\text{স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন} \xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}} \text{মল্টোজ।}$$

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজ জাতীয় শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

মল্টোজ $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ।

আন্ত্রিক রসে শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাককারী নিম্নোক্ত এনজাইমগুলো ক্রিয়াশীল থাকে:

১. আন্ত্রিক **অ্যামাইলেজ** স্টার্চ, ডেক্সট্রিন প্রভৃতি পলিস্যাকারাইডকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ ও ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিন উৎপন্ন করে।

স্টার্চ, ডেক্সট্রিন + H_2O $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ, ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিন।

২. **আইসোমল্টেজ** এনজাইম আইসোমল্টোজ জাতীয় শর্করাকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মল্টোজ ও গ্লুকোজ উৎপন্ন করে।

আইসোমল্টোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{আইসোমল্টেজ}}$ মল্টোজ + গ্লুকোজ।

৩. **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজকে বিশ্লিষ্ট করে গ্লুকোজ তৈরি করে।

মল্টোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ মল্টোজ + গ্লুকোজ।

৪. **সুক্রেজ** এনজাইম সুক্রোজ নামক ডাইস্যাকারাইডকে ভেঙে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফ্রুক্টোজ সৃষ্টি করে।

সুক্রোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{সুক্রেজ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ।

৫. **ল্যাক্টেজ** এনজাইম দুধের ল্যাক্টোজ নামক ডাই-স্যাকারাইডকে ভেঙে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু গ্যালাক্টোজে পরিণত করে।

ল্যাক্টোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{ল্যাক্টেজ}}$ গ্লুকোজ + গ্যালাক্টোজ।

আমিষ পরিপাক

অগ্ন্যাশয় রসে অবস্থিত এনজাইম আমিষ জাতীয় খাদ্যের উপর নিম্নোক্তভাবে ক্রিয়াশীল হয়।

১. **ট্রিপসিন** এনজাইম নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনরূপে ক্ষরিত হয়। ডিওডেনামের মিউকোসা নিঃসৃত **এন্টেরোকাইনেজ** এনজাইমের সহায়তায় এটি সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত হয়। ট্রিপসিন প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষকে ভেঙ্গে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

প্রোটিওজ ও পেপটোন $\xrightarrow{\text{ট্রিপসিন}}$ পলিপেপটাইড।

২. **কাইমোট্রিপসিন** নিষ্ক্রিয় কাইমোট্রিপসিনোজেনরূপে ক্ষরিত হয়। পরে ট্রিপসিনের ক্রিয়ায় এটি সক্রিয় কাইমোট্রিপসিনে পরিণত হয়। এটি প্রোটিওজ ও পেপটোনকে ভেঙে পলিপেপটাইডে পরিণত হয়।

প্রোটিওজ ও পেপটোন $\xrightarrow{\text{কাইমোট্রিপসিন}}$ পলিপেপটাইড।

৩. **কার্বোক্সিপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজকে সরল পেপটাইড (ডাইপেপটাইড) ও অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{কার্বোক্সিপেপটাইডেজ}}$ ডাইপেপটাইড + অ্যামিনো এসিড।

৪. **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{অ্যামিনোপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৫. **ট্রাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

ট্রাইপেপটাইড $\xrightarrow{\text{ট্রাইপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৬. **ডাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ডাইপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

ডাইপেপটাইড $\xrightarrow{\text{ডাইপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৭. **কোলাজিনেজ** এনজাইম মাছ ও মাংসে বিদ্যমান কোলাজেন জাতীয় প্রোটিনকে সরল পেপটাইডে রূপান্তরিত করে।

কোলাজেন $\xrightarrow{\text{কোলাজিনেজ}}$ সরল পেপটাইড।

৮. **ইলাস্টেজ** এনজাইম যোজক টিস্যুর প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেঙে পেপটাইড উৎপন্ন করে।

ইলাস্টিন $\xrightarrow{\text{ইলাস্টেজ}}$ পেপটাইড।

আন্ত্রিক রসে আমিষ পরিপাককারী এনজাইম **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{অ্যামিনোপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

স্নেহ পরিপাক

স্নেহ পরিপাকে **পিত্তরস** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পিত্তরসে কোন এনজাইম থাকে না। পিত্তরসে অবস্থিত পিত্তলবণ, যেমন- **সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট** (sodium glycocholate) ও **সোডিয়াম টরোকোলেট** (sodium taurocholate) স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে। এ প্রক্রিয়াকে **অবদ্রবণ** বা **ইমালসিফিকেশন** (emulsification) বলে।

অগ্ন্যাশয় রসে স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম স্নেহকণা পরিপাকে নিম্নোক্তভাবে ক্রিয়াশীল হয়:

১. **লাইপেজ** নামের এনজাইম স্নেহকণাকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

স্নেহকণা $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল।

২. **ফসফোলাইপেজ** এনজাইম ফসফোলিপিডকে ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল ও ফসফোরিক এসিডে পরিণত করে।

ফসফোলিপিড $\xrightarrow{\text{ফসফোলাইপেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল + ফসফোরিক এসিড।

৩. **কোলেস্টেরল এস্টারেজ** এনজাইম কোলেস্টেরল এস্টারের উপর ক্রিয়াশীল হয়ে ফ্যাটি এসিড ও কোলেস্টেরল উৎপন্ন করে।

কোলেস্টেরল এস্টার $\xrightarrow{\text{কোলেস্টেরল এস্টারেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + কোলেস্টেরল।

আন্ত্রিক রসে নিম্নলিখিত স্নেহ পরিপাককারী এনজাইম ক্রিয়াশীল হয় :

১. **লাইপেজ** এনজাইম পিত্তলবণের প্রভাবে স্নেহকণায় পরিণত হওয়া লিপিডকে আর্দ্রবিশিষ্ট করে মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিড উৎপন্ন করে। পরবর্তীতে তা ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে রূপান্তরিত হয়।

স্নেহকণা $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ মনোগ্লিসারাইড + ফ্যাটি এসিড।

২. **লেসিথিনেজ** এনজাইম লেসিথিনকে ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল, ফসফরিক এসিড ও কোলিনে পরিণত করে।

লেসিথিন $\xrightarrow{\text{লেসিথিনেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল + ফসফরিক এসিড + কোলিন।

৩. **মনোগ্লিসারাইডেজ** কোষের ভিতরে মনোগ্লিসারাইডকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

মনোগ্লিসারাইড $\xrightarrow{\text{মনোগ্লিসারাইডেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল।

এছাড়াও আন্ত্রিক গ্রন্থির নিউক্লিয়েডেজ, নিউক্লিওটাইডেজ ও নিউক্লিওসাইডেজ এনজাইমসমূহ নিউক্লিক এসিড ও এর উপাদানগুলোকে ফসফেট গ্রুপ, পেন্টোজ শ্যুগার ও নাইট্রোজেন বেস-এ বিশ্লিষ্ট করে।

পরিপাক গ্রন্থির ভূমিকা (Role of Digestive Glands)

পৌষ্টিকতন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন রস নিঃসৃত হয়ে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে সেগুলোকে **পৌষ্টিকগ্রন্থি** বা **পরিপাক গ্রন্থি** বলে। মানবদেহে পাঁচ ধরনের পৌষ্টিকগ্রন্থি রয়েছে, যথা- **লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থি**। এসব গ্রন্থির মধ্যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি পাকস্থলির প্রাচীরে এবং আন্ত্রিক গ্রন্থি অন্ত্রের প্রাচীরে অবস্থান করে। অন্য গ্রন্থিগুলো পৌষ্টিকনালির বাইরে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্র গঠনবিশিষ্ট। নিচে বিভিন্ন পৌষ্টিকগ্রন্থির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. লালাগ্রন্থি (Salivary glands)

মানুষের মুখগহ্বরের দুপাশে নিচে বর্ণিত তিনজোড়া লালাগ্রন্থি অবস্থিত। এগুলো হচ্ছে –

ক. প্যারোটিড গ্রন্থি (Parotid gland) : এগুলো সবচেয়ে বড় লালাগ্রন্থি। প্রতি কানের নিচে রয়েছে একটি করে মোট দুটি প্যারোটিড গ্রন্থি। প্রত্যেক গ্রন্থি থেকে একটি নালি বেরিয়ে দ্বিতীয় উর্ধ্বমোলার দাঁতের বিপরীতে মুখগহ্বরে উন্মুক্ত হয়।

খ. সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি (Submandibular gland) : প্রতি ম্যান্ডিবল বা নিম্ন চোয়ালের কৌণিক অঞ্চলের নিচে একটি করে মোট একজোড়া সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি বিদ্যমান। এ গ্রন্থির নালি জিহ্বার নিচে **ফ্রেনুলাম** (frenulum) নামক বিশেষ ত্বকের পাশে উন্মুক্ত হয়।

চিত্র ৩.৬ : মানুষের লালাগ্রন্থিসমূহ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

গ. সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি (Sublingual gland) : জিহ্বার নিচে অবস্থান করে একজোড়া সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি। এদের নালি জিহ্বার নিচে ফ্রেনুলামে উন্মুক্ত হয়।

লালা (Saliva) : লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে লালা বা লালারস বলে। একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক ১২০০ – ১৫০০ মিলি লিটার লালা ক্ষরণ করে। লালা সামান্য অম্লীয়, ফলে মুখগহ্বরে সবসময় p^H 6.2-7.4 মাত্রায় আম্লিক অবস্থা বিরাজ করে।

লালার উপাদান (Composition of saliva)

১. **পানি:** ৯৫.৫% – ৯৯.৫%।

২. **কোষীয় উপাদান :** ঈস্ট, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, লিউকোসাইট, এপিথেলিয়াল কোষ ইত্যাদি।

৩. **গ্যাস :** প্রতি ১০০ মিলি লালায় ১ মিলি অক্সিজেন, ২৫ মিলি নাইট্রোজেন এবং ৫০ মিলি কার্বন ডাইঅক্সাইড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

৪. **অজৈব পদার্থ :** প্রায় ০.২%; সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট ইত্যাদি।

৫. **জৈব পদার্থ:** প্রায় ০.৩%; এনজাইম (টায়ালিন, লাইপেজ, কার্বনিক এনহাইড্রেজ, ফসফেটেজ, ব্যাকটেরিও-লাইটিক এনজাইম ইত্যাদি), মিউসিন, ইউরিয়া, অ্যামিনো এসিড, কোলেস্টেরল, ভিটামিন, অ্যান্টিজেন, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি।

লালার কাজ (Functions of saliva)

i. লালার অধিকাংশই পানি। খাদ্যের স্বাদ অনুভব এবং পরিপাকের সময় বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য পানি খাদ্যের দ্রাবক হিসেবে খাদ্যকে ভিজিয়ে নরম করে। পানি মুখ অভ্যন্তরকেও আর্দ্র করে, ফলে স্বাদ অনুভবসহ খাদ্য চিবানো ও গিলতে সুবিধা হয়। জিহ্বার স্বাদকুঁড়িগুলো শুকনো খাদ্যে প্রভাবিত হয় না। লালায় ভিজে খাদ্যকণা মুক্ত হলে তা থেকে স্বাদকুঁড়িগুলো অনুভূতি গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্যের স্বাদ উপলব্ধি সম্ভব হয়।

ii. মুখ, জিহ্বা ও ঠোঁট লালায় সিক্ত থাকার কারণে কথা বলতে সহজ হয়। ভয়, উত্তেজনা ইত্যাদি সময়ে কিংবা অসুখের সময় লালাক্ষরণ কমে যায়। তখন কথা বলতে অসুবিধা হয়।

iii. মিউসিন নামক গ্লাইকোপ্রোটিন খাদ্যের সঙ্গে মিশে পিচ্ছিল খাদ্যকে দলায় পরিণত করে। লালা খাদ্য চর্বণ এবং গলাধঃকরণে সহায়ক। এসিড ও বেসকে প্রশমন (বাফার) করতেও এটি সাহায্য করে।

iv. **ক্লোরাইড** (Chloride) : স্যালিভারি অ্যামাইলেজকে সক্রিয় করে।

v. **স্যালিভারি অ্যামাইলেজ বা টায়ালিন এনজাইম** (Salivary amylase or Ptyaline): রান্না করা স্টার্চের পলিস্যাকারাইডকে ভেঙ্গে মলটোজ এবং ডেক্সট্রিন নামক ডাইস্যাকারাইডে পরিণত করে।

vi. **বাইকার্বনেট** (Bicarbonate) : লালার অম্লতা p^H 6.2 – 7.4 এর মধ্যে বজায় রাখতে সাহায্য করে। এটি বাফার (buffer) হিসেবে কাজ করে। ফলে মুখে সৃষ্ট এসিডের শক্তি কমিয়ে রাখার মাধ্যমে দাঁতের এনামেল ক্ষয় রোধ করে।

vii. **লাইসোজাইম এনজাইম** (Lysozyme enzyme) : গৃহীত খাদ্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের মাধ্যমে দাঁতকে রক্ষা করে।

viii. **ইম্যুনোগ্লোবুলিন** (Immunoglobulin) : লালা হচ্ছে এন্টিব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমের অংশ।

ix. লালা সামগ্রিকভাবে মুখ অভ্যন্তর এবং দাঁত থেকে কোষীয় ও খাদ্যের ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করে, এবং মুখের নরম অংশের সংবেদনশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

২. যকৃত (Liver)

অবস্থান : যকৃত উদর-গহ্বরের উপরভাগে ডানদিকে ডায়াফ্রামের ঠিক নিচে ডিওডেনাম ও ডান বৃক্কের উপরদিকে পাকস্থলির ডান পাশে অবস্থিত।

গঠন : যকৃত মানবদেহের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষে এর ওজন প্রায় ১.৫–২.০০

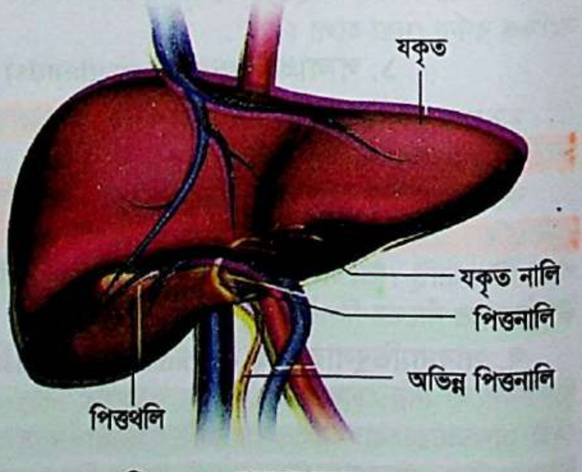

চিত্র ৩.৭ : মানুষের যকৃত

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কেজি। ডান, বাম, কোয়াড্রেট ও কডেট নামে ৪টি অসম্পূর্ণ খণ্ড নিয়ে যকৃত গঠিত। খণ্ডগুলো স্থিতিস্থাপক তন্তুসমৃদ্ধ ক্যাপসুলে আবৃত। ডান খণ্ডটি সবচেয়ে বড়। যকৃতের নিচের পিঠে **পিত্তথলি** (gall bladder) সংলগ্ন থাকে। প্রত্যেক খণ্ড বহুভূজাকার কোষে গঠিত। কোষগুলো একেকটি ক্ষুদ্র অণুখণ্ড নির্মাণ করে। প্রত্যেক অণুখণ্ডের কেন্দ্রে থাকে **কেন্দ্রীয় শিরা** (central vein)। যকৃত কোষগুলো চাকার স্পোকের মতো বিন্যস্ত। কোষগুলোর গা বেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **সাইনুসয়েড** (sinusoid) ও **পিত্তনালিকা** প্রসারিত হয়। পিত্তনালিকাগুলো পিত্তনালিতে গিয়ে শেষ হয়। যকৃত থেকে আসা ডান ও বাম যকৃত নালি মিলে একটি **অভিন্ন যকৃত নালি** গঠন করে। এটি পিত্তনালির সাথে মিলিত হয়ে **অভিন্ন পিত্তনালি** গঠন করে যা **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার** (ampulla of vater) নামে নালির মাধ্যমে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়।

যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা (Storage & Metabolic Role of Liver)

মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হচ্ছে যকৃত যা দেহের ওজনের প্রায় ৩–৫%। এটি মূলত পরিবর্তনশীল বাহ্যিক অবস্থা সত্ত্বেও দেহের অভ্যন্তরীণ স্থিতি বা সাম্য রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যকৃতে নানা ধরনের জৈব রাসায়নিক (bio-chemical) বিক্রিয়া সংঘটিত হয় যা দেহের **বিপাক** (metabolism) ক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ জন্য একে মানবদেহের জৈব রসায়নাগার (organic laboratory) বলা হয়। যকৃত প্রায় পাঁচ শতাধিক জৈবনিক কাজ সম্পন্ন করে থাকে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। নিচে যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

যকৃতের সঞ্চয়ী ভূমিকা (Storage functions of Liver)

নিচে যকৃতের সঞ্চয়ী ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. গ্লাইকোজেন সঞ্চয় (Storage of Glycogen) : ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে গ্লুকোজ যকৃতে প্রবেশ করে। রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজ **গ্লাইকোজেনেসিস** (glycogenesis) প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোজেন-এ রূপান্তরিত হয়ে যকৃতের সঞ্চয়ী কোষে জমা থাকে। **ইনসুলিন** (insulin) নামক হরমোন এ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। প্রয়োজনে এ গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা ঠিক রাখে।

২. রক্ত সঞ্চয় (Blood reservoir) : প্লীহা ও অন্ত্র থেকে বেরিয়ে রক্তবাহিকাগুলো মিলিত হয়ে **হেপাটিক পোর্টাল শিরা** গঠন করে। যকৃতের ভিতর দিয়ে রক্ত যদিও অনবরত প্রবাহিত হয় তারপরও এর রক্তবাহিকাগুলোসহ এ শিরা বিপুল পরিমাণ **রক্তের ভান্ডার** (reservoir) হিসেবে কাজ করে। যকৃত প্রায় ১৫০০ ঘন সে.মি. পর্যন্ত রক্ত সঞ্চয় করে রাখতে পারে যা দেহের বিভিন্ন রক্তক্ষরণজনিত ঘটনায় মূল রক্তসংবহনের সাথে মিলিত হয়ে রক্তচাপের সমন্বয় ঘটায়।

৩. ভিটামিন সঞ্চয় (Storage of Vitamins) : যকৃত স্নেহে (fat) দ্রবণীয় ভিটামিনসমূহ (A, D, E, K), পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (B ও C), সায়ানো কোবালামিন (B_{12}) এবং ফলিক এসিড সঞ্চয় করে। B_{12} এবং ফলিক এসিড অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকা তৈরিতে প্রয়োজন হয়।

৪. পিত্তরস তৈরি (Production of Bile) : যকৃত কর্তৃক উৎপন্ন **পিত্তরস** (bile) যকৃতের ডান খন্ডাংশের নিচে অবস্থিত পিত্তথলিতে (gall bladder) জমা থাকে।

৫. চর্বি ও অ্যামিনো এসিড সঞ্চয় (Storage of Fat & Amino acid) : যে শর্করা (গ্লুকোজ) দেহে ব্যবহৃত হতে পারে না বা গ্লাইকোজেন হিসেবে সঞ্চিত থাকে না, যকৃত সেই অতিরিক্ত গ্লুকোজকে চর্বিতে পরিণত করে জমা রাখে। যকৃত অ্যামিনো এসিডও জমা রাখে। দেহের প্রয়োজনে চর্বি এবং অ্যামিনো এসিড ব্যবহারযোগ্য গ্লুকোজে পরিবর্তিত হয়।

৬. মিনারেল সঞ্চয় (Storage of Mineral) : যকৃত লৌহ ও পটাসিয়াম সঞ্চয় করে। লোহিত রক্ত কণিকার ভাঙনে হিমোগ্লোবিন যকৃতের **কাপফার** (Kupffer) কোষের মাধ্যমে **হিম** (haem) ও **গ্লোবিন** (globin)-এ পরিণত হয়। হিমের লৌহ অংশ **ফেরিটিন** (ferritin) হিসেবে যকৃতে জমা থাকে। এছাড়াও কপার, জিঙ্ক, কোবাল্ট ইত্যাদি মিনারেল স্বল্পমাত্রায় যকৃতে সঞ্চিত থাকে।

যকৃতের বিপাকীয় ভূমিকা (Metabolic functions of Liver)

যকৃতে নিচে বর্ণিত বিপাকীয় কার্যাবলী সংঘটিত হয়।

১. শর্করা বিপাক (Carbohydrate Metabolism) : যকৃতে শর্করার বিপাককে নিচে বর্ণিত উপায়ে ব্যাখ্যা করা হয়।

- **গ্লাইকোজেনেসিস** (Glycogenesis) : অন্ত্র থেকে হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে চিনি (যেমন–গ্লুকোজ) যকৃতে প্রবেশ করে। এ শিরাটি বিভিন্ন মাত্রায় চিনি বহনকারী একমাত্র রক্তবাহিকা। শর্করা বিপাকে যকৃতই দেহে গ্লুকোজ লেভেল প্রতি ১০০ ঘন সেন্টিমিটারে ৯০ মিলিগ্রাম গ্লুকোজ হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করে। যে ধরনের

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

খাবারই গ্রহণ করা হোক না কেন রক্তে গ্লুকোজ লেভেল যেন না বাড়ে বা কমে, যকৃত তা প্রতিরোধ করে। গ্যালাকটোজ, ফ্রুকটোজসহ সমস্ত হেক্সোজ চিনিকে যকৃত গ্লুকোজে পরিবর্তিত করে গ্লাইকোজেন (glycogen) নামক অদ্রবণীয় পলিস্যাকারাইড হিসেবে সঞ্চিত রাখে। গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন রূপান্তর প্রক্রিয়াটিকে গ্লাইকোজেনেসিস বলে। প্রক্রিয়াটি ইনসুলিনের উপস্থিতিতে উদ্দীপ্ত হয়। ইনসুলিন (insulin) হচ্ছে রক্তে চিনির লেভেল বেড়ে গেলে তার প্রতি সাড়া হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (islets of Langerhans) থেকে উৎপন্ন হরমোন।

- **গ্লুকোনিওজেনেসিস** (Gluconeogenesis) : গ্লুকোজের চাহিদার প্রেক্ষিতে যদি যকৃতে গ্লাইকোজেনের ঘাটতি পড়ে তখন ননকার্বোহাইড্রেট উৎস যেমন অ্যামিনো এসিড ও গ্লিসারল প্রভৃতি থেকে গ্লুকোজ সংশ্লেষিত হওয়ায় এ প্রক্রিয়াকে **গ্লুকোনিওজেনেসিস** বলে।

২. **প্রোটিন বিপাক** (Protein Metabolism) : প্রোটিন বিপাকে যকৃত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব ভূমিকাকে নিচে বর্ণিত চারটি শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

- **ডিঅ্যামিনেশন** (Deamination) : কোন অ্যামিনো এসিড বা অন্য উপাদান থেকে অ্যামিনো গ্রুপের অপসারণ প্রক্রিয়াকে ডিঅ্যামিনেশন বলে। খাদ্যের সঙ্গে গৃহীত অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড দেহ জমিয়ে রাখতে পারে না। যকৃত অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত অ্যামিনো এসিড ডিঅ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে কিটো এসিড ও অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) তৈরি করে। কিটো এসিড শক্তি উৎপাদনের জন্য ক্রেবস চক্রে প্রবেশ করে। অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এর সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া (NH_3) সৃষ্টি হয়।
- **ইউরিয়া তৈরি** (Urea formation) : অ্যামোনিয়া অত্যন্ত বিষাক্ত ক্ষতিকর যা দেহে সঞ্চিত হলে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। যকৃতে অরনিথিন চক্রে (Ornithine cycle) শর্করা বিপাকে সৃষ্ট CO_2 এর সাথে অ্যামোনিয়া যুক্ত হয়ে ইউরিয়া সৃষ্টি করে। ইউরিয়া রক্তবাহিত হয়ে বৃক্ক হতে মূত্ররূপে দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়।
- **প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষ** (Synthesis of plasma proteins) : যকৃত γগ্লোবিউলিন ছাড়া প্রায় সকল ধরনের প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষ করে। যকৃতে যেসব প্লাজমা প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় সেগুলো হচ্ছে: অ্যালবুমিন, লিপোপ্রোটিন, ট্রান্সফেরিন, সেরোপ্লাজমিন, গ্লোবিউলিন, α_1ফেটোপ্রোটিন এবং রক্ত তঞ্চন ফ্যাক্টর I, II, V, VII, IX, X, XI, XII.
- **হরমোন সংশ্লেষ** (Synthesis of hormone) : যকৃত অ্যানজিওটেনসিনোজেন (angiotensinogen) নামক হরমোন সংশ্লেষ করে যা বৃক্ক নিঃসৃত রেনিন (renin) এনজাইম দিয়ে সক্রিয় হয়ে দেহে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।

৩. **ফ্যাট বিপাক** (Fat Metabolism) : ফ্যাটগুলোকে জমা রাখার বদলে যকৃত এগুলোর পরিশোধন ও পরিবহনে নিয়োজিত থাকে। যকৃত কোষ এক্ষেত্রে যে কাজ করে তা হচ্ছে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেটকে ফ্যাটে রূপান্তর; এবং রক্ত থেকে কোলেস্টেরল সরিয়ে নেয়া, ভেঙে ফেলা বা প্রয়োজনে সংশ্লেষ করা। গ্লুকোজের ঘাটতি হলে শ্বসনের উদ্দেশে যকৃত ফ্যাটকে ভেঙে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে। ফ্যাটি এসিড বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থে পরিণত হয়ে যকৃত থেকে নির্গত হয়। গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় গ্লিসারল গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়।

৪. **লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন ও ভাঙন** (Production and Destruction of Red Blood Cells) : শিশুদেহে লোহিত কণিকা উৎপাদনে যকৃত নিয়োজিত থাকে। পরবর্তীতে অস্থিমজ্জার কোষগুলো এ দায়িত্ব পালন করে। এ প্রক্রিয়া একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে যকৃত তখন বিপরীত ভূমিকা পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ যকৃত তখন লোহিত রক্তকণিকা ভাঙনে সহযোগিতা করে।

৫. **হিমোগ্লোবিনের ভাঙন** (Breakdown of Haemoglobin) : লোহিত রক্তকণিকার আয়ু ১২০ দিন (৪ মাস)। এরপর এগুলো যকৃত, প্লীহা ও অস্থিমজ্জায় ফ্যাগোসাইটিক ম্যাক্রোফেজ কোষের ক্রিয়ায় ভেঙে যায় এবং কণিকার হিমোগ্লোবিন রক্তের প্লাজমায় মুক্ত হয়ে মিশে যায়। এগুলোকে তখন যকৃত, প্লীহা ও লসিকা গ্রন্থির **ম্যাক্রোফেজ** (macrophage) নামক বিশেষ শ্বেত-রক্তকণিকা গ্রহণ করে। যকৃতের ম্যাক্রোফেজকে **কাপফার কোষ** (Kupffer cell) বলে। ম্যাক্রোফেজের অভ্যন্তরে হিমোগ্লোবিন ভেঙ্গে **হিম** ও **গ্লোবিন** গঠন করে। গ্লোবিন হচ্ছে অণুর প্রোটিন অংশ, এটি তার নিজস্ব অ্যামিনো এসিডে বিশ্লিষ্ট হয়। হিম থেকে আয়রন অংশ সরে গেলে অণুর বাকি অংশ **বিলিভারডিন** (biliverdin) নামে সবুজ রঞ্জক উৎপন্ন করে। এ রঞ্জক হলদে **বিলিরুবিন** (bilirubin)-এ পরিবর্তিত হয়। আয়রন বর্জিত হয় না। এটি হিমোগ্লোবিন উৎপন্নে অস্থিমজ্জার কোষে পুনর্ব্যবহৃত হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৬. পিত্ত উৎপাদন (Bile production) : যকৃত কোষ (হেপাটোসাইট) অবিরাম পিত্ত ক্ষরণ করে এবং পিত্তথলিতে জমা রাখে। যকৃত কোষ স্টেরয়েড থেকে পিত্ত লবণ, যেমন–সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট (sodium glycocholate) ও সোডিয়াম টরোকোলেট (sodium taurocholate) সংশ্লেষ করে। পরিপাক অঙ্গ হিসেবে যকৃতের পিত্ত উৎপাদন ও ক্ষরণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৭. হরমোনের ভাঙন (Breakdown of Hormones) : যকৃত প্রায় সব হরমোনই কম-বেশি ধ্বংস করে। তবে টেস্টোস্টেরন ও অ্যালডোস্টেরন যতদ্রুত ধ্বংস হয় অন্য হরমোনগুলো (ইনসুলিন, গ্লুকাগোন, আন্ত্রিক হরমোন, স্ত্রী যৌন হরমোন, অ্যাড্রেনাল হরমোন, থাইরক্সিন প্রভৃতি) ততদ্রুত ধ্বংস হয় না। এভাবে যকৃত বিভিন্ন হরমোনের কর্মকান্ডে স্থায়ী অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (হোমিওস্ট্যাসিস) সৃষ্টি করে।

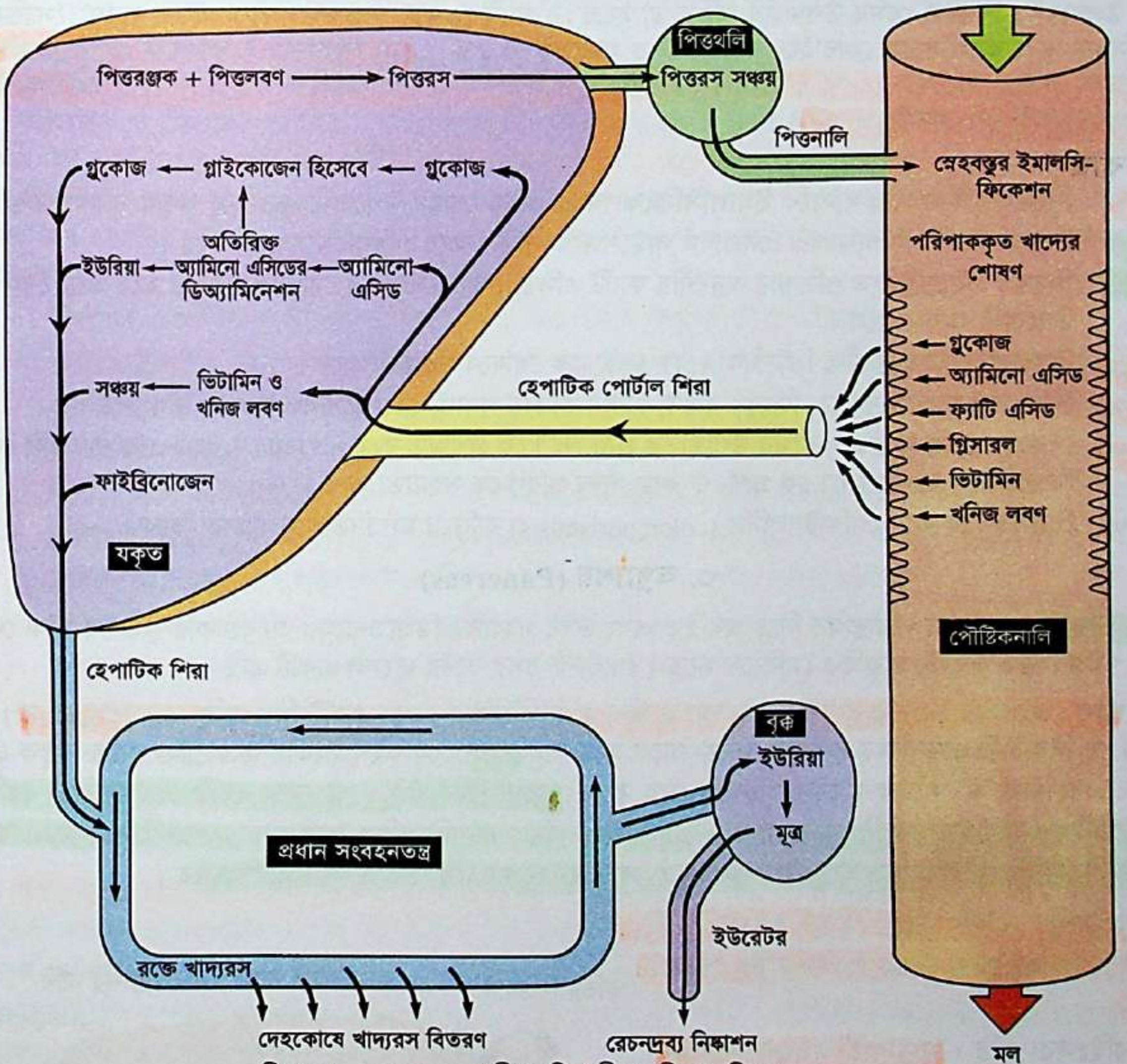

চিত্র ৩.৮ : যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকার চিত্ররূপ

৮. টক্সিন বা বিষ অপসারণ (Detoxification) : শরীরের ভিতর স্বাভাবিক কর্মকান্ডের ফলে উৎপন্ন যেসব পদার্থ মাত্রাতিরিক্ত জমা হলে দেহে বিষময়তার সৃষ্টি করে এমন পদার্থকে টক্সিন (toxin) বা বিষ বলে। যকৃত কোষের অভ্যন্তরে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এ বিষ প্রশমিত হয়ে যায়। অনেক ওষুধও দেহ থেকে অপসারণ করে।

৯. তাপ উৎপাদন (Production of Heat) : যকৃতের অভ্যন্তরে নানা ধরনের বিক্রিয়া সংঘটিত হওয়ায় এখানে প্রচুর তাপ উৎপাদিত হয়। এ তাপ রক্তবাহিকার মাধ্যমে সমগ্র দেহে সঞ্চালিত হয়, ফলে দেহে তাপমাত্রা স্থিতিশীল থাকে (homeotherm) অর্থাৎ বাইরের তাপমাত্রার পরিবর্তনে দেহের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে না।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১০. রক্ত ব্যাকটেরিয়ামুক্ত রাখা (Blood cleanliness) : পোর্টাল শিরা দিয়ে যখন রক্ত অতিক্রম করে তখন কাপফার কোষ এর মধ্যে থাকা ব্যাকটেরিয়াগুলোকে ধ্বংস করে ফলে সিস্টেমিক সংবহনে ব্যাকটেরিয়াগুলো প্রবেশ করতে পারেনা।

যকৃতের নিঃসরণ– পিত্তরস (Secretion of Liver — Bile)

পিত্তরস (Bile) **বা পিত্ত :** যকৃত কোষ থেকে নিঃসৃত পিত্তরস হলদে-সবুজ, আঠালো, তিক্ত স্বাদধারী ক্ষারীয় তরল পদার্থ। পিত্তরস যকৃত থেকে নিঃসৃত হয়ে বাম ও ডান যকৃতনালি পথে **অভিন্ন যকৃত** নালিতে আসে এবং **সিস্টিক নালি** দিয়ে পিত্তথলিতে জমা হয়। **অভিন্ন যকৃত নালি অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার** (ampulla of vater)– এর মাধ্যমে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়।

উপাদান : পিত্তরস যেসব উপাদানে গঠিত তা হচ্ছে (i) **পানি** (৯৭% – ৯৮%), (ii) **অজৈব লবণ** (সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, কার্বোনেট ও ফসফেট–০.৫%), (iii) **পিত্তলবণ** (সোডিয়াম টোরোকোলেট ও সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট–০.৮%), (iv) **পিত্ত রঞ্জক** (বিলিরুবিন ও বিলিভারডিন–০.২%), (v) **কোলেস্টেরল** (০.৩৮%) এবং (vi) **ফ্যাট** (০.৮%)।

কাজ

i. পিত্তরস চর্বি জাতীয় খাদ্যকে **ইমালসিফিকেশন** প্রক্রিয়ায় শোষণ উপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে।
ii. পিত্তলবণ চর্বি পরিপাককারী এনজাইম লাইপেজকে সক্রিয় করে পরিপাকে সাহায্য করে।
iii. পিত্তরস হাইড্রোট্রফিক প্রক্রিয়ায় অদ্রবণীয় ফ্যাটি এসিড, কোলেস্টেরল ইত্যাদিকে দ্রবীভূত করে অন্ত্রে শোষণের উপযোগী করে তোলে।
iv. পিত্তলবণ চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন A, D, E, K-কে শোষণে সহায়তা করে।
v. পিত্তরসের মাধ্যমে কপার, জিংক, পারদ, টক্সিন জাতীয় পদার্থ, কোলেস্টেরল ইত্যাদি নিষ্কাশিত হয়।
vi. পিত্তরসে বেশি ক্ষারক পদার্থের উপস্থিতির জন্য HCl কে প্রশমিত করে pH নিয়ন্ত্রণ করে এবং পাকস্থলি থেকে ডিওডেনামে আগত HCl কে প্রশমিত করে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে।
vii. পিত্তলবণ কোলনে পেরিস্ট্যালসিস (colon peristalsis) বাড়িয়ে মল নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

৩. অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

অবস্থান : অগ্ন্যাশয় পাকস্থলির নিচে অবস্থিত এবং উদর গহ্বরের ডিওডেনামের অর্ধবৃত্তাকার কুন্ডলীর ফাঁক থেকে প্লীহা পর্যন্ত বিস্তৃত লম্বাটে আকৃতির (মরিচের মতো) গোলাপী-ধূসর বর্ণের মাংসল একটি গ্রন্থি।

গঠন : অগ্ন্যাশয় ১২–১৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও প্রায় ৫ সেন্টিমিটার চওড়া একটি **মিশ্র গ্রন্থি** (mixed gland)। এর চওড়া যে দিকটি ডিওডেনামের কুন্ডলির ফাঁকে থাকে তার নাম **মাথা**; যে অংশ সংকীর্ণ হয়ে প্লীহা পর্যন্ত বিস্তৃত সেটি **লেজ**; এবং মাথা ও লেজের মাঝের অংশকে **দেহ** বলে। অগ্ন্যাশয়ের গ্রন্থিগুলো থেকে ছোট ছোট নালিকা বেরিয়ে একত্রিত হয় এবং **উইর্সাং নালি** (duct of Wirsung) গঠন করে। এ নালি গ্রন্থির দৈর্ঘ্য বরাবর এসে ডিওডেনামের কাছে অভিন্ন পিত্তনালির সাথে মিলিত হয়ে **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার**-এর মাধ্যমে ডিওডেনামে প্রবেশ করে।

অগ্ন্যাশয় একটি মিশ্র গ্রন্থি হওয়ায় এটি বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা উভয় প্রকার গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত।

বহিঃক্ষরা গ্রন্থি : অগ্ন্যাশয়ে অসংখ্য **লোবিওল** (lobule) বা **অ্যাসিনাস** (acinus) থাকে। প্রতিটি লোবিওল একটি কেন্দ্রীয় **লুমেন** (ক্ষুদ্র নালি) এবং লুমেনকে ঘিরে বৃত্তাকারে সজ্জিত একসারি কোষ নিয়ে গঠিত। লোবিওলের কোষ থেকে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়। লুমেন প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র অগ্ন্যাশয় নালিকা। সকল অ্যাসিনাসের লুমেন বা ক্ষুদ্র অগ্ন্যাশয় নালিকাগুলো একত্রিত হয়ে প্রধান অগ্ন্যাশয় নালি বা উইর্সাং নালি গঠন করে।

চিত্র ৩.৯ : মানুষের অগ্ন্যাশয়

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

লোবিওল বা অ্যাসিনাস নালিযুক্ত গ্রন্থি, তাই একে সনাল গ্রন্থি বলে এবং এদের ক্ষরণ বহির্মুখী অর্থাৎ নালির মাধ্যমে অগ্ন্যাশয় রস বাহিত হয় বলে এদের বহিঃক্ষরা গ্রন্থি (exocrine gland) বলা হয়।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি : লোবিওলগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কিছু বহুভুজাকার কোষ গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। এদের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (islets of Langerhans) বা ল্যাঙ্গারহ্যান্সের দ্বীপপুঞ্জ বলে। এতে ৪ ধরনের কোষ পাওয়া যায়। কোষগুলো নালিবিহীন এবং এসব কোষগুলো থেকে হরমোন নিঃসৃত হয়। কোষগুলো হচ্ছে :

i. আলফা কোষ (α cell)-এটি গ্লুকাগন (glucagon) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
ii. বিটাকোষ (β cell) - এটি ইনসুলিন (insulin) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়।
iii. ডেল্টা কোষ (δ cell)– এটি সোমাটোস্টাটিন (somatostatin) হরমোন ক্ষরণ করে, যা আলফা ও বিটা কোষের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং
iv. পিপি কোষ (PP cell)– এটি প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড ক্ষরণ করে।

পরিপাকে অগ্ন্যাশয়ের ভূমিকা : খাদ্য পাকস্থলি থেকে ক্ষুদ্রান্ত্রে যাওয়ার সময় ক্ষারীয় তরলরূপী অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়। অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা অংশ থেকে দুধরনের ক্ষরণ মিলে অগ্ন্যাশয় রস গঠন করে, যেমন– পরিপাক এনজাইম এবং একটি ক্ষারীয় তরল। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয় থেকে বিভিন্ন ধরনের পরিপাককারী এনজাইম নিঃসৃত হয়। আমিষ, শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাককারী এসব এনজাইমসমূহের পরিপাকে অংশগ্রহণের ধরন নিম্নরূপ:

- ট্রিপসিন এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ অণুকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।
- কাইমোট্রিপসিন এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ অণুকে পলিপেটাইডে পরিণত করে।
- কার্বক্সিপেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজকে সরল পেপটাইড ও অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত করে।
- অ্যামিনোপেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- ট্রাইপেপটাইডেজ এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- ডাইপেপটাইডেজ এনজাইম ডাইপেপটাইডকে ভেঙে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- কোলাজিনেজ এনজাইম কোলাজেন জাতীয় প্রোটিনকে সরল পেপটাইডে রূপান্তরিত করে।
- ইলাস্টেজ এনজাইম যোজক টিস্যুর প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেঙে পেপটাইড উৎপন্ন করে।
- অ্যামাইলেজ এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন জাতীয় জটিল শর্করাকে মল্টোজে পরিণত করে।
- মল্টেজ এনজাইম মল্টোজ জাতীয় শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।
- লাইপেজ এনজাইম চর্বি (লিপিড)-কে ভেঙে ফ্যাটি এসিডে রূপান্তরিত করে।
- কোলেস্টেরল এস্টারেজ এনজাইম কোলেস্টেরল এস্টারকে ফ্যাটি এসিডে বিশ্লিষ্ট করে।

অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা অংশ থেকে অগ্ন্যাশয় রসের অংশ হিসেবে ক্ষরিত হয় বাইকার্বনেট আয়ন। পাকস্থলিতে আংশিক পাচিত খাদ্য (অর্থাৎ কাইম) গ্যাস্ট্রিনের কর্মকাণ্ডে অতিমাত্রায় আম্লিক থাকে। বাইকার্বনেটের প্রকৃতি ক্ষারীয় হওয়ায় অর্ধপাচিত খাদ্য নিরপেক্ষ হয়ে যায়। ফলে এ খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে গেলেও আন্ত্রিক প্রাচীরের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বাইকার্বনেট আয়ন ক্ষরিত হয় বহিঃক্ষরা অগ্ন্যাশয়ের নালিপ্রাচীরের কোষ থেকে। অগ্ন্যাশয় রস এভাবে অম্ল-ক্ষারের সাম্য, পানিসাম্য, দেহতাপ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (Gastric gland)

পাকস্থলি (stomach) একটি থলিসদৃশ অঙ্গ এবং এর প্রাচীর পেশি ও মিউকোসা (mucosa) দিয়ে গঠিত। মিউকোসা স্তরটি সরল স্তম্ভাকার এপিথেলিয়ামে (columnar epithelium) আবৃত যা প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন গ্যাস্ট্রিক পিট (gastric pit) সম্পন্ন। গ্যাস্ট্রিক পিট গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ধারণ করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এক ধরনের নলাকার গ্রন্থি এবং চার ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক ধরনের কোষের ক্ষরণ পৃথক। সম্মিলিতভাবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির রসকে গ্যাস্ট্রিক জুস (gastric juice) বলে। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ দিনে প্রায় ২ লিটার গ্যাস্ট্রিক জুস তৈরি করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির কোষগুলোর নাম ও কাজ নিম্নরূপ–

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১. অক্সিনটিক কোষ (Oxyntic cell) : এগুলো প্যারাইটাল কোষ (parietal cell)-নামে পরিচিত এবং হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপন্ন করে।

২. মিউকাস কোষ (Mucous cell) : পিচ্ছিল মিউকাস উৎপন্ন করে।

৩. আর্জেন্টাফিন কোষ (Argentaffin cell) : গ্যাস্ট্রিক ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর সৃষ্টি করে।

৪. জাইমোজেনিক কোষ (Zymogenic cell) : জাইমোজেনিক কোষকে চীফ কোষ (Chief Cell)-ও বলে। এ কোষ থেকে নিষ্ক্রিয় পেপসিনোজেন উৎপন্ন হয়।

গ্যাস্ট্রিক জুসের উপাদান

১. পানি : ৯৯.৪৫%।

২. অজৈব পদার্থ : ০.১৫%; HCl, সোডিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, ক্যালসিয়াম ফসফেট, ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট ইত্যাদি।

৩. জৈব পদার্থ : ০.৪০%; মিউসিন, ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর; এনজাইম (পেপসিন, রেনিন, লাইপেজ ইত্যাদি)।

গ্যাস্ট্রিক জুসের কাজ

১. গ্যাস্ট্রিক জুসে বিদ্যমান HCl পাকস্থলিতে অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে, ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং নিষ্ক্রিয় এনজাইমকে সক্রিয় করে।

২. গ্যাস্ট্রিক জুসে বিদ্যমান পেপসিন এনজাইম HCl-এর সাথে মিশে প্রোটিনকে পেপটোনে পরিণত করে।

৩. গ্যাস্ট্রিক জুসে বিদ্যমান রেনিন এনজাইম দুধের ক্যাসিনোজেনকে ক্যাসিনে পরিণত করে।

৪. গ্যাস্ট্রিক জুস পাকস্থলির প্রাচীর সুরক্ষা করে।

৫. কিছু বিষাক্ত বস্তু, ভারী ধাতু, অ্যালক্যালয়েড বস্তু ইত্যাদি গ্যাস্ট্রিক জুসের সাথে দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়।

৫. আন্ত্রিক গ্রন্থি (Intestinal glands)

অন্ত্রপ্রাচীরের মিউকোসা স্তরে কতগুলো এককোষী গ্রন্থি খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম ক্ষরণ করে। এগুলো হচ্ছে– ব্রাশকোষ, গবলেট কোষ, প্যানেথ কোষ, আর্জেনটাইন কোষ, লিবারক্যুন-এর গ্রন্থি এবং ব্রুনার-এর গ্রন্থি। এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে আন্ত্রিক রস বা সাক্কাস ইন্টেরিকাস (intestinal juice or succus intericus) বলে।

আন্ত্রিক রসের উপাদান

i. পানি: ৯৮.৫%।

ii. অজৈব পদার্থ : ০.৮%; সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণ।

iii. জৈব পদার্থ : ০.৭%; সক্রিয়ক – এন্টারোকাইনেজ; এনজাইম – ট্রিপসিনোজেন, পেপটাইডেজ, অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, ল্যাক্টেজ, সুক্রেজ, লাইপেজ ইত্যাদি।

আন্ত্রিক রসের কাজ

i. আন্ত্রিক রসের মিউকাস অন্ত্র প্রাচীরকে বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া থেকে রক্ষা করে।

ii. এতে উপস্থিত সক্রিয়ক এন্টারোকাইনেজ নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনকে ট্রিপসিনে পরিণত করে।

iii. এরসের সুক্রেজ ও ল্যাক্টেজ এনজাইম যথাক্রমে, মল্টোজ, সুক্রোজ ও ল্যাক্টোজ শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

iv. এতে অবস্থিত পেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

এনজাইম ও পিত্তরসের মধ্যে পার্থক্য

এনজাইম	পিত্তরস
১. এনজাইম নালিযুক্ত গ্রন্থি নিঃসৃত জৈব রাসায়নিক পদার্থ।	১. পিত্তরস যকৃত নিঃসৃত মিশ্র পদার্থ।
২. এনজাইম পানি ও প্রোটিন জাতীয় জৈব পদার্থ।	২. পিত্তরস পানি, জৈব ও অজৈব পদার্থ।
৩. এনজাইম গ্রন্থি থেকে তাৎক্ষণিক উৎপন্ন হয় এবং কোথাও সঞ্চিত থাকে না।	৩. পিত্তরস যকৃত থেকে উৎপন্ন হয়ে পিত্তথলিতে সঞ্চিত থাকে।
৪. এনজাইমের সমগ্র কার্যক্ষেত্র দেহের বিভিন্ন অঙ্গে।	৪. পিত্তরসের কার্যক্ষেত্র কেবল পরিপাকনালিতে সীমাবদ্ধ।
৫. এনজাইম রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিকে ত্বরান্বিত করে।	৫. পিত্তরস খাদ্য পরিপাকে ক্ষারীয় মাধ্যম তৈরি করে।
৬. এনজাইম কার্যশেষে অপরিবর্তিত থাকে।	৬. পিত্তরস কাজ শেষে বর্জ্য হিসেবে দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা (Role of Nervous System & Hormone in Digestion)

খাদ্য পরিপাক ও শ্বসন যে জটিল প্রক্রিয়া তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব প্রক্রিয়া শেষে উৎপন্ন হয় শক্তি। শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারই হচ্ছে সুস্থ জীবন অব্যাহত রাখার একমাত্র কৌশল। শক্তির সংরক্ষণ ও ব্যবহার প্রক্রিয়া যে কত সূক্ষ্মভাবে দেহে পরিচালিত হচ্ছে সে বিষয়টি পরিষ্কার জানতে হলে পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

পরিপাকের জন্য বিভিন্ন এনজাইম ও অন্যান্য পদার্থের (যেমন–HCl) ক্ষরণ হয় শক্তির বিনিময়ে। শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার কখনও বৃথা যায় না। এ কারণে খাদ্যের অনুপস্থিতিতে শক্তি ও পদার্থ উৎপন্ন হয় না। বরং খাদ্য পরিপাকের উদ্দেশেই বিপুল পরিমাণ **গ্যাস্ট্রিক জুস** (gastric juice) উৎপন্ন ও ক্ষরিত হয়। পরিপাকের প্রত্যেক ধাপের কর্মকাণ্ডে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনতন্ত্র (অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র; endocrine system) নিম্নোক্তভাবে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (central nervous system) পৌষ্টিকতন্ত্র সংশিষ্ট স্নায়ুর মাধ্যমে উত্তেজিত হয় এবং বিভিন্ন নির্দেশনা ও সংকেত প্রেরণের মাধ্যমে পৌষ্টিকনালি ও গ্রন্থিগুলোকে পরিচালনা করে। এতে **স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র** (autonomic nervous system)-ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। পরিপাক ক্রিয়া দুটি ভিন্ন ধরনের স্নায়ুজালক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন- (i) **বহির্নিহিত স্নায়ুজালক** (extrinsic plexus) এবং (ii) **অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক** (intrinsic plexus)।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের **সিমপ্যাথেটিক** (sympathetic) ও **প্যারাসিমপ্যাথেটিক** (parasympathetic) শাখা থেকে আগত বহির্নিহিত স্নায়ুজালক পৌষ্টিকনালির বাহির থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। অপরদিকে পৌষ্টিকনালির প্রাচীরে ঘনসন্নিবিষ্ট জালিকা গঠন করে বিন্যস্ত থেকে অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক পৌষ্টিকনালির ভিতর থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। দুধরনের অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক পৌষ্টিকতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। একটি হচ্ছে– পৌষ্টিকনালির বাইরের দিকে অবস্থিত **মায়েনটেরিক স্নায়ুজালক** (myenteric plexus) যা পৌষ্টিকতন্ত্রের মসৃণ পেশিগুলোর সঙ্কোচন বা পেরিস্ট্যালসিস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্যটি **সাব-মিউকোসাল স্নায়ুজালক** (submucosal plexus) যা পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের নিঃসরণ ও স্থানীয় রক্ত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

১. লালাক্ষরণ : দুধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া মুখগহ্বরে লালাক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমটি হচ্ছে **অনপেক্ষ প্রতিবর্ত**, দ্বিতীয়টি **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া**।

❑ খাদ্য মুখগহ্বরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে **অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (unconditional reflex; উদ্দীপনা-সাড়াদান শেখার বিষয় নয়) শুরু হয়ে যায়। জিভের স্বাদকুঁড়ির গ্রাহক বা রিসেপ্টর খাদ্যের স্বাদে উদ্দীপ্ত হয়। এসব রিসেপ্টর থেকে সেন্সরি নিউরন **স্নায়ুউদ্দীপনা** (nerve impluse) মস্তিষ্কে বহন করে। মস্তিষ্ক থেকে মোটর নিউরনের সাহায্যে স্নায়ু উদ্দীপনা লালাগ্রন্থিতে এলে সেখান থেকে **লালা** ক্ষরিত হয়। যে প্রতিবর্ত ক্রিয়া মস্তিষ্ক হয়ে অতিক্রম করে তাকে **করোটিক প্রতিবর্ত** (cranial reflex) বলে।

❑ দ্বিতীয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া হচ্ছে **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত** (conditional reflex; সাড়াটি শিক্ষণজনিত)। খাবার দেখে, গন্ধ শুঁকে, চিন্তাভাবনা শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এ প্রতিবর্তের অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি একান্তে বসে তেঁতুল বা চালতার আচার মুখে দেওয়ার কথা চিন্তা করে তাহলে হয়তো লালা ক্ষরণ শুরু হয়ে যাবে। এসব আচার খাওয়ার অভিজ্ঞতা যার আছে তার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটবে। অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষা গ্রহণকে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত বলে। (আরও বিস্তারিত দ্বাদশ অধ্যায়: **প্রাণীর আচরণ**-এ আলোচিত হয়েছে।

২. গ্যাস্ট্রিক জুস (রস) ক্ষরণ : গ্যাস্ট্রিক জুসের ক্ষরণ হয় ৩টি ধাপে, যেমন- (i) **স্নায়বিক বা সেফালিক পর্যায়** (Cephalic phase), (ii) **গ্যাস্ট্রিক পর্যায়** (Gastric phase) এবং (iii) **আন্ত্রিক পর্যায়** (Intestinal phase)।

i. স্নায়বিক পর্যায় : মুখগহ্বরে খাদ্যের উপস্থিতি ও গলাধঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক প্রতিবর্ত (স্নায়ুউদ্দীপনা) শুরু হয়ে যায়। এ উদ্দীপনা মস্তিষ্ক থেকে **ভ্যাগাস স্নায়ুর** মাধ্যমে পাকস্থলিতে পৌঁছায়। খাদ্য দেখা, গন্ধ ও স্বাদ নেয়া, এমনকি চিন্তা করলেও একই অবস্থা হবে। পাকস্থলির গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিগুলো **গ্যাস্ট্রিক জুস** ক্ষরণে উদ্দীপ্ত হয়। এটি হচ্ছে প্রস্তুতি পর্ব। পাকস্থলিতে খাদ্য পৌঁছার আগেই এটি ঘটে এবং এভাবে পাকস্থলি খাদ্য গ্রহণে প্রস্তুত হয়। পাকস্থলির ক্ষরণে স্নায়বিক পর্যায় প্রায় এক ঘন্টা স্থায়ী হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ii. **গ্যাস্ট্রিক পর্যায় :** এটি অনুষ্ঠিত হয় পাকস্থলিতে। খাদ্য ধারণে পাকস্থলি প্রসারিত হলে প্রসারণ গ্রাহক (stretch receptor) উদ্দীপ্ত হয় এবং পাকস্থলির সাবমিউকোসায় অবস্থিত স্নায়ু জালিকায় স্নায়ু উদ্দীপনা প্রেরণ করে। সেখান থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিতে পৌঁছে জুস ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে। গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণ প্রায় ৪ ঘন্টা স্থায়ী হয়।

iii. **আন্ত্রিক পর্যায় :** এ পর্বটি ক্ষুদ্রান্ত্রে সংঘটিত হয়। এসিডধর্মী কাইম যখন প্রবেশ করে এবং ডিওডেনামের প্রাচীর স্পর্শ করে তখন স্নায়বিক সাড়া প্রদানকে উৎসাহিত করে। ক্ষুদ্রান্ত্র প্রাচীরের রিসেপ্টরগুলো খাদ্যের উপস্থিতিতে উদ্দীপ্ত হওয়ার খবর মস্তিষ্কে পৌঁছালে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার অংশ হিসেবে মস্তিষ্ক গ্যাস্ট্রিক জুসের ক্ষরণ কমিয়ে দেয় এবং পাকস্থলি থেকে কাইমের নির্গমন গতি মন্থর করে দেয়। এর ফলে একসঙ্গে বেশি খাদ্য অন্ত্রে প্রবেশ করতে পারে না। শুধু তাই নয়, ডিওডেনামের মিউকোসা দুধরনের হরমোন ক্ষরণ করে, কোলেসিস্টোকাইনিন (Cholecystokinin, CCK) এবং সিক্রেটিন (Secretin)। CCK আবার প্যানক্রিওজাইমিন (Pancreozymin) নামেও পরিচিত। উভয় হরমোনই রক্তে সংবহিত হয়ে পাকস্থলি, অগ্ন্যাশয় ও যকৃতে পৌঁছায়। সিক্রেটিন পাকস্থলিতে গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণে বাধা দেয়, আর CCK পাইলোরিক স্ফিংক্টারের পেশিকে সংকুচিত করে পাকস্থলি শূন্য হতে বাধা দেয়।

৩. **অগ্ন্যাশয় রস ও পিত্ত :** অগ্ন্যাশয় রস ও পিত্তের ক্ষরণেও স্নায়বিক প্রতিবর্তের ভূমিকা আছে। পাকস্থলিতে পরিপাকের স্নায়বিক ও গ্যাস্ট্রিক ধাপে ভ্যাগাস স্নায়ু যকৃতকে পিত্ত ও অগ্ন্যাশয়কে এনজাইম ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে।

পরিপাকে হরমোনের ভূমিকা

খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের নিঃসরণ কয়েকটি নির্দিষ্ট হরমোন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। হরমোনগুলো পাকস্থলি ও অন্ত্রের মিউকোসা স্তরের কোষ থেকে ক্ষরিত হয়ে পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন রক্তবাহিকার মাধ্যমে হৃৎপিন্ডে পৌঁছে। হৃৎপিন্ড থেকে ধমনির মাধ্যমে পুনরায় পৌষ্টিকতন্ত্রে এসে পৌঁছায় এবং এনজাইম নিঃসরণ ও অঙ্গের সঞ্চালন কাজকে উদ্দীপিত করে। নিচে খাদ্য পরিপাক নিয়ন্ত্রণকারী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. **গ্যাস্ট্রিন** (Gastrin) : পাকস্থলির পাইলোরিক প্রান্তের গ্রন্থিগুলোর গাত্রের জি-কোষ থেকে গ্যাস্ট্রিন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে পাকস্থলির প্রাচীরে অবস্থিত গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসৃত হয়। এটি HCl এর ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্ননালি থেকে পাকস্থলিতে খাদ্যগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

২. **সিক্রেটিন** (Secretin) : অন্ত্রের (ডিওডেনামের) মিউকোসা থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে অগ্ন্যাশয় থেকে অগ্ন্যাশয় রস নিঃসৃত হয়। তাছাড়া এটি পাকস্থলির প্রাচীরকে পেপসিন এনজাইম এবং যকৃতকে পিত্ত (bile) ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। এটি প্রথম আবিষ্কৃত হরমোন।

৩. **কোলেসিস্টোকাইনিন** (Cholecystokinin) : এর অপর নাম প্যানক্রিওজাইমিন। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হরমোনটি অগ্ন্যাশয়ের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। এটি পিত্তথলি থেকে পিত্ত বের হতেও উদ্দীপনা যোগায়।

৪. **সোমাটোস্ট্যাটিন** (Somatostatin) : এ হরমোনটি পাকস্থলি ও অন্ত্রের মিউকোসাতে অবস্থিত ডি-কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। এটি গ্যাস্ট্রিনের ক্ষরণ নিবারণ করে ফলে পাকস্থলি রসের ক্ষরণ হ্রাস পায়। এটি অগ্ন্যাশয় রসের ক্ষরণও হ্রাস করে।

৫. **এন্টেরোকাইনিন** (Enterokinin) : ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে ইলিয়ামের প্রাচীরে বিদ্যমান আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে মল্টেজ, সুক্রেজ, ইনভারটেজ ও ল্যাক্টেজ এনজাইম নিঃসৃত হয়।

৬. **পেপটাইড YY** (Peptide YY) : ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে অন্ত্রের ভিতর দিয়ে ধীর গতিতে খাদ্য প্রবাহিত হয় যাতে দক্ষতার সাথে খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ সম্পন্ন হয়।

৭. **এন্টারোগ্যাস্ট্রোন** (Enterogastrone = Gastric Inhibitory Peptide–GIP) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে নিঃসৃত হয়। এ হরমোন পাকস্থলির বিচলন ও গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করে। গ্যাস্ট্রিক সংকোচন হ্রাস করার জন্য একে গাস্ট্রিক ইনহিবিটরি পেপটাইড বলা হয়।

৮. **এন্টারোক্রাইনিন** (Enterocrinin) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে ক্ষরিত হয়। এটি লিবারকুন গ্রন্থিকে (crypts of liberkuhn) উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।

৯. **ডিওক্রাইনিন** (Deocrinin) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে ক্ষরিত হয়। এ হরমোন ব্রুনারের গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।

১০. **প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড** (Pancreatic Polypeptide) : এটি আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্সের প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড কোষ থেকে ক্ষরিত হয় এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে বাধা দেয়।

১১. **ভিলিকাইনিন** (Villikinin) : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে এ হরমোন নিঃসৃত হয় এবং ভিলাই এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে খাদ্য পরিপাকের রূপরেখার ছক

পরিপাকস্থল	পরিপাকগ্রন্থি ও পরিপাক রস	পরিপাক রসের এনজাইম	প্রভাবিত খাদ্যের নাম	সরলীকৃত উপাদান
মুখবিবর	লালাগ্রন্থি নিঃসৃত "লালারস"	কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী ১. টায়ালিন ২. মল্টেজ (অল্পমাত্রায়)	 স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন মল্টোজ	 মল্টোজ গ্লুকোজ
পাকস্থলি	গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত "পাকরস"	প্রোটিন পরিপাককারী ১. পেপসিন ২. জিলেটিনেজ ৩. রেনিন	 প্রোটিন জিলেটিন দুগ্ধ কেসিন	 প্রোটিওজ ও পেপটোন পেপটোন ও পলিপেপটাইড প্যারাকেসিন
		লিপিড পরিপাককারী ১. গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ	 মাখনের চর্বি	 ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল
ক্ষুদ্রান্ত্র	অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত "অগ্ন্যাশয় রস"	প্রোটিন পরিপাককারী ১. ট্রিপসিন ২. কাইমোট্রিপসিন ৩. কার্বোক্সিপেপটাইডেজ ৪. অ্যামিনোপেপটাইডেজ ৫. ট্রাইপেপটাইডেজ ৬. ডাইপেপটাইডেজ ৭. কোলাজিনেজ	 প্রোটিওজ ও পেপটোন প্রোটিওজ ও পেপটোন পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজ পলিপেপটাইড ট্রাইপেপটাইড ডাইপেপটাইড কোলাজেন	 পলিপেপটাইড পলিপেপটাইড সরল পেপটাইড ও অ্যামিনো এসিড অ্যামিনো এসিড অ্যামিনো এসিড অ্যামিনো এসিড সরল পেপপাইড
		শর্করা পরিপাককারী ১. অ্যামাইলেজ ২. মল্টেজ	 স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন মল্টোজ	 মল্টোজ গ্লুকোজ
		লিপিড পরিপাককারী ১. লাইপেজ ২. ফসফোলাইপেজ ৩. কোলেস্টেরল এস্টারেজ	 চর্বি (লিপিড) ফসফোলিপিড কোলেস্টেরল এস্টার	 ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল ফ্যাটি এসিড ফ্যাটি এসিড
	আন্ত্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত এনজাইমসমূহ	প্রোটিন পরিপাককারী ১. অ্যামিনোপেপটাইডেজ	 পেপটাইড অণু	 অ্যামিনো এসিড
		লিপিড পরিপাককারী ১. লাইপেজ ২. অ্যালকালাইন ফসফেটেজ	 ট্রাইগ্লিসারাইড ও ডাইগ্লিসারাইড ফসফোলিপিড	 মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিড গ্লিসারল, ফ্যাটি এসিড, ফসফোরিক এসিড এবং এদের বেস (যেমন-কোলিন)
		কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী ১. ল্যাক্টেজ ২. মল্টেজ ৩. সুক্রেজ ৪. অ্যামাইলেজ	 ল্যাক্টোজ মল্টোজ সুক্রোজ স্টার্চ ও ডেক্সট্রিন	 গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজ গ্লুকোজ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ সরল শর্করা
		নিউক্লিক এসিড পরিপাককারী ১. নিউক্লিয়েডেজ ২. নিউক্লিওটাইডেজ ৩. নিউক্লিওসাইডেজ	 নিউক্লিক এসিড নিউক্লিওটাইড নিউক্লিওসাইড	 মনোনিউক্লিওটাইড নিউক্লিওসাইড ও ফসফেট গ্রুপ পেন্টোজ শ্যুগার ও নাইট্রোজেন বেস

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

খাদ্যবস্তুর শোষণ (Absorption of Food)

পুষ্টি অণু গ্রহণের প্রক্রিয়াকে শোষণ বলে। ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়াম অংশে পরিপাকের চূড়ান্ত পর্যায়ের শেষে উৎপন্ন পদার্থ শোষিত হয়। এর অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত অসংখ্য ক্ষুদ্র অভিক্ষেপ বা ভিলাই (villi; একবচনে villus) শোষণের জন্য যথাযথভাবে অভিযোজিত। ভিলাইগুলোর উপরিভাগের তল স্তম্ভাকার আবরণী কোষ (columnar epithelial cells) দিয়ে আবৃত থাকে। মানুষের অন্ত্রে প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) ভিলাই থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের শোষণ প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

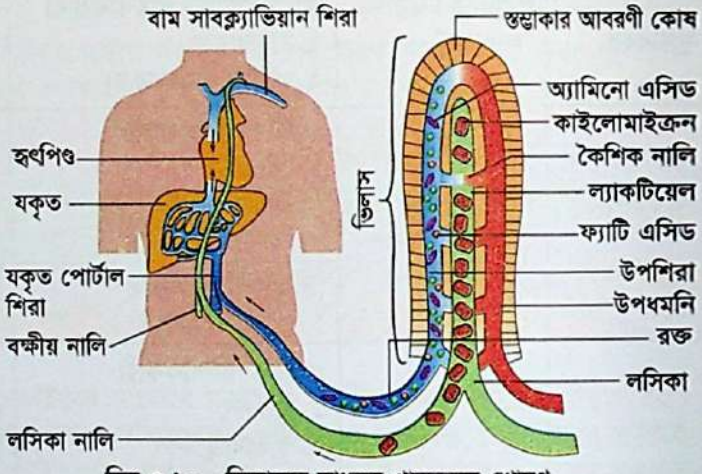

চিত্র ৩.১০ : ভিলাসের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর শোষণ

১. শর্করা শোষণ (Absorption of Carbohydrate) : গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকাস ঝিল্লির **কাইনেজ** নামক এনজাইমের সহায়তায় অতি দ্রুত ফসফরাস যুক্ত হয়ে সক্রিয় শোষণের মাধ্যমে শোষিত হয়ে পোর্টাল শিরার রক্তে প্রবেশ করে। ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ ও ল্যাকটোজ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষিত হয়। পোর্টাল শিরায় শোষিত খাদ্যসার যকৃতে মুক্ত করে।

২. আমিষ শোষণ (Absorption of Protein) : আমিষের পরিপাকজাত অ্যামিনো এসিডগুলো শোষিত হয়ে পোর্টাল শিরার রক্তে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে যকৃতে পৌঁছে। সাধারণত এল-অ্যামিনো এসিডগুলো সক্রিয় পদ্ধতিতে এবং ডি-অ্যামিনো এসিডগুলো ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষিত হয়। অ্যামিনো এসিড ব্যতীত কিছু প্রোটিওজ, পেপটোন ও পলিপেপটাইড অণু অপরিবর্তিত অবস্থায় সামান্য পরিমাণে শোষিত হয়।

৩. চর্বি বা লিপিড শোষণ (Absorption of Lipid) : চর্বির পরিপাকজাত ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ভিলাইয়ের স্তম্ভাকার আবরণী কোষে প্রবেশ করে এবং পুনরায় লিপিডে পরিণত হয়। আবরণী কোষে যে প্রোটিন থাকে তা লিপিড অণুকে আবৃত করে **লিপোপ্রোটিন** কণা গঠন করে, এর নাম **কাইলোমাইক্রন** (chylomicrons)। এগুলো **এক্সোসাইটোসিস** (exocytosis, প্লাজমাঝিল্লির মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ কোষের বাইরে নিষ্কাশিত হওয়া) প্রক্রিয়ায় আবরণী কোষ ত্যাগ করে এবং ভিলাইয়ের লসিকা বাহিকায় প্রবেশ করে। লসিকা তখন সাদা বর্ণ ধারণ করে। এ কারণে তখন লসিকা বাহিকাকে **ল্যাকটিয়েল** (lacteal) বলে। ল্যাকটিয়েল অর্থ হচ্ছে সাদাটে (milky)। কাইলোমাইক্রনগুলো লসিকার মাধ্যমে লসিকাতন্ত্রের ভিতর দিয়ে হৃৎপিন্ডের কাছে শিরারক্তের প্লাজমায় প্রবেশ করে। প্লাজমায় একটি এনজাইম লিপিডকে বিশ্লিষ্ট করে আবার কোষের গ্রহণ উপযোগী ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল সৃষ্টি করে। এগুলো শ্বসনে ব্যবহৃত হয় কিংবা স্নেহ পদার্থ (fat) হিসেবে যকৃত, মেসেন্টারি বা চামড়ার নিচে সঞ্চিত থাকে।

৪. পানি শোষণ (Absorption of Water) : ক্ষুদ্রান্ত্রই পানি শোষণের প্রধান স্থল। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের প্রাচীরের আবরণী কোষে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের শোষণের পর অবশিষ্ট পানি বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে।

৫. খনিজ লবণ শোষণ (Absorption of Minerals) : ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের প্রাচীরের আবরণী কোষ দ্বারা সক্রিয় পদ্ধতিতে খনিজ লবণ শোষিত হয়।

৬. ভিটামিন শোষণ (Absorption of Vitamins) : খাদ্যের ভিটামিন A, D, E, K ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত হয়। সাধারণ পিত্তলবণ এ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। ভিটামিন C ও কয়েক প্রকার B ভিটামিন ব্যাপন ও সক্রিয় শোষণ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়াম অংশে শোষিত হয়।

শোষিত খাদ্যসারের পরিণতি (Fate of absorbed Food Nutrients)

অ্যামিনো এসিড : অ্যামিনো এসিড কোষে গৃহীত হয়ে এনজাইমের সহায়তায় প্রোটিন গঠনে ব্যবহৃত হয়। অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড যকৃতে পরিবর্তিত হয়ে একদিকে ইউরিয়া, অন্যদিকে শর্করা বা চর্বিতে রূপান্তরিত হয়। ইউরিয়া বর্জ্য পদার্থ। শর্করা বা চর্বি শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

গ্লুকোজ : গ্লুকোজ থেকে কোষে শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু গ্লুকোজ অন্যান্য বস্তুর সাথে মিলিত হয়ে প্রোটোপ্লাজমের ধাতব উপাদান গঠন করে এবং কিছু গ্লুকোজ যকৃত ও পেশিতে গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল : ফ্যাটি এসিডের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রাণী নিজ দেহের উপযোগী চর্বি তৈরি করে। ফ্যাটি এসিড প্লাজমামেমব্রেন ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেন গঠনে ব্যবহৃত হয়। চর্বির শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা গ্লুকোজের তুলনায় দ্বিগুণ।

বৃহদন্ত্রের কাজ (Functions of Large Intestine)

খাদ্যের পরিপাক এবং পরিপাককৃত খাদ্য দেহে শোষণের পর যে অংশটুকু অপাচ্য থাকে বা শোষিত হয় না, তা বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রের ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়ামের পিছন থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত মোটা, নলাকার ও খাঁজযুক্ত অংশকে বৃহদন্ত্র বলে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১.৫ মিটার। এটি তিন অংশে বিভক্ত। সম্মুখের জেজুনাম সংলগ্ন স্ফীত গোল অংশটি **সিকাম** (caecum), মধ্যবর্তী U আকৃতির বৃহৎ অংশটি **কোলন** (colon) এবং পশ্চাতের পায়ু সংলগ্ন থলি আকৃতির অংশটি **মলাশয়** (rectum)। সিকামের সাথে একটি বদ্ধ ধরনের থলি যুক্ত থাকে, এর নাম **অ্যাপেনডিক্স** (appendix)। কোলনের আবার ৪টি অংশ রয়েছে- (i) **উর্ধ্বমুখী কোলন** (ascending colon), (ii) **অনুপ্রস্থ কোলন** (transverse colon), (iii) **নিম্নমুখী কোলন** (descending colon) এবং (iv) **সিগময়েড কোলন** (sigmoid colon)। মানুষের বৃহদন্ত্র প্রধানত নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করে।

১. ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া : বৃহদন্ত্রে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া (প্রায় ৫০০ প্রজাতির) মিথোজীবী হিসেবে বাস করে। এসব ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদতন্তুর সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ (যেগুলো পরিপাক করার মতো এনজাইম মানুষের পৌষ্টিকনালিতে থাকেনা) প্রভৃতির ফারমেন্টেশন ও হাইড্রোলাইসিস ঘটিয়ে ক্ষুদ্র খাদ্যাণুতে পরিণত করে।

২. শোষণ : ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে আগত পরিপাক বর্জ্যে অবস্থিত পানির প্রায় ৭০-৮০% অভিস্রবণের মাধ্যমে বৃহদন্ত্রে শোষিত হয়ে কঠিন মলের আকার ধারণ করে। কিছু পরিমাণ অজৈব লবণ, গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফলিক এসিড, ভিটামিন-B এবং K বৃহদন্ত্রে শোষিত হয়।

৩. ক্ষরণ : বৃহদন্ত্রের মিউকোসা স্তরে অবস্থিত **গবলেট কোষ** (goblet cell) মিউকাস ক্ষরণ করে বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগকে পিচ্ছিল রাখে।

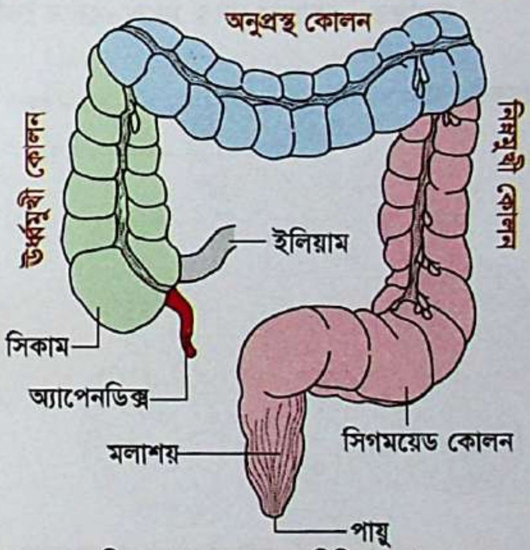

চিত্র ৩.১১ : বৃহদন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

৪. খাদ্যের অসার অংশ সঞ্চয় : ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক ও শোষণের পর খাদ্য ও পাচকরসগুলোর অবশিষ্ট উপাদান ইলিওকোলিক পেশিবলয় অতিক্রম করে সিকাম ও কোলনে প্রবেশ করে এবং সেখানে দীর্ঘসময় জমা থাকে।

৫. মল উৎপাদন : দৈনিক প্রায় ৩৫০ গ্রাম **তরল মন্ড** (chyle) বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। মন্ড থেকে শোষণের মাধ্যমে প্রায় ১৩৫ গ্রাম আর্দ্র মল (faeces) উৎপন্ন হয়ে দেহের বাইরে নিষ্ক্রান্ত হয়।

মলত্যাগ (Defaecation) **:** যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যের অপাচ্য অংশ মলরূপে দেহের বাইরে নির্গত হয় তাকে **মলত্যাগ** বা **ডেফিকেশন** বা **ইজেসশন** (egestion) বলে। খাদ্যের অপাচ্য, অশোষিত ও দেহে পুষ্টিমূল্যহীন বস্তুকে **রাফেজ** (roughage) বলে। এ রাফেজ বিশেষ প্রক্রিয়ায় মলে পরিণত হয়। বৃহদন্ত্রের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত মিউকাস **লুব্রিক্যান্ট** (lubricant) এর মতো কাজ করে ফলে মল নির্গমন সহজ হয়। মল বৃহদন্ত্রে কয়েক ঘন্টা অবস্থান করে। এ সময়ের ভিতর ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে বিভিন্ন সালফারঘটিত গ্যাস (যেমন-হাইড্রোজেন সালফাইড) উৎপন্ন হয় এবং মল দুর্গন্ধযুক্ত হয়। মল মলাশয়ে প্রবেশ করলে মলাশয়ের প্রাচীরে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা থেকে **ডেফিকেশন প্রতিবর্তী** (defaecation reflex) ঘটে। ফলে কোলনে **পেরিস্ট্যালসিস** শুরু হয় এবং মলকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়। উদর পেশি এবং ডায়াফ্রামের ঐচ্ছিক সংকোচনের ফলে পায়ুনালির ভিতরে স্ফিংক্টার পেশি শিথিল হয় এবং মল পায়ু পথে দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে। পূর্ণবয়স্ক মানুষ দিনে একবার কিংবা দুবার, আর শিশুরা বেশ কয়েকবার মলত্যাগ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ব্যবহারিক অংশ

স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ

☐ যকৃতের অনুচ্ছেদ (Section through liver)

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. যকৃত কতকগুলো ক্ষুদ্র খন্ড বা হেপাটিক লোবিওল (lobule)-এ বিভক্ত।

২. প্রত্যেক লোবিওল অসংখ্য বহুভুজাকার হেপাটিক কোষ (hepatic cell)-এ গঠিত।

৩. বহুভুজাকার কোষগুলো এক বা দ্বিনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট।

৪. লোবিওলের মাঝে মাঝে সাইনুসয়েড (sinusoid) নামক ফাঁকা স্থান থাকে।

৫. প্রত্যেক লোবিওলের কেন্দ্রে একটি কেন্দ্রীয় শিরা অবস্থিত। কোষের মাঝে মাঝে রয়েছে কৈশিকনালি ও পিত্তনালি।

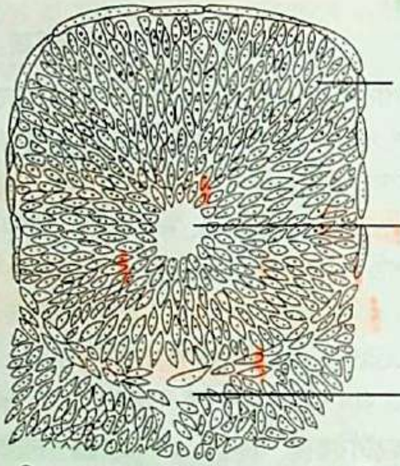

চিত্র ৩.১২ : যকৃতের অনুচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

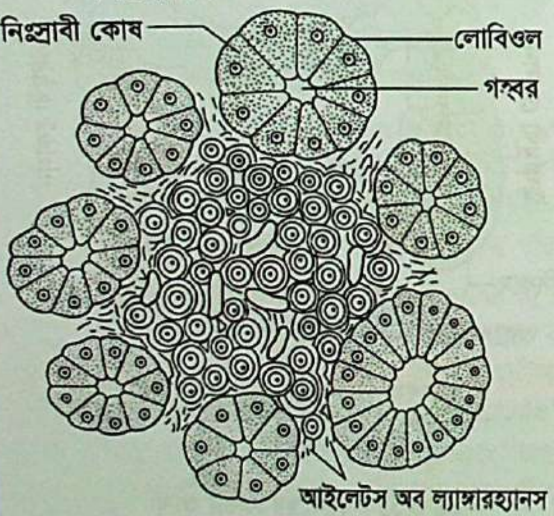

চিত্র ৩.১৩ : অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

☐ অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. ক্ষরণকারী কোষে গঠিত ও কেন্দ্রীয় গহ্বরযুক্ত লোবিওল বা অ্যাসিনাস (acinus) উপস্থিত।

২. লোবিওলের ফাঁকে ফাঁকে আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (islets of Langerhans) নামক কোষপুঞ্জ বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত।

৩. কোষগুলোর মধ্যে রক্তনালি ও অগ্ন্যাশয় নালি আছে।

৪. অ্যাসিনাসগুলোর ফাঁকে ফাঁকে যোজক টিস্যু দেখা যায়।

☐ পাকস্থলির প্রস্থচ্ছেদ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. প্রাচীর পাঁচটি পর্যায়ক্রমিক স্তরে বিভক্ত, যথা–সেরোসা, পেশিস্তর, সাবমিউকোসা, মাসকিউলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা।

২. পেশিস্তর বহিঃস্থ অনুদৈর্ঘ্য ও অন্তঃস্থ বৃত্তাকার পেশিতে গঠিত। সাবমিউকোসা অ্যারিওলার যোজক টিস্যুতে নির্মিত এবং রক্তনালি, স্নায়ু প্রভৃতি ধারণ করে।

৩. মিউকোসা স্তর থেকে রুগী (rugae) নামক কতকগুলো অভিক্ষেপ বের হয়েছে।

৪. মিউকোসায় গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (gastric gland) দেখা যায়।

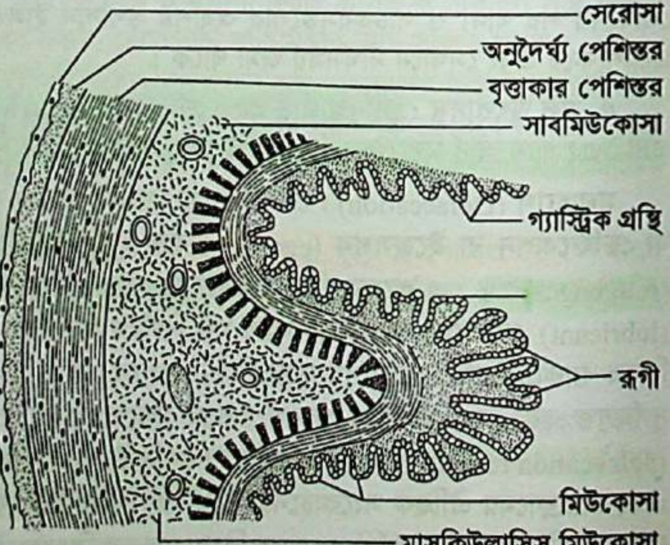

চিত্র ৩.১৪ : পাকস্থলির প্রস্থচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

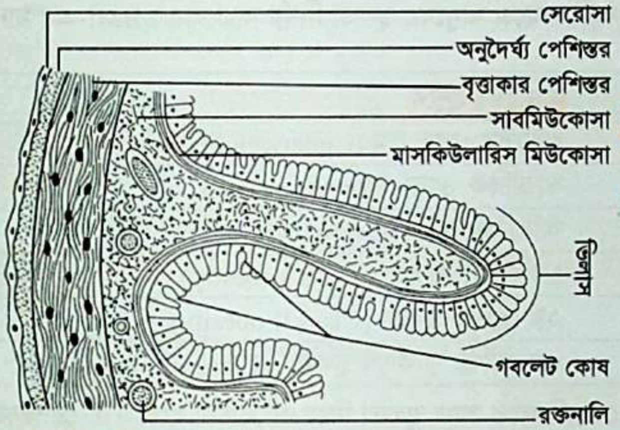

চিত্র ৩.১৫ : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রস্থচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

❑ ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রস্থচ্ছেদ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. সেরোসা, পেশিস্তর, সাবমিউকোসা, মাসকিউলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা স্তর বিদ্যমান।

২. পেশিস্তর বহিঃস্থ অনুদৈর্ঘ্য ও অন্তঃস্থ বৃত্তাকার পেশিতে গঠিত।

৩. সাবমিউকোসা অ্যারিওলার যোজক টিস্যুতে নির্মিত এবং রক্তনালি ও স্নায়ু সমৃদ্ধ।

৪. মিউকোসা থেকে **ভিলাই** (villi; একবচনে– villus) নামের আঙ্গুলের মতো কতগুলো অভিক্ষেপ বেরিয়েছে। মিউকোসাতে গবলেট ও শোষণক্ষম কোষ রয়েছে।

স্থূলতা (Obesity)

'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল'– একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় প্রবচন। আগে সাধারণ মানুষের চোখে স্বাস্থ্যবান মানুষ বলতে দীর্ঘকায় ও মোটা-সোটা ব্যক্তিকে বোঝাত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আমরা জানতে পেরেছি যে 'মোটা-সোটা' ব্যক্তি মানেই স্বাস্থ্যবান মানুষ নয়। স্বাস্থ্যের আধুনিক সংজ্ঞা হচ্ছে : **রোগ-ব্যাধি বা অন্যান্য অস্বাভাবিক পরিস্থিতিমুক্ত শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক মঙ্গলকর অবস্থাকে স্বাস্থ্য বলে** (Mosby's Medical Dictionary, 8th edition, 2009)। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী, স্থূলতাকে স্বাস্থ্যের পরিবর্তে অসুস্থতা হিসেবে বিবেচনা করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন শাখার সৃষ্টি হয়েছে।

আদর্শ দৈহিক ওজনের ২০% বা তারও বেশি পরিমাণ মেদ দেহে সঞ্চিত হলে তাকে স্থূলতা বলে। স্থূলতার ফলে দেহের ওজন স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। পূর্ণবয়স্ক মানুষে দেহের মাত্রাতিরিক্ত ওজন নির্ধারণের জন্য উচ্চতা ও ওজনের যে আনুপাতিক হার উপস্থাপন করা হয় তাকে **দেহের ওজন সূচক বা বডি মাস ইনডেক্স** (Body Mass Index = BMI) বলে। BMI কে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয়।

$$BMI = \frac{\text{দেহের ওজন (কিলোগ্রাম)}}{\text{ব্যক্তির উচ্চতা (মিটার}^2\text{)}}$$

একজন স্বাভাবিক মানুষের BMI - এর বিস্তৃতি হলো ২৫ - ২৯.৯৯ পর্যন্ত অর্থাৎ এই মান ৩০ বা তার চেয়ে বেশি হলে তাকে স্থূলকায় বা মোটা বলা যাবে।

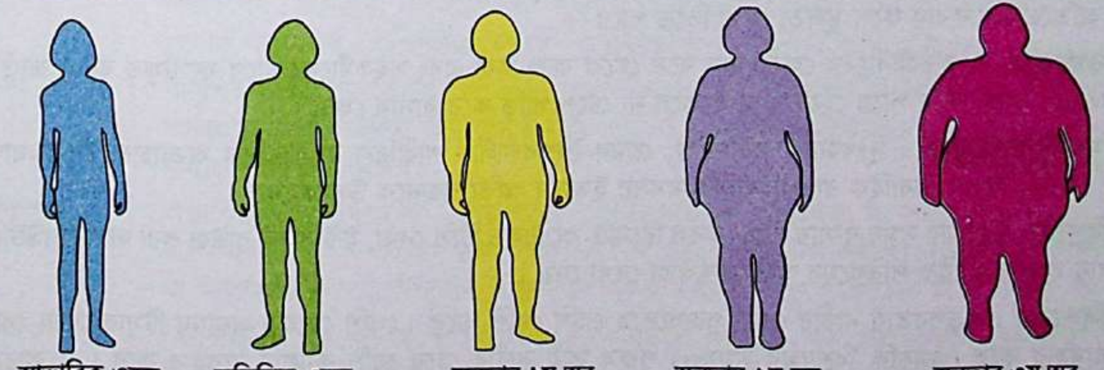

চিত্র ৩.১৫ : BMI নির্ণয়

পাশাপাশি এই মান ১৮.৫ এর নিচে হলে তাকে নিম্ন মাত্রার ওজন ধরা হয়। তবে মাত্রা যদি ৫০-১০০ হয় তবে এই স্থূলতাকে **মরবিড স্থূলতা** (morbid obesity) বা **ব্যাধিগ্রস্থ বিভৎস স্থূলতা** বলে। ২০০০ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

BMI-এর এই মান নির্দেশিকা প্রকাশ করে। এর সাহায্যে অতি সহজে মানুষের স্থূলতা নির্ণয় করা যায়। BMI-এর মান নির্দেশিকাটি নিচের ছকে প্রকাশ করা হলো –

ক্রমিক	বিএমআই (BMI)	মানুষের শ্রেণি
1	<18.5 kg/m^2	শরীরের ওজন কম (Underweight)
2	18.5 – 24.99 kg/m^2	স্বাভাবিক ওজন (Normal weight)
3	25.0 – 29.99 kg/m^2	অতিরিক্ত ওজন (Overweight)
4	30.0 – 34.99 kg/m^2	১ম শ্রেণির স্থূলতা (Class I obesity)
5	35.0 – 39.99 kg/m^2	২য় শ্রেণির স্থূলতা (Class II obesity)
6	≥ 40.0 kg/m^2	৩য় শ্রেণির ঝুঁকিপূর্ণ স্থূলতা (Class III obesity)

স্থূলতার ব্যাপকতায় সারা পৃথিবীর চিকিৎসা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে আজ স্থূলতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি শাখাও সৃষ্টি হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখায় স্থূলতার কারণ, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে বেরিয়াট্রিকস (Bariatrics) বলে। স্থূলতার কারণে যে সব রোগ হতে পারে তার মধ্যে রয়েছে–করোনারি হৃদরোগ, টাইপ-২ ডায়াবেটিস, ক্যান্সার (স্তন, কোলন), উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, যকৃত ও পিত্তথলির অসুখ, স্লিপ অ্যাপনিয়া, অস্টিও-আর্থ্রাইটিস, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি।

স্থূলতার কারণ (Causes of Obesity)

ব্যক্তি পর্যায়ে অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণ, কিন্তু পর্যাপ্ত কায়িক পরিশ্রম না করাকে স্থূলতার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, সামাজিক পর্যায়ে সুলভ ও মজাদার খাবার, গাড়ীর উপর নির্ভরতা বেড়ে যাওয়া এবং উৎপাদন যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারকে স্থূলতা বৃদ্ধির কারণ বলে মনে করা হয়। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যে সব কারণকে স্থূলতার জন্য বিশেষভাবে দায়ী করেছেন তা নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. **জিনগত** : সফল বিপাক এবং দেহে মেদ সঞ্চয় ও বিস্তারের ক্ষেত্রে **গুচ্ছ জিন** ভূমিকা পালন করে। স্থূলকায় বাবা-মায়ের সন্তান প্রায় ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে স্থূলকায় হয়। নিম্ন বিপাক হার এবং জিনগত সংবেদনশীলতা স্থূলতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

২. **পারিবারিক জীবনযাত্রা** : পরিবারের জীবনযাত্রার উপর স্থূলতা প্রকাশ অনেকখানি নির্ভর করে। খাদ্যাভ্যাস পারিবারিকভাবেই গড়ে উঠে। চর্বিযুক্ত ফার্স্টফুড (বার্গার, পিৎজা ইত্যাদি) খাওয়া, ফল, সব্জি ও অপরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট (লাল চালের ভাত) না খাওয়া, অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় পান করা; দামী রেস্তোঁরায় খাওয়ার আগে ক্ষুধাবর্ধক ও খাওয়ার শেষে চর্বি ও চিনিযুক্ত ডেসার্ট (dessert) খাওয়া।

৩. **আবেগ** : বিষণ্নতা, আশাহীনতা, ক্রোধ, একঘেঁয়েমিজনিত বিরক্তি, নিজেকে ছোট ভাবা প্রভৃতি মানষিক কারণে ক্রমাগত অতিভোজন করার ফলে স্থূলতা দেখা দিতে পারে।

৪. **কর্মক্ষেত্র** : চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রে ঠায় বসে থেকে কাজ করা এবং সহকর্মীদের চাপে ফাস্টফুড বা এ জাতীয় খাবার খাওয়া। কাজ শেষে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে না চেপে গাড়ি করে বাসায় ফেরা।

৫. **মানসিক আঘাত** : দুঃখজনক ঘটনাবলী, যেমন-শৈশবকালীন শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার; পিতা-মাতা হারানোর বেদনা; কিংবা বৈবাহিক বা পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদি অতিভোজনকে উসকে দেয়।

৬. **বিশ্রাম** : বিশ্রামের সময় বাসায় বসে কেবল রিমোট-কন্ট্রোলড টিভি দেখা, ইন্টারনেটে ব্রাউজ করা বা কম্পিউটারে গেম খেলার কারণে কায়িক পরিশ্রমের অভাবে স্থূলতা দেখা দেয়।

৭. **লিঙ্গভেদ** : গড়পরতায় নারীর চেয়ে পুরুষদেহে বেশি পেশি থাকে। পেশি যেহেতু অন্যান্য টিস্যুর চেয়ে বেশি ক্যালরি ব্যবহার করে (এমনকি বিশ্রামের সময়ও) পুরুষ তাই নারীর চেয়ে বেশি ক্যালরি ব্যবহার করে। এ কারণে নারী-পুরুষ একই পরিমাণ আহার করলেও নারীদেহে মেদ জমার আশঙ্কা বেশি থাকে।

৮. **গর্ভাবস্থা** : প্রতিবার গর্ভধারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদেহে ৪-৬ পাউন্ড ওজন বেড়ে যায়।

৯. **নিদ্রাহীনতা** : রাতে ৬ ঘন্টার কম ঘুম হলে দেহে হরমোনজনিত পরিবর্তন ঘটে ক্ষুধা বেড়ে যায় ফলে বেশি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করায় স্থূলতার সৃষ্টি হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১০. শিক্ষার অভাব : সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা না থাকা, সুষম খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, স্থূলতার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে না জানা ইত্যাদি কারণে স্থূলতা দেখা দেয়।

১১. অসুখ : পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম (Polycystic Ovary Syndrome) হলে নারীদেহে স্থূলতা দেখা দিতে পারে। তা ছাড়া, কুসিং সিনড্রোম (Cushing's Syndrome), হাইপোথাইরয়ডিজম (Hyporthyroidism) হলেও স্থূলতা হতে পারে।

১২. কতক ওষুধ : কিছু ওষুধ স্থূলতার সম্ভাবনাকে বাড়াতে পারে, যেমন–কর্টিকোস্টেরয়েডস, বিষন্নতা দূর করার ওষুধ (অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস), জন্মবিরতিকরণ বড়ি প্রভৃতি। তাছাড়া ইনসুলিন ও কিছু ডায়াবেটিক প্রতিষেধক ওষুধও স্থূলতা সৃষ্টি করে।

স্থূলতা প্রতিরোধ (Prevention of Obesity)

স্থূলতাজনিত ঝুঁকির মধ্যে কেউ থাক বা না থাক সবারই এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। স্থূলতা প্রতিরোধের জন্য নিচে উল্লেখিত আচরণ-কেন্দ্রিক বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ, পালন ও অনুসরণ করতে হবে।

১. নিয়মিত ব্যায়াম : সপ্তাহে অন্তত ১৫০–২৫০ মিনিট দ্রুত হাঁটা বা সাঁতার কাটার অভ্যাস করতে হবে।

২. স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যগ্রহণ : কম ক্যালোরি ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ফল, সব্জি ও গোটা শস্য দানা গ্রহণ করতে হবে।

৩. খাদ্য নিয়ন্ত্রণ : চর্বিযুক্ত খাবার, মিষ্টিসমৃদ্ধ আহার গ্রহণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অ্যালকোহল গ্রহণ নিষিদ্ধ করতে হবে।

৪. লোভনীয় খাবার পরিহার : লোভনীয় খাবারের দিকে হাত বাড়ানো ঠিক নয়। ভুক্তভোগীরা যেন আহার গ্রহণের সময় তাদের জন্য নির্ধারিত খাবার তালিকা কঠোরভাবে মেনে চলেন সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

৫. দেহের ওজন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা : প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত অন্তত একবার নিজের ওজন মেপে দেখতে হবে রুটিন অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণের প্রভাব কতখানি সফল হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী ফল পেতে হলে খাদ্য ও ব্যায়াম সংক্রান্ত তালিকার প্রতি অটল ও বিশ্বস্ত থাকতে হবে।

৬. চিকিৎসা : Orlistat (Xenical), Lorcaserin (Belviq), Phentermine (Suprenza) প্রভৃতি ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্থূলতা প্রতিকারে মানুষ আজ ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারেও পিছপা হচ্ছে না।

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

কাইম : পাকস্থলিতে খাদ্য প্রবেশের পর পাকস্থলির পেশির সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যদলা গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত গ্যাস্ট্রিক জুসের সাথে মিশে দলিত মথিত হয়ে নরম পিচ্ছিল খাদ্যপিণ্ডে পরিণত হয়। একে কাইম (chyme) বলে।

এপিগ্লটিস : মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর জিহ্বার একেবারে গোড়ায় (গলবিলে) সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র নমনীয় অঙ্গবিশেষ। খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণের সময় এটি শ্বাসরন্ধ্রকে (গ্লটিস) আবৃত করে শ্বাসনালিতে খাদ্য প্রবেশে বাধা দেয়। এপিগ্লটিস স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি ও শ্লেষ্মাস্তর দিয়ে গঠিত।

লালা : মানুষের মুখের তিনজোড়া লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত একপ্রকার বর্ণহীন জলীয় দ্রবণের নাম লালা। লালায় অবস্থিত মিউসিন খাদ্যদ্রব্যকে নরম ও পিচ্ছিল করে এবং টায়ালিন ও মল্টেজ এনজাইম শর্করা খাদ্যকে পরিপাক করে।

অগ্ন্যাশয় : অগ্ন্যাশয় একটি মিশ্রগ্রন্থি। অগ্ন্যাশয়ের লোবিওল নামক বহিঃক্ষরা বা সনালগ্রন্থি নিঃসৃত অগ্ন্যাশয় রসের নানা প্রকার এনজাইম খাদ্য পরিপাক করে এবং **আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স** নামক অন্তঃক্ষরা বা অনালগ্রন্থি নিঃসৃত ইনসুলিন ও গ্লুকাগন নামক হরমোন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

সিকাম : মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত বদ্ধ থলির মতো স্ফীত অংশের নাম সিকাম। মাংসাশী প্রাণীর সিকাম ক্ষুদ্রাকৃতির হয়। কিন্তু অধিকাংশ তৃণভোজী প্রাণীর ক্ষেত্রে এটি বেশ বড় ও সুগঠিত থাকে। এখানে সেলুলোজ পরিপাক হয়। মানুষের ক্ষেত্রে এটি একটি লুপ্তপ্রায় অঙ্গ।

ডিঅ্যামিনেশন : যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো এসিড থেকে অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) অপসারিত হয় তাকে ডিঅ্যামিনেশন বলে। যকৃত অতিরিক্ত ও অব্যবহৃত অ্যামিনো এসিড ডিঅ্যামিনেশন প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে কিটো এসিড ও অ্যামিন মূলক তৈরি করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

লাইপোজেনেসিস: যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ থেকে লিপিড সৃষ্টি হয় তাকে **লাইপোজেনেসিস** বলে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা যদি এমন পরিমাণ বেড়ে যায় যে তা শক্তি উৎপাদন ও গ্লাইকোজেন সঞ্চয় ক্ষমতার মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় তখন ইনসুলিন হরমোনের প্রভাবে যকৃত অতিরিক্ত গ্লুকোজকে ট্রাইগ্লিসারাইডে (লিপিড) রূপান্তর করে।

গ্লাইকোজেনোলাইসিস: যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যকৃতের সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ তৈরি হয় তাকে **গ্লাইকোজেনোলাইসিস** বলে। রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা কমে গেলে গ্লাইকোজেনোলাইসিস প্রক্রিয়ায় যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ তৈরি হয় এবং রক্তে মিশে যায়।

মেমব্রেন এনজাইম: অন্ত্রের অন্তঃপ্রাচীরে বিদ্যমান মাইক্রোভিলাইয়ের কোষের প্লাজমা মেমব্রেনে কতগুলো এনজাইম পরিপাক ক্রিয়ায় নিয়োজিত থেকে সর্বদা শর্করা, আমিষ ও ফসফেট জাতীয় যৌগকে পরিপাক করে। মাইক্রোভিলাই কোষের প্লাজমা মেমব্রেনে বিদ্যমান এসব এনজাইমকে **মেমব্রেন এনজাইম** বলে।

গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল হরমোন: খাদ্য পরিপাকের সকল প্রক্রিয়া কয়েকটি হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। খাদ্য পরিপাকের সাথে জড়িত সকল হরমোন পাকস্থলি ও অন্ত্রের মিউকোসা স্তরের কোষ থেকে ক্ষরিত হয়। এসব হরমোন রাসায়নিকভাবে পেপটাইড জাতীয় এবং সামগ্রিকভাবে **গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল হরমোন** বা **জিআই হরমোন** নামে পরিচিত।

স্থূলতা: দেহের ওজন অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার কারণে যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি হয় তাকেই **স্থূলতা** (obesity) বলে। এক্ষেত্রে চর্বি জমার কারণে দেহের উচ্চতার তুলনায় ওজন অনেক বেড়ে যায় যা বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মানুষের অ্যাপেনডিক্স পরিপাক নালির কোন অংশের সাথে যুক্ত?
ক) জেজুনাম খ) ইলিয়াম
গ) সিকাম ঘ) কোলন

২. পরিপাকে সাহায্যকারী হরমোন কোনটি? [চ.বো.১৫]
ক) গ্লুকাগন খ) এড্রিন্যালিন
গ) ইনসুলিন ঘ) সিক্রেটিন

৩. সাইনুসয়েড পাওয়া যায় কোথায়?
ক) যকৃতে খ) অগ্ন্যাশয়ে
গ) ফুসফুসে ঘ) হৃৎপিণ্ডে

৪. কোনটিকে মানবদেহের ল্যাবরেটরি বলা হয়? [ব.বো.১৫]
ক) যকৃত খ) অগ্ন্যাশয়
গ) হৃৎপিন্ড ঘ) ফুসফুস

৫. ক্ষুদ্রান্ত্রের অংশ নয় কোনটি? [ঢা.বো.১৫]
ক) ডিওডেনাম খ) সিকাম
গ) জেজুনাম ঘ) ইলিয়াম

৬. মানুষের মুখের দুপাশে কয়জোড়া লালাগ্রন্থি আছে?
ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৬

৭. নিচের কোন এনজাইম অম্লীয় পরিবেশে অধিক কার্যকরী?
ক) ট্রিপসিন খ) ইরেপসিন
গ) পেপসিন ঘ) কাইমোট্রিপসিন

৮. কোনটি দুগ্ধ প্রোটিন পরিপাককারী এনজাইম?
ক) রেনিন খ) কেসিন
গ) পেপসিন ঘ) ট্রিপসিন

৯. আমাদের প্রতি চোয়ালের সামনে কয়টি কর্তন দাঁত আছে?
ক) ১টি খ) ২টি
গ) ৩টি ঘ) ৪টি

১০. দুধ দাঁতে অনুপস্থিত থাকে কোনটি?
ক) ইনসিসর খ) ক্যানাইন
গ) প্রিমোলার ঘ) মোলার

১১. 'কেসিন' কোন ধরনের উপাদান?
ক) শর্করা খ) প্রোটিন
গ) ফ্যাট ঘ) ভিটামিন

১২. ভাত মুখগহ্বরে রাখলে কী ঘটবে?
ক) খাদ্য কাইমে পরিণত হবে
খ) ইমালসিফিকেশন হবে
গ) খাদ্য পলিপেপটাইডে পরিণত হবে
ঘ) খাদ্য মল্টোজ-এ পরিণত হবে

১৩. গলবিলে উন্মুক্ত হয় না কোনটি? [ব.বো.১৭]
ক) শ্বাসনালি খ) অন্ননালি
গ) ইউস্টেশিয়ান নালি ঘ) উইর্সাং এর নালি

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL BDNIYOG.COM COPYRIGHT

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৪ মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সঞ্চালন
Human Physiology : Blood & Circulation

মানবদেহের অভ্যন্তরে এক বিশেষ তন্ত্র খাদ্যসার, শ্বসন গ্যাস ও রেচন বর্জ্য পরিবহন এবং দেহের তাপমাত্রা ও বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ, বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও রোগজীবাণু প্রতিরোধের কাজে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত। এর নাম **রক্ত সংবহনতন্ত্র। রক্তবাহিকাসমৃদ্ধ এবং হৃৎপিন্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত যে তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয় তাকে রক্ত সংবহনতন্ত্র বলে।** ব্রিটিশ চিকিৎসক Willium Harvey, 1628 খ্রিস্টাব্দে মানুষের রক্ত সংবহন সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা প্রদান করেন। এ অধ্যায়ে মানব রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং এর কিছু জটিলতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- রক্ত
- লসিকা
- রক্ত তঞ্চন
- হৃৎচক্র
- ব্যারোরিসেপ্টর
- অ্যানজাইনা
- পেসমেকার
- প্লাক

পিরিয়ড সংখ্যা-১৪ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. রক্তকণিকা ও লসিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ২. রক্ত জমাট বাঁধার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. ব্যবহারিক : রক্তের কণিকাসমূহ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে। ৪. হৃৎপিণ্ডের গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ৫. হার্টবিটের দশাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. হার্টবিট নিয়ন্ত্রণে SA নোড, BM নোড এবং পারকিনজি আঁশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টর এবং আয়তন রিসেপ্টরের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. মানবদেহের রক্ত সংবহন পদ্ধতির তুলনা করতে পারবে। ৯. হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থা ও করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক রক্ত সঞ্চালনে পেস মেকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. ওপেন হার্ট সার্জারি, করোনারি বাইপাস এবং এনজিওপ্লাস্টির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● রক্তকণিকা ও লসিকা ● রক্ত জমাট বাঁধা ● ব্যবহারিক ○ রক্ত কণিকাসমূহের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ ● হৃৎপিন্ডের গঠন ● হার্টবিট, বিভিন্ন দশা ও এর নিয়ন্ত্রণে SA নোড, BM নোড এবং পারকিনজি আঁশের ভূমিকা ● রক্তচাপ ও ব্যারোরিসেপ্টর এবং আয়তন রিসেপ্টরের ভূমিকা ● মানবদেহে রক্ত সংবহন ○ সিস্টেমিক সংবহনতন্ত্র ○ পালমোনারি সংবহন ● হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থায় করণীয় ○ বুকের ব্যাথা ○ হার্ট এটাক ○ হার্ট ফেইলিউর ● হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা ○ পেস মেকার কার্যক্রম ○ ওপেন হার্ট সার্জারি ○ করোনারি বাইপাস ○ এনজিওপ্লাস্টি

রক্ত (Blood)

রক্ত হচ্ছে মানুষের জীবন রক্ষাকারী এক বিশেষ তরল যোজক টিস্যু যার মাধ্যমে বিভিন্ন রক্তবাহিকা দেহের সকল কোষে পুষ্টি, ইলেক্ট্রোলাইট, হরমোন, ভিটামিন, অ্যান্টিবডি, O_2, ইমিউন কোষ ইত্যাদি বহন করে এবং CO_2 ও বর্জ্য পদার্থ প্রত্যাহৃত হয়। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের দেহে প্রায় ৫–৬ লিটার রক্ত থাকে অর্থাৎ দেহের মোট ওজনের প্রায় ৮%। রক্ত সামান্য ক্ষারীয়। এর pH মাত্রা ৭.৩৫-৭.৪৫ (গড়ে ৭.৪০) এবং তাপমাত্রা ৩৬-৩৮° সেলসিয়াস। রক্তের আপেক্ষিক গুরুত্ব পানির চেয়ে বেশি, প্রায় ১.০৬৫। অজৈব লবণের উপস্থিতির জন্য রক্তের স্বাদ নোনতা। সুনির্দিষ্ট বাহিকার মাধ্যমে রক্ত দেহের সবখানে সঞ্চালিত হয়।

রক্তের উপাদান (Components of Blood)

টেস্টটিউবে রক্ত নিয়ে সেন্ট্রিফিউগাল যন্ত্রে ঘুরালে রক্ত দুটি স্তরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উপরের হালকা হলুদ বর্ণের প্রায় ৫৫% যে অংশ থাকে তা **রক্তরস** বা **প্লাজমা** (plasma) এবং নিচের গাঢ়তর বাকি ৪৫% অংশ **রক্তকণিকা** (blood corpuscles)। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তকণিকাগুলো রক্তরসে ভাসমান থাকে। লোহিত কণিকার আধিক্যের কারণে রক্ত লাল দেখায়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

রক্তরস বা প্লাজমা (Plasma)

রক্তরস বা প্লাজমা হচ্ছে রক্তের হালকা হলুদ বর্ণের তরল অংশ। এতে পানির পরিমাণ ৯০–৯২% এবং দ্রবীভূত কঠিন পদার্থের পরিমাণ ৮–১০%। রক্তরসের কঠিন পদার্থ বিভিন্ন জৈব (৭–৯%) ও অজৈব (০.৯%) উপাদান নিয়ে গঠিত। তা ছাড়া, কয়েক ধরনের গ্যাসও রক্তরসে পাওয়া যায়। রক্তরসে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো উপস্থিত।

ক. অজৈব পদার্থ (Inorganic constituents) : রক্তরসে অজৈব পদার্থের পরিমাণ প্রায় ০.৯%। এর মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বোনেট, ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, তামা, আয়োডিন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

খ. জৈব পদার্থ (Organic constituents) : রক্তের জৈব উপাদানগুলো হচ্ছে:

i. **প্লাজমা প্রোটিন** (Plasma protein) : জৈব পদার্থের মধ্যে প্লাজমা প্রোটিনের পরিমাণ প্রায় ৭.৫%। প্লাজমা প্রোটিনের মধ্যে অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, প্রোথ্রম্বিন, ফাইব্রিনোজেন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ii. **নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ** (Nitrogenous excretory products): রেচন পদার্থের মধ্যে রয়েছে– ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন, জ্যানথিন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি।

iii. **অন্যান্য পদার্থ** : গ্লুকোজ, ফ্যাট, কোলেস্টেরল, হরমোন, বিভিন্ন প্রকার এনজাইম রক্তরসে অবস্থান করে। বিভিন্ন ভিটামিন, রঞ্জক পদার্থ (বিলিরুবিন, ক্যারোটিন) ইত্যাদিও রক্তরসে পাওয়া যায়।

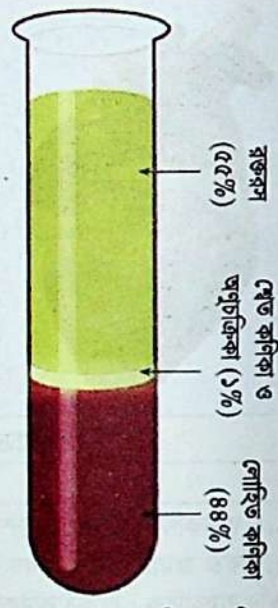

চিত্র ৪.১ রক্তরস ও কণিকার পরিমাণ

রক্তরসের কাজ : (i) রক্তের তরলতা রক্ষা করে এবং ভাসমান রক্ত কণিকাসহ অন্যান্য দ্রবীভূত পদার্থ দেহের সর্বত্র পরিবাহিত হয়। (ii) পরিপাকের পর খাদ্যসার রক্তরসে দ্রবীভূত হয়ে দেহের বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গে বাহিত হয়। (iii) টিস্যু থেকে যে সব বর্জ্যপদার্থ বের হয় তা রেচনের জন্য বৃক্কে নিয়ে যায়। (iv) টিস্যুর অধিকাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড রক্তরসে বাইকার্বনেটরূপে দ্রবীভূত থাকে। (v) অল্প পরিমাণ অক্সিজেন বাহিত হয়। (vi) লোহিত কণিকায় সংবদ্ধ হওয়ার আগে অক্সিজেন প্রথমে রক্তরসেই দ্রবীভূত হয়। (vii) রক্তরসের মাধ্যমে হরমোন, এনজাইম, লিপিড প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গে বাহিত হয়। (viii) রক্তরস রক্তের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করে। (ix) রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পরিবহন করে। (x) যকৃত, পেশি ইত্যাদি অঙ্গে উৎপন্ন তাপ শক্তিকে সমগ্র দেহে পরিবহন করে দেহে তাপের সমতা রক্ষা করে।

রক্তকণিকা (Blood Corpuscles)

রক্তে ভাসমান বিভিন্ন কোষকে রক্তকণিকা বলা হয়। এগুলো হিমাটোপয়েসিস (hematopoiesis) প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। অন্যান্য কোষের মতো স্ববিভাজিত হয়ে সৃষ্টি হয় না বলে এদের কোষ না বলে কণিকা বলা হয়। রক্তের ৪৫% হলো রক্তকণিকা যা রক্তরসের মধ্যে নিমজ্জিত থাকে। রক্তকণিকা তিন ধরনের, যথা– এরিথ্রোসাইট বা লোহিত রক্তকণিকা, লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা ও প্লেইটলেট বা অণুচক্রিকা।

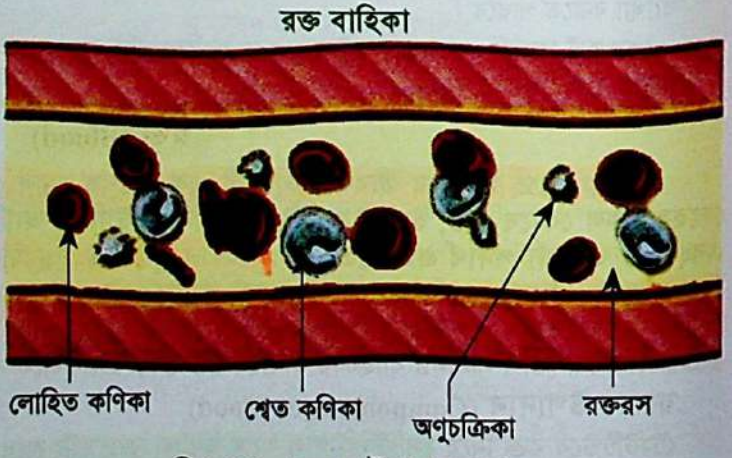

চিত্র ৪.২ : রক্তের উপাদানসমূহ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

নিচের ছকের মাধ্যমে রক্তের উপাদানগুলো দেখানো হলো।

- রক্ত
  - রক্তরস বা প্লাজমা (৫৫%)
    - পানি (৯০-৯২%)
    - কঠিন পদার্থ (৮-১০%)
      - অজৈব উপাদান (০.৯%)
        - i. সোডিয়াম ক্লোরাইড
        - ii. পটাসিয়াম
        - iii. ক্যালসিয়াম
        - iv. ম্যাগনেসিয়াম
        - v. ফসফরাস
        - vi. লৌহ
        - vii. তামা
      - জৈব উপাদান (৭-৯%)
        - প্লাজমা প্রোটিন
          - i. অ্যালবুমিন
          - ii. গ্লোবিউলিন
          - iii. প্রোথ্রম্বিন
          - iv. ফাইব্রিনোজেন
        - নাইট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ
          - i. ইউরিয়া
          - ii. ইউরিক এসিড
          - iii. ক্রিয়েটিনিন
          - iv. জ্যানথিন
          - v. অ্যামোনিয়া
        - অন্যান্য পদার্থ
          - i. গ্লুকোজ
          - ii. লিপিড
          - iii. হরমোন
          - iv. এনজাইম
          - v. রঞ্জক পদার্থ
  - রক্তকণিকা (৪৫%)
    - লোহিত রক্তকণিকা
    - শ্বেত রক্তকণিকা
      - গ্র্যানিউলোসাইট
        - ইওসিনোফিল
        - বেসোফিল
        - নিউট্রোফিল
      - অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট
        - লিম্ফোসাইট
        - মনোসাইট
    - অণুচক্রিকা

১. লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট (Erythrocyte; গ্রিক, *erythros* = লোহিত + *kytos* = কোষ)

মানবদেহের রক্তরসে ভাসমান গোল, দ্বি-অবতল চাকতির মতো, নিউক্লিয়াসবিহীন কিন্তু অক্সিজেনবাহী হিমোগ্লোবিনযুক্ত, লাল বর্ণের কণিকাকে লোহিত রক্তকণিকা বলে। এ ধরনের কণিকার গড় ব্যাস ৭.৩ μm ও গড় স্থূলতা ২.২μm, এবং কিনারা অপেক্ষা মধ্যভাগ অনেক পাতলা। স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মধ্যে কেবল উটের লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে-এ তথ্যটি ভুল। উটের এরিথ্রোসাইটও নিউক্লিয়াসবিহীন, তবে কণিকার আকার কিছুটা ভিন্নতর।

বিভিন্ন বয়সের মানবদেহে প্রতি ঘন মিলিমিটার রক্তে রক্তকণিকার সংখ্যা হচ্ছে: ভ্রূণদেহে ৮০-৯০ লাখ; শিশুর দেহে ৬০-৭০ লাখ; পূর্ণবয়স্ক পুরুষে ৫৪ লাখ; পূর্ণবয়স্ক স্ত্রীদেহে ৪৮ লাখ। বিভিন্ন শারীরিক অবস্থায় এ সংখ্যার তারতম্য ঘটে, যেমন- ব্যায়াম ও গর্ভাবস্থায় কণিকার সংখ্যা বেশি হয়।

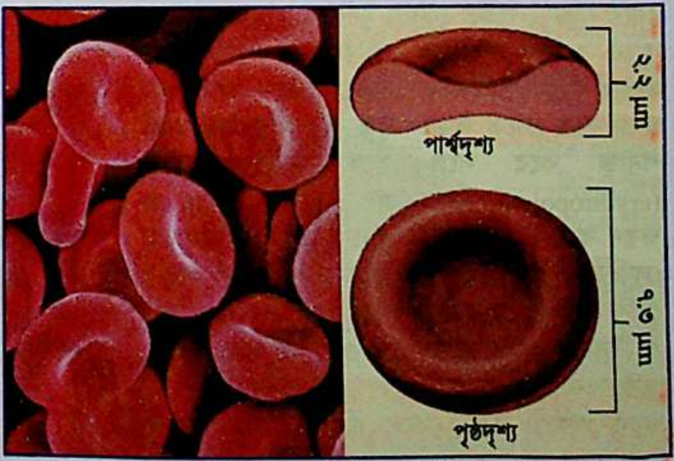

চিত্র ৪.৩ : লোহিত রক্তকণিকা

মানব ভ্রূণের প্রাথমিক পর্যায়ে (তিন সপ্তাহ বয়সে) কুসুম থলিতে, মাধ্যমিক পর্যায়ে (ছয় মাস বয়স পর্যন্ত) যকৃত এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় থেকে পর্শুকা, কশেরুকা, স্টার্ণাম ও শ্রোণিচক্রের লাল অস্থিমজ্জায় অবস্থিত বড় নিউক্লিয়াসযুক্ত এরিথ্রোব্লাস্ট (erythroblast) নামক স্টেমকোষ থেকে অবিরাম লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয়। এ সময় হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষিত হয় এবং একটি এরিথ্রোব্লাস্ট কয়েকবার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। লোহিত কণিকা পরিস্ফুটনের সময় নিউক্লিয়াস সংকুচিত ও অকার্যকর হয়ে পড়ে এবং অবশেষে এক্সোসাইটোসিস (exocytosis; প্লাজমাঝিল্লির মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় পদার্থসমূহ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কোষের বাইরে নিষ্কাশিত হওয়া) প্রক্রিয়ায় রক্তরসে পরিত্যক্ত হয়। নিউক্লিয়াস না থাকায় আর বিভাজনও ঘটে না। তখন রাইবোজোম, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বস্তু, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ইত্যাদি প্রধান কোষীয় অঙ্গাণুও বর্জিত হয়। কোষটি তখন প্লাজমাঝিল্লিতে আবদ্ধ হিমোগ্লোবিন অণুপূর্ণ দ্বি-অবতল চাকতির মতো দেখায়। কণিকা দ্বি-অবতল হওয়ায় গ্যাস ব্যাপনের ক্ষেত্র অনেক বেড়ে যায়, সমতল বা উত্তল হলে এমন সুযোগ সৃষ্টি হতো না।

প্রতিটি হিমোগ্লোবিন অণু **হিম** (heme) নামক অক্সিজেনবাহী লৌহসমৃদ্ধ রঞ্জক ও **গ্লোবিন** (globin) নামক প্রোটিন দিয়ে গঠিত। একটি লোহিত কণিকার ওজনের ৩৩% হিমোগ্লোবিন। মানবদেহের সকল লোহিত কণিকায় লৌহের সামগ্রিক পরিমাণ দেহের মোট লৌহের প্রায় ৬৫ ভাগ। প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে ১৬ গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে। প্রত্যেক লোহিত কণিকায় ২৮০ মিলিয়ন হিমোগ্লোবিন অণু থাকে। একটি হিমোগ্লোবিন অণু যেহেতু চারটি O_2 অণুর সাথে যুক্ত হতে পারে, তাই একটি লোহিত কণিকা অন্য কণিকার তুলনায় ক্ষুদ্র হলেও এক বিলিয়নের বেশি সংখ্যক O_2 অণু বহন করে। কণিকা তখন ফুসফুসের কৈশিক জালিকা সমৃদ্ধ অংশ দিয়ে অতিক্রম করে যখন O_2 কণিকায় ব্যাপিত হয় এবং হিমোগ্লোবিনে আবদ্ধ হয় (অক্সিহিমোগ্লোবিন)। সিস্টেমিক কৈশিক নালিতে হিমোগ্লোবিন থেকে O_2 বিযুক্ত হয়ে দেহকোষে ব্যাপিত হয়।

চিত্র ৪.৪ : হিমোগ্লোবিন অণু

লোহিত রক্তকণিকা অত্যন্ত নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক প্রকৃতির হওয়ায় কৈশিকনালির মতো ক্ষুদ্রতম রক্তবাহিকার অভ্যন্তরেও প্রবাহের সময় অতি সহজে এঁকে-বেঁকে যেতে পারে। কণিকার প্লাজমাঝিল্লি ক্লোরাইড ও বাইকার্বনেট আয়নের দ্রুত বিনিময়ের জন্য বিশেষায়িত। লোহিত কণিকার আয়ুষ্কাল ৪ মাস (১২০ দিন)। এ সময়কালে একটি কণিকা মানবদেহের ভিতরে প্রায় ১১,০০০ কিলোমিটার পথ পরিভ্রমণ করে। একেকটি কণিকা প্রতি মিনিটে একবার সমগ্র দেহ ঘুরে আসে। মানবদেহে প্রতি সেকেন্ডে ২০ লক্ষ থেকে ১ কোটি লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয় এবং সমপরিমাণ বিনষ্ট হয়। বিনষ্ট কণিকার ভগ্নাবশেষ দ্রুত যকৃত, অস্থিমজ্জা ও প্লীহায় অবস্থিত বড় বড় **ম্যাক্রোফেজ** (macrophaoge) নামক কোষে ভক্ষিত ও বিশ্লিষ্ট হয়। এগুলোর লৌহ অংশ **ফেরিটিন** (ferritin) হিসেবে যকৃতে জমা থেকে নতুন লোহিত কণিকা সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু রঞ্জকগুলো **বিলিরুবিন** (bilirubin) নামক পিত্তরঞ্জকে রূপান্তরিত হয় এবং পিত্তের সাথে রেচন প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয়।

রাসায়নিকভাবে লোহিত কণিকার ৬০–৭০% পানি এবং ৩০–৪০% কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের মধ্যে প্রায় ৯০% **হিমোগ্লোবিন**। অবশিষ্ট ১০% প্রোটিন, ফসফোলিপিড, কোলেস্টেরল, অজৈব লবণ, অজৈব ফসফেট, পটাসিয়াম ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।

লাল অস্থিমজ্জার মধ্যে **স্টেমকোষ** (stem cell) থেকে লোহিত রক্তকণিকা উদ্ভূত হয়। রক্তে অক্সিজেন মাত্রা কমে গেলে নতুন লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয়। রক্তপাত, উঁচু স্থানে অবস্থান, ব্যায়াম, অস্থিমজ্জার ক্ষতি, কম মাত্রার হিমোগ্লোবিনসহ বিভিন্ন কারণে অক্সিজেন মাত্রা কমে যেতে পারে। বৃক্ক কম অক্সিজেন মাত্রা শনাক্ত করে সঙ্গে সঙ্গে এরিথ্রোপয়েটিন (erythropoietin) নামে এক হরমোন উৎপন্ন ও ক্ষরণ করে। এ হরমোন লাল অস্থিমজ্জার মাধ্যমে লোহিত কণিকা উৎপাদন প্রক্রিয়াকে উদ্দীপ্ত করে। বেশি লোহিত রক্তকণিকা রক্তপ্রবাহে যুক্ত হলে রক্ত ও টিস্যুতে অক্সিজেনের মাত্রাও বেড়ে যায়। রক্তে অক্সিজেন মাত্রা বৃদ্ধি পেলে বৃক্ক এরিথ্রোপয়েটিন ক্ষরণ কমিয়ে দেয়, ফলে লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদনও কমে যায়।

চিত্র ৪.৫ : বিভিন্ন ধরনের রক্তকণিকার উৎপত্তি

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

লোহিত কণিকার কাজ : (i) হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে ফুসফুস থেকে দেহকোষে অধিকাংশ O_2 ও সামান্য পরিমাণ CO_2 সরবরাহ করে। (ii) রক্তের ঘনত্ব ও আঠালো ভাব রক্ষা করে। (iii) হিমোগ্লোবিন বাফার হিসেবে রক্তে অম্ল-ক্ষারের সমতা রক্ষা করে এবং রক্তের সাধারণ ক্রিয়া বজায় রাখতে সাহায্য করে। (iv) রক্তের আয়নিক ভারসাম্য অব্যাহত রাখে। (v) রক্তরসের সাথে অভিস্রবণিক সম্পর্ক রক্ষা করে। (vi) প্লাজমাঝিল্লিতে সংযুক্ত অ্যান্টিজেন রক্তের গ্রুপিংয়ে সাহায্য করে। (vii) এসব কণিকা রক্তে বিলিভার্ডিন ও বিলিরুবিন উৎপন্ন করে।

২. শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট (Leucocytes; গ্রিক *leucos* = বর্ণহীন, *Kytos* = কোষ)

দেহকে জীবাণুঘটিত রোগ থেকে মুক্ত রাখতে যে রক্তকণিকা ইমিউনতন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সদা তৎপর থাকে তা হচ্ছে লিউকোসাইট বা শ্বেত রক্তকণিকা। যেভাবেই বা যে পথেই জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটুক না কেন শ্বেত রক্তকণিকার দুটি বিশেষ সতর্ক প্রহরী **B-লিম্ফোসাইট ও ফ্যাগোসাইট** অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেগুলো মোকাবিলা করে মানুষের জীবন রক্ষা করে। মানুষের চোখের অন্তরালে এ কণিকাগুলো আজীবন সংঘবদ্ধভাবে দেহের **ভ্রাম্যমাণ প্রতিরক্ষামূলক ইউনিট** (mobile defensive unit) হিসেবে কাজ করে চলেছে। সব বয়সে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা এক নয়। নবজাতকে প্রতি মাইক্রোলিটার (mL) রক্তে শ্বেত কণিকার সংখ্যা ৯,০০০–৩০,০০০; দুবছরের কম বয়সীর দেহে ৬,২০০–১৭,০০০; এবং দুবছরের বেশি ও পূর্ণবয়স্ক মানবদেহে ৪,০০০–১০,০০০ (গড়ে ৭,০০০)। লোহিত ও শ্বেত কণিকার অনুপাত ৭০০ : ১। পরিণত সুস্থ মানুষের রক্তের মাত্র ১% শ্বেত রক্তকণিকা।

রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকলে তাকে **লিউকোসাইটোসিস** (leukocytosis) এবং কম থাকেলে তাকে **লিউকোপেনিয়া** (leukopenia) বলে। রক্তে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা কম থাকলে দুর্বল অনাক্রম্যতা প্রকাশ পায় অর্থাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। **লিউকেমিয়া** (leukamia) ক্যানসারের ক্ষেত্রে লোহিত কণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কিন্তু শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায় এবং রোগীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কিছু শ্বেত রক্তকণিকা রক্ত থেকে স্থানান্তরিত হয়ে দেহের অন্য কোন টিস্যুতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। যকৃতে বিদ্যমান **কাপফার কোষ** (Kupffer cells) এক ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা যা অনাক্রম্যতন্ত্রের অংশ হিসেবে কাজ করে।

রাসায়নিকভাবে শ্বেত রক্তকণিকা নিউক্লিওপ্রোটিন, গ্লাইকোজেন, লিপিড, কোলেস্টেরল, অ্যাস্‌করবিক এসিড ও প্রোটিন বিশ্লেষী এনজাইম সমৃদ্ধ।

রঞ্জিত শ্বেত কণিকার সাইটোপ্লাজমে ক্ষুদ্র দানার উপস্থিতির ভিত্তিতে শ্বেত কণিকা দুধরনের– **গ্র্যানিউলোসাইট** ও **অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট**।

ক. গ্র্যানিউলোসাইট (Granulocytes)

যে শ্বেত কণিকার সাইটোপ্লাজম দানাদার সেসব কণিকাকে **গ্র্যানিউলোসাইট** বলে। এ কোষের একেকটি দানা হচ্ছে ঝিল্লিবদ্ধ এনজাইম যা প্রধানত কোষে ভক্ষিত পদার্থ পরিপাকে অংশ নেয়। গ্র্যানিউলোসাইটের নিউক্লিয়াস একাধিক (২–৭টি) খণ্ডযুক্ত। জীবাণু ইত্যাদি শনাক্তের জন্য এ কোষ বিশেষ প্রোটিন শৃঙ্খল বহন করে। শ্বেত কণিকার ৭২% হচ্ছে গ্র্যানিউলোসাইট। অস্থিমজ্জার **মায়েলোব্লাস্ট** (myeloblast) নামে কোষ থেকে এগুলো উৎপন্ন হয়ে রক্ত প্রবাহের মাধ্যমে সমগ্র দেহ পরিভ্রমণ করে। এদের আয়ুষ্কাল মাত্র ৪–৮ ঘণ্টা। গ্র্যানিউলোসাইটের সাইটোপ্লাজমের দানাগুলো **লিইশম্যান রঞ্জক** (Leishman stain)-এ নানাভাবে রঞ্জিত হয়। বর্ণধারনের বিভিন্নতায় গ্র্যানিউলোসাইট নিচে বর্ণিত তিন ধরনের।

১. নিউট্রোফিল (Neutrophil) : এ ধরনের শ্বেত কণিকা গোল, ১২–১৫µm ব্যাস ও ২–৫ (সাধারণত ৩টি) খণ্ডবিশিষ্ট নিউক্লিয়াস, গোলাপী সাইটোপ্লাজম ও রক্তাভ দানাযুক্ত গ্র্যানিউলোসাইট। শ্বেত রক্তকণিকার ৭০% নিউট্রোফিল। প্রতি মাইক্রোলিটারে ৪৯০০টি নিউট্রোফিল থাকে। [বিস্তারিত বর্ণনা ১০ম অধ্যায়ে।] এগুলোর আয়ুষ্কাল ২– ৫ দিন।

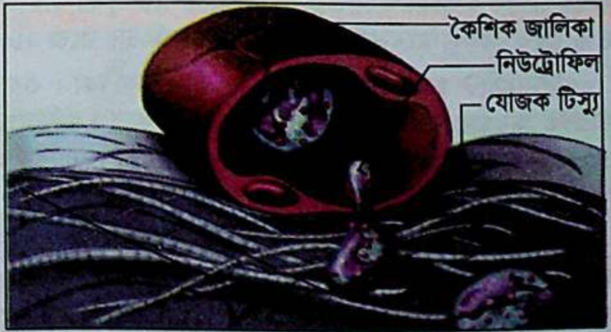

চিত্র ৪.৬ :কৈশিক জালিকা ভেদ করে নিউট্রোফিলের টিস্যুতে প্রবেশ

নিউট্রোফিল অ্যামিবয়েড চলনে সক্ষম এবং সংকুচিত হয়ে কৈশিক জালিকা প্রাচীরে কণিকার চেয়ে ছোট ছিদ্র ভেদ করে টিস্যুতে ও সংক্রমণস্থলে উপস্থিত হতে পারে। এ প্রক্রিয়াকে **ডায়াপেডেসিস** (diapedesis) বলে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কাজ : নিউট্রোফিলের প্রধান কাজ হচ্ছে : (i) ফ্যাগোসাইটোসিসের মাধ্যমে দেহে প্রবিষ্ট জীবাণুকে সম্পূর্ণ গ্রাস করা। (ii) দেহের অন্যান্য কোষকে যথাযথ সাড়া দেয়ার জন্য অণুপ্রবেশকারী সম্পর্কে রাসায়নিক বার্তা প্রেরণ করা। (iii) লিপিডজাত এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে, ফলে রক্তবাহিকার প্রাচীর আরও ভেদ্য হয় এবং আরও বেশি নিউট্রোফিল এসে সংক্রমণস্থলে জমা হয়ে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

২. **ইওসিনোফিল** (Eosinophil) : এ ধরনের শ্বেত কণিকা গোল, ১২–১৭μm ব্যাস ও দুই খণ্ডবিশিষ্ট নিউক্লিয়াস, নীলাভ সাইটোপ্লাজম ও লালচে-কমলা রঙের দানাযুক্ত গ্র্যানিউলোসাইট। শ্বেত কণিকার ১.৫% ইওসিনোফিল। রক্তবাহিকা অপেক্ষা পৌষ্টিকনালিতে এগুলো বেশি পাওয়া যায়।

কাজ : (i) প্রধান কাজ হচ্ছে অ্যালার্জিজনিত প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা এবং তার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কষ্ট লাঘব করা। (ii) ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় গ্রাস করা অসম্ভব এমন বড় জীবাণু ধ্বংসের উদ্দেশে ইওসিনোফিল সংক্রমণস্থলে জড়ো হয়ে হাইড্রোলাইটিক এনজাইম ক্ষরণ ও মারাত্মক প্রতিক্রিয়াশীল অক্সিজেন ত্যাগ করে *Schistosoma, Trichinella* প্রভৃতি পরজীবীর মৃত্যু ঘটায়। (iii) সাইটোপ্লাজমের দানা থেকে জীবাণুর লার্ভানাশক পলিপেপটাইড ক্ষরণ করে।

৩. **বেসোফিল** (Basophil) : এ ধরনের শ্বেত কণিকা গোল, ১২–১৫μm ব্যাস ও দুই খণ্ডবিশিষ্ট নিউক্লিয়াস, নীলচে-কালো রঙের দানাযুক্ত গ্র্যানিউলোসাইট। শ্বেত রক্তকণিকার ০.৫% বেসোফিল। প্রতি মাইক্রোলিটারে ৩৫টি বেসোফিল থাকে। এগুলোর আয়ুষ্কাল ১২–১৫ দিন।

চিত্র ৪.৭ : বিভিন্ন ধরনের লিউকোসাইট

কাজ : বেসোফিলের সাইটোপ্লাজমে যে দানা থাকে তা থেকে হিস্টামিন (histamine) ও হেপারিন (heparin) তৈরি হয়। সংক্রমিত অংশে দ্রুত শ্বেত রক্তকণিকা প্রবাহের জন্য হিস্টামিন বিভিন্ন রক্তবাহিকাকে প্রসারিত করে দেয়। হেপারিন রক্তবাহিকার ভিতরে রক্ত জমাট প্রতিরোধ করে।

খ. অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট (Agranulocytes)

যে শ্বেত রক্তকণিকার সাইটোপ্লাজম দানাবিহীন এবং নিউক্লিয়াসটি বড় ও অখণ্ডায়িত সেসব কণিকাকে অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট বলে। শ্বেত কণিকার ২৮% হচ্ছে অ্যাগ্র্যানিউলোসাইট। এসব কণিকা অস্থিমজ্জা ও লিম্ফয়েড টিস্যু থেকে উৎপন্ন হয়। এগুলো দুধরনের : মনোসাইট ও লিম্ফোসাইট।

১. **মনোসাইট** (Monocytes) : যেসব অ্যাগ্র্যানিউলার শ্বেত রক্তকণিকা গোল, ১২–২০μm ব্যাস ও বড় বৃক্ক বা অশ্বক্ষুরাকার অখণ্ডায়িত নিউক্লিয়াস এবং নীলচে–ধূসর সাইটোপ্লাজমযুক্ত সেসব রক্তকণিকাকে মনোসাইট বলে। দেহের ৪% শ্বেত কণিকা মনোসাইট। প্রতি মাইক্রোলিটার রক্তে ২৮০টি মনোসাইট থাকে। এগুলোর আয়ুষ্কাল ২–৫ দিন।

মনোসাইট হচ্ছে সবচেয়ে বড় শ্বেত রক্তকণিকা। এর নিউক্লিয়াস প্রাথমিক অবস্থায় গোল বা ডিম্বাকার হলেও পরিণত অবস্থায় বৃক্ক বা অশ্বক্ষুরাকার ধারণ করে। অস্থিমজ্জার মনোব্লাস্ট (monoblast) কোষ থেকে উৎপত্তির পর ৩০–৪০ ঘন্টা পর্যন্ত রক্তে কাটিয়ে অবশেষে কৈশিকনালির প্রাচীর ভেদ করে টিস্যুতে প্রবেশ করে এবং ম্যাক্রোফেজ (macrophage)-এ পরিণত হয়।

কাজ : (i) বিপুল পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, পচনরূপ দেহাংশ (necrotics) বা অন্যান্য বহিরাগত পদার্থ ম্যাক্রোফেজ গ্রাস করে দেহের প্রাকৃতিক ধাঙর (scavenger) হিসেবে কাজ করে। (ii) কতিপয় অ্যান্টিজেনকে কাজে লাগিয়ে ইমিউনতন্ত্রে ভূমিকা পালন করে। (iii) সংক্রমণের বিরুদ্ধে সারা দেহে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে কাজ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. **লিম্ফোসাইট** (Lymphocytes) : যেসব অ্যাগ্র্যানিউলার শ্বেত কণিকা গোল, ৬ – ১৬μm ব্যাস ও সম্পূর্ণ কোষ জুড়ে গোল অখণ্ডায়িত নিউক্লিয়াস এবং নিউক্লিয়াসের চারদিক ঘিরে সংকীর্ণ নীলাভ সাইটোপ্লাজম যুক্ত সেসব রক্তকণিকাকে লিম্ফোসাইট বলে। দেহের ২৪% শ্বেত কণিকা লিম্ফোসাইট। প্রতি মাইক্রোলিটার রক্তে ১৬৮০টি লিম্ফোসাইট থাকে। এদের আয়ুষ্কাল প্রায় ৭ দিন।

লিম্ফোসাইট হচ্ছে দ্বিতীয় বড় শ্বেত রক্তকণিকা। এগুলো রক্ত প্রবাহে পাওয়া গেলেও সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় লসিকা পর্ব, বিশেষ লিম্ফয়েড টিস্যুতে, যেমন প্লীহা, পৌষ্টিকনালির সাবমিউকোসা, থাইমাস, টনসিল ও অ্যাডেনয়েড। লিম্ফোসাইট দুধরনের : **B-লিম্ফোসাইট ও T-লিম্ফোসাইট**। এ দুধরনের কণিকাকে যথাক্রমে B-কোষ ও T-কোষ নামে অভিহিত করা হয়। দুধরনের কোষই অস্থিমজ্জার স্টেমকোষ থেকে সৃষ্টি হয়, দেখতেও অভিন্ন থাকে। কিন্তু পরে কিছু কোষ থাইমাসে পরিযায়ী হয়ে সেখানে T-কোষে পরিণত হয়। বাকি কোষগুলো অস্থিমজ্জায় রয়ে যায় এবং মানবদেহে এগুলো B-কোষে পরিণত হয়। লিম্ফোসাইটের আয়ুষ্কাল এক সপ্তাহের মতো হলেও কিছু কোষের (B ও T কোষ) বংশধর দীর্ঘজীবী হয়ে স্মৃতিকোষে (memory B-কোষ ও T-কোষ) পরিণত হয়। [বিস্তারিত বর্ণনা ইমিউনিটি অধ্যায়ে]।

কাজ : (i) বহিরাগত জীবাণু দেহে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টির আগেই অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে তা ধ্বংস করে ফেলে। (ii) একই ধরনের অণুজীব ভবিষ্যতে দেহে প্রবেশ করলে স্মৃতি B-কোষ সহজেই শনাক্ত ও ধ্বংসে সহযোগিতা করে। (iii) বিভিন্ন ধরনের T-কোষ সক্রিয়ভাবে ভাইরাসকে আক্রমণ ছাড়াও আক্রান্ত দেহকোষ, ক্যান্সারকোষ ইত্যাদিও ধ্বংস করে। (iv) বিকৃত (defective) T-কোষ দেহে ক্যান্সার বা অটোইমিউন ব্যাধির (autoimmune disease) সৃষ্টি করতে পারে।

শ্বেত রক্তকণিকার কাজ : (i) মনোসাইট ও নিউট্রোফিল **ফ্যাগোসাইটোসিস** (phagocytosis) প্রক্রিয়ায় জীবাণু ভক্ষণ করে ধ্বংস করে। (ii) লিম্ফোসাইটগুলো অ্যান্টিবডি সৃষ্টি করে রোগ প্রতিরোধ করে (এজন্য এদের আণুবীক্ষণিক সৈনিক বলে)। বেসোফিল **হেপারিন** (heparin) উৎপন্ন করে যা রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্তজমাট রোধ করে। (iii) দানাদার লিউকোসাইট **হিস্টামিন** (histamine) সৃষ্টি করে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। (ii) নিউট্রোফিলের বিষাক্ত দানা জীবাণু ধ্বংস করে। (v) ইওসিনোফিল রক্তে প্রবেশকৃত কৃমির লার্ভা এবং অ্যালার্জিক-অ্যান্টিবডি ধ্বংস করে।

৩. অণুচক্রিকা বা প্লেইটলেট (Platelets)

দেহের লাল অস্থিমজ্জার **মেগাক্যারিওসাইট** (megakaryocyte) নামে বড় কোষ থেকে উৎপন্ন ও রক্তরসে ভাসমান ১–৪μm ব্যাসসম্পন্ন, অনিয়তাকার, ঝিল্লি-আবৃত, সামান্য সাইটোপ্লাজমযুক্ত কিন্তু নিউক্লিয়াসবিহীন, কোষ-ভগ্নাংশকে (cell fragments) **অণুচক্রিকা** বা **প্লেইটলেট** বলে। প্রতি mL রক্তে প্রায় ১,৫০,০০০–৩,০০,০০০ অণুচক্রিকা থাকতে পারে। প্রতিদিন প্রায় ২০০ বিলিয়ন (২০ হাজার কোটি) অণুচক্রিকা উৎপন্ন হয়। এগুলোর আয়ুষ্কাল ৮–১২ দিন, ধ্বংস প্রাপ্তি ঘটে যকৃত ও প্লীহার ম্যাক্রোফেজের মাধ্যমে।

প্রত্যেক অণুচক্রিকার সাইটোপ্লাজমে (i) সংকোচনে সহায়ক অ্যাকটিন, মায়োসিন ও থ্রম্বোস্থেনিন প্রোটিন; (ii) বিভিন্ন এনজাইম ও বিপুল পরিমাণ ক্যালসিয়াম আয়ন সংশ্লেষের জন্য এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও গলজি বস্তুর অংশ; (iii) ATP ও ADP উৎপন্নের জন্য মাইটোকন্ড্রিয়া; (iv) বিভিন্ন বাহিকায় প্রভাব সৃষ্টিকারী হরমোন-সদৃশ পদার্থ; (v) ফাইব্রিন তন্তু সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন ফ্যাক্টর; (vi) এন্ডোথেলিয়াল কোষ সৃষ্টি, ক্ষতিগ্রস্ত বাহিকার প্রাচীর নির্মাণ ও ফাইব্রোব্লাস্টের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বৃদ্ধি ফ্যাক্টর উৎপন্ন হয়।

অণুচক্রিকার শুধু সাইটোপ্লাজমই নয় ঝিল্লিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে। ঝিল্লিতে অবস্থিত গ্লাইকোপ্রোটিন রক্তবাহিকার ক্ষতস্থানে বিশেষ করে এন্ডোথেলিয়ামে যুক্ত হয় এবং ঝিল্লি থেকে বিপুল পরিমাণ ফসফোলিপিড নির্গত হয়ে রক্ত জমাটের বিভিন্ন ধাপ ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট হয়। এত কাজ করা সত্ত্বেও অণুচক্রিকাকে অনেক বিজ্ঞানী কোষ বলতে নারাজ কারণ এগুলোর অভ্যন্তরে না আছে নিউক্লিয়াস, কিংবা

চিত্র ৪.৮ : অণুচক্রিকা

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

DNA। অনেকে কথিত অণুচক্রিকাকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে **থ্রম্বোসাইট** (thrombocyte) নামে অভিহিত করে থাকেন।

কাজ : (i) অস্থায়ী প্লেইটলেট প্লাগ (platelet plug) সৃষ্টির মাধ্যমে রক্তপাত বন্ধ করে। (ii) রক্তজমাট ত্বরান্বিত করতে বিভিন্ন ক্লটিং ফ্যাক্টর (clotting factor) ক্ষরণ করে। (iii) প্রয়োজন শেষে রক্তজমাট বিগলনে সাহায্য করে। (iv) ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস ধ্বংস করে। (v) দেহের কোথাও ব্যথার সৃষ্টি হলে নিউট্রোফিল ও মনোসাইটকে আকৃষ্ট করতে রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। (vi) রক্তবাহিকার এন্ডোথেলিয়ামের অন্তঃপ্রাচীর সুরক্ষার জন্য গ্রোথ-ফ্যাক্টর ক্ষরণ করে। (vii) সেরোটোনিন (serotonin) নামক রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশে রক্তবাহিকাকে দ্রুত সংকোচনে উদ্বুদ্ধ করে। (viii) স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি অণুচক্রিকা থাকলে রক্তনালির ভিতরে অদরকারী রক্তজমাট সৃষ্টি, স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

রক্ত জমাট বাঁধা বা রক্ত তঞ্চন (Blood Clotting)

মানবদেহে রক্তবাহিকার অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বাঁধতে পারেনা কারণ বাহিকার অন্তঃস্থ প্রাচীর থাকে মসৃণ এবং রক্তে **হেপারিন** (heparin) নামে এক ধরনের মিউকোপলিস্যাকারাইড সংবহিত হয়। দেহের কোথাও ক্ষত সৃষ্টির ফলে কোনো রক্তবাহিকার এন্ডোথেলিয়াম ক্ষতিগ্রস্ত হলে রক্তপাত বন্ধের উদ্দেশে ও সংক্রমণ প্রতিরোধে যে জটিল জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় **ফাইব্রিন জালক** সৃষ্টির মাধ্যমে ক্ষতস্থানে রক্তকে থকথকে পিণ্ডে পরিণত করে সে প্রক্রিয়াকে রক্তের **জমাট বাঁধা** বা **রক্ত তঞ্চন** বলে। এ প্রক্রিয়ায় অণুচক্রিকা ও রক্তরসে অবস্থিত ১৩ ধরনের **ক্লটিং ফ্যাক্টর** (clotting factor) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ৪টি ফ্যাক্টর হলো– (i) ফাইব্রিনোজেন, (ii) প্রোথ্রম্বিন, (iii) থ্রম্বোপ্লাস্টিন ও (iv) Ca^{2+}। দেহের শারীরবৃত্তিক স্থিতাবস্থার জন্য রক্তবাহিকায় রক্তরস, রক্তকণিকা, অণুচক্রিকা ইত্যাদির নির্বিঘ্ন প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখতে রক্তের জমাট বাঁধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্ষত নিরাময়ের উদ্দেশে যে কোনো উপায়ে রক্তপাত মন্থর ও বন্ধের প্রক্রিয়াকে **হিমোস্টেসিস** (hemostasis) বলে। মানবদেহে রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়াটিও হিমোস্টেসিসের অংশ। নিচে বর্ণিত কয়েকটি ধারাবাহিক জৈব রাসায়নিক ধাপের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

১. স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তবাহিকার এন্ডোথেলিয়াল কোষ থেকে ক্ষরিত বিশেষ অণুর (হেপারিন, থ্রম্বোমডিউলিন ইত্যাদি) প্রভাবে রক্ত প্রবাহের সময় অণুচক্রিকাগুলো এন্ডোথেলিয়ামে সংলগ্ন হওয়া থেকে বিরত থাকে, তাই জমাটও বাঁধেনা। কিন্তু বাহিকায় ক্ষত সৃষ্টির ফলে অণুচক্রিকা কোলাজেন তন্তুর সংস্পর্শে এলে স্ফীত হয়ে চারপাশ থেকে ক্ষণপদ সৃষ্টি করে এবং বিপুল পরিমাণ ADP ক্ষরণ করে। ADP-র সক্রিয়তায় আশেপাশের অণুচক্রিকাও পরস্পর আসঞ্জিত হয়ে স্তূপাকার ধারণ করে।

২. রক্তবাহিকার ক্ষতস্থানে অণুচক্রিকা ও ক্ষতের টিস্যু থেকে **প্রোথ্রম্বিন সক্রিয়কারী পদার্থ** (prothrombin activator) ক্ষরিত হয়। এ পদার্থ Ca^{2+}-এর সহায়তায় রক্তরসে অবস্থিত নিষ্ক্রিয় **প্রোথ্রম্বিন** (prothrombin) প্লাজমা প্রোটিনকে সক্রিয় **থ্রম্বিন** (thrombin) এনজাইমে রূপান্তরিত করে।

৩. থ্রম্বিন রক্তরসে অবস্থিত **ফাইব্রিনোজেন** (fibrinogen) নামক গ্লাইকোপ্রোটিনকে **ফাইব্রিন** (fibrin) তন্তুতে পরিণত করে। এসব তন্তু পরস্পর যুক্ত হয়ে **ফাইব্রিন জালক** সৃষ্টি করে।

চিত্র ৪.৯ : রক্ত জমাট বাঁধা

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ক্ষতিগ্রস্ত এন্ডোথেলিয়াম ও বিমুক্ত অণুচক্রিকা
↓ Ca^{2+} | প্রোথ্রম্বিন সক্রিয়কারী পদার্থ
নিষ্ক্রিয় প্রোথ্রম্বিন
↓
সক্রিয় থ্রম্বিন
↓ Ca^{2+}
ফাইব্রিনোজেন
↓
ফাইব্রিন তন্তু
↓
ফাইব্রিন জালক
↓
রক্ত জমাট বাঁধা

৪. ফাইব্রিন জালক ক্ষতস্থানে জড়ো হয়ে থাকা অণুচক্রিকার চতুর্দিক জড়িয়ে **প্লেইটলেট প্লাগ** (platelet plug) বা **ছিপি** নির্মাণ করে। ছিপিটি রক্ত জমাটের কাঠামো হিসেবে কাজ করে। ফাইব্রিন জালকে অণুচক্রিকা, রক্ত কণিকা, রক্তরস ও অন্যান্য উপাদান বিজড়িত হয়ে আটকে যায়। ফলে রক্ত জমাট বাঁধে। এতে লোহিত কণিকা আটকে যাওয়ায় জমাটটি লালচে দেখায়।

৫. জমাট বাঁধা শেষ হলে জমাট থেকে যে হলুদ তরল বেরিয়ে আসে তা **সিরাম** (serum)। সিরামের গঠন রক্তরসের মতোই কেবল ফাইব্রিনোজেন ও প্রোথ্রম্বিন থাকে না।

৬. ফাইব্রিন জমাট সাময়িক। রক্তবাহিকার পুনর্গঠন শুরু হলে নতুন টিস্যু কোষ সৃষ্টির জন্য **প্লাজমিন** (plasmin) এনজাইম ফাইব্রিন জালককে ধ্বংস করে দেয়।

রক্ততঞ্চনকাল : দেহ থেকে নির্গত রক্ত জমাট বাঁধতে যে সময় লাগে তাকে রক্ততঞ্চনকাল বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের রক্ততঞ্চনকাল হচ্ছে ৩-৮ মিনিট। তবে ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে সময় অনেক বেশি লাগতে পারে।

রক্তক্ষরণকাল : কোনো বাহ্যিক প্রয়োগ ছাড়া প্রথম রক্ত নির্গত হওয়া শুরু থেকে রক্ত জমাট বাঁধা পর্যন্ত সময়কে রক্তক্ষরণকাল বলে। মানুষের স্বাভাবিক রক্তক্ষরণ কাল ১-৪ মিনিট।

লসিকা বা লিম্ফ (Lymph)

টিস্যু গঠনকারী কোষের ফাঁকে ফাঁকে অবস্থিত বর্ণহীন তরল পদার্থকে **লসিকা** বলে। পরিণত মানব দেহে প্রতিদিন কৈশিক জালিকার প্রাচীর ভেদ করে ৪-৮ লিটার তরল পদার্থ ও রক্তপ্রোটিন চারপাশের টিস্যু কোষের ফাঁকে ফাঁকে লসিকা হিসেবে অবস্থান করে। লসিকাতন্ত্রের মাধ্যমে শুধু লসিকা নয় রক্তপ্রোটিনও রক্তে ফিরে যায়। রক্তপ্রোটিন যদি এভাবে পুনরুদ্ধার না হতো তাহলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মানুষ মারা যেতো।

লসিকার উৎপত্তি : ধমনির শাখা থেকে উৎপন্ন কৈশিক ধমনিতে রক্ত পৌছালে এর অধিকাংশই কৈশিক শিরাতে প্রবাহিত হয়। প্রায় ১০% এর মতো রক্তরস (প্লাজমা) কৈশিকজালিকা থেকে বেরিয়ে দেহ কোষের চারদিকে **ইন্টারস্টিশিয়াল তরল** (interstitial fluid) হিসেবে অবস্থান করে। এ তরল লসিকা নালিকায় প্রবেশ করে লসিকায় পরিণত হয়। লসিকা উৎপাদনের প্রক্রিয়াকে **লিম্ফোজেনেসিস** (lymphogensis) বলে।

লসিকার উপাদান : লসিকায় প্রধানত দুধরনের উপাদান দেখা যায়, যথা-কোষ উপাদান ও কোষবিহীন উপাদান।

কোষ উপাদান : লসিকায় প্রধানত শ্বেত কণিকার লিম্ফোসাইট থাকে। সামান্য পরিমাণ লোহিত কণিকা দেখা গেলেও (কৈশিক জালিকার পাতলা প্রাচীর ভেদ করে ইন্টারস্টিশিয়াল তরলে প্রবেশ করে) অণুচক্রিকা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। প্রতি কিউবিক মিলিমিটার লসিকায় ৫০০- ৭৫,০০০ লিম্ফোসাইট থাকতে পারে।

কোষবিহীন উপাদান : লসিকায় অবস্থিত কোষবিহীন উপাদানগুলো রক্তরসের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। লসিকায় প্রায় ৯৪%ই পানি এবং ৬% কঠিন পদার্থ বিদ্যমান। কঠিন অংশের মধ্যে নিম্নোক্ত উপাদানগুলো পাওয়া যায় :

১. **শর্করা :** প্রতি ১০০ মিলিমিটার লসিকায় শর্করার (গ্লুকোজ) পরিমাণ ১২০-১৩২ গ্রাম।

২. **প্রোটিন :** লসিকায় প্রধানত অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ফাইব্রিনোজেন, এনজাইম, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি থাকে।

৩. **লিপিড :** প্রধানত কাইলোমাইক্রন হিসেবে থাকে যাতে ট্রাইগ্লিসারাইড ও ফসফোলিপিড উপস্থিত। অভুক্ত অবস্থায় লসিকায় ফ্যাটের পরিমাণ কম থাকে। চর্বিযুক্ত খাবার খেলে লসিকায় ফ্যাটের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং লসিকা দুধের মতো সাদা দেখায়। এ ধরনের লসিকাকে **কাইল** (chyle) বলে। তবে সাধারণত এর পরিমাণ মোট কঠিন অংশের প্রায় ৫-১৫%।

৪. **রেচন বর্জ্য :** লসিকায় ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি পাওয়া যায়।

৫. **অন্যান্য বস্তু :** গ্লুকোজ, জীবাণু, ক্যানসার কোষ, দ্রবীভূত CO_2 ইত্যাদিও লসিকায় পাওয়া যায়।

লসিকাতন্ত্র (Lymphatic system)

লসিকা, লসিকা ক্যাপিলারি, লিম্ফ নোড, লসিকানালি বা লিমফেটিক্স, লিম্ফয়েড অঙ্গ, যথা- প্লীহা, থাইমাস গ্রন্থি, টনসিল, লিম্ফেটিক টিস্যু এবং সমষ্টিভূত (aggregated) লিম্ফ নোড সমন্বয়ে গঠিত তন্ত্রকে **লসিকাতন্ত্র** বলে। কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম এবং লসিকাতন্ত্র উভয়ে সমগ্র দেহে ফ্লুয়িড (fluid) সংবহন করে বলে লসিকা তন্ত্রকে কখনো

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কখনো **দ্বিতীয় সংবহনতন্ত্র** বলেও অভিহিত করা হয়। তবে পার্থক্য হলো লসিকাতন্ত্র বদ্ধ নয় এবং এখানে কোন কেন্দ্রিয় পাম্প যন্ত্র নেই। লসিকানালি বদ্ধপ্রান্তবিশিষ্ট সূক্ষ্ম নালিকা। কৈশিক জালকের মতো অসংখ্য সূক্ষ্ম লসিকানালি পরস্পর যুক্ত হয়ে প্রধানত দুটি বড় নালি গঠন করে, যথা–

১. **ডান লসিকানালি :** মাথা ও গলার ডান দিক, ডান বাহু এবং বক্ষ অঞ্চলের ডান দিকে অবস্থিত লসিকানালিগুলো মিলে ডান লসিকানালি গঠন করে। এটি ডান সাবক্লেভিয়ান শিরা এবং ডান অন্তঃজুগুলার শিরার সংযোগস্থলে শিরাতন্ত্রের সাথে সংযুক্ত।

২. **থোরাসিক লসিকানালি :** দেহের নিম্নাংশ এবং বাম দিকের লসিকানালিগুলো মিলে থোরাসিক লসিকানালি গঠন করে। এটি বাম সাবক্লেভিয়ান ও বাম অন্তঃজুগুলার শিরার সংযোগস্থলে শিরাতন্ত্রের সাথে সংযুক্ত। পৌষ্টিকনালি অঞ্চলে লসিকানালি সুবিকশিত এবং নালি অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম লসিকা নালিকে **ল্যাকটিল** (lacteal) বলে। লসিকানালিতে শিরার অনুরূপ কপাটিকা থাকে তবে সংখ্যায় বেশি। ফলে লসিকা শুধু এক দিকে প্রবাহিত হয়। চলন বা শ্বসনের সময় কঙ্কাল পেশির সংকোচনে লসিকানালিতে অত্যন্ত ধীর গতিতে লসিকা প্রবাহিত হয়। লসিকানালিতে ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে যার মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া বা কোষের ধ্বংসাবশেষ (cell debris) প্রবেশ করতে পারে। লসিকানালির বিভিন্ন স্থানে গোল বা ডিম্বাকার স্ফীত অংশ থাকে। এগুলো **লিম্ফ নোড বা লসিকা গ্রন্থি**। ঘাড়, বগল, কুচকিতে প্রচুর লিম্ফ নোড থাকে। প্লীহা, টনসিল, অ্যাডেনয়েড ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য লিম্ফেটিক অঙ্গ।

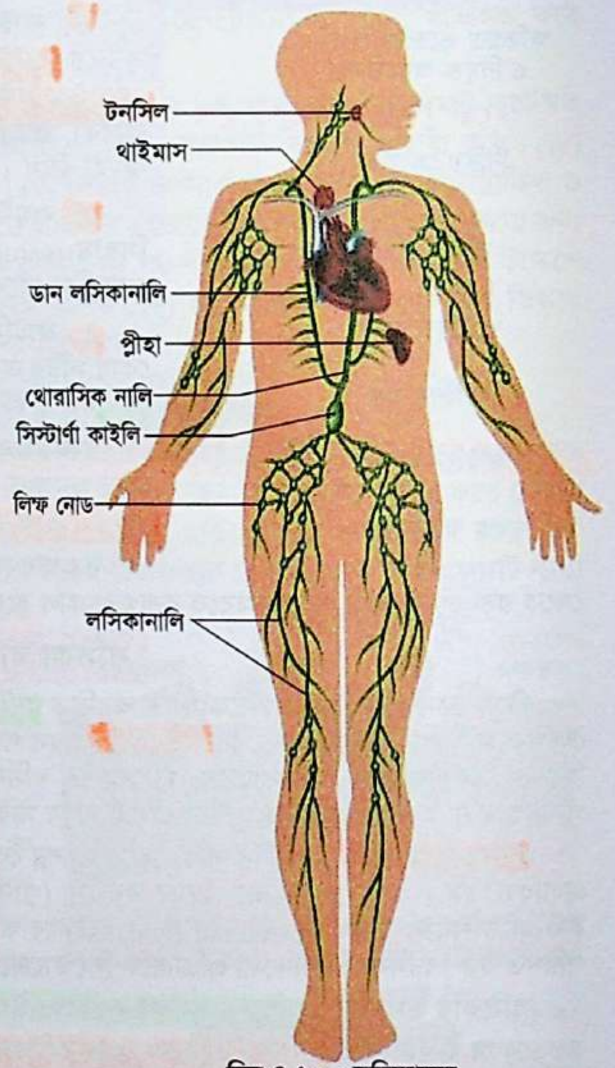

চিত্র ৪.১০ : লসিকাতন্ত্র

লসিকার কাজ : দেহের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ লসিকার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে, যেমন–

১. টিস্যুর ফাঁকা স্থান থেকে অধিকাংশ প্রোটিন লসিকার মাধ্যমে রক্তে ফিরে আসে।
২. যেসব স্নেহকণা ও উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট কণা কৈশিক নালির বাধা অতিক্রমে অক্ষম সেগুলো লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
৩. দেহের যেসব টিস্যুকোষে রক্ত পৌছাতে সক্ষম হয় না সেখানে লসিকা অক্সিজেন ও পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে।
৪. অন্ত্র থেকে স্নেহ পদার্থ শোষিত হয়ে লসিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
৫. লসিকায় উপস্থিত শ্বেত কণিকা (লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট) দেহের প্রতিরক্ষায় অবদান রাখে।
৬. লসিকা ও লিম্ফোসাইট থেকে উৎপন্ন অ্যান্টিবডি প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।
৭. লসিকা রক্ত সংবহনের এক অংশ থেকে অন্য অংশে তরল পদার্থ পরিবহনের মাধ্যমে দেহরসের পুনর্বণ্টনে অংশ নেয়।
৮. বিভিন্ন অঙ্গে টিস্যুর সাংগঠনিক অখণ্ডতা রক্ষায় লসিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
৯. টিস্যু থেকে টিস্যুরসের প্রায় ১০% অংশ লসিকার মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়।

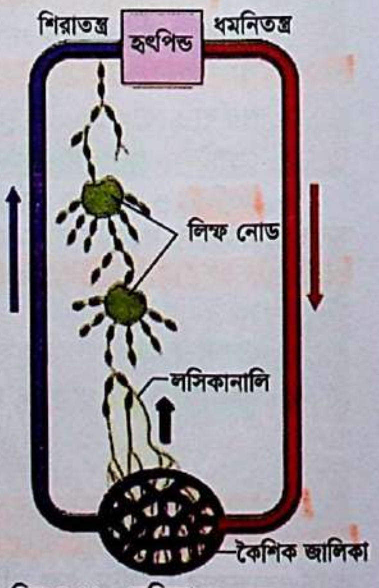

চিত্র ৪.১১ : লসিকা সংবহন

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

রক্ত ও লসিকার মধ্যে পার্থক্য		
বৈশিষ্ট্য	রক্ত	লসিকা
১. বর্ণ	লাল বর্ণের পরিবহন টিস্যু।	বর্ণহীন পরিবহন টিস্যু।
২. প্রবাহ	রক্তনালিতে সুনির্দিষ্ট চাপে প্রবাহিত হয়।	লসিকানালিতে চাপহীন প্রবাহিত হয়।
৩. গঠন উপাদান	প্লাজমা, লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা এবং অণুচক্রিকা নিয়ে গঠিত।	প্লাজমা ও শ্বেত রক্তকণিকা নিয়ে গঠিত।
৪. হিমোগ্লোবিন	হিমোগ্লোবিন বিদ্যমান।	হিমোগ্লোবিন অনুপস্থিত।
৫. প্রোটিন ইত্যাদি	অধিক পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত।	অল্প পরিমাণ প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসযুক্ত।
৬. পরিবহন	রক্তের মাধ্যমে শ্বসন গ্যাস ও খাদ্যকণা (শর্করা ও আমিষ) পরিবাহিত হয়।	লসিকার মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ ও খাদ্যসার (লিপিড) পরিবাহিত হয়।

ব্যবহারিক (Practical)

কাজ : রক্ত কণিকাসমূহের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ : জীবাণুমুক্ত সুচ, পরিষ্কার স্লাইড, লিশম্যান রঞ্জক, রক্ত, ড্রপার, তুলা, স্পিরিট, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি।

রক্ত সংগ্রহ ও স্লাইড প্রস্তুতি

i. একটি জীবাণুমুক্ত নিডলের সাহায্যে নিজের বাম হাতের মধ্যমার অগ্রভাগ ফুটো করে একবিন্দু রক্ত স্লাইডের একপ্রান্তে সংগ্রহ করতে হবে।
ii. অপর একটি পরিষ্কার স্লাইডের প্রান্ত দিয়ে ৪৫° কোণে রক্তের ফোঁটাটি সামনের দিকে এমনভাবে ঠেলে দিতে হবে যাতে প্রথম স্লাইডের উপর চাপ না পড়ে। ফলে প্রথম স্লাইডের উপর রক্তের একটি পাতলা প্রলেপ (blood flim) তৈরি হবে।
iii. প্রলেপটি বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে।
iv. বাতাসে শুকানোর পর প্রলেপটির উপর **লিশম্যান রঞ্জক** দিয়ে প্লাবিত করতে হবে এবং একটি পেট্রিডিস দিয়ে স্লাইডটি ঢেকে রাখতে হবে।
v. এক মিনিট পর (বেশি সময় রাখা যায়) লিশম্যান দ্রবণের সমপরিমাণ পাতিত পানি স্লাইডের উপর অল্প অল্প করে ঢালতে হবে।
vi. এভাবে ১০ মিনিট রাখার পর স্লাইডটি পাতিত পানিতে ভালোভাবে ধুয়ে বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে।
vii. অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতকৃত অথবা বিজ্ঞানাগারে সংরক্ষিত রক্ত কণিকাসমূহের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ করে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ মিলিয়ে দেখতে হবে। প্রয়োজনে শ্রেণিশিক্ষকের সাহায্য নিতে হবে।

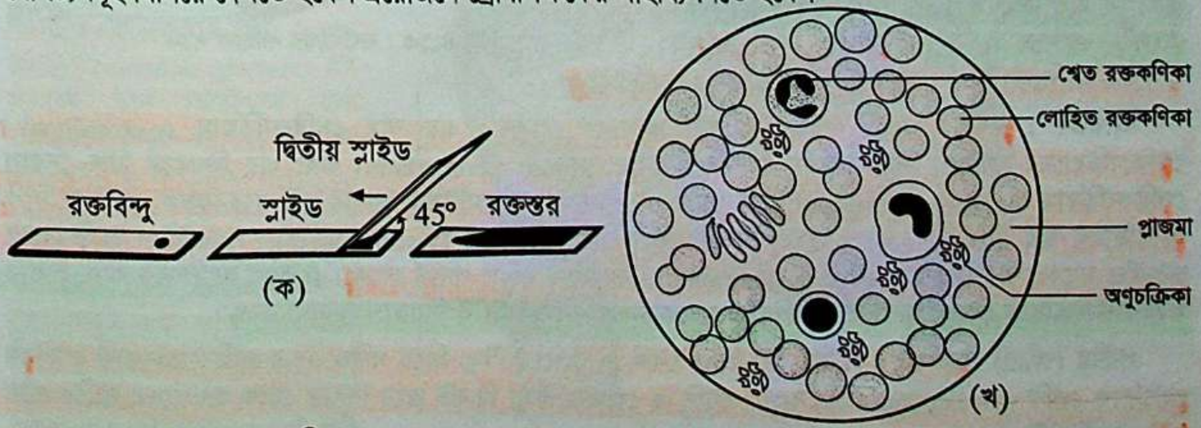

চিত্র ৪.১২ : (ক) স্লাইড প্রস্তুতকরণ ও (খ) মানুষের রক্ত

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. রক্তরস ও রক্তকণিকা নিয়ে রক্ত গঠিত।
২. রক্তরসে অসংখ্য লোহিত রক্তকণিকা, শ্বেত রক্তকণিকা ও অণুচক্রিকা বর্তমান।
৩. লোহিত রক্তকণিকা গোলাকার, দ্বি-অবতল ও নিউক্লিয়াসবিহীন।
৪. শ্বেত রক্তকণিকা বর্ণহীন ও নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং অনিয়তাকার ও অপেক্ষাকৃত বড়।
৫. অণুচক্রিকা ক্ষুদ্র ও নিউক্লিয়াসবিহীন।

সতর্কতা : রক্ত সংগ্রহের আগে অ্যালকোহল দিয়ে নিডল্ ও আঙুলের অগ্রভাগ জীবাণু মুক্ত করে নিতে হবে।

মানুষের হৃৎপিণ্ডের গঠন (Structure of Human Heart)

দেহের যে প্রকোষ্ঠময় পেশল অঙ্গের নিরবচ্ছিন্ন ছন্দময় সংকোচন প্রসারণের মাধ্যমে সমগ্র দেহে রক্ত সংবহিত হয় তাকে **হৃৎপিণ্ড** বলে। রক্তকে রক্তবাহিকার ভিতর দিয়ে সঞ্চালনের জন্য হৃৎপিণ্ড **মানবদেহের পাম্পযন্ত্র** (pumping machine) রূপে কাজ করে। জীবন্ত এ পাম্পযন্ত্রটি দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে শিরার মাধ্যমে আনীত রক্ত ধমনির সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে।

একজন সুস্থ মানুষের জীবদ্দশায় হৃৎপিন্ড গড়ে ২৬০০ মিলিয়ন বার স্পন্দিত হয়ে প্রতিটি ভেন্ট্রিকল (নিলয়) থেকে প্রায় ১৫৫ মিলিয়ন লিটার (বা দেড় লক্ষ টন) রক্ত বের করে দেয়। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষে হৃৎপিণ্ডের ওজন ২৫০-৩৯০ গ্রাম ও স্ত্রীতে ২০০-২৭৫ গ্রাম। ভ্রূণ অবস্থায় মাতৃগর্ভে ছয় সপ্তাহ থেকে হৃৎস্পন্দন শুরু হয় এবং আমৃত্যু এ স্পন্দন চলতে থাকে।

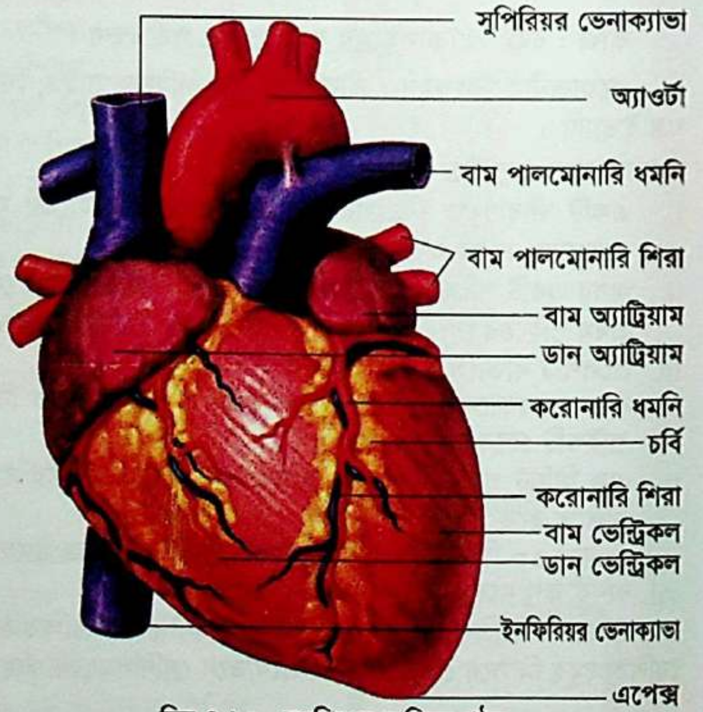

চিত্র ৪.১৩ : হৃৎপিণ্ডের বাহ্যিক গঠন

অবস্থান : মানুষের হৃৎপিণ্ড বক্ষ গহ্বরে মধ্যচ্ছদার উপরে ও দুই ফুসফুসের মাঝ-বরাবর বাম দিকে একটু বেশি বাঁকা হয়ে অবস্থিত। এটি দেখতে ত্রিকোণাকার; গোড়াটি চওড়া ও ঊর্ধ্বমুখী থাকে, কিন্তু সুচালো শীর্ষদেশ নিচের দিকে পঞ্চম পাঁজরের ফাঁকে অবস্থান করে।

আকার ও আকৃতি : লালচে-খয়েরী রংয়ের হৃৎপিণ্ডটি ত্রিকোণা মোচার মতো। এর চওড়া ঊর্ধ্বমুখী অংশটি বেস (base), ক্রমশ সরু নিম্নমুখী অংশটি এপেক্স (apex)। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ডের দৈর্ঘ্য ১২ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ ৮ সেন্টিমিটার।

আবরণ : হৃৎপিণ্ড একটি পাতলা দ্বিস্তরী আবরণে আবৃত। এর নাম **পেরিকার্ডিয়াম** (pericardium)। পেরিকার্ডিয়ামের বাইরের দিক **তন্তুময় পেরিকার্ডিয়াম** (fibrous pericardium) এবং এর ভিতরের দিক **সেরাস পেরিকার্ডিয়াম** (serous pericardium) নামে পরিচিত। সেরাস পেরিকার্ডিয়াম আবার দুটি স্তরে বিভক্ত, বাইরের দিকে **প্যারাইটাল স্তর** (parietal layer) এবং ভিতরের দিকে **ভিসেরাল স্তর** (visceral layer)। প্যারাইটাল ও ভিসেরাল স্তরদুটির মাঝে **পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড** (pericardial fluid) নামক তরল পদার্থ থাকে। এ তরল হৃৎপিণ্ডকে তাপ, চাপ ও ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে হৃৎপিণ্ডের সংকোচনকে সহজসাধ্য ও নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

প্রাচীর (Wall) : হৃৎপিন্ডের প্রাচীর অনৈচ্ছিক পেশি ও যোজক টিস্যু দিয়ে গঠিত। এর প্রাচীর গঠনকারী পেশিকে **কার্ডিয়াক পেশি** (cardiac muscles) বলে। পেশি ও যোজক টিস্যু তিনটি স্তরে বিন্যস্ত থেকে হৃৎপিন্ডের প্রাচীর গঠন করে। স্তরতিনটি হলো–

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১. **এপিকার্ডিয়াম** (Epicardium) : এটি পাতলা ও স্বচ্ছ যোজক টিস্যু নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের সর্ববহিঃস্থ স্তর। এ স্তরে বিক্ষিপ্তভাবে চর্বি লেগে থাকে।

২. **মায়োকার্ডিয়াম** (Myocardium) : এটি কার্ডিয়াক পেশি নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের মধ্যবর্তী স্তর। এ স্তরটি সর্বাপেক্ষা পুরু। এ স্তরের পেশি দৃঢ় প্রকৃতির এবং এগুলো হৃৎপিন্ড সংকোচন- প্রসারণে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

৩. **এন্ডোকার্ডিয়াম** (Endocardium) : এটি যোজক টিস্যু নির্মিত হৃৎপ্রাচীরের অন্তঃস্থ স্তর। এটি হৃৎপিন্ডের প্রকোষ্ঠের অন্তঃপ্রাচীর গঠন করে, হৃৎকপাটিকাসমূহ ঢেকে রাখে এবং রক্তবাহিকার সাথে হৃৎপিন্ডের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ ঘটায়।

হৃৎপিন্ডের প্রকোষ্ঠসমূহ (Chambers of Heart)

মানব হৃৎপিন্ড সম্পূর্ণরূপে চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট (completely four chambered) একটি ফাঁপা অঙ্গ। এর মধ্যে উপরের দুটি **অ্যাট্রিয়া** (atria: একবচনে atrium) বা **অলিন্দ** ও নিচের দুটি **ভেন্ট্রিকল** (Ventricle) বা **নিলয়**। দুটি অ্যাট্রিয়াকে দেহের অবস্থান অনুসারে **ডান অ্যাট্রিয়াম** ও **বাম অ্যাট্রিয়াম** বলে এবং ভেন্ট্রিকল দুটিকে **ডান ভেন্ট্রিকল** ও **বাম ভেন্ট্রিকল** বলা হয়। অ্যাট্রিয়ামের তুলনায় ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর পুরু ও পেশিবহুল। ডান ও বাম অ্যাট্রিয়াম **আন্তঃঅ্যাট্রিয়াল** (আন্তঃঅলিন্দ) **পর্দা** (inter-atrial septum) এবং ডান ও বাম ভেন্ট্রিকল **আন্তঃভেন্ট্রিকুলার** (আন্তঃনিলয়) **পর্দা** (inter-ventricular septum) দিয়ে পৃথক থাকে। নিচে প্রকোষ্ঠগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

❑ **ডান অ্যাট্রিয়াম** : এ প্রকোষ্ঠ ডান দিকে অবস্থিত, তুলনামূলকভাবে বড় ও পাতলা প্রাচীর দিয়ে গঠিত। এর ভিতরের গায়ে **সাইনো- অ্যাট্রিয়াল নোড** (sino-atrial node) বা **পেস মেকার** (pace maker) নামে একটি পেশিখন্ড থাকে। এখান থেকে হৃৎস্পন্দন শুরু হয়। ডান অ্যাট্রিয়াম সুপিরিয়র ও ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভার মাধ্যমে যথাক্রমে দেহের সম্মুখ ও পশ্চাৎ অঞ্চল থেকে এবং করোনারি শিরা ও করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে হৃৎপিন্ডের প্রাচীর থেকে ফিরে আসা CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। **ডান অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার-ছিদ্র** (right atrio- ventricular aperture)-এর মাধ্যমে ডান অ্যাট্রিয়াম ডান ভেন্ট্রিকলে উন্মুক্ত হয়। এ ছিদ্রপথে **ট্রাইকাসপিড কপাটিকা** (tricupid valves) নামে তিনটি ঝিল্লিময় টুপির মতো কপাটিকা থাকে। এ কপাটিকা ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত ডান ভেন্ট্রিকলে আসতে দেয়, কিন্তু ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্ত ফিরে যেতে দেয় না অর্থাৎ কপাটিকাটি একমুখী।

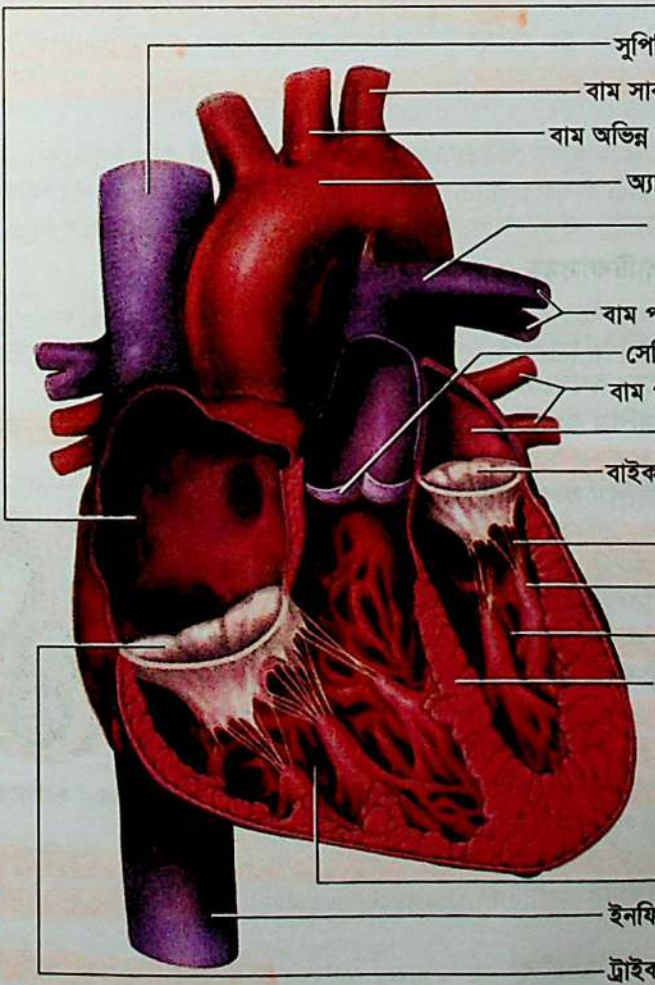

চিত্র ৪.১৪ : মানব হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

□ বাম অ্যাট্রিয়াম : এ প্রকোষ্ঠ বাম দিকে অবস্থিত, তুলনামূলকভাবে ছোট এবং অপেক্ষাকৃত পুরু প্রাচীরবিশিষ্ট। প্রকোষ্ঠটি পালমোনারি বা ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে ফুসফুস থেকে ফিরে আসা O_2-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। বাম অ্যাট্রিয়াম বাম অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রের মাধ্যমে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্ত প্রেরণ করে। এ ছিদ্রমুখে **বাইকাসপিড কপাটিকা** (bicuspid valves) বা **মাইট্রাল কপাটিকা** (mitral valves) নামক দুটি ঝিল্লিময় টুপির মতো কপাটিকা থাকে। এটি একমুখী কপাটিকা। এ কপাটিকা বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে বাম ভেন্ট্রিকলে রক্ত যেতে দেয়, কিন্তু বাম ভেন্ট্রিকল থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে রক্ত ফিরে যেতে দেয় না। বাইকাসপিড ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকাগুলোর এক প্রান্ত অ্যাট্রিয়াম-ভেন্ট্রিকল ছিদ্রের মুখে এবং অপর প্রান্ত ভেন্ট্রিকলের অন্তঃপ্রাচীরের গাত্রে **কর্ডি টেন্ডিনি** (chordae tendinae) নামক তন্তুর সাহায্যে যুক্ত থাকে।

□ ডান ভেন্ট্রিকল : ডান ভেন্ট্রিকল বাম ভেন্ট্রিকল অপেক্ষা কিছুটা বড় এবং ডানে অবস্থিত। এটি **ডান অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রের** মাধ্যমে ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত সংগ্রহ করে। ডান ভেন্ট্রিকলের সম্মুখ ভাগ থেকে **ফুসফুসীয় ধমনি** (pulmonary artery) সৃষ্টি হয় যার মাধ্যমে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুসে সঞ্চালিত হয়। এ ধমনির মুখে একটি একমুখী **অর্ধচন্দ্রাকার বা সেমিলুনার কপাটিকা** (semiluner valve) থাকে। এ কপাটিকা ডান ভেন্ট্রিকলে রক্ত ফেরত আসতে দেয় না।

□ বাম ভেন্ট্রিকল : হৃৎপিণ্ডের বাম দিকে অবস্থিত বাম ভেন্ট্রিকলের প্রাচীর তুলনামূলকভাবে অধিক পুরু কারণ এ প্রকোষ্ঠ থেকেই সমগ্র দেহে রক্ত প্রেরিত হয় (অন্যদিকে ডান ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত কেবল ফুসফুসে প্রেরিত হয়) যাতে অনেক বেশি শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। বাম ভেন্ট্রিকল বাম অ্যাট্রিয়াম থেকে **বাম অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার** ছিদ্রের মাধ্যমে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে। বাম ভেন্ট্রিকলের সম্মুখ থেকে **সিস্টেমিক মহাধমনি বা অ্যাওর্টা** (aorta) উৎপন্ন হয় এবং এর মাধ্যমে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গে প্রেরিত হয়। এ ধমনির উৎপত্তি স্থলেও একটি একমুখী **অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকা** থাকে যা রক্তকে বাম ভেন্ট্রিকলে ফিরে আসতে দেয় না। এ কপাটিকার নাম **অ্যাওর্টিক কপাটিকা** (aortic valve)।

[শারীরবিজ্ঞানের আধুনিক পরিভাষা অনুযায়ী হৃৎপিণ্ডের ঊর্ধ্ব প্রকোষ্ঠদুটিকে auricle নামের পরিবর্তে **atrium** বলে, যথা– right atrium ও left atrium। এ বইয়েও তাই auricle বা অলিন্দের পরিবর্তে ডান অ্যাট্রিয়াম ও বাম অ্যাট্রিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, অরিক্‌ল বলতে মেরুদণ্ডী প্রাণীর বহিঃকর্ণ (external ear) কে বোঝায়।]

হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাসমূহ (Valves of Heart)

হৃৎপিণ্ডের মধ্যদিয়ে রক্ত প্রবাহ একমুখী করার জন্য এবং O_2-সমৃদ্ধ ও CO_2-সমৃদ্ধ রক্তের মিশ্রণ প্রতিহত করার জন্য হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন ছিদ্রপথে কপাটিকা থাকে। হৃৎপিণ্ডের অন্তঃপ্রাচীর বা এন্ডোকার্ডিয়াম ভাঁজ হয়ে কপাটিকা গঠিত হয়। নিচে মানুষের হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাগুলো উল্লেখ করা হলো।

১. ট্রাইকাসপিড কপাটিকা (Tricuspid valve) : ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেন্ট্রিকলের সংযোগ স্থলের ছিদ্রে তিনটি ঝিল্লিময় টুপির মতো এ কপাটিকা থাকে।

২. বাইকাসপিড কপাটিকা (Bicuspid valve) : বাম অ্যাট্রিয়াম ও বাম ভেন্ট্রিকলের সংযোগ স্থলের ছিদ্রে দুইটি ঝিল্লিময় টুপির মতো এ কপাটিকা থাকে। বাইকাসপিড কপাটিকা খৃষ্টান বিশপদের সুউচ্চ টুপির মতো দেখতে। তাই এদের মাইট্রাল কপাটিকা (mitral valve)ও বলে।

৩. পালমোনারি কপাটিকা (Pulmonary valve) : ডান ভেন্ট্রিকল ও পালমোনারি ধমনির ছিদ্রপথে অবস্থিত ত্রি-পর্দা (tri-flap) বিশিষ্ট সেমিলুনার বা অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকাকে পালমোনারি কপাটিকা বলে।

চিত্র ৪.১৫ : হৃৎপিণ্ডের কপাটিকাসমূহ (প্রস্থচ্ছেদে)

৪. অ্যাওর্টিক কপাটিকা (Aortic valve) : বাম ভেন্ট্রিকল ও মহাধমনির ছিদ্রপথে অবস্থিত ত্রি-পর্দা বিশিষ্ট অর্ধচন্দ্রাকার কপাটিকার নাম অ্যাওর্টিক কপাটিকা।

৫. ইউস্টেশিয়ান কপাটিকা (Eustachian valve) : ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা ও ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে এটি অবস্থিত।

৬. করোনারি কপাটিকা (Coronary valve) করোনারি সাইনাস এবং ডান অ্যাট্রিয়ামের সংযোগস্থলে এর অবস্থান।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

হৃৎপিন্ডের প্রধান গাঠনিক উপাদানসমূহ এবং এদের কাজ	
হৃৎপিন্ডের গাঠনিক উপাদান	প্রধান কাজ
অ্যাওর্টা	অ্যাওর্টা দেহের বৃহত্তম ধমনি। ফুসফুস ছাড়া অন্য সকল অঙ্গে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ (oxygenated) রক্ত পরিবহন করে। পালমোনারি ধমনি অক্সিজেন-রিক্ত রক্ত (de-oxygenated) ফুসফুসে বহন করে।
পালমোনারি শিরা	ফুসফুস থেকে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিন্ডের বাম অ্যাট্রিয়ামে পরিবহন করে।
বাম অ্যাট্রিয়াম	পালমোনারি শিরার মাধ্যমে ফুসফুস থেকে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত গ্রহণ করে।
বাম ভেন্ট্রিকল	হৃৎপিন্ডের সর্বাধিক পেশিবহুল অংশ। অ্যাওর্টার মাধ্যমে ফুসফুস ছাড়া দেহের অন্যান্য অংশে রক্ত পাম্প করে।
বাইকাসপিড কপাটিকা	বাম ভেন্ট্রিকলের সংকোচনকালে বাম অ্যাট্রিয়ামে রক্তের পশ্চাৎ প্রবাহ প্রতিরোধ করে।
কর্ডি টেন্ডিনি	ভেন্ট্রিকলের সংকোচনকালে কপাটিকার অভ্যন্তর ভাগ বাইরের দিকে ঘুরে যাওয়া প্রতিরোধ করে।
ডান ভেন্ট্রিকল	পালমোনারি ধমনির মাধ্যমে অক্সিজেন-রিক্ত রক্তকে ফুসফুসে পাম্প করে।
ট্রাইকাসপিড কপাটিকা	ডান ভেন্ট্রিকলের সংকোচনকালে ডান অ্যাট্রিয়ামে রক্তের পশ্চাৎ প্রবাহ প্রতিরোধ করে।
সেমিলুনার কপাটিকা	ডান ভেন্ট্রিকলের শিথিল অবস্থায় পালমোনারি ধমনি থেকে রক্তের পশ্চাৎ প্রবাহ প্রতিরোধ করে।
ডান অ্যাট্রিয়াম	ভেনা ক্যাভার মাধ্যমে ফুসফুস ছাড়া দেহের অন্য সকল অঙ্গ থেকে অক্সিজেনরিক্ত রক্ত গ্রহণ করে।
ভেনা ক্যাভা	দেহের এই প্রধান শিরার মাধ্যমে অক্সিজেন-রিক্ত রক্ত ডান অ্যাট্রিয়ামে ফেরত আসে।

মাছ এবং মানুষের হৃৎপিন্ডের মধ্যে পার্থক্য	
মাছের হৃৎপিন্ড	মানুষের হৃৎপিন্ড
১. দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।	১. চার প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট।
২. ১টি অ্যাট্রিয়াম ও ১টি ভেন্ট্রিকল।	২. দুটি অ্যাট্রিয়া ও দুটি ভেন্ট্রিকল।
৩. সাইনাস ভেনোসাস নামক উপপ্রকোষ্ঠ আছে।	৩. সাইনাস ভেনোসাস নেই।
৪. কেবল CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত পরিবহন করে।	৪. O_2- সমৃদ্ধ ও CO_2-সমৃদ্ধ উভয় ধরনের রক্ত পরিবহন করে।
৫. একচক্রী রক্ত সংবহন ঘটে।	৫. দ্বিচক্রী সংবহন ঘটে।

হার্টবিট–কার্ডিয়াক চক্র (Cardiac Cycle)

হৃৎপিণ্ডের অ্যাট্রিয়া ও ভেন্ট্রিকলদুটির পর্যায়ক্রমিক সংকোচন ও প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের ভিতরে গতিশীল থাকে। হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলোর সংকোচনকে **সিস্টোল** (systole) ও প্রসারণকে **ডায়াস্টোল** (diastole) বলে। হৃৎপিণ্ডের একবার সংকোচন (সিস্টোল) ও একবার প্রসারণ (ডায়াস্টোল)-কে একত্রে **হার্টবিট বা হৃৎস্পন্দন** (heart beat) বলা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির হৃৎস্পন্দনের হার প্রতি মিনিটে প্রায় ৭০-৮০ বার। প্রতি হৃৎস্পন্দন সম্পন্ন করতে সিস্টোল ও ডায়াস্টোলের যে চক্রাকার ঘটনাবলি অনুসৃত হয় তাকে **কার্ডিয়াক চক্র বা হৃৎচক্র** বলে। যদি প্রতি মিনিটে গড়ে ৭৫ বার হার্টবিট হয় তবে কার্ডিয়াক চক্রের সময়কাল-$\frac{৬০}{৭৫}$ = ০.৮ সেকেন্ড। স্বাভাবিকভাবেই অ্যাট্রিয়াল চক্র এবং ভেন্ট্রিকুলার চক্র উভয়েরই স্থিতিকাল ০.৮ সেকেন্ড।

কার্ডিয়াক চক্র চলাকালীন হৃৎপিন্ডের মধ্যে রক্তসংবহন

কার্ডিয়াক চক্র চলাকালীন কীভাবে হৃৎপিন্ডে রক্ত সংবহন হয় তা নিচের চারটি ঘটনাবলির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়।

১. **অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টোল** (Atrial diastole) : এ সময় অ্যাট্রিয়ামদুটি প্রসারিত বা শিথিল অবস্থায় থাকে। ট্রাইকাসপিড এবং বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ হয়। অ্যাট্রিয়াম-মধ্যবর্তী চাপ হ্রাস পায়, ফলে দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা এবং ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা দিয়ে ডান অ্যাট্রিয়ামে এবং পালমোনারি শিরা দিয়ে ফুসফুস থেকে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত বাম অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। এ সময় হৃৎপিণ্ডের পেশি থেকেও CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি সাইনাসের মাধ্যমে ডান অ্যাট্রিয়ামে আসে। অ্যাট্রিয়ামদুটি রক্তপূর্ণ হলে অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল ঘটে। এ দশার সময়কাল ০.৭ সেকেন্ড।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. **অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল** (Atrial systole) : অ্যাট্রিয়ামের ডায়াস্টোল শেষ হলে প্রায় একই সাথে উভয় অ্যাট্রিয়াম সংকুচিত হয়। যদিও সংকোচনের ঢেউ প্রথমে ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে শুরু হয়ে বাম অ্যাট্রিয়ামে ছড়িয়ে পড়ে। ডান অ্যাট্রিয়ামের সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (sino-atrial node) থেকে সংকোচনের সূত্রপাত ঘটে। অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোল ০.১ সেকেন্ড স্থায়ী হয়। প্রথমার্ধে অর্থাৎ প্রথম ০.০৫ সেকেন্ড সংকোচন সর্বোচ্চ মাত্রায় থাকে, একে ডায়নামিক (dynamic) পর্যায় বলে। আর দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ পরবর্তী ০.০৫ সেকেন্ড ক্ষীণতর হতে হতে প্রশমিত হয়। একে বলে অ্যাডায়নামিক (adynamic) পর্যায়।

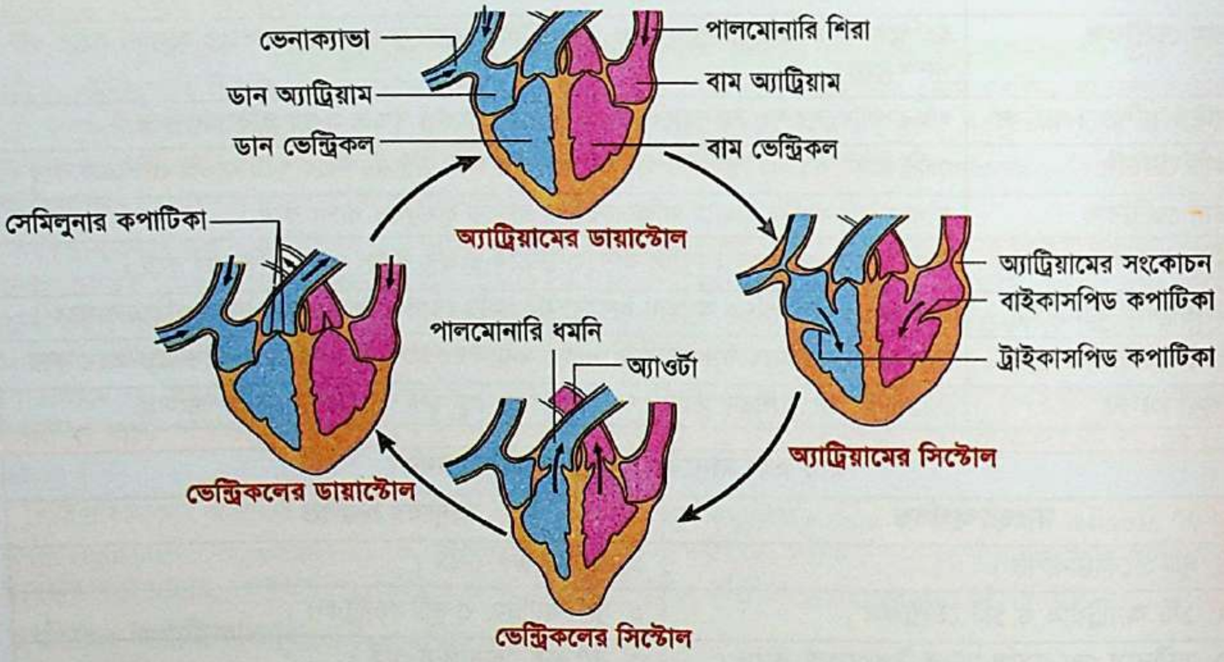

চিত্র ৪.১৬ : কার্ডিয়াক চক্র

৩. **ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল** (Ventricular systole) : অ্যাট্রিয়ামের সিস্টোলের পরপরই (প্রায় ০.১–০.২ সেকেন্ড পর) ভেন্ট্রিকলদুটি রক্তপূর্ণ অবস্থায় সংকুচিত হয়। ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা সজোরে বন্ধ হয় এবং সেমিলুনার কপাটিকা খুলে যায়। এতে লাব (lub) সদৃশ প্রথম শব্দের সৃষ্টি হয়। ভেন্ট্রিকল-মধ্যবর্তী চাপ বৃদ্ধি পায় এবং ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত ভেন্ট্রিকলের বাইরে নির্গত হয়। ডান ভেন্ট্রিকল থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনিতে এবং বাম ভেন্ট্রিকল থেকে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাওর্টায় প্রবেশ করে। এ দশার সময়কাল ০.৩ সেকেন্ড।

৪. **ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল** (Ventricular diastole) : ভেন্ট্রিকলের সিস্টোলের পরপরই এর ডায়াস্টোল শুরু হয়। এ দশার সময়কাল ০.৫ সেকেন্ড। যখনই ভেন্ট্রিকল প্রসারিত হতে থাকে তখন ভেন্ট্রিকল মধ্যস্থ চাপ কমতে থাকে। ফলে অ্যাওর্টা ও পালমোনারি ধমনির রক্ত ভেন্ট্রিকলে ফিরে আসতে চায়। কিন্তু অতি দ্রুত সেমিলুনার কপাটিকা বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় ডাব (dub) সদৃশ দ্বিতীয় শব্দ উৎপন্ন হয়। সুতরাং, হৃৎপিন্ডের শব্দগুলো হচ্ছে–

ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল= লাব (lub); ভেন্ট্রিকলের ডায়াস্টোল = ডাব (dub)।

অ্যাট্রিয়াম		ভেন্ট্রিকল	
ডায়াস্টোল	সিস্টোল	ডায়াস্টোল	সিস্টোল
০.৭ সে.	০.১ সে.	০.৫ সে.	০.৩ সে.

ভেন্ট্রিকলের প্রসারণ অব্যাহত থাকায় এর অভ্যন্তরের চাপ ক্রমশ কমতে থাকে এবং তা যখন অ্যাট্রিয়ামের চাপের নিচে নেমে যায় তখন অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা খুলে যায়। ভেন্ট্রিকল তখন অ্যাট্রিয়াম থেকে আগত রক্তে পূর্ণ হতে থাকে। সামান্য বিশ্রামের পর আবার আগের মতো ভেন্ট্রিকলের সিস্টোল শুরু হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

হার্টবিট-এর মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ এবং উদ্দীপনা পরিবহন (Myogenic Regulation of Heart Beat and Transmission of Impulse)

মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংকুচিত-প্রসারিত হয়ে সমগ্র দেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায়। এতে প্রচণ্ড গতিতে দেহে রক্ত প্রবাহিত হয়। বাইরের কোন উদ্দীপনা ছাড়াই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় এ ধরনের নিয়ন্ত্রণকে মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ (**myogenic** = muscle origin; myo = muscle + genic = giving rise to) বলে অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্র বা হরমোন, কিংবা অন্য কোন উদ্দীপনা ছাড়াই নিজ থেকে হৃৎস্পন্দন তৈরি হয়। কোন স্তন্যপায়ী প্রাণীর হৃৎপিণ্ড তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে O_2-সমৃদ্ধ লবণ দ্রবণে ৩৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় রেখে দিলে তাতে বাইরের কোন উদ্দীপনা ছাড়াই বেশ কিছু সময় পর্যন্ত হার্টবিট চলতে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরের কিছু রূপান্তরিত হৃৎপেশি মায়োজেনিক প্রকৃতির জন্য দায়ী। হৃৎপিণ্ডের এ বিশেষ ধরনের পেশিগুলোকে সম্মিলিতভাবে **সংযোগী টিস্যু বা জাংশনাল টিস্যু** (junctional tissue) বলে। হৃৎপিণ্ডের সংযোগী টিস্যুগুলো নিচে বর্ণিত চার ধরনের।

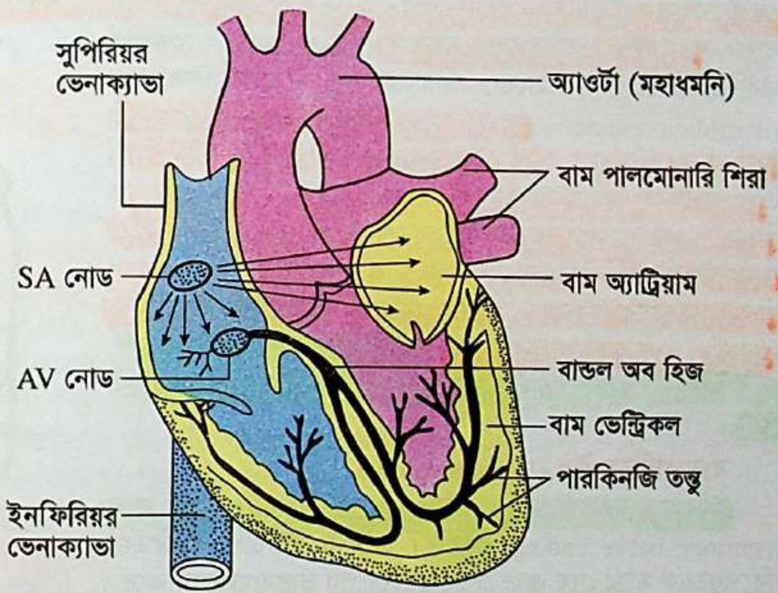

চিত্র ৪.১৭ : মানুষের হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী টিস্যু

১. **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড** (Sino-Atrial Node, সংক্ষেপে SAN) : এটি ডান অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে, ডান অ্যাট্রিয়াম ও সুপিরিয়র ভেনাক্যাভার ছিদ্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত এবং স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে কিছু স্নায়ুপ্রান্তসহ অল্প সংখ্যক হৃৎপেশিতন্তু নিয়ে গঠিত। এগুলো ১০–১৫ mm লম্বা, ৩ mm চওড়া এবং ১ mm পুরু। SAN থেকে সৃষ্ট একটি অ্যাকশন পটেনসিয়াল (action potential) ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালের মাধ্যমে হার্টবিট শুরু হয়। এ অ্যাকশন পটেনসিয়াল ছড়িয়ে সাথে সাথে স্নায়ু উদ্দীপনার অনুরূপ উত্তেজনার একটি ছোট তরঙ্গ হৃৎপেশির দিকে অতিক্রান্ত হয়। এটি অ্যাট্রিয়ামের প্রাচীরে ছড়িয়ে অ্যাট্রিয়ামের সংকোচন ঘটায়। SAN-কে **পেসমেকার** (pacemaker) বলে, কারণ প্রতিটি উত্তেজনার তরঙ্গ এখানেই সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তী উত্তেজনার তরঙ্গ সৃষ্টির উদ্দীপক হিসেবেও এটি কাজ করে।

২. **অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার নোড** (Atrio-Ventricular Node, **সংক্ষেপে** AVN) : ডান অ্যাট্রিয়াম-ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে অবস্থিত SAN-এর অনুরূপ গঠন বৈশিষ্ট্যের AVN টিস্যু **AV বান্ডেল** নামক বিশেষ পেশিতন্তু গুচ্ছের সাথে যুক্ত থাকে। AV বাণ্ডেল-এর মাধ্যমে হৃৎউদ্দীপনার ঢেউ অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকলে প্রবাহিত হয়। SAN থেকে AVN-এ উদ্দীপনার ঢেউ পরিবহনে ০.১৫ সেকেন্ড দেরি হয়। অর্থাৎ ভেন্ট্রিকুলার সিস্টোল শুরুর আগে অ্যাট্রিয়াল সিস্টোল সম্পূর্ণ হয়।

৩. **বান্ডল অব হিজ** (Bundle of His) : হৃৎপিণ্ডের এ বিশেষ টিস্যুটি AV নোড থেকে উৎপন্ন হয়ে আন্তঃভেন্ট্রিকুলার (আন্তঃনিলয়) প্রাচীরের পশ্চাৎভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ডান ও বাম শাখায় বিভক্ত হয়ে ভেন্ট্রিকলের **পারকিঞ্জি তন্তুতে** মিলিত হয়। এটি AV নোড থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে সঞ্চারিত করে।

৪. **পারকিঞ্জি তন্তু** (Purkinje fibre) : এ তন্তুগুলো বাণ্ডল অব হিজ থেকে উৎপন্ন হয়ে ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে জালক সৃষ্টি করে। বান্ডল অব হিজ থেকে প্রাপ্ত উদ্দীপনা পারকিঞ্জি তন্তুর মাধ্যমে ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরে ছড়িয়ে পড়ে ভেন্ট্রিকল দুটির সংকোচন ঘটায়। হৃৎপিণ্ডের বিশেষ সংযোগী টিস্যুগুলোর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহের অনুক্রমটি নিম্নরূপ :

SA নোড → AV নোড → বান্ডল অব হিজ → পারকিঞ্জি তন্তু

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যারোরিসেপ্টরের ভূমিকা
(Role of Baroreceptor in controlling Blood Pressure)

রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার (Blood pressure)

রক্তনালির ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রাচীর গাত্রে যে পার্শ্বচাপ প্রয়োগ করে তাকে **রক্তচাপ** বলে। হৃৎপিণ্ডের বিশেষত ভেন্ট্রিকল (নিলয়)-এর সংকোচনের ফলেই রক্ত ধমনির মধ্যদিয়ে অব্যাহতভাবে বহমান থাকে। **ভেন্ট্রিকলের সংকোচন** (systole) অবস্থায় রক্তচাপ বেশি থাকে এবং এ চাপকে **সিস্টোলিক চাপ** (systolic pressure) বলে। অপরদিকে **ভেন্ট্রিকলের প্রসারণ** (diastole) কালে রক্তচাপ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। একে বলা হয় **ডায়াস্টোলিক চাপ** (diastolic pressure)। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের স্বাভাবিক সিস্টোলিক চাপ হচ্ছে ১১০-১২০ mmHg (মিলিমিটার পারদ স্তম্ভ) এবং স্বাভাবিক ডায়াস্টোলিক চাপ ৭০–৮০ mmHg. রক্ত স্বাভাবিক সীমার উপরে থাকলে তাকে **উচ্চ রক্তচাপ** (hypertension) এবং স্বাভাবিক সীমার নিচে থাকলে তাকে **নিম্ন রক্তচাপ** (hypotension) বলে। মানুষের রক্তচাপ মাপার যন্ত্রকে **স্ফিগমোম্যানোমিটার** (sphygmomanometer) বলা হয়। বয়স, লিঙ্গ, পেশা, খাদ্যাভ্যাস, জীবনযাপন পদ্ধতি ইত্যাদি কারণে মানুষের রক্তচাপের তারতম্য ঘটে।

চিত্র ৪.১৮ : অ্যাওর্টিক এবং ক্যারোটিক ব্যারোরিসেপ্টর

ব্যারোরিসেপ্টর (Baroreceptors)

মানুষের রক্তবাহিকার প্রাচীরে বিশেষ সংবেদী স্নায়ু প্রান্ত (sensory nerve ending) থাকে। এগুলো রক্তচাপ পরিবর্তনে বিশেষভাবে সাড়া দেয় এবং দেহে রক্ত চাপের ভারসাম্য রক্ষা করে। এ সংবেদী স্নায়ু প্রান্তকে **ব্যারোরিসেপ্টর** বলে। এসব স্নায়ু প্রান্ত অস্বাভাবিক রক্তচাপ শনাক্ত করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে যে বার্তা পাঠায় তার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র হৃৎস্পন্দন মাত্রা ও শক্তি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রক্তচাপ স্বাভাবিককরণে ভূমিকা পালন করে। সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি **ব্যারোরিফ্লেক্স** (baroreflex) নামে পরিচিত।

ব্যারোরিসেপ্টর দু'রকম–উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর এবং নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর।

১. **উচ্চচাপ ব্যারোরিসেপ্টর** (High-Pressure Baroreceptors) : অনুপ্রস্থ অ্যাওর্টিক আর্চ এবং ডান ও বাম অন্তঃস্থ ক্যারোটিড ধমনির **ক্যারোটিড সাইনাস**-এ এসব ব্যারোরিসেপ্টর অবস্থান করে। রক্তের চাপ বেড়ে গেলে অর্থাৎ রক্তনালির প্রসারণ ঘটলে সেখানকার ব্যারোরিসেপ্টরগুলো উদ্দীপ্ত হয় এবং এ উদ্দীপনা মস্তিষ্কের মেডুলায় সঞ্চালিত হয় এবং এখানে **ভ্যাসোমোটর** (vasomotor) কেন্দ্রটি দমিত হয়। ফলে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু বরাবর হৃৎপিন্ড ও রক্তনালিতে চেষ্টীয় (motor) বা আজ্ঞাবহ উদ্দীপনা পরিবহনের হার হ্রাস পায়। আজ্ঞাবহ উদ্দীপনার কমতিতে হৃৎপিন্ডের পাম্পিং ক্রিয়া এবং রক্তনালির মধ্য দিয়ে রক্ত সংবহনের মাত্রা কমে যায়। এভাবে রক্তচাপ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

রক্তচাপ পড়ে গেলে (যেমন–মানসিক আঘাতে) ক্যারোটিড ও অ্যাওর্টিক ব্যারোরিসেপ্টর থেকে সংকেত যথাক্রমে গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল ও ভ্যাগাস স্নায়ুর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মেডুলা অবলংগাটায় জড়ো হয়। মেডুলা অবলংগাটা তথ্যগুলো হৃৎপেশি, কার্ডিয়াক পেসমেকার, দেহের ধমনিকা বা আর্টারিওল (ধমনির সূক্ষ্ম শাখা) ও শিরায় প্রেরণ করে। ফলে হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয় ও সজোরে সংকুচিত হয় এবং ধমনির রক্তচাপ স্বাভাবিক হয়ে আসে।

২. **নিম্নচাপ ব্যারোরিসেপ্টর বা আয়তন রিসেপ্টর** (Low-Pressure Baroreceptors or Volume Receptors): বড় বড় সিস্টেমিক শিরা, পালমোনারি রক্তবাহিকা এবং ডান অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের প্রাচীরের ব্যারোরিসেপ্টরগুলো এ ধরনের। এসব রিসেপ্টর **রক্তের আয়তন** (blood volume) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখে। রক্তের আয়তন কমে গেলে রক্তচাপও কমে যায়। তখন আয়তন রিসেপ্টর মস্তিষ্কের **হাইপোথ্যালামাস**-এ বার্তা প্রেরণ করে। ফলে পিটুইটারি গ্রন্থির **নিউরোহাইপোফাইসিস** কর্তৃক **অ্যান্টিডাইউরেটিক বা ভ্যাসোপ্রেসিন হরমোন** ক্ষরণ বেড়ে যায়। উক্ত হরমোন বৃক্কনালিকায় পানি পুনঃশোষণ বাড়িয়ে রক্তের আয়তন বৃদ্ধির মাধ্যমে রক্তচাপ বাড়ায়। ভ্যাসোপ্রেসিন

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

হরমোন সরাসরি রক্তনালিকার সংকোচন ঘটিয়েও রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। রক্তের আয়তন তথা চাপ কমে গেলে স্বয়ংক্রিয় বা সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু উদ্দীপ্ত হওয়ায় বৃক্কের অন্তর্বাহী ধমনির **জাক্সটা-গোমেরুলার কোষ** (juxtaglomerular cell) থেকে **রেনিন** এনজাইম ক্ষরণ বেড়ে যায়। রেনিন এনজাইমের কার্যকারিতায় কয়েকটি জটিল বিক্রিয়ার মাধ্যমে রক্তের আয়তন বাড়িয়ে রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ আয়তন রিসেপ্টরের প্রভাব রয়েছে রক্ত সংবহন ও রেচন উভয় তন্ত্রে।

মানবদেহে রক্ত সংবহন (Blood Circulation of Human Body)

মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্র **বদ্ধ ধরনের** (closed type)। অর্থাৎ রক্ত হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিক নালির মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়ে অভ্যন্তরীণ পরিবহন সম্পন্ন করে। তাছাড়া মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্রে **দ্বি-চক্রীয় সংবহন** (double circulation) অর্থাৎ **সিস্টেমিক** (systemic) ও **পালমোনারি** (pulmonary) চক্র দেখা যায়। মানবদেহে চার প্রক্রিয়ায় রক্তসংবহন সংঘটিত হয়, যথা- ১. সিস্টেমিক, ২. পালমোনারি, ৩. পোর্টাল এবং ৪. করোনারি। নিচে এসব প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. সিস্টেমিক সংবহন (Systemic circulation)

যে সংবহনে রক্ত বাম ভেন্ট্রিকল থেকে বিভিন্ন রক্ত বাহিকার মাধ্যমে অঙ্গগুলোতে পৌছায় এবং অঙ্গ থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে, তাকে **সিস্টেমিক সংবহন** বলে। সব সিস্টেমিক ধমনির উদ্ভব হয় **অ্যাওর্টা** (aorta) বা **মহাধমনি** থেকে, আর অ্যাওর্টার উদ্ভব ঘটে বাম ভেন্ট্রিকল থেকে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের ফলে বাম ভেন্ট্রিকল থেকে রক্ত প্রথমে অ্যাওর্টার ভিতর দিয়ে ধমনিতে প্রবেশ করে। পরে দেহের বিভিন্ন টিস্যু ও অঙ্গের **ধমনিকা** (arteriole) ও কৈশিক নালির (capillaries) রক্ত জালিকার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। জালিকা থেকে রক্ত পুনরায় সংগৃহীত হয়ে উপশিরার মাধ্যমে শিরায় প্রবেশ করে। সব শিরার রক্ত পরে **সুপিরিয়র ভেনাক্যাভা** (উর্ধ্ব মহাশিরা) ও **ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা** (নিম্ন মহাশিরা) দিয়ে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে। ডান অ্যাট্রিয়াম থেকে রক্ত ডান ভেন্ট্রিকলে গমন করে। এভাবে সিস্টেমিক সংবহন সমাপ্ত হয়। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসতে সিস্টেমিক সংবহনের সময় লাগে ২৫-৩০ সেকেন্ড।

কাজ : সিস্টেমিক সংবহনে রক্ত দেহকোষের চারপাশে অবস্থিত কৈশিক জালিকা অতিক্রমকালে কোষে O_2, খাদ্যসারসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করে এবং একই সাথে কোষে সৃষ্ট CO_2, রেচন পদার্থ ইত্যাদি কোষ থেকে অপসারিত হয়।

বাম ভেন্ট্রিকল→ অ্যাওর্টা→টিস্যু ও অঙ্গ→ মহাশিরা (ভেনাক্যাভা)→ ডান অ্যাট্রিয়াম→ডান ভেন্ট্রিকল।

২. পালমোনারি সংবহন (Pulmonary circulation)

যে সংবহনে রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডান ভেন্ট্রিকল থেকে ফুসফুসে পৌছায় এবং ফুসফুস থেকে বাম অ্যাট্রিয়ামে ফিরে আসে, তাকে **পালমোনারি** বা **ফুসফুসীয় সংবহন** বলে। পালমোনারি সংবহনের শুরু হয় **পালমোনারি ধমনি** থেকে, আর পালমোনারি ধমনির উদ্ভব ঘটে ডান ভেন্ট্রিকল থেকে। ডান ভেন্ট্রিকলের সংকোচনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড-সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি ধমনিতে প্রবেশ করে। এরপর রক্ত ধমনিকা (arteriole) হয়ে ফুসফুসের অ্যালভিওলাসের চারপাশে অবস্থিত কৈশিক নালিতে উপস্থিত হয়। কৈশিক নালি থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্ত পুনরায় ক্ষুদ্রতর শিরা বা **ভেনিউল** (venule) এবং অবশেষে ৪টি (প্রতি ফুসফুস থেকে ২টি) পালমোনারি শিরার মাধ্যমে বাম অ্যাট্রিয়ামে ফেরত আসে।

ডান ভেন্ট্রিকল → পালমোনারি ধমনি→ ফুসফুস→ পালমোনারি শিরা→ বাম অ্যাট্রিয়াম→বাম ভেন্ট্রিকল।

কাজ : এ সংবহনের মাধ্যমে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত ফুসফুসে প্রবেশ করে। সেখানে অ্যালভিওলাসে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসের বিনিময় ঘটে ফলে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফেরত আসে।

৩. পোর্টাল সংবহন (Portal circulation)

সিস্টেমিক ও পালমোনারি এ দুটি সম্পূর্ণ সংবহন চক্র ছাড়াও অনেক মেরুদণ্ডী প্রাণীতে রক্ত চলার পথে কিছুটা পার্শ্বপথ অনুসরণ করে। এসব ক্ষেত্রে কোনো অঙ্গের কৈশিক জালিকা থেকে উৎপন্ন শিরা হৃৎপিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে অন্য একটি মাধ্যমিক অঙ্গে প্রবেশ করে এবং সেখানে পুনরায় জালিকায় বিভক্ত হয়। এ ধরনের রক্ত সংবহনকে **পোর্টাল সংবহন** বলে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীতে সাধারণত **যকৃত বা হেপাটিক** (hepatic) এবং **বৃক্কীয় বা রেনাল** (renal)-এ দুধরনের পোর্টাল সংবহন দেখা যায়। তবে রেনাল পোর্টাল সংবহন মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীতে অনুপস্থিত।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

হেপাটিক (যকৃত) পোর্টাল সংবহন: পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্র, অগ্ন্যাশয়, অন্ত্র ও প্লীহা থেকে কৈশিক জালিকার মাধ্যমে সংগৃহীত রক্ত **হেপাটিক পোর্টাল শিরা** (hepatic portal vein)-র ভিতর দিয়ে যকৃতের দিকে প্রবাহিত হওয়াকে হেপাটিক পোর্টাল সংবহন বলে। যকৃতে পৌঁছে হেপাটিক পোর্টাল শিরা পুনরায় কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয়। এসব কৈশিক জালিকা পরে একত্রীভূত হয়ে **হেপাটিক শিরা** (hepatic vein) গঠন করে এবং এর মাধ্যমে রক্ত ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভায় বাহিত হয়। সেখান থেকে রক্ত হৃৎপিণ্ডে পৌঁছায়।

পৌষ্টিক অঙ্গসমূহ→হেপাটিক পোর্টাল শিরা→যকৃত→হেপাটিক শিরা→ইনফিরিয়র ভেনাক্যাভা→ হৃৎপিণ্ড।

হেপাটিক পোর্টাল সংবহনের প্রয়োজনীয়তা : (i) পৌষ্টিকনালি থেকে শোষিত সরল খাদ্য (গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফ্যাটি এসিড ইত্যাদি) পোর্টাল সংবহনের মাধ্যমে যকৃতে আসে। সেখানে অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেন-এ পরিণত হয়ে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হয়। দেহকোষে গ্লুকোজের অভাব ঘটলে গ্লাইকোজেন পুনরায় গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তে প্রবাহিত হয়। (ii) দূষিত নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ অ্যামোনিয়া যকৃতে ইউরিয়ায় পরিণত হয়ে বৃক্কের মাধ্যমে দেহের বাইরে নির্গত হয়। ফলে রক্ত পরিশুদ্ধ হয়। (iii) যকৃত রক্তে প্রোটিন উৎপন্ন করে রক্তে সরবরাহ করে।

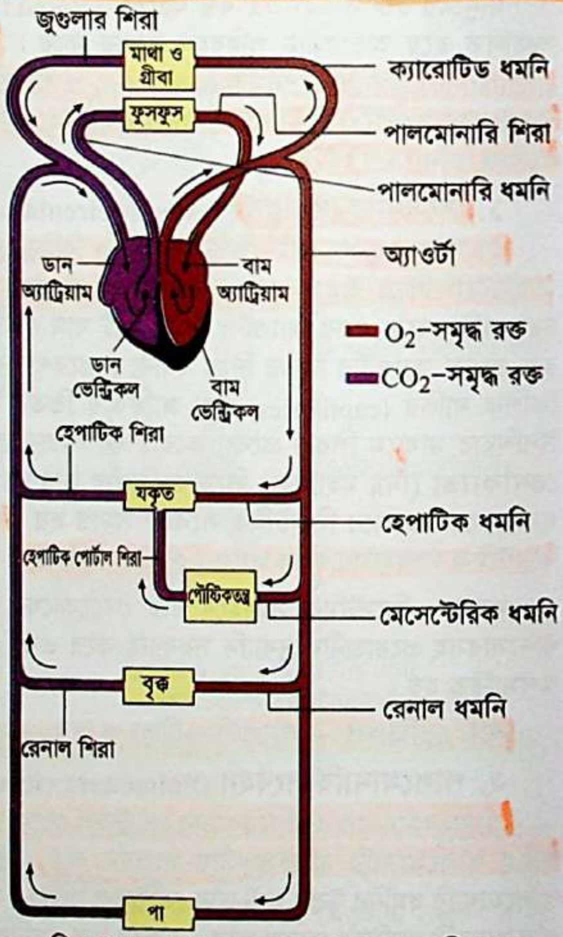

চিত্র ৪.১৯ : মানবদেহের রক্ত সংবহনের চিত্ররূপ

৪. করোনারি সংবহন (Coronary circulation)

দেহে রক্ত সংবহনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে আমৃত্যু যে অঙ্গটি রক্তের মাধ্যমে সমগ্র দেহের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে, সেটি **হৃৎপিণ্ড**। হৃৎপিণ্ডের নিজের জন্যও পুষ্টি এবং অক্সিজেন প্রয়োজন। এ চাহিদা পূরণ হয় করোনারি সংবহনের মাধ্যমে। হৃৎপিণ্ডের হৃৎপেশিতে রক্ত সঞ্চালনকারি সংবহনকে করোনারি রক্ত সংবহন বলে।

হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে সরাসরি হৃৎগহ্বর থেকে রক্ত সঞ্চালিত হয় না। সিস্টেমিক ধমনির গোড়া থেকে সৃষ্ট করোনরি ধমনির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের প্রাচীরে O_2–সমৃদ্ধ রক্ত সংবাহিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রাচীর CO_2–সমৃদ্ধ রক্ত করোনারি শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ডান অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে।

সিস্টেমিক ধমনি → করোনারি ধমনি → হৃৎপ্রাচীর → করোনরি শিরা → ডান অ্যাট্রিয়াম।

হৃদরোগের বিভিন্ন অবস্থায় করণীয়
(Measures to be taken in different conditions of Heart Disease)

বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতে মানুষের হৃৎপিণ্ডে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসব সমস্যার মধ্যে বুকে ব্যথা, হার্ট অ্যাটাক ও হার্ট ফেইলিউর নিয়ে আলোচনা করা হলো।

বুকে ব্যথা (Chest pain) বা অ্যানজাইনা (Angina)

নানা কারণে বুকে ব্যথা হলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হৃৎপিণ্ডজনিত বুক ব্যথা। হৃৎপেশি যখন O_2-সমৃদ্ধ পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ পায় না তখন বুক নিষ্পেষিত হচ্ছে বা দম বন্ধ হয়ে আসছে এমন মারাত্মক অস্বস্তি অনুভূত হলে সে ধরনের বুক ব্যথাকে **অ্যানজাইনা** বা **অ্যানজাইনা পেকটোরিস** (angina / angina pectoris) বলে। অ্যানজাইনাকে সাধারণত হার্ট অ্যাটাকের পূর্বাবস্থা মনে করা হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

অ্যানজাইনার লক্ষণ (Symptoms of Angina)

১. উরঃফলক বা স্টার্নামের (sternum) পিছনে বুকে ব্যথা হওয়া।
২. ব্যায়াম বা অন্য শারীরিক কাজে, মানসিক চাপ, অতি ভোজন, শৈত্য বা আতংকে বুকে ব্যথা হতে পারে। ব্যথা ৫–৩০ মিনিট স্থায়ী হয়।
৩. অ্যানজাইনা গলা, কাঁধ, চোয়াল, বাহু, পিঠ এমনকি দাঁতেও ছড়াতে পারে।
৪. অনেক সময় ব্যথা কোত্থেকে আসছে তাও বোঝা যায় না।
৫. বুকে জ্বালাপোড়া, চাপ, নিষ্পেষণ বা আড়ষ্ট ভাব সৃষ্টি হয়ে অস্বস্তির প্রকাশ ঘটায়।
৬. বুকে ব্যথা ছাড়াও হজমে গন্ডগোল ও বমি ভাব হতে পারে।
৭. ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া কিংবা দম ফুরিয়ে হাঁপানো দেখা দিতে পারে।

অনেক রোগী অ্যানজাইনা টের পায় না, তবে কাঁধ ও বাহু ভারী হয়ে আসে। বুকে ব্যথার সাথে সাথে ঘাম হয়, মাথা ঝিমঝিম করে বা শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যায়। রোগী চিন্তান্বিত থাকে, মাথা ঝুলে থাকে। সারাদিন দুর্বল ও পরিশ্রান্ত থাকে এবং তখন সহজ কাজও কঠিন মনে হয়।

করণীয় / প্রতিকার (Control)

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া এবং তা ধরে রাখাই হচ্ছে অ্যানজাইনা প্রতিরোধের প্রধান উপায়। এজন্যে কিছু বিষয় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পালন করা উচিত। কিছু বিষয় আছে যার নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে নেই, যেমন-বয়স, লিঙ্গভেদ, হৃদরোগ ও অ্যানজাইনার পারিবারিক ইতিহাস। যে সব বিষয় আমাদের নাগালে তার মধ্যে রয়েছে: হাঁটা-চলা বা ব্যায়াম করা, স্থূলতা প্রতিরোধ করা, সুষম ও হৃৎবান্ধব খাবার খাওয়া, রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা, ডায়াবেটিস প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে রাখা, ধূমপান ত্যাগ করা; মদপানের ধারে কাছে না যাওয়া, বছরে একবার (সম্ভব হলে দুবার) সম্পূর্ণ শরীরের চেকআপ করিয়ে নেওয়া।

হার্ট অ্যাটাক (Heart Attack or Myocardial Infarction)

হৃৎপেশির সুস্থতার জন্য ক্রমাগতভাবে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ জরুরি। করোনারি ধমনির মাধ্যমে অক্সিজেন–সমৃদ্ধ রক্ত পেশিতে পৌঁছায়। চর্বি জাতীয় পদার্থ, ক্যালসিয়াম, প্রোটিন প্রভৃতি করোনারি ধমনির অন্তর্গাত্রে জমা হয়ে বিভিন্ন আকৃতির প্লাক (plaques) গঠন করে। একে **করোনারি অ্যাথেরোমা** (coronary atheroma) বলে। প্লাকের বহির্ভাগ ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠে। এভাবে প্লাক শক্ত হতে হতে যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় তখন এগুলো বিদীর্ণ হয়। অণুচক্রিকা জমা হয়ে প্লাকের চতুর্দিকে তখন রক্ত জমাট বাঁধাতে শুরু করে। রক্ত জমাট বাঁধার কারণে করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলে হৃৎপেশিতে পুষ্টি ও অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্তের সরবরাহও বন্ধ হয়ে যায়, ফলে হৃৎপেশি ধ্বংস হয় বা মরে যায় এবং মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এর নাম **হার্ট অ্যাটাক বা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন** (myocardial infraction; মায়োকার্ডিয়াল অর্থ হৃৎপেশি, আর ইনফার্কশন অর্থ অপর্যাপ্ত রক্ত প্রবাহের কারণে টিস্যুর মৃত্যু)।

হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ

করোনারি ধমনিতে কোলেস্টেরল জাতীয় পদার্থ জমা হওয়া থেকে হার্ট অ্যাটাকে পরিসমাপ্তি হওয়া পর্যন্ত অনেক দিন অতিবাহিত হয়। এ সময়ের ভিতর বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে নিম্নোক্ত লক্ষণগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়।

১. **বুকে অস্বস্তি** (Chest-discomfort) : বুকের ঠিক মাঝখানে অস্বস্তি হওয়া যা কয়েক মিনিট থাকে, চলে যায় আবার ফিরে আসে। বুকে অসহ্য চাপ, মোচড়ান, আছড়ান বা ব্যথা অনুভূত হয়।
২. **ঊর্ধ্বাঙ্গের অন্যান্য অংশে অস্বস্তি** (Discomfort in other areas of the upper body) : এক বা উভয় বাহু, পিঠ, গলা, চোয়াল বা পাকস্থলির উপরের অংশে অস্বস্তি বা ব্যথা অনুভব।
৩. **ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস** (Shortness of breath) : বুকে অস্বস্তির সময় ঘন ঘন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস ঘটে। অনেক সময় বুকে অস্বস্তি হওয়ার আগেও এমন অবস্থা দেখা দিতে পারে।
৪. **বমি-বমি ভাব** (Nausea) : পাকস্থলিতে অস্বস্তির সঙ্গে বমি-বমি ভাব, বমি হওয়া, হঠাৎ মাথা ঝিমঝিম করা অথবা ঠান্ডা ঘাম বেরিয়ে যাওয়া।
৫. **ঘুমে ব্যাঘাত** (Sleep disturbance) : ঘুমে ব্যাঘাত ঘটা, নিজেকে শক্তিহীন বা শ্রান্ত বোধ করা।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

প্রতিরোধ

১. ঋতুকালীন টাটকা ফল ও সবজি খেতে হবে।
২. চর্বি ও কোলেস্টেরলযুক্ত খাবার বাদ দিতে হবে।
৩. **বডি-মাস ইন্ডেক্স** (Body Mass Index, BMI) মেনে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে।
৪. সঠিক ওজন, রক্তে কোলেস্টেরল মাত্রা ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত ব্যায়াম (যেমন- প্রতিদিন ৩০ মিনিট হাঁটা ইত্যাদি) করতে হবে।
৫. ধূমপায়ী হলে অবশ্যই ধূমপান ত্যাগ করতে হবে, অধূমপায়ী হলে ধূমপান না করার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।
৬. জীবনাভ্যাসে অ্যালকোহল নিষিদ্ধ রাখতে হবে।
৭. কোলেস্টেরল, রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।
৮. চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী নিয়মিত ওষুধ চালিয়ে যেতে হবে বা বন্ধ করতে হবে।
৯. বছরে অন্তত একবার (সম্ভব হলে দুবার) সমগ্র দেহ চেকআপের ব্যবস্থা করতে হবে।

হার্ট ফেইলিউর (Heart Failure)

হৃৎপিন্ড যখন দেহের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত রক্তের যোগান দিতে পারে না তখন এ অবস্থাকে **হার্ট ফেইলিউর** বলে। অনেক সময় হৃৎপিন্ড রক্তে পরিপূর্ণ হতে না পারায়, কখনওবা হৃৎপ্রাচীরে যথেষ্ট শক্তি না থাকায় এমনটি হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে উভয় সমস্যাই একসঙ্গে দেখা যায়। অতএব হার্ট ফেইলিউর মানে হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে গেছে, বা থেমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তা নয়। তবে হার্ট ফেইলিউরকে হৃৎপিন্ডের একটি মারাত্মক অবস্থা বিবেচনা করে সুচিকিৎসার কথা বলা হয়েছে।

হার্ট ফেইলিউরের কারণ

করোনারি ধমনির অন্তঃস্থ গাত্রে কোলেস্টেরল জমে ধমনির গহবর সংকীর্ণ করে দিলে হৃৎপ্রাচীর পর্যাপ্ত O_2-সমৃদ্ধ রক্ত সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হয়। কালান্তরে হার্ট ফেইলিউর ঘটে। উচ্চ রক্তচাপ বেশি দিন স্থায়ী হলে ধমনির অন্তঃস্থ প্রাচীরে কোলেস্টেরল জমার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। ফলে রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হয় এবং হৃৎপিন্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। ডায়াবেটিস হলে দেহ পর্যাপ্ত ইনসুলিন উৎপাদন বা সঠিকভাবে ব্যবহারও করতে পারে না। এ কারণে ধীরে ধীরে হৃৎপেশি ও হৃৎপিন্ডের বাহিকাগুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে হার্ট ফেইলিউর ঘটে। হৃৎপিন্ডে জন্মগত বা সংক্রমণজনিত কারণেও হার্ট ফেইলিউর ঘটতে পারে।

হার্ট ফেইলিউরের লক্ষণ

১. সক্রিয়, নিষ্ক্রিয় এমনকি ঘুমের মধ্যেও শ্বাসকষ্টে ভোগা এবং ঘুমের সময় মাথার নিচে দুটি বালিশ না দিলে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়।
২. সাদা বা গোলাপি রঙের রক্তমাখানো মিউকাসসহ স্থায়ী কাশি বা ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস-প্রশ্বাস।
৩. শরীরের বিভিন্ন জায়গার টিস্যুতে তরল জমে ফুলে উঠে।
৪. পা, গোড়ালি, পায়ের পাতা, উদর ও যকৃত স্ফীত হয়ে যায়। জুতা পরতে গেলে হঠাৎ আঁটসাট মনে হয়।
৫. প্রতিদিন সব কাজে, সবসময় ক্লান্তিভাব। বাজার-সদাই করা, সিঁড়ি দিয়ে উঠা, কিছু বহন করা বা হাঁটা সবকিছুতেই শ্রান্তিভাব।
৬. পাকস্থলি সব সময় ভরা মনে হয় কিংবা বমি ভাব থাকে।
৭. হৃৎস্পন্দন এত দ্রুত হয় মনে হবে যেন হৃৎপিন্ড এক প্রতিযোগিতায় নেমেছে।
৮. কাজ-কর্ম, চলনে অসামঞ্জস্যতা এবং স্মৃতিহীনতা প্রকাশ পায়।

হার্ট ফেইলিউরের প্রতিকার

অসুখের শুরুতেই হার্ট ফেইলিউরের বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিশ্চিত হলে এবং প্রতিকার সম্বন্ধে সতর্ক হলে রোগীর তেমন সমস্যা থাকে না, সক্রিয় জীবন যাপনেও কোনো কিছু বাধা হয় না। হার্ট ফেইলিউরে আক্রান্ত রোগীদের সাধারণত ৩ ধরনের চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ রাখার চেষ্টা করা হয়।

১. **জীবনযাপন পদ্ধতির পরিবর্তন :** স্বাস্থ্যসম্মত আহার হচ্ছে রোগীদের প্রধান অবলম্বন। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাদ্য তালিকা দেখে নিয়মিত সুষম পানাহার করা উচিত।
২. **ওষুধ গ্রহণ :** হার্ট ফেইলিউরের ধরন দেখে চিকিৎসক যে সব ওষুধ নির্বাচিত করবেন নিয়মিত তা সেবন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৩. অন্যান্য চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়া : হার্ট ফেইলিউর যেন খারাপের দিকে মোড় না নেয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে বিভিন্ন শারীরিক অব্যবস্থাপনা সারিয়ে তুলতে হবে বা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। যেমন- শরীরের ওজন বেড়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে টিস্যুতে পানি জমে থাকা। চিকিৎসককে বলতে হবে কখন ওজন পরীক্ষা করাতে হবে এবং ওজন পরিবর্তন সম্বন্ধে কখন তাঁকে রিপোর্ট করতে হবে।

উল্লিখিত ৩টি প্রতিকার পদ্ধতিতে কাজ না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী শল্যচিকিৎসা বা অন্য কোনো ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা (The Concept of the Treatment of Heart Diseases)

হৃদরোগ নির্ণয়

নিচে বর্ণিত উপায়ে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক হৃদরোগ নির্ণয় করতে পারেন।

১. চিকিৎসকগণ হার্ট বিটের হার বৃদ্ধি, হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক শব্দ, পা ফুলে যাওয়া, ঘাড়ের শিরা ফুলে যাওয়া, যকৃত বড় হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখে হৃদরোগ সহজেই নির্ণয় করতে পারেন।
২. বুকের X-ray করানোর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা জানা যায়।
৩. ইসিজি (Electrocardiogram)– হৃৎপিণ্ডের প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ে ইসিজি সাহায্য করে।
৪. ইটিটি (Exercise Tolerance Test)-এর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা বা কার্যক্ষমতা ভালোভাবে জানা যায়।
৫. রক্তের BNP (Brain Natriuretic Peptide) পরীক্ষার মাধ্যমে হার্ট ফেইলিউর সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়।
৬. করোনারি এনজিওগ্রাম-এর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের রক্তনালিতে কোনো ব্লক আছে কিনা তা দেখা হয়।
৭. হৃৎপিণ্ডের পেশির অবস্থা জানা যায় MRI (Magnetic Resonance Imaging) পরীক্ষার মাধ্যমে।
৮. উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে শর্করা ও চর্বির পরিমাণ নির্ণয়ের পরীক্ষা করে হৃদরোগ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

আধুনিক বিশ্বে হৃদরোগের গবেষণার ফসল হিসেবে বেশ কিছু চিকিৎসা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। নিচে এমন কয়েকটি চিকিৎসা ব্যবস্থার ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

পেসমেকার (Pacemaker)

হৃৎপিন্ডের ডান অ্যাট্রিয়াম-প্রাচীরের উপর দিকে অবস্থিত, বিশেষায়িত কার্ডিয়াক পেশিগুচ্ছে গঠিত ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রে নিয়ন্ত্রিত একটি ছোট অংশ যা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহ ছড়িয়ে দিয়ে হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি করে এবং স্পন্দনের ছন্দময়তা বজায় রাখে তাকে **পেসমেকার** বলে। মানুষের হৃৎপিন্ডে সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (sino-atrial node) হচ্ছে পেসমেকার। এটি অকেজো বা অসুস্থ হলে হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যে **কম্পিউটারাইজড বৈদ্যুতিক যন্ত্র** দেহে স্থাপন করা হয় তাকেও পেসমেকার বলে। অতএব, পেসমেকার দুধরনের– একটি হচ্ছে হৃৎপিন্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপী সাইনো-অ্যাট্রিয়াল নোড (SA নোড) যা **প্রাকৃতিক পেসমেকার** নামে পরিচিত; অন্যটি হচ্ছে **যান্ত্রিক পেসমেকার**, এটি অসুস্থ প্রাকৃতিক পেসমেকারকে নজরদারির মধ্যে রাখে। প্রাকৃতিক পেসমেকারের কার্যক্রম কার্ডিয়াক চক্রের অধীনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে হৃদরোগের চিকিৎসার ধারণা ব্যাখ্যায় যান্ত্রিক পেসমেকার কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

যান্ত্রিক পেসমেকার কার্যক্রম (Artificial Pacemaker Activities)

অসুস্থ ও দুর্বল হৃৎপিন্ডে বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি করে স্বাভাবিক স্পন্দন হার ফিরিয়ে আনার ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে বুকে বা উদরে চামড়ার নিচে স্থাপিত ছোট এক বিশেষ যন্ত্রকে **পেসমেকার** বলে। দেহকে সুস্থ, সবল ও সক্রিয় রাখতে হলে হৃৎপিন্ডের সুস্থতা বজায় ও নিয়ন্ত্রণে রাখা একান্ত জরুরী। হৃৎপিন্ডের সুস্থতা পরিমাপের প্রাথমিক ধাপ হচ্ছে হৃৎস্পন্দনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা। হৃৎস্পন্দন স্বাভাবিকের চেয়ে ধীর লয় বা দ্রুত গতিসম্পন্ন কিংবা অনিয়ত হলে অর্থাৎ অস্বাভাবিক স্পন্দন হলে তাকে **অ্যারিথমিয়া (arrhythmia)** বলে। এমন অবস্থায় মানুষ ক্লান্ত হয়ে পড়ে, ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় বা ফ্যাকাশে হয়ে যেতে পারে। প্রচন্ড অ্যারিথমিয়ায় দেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের ক্ষতি হতে পারে, মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে বা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। পেসমেকার ব্যবহারে সব ধরনের অ্যারিথমিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, বাকি জীবন সক্রিয় থাকা যায়। দুজন আমেরিকান বিজ্ঞানী William Chardack এবং Wilson Greatbatch, ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে দেহে স্থাপনযোগ্য পেসমেকার আবিষ্কার করেন।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

যান্ত্রিক পেসমেকারের গঠন

একটি লিথিয়াম ব্যাটারি, কম্পিউটারাইজড জেনারেটর ও শীর্ষে সেন্সরযুক্ত কতকগুলো তার নিয়ে একটি পেসমেকার গঠিত। সেন্সরগুলোকে **ইলেকট্রোড** (electrode) বলে। ব্যাটারি জেনারেটরকে শক্তি সরবরাহ করে। ব্যাটারি ও জেনারেটর একটি পাতলা ধাতব বাক্সে আবৃত থাকে। তারগুলোর সাহায্যে জেনারেটরকে হৃৎপিন্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ইলেকট্রোডগুলো হৃৎপিন্ডের বৈদ্যুতিক কর্মকান্ড শনাক্ত করে তারের মাধ্যমে জেনারেটরে প্রেরণ করে।

পেসমেকারে অপরিরাহী আবরণযুক্ত (insulated) ১-৩টি তার থাকে। পেসমেকারের তারকে লিড (lead) বলে। হৃৎপিন্ডের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে তার প্রবেশের ধরন অনুযায়ী পেসমেকার নিচে বর্ণিত ৩ রকম।

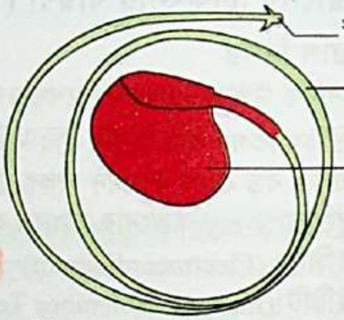

চিত্র ৪.২০ : যান্ত্রিক পেসমেকার

১. **এক-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার** (Single-chamber pacemaker) : এ ধরনের পেসমেকারে একটি তার বা লিড থাকে যা জেনারেটর থেকে হৃৎপিন্ডের শুধু ডান অ্যাট্রিয়াম (অলিন্দ) বা ডান ভেন্ট্রিকল (নিলয়)-এ বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে।

২. **দ্বি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার** (Dual-chamber pacemaker) : এ ধরনের পেসমেকারে দুটি তার (লিড) থাকে যা জেনারেটর থেকে হৃৎপিন্ডের দুটি প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ ডান অ্যাট্রিয়াম ও ডান ভেন্ট্রিকলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে।

৩. **ত্রি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার** (Triple-chamber pacemaker) : এ ধরনের পেসমেকারে তিনটি তার (লিড) থাকে যার একটি জেনারেটর থেকে ডান অ্যাট্রিয়ামে, আরেকটি ডান ভেন্ট্রিকলে এবং অন্যটি বাম ভেন্ট্রিকলে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহন করে। এটি অত্যন্ত দুর্বল হৃৎপেশির হৃৎপিন্ডে স্থাপন করা হয় (না হলে হার্ট ফেইলিউরের আশঙ্কা থাকে)। পেসমেকার এক্ষেত্রে ভেন্ট্রিকলদুটিকে সংকোচন ক্ষমতার উন্নতি ঘটিয়ে রক্তপ্রবাহে উন্নতি ঘটায়।

পেসমেকার যেভাবে কাজ করে

জেনারেটরের কম্পিউটার-চিপ এবং হৃৎপিন্ডে যুক্ত সেন্সরবাহী তার ব্যক্তির চলন, রক্তের তাপমাত্রা, শ্বসন ও বিভিন্ন শারীরিক কর্মকান্ড মনিটর করে। প্রয়োজনে কর্মকান্ডের ধারা অনুযায়ী হৃৎপিন্ডকে তাল মিলিয়ে চলতে সাহায্য করে। এসব তথ্য কাজে লাগিয়ে পেসমেকার ঠিক করে দেয় কোন ধরনের বিদ্যুৎ তরঙ্গ লাগবে এবং কখন লাগবে। যেমন-পেসমেকার ব্যক্তির ব্যায়াম করার বিষয়টি বুঝতে পেরে হৃস্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। এসব উপাত্ত পেসমেকারে রক্ষিত থাকে যা দেখে চিকিৎসকেরা পেসমেকারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন। কম্পিউটারের সাহায্যেই যেহেতু পেসমেকারের প্রোগ্রামে পরিবর্তন আনা যায় তাই পেসমেকারে ছুরি-কাঁচি চালানোর প্রয়োজন পড়ে না। পেসমেকারের ব্যাটারি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মেয়াদ থাকে ৫-১০ বছরের মতো।

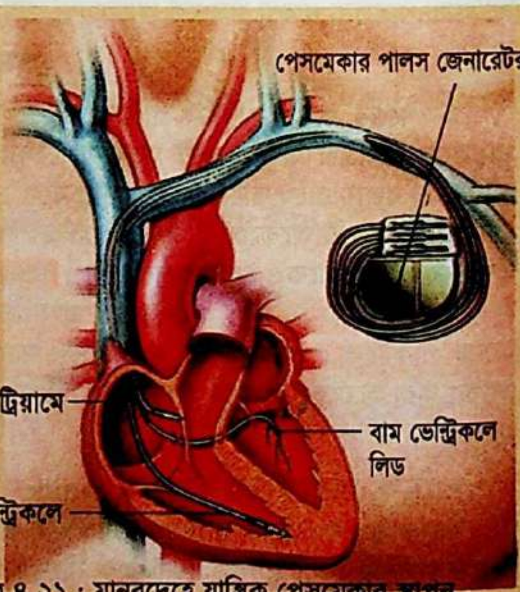

চিত্র ৪.২১ : মানবদেহে যান্ত্রিক পেসমেকার স্থাপন (ত্রি-প্রকোষ্ঠ পেসমেকার)

ওপেন হার্ট সার্জারি (Open Heart Surgery)

শল্যচিকিৎসক যখন রোগীর বুক কেটে উন্মুক্ত করে হৃৎপিন্ডে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন তখন সে প্রক্রিয়াকে ওপেন হার্ট সার্জারি বলে। এটি একটি বড় শল্যচিকিৎসামূলক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে হৃৎপিন্ড সংক্রান্ত অনেক জটিল সমস্যা ও রোগ মুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অন্য সব চিকিৎসার পরও যদি হৃৎপিন্ডে বড় ধরনের সমস্যা থাকে তাহলে ওপেন হার্ট সার্জারি ছাড়া উপায় থাকে না।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ওপেন হার্ট সার্জারির প্রকারভেদ

ওপেন হার্ট সার্জারি প্রধানত নিচে বর্ণিত তিন উপায়ে করা হয়।

১. **অন-পাম্প সার্জারি** (On-pump surgery) : এ ধরনের সার্জারিতে একটি হৃদ-ফুসফুস মেশিনে যা কার্ডিওপালমোনারি বাইপাস (cardiopulmonary bypass) নামে পরিচিত সেটি ব্যবহার করা হয়। এ যন্ত্রটি সাময়িকভাবে হৃৎপিন্ডের কাজের দায়িত্ব নিয়ে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত পাম্প করে বিভিন্ন অঙ্গ ও টিস্যুতে প্রেরণ করে। এটি হচ্ছে প্রচলিত পদ্ধতি। এ প্রক্রিয়ায় শল্যচিকিৎসক যখন অস্ত্রোপচার করেন তখন হৃৎপিন্ডে রক্তও থাকে না, হৃৎস্পন্দনও হয় না।

২. **অফ-পাম্প সার্জারি বা বিটিং হার্ট** (Off-pump surgery or beating heart) : এ ধরনের সার্জারিতে হৃদ-ফুসফুস মেশিন ব্যবহৃত হয় না, বরং চিকিৎসক সক্রিয় হৃৎস্পন্দনরত হৃৎপিন্ডেই অস্ত্রোপচার করেন। তবে হৃৎস্পন্দনের হার ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোনো উপায়ে সামান্য মন্থর করে রাখা হয়।

৩. **রোবট-সহযোগী সার্জারি** (Robot-assisted surgery) : এ ধরনের সার্জারিতে শল্যচিকিৎসক বিশেষ কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত রোবটিক হাত (যান্ত্রিক হাত)-এর সাহায্যে অস্ত্রোপচার করেন। চিকিৎসক কম্পিউটার সার্জারির ত্রিমাত্রিক দৃশ্য দেখতে পান এবং কাজ সম্পন্ন করেন। এ ধরনের সার্জারি অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সঠিক হয়ে থাকে।

ওপেন হার্ট সার্জারি পদ্ধতি

একজন কার্ডিওভাস্কুলার শল্যচিকিৎসকের অধীনে একটি শল্যচিকিৎসক দল ওপেন হার্ট সার্জারির মতো জটিল অস্ত্রোপচার পরিচালনা করেন। সার্জারির শুরুতে চিকিৎসকের নির্দেশে সাধারণ অ্যানেসথেসিয়া (general anesthesia) কিংবা স্নায়ুবন্ধক অ্যানেসথেসিয়া (nerve block anesthesia) প্রয়োগ করা হয়। সার্জারি শুরু হয় বুক ও স্টার্নাম কেটে বড়-সড় গর্ত সৃষ্টির মাধ্যমে। তা না হলে রোগীর ভিতরটা ভালোমতো দেখা যায় না। অন-পাম্প সার্জারি হলে ওষুধ প্রয়োগে হৃৎস্পন্দন বন্ধ করে দিয়ে **হৃদ-ফুসফুস মেশিন** (heart-lung machine)-এর সাহায্যে পাম্প করে সারা দেহে রক্তের সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়। সার্জারি শেষে মেশিন খুলে নেয়া হয়।

অন্যদিকে, করোনারি আর্টারি বাইপাস সার্জারি বা হৃৎকপাটিকা মেরামত বা পুনঃস্থাপন করার সময় সার্জন আর প্রচলিত বড় ধরনের কাটা-ছেঁড়া না করে বুকের মাঝামাঝি ছোট ফুটা করে তার ভিতরে ক্যামেরাযুক্ত যন্ত্র ঢুকিয়ে রোগীর অভ্যন্তরভাগ দেখেন মনিটরে। এ প্রক্রিয়ায় সার্জারি হলে সময় ও ব্যথা উভয়ই কম লাগে, সংক্রমণজনিত জটিলতাও কম হয়। রোগীর ব্যক্তিগত পছন্দ, শনাক্তকরণ, বয়স, অসুখের ইতিহাস, স্বাস্থ্য ঝুঁকি প্রভৃতির উপর এ ধরনের সার্জারি নির্ভর করে।

সাবধানতা

জটিল কার্ডিওভাস্কুলার অসুখে ওপেন হার্ট সার্জারির স্মরণাপন্ন হতে হয়। অন্ততঃ বাংলাদেশে এ সার্জারির খরচ মোটেও কম নয়। সার্জারির পর ভুক্তভোগীকে সবসময় সতর্ক থাকতে হয়। যেমন-হৃৎপিন্ড সুস্থ রাখে এমন আহার গ্রহণ; নিয়মিত ব্যায়াম করা; বয়স-উচ্চতার সঙ্গে মিল রেখে ওজন ঠিক রাখা; চাপ থেকে মুক্ত থাকা; ধূমপানের অভ্যাস থাকলে তা ছেড়ে দেয়া এবং উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল ও ডায়াবেটিস সংক্রান্ত জটিলতা থেকে মুক্ত থাকা।

কাজ : তোমার বাবার বয়স ষাটের উপরে। তাঁর যেন কোন ধরনের হৃদরোগ না হয় সেজন্য তাঁকে কী কী পরামর্শ দেবে?

করোনারি বাইপাস সার্জারি (Coronary Bypass Surgery)

এক বা একাধিক করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) রুদ্ধ হয়ে গেলে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ অব্যাহত রাখতে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে দেহের অন্য অংশ থেকে (যেমন-পা থেকে) একটি সুস্থ রক্তবাহিকা (ধমনি বা শিরা) কেটে এনে রুদ্ধ ধমনির পাশে স্থাপন করে রক্ত সরবরাহের যে বিকল্প পথ সৃষ্টি করা হয় তাকে **করোনারি বাইপাস** বলে। করোনারি বাইপাস সৃষ্টির সামগ্রিক অস্ত্রোপচার প্রক্রিয়াটিকে **করোনারি বাইপাস সার্জারি** বলা হয়।

করোনারি হৃদরোগ সৃষ্টির প্রধানতম কারণ হচ্ছে করোনারি ধমনির রুদ্ধতা। এর মূল কারণ ধমনির অন্তঃস্থ প্রাচীর ঘিরে ক্রমশ সঞ্চিত হওয়া উচ্চমাত্রার কোলেস্টেরল জাতীয় হলদে চর্বি পদার্থ। ধমনি প্রাচীরের এন্ডোথেলিয়ামে এগুলো জমা হয়। পরে এসব পদার্থে তন্তু পুঞ্জিভূত হয়ে শক্ত হতে শুরু করে এবং চুনময় পদার্থে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়াকে **আর্টারিওস্ক্লেরোসিস** (arteriosclerosis) বলে। আর পুঞ্জিভূত পদার্থগুলোকে বলে **অ্যাথেরোমেটাস প্লাকস** (atheromatous plaques)। প্লাকসের আধিক্যের কারণে ধমনিপথ সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, রক্তপ্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয় এবং এক সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তখন হৃৎপেশি O_2-সমৃদ্ধ রক্ত না পেলে হার্ট ফেইলিউর, হার্ট অ্যাটাক প্রভৃতি মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি হয়। জীবনের প্রতি হুমকিস্বরূপ এসব জটিলতা এড়াতে O_2-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপেশিতে সরবরাহ করার বিকল্প পথের সৃষ্টি করতে হয়। বাইপাস সড়কের মতো হৃৎপিন্ডে বাইপাস ধমনি নির্মাণের জটিল প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হতে হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ধূমপান, উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধি ও ডায়াবেটিস প্রভৃতি ধমনি গাত্রে প্লাক জমার কাজ ত্বরান্বিত করে। তা ছাড়া, ৪৫ বছরের বেশি বয়সি পুরুষ ও ৫৫ বছরের বেশি বয়সি নারীর ক্ষেত্রে কিংবা পরিবারের ইতিহাসে যদি করোনারি ধমনি সংক্রান্ত ব্যাধির নজির থেকে থাকে তাহলে আরও কম বয়সে করোনারি বাইপাস করার ঝুঁকি দেখা দিতে পারে।

যখন করোনারি ধমনির লুমেন ৫০–৭০% সংকীর্ণ হয় তখন থেকেই O_2–সমৃদ্ধ রক্তের প্রবাহ হৃৎপেশিতে কমে যায়। বুকে ব্যথা অনুভূত হয়। প্লাকের চূড়ায় যদি রক্ত জমাট বাঁধে তাহলে পরিস্থিতি হার্ট অ্যাটাকের দিকে চলে যায়।

ধমনির লুমেন যদি ৯০–৯৯% সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন **অস্থির অ্যানজাইনা** (unstable angina) ত্বরান্বিত হয়। এমন অবস্থায় করোনারি বাইপাস কার্যক্রম গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকে না।

করোনারি বাইপাস একটি জটিল প্রক্রিয়া। রোগ শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ায় হৃদচিকিৎসক প্রথমে করোনারি ধমনির রোগের সঠিক অবস্থান, ধরন ও ব্যাপকতা নির্ণয় করেন। পরবর্তী ধাপে রোগীর হৃৎপিন্ড, বয়স, লক্ষণের ব্যাপকতা, অন্যান্য অসুখ-বিসুখের অবস্থা ও জীবনযাত্রা পদ্ধতি বিবেচনা করে হৃদ ও শল্যচিকিৎসক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবেন। রুদ্ধ করোনারি ধমনিকে এড়িয়ে ভিন্নপথ নির্মাণ করতে বুক, হাত, পা ও তলপেট থেকে ধমনি সংগ্রহ করা হয়। কয়টি করোনারি ধমনি বাইপাস করতে হবে তার উপর নির্ভর করে অস্ত্রোপচারের সময়কাল। সাধারণত ৩-৫ ঘন্টা সময়ের মধ্যে বাইপাস কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে রোগী হাসপাতাল ত্যাগ করতে পারেন। কোন জটিলতা না থাকলে ২ মাসের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে যান। এরপর থেকে রোগীকে নিয়মিত চেকআপের মধ্যে থাকতে হয়।

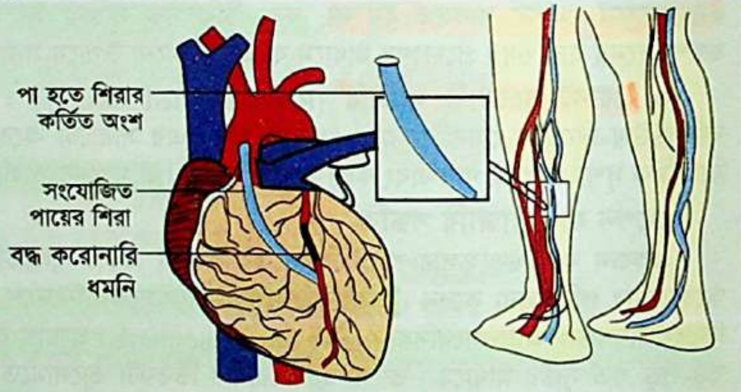

চিত্র ৪.২২ : করোনারি বাইপাস সার্জারি
(বাম পা থেকে শিরা এনে করোনারি ধমনিতে সংযোজন)

বিধিনিষেধ

বাইপাস সার্জারির পর রোগীকে বেশকিছু বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। যেমন– ধূমপান ত্যাগ, কোলেস্টেরলের চিকিৎসা, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ, নিয়মিত নির্ধারিত ব্যায়াম, স্বাস্থ্যসম্মত ওজন বজায় রাখা, হৃদ-বান্ধব ভোজনে অভ্যস্ত হওয়া, চাপ ও রাগ নিয়ন্ত্রণে আনা, নির্ধারিত ওষুধ সেবন এবং চিকিৎসকের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করা।

এনজিওপ্লাস্টি (Angioplasty)

বড় ধরনের অস্ত্রোপচার না করে হৃৎপিন্ডের সংকীর্ণ লুমেন (গহ্বর)-যুক্ত বা রুদ্ধ হয়ে যাওয়া করোনারি ধমনি পুনরায় প্রশস্ত লুমেনযুক্ত বা উন্মুক্ত করার পদ্ধতিকে **এনজিওপ্লাস্টি** (angio = রক্তবাহিকা + plasty = পুনর্নির্মাণ) বলে। এনজিওপ্লাস্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে সরু বা বন্ধ হয়ে যাওয়া লুমেনের ভিতর দিয়ে হৃৎপিন্ডে পর্যাপ্ত O_2 সরবরাহ নিশ্চিত করে হৃৎপিন্ড ও দেহকে সচল রাখা। বুকে ব্যথা (অ্যানজাইনা), হার্ট ফেইলিউর, হার্ট অ্যাটাক প্রভৃতি মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তির সহজ উপায় এনজিওপ্লাস্টি। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে জার্মান কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ অ্যানড্রেস গ্রয়েনজিগ (Dr. Andreas Gruentzig) সর্বপ্রথম এ পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

এনজিওপ্লাস্টির প্রকারভেদ

এনজিওপ্লাস্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্লাক জমা বা রক্ত জমাটের কারণে সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া বা রুদ্ধ হয়ে যাওয়া করোনারি ধমনির লুমেন (গহ্বর) চওড়া করে O_2-সমৃদ্ধ রক্তের প্রবাহ অক্ষুন্ন রাখা। প্লাকের ধরন ও অবস্থান অনুযায়ী এনজিওপ্লাস্টির ধরনও বিভিন্ন হয়ে থাকে। এনজিওপ্লাস্টি ৪ ধরনের : বেলুন এনজিওপ্লাস্টি (Ballon angioplasty), লেজার এনজিওপ্লাস্টি (Laser angioplasty), অ্যাথেরেকটমি (Atherectomy) ও করোনারি স্টেন্টিং (Coronary stenting)।

উল্লিখিত ধরনগুলোর মধ্যে করোনারি স্টেন্টিং এনজিওপ্লাস্টি বর্তমানে বেশি প্রচলিত। নিচে এর বর্ণনা দেয়া হলো।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

এনজিওপ্লাস্টি প্রক্রিয়া

এনজিওগ্রাম (angiogram) করে নিশ্চিত হওয়ার পর এ ধরনের সার্জারি করা হয়। এ ধরনের কার্যক্রমে ঊর্ধ্ববাহু বা পা-এর একটি অংশ কেটে ধমনির ভিতর দিয়ে পাতলা নল বা **ক্যাথেটার** (catheter) প্রবেশ করিয়ে কৌশলে রুদ্ধ বা আংশিক বুজে যাওয়া ধমনিতে পৌছানো হয়। ক্যাথেটারে একটি সরু তার, তারের অগ্রভাগে একটি চুপসানো বেলুন ও বেলুনটির চারদিকে একটি ধাতব তারের জালের চোঙ বসানো থাকে। জালিকাটিকে **স্টেন্ট** (stent) বলে। স্টেন্টটি সাধারণত বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্মিত। এখন অবশ্য অন্যান্য ধাতব বা বিশেষ ধরনের সুতার তৈরি স্টেন্টও ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ৪.২৩ : বিভিন্ন ধরনের এনজিওপ্লাস্টি

স্টেন্টসহ বেলুন কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌছালে বেলুনটি বাইরে থেকে ফোলানো হয়। বেলুনের সাথে সাথে স্টেন্টও স্ফীত হয় এবং প্রতিবন্ধক স্থানে চাপ দিতে থাকে। চাপের ফলে ধমনির গহ্বরের প্রতিবন্ধক স্থানে চর্বিযুক্ত পদার্থও নিষ্পেশিত হয় এবং সংকীর্ণ ধমনিগহ্বর প্রশস্ত হয়। ধমনির ভিতরে তখন রক্ত স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হতে শুরু করে। এর পর সেন্টটি ধমনি গহ্বরে রেখে দিয়েই বেলুন সংকুচিত করে বাইরে বের করে আনা হয়। স্টেন্ট সবসময় ধমনির অন্তঃপ্রাচীরকে বাইরের দিকে চেপে রাখে বলে ধমনির ভিতরে সহজে চর্বিপদার্থ (অ্যাথেরোমা/ব্লক) জমতে পারেনা। স্টেন্টের গায়ে এক ধরনের প্রলেপ লাগানো থাকে যা চর্বি গলিয়ে ধমনিকে পুনরায় সংকীর্ণ হওয়া থেকে রক্ষা করে। সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে ৩০ মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে।

এনজিওপ্লাস্টির উপকারিতা

করোনারি হৃদরোগের অন্যতম প্রধান রোগ সৃষ্টি হয় করোনারি ধমনিতে। ধমনির ভিতর ব্লক সৃষ্টি হলে পর্যাপ্ত O_2-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপেশিতে সংবহিত হতে পারে না। ফলে হার্ট ফেইলিউর ও হার্ট অ্যাটাকের মতো মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এমন মারাত্মক অবস্থা মোকাবিলায় এনজিওপাস্টি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

এনজিওপ্লাস্টি ধমনির লুমেন থেকে ব্লক অপসারণ বা হ্রাস করতে পারে এবং শ্বাসকষ্ট ও বুকে ব্যথা উপশম হয়। হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা কমিয়ে জীবন রক্ষায় অবদান রাখে। যেহেতু বুক উন্মুক্ত করতে হয় না সেহেতু কষ্ট, সংক্রমণ ও দীর্ঘকালীন সতর্কতার প্রয়োজন পড়ে না। মাত্র এক থেকে কয়েক ঘন্টায় জীবন রক্ষাকারী এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে এবং কয়েক দিন পর থেকেই হালকা কাজকর্ম করা সম্ভব। সুস্থ হতে ৪ সপ্তাহের বেশি লাগে না।

যাঁরা বৃক্কের অসুখে ভুগছেন, কিংবা এনজিওগ্রামের সময় রঞ্জকের প্রতি অ্যালার্জি দেখা দেয় এবং যাঁদের বয়স ৭৫ বছরের বেশি তাঁদের ক্ষেত্রে এনজিওপ্লাস্টি কিছুটা অসুবিধাজনক হতে পারে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত কপাটিকা দুটি বন্ধ থাকে যে ধাপে–
i) অলিন্দের সিস্টোল ii) অলিন্দের ডায়াস্টোল
iii) নিলয়ের সিস্টোল
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফারিনের হাত আপেল কাটতে গিয়ে কেটে গেল। এর ফলে সেখান থেকে লাল তরল পদার্থ বের হল। এতে এক ধরনের Y আকৃতির জৈব রাসায়নিক পদার্থ আছে যা তার দেহের রোগ প্রতিরোধ করে। [সকল বোর্ড ১৮]
ক. ইন্টারফেরন কী ?
খ. Rh ফ্যাক্টর বলতে কী বোঝ ?
গ. উদ্দীপকের ফারিনের লাল তরল পদার্থ বন্ধ হওয়ার কৌশল ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রোগ প্রতিরোধী উপাদানের কার্যপদ্ধতি বিশেষণ কর।

২. আমাদের হৃৎযন্ত্রটি কিছু কপাটিকা ও নোড এর সাহায্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। [রা.বো. ১৭]
ক. কলামনি কর্ণি কী ?
খ. রক্তচাপ বলতে কী বোঝ ?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কপাটিকাসমূহের বিবরণ দাও।
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণকারী নোডসমূহের কার্যাবলি ব্যাখ্য কর।

৩. মি. মমতাজ স্ফিগমোম্যানোমিটার দ্বারা নিয়মিত রক্তচাপ পরিমাপ করেন। আজ দুপুরে তার রক্তচাপ ছিল ১৭৫/১১০। [ঢা.বো.১৫]
ক. সিস্টোল কী ?
খ. রক্ত তঞ্চন বলতে কী বোঝ ?
গ. মি. মমতাজের দেহে কী ধরনের রক্তচাপ বিদ্যমান ? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মি. মমতাজের দেহে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থাকলেও রক্তশূন্যতা সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই– বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

জ্ঞানমূলক

১. রক্ত কী ? [য.বো. ১৬]
২. সিরাম কী ?
৩. হেপারিন কী ? [চ.বো. ১৭]
৪. কাইল কী ?
৫. মিট্রাল ভাল্ব কী ?
৬. রক্ত তঞ্চন কী ?
৭. সিস্টোল কী ?
৮. SAN কী ?
৯. হার্ট বিট কী ? [ঢা.বো. ১৬]
১০. কলামনি কর্ণি কী ? [রা.বো. ১৭]
১১. অ্যানজাইনা কী ?
১২. ইনফ্যার্কশন কী ?
১৩. অ্যারিথমিয়া কী ?
১৪. অ্যানজিওপ্লাস্টি কী ? [কু.বো. ১৭]
১৫. পেসমেকার কী ?
১৬. হিমোস্টেটিক প্লাক কী ?
১৭. হার্টবিট কী ?
১৮. স্ট্রোক কী ?
১৯. থ্রম্বোসাইটের কাজ কী ?
২০. কৈশিকজালিকা কী ?

অনুধাবনমূলক

১. Lub-Dub বলতে কী বোঝায় ?
২. লসিকা ও রক্তের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।
৩. রক্ত তঞ্চন বলতে কী বোঝায় ?
৪. মায়োজেনিক নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বোঝায় ? [দি.বো. ১৭]
৫. করোনারি রক্ত সংবহন বলতে কী বোঝায় ? [দি.বো. ১৬; চ.বো. ১৭]
৬. সিস্টেমিক ও পালমোনারি সংবহনের পার্থক্য উল্লেখ কর।
৭. রক্তচাপ বলতে কী বোঝায় ? [রা.বো. ১৭]
৮. অ্যানজাইনা বলতে কী বোঝায় ? [ঢা.বো. ১৫]
৯. অ্যানজিওপ্লাস্টি বলতে কী বোঝায় ? [ঢা.বো. ১৭]
১০. প্রাকৃতিক পেসমেকার বলতে কী বোঝায় ?
১১. কীভাবে রক্ত জমাট বাঁধে ?
১২. আগ্র্যানিউলোসাইট বলতে কী বুঝ ?
১৩. হার্ট অ্যাটাক কেন হয় ?
১৪. হার্ট ফেইলিউর ঘটে কেন ?
১৫. তিন ধরনের রক্তকণিকার মধ্যে পার্থক্যগুলো ব্যাখ্যা কর।
১৬. হৃৎপিণ্ডের কোন কপাটিকা কীভাবে কাজ করে তা বুঝিয়ে বল।
১৭. পারকিঞ্জি তন্তু বলতে কী বুঝ ?
১৮. রক্ত ও লসিকার মধ্যে পার্থক্যগুলো বুঝিয়ে লেখ।
১৯. মানুষের সংবহনতন্ত্রকে দ্বিচক্রী সংবহন বলে কেন ?
২০. রুই মাছের হৃৎপিণ্ডের সাথে মানুষের হৃৎপিণ্ডের তুলনা কর।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL BDNIYOG.COM COPYRIGHT

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৫ মানব শারীরতত্ত্ব : শ্বসন ও শ্বাসক্রিয়া
Human Physiology : Respiration & Breathing

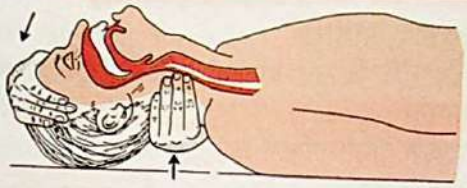

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- অ্যালভিওলাই
- প্লিউরা
- শ্বাসরঞ্জক
- ওটিটিস মিডিয়া
- সাইনুসাইটিস
- কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস

অক্সিজেন ছাড়া কোনো প্রাণীই বাঁচতে পারে না। আমাদের দেহেও বায়ুর সাথে অক্সিজেন শ্বসন অঙ্গে প্রবেশ করে এবং তা রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে দেহের সব অঙ্গের টিস্যুকোষে পৌঁছায়। এ অক্সিজেন টিস্যুকোষে সঞ্চিত খাদ্য উপাদানের সাথে বিক্রিয়া করে তাপ ও শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে জীবনকে সচল রাখে। উপজাত হিসেবে তৈরি করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি। CO_2 রক্তের মাধ্যমে বাহিত হয়ে শ্বসন অঙ্গের মাধ্যমে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়।

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীব পরিবেশ থেকে গৃহীত অক্সিজেন দিয়ে কোষমধ্যস্থ খাদ্যবস্তুকে জারিত করে খাদ্যের স্থিতিশক্তিকে তাপ ও গতিশক্তিরূপে মুক্ত করে এবং উপজাত পদার্থ হিসেবে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে তাকে **শ্বসন** বলে। এ অধ্যায়ে শ্বসন প্রক্রিয়া এবং এ সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পিরিয়ড সংখ্যা-১০ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. মানুষের শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশের গঠনের সাথে কাজের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে। ২. ব্যবহারিক : ফুসফুসের অনুচ্ছেদ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে। ৩. মানুষের প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম (ventilation mechanism) ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ৪. রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন (transport) ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. শ্বসনে রঞ্জকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. শ্বাসনালির রোগ সংক্রমণের কারণ, লক্ষণ এবং প্রতিকার ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. একজন ধুমপায়ী ও একজন অধুমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রে চিত্রের তুলনা করতে পারবে। ৮. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা হিসেবে মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবে।	● শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ ও কাজ ● ব্যবহারিক ○ ফুসফুসের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ ● প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম ও নিয়ন্ত্রণ ● গ্যাসীয় পরিবহন ○ অক্সিজেন ○ কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন ● শ্বাসরঞ্জক ● মানবদেহে রক্ত সংবহনতন্ত্র ● শ্বসননালির সমস্যা, লক্ষণ ও প্রতিকার ○ সাইনুসাইটিস ○ ওটিটিস মিডিয়া ● ফুসফুসের এক্স-রে চিত্রের তুলনা ○ ধুমপায়ী মানুষের ○ অধুমপায়ী মানুষের ● কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের উদ্দেশ্য ○ মুখ হতে মুখের সাহায্যে

মানুষের শ্বসনতন্ত্র (Human Respiratory System)

মানুষের শ্বসন অঙ্গ হচ্ছে একজোড়া ফুসফুস (lungs)। যে পথ দিয়ে ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করে এবং ফুসফুস থেকে তা বহির্গত হয় তাকে **শ্বসন পথ** (respiratory passage) বলে। সম্মুখ নাসারন্ধ্র থেকে শ্বসন পথের শুরু। মানুষের শ্বসনতন্ত্রের পর্যায়ক্রমিক বিভিন্ন অংশকে নিচে বর্ণিত তিনটি অঞ্চলে ভাগ করে বর্ণনা করা যায়।

ক. বায়ুগ্রহণ ও ত্যাগ অঞ্চল

১. সম্মুখ নাসারন্ধ্র (Anterior nostrils): নাকের সামনে অবস্থিত পাশাপাশি দুটি ছিদ্রকে সম্মুখ নাসারন্ধ্র বলে। নাক একটি হলেও **ন্যাসাল সেপ্টাম** (nasal septum) বা নাসা ব্যবধায়ক-এর মাধ্যমে দুটি নাসারন্ধ্রের বিকাশ ঘটেছে। সম্মুখ নাসারন্ধ্র সবসময় উন্মুক্ত থাকে এবং এ পথেই বায়ু দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. **ভেস্টিবিউল** (Vestibule) : নাসারন্ধ্রের পরে নাকের ভিতরের অংশের নাম ভেস্টিবিউল। এর প্রাচীরে অনেক লোম থাকে। লোমগুলো ছাঁকনির মতো গৃহীত বাতাস পরিষ্কারে সহায়তা করে।

৩. **নাসাগহ্বর** (Nasal cavity) : ভেস্টিবিউলের পরের অংশটি নাসাগহ্বর। নাসাগহ্বরের প্রাচীরে সিলিয়াযুক্ত মিউকাস ক্ষরণকারী ও অলফ্যাক্টরী কোষ থাকে। এটি আগত প্রশ্বাস বায়ুকে কিছুটা সিক্ত করে। সিলিয়াযুক্ত ও মিউকাস কোষগুলো ধুলাবালি এবং রোগজীবাণু আটকে দেয়। অলফ্যাক্টরি কোষ ঘ্রাণ উদ্দীপনা গ্রহণে সাহায্য করে।

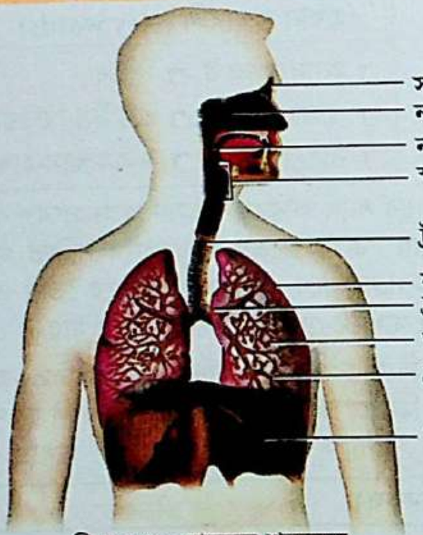

চিত্র ৫.১ : মানুষের শ্বসনতন্ত্র

৪. **পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র** (Posterior nostrils) : নাসা গহ্বরদ্বয় যে দুটি ছিদ্রের মাধ্যমে নাসাগলবিলে উন্মুক্ত হয় তাকে **কোয়ানা** (choana) বা পশ্চাৎ নাসারন্ধ্র বলে। এসব ছিদ্রপথে বাতাস নাসাগলবিলে প্রবেশ করে।

৫. **নাসাগলবিল** (Nasopharyx) : পশ্চাৎ নাসারন্ধ্রের পরে নাসাগলবিল অবস্থিত। এর পরেই **মুখ-গলবিল** (oropharynx), যা স্বরযন্ত্র পর্যন্ত বিস্তৃত।

৬. **স্বরযন্ত্র** (Larynx) : এটি নাসাগলবিলের নিচের অংশের ঠিক সামনের দিকের অংশ এবং কয়েকটি তরুণাস্থি টুকরায় গঠিত। এগুলোর মধ্যে থাইরয়েড তরুণাস্থি সবচেয়ে বড় এবং এটি গলার সামনে উঁচু হয়ে ওঠে (পুরুষে)। হাত দিলে এর অবস্থান বোঝা যায় এবং বাইরে থেকে দেখা যায়। একে Adam's Apple বলে। স্বরযন্ত্রের উপরে থাকে একটি ছোট **এপিগ্লটিস** (epiglottis)। স্বরযন্ত্রে অনেক পেশি যুক্ত থাকে। এর অভ্যন্তরভাগে থাকে মিউকাস আবরণী ও **স্বররজ্জু** (vocal cord)। পেশির সংকোচন-প্রসারণই স্বররজ্জুর টান (tension) বা শ্লথন (relaxation) নিয়ন্ত্রণ করে। টানটান অবস্থায় বাতাসের সাহায্যে স্বররজ্জু কম্পিত হয়ে **শব্দ** সৃষ্টি করে। এপিগ্লটিস খাদ্য গলাধঃকরণের সময় স্বরযন্ত্রের মুখটি বন্ধ করে দেয়। ফলে খাদ্য স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করতে পারে না, অন্য সময় এটি শ্বসনের উদ্দেশে উন্মুক্ত থাকে। স্বরযন্ত্রে স্বর সৃষ্টি হয়।

খ. বায়ু পরিবহন অঞ্চল

৭. **শ্বাসনালি বা ট্রাকিয়া** (Trachea) : স্বরযন্ত্রের পর থেকে পঞ্চম বক্ষদেশীয় কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ১২ সেমি. দীর্ঘ ও ২ সেমি. ব্যাসবিশিষ্ট ফাঁপা নলাকার অংশকে ট্রাকিয়া বলে। এটি ১৬-২০টি তরুণাস্থি নির্মিত অর্ধবলয়ে (C-আকৃতির) গঠিত। তন্তুময় টিস্যু দিয়ে অর্ধবলয়গুলো আটকানো থাকে। ট্রাকিয়ার অন্তঃপ্রাচীরে সিলিয়াযুক্ত মিউকাস আবরণী রয়েছে। ট্রাকিয়া চুপসে যায় না বলে সহজে এর মধ্য দিয়ে বায়ু চলাচল করতে পারে। এর অন্তঃপ্রাচীরের সিলিয়া অবাঞ্ছিত বস্তুর প্রবেশ রোধ করে।

৮. **ব্রঙ্কাস** (Bronchus) : বক্ষগহ্বরে ট্রাকিয়ার শেষ প্রান্ত দুটি (ডান ও বাম) শাখায় বিভক্ত হয়; এদের নাম **ব্রঙ্কাই** (bronchi –বহুবচন)। এগুলো ফুসফুসের **হাইলাম** (hilum) দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে। ডান ব্রঙ্কাসটি অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু প্রশস্ত এবং তিনভাগে ভাগ হয়ে ডান ফুসফুসের তিনটি খণ্ডে প্রবেশ করে। বাম ব্রঙ্কাসটি দুভাগে ভাগ হয়ে বাম ফুসফুসের দুটি খন্ডে প্রবেশ করে। ফুসফুসের অভ্যন্তরে প্রতিটি **ব্রঙ্কাস** পুনঃপুনঃ বিভক্ত হয়ে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকায় **ব্রঙ্কিওল** (bronchiole) গঠন করে। ব্রঙ্কিওল দুধরনের- **প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল** ও **শ্বসন ব্রঙ্কিওল**। ব্রঙ্কাসে তরুণাস্থি থাকলেও ব্রঙ্কিওলগুলো তরুণাস্থিবিহীন।

গ. শ্বসন অঞ্চল

৯. **ফুসফুস** (Lungs) : ফুসফুস সংখ্যায় দুটি এবং হালকা গোলাপী রঙের স্পঞ্জের মতো নরম অঙ্গ। বাম ফুসফুসটি আকারে ছোট, ওজনে ৫৬৫ গ্রাম, **দুই লোব** বিশিষ্ট এবং ডান ফুসফুস আকারে বড়, ওজনে ৬২৫ গ্রাম, **তিন লোব** বিশিষ্ট। ফুসফুস **দ্বিস্তরী প্লিউরাল পর্দা** (pleural membrane) দিয়ে আবৃত থাকে। ভিতরের পর্দাকে **ভিসেরাল প্লিউরা** এবং বাইরের পর্দাকে **প্যারাইটাল প্লিউরা** বলে। দুই স্তরের মাঝে প্লিউরাল গহ্বরে **প্লিউরালরস** নামক এক ধরনের রস থাকে। ব্রঙ্কাস যে অংশে ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে **হাইলাম** (hilum) বলে। হাইলামের মাধ্যমে ধমনি ফুসফুসে প্রবেশ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

এবং শিরা ও লসিকা নালি বেরিয়ে আসে। ব্রঙ্কাস, ধমনি, শিরা, লসিকা নালি, ঘন যোজক টিস্যুতে পরিবেষ্টিত হয়ে পালমোনারি মূল (pulmonary root) গঠন করে এবং এর সাহায্যেই ফুসফুস ঝুলে থাকে। ফুসফুসের প্রতিটি লোব কয়েকটি সেগমেন্ট (bronchopulmonary segments)-এ বিভক্ত। ডান ফুসফুসে ১০টি এবং বাম ফুসফুসে ৮টি সেগমেন্ট থাকে। প্রত্যেকটি সেগমেন্ট আবার অসংখ্য লোবিউল (lobule)-এ বিভক্ত। লোবিউলগুলো ফুসফুসের কার্যকরী একক। ফুসফুসে রক্ত সংবহনতন্ত্র এবং পরিবেশের মধ্যে O_2 ও CO_2 এর বিনিময় ঘটে।

১০. ব্রঙ্কিয়াল বা শ্বসন বৃক্ষ (Bronchial or Respiratory tree) : ট্রাকিয়ার দ্বিবিভাজনে সৃষ্ট যে ব্রঙ্কাস ডান ও বাম ফুসফুসে প্রবেশ করে তাকে **প্রাইমারি ব্রঙ্কাস** বলে। প্রাইমারি ব্রঙ্কাস বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক লোবের জন্য একটি করে **সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস** বা **লোবার ব্রঙ্কাস** (lobar bronchus) গঠন করে (ডান ফুসফুসে ৩টি এবং বাম ফুসফুসে ২টি)। সেকেন্ডারি ব্রঙ্কাস থেকে টার্সিয়ারী ব্রঙ্কাস বা সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস সৃষ্টি হয়ে একটি করে পালমোনারি সেগমেন্টে প্রবেশ করে। সেগমেন্টাল ব্রঙ্কাস বার বার বিভক্ত হয়ে যে সূক্ষ্ম নালির সৃষ্টি হয় সেগুলোকে **ব্রঙ্কিওল** (bronchiole) বলে যা এক একটি লোবিউলে প্রবেশ করে। সমগ্র বায়ুনালি সিস্টেমকে দেখতে একটি উল্টানো বৃক্ষের মতো দেখায় বলে একে সাধারণভাবে **শ্বসন বৃক্ষও** বলে।

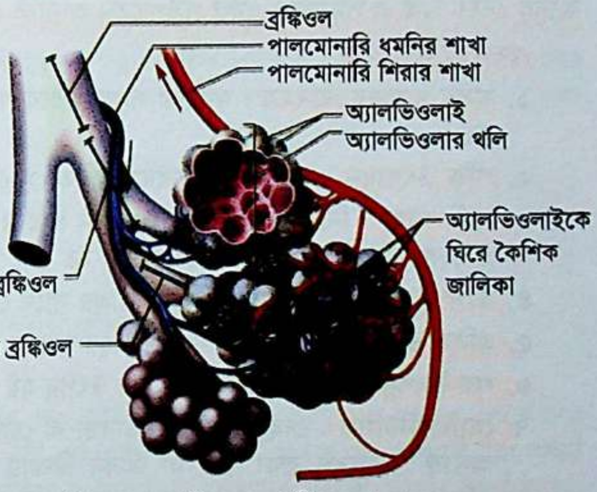

চিত্র ৫.২ : ব্রঙ্কিওলের প্রান্তীয় অংশ যাতে রক্ত সরবরাহসহ অ্যালভিওলাই দৃশ্যমান

ব্রঙ্কাস প্রাচীরে তরুণাস্থি (cartilage) থাকে, ব্রঙ্কিওলে থাকেনা। ব্রঙ্কিওল ব্রঙ্কাসের চেয়ে বেশি মসৃণ পেশি ধারণ করে, তবে ব্রঙ্কাস এবং ব্রঙ্কিওল উভয়ে সিলিয়াসম্পন্ন স্তম্ভাকার এপিথেলিয়াম (columner epithelium)-এ আবৃত। প্রতিটি লোবিউলে ব্রঙ্কিওল বিভক্ত হয়ে প্রান্তীয় ব্রঙ্কিওল, শ্বসন ব্রঙ্কিওল, অ্যালভিওলার নালি, অ্যাট্রিয়াম, অ্যালভিওলার থলি এবং সর্বশেষে **অ্যালভিওলাস** (alveolus, pl.-alveloli) সৃষ্টি করে। অ্যালভিওলার নালি এবং অ্যালভিওলাই সরল আঁইশাকার এপিথেলিয়াম (squamous epithelium) দিয়ে আবৃত।

অ্যালভিওলাস-এর গঠন

অ্যালভিওলাস ফুসফুসের কার্যকরী একক। এগুলো আঙ্গুরের থোকার মতো গুচ্ছাবদ্ধ, অতি ক্ষুদ্রাকায়, বুদবুদ সদৃশ বায়ুথলি এবং গ্যাস বিনিময়ের তল (gas cxchange surface) গঠন করে। ফুসফুসে অ্যালভিওলাসের সংখ্যা বয়সের সাথে সম্পর্কিত। নবজাতক শিশুর ফুসফুসে মাত্র ২০ মিলিয়ন অ্যালভিওলাই থাকে, ৮ বছরে এ সংখ্যা ৩০০ মিলিয়ন; অন্যদিকে একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের দুটি ফুসফুসে থাকে প্রায় ৭০০ মিলিয়ন অ্যালভিওলাই এবং এগুলো প্রায় ১১,৮০০ বর্গ সেন্টিমিটার শ্বসনতল সৃষ্টি করে। অ্যালভিওলাসের ব্যাস ২০০–৩০০ মাইক্রোমিটার এবং প্রাচীর মাত্র ০৪ মাইক্রোমিটার পুরু। এগুলোর বাইরের দিকে প্রচুর কৈশিকজালিকা নিবিড়ভাবে অবস্থান করে। **পালমোনারি ধমনি** থেকে এগুলোর উৎপত্তি হয় এবং পুনরায় মিলে **পালমোনারি শিরা** গঠন করে। প্রত্যেক অ্যালভিওলাসের প্রাচীর অত্যন্ত পাতলা, চাপা স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াল কোষে গঠিত হওয়ায় সহজেই গ্যাসের ব্যাপন ঘটতে পারে। অ্যালভিওলাস প্রাচীর ফ্যাগোসাইটিক অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ ধারণ করে। ম্যাক্রোফেজ অণুজীব এবং অন্যান্য বহিরাগত

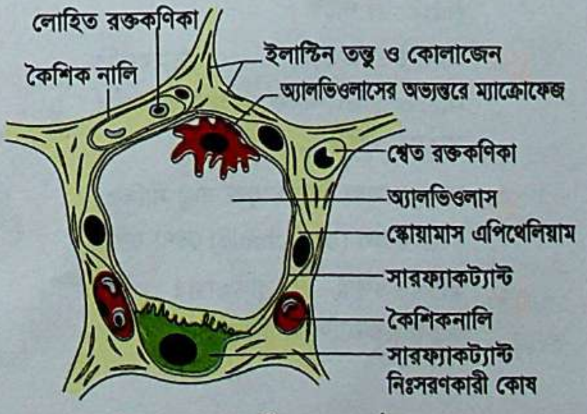

চিত্র ৫.৩ : অ্যালভিওলাসের গঠন

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কণা ধ্বংস করে। তাছাড়া প্রাচীরে কোলাজেন ও স্থিতিস্থাপক তন্তু থাকে। এ স্থিতিস্থাপক সূত্রের কারণে প্রশ্বাস-নিঃশ্বাসের সময় অ্যালভিওলাস সহজেই প্রসারিত হতে পারে,আবার পূর্বাবস্থায় ফিরেও আসতে পারে।

অ্যালভিওলাস প্রাচীরে **সেপ্টাল কোষ** নামক কিছু বিশেষ কোষ থাকে যা প্রাচীরের ভিতরের দিকে **সারফ্যাকট্যান্ট** (surfactant; dipalmitoyl lecithin) নামক **ডিটারজেন্ট** (detergent)-এর অনুরূপ ফসফোলিপিড রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে। সারফ্যাকট্যান্ট সারফেস টেনসন হ্রাস করে অ্যালভিওলাসকে চুপসে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। সারফ্যাকট্যান্টবিহীন অ্যালভিওলাস তথা ফুসফুস যথাযথ কাজ করতে পারে না। ২৩ সপ্তাহ বয়স্ক মানবভ্রূণে সর্বপ্রথম সারফ্যাকট্যান্ট ক্ষরণ শুরু হয়। এ কারণে ২৪ সপ্তাহের আগে মানবভ্রূণকে স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকারী গণ্য করা হয় না। অনেক দেশে তাই এ সময়কাল পর্যন্ত গর্ভপাতের অনুমতি দেয়া হয়।

শ্বসনতন্ত্রের কাজ

১. **শ্বসন গ্যাসের বিনিময়** : শ্বসনের সময় পরিবেশের O_2 রক্তে মিশে এবং রক্ত থেকে CO_2 পরিবেশে পরিত্যক্ত হয়।

২. **শক্তি উৎপাদন** : শ্বসনতন্ত্রের মাধ্যমে গৃহিত O_2 কোষীয় শ্বসনে ব্যবহৃত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে।

৩. **পানি সাম্য** : নিঃশ্বাসের মাধ্যমে প্রতিদিন প্রায় ৪০০–৬০০ মিলিলিটার পানি দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। এতে দেহের পানি সাম্য বজায় রাখতে সুবিধা হয়।

৪. **তাপ নিয়ন্ত্রণ** : নিঃশ্বাসের সময় CO_2 এর সাথে দেহের কিছু তাপ নির্গত হয়ে দেহের তাপমাত্রা বজায় থাকে।

৫. **এসিড ও ক্ষারের সাম্যতা** : নিঃশ্বাস বায়ুর মাধ্যমে CO_2 দেহের বাইরে পরিত্যক্ত হওয়ায় p^H নিয়ন্ত্রণে সহায়তা হয়।

৬. **শব্দ উৎপন্ন** : ল্যারিংক্সের মাধ্যমে শব্দ উৎপন্ন হয়।

৭. **হোমিওস্টিসিস** : দেহাভ্যন্তরের স্থিতাবস্থা বা হোমিওস্টেটিস (homeostasis; কোন জীব কর্তৃক অবিরত তার অন্তঃস্থ পডরবেশ রক্ষা করা বা জীবন ক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। এর ফলে পরিবর্তিত পরিবেশেও জীবকোষগুলো দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে।

৮. **উদ্বায়ী গ্যাস** : দেহ থেকে কিছু উদ্বায়ী গ্যাস, যেমন-ক্লোরোফর্ম, ইথার, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি নিষ্কাশন করে।

৯. **দূষিত পদার্থের প্রবেশ রোধ** : শ্বসনতন্ত্র বাতাসে বিদ্যমান জীবাণু ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ প্রবেশ রোধ করে।

ব্যবহারিক

ফুসফুসের অনুচ্ছেদ (Section through Lung)

শনাক্তকরণ

১. অনুচ্ছেদের অভ্যন্তরভাগে বুদবুদ-এর মতো অসংখ্য অ্যালভিওলাই (alveoli) থাকে।

২. অ্যালভিওলাইগুলো ট্র্যাবেকুলি (trabeculae) নামক ব্যবধায়ক পর্দার মাধ্যমে পৃথক।

৩. অসংখ্য সূক্ষ্ম সিলিয়াযুক্ত বায়ু নালিকা বা **ব্রঙ্কিওল** (bronchiole) দেখা যায়।

৪. অ্যালভিওলাই ও ব্রঙ্কিওলের ফাঁকে ফাঁকে রক্তনালি অবস্থিত।

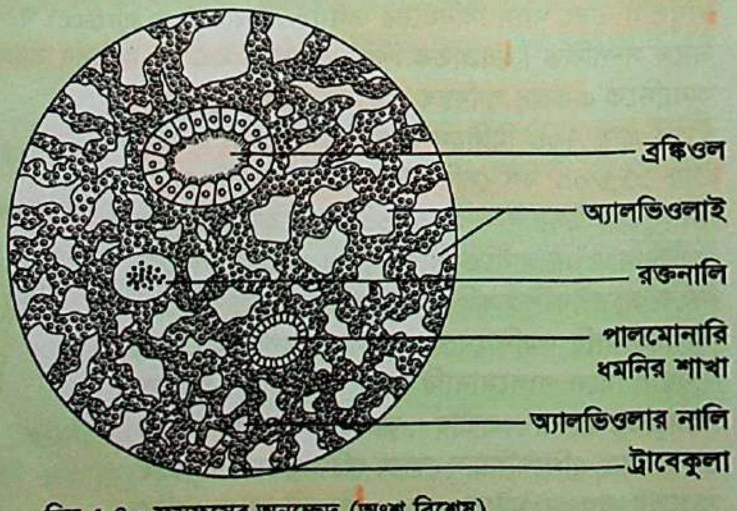

চিত্র ৫.৪ : ফুসফুসের অনুচ্ছেদ (অংশ বিশেষ)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

শ্বসনের শারীরবৃত্ত (Physiology of Respiration)

পরিবেশ থেকে গৃহীত O_2 দিয়ে কোষমধ্যস্থ খাদ্য (গ্লুকোজ) জারিত করে শক্তি উৎপাদন শেষে CO_2 পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়ার জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার নাম **শ্বসন**। এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া ও মানবদেহে নিরন্তর চলমান প্রক্রিয়া। নিচে বর্ণিত দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়।

১. বহিঃশ্বসন (External respiration) : এটি ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া যা ফুসফুসে সংঘটিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় এনজাইমের কোন ভূমিকা নেই এবং কোন শক্তিও উৎপন্ন হয় না। ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ে প্রশ্বাসের মাধ্যমে গৃহীত O_2 এবং দেহকোষ থেকে উৎপন্ন এবং রক্তবাহিত CO_2 গ্যাসের বিনিময় ঘটে।

২. অন্তঃশ্বসন (Internal respiration) : এটি জৈবরাসায়নিক প্রক্রিয়া যা দেহকোষ ও রক্তে সংঘটিত হয়। এখানে এনজাইমের ভূমিকা ব্যাপক এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। ফুসফুস কর্তৃক বায়ুমণ্ডল থেকে গৃহীত O_2 রক্ত দ্বারা বাহিত হয়ে দেহকোষে পৌছায় যেখানে গ্লুকোজ জারিত হয়ে শক্তি উৎপন্ন করে। উপজাত বস্তু হিসেবে নির্গত CO_2 রক্ত দ্বারা পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে পৌছায়।

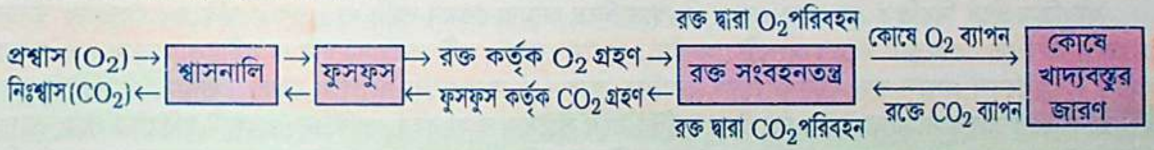

নিচে প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম এবং গ্যাসীয় পরিবহন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেয়া হলো।

প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম (Ventilation Mechanism)

যে প্রক্রিয়ায় ফুসফুসে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড-সমৃদ্ধ বায়ু ফুসফুস থেকে বের হয়ে যায় তাকে **শ্বাসক্রিয়া** (breathing) বলে। প্রকৃতপক্ষে এটি বহিঃশ্বসন প্রক্রিয়া। বক্ষগহ্বরের আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ফুসফুসের আয়তন সঙ্কোচন-প্রসারণের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। দুধরনের পেশির ক্রিয়ায় বক্ষগহ্বরের আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে : (১) বক্ষ ও উদর গহ্বরের মাঝে অবস্থিত **মধ্যচ্ছদা বা ডায়াফ্রাম** (diaphragm) এবং (২) পর্শুকাসমূহের (ribs) ফাঁকে অবস্থিত **ইন্টারকোস্টাল পেশি** (intercostal muscle)। শ্বাসক্রিয়া দুটি পর্যায়ে সম্পন্ন হয়, যথা: (ক) **প্রশ্বাস** বা শ্বাসগ্রহণ এবং (খ) **নিঃশ্বাস** বা শ্বাসত্যাগ।

ক. প্রশ্বাস বা শ্বাসগ্রহণ (Inspiration) : ডায়াফ্রাম-পেশি সংকুচিত হলে এর কেন্দ্রীয় **টেনডন** (tendon) নিম্নমুখে সঞ্চালিত হয়। ফলে বক্ষগহ্বরের অনুদৈর্ঘ্য ব্যাস বেড়ে যায়। একই সময় নিম্নভাগের **পর্শুকাগুলো** (ribs) কিছুটা উপরে উঠে আসায় বক্ষগহ্বরের পার্শ্বীয় এবং অগ্র-পশ্চাৎ ব্যাসও বেড়ে যায়। **ইন্টারকোস্টাল** (intercostal) পেশির সংকোচনের ফলে পর্শুকার দেহ (shaft) উত্তোলিত হয়। এতে স্টার্নাম উপরে উঠে সামনে সঞ্চালিত হয়। ফলে বক্ষের অগ্র-পশ্চাৎ ব্যাসসহ অনুপ্রস্থ ব্যাস বৃদ্ধি পায়।

এভাবে ডায়াফ্রাম ও পর্শুকা পেশির সংকোচনের ফলে বক্ষীয় গহ্বর সবদিকে বেড়ে যায়। এ কারণে ফুসফুস প্রসারিত হয়ে এর ভিতরের আয়তনও বাড়িয়ে দেয়। প্রসারিত ফুসফুসের অভ্যন্তরীণ চাপ বাতাসের সাধারণ চাপ অপেক্ষা কম হওয়ায় নাসিকা পথের ভিতর দিয়ে আসা বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে।

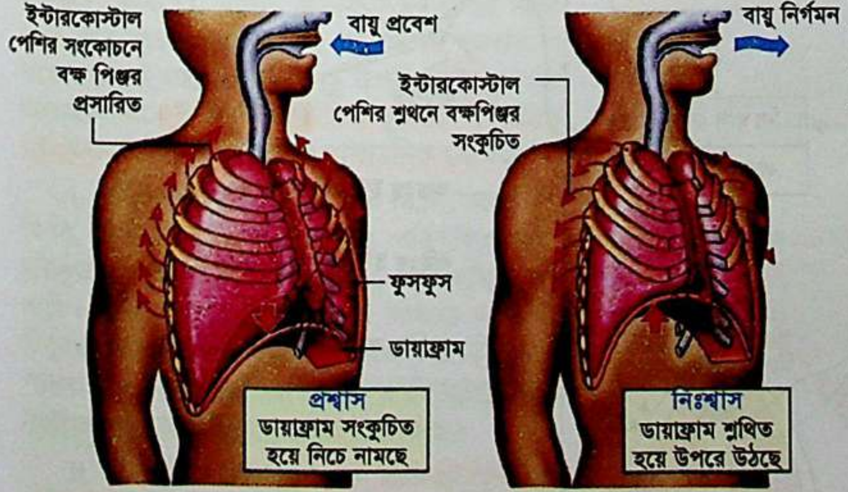

চিত্র ৫.৫ : প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস কার্যক্রম

পরিবেশ থেকে O_2-সমৃদ্ধ বায়ু নাসারন্ধ্র পথে ট্রাকিয়া→ব্রঙ্কাস→ব্রঙ্কিওল→অ্যালভিওলাই তথা ফুসফুসে প্রবেশ।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

খ. নিঃশ্বাস বা শ্বাসত্যাগ (Expiration) : এটি প্রশ্বাসের পর পরই সংঘটিত একটি নিষ্ক্রিয় প্রক্রিয়া। প্রশ্বাসে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলোর প্রসারণ বা শিথিলতার জন্য নিঃশ্বাস ঘটে।

নিঃশ্বাসের সময় প্রশ্বাসকালে অংশগ্রহণকারী পেশিগুলো স্থিতিস্থাপকতার জন্য পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। তখন পর্শুকাগুলো নিজস্ব ওজনের জন্য নিম্নগামী হয়; উদরীয় পেশিগুলোর চাপে ডায়াফ্রাম ধনুকের মতো বেঁকে বক্ষগহ্বরের আয়তন কমিয়ে দেয়; ফুসফুসীয় পেশি পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়; এবং প্লিউরার অন্তঃস্থ চাপ ও ফুসফুসের বায়ুর চাপ বেড়ে যায়। বাতাস তখন ফুসফুস থেকে নাসিকা পথে বেরিয়ে গেলে ফুসফুসের আয়তনও কমে যায়।

ফুসফুসে CO_2–সমৃদ্ধ বায়ু → অ্যালভিওলাই → ব্রঙ্কিওল → ব্রঙ্কাস → নাসাপথ → নাসারন্ধ্র পথে বাইরে নিষ্কাশন।

শ্বসন একটি ছন্দময় প্রক্রিয়া। পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষে বিশ্রামকালে এ প্রক্রিয়া প্রতিমিনিটে ১৪–১৮ বার এবং নবজাত শিশুতে ৪০ বার সংঘটিত হয়। তবে ব্যায়াম বা অন্য কারণে শ্বসনের হার দ্রুত হয় বলে উদরীয় পেশিও তখন শ্বসন কাজে যোগ দেয়।

প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ (Regulation of Respiration)

স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বলে প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস নিয়ে আমরা তেমন ভাবি না। পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মেডুলায় শ্বসনের এ কেন্দ্র অবস্থিত। কেন্দ্রের নিচের অংশটি (অংকীয়) **প্রশ্বাস কেন্দ্র**। এটি প্রশ্বাসের হার ও গভীরতা বাড়ায়। এ কেন্দ্রের পৃষ্ঠীয় ও পার্শ্বদেশ প্রশ্বাস বন্ধ করে নিঃশ্বাস ত্বরান্বিত করে। এ অংশগুলো **নিঃশ্বাস কেন্দ্র**। প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস কেন্দ্র ইন্টারকোস্টাল স্নায়ুর সাহায্যে ইন্টারকোস্টাল পেশির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। ব্রঙ্কিওল ও ব্রঙ্কাই মস্তিষ্কের সঙ্গে ভ্যাগাস স্নায়ুর মাধ্যমে যুক্ত। ডায়াফ্রাম ও ইন্টারকোস্টাল পেশিতে প্রেরিত ছন্দময় স্নায়ু-উদ্দীপনার ফলে এসব অংশে শ্বসনিক আন্দোলন সংঘটিত হয়।

প্রশ্বাসের কারণে ফুসফুস ফুলে উঠে, ব্রঙ্কিওলে অবস্থিত রিসেপ্টরগুলো সটান হয়, ফলে তা উদ্দীপ্ত হয়ে ভ্যাগাস স্নায়ুর মাধ্যমে আরও বেশি স্নায়ু উদ্দীপনা নিঃশ্বাস কেন্দ্রে প্রেরণ করে। তখন প্রশ্বাস কেন্দ্র ও প্রশ্বাস সাময়িক বন্ধ থাকে। বহিঃস্থ ইন্টারকোস্টাল পেশি তখন শিথিল হয়, ফুসফুসের টিস্যু চুপসে যায়, ফলে নিঃশ্বাস ঘটে। এরপর ব্রঙ্কিওলগুলো

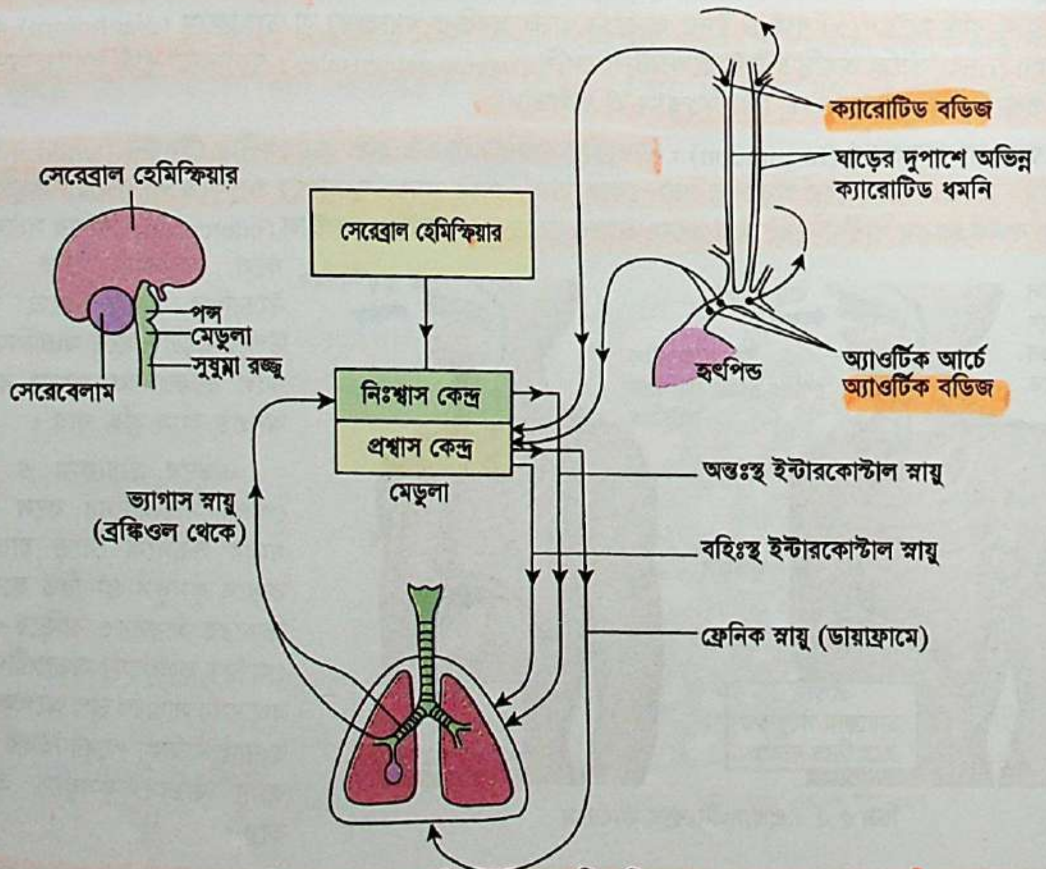

চিত্র ৫.৬ : প্রশ্বাস-নিঃশ্বাসের স্নায়বিক নিয়ন্ত্রণ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

সটান থাকে না, রিসেপ্টরগুলো উদ্দীপ্ত থাকে না। প্রশ্বাস কেন্দ্র তখন সক্রিয় হয়ে যায় এবং আবার প্রশ্বাস শুরু হয়। এভাবে সম্পূর্ণ চক্রটি আজীবন ছন্দায়িত পুনরাবৃত্ত হয়।

শ্বসনের মৌলিক ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে মেডুলা। এখানে সরবরাহকৃত সমস্ত স্নায়ু কেটে ফেললেও ছন্দ অব্যাহত থাকে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় বিভিন্ন উদ্দীপনা এ মৌলিক ছন্দের হেরফের ঘটাতে পারে। প্রধান যে উদ্দীপনা প্রশ্বাস-নিঃশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করে তা হচ্ছে রক্তে O_2 এর চেয়ে CO_2 এর ঘনত্ব। CO_2-এর লেভেল বেড়ে গেলে (যেমন–ব্যায়ামের সময়) রক্ত সংবহনতন্ত্রের ক্যারোটিড ও অ্যাওর্টিক বডিজ (carotid and aortic bodies)-এ অবস্থিত কেমোরিসেপ্টর উদ্দীপ্ত হয়ে প্রশ্বাস কেন্দ্রে স্নায়ু-উদ্দীপনা প্রেরণ করে। প্রশ্বাস কেন্দ্র তখন ইন্টারকোস্টাল ও ফ্রেনিক স্নায়ুর মাধ্যমে বহিঃইন্টারকোস্টাল পেশি ও ডায়াফ্রামে স্নায়ু-উদ্দীপনা প্রেরণ করে এদের সংকোচনের গতি বাড়িয়ে দেয়। এতে প্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়। সুযোগ পেলে CO_2 দেহে দ্রুত ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। দেহে দ্রবীভূত হয়ে যে এসিড উৎপন্ন করে তা এনজাইম ও বিভিন্ন প্রোটিন বিনাশ শুরু করে। বাতাসে CO_2 ঘনত্ব ০.২৫% বাড়লে শ্বসনের হার দ্বিগুণ হয়ে যায়।

অন্যদিকে, বাতাসে যদি O_2 ঘনত্ব ২০% থেকে ৫% এ নেমে আসে তাহলেও শ্বসনের হার দ্বিগুণ হয়ে যায়। O_2-এর ঘনত্বও শ্বসন হারে প্রভাব ফেলে। তবে স্বাভাবিক পরিবেশে প্রচুর O_2 থাকে বলে প্রভাবও পড়ে কম। O_2 ঘনত্বের প্রতি সংবেদী কেমোরিসেপ্টরগুলো মেডুলা এবং অ্যাওর্টিক ও ক্যারোটিড বডিজে অবস্থান করে (এসব বডি CO_2 রিসেপ্টর হিসেবেও কাজ করে)।

সীমিত মাত্রায় শ্বসনের (প্রশ্বাস-নিঃশ্বাস) হার ও গভীরতাকে ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। যেমন- বাতাস বুকের ভিতর টেনে নিয়ে ধরে রাখা যায়। ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রণ সজোর শ্বসন, বক্তৃতা করা, গান গাওয়া, হাঁচি ও কাশি দেওয়ার জন্যেও হতে পারে। নিয়ন্ত্রণ একবার প্রয়োগ হয়ে গেলে মস্তিষ্কের সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারে যে স্নায়ু উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় তা শ্বসন কেন্দ্রে পৌঁছে নির্দেশ কার্যকর করে।

সটান (stretch) রিসেপ্টর ও কেমোরিসেপ্টরের মাধ্যমে প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ একটি নেতিবাচক প্রতিফল (negative feedback)। কিন্তু নেতিবাচক প্রতিফল সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় বাতিল হয়ে যেতে পারে।

গ্যাসীয় (O_2 ও CO_2) পরিবহন (Transport of Gases)

ফুসফুস গহ্বরের ভিতরে অ্যালভিওলাই-এর বাতাস এবং এগুলোর প্রাচীরে অবস্থিত কৈশিকনালির রক্তের মধ্যে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিনিময় ঘটে।

ক. অক্সিজেন পরিবহন

প্রশ্বাসের মাধ্যমে আগত বাতাস ফুসফুসে পৌঁছালে ফুসফুসের অ্যালভিওলাইয়ে O_2-এর চাপ থাকে ১০৭ mmHg। অন্যদিকে, ফুসফুসের কৈশিকজালিকায় দেহ থেকে আগত রক্তে O_2-চাপ থাকে ৪০ mmHg। সুতরাং ফুসফুস থেকে O_2 ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুসীয় ঝিল্লি ভেদ করে রক্তে প্রবেশ করে। এই ব্যাপন যতক্ষণ না রক্তে O_2-এর চাপ 100 mmHg উপনীত হয় ততক্ষণ অব্যাহত থাকে। রক্তে অক্সিজেন দুভাবে পরিবাহিত হয়: যথা- ভৌত দ্রবণরূপে ও রাসায়নিক যৌগরূপে।

i. ভৌত দ্রবণরূপে : প্রতি ১০০ মি.লি. রক্তে ০.২ মি.লি. অক্সিজেন ভৌত দ্রবণরূপে পরিবাহিত হয়। দ্রবীভূত অংশই রক্তে ১০০ mmHg চাপ সৃষ্টির জন্য দায়ী। তবে অংশের পরিমাণ খুব সামান্য বলে তা টিস্যুকোষে অক্সিজেন সরবরাহ কাজে বিশেষ ভূমিকা পালন করে না। তবে অক্সিজেন ও হিমোগ্লোবিনের সংযোজন কাজে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

ii. রাসায়নিক যৌগরূপে : O_2 রক্তে প্রবেশের পর লোহিত কণিকায় অবস্থিত হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সি-হিমোগ্লোবিন গঠন করে। এটি একধরনের

চিত্র ৫.৭ : অ্যালভিওলাসের মাধ্যমে গ্যাসীয় বিনিময়

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

শিথিল রাসায়নিক যৌগ, যা অক্সিজেনের চাপ কমে গেলে পুনরায় বিযুক্ত হয়। এ সংযোজন রক্তে অক্সিজেনের দ্রবীভূত অংশের চাপের উপর নির্ভরশীল। এ চাপ যত বাড়ে হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে তত বেশি সংযুক্ত হয়।

$Hb_4 + 4O_2 \rightleftharpoons 4HbO_2$ [Hb = হিমোগ্লোবিন]

খ. কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন

শর্করা জারণের সময় কোষে CO_2 সৃষ্টি হয়। এই CO_2 দেহের জন্য ক্ষতিকর। কোষ থেকে CO_2 রক্তে পরিবাহিত হয়ে ফুসফুসে পৌঁছায় এবং ফুসফুস থেকে বায়ুতে মুক্ত হয়। নিচে বর্ণিত তিনটি ভিন্ন পদ্ধতিতে CO_2 রক্তে পরিবাহিত হয়।

i. **ভৌত দ্রবণরূপে :** কিছু পরিমাণ (৫%) CO_2 রক্তরসের পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড গঠন করে।

$H_2O + CO_2 \rightarrow H_2CO_3$ (কার্বনিক এসিড)

এ বিক্রিয়ায় **কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ** এনজাইম প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

প্রতি হাজার CO_2 অণুর মধ্যে মাত্র এক অণু H_2CO_3 রূপে দ্রবণে উপস্থিত থাকে। সুতরাং CO_2-এর খুব সামান্য অংশই H_2CO_3 রূপে পরিবাহিত হয়।

ii. **কার্বামিনো যৌগরূপে :** টিস্যুকোষ থেকে রক্তের প্লাজমায় আগত CO_2 -এর কিছু অংশ লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। লোহিত কণিকার মধ্যে যে হিমোগ্লোবিন থাকে তার **গ্লোবিন** (প্রোটিন) অংশের অ্যামিনো গ্রুপের-(NH_2) সাথে CO_2 যুক্ত হয়ে **কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন** যৌগ গঠন করে।

$$CO_2 + HbNH_2 \rightarrow HbN\begin{matrix} H \\ COOH \end{matrix} = HbNHCOOH \text{ (কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন)}$$

CO_2-এর একাংশ প্লাজমা প্রোটিনের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে কার্বামিনোপ্রোটিন গঠন করে।

$PrNH_2 + CO_2 \rightarrow PrNHCOOH$ (কার্বামিনোপ্রোটিন)

এ রাসায়নিক ক্রিয়া এক সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়।

মোট CO_2-এর শতকরা ২৭ ভাগ কার্বামিনো যৌগরূপে পরিবাহিত হয়। প্রতি ১০০ মি.লি. রক্তে এর পরিমাণ ৩ মি.লি. যার ২ মি.লি কার্বামিনো-হিমোগ্লোবিনরূপে এবং ১ মি.লি কার্বামিনো-প্রোটিনরূপে পরিবাহিত হয়।

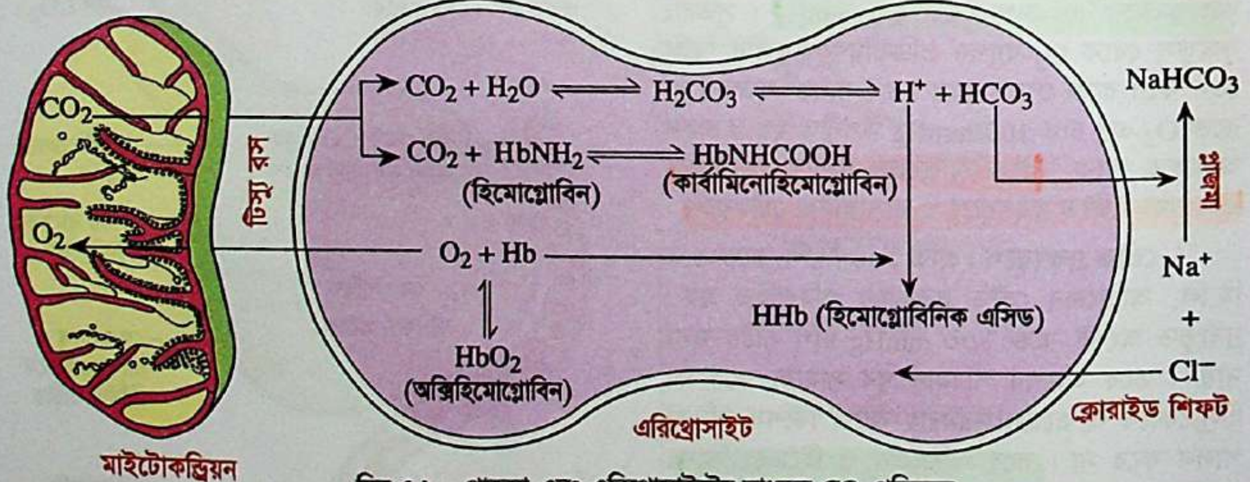

চিত্র ৫.৮ : প্লাজমা এবং এরিথ্রোসাইটের মাধ্যমে CO_2 পরিবহন

iii. **বাইকার্বোনেট যৌগরূপে :** CO_2-এর বেশির ভাগই (৬৫%) রক্তে বাইকার্বোনেটরূপে পরিবাহিত হয়। এটি– (১) $NaHCO_3$– রূপে প্লাজমার মাধ্যমে এবং (২) $KHCO_3$ –রূপে লোহিত কণিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

টিস্যুরস থেকে CO_2 প্রথমে প্লাজমায় ও পরে লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে লোহিত কণিকার মধ্যে CO_2 পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিড (H_2CO_3) উৎপন্ন করে। রক্তরসে কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ অনুপস্থিত থাকায় রক্তরসে খুব কম মাত্রায় কার্বনিক এসিড উৎপন্ন হয়।

$$CO_2 + H_2O \xrightarrow{\text{কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ}} \underset{\text{কার্বনিক এসিড}}{H_2CO_3} \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$$

লোহিত কণিকায় উৎপন্ন H_2CO_3 বিশ্লিষ্ট হয়ে H^+ ও HCO_3^- আয়নে পরিণত হয়। লোহিত কণিকায় বেশি মাত্রায় HCO_3^- সঞ্চিত হওয়ায় এর ঘনত্ব প্লাজমার তুলনায় বেশি হয়।

আয়ন লোহিত কণিকা থেকে প্লাজমায় পরিব্যাপ্ত (diffuse) হয় এবং প্লাজমার Na^+ আয়নের সাথে মিলে $NaHCO_3$ উৎপন্ন করে। লোহিত কণিকার মধ্যে K^+ আয়নের সাথে HCO_3^- বিক্রিয়া করে $KHCO_3$ এ পরিণত হয়।

লোহিত কণিকা থেকে প্লাজমায় HCO_3^- আয়ন আগমনের সাথে সমতা রেখে প্লাজমা থেকে Cl^- লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে এবং লোহিত কণিকায় K^+ আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে KCl গঠন করে। লোহিত কণিকা থেকে HCO_3 আয়ন বেরিয়ে আসায় ঋণাত্মক আয়নের যে ঘাটতি হয় প্লাজমার ক্লোরাইড (Cl^-) আয়ন লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে সে ঘাটতি পূরণ করে। একে **ক্লোরাইড শিফট** (chloride shift) বলে। এর প্রথম বর্ণনাকারী জার্মান শারীরবৃত্তবিদ **হার্টগ জ্যাকব হ্যামবার্গার** (Hartog Jacob Hamburger)-এর নাম অনুসারে ক্লোরাইড শিফটকে **হ্যামবার্গার শিফট**ও বলা হয়।

বহিঃশ্বসন ও অন্তঃশ্বসনের পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	বহিঃশ্বসন	অন্তঃশ্বসন
১. প্রকৃতি	একটি ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া।	একটি জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া।
২. ক্রিয়াস্থল	ফুসফুসে সংঘটিত হয়।	কোষ ও রক্তে সংঘটিত হয়।
৩. এনজাইমের ভূমিকা	এনজাইমের কোনো ভূমিকা নেই।	এতে এনজাইমের ভূমিকা ব্যাপক।
৪. প্রধান উপ-পর্যায়	শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগ।	গ্লাইকোলাইসিস, ক্রেবস চক্র ও গ্যাস পরিবহন।
৫. শক্তি	কোনো শক্তি উৎপন্ন হয় না।	নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়।

শ্বসনে শ্বাসরঞ্জকের ভূমিকা (Role of Respiratory Pigments during Respiration)

হিমোগ্লোবিন হচ্ছে মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্তের লোহিত কণিকায় এবং অনেক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর প্লাজমায় বিস্তৃত লাল বর্ণের প্রোটিনধর্মী অক্সিজেনবাহী শ্বাসরঞ্জক। লোহিত রক্তকণিকার প্রধান প্রোটিন হচ্ছে হিমোগ্লোবিন। এর বর্ণের জন্যই লোহিত কণিকা লাল দেখায় এবং লোহিত কণিকার সংখ্যাধিক্যের কারণে রক্ত লাল দেখায়। হিমোগ্লোবিন শ্বসন গ্যাস অক্সিজেন পরিবহনে প্রধান ভূমিকা পালন করে, কিছু পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইডও বহন করে। চারটি একক নিয়ে গঠিত হিমোগ্লোবিন একটি গোল অণু। এর প্রতিটি একক পলিপেপটাইড জাতীয় প্রোটিন **গ্লোবিন** (globin) এবং লৌহগঠিত **হিম** (heme) নিয়ে গঠিত। রক্তে হিম ও গ্লোবিন ১:২৫ অনুপাতে উপস্থিত থাকে। হিমের ৩৩.৩৩% লৌহ (Fe)। পূর্ণবয়স্ক মানুষের সমগ্র রক্তে মাত্র ৪-৫ গ্রাম লৌহ থাকে।

i. **অক্সিজেন পরিবহন :** শ্বসনের সময় অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ফুসফুস থেকে রক্তে প্রবেশ করে। রক্তে প্রবিষ্ট সমস্ত অক্সিজেনই মুক্ত অবস্থায় থাকে না। এর এক বড় অংশ লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে **অক্সিহিমোগ্লোবিন** (oxyhaemoglobin) নামে অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। এ যৌগ গঠন রক্তরসে (প্লাজমায়) অক্সিজেনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। রক্তরসে যত বেশি অক্সিজেন দ্রবীভূত হবে তার সাথে সংগতি রেখে অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ উৎপন্ন হবে। অন্যদিকে, অক্সিজেনের পরিমাণ যে হারে কমে যাবে যৌগ সে হারে ভেঙে যাবে এবং অক্সিজেন মুক্ত হয়ে রক্তরসে প্রবেশ করবে। প্রতিটি হিমোগ্লোবিন চারটি হিম অংশ থাকায় এর চারটি ফেরাস অণু চার অণু অক্সিজেন যুক্ত করতে পারে।

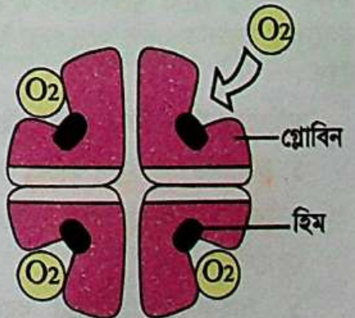

চিত্র ৫.৯ : হিমোগ্লোবিনে অক্সিজেন সংবন্ধন

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ii. **কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবহন :** CO_2 হিমোগ্লোবিনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন নামক অস্থায়ী যৌগ গঠন করে। কার্বামিনো হিমোগ্লোবিন-সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিন্ড হয়ে পরিশোধনের জন্য ফুসফুসে গমন করে।

দেহে রক্ত পরিবহনের সময় বেশ কিছু পরিমাণ অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তরস থেকে স্বল্প অক্সিজেনযুক্ত টিস্যুরসে চলে যায়। ফলে রক্তরসে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যায়। হিমোগ্লোবিন তখন তার সাথে যুক্ত অক্সিজেন ছাড়াতে শুরু করে। এভাবে অক্সিজেন প্রথমে রক্তরসে ও পরে টিস্যুরসে চলে যায়।

শ্বসননালির সমস্যা, লক্ষণ ও প্রতিকার
(Problems, Symptoms and Remedy of Respiratory Tract Disease)

সচল মানবদেহের জন্য সুস্থ অঙ্গতন্ত্র প্রয়োজন। বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের মধ্যে শ্বসনতন্ত্রের **শ্বসননালি** অন্যতম প্রধান অঙ্গ। কিন্তু এটি প্রায়ই ভাইরাসে, মাঝে-মধ্যে ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সচল দেহকে প্রায় আধা-অচল করে দেয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা শ্বসননালির সংক্রমণকে দুভাগে ভাগ করে থাকেন। (১) **ঊর্ধ্ব শ্বসননালিতে সংক্রমণ** (ফলে নাক, কান, গলা, সাইনাস আক্রান্ত হয়) এবং (২) **নিম্ন শ্বসননালিতে সংক্রমণ** (ফলে শ্বাসনালি ও ফুসফুস আক্রান্ত হয়)। ঊর্ধ্ব শ্বসননালিতে সংক্রমণের উদাহরণ হিসেবে সিলেবাসভুক্ত **সাইনুসাইটিস ও ওটাইটিস মিডিয়া** সৃষ্ট সমস্যা, লক্ষণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

সাইনুসাইটিস (Sinusitis)

মাথার খুলিতে মুখমন্ডলীয় অংশে নাসাগহ্বরের দুপাশে অবস্থিত বায়ুপূর্ণ চারজোড়া বিশেষ গহ্বরকে **সাইনাস** বা **প্যারান্যাসাল সাইনাস** (paranasal sinus) বলে। এগুলো হলো–

১. **ম্যাক্সিলারি সাইনাস** (Maxillary sinus) : ম্যাক্সিলারি অঞ্চলে গালে অবস্থিত।
২. **ফ্রন্টাল সাইনাস** (Frontal sinus) : চোখের উপরে অবস্থিত।
৩. **এথময়েড সাইনাস** (Ethmoid sinus) : দু'চোখের মাঝখানে অবস্থিত।
৪. **স্ফেনয়েড সাইনাস** (Sphenoid sinus) : এথময়েড সাইনাসের পেছনে অবস্থিত।

সাইনাস সাধারণত বায়ুপূর্ণ মিউকাস পর্দায় আবৃত এবং ক্ষুদ্র নালির মাধ্যমে নাসাগহ্বর তথা শ্বাসনালির সাথে যুক্ত থাকে। এসব সাইনাস যদি বাতাসের বদলে তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে এবং এই তরল যদি ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকে সংক্রমিত হয় তখন সাইনাসের মিউকাস পর্দায় প্রদাহের সৃষ্টি হয়। **ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের সংক্রমণে বা এলার্জিজনিত কারণে সাইনাসের মিউকাস পর্দায় যে প্রদাহের সৃষ্টি হয় তাকেই সাইনুসাইটিস বলে।** সাইনুসাইটিসের কারণে মাথা ব্যথা, মুখমন্ডলে ব্যথা, নাক দিয়ে ঘন হলদে বা সবুজাভ তরল ঝরে পড়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দেয়।

চিত্র ৫.১০ : সাইনুসাইটিস

স্থায়িত্বের উপর ভিত্তি করে সাইনুসাইটিস দুরকম :

১. **অ্যাকিউট সাইনুসাইটিস** (Acute sinusitis) : এর স্থায়িত্ব ৪ – ৮ সপ্তাহ।
২. **ক্রনিক সাইনুসাইটিস** (Chronic sinusitis) : এর স্থায়িত্ব ২ মাসের বেশি সময়।

রোগের কারণ

১. সাইনাসগুলো বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস (Human respiratory syncytial virus, Parainflueza virus, Metapneumo virus), ব্যাকটেরিয়া (*Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae*) এবং কিছু ক্ষেত্রে ছত্রাকে আক্রান্ত হলে সাইনুসাইটিস হতে পারে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. ঠাণ্ডাজনিত কারণে; অ্যালার্জিজনিত কারণে; ব্যবধায়ক পর্দার অস্বাভাবিকতায় সাইনাস গহ্বর অবরুদ্ধ হয়ে; নাকে পলিপ (polyp) সৃষ্টি হলে; নাসাগহ্বরের মিউকোসা স্ফীতির ফলে নাসাপথ সরু হয়ে ক্রনিক সাইনুসাইটিস হতে পারে।
৩. দাঁতের ইনফেকশন থেকে বা দাঁত তুলতে গিয়েও সাইনাসে সংক্রমণ হতে পারে।
৪. যারা হাঁপানির সমস্যায় ভোগে তাদের দীর্ঘস্থায়ী সাইনুসাইটিস দেখা যায়।
৫. সাধারণত ঘরের পোকামাকড়, ধুলাবালি, পেস্ট, তেলাপোকা ইত্যাদি যেসব অ্যালার্জেন ধারণ করে তার প্রভাবে এ রোগের সংক্রমণ দেখা দিতে পারে।
৬. ইউস্টেশিয়ান নালির (eustachian tube) সামান্য অস্বাভাবিকতায় সাইনাস গহ্বর অবরুদ্ধ হয়ে এবং সংক্রমণের ফলে সাইনুসাইটিস হতে পারে।
৭. নাকের হাড় বাঁকা থাকলে অথবা মুখগহ্বরের টনসিল বড় হলে এ রোগ হতে পারে।
৮. সিস্টিক ফাইব্রোসিস এর কারণে এ রোগ হয়।
৯. অপুষ্টি, পরিবেশ দূষণ ও ঠান্ডা স্যাঁতসেঁতে পরিবেশের কারণেও এ রোগ হতে পারে।

রোগের লক্ষণ

১. নাক থেকে হলদে বা সবুজ বর্ণের ঘন তরল বের হয়। এতে পুঁজ বা রক্ত থাকতে পারে।
২. দীর্ঘ ও বিরক্তিকর তীব্র মাথা ব্যথা লেগেই থাকে যা সাইনাসের বিভিন্ন অঞ্চলে হতে পারে।
৩. মাথা নাড়াচাড়া করলে, হাঁটলে বা মাথা নিচু করলে ব্যথার তীব্রতা আরো বেড়ে যায়।
৪. জ্বর জ্বর ভাব থাকে, কোন কিছু ভালো লাগে না বরং অল্পতেই ক্লান্ত লাগে।
৫. নাক বন্ধ থাকে, নিঃশ্বাসের সময় নাক দিয়ে বাজে গন্ধ বের হয়।
৬. মুখমন্ডল অনুভূতিহীন মনে হয়।
৭. মাথাব্যথার সাথে দাঁত ব্যথাও হতে পারে।
৮. কাশি হয়, রাতে কাশির তীব্রতা বাড়ে, গলা ভেঙ্গে যায়।

জটিলতা

সাইনুসাইটিস সংক্রান্ত জটিলতা কেবল নাসিকাগহ্বর ঘিরেই অবস্থান করে না, বরং সাইনাসগুলোর অবস্থান চোখ ও মস্তিষ্কের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল অঙ্গের সংলগ্ন হওয়ায় জীবাণুর সংক্রমণ শুধু সাইনাসেই সীমাবদ্ধ না থেকে রক্তবাহিত হয়ে চোখ ও মস্তিষ্কে পৌঁছালে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কে সংক্রমণের ফলে মাথাব্যথা, দৃষ্টিহীনতা থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। চোখে সংক্রমণের ফলে পেরিঅরবিটাল ও অরবিটাল সেলুলাইটিসসহ আরও অনেক জটিলতা দেখা দিতে পারে।

প্রতিকার

স্বেচ্ছাসতর্কতা : সাইনাসে জমাট বেঁধে থাকা তরলকে বিগলিত করে সাইনাসকে চাপমুক্ত ও স্বাভাবিক রাখতে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে।

(১) গরম পানিতে ভিজিয়ে, চিপড়ে একখন্ড কাপড় প্রতিদিন বারবার মুখমন্ডলে চেপে ধরা; (২) মিউকাস তরল করতে প্রচুর পানি পান করা; (৩) প্রতিদিন ২-৪ বার নাক দিয়ে বাষ্প টেনে নেওয়া; (৪) দিনে কয়েকবার ন্যাসাল স্যালাইন স্প্রে করা; (৫) আর্দ্রতা প্রতিরোধক ব্যবহার করা; (৬) যন্ত্রের সাহায্যে নাকের ভিতর সবেগে পানি প্রবাহিত করে সাইনাস পরিষ্কার রাখা; (৭) বন্ধ নাক খোলার জন্য ন্যাসাল স্প্রে ব্যবহারে সতর্ক থাকা [প্রথম দিকে ন্যাসাল স্প্রে ভালো কাজ করলেও ৩-৫ দিন একনাগাড়ে ব্যবহার করলে অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে]; (৮) নাক বন্ধ অবস্থায় উড়োজাহাজে না চড়াই ভালো; এবং (৯) মাথা নিচু করে শরীর বাঁকানো অনুচিত।

ওষুধ প্রয়োগ : অ্যাকিউট সাইনুসাইটিসের চিকিৎসায় ওষুধের দরকার হয় না। তবে প্রয়োজনে দু'সপ্তাহের চিকিৎসা চলতে পারে। ক্রনিক সাইনুসাইটিসের চিকিৎসা চলে ৩-৪ সপ্তাহ। ছত্রাকজনিত সাইনুসাইটিসের চিকিৎসায় বিশেষ ধরনের ওষুধ ব্যবহৃত হয়। অ্যান্টিবায়োটিকসহ সমস্ত ঔষধ ব্যবহারে চিকিৎসকের পরামর্শ ও প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী হতে হবে।

কোনো শিশু যদি নাক দিয়ে তরল-নির্গমনসহ ২-৩ সপ্তাহ ধরে কাশিতে, ১০২.২° এ জ্বরে, মাথাব্যথা ও প্রচন্ড চোখফোলা অসুখে ভোগে তাহলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নির্দেশে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োগ শুরু করতে হবে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ওটিটিস মিডিয়া (Otitis media) — মধ্যকর্ণের সংক্রমণ

কানের ভিতরে বা বাইরে যে কোন অংশে সংক্রমণজনিত প্রদাহকে **ওটিটিস** (otitis) বলে। কানের মধ্যকর্ণে সংক্রমণজনিত প্রদাহকে বলা হয় **ওটিটিস মিডিয়া** (otitis media / middle ear infection)। গলবিলের সাথে মধ্যকর্ণের সংযোগ স্থাপনকারী **ইউস্টেশিয়ান নালি** (eustachian tube) টি অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে, শুধু ঢোকগেলার সময় খোলা থাকে। কোনো কারণে কোনো জীবাণু এ নালি দিয়ে এসে মধ্যকর্ণে প্রদাহ সৃষ্টি করলে তাকে **ওটিটিস মিডিয়া** বলে। বয়স্কদের তুলনায় শিশুরা এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়।

শিশুদের ওটিটিস মিডিয়া তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা–

১. **স্বল্পস্থায়ী বা অ্যাকিউট ওটিটিস মিডিয়া :** এক্ষেত্রে ইউস্টেশিয়ান নালির প্রতিবন্ধকতার কারণে ঊর্ধ্ব শ্বাসনালি আক্রান্ত হয় এবং মধ্যকর্ণ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হয়। দু থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে এ রোগ নিরাময় হয়।

২. **দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক ওটিটিস মিডিয়া :** এক্ষেত্রে দু থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে রোগ নিরাময় হয় না। রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এ রোগে কানের পর্দা ছিদ্র হয়ে পুঁজ বা তরল পদার্থ বেরিয়ে আসে। শ্রবণে ব্যাঘাত ঘটে।

৩. **অ্যাডহেসিভ ওটিটিস মিডিয়া :** এক্ষেত্রে কানের পর্দা মধ্যকর্ণের কোনো স্থানে বা অস্থির সাথে আটকে যায়। ফলে রোগী বধির হয়ে যায়।

রোগের কারণ

১. প্রধানত ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাকের সংক্রমণে এ রোগ হয়। Respiratory syncytial virus (RSV), Influenza virus, Rhinovirus এবং *Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis* ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটলে।
২. মধ্যকর্ণের সাথে নাকের সংযোগস্থল (eustachian tube) ফুলে বন্ধ হয়ে গেলে।
৩. কোন কারণে অ্যাডিনয়েড (adenoids) ফুলে গেলে।
৪. মাতৃদুগ্ধ পান না করালে বা কম করালে।
৫. শিশুদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার কারণে ঠান্ডা লাগলে এবং কানের সংক্রমণ হলে।

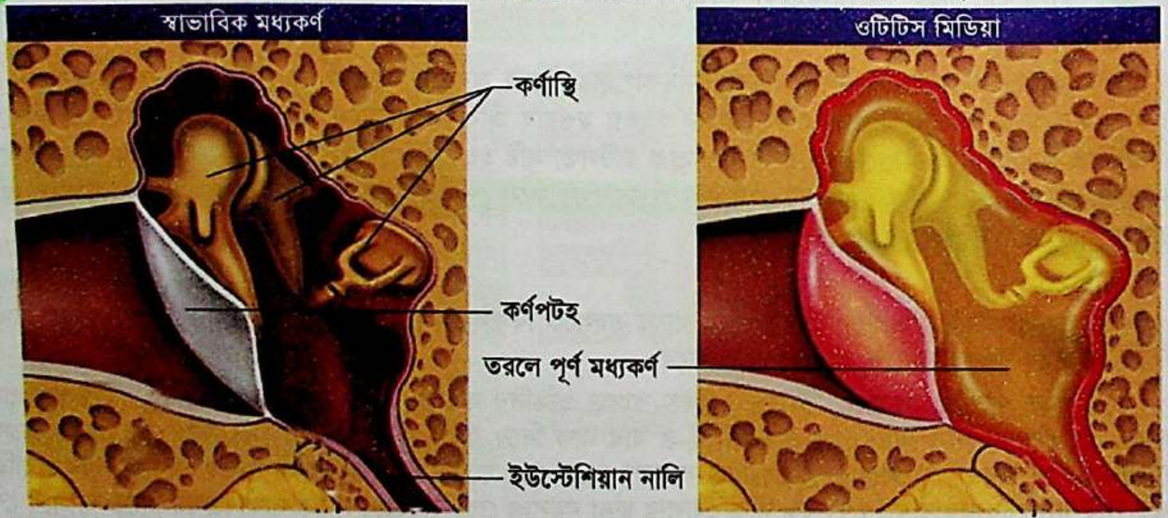

চিত্র ৫.১১ : ওটিটিস মিডিয়া

ওটিটিস মিডিয়া কাদের বেশি হয়

যাদের ওটিটিস মিডিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেশি রয়েছে তারা হলো–

১. চার মাস থেকে চার বছর বয়সি শিশুদের।
২. ডে কেয়ার সেন্টারগুলোর মতো জায়গাতে যেখানে একসাথে অনেক শিশু বেড়ে উঠে সেসব শিশুদের।
৩. যেসব শিশুদের নিচু অবস্থানে শুইয়ে বোতলে দুধ খাওয়ানো হয়।
৪. যেসব শিশুরা ধুমপানযুক্ত ও বায়ু দূষণপূর্ণ এলাকায় বাস করে।
৫. পরিবারের অন্য কারো কানে সংক্রমণ হলে শিশুদেরও কানের সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

রোগের লক্ষণ

শিশুদের ক্ষেত্রে

১. কানে ব্যথা হয় এবং কান টানতে থাকে।
২. মাথা ব্যথা হয় ফলে অতিরিক্ত কান্নাকাটি করে।
৩. দেহে বেশি তাপসহ (104°F+) জ্বর থাকে তাই ঘুমাতে পারে না।
৪. নাক দিয়ে পানি ঝরে, কান থেকে দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ বের হয়।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে

১. কানে ব্যথা হয়, কানে চাপ অনুভূত হয় এবং কান ভোঁ ভোঁ করে।
২. মাথা ঝিম ঝিম করে এবং প্রচন্ড মাথা ব্যথা হয়।
৩. কাশি হয় ও নাক দিয়ে পানি ঝরে।
৪. কানে কম শোনে, খাবারে রুচি থাকে না।

ওটিটিস মিডিয়ার জটিলতা

১. কানের পর্দা বা টিমপেনিক পর্দায় ছিদ্র হয়।
২. ছিদ্রপথে মধ্যকর্ণ থেকে গাঢ় তরল পদার্থ গড়িয়ে পড়ে।
৩. কানে কম শোনে।
৪. কানে কম শোনার কারণে শিশুরা সহজে কথা বলা শিখতে পারেনা।

উপদেশ

i. অপ্রয়োজনে কান চুলকানো এড়িয়ে চলা।
ii. গোসলের পূর্বে তুলা তেলে ভিজিয়ে কানে দিয়ে গোসল করা।
iii. ঠান্ডা না নাগানো।
iv. সাতার না কাটা।
v. কান পরিস্কার রাখা।
vi. কানে পানি ঢুকতে না দেয়া।

প্রতিরোধ (Prevention)

১. শিশুর আশেপাশে ধুমপান না করা। কারণ ধুমপায়ীদের শিশুরা ঠান্ডা ও কানের সংক্রমণে বেশি ভুগে থাকে।
২. কানের সংক্রমণ প্রতিরোধে জন্মের পর শিশুকে অন্তত প্রথম ছয়মাস বুকের দুধ খেতে দেয়া। বুকের দুধে রয়েছে রোগ প্রতিরোধক উপাদান। তা ছাড়া ধারণা করা হয় মায়ের দুধে এমন কোনো উপাদান রয়েছে যা পান করার সময় গলার উপর দিকের মিউকাস পর্দা বা ঝিল্লিতে আটকে থাকা ব্যাকটেরিয়াকে নিচের দিকে পাকস্থলিতে নিয়ে আসে। ফলে ব্যাকটেরিয়া উপর দিকে ইউস্টেশিয়ান নালিতে প্রবেশের সুযোগ পায় না।
৩. বুকের দুধ বা অন্য কোনো তরল খাওয়ানোর সময় শিশুর মাথাটি পিঠের সঙ্গে ৪৫ ডিগ্রি কোণে উঁচুতে রাখতে হবে। তা না হলে তরল খাবার ইউস্টেশিয়ান নালি হয়ে কানে ঢুকে সংক্রমণ সৃষ্টি করে।
৪. অ্যালার্জি সৃষ্টি করে এমন কিছু এড়িয়ে চলা। কারণ অ্যালার্জিজনিত প্রতিক্রিয়ার কারণে ইউস্টেশিয়ান নালি বন্ধ হয়ে সংক্রমণ ঘটতে পারে।
৫. গোসলের সময় কানে যাতে পানি প্রবেশ না করে সেদিকে খেয়াল রাখা ও বায়ু দূষণ থেকে দূরে থাকা।
৬. বার বার সর্দি হতে থাকলে এবং নাকের ছিদ্রপথ লালাভ রং এর হলে; শিশু মুখ দিয়ে শ্বাস নিলে এবং রাতে হাঁ করে ঘুমালে শীঘ্রই চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া।
৭. শিশুকালে নিউমোকক্কাল কনজুগেট ভ্যাক্সিন গ্রহণ করে (Pneumococcal conjugate vaccine) *Streptococcus pneumoniae* সৃষ্ট ওটিটিস মিডিয়া রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যেতে পারে।

প্রতিকার (Remedy)

১. চিকিৎসকের পরামর্শ মতো সম্পূর্ণ কোর্সের অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করা। প্রয়োজনে কানের ড্রপ এবং অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।
২. অল্প সময়ের জন্য ব্যথানাশক কোন ওষুধ যেমন– প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।
৩. সতর্কতার সঙ্গে ২/৩ ফোঁটা উষ্ণ মিনারেল অয়েল কানে দেয়া যেতে পারে।
৪. সহনীয় মাত্রায় গরম পানির বোতল চেপে ধরে কানে গরম সেঁক দেয়া। বেশি গরম হলে কাপড়ে বা তোয়ালে পেঁচিয়ে সেঁক দেয়া যেতে পারে।
৫. কান দিয়ে সবসময় পুঁজ পড়ার মতো অবস্থা বার বার ঘটলে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ (ENT Specialist) চিকিৎসকের মাধ্যমে টিম্পেনোস্টোমি টিউব (Tympanostomy tube) নামে বিশেষ নলের সাহায্যে আধুনিক চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে।
৬. কানের পর্দা ছিদ্র হয়ে গেলে Myringoplasty করা যেতে পারে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ধূমপায়ী ও অধূমপায়ী মানুষের ফুসফুসের এক্স-রের তুলনা
(Comparison Between the X-Ray Film of the Lungs of Smoker and Nonsmoker)

একটি সিগারেটের শলায় প্রায় ৪ হাজার বিভিন্ন রাসায়নিক থাকে। ধূমপানের ফলে এগুলো দেহের ভিতরে, বিশেষ করে ফুসফুসে প্রবেশ করে দেহকে অসুস্থ করতে শুরু করে। সিগারেটে যে রাসায়নিক থাকে তার মধ্যে নিকোটিন, আর্সেনিক, মিথেন, অ্যামোনিয়া, কার্বন মনোক্সাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড ইত্যাদি প্রধান। একজন অধূমপায়ী যে কাজ চটজলদি করতে পারে, সে কাজ ধূমপায়ীর জন্য অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ প্রমাণিত হয়। নিচে ধূমপায়ী ও অধূমপায়ী মানুষের এক্স-রের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো।

১. **এক্স-রে ফিল্ম :** ধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে এটি কোথাও কোথাও সাদাটে বা সাদা, অধূমপায়ীর ক্ষেত্রে এটি কালো।

২. **ফুসফুস :** এক্স-রে দেখে চিকিৎসক ধূমপায়ী ব্যক্তির ফুসফুসে পানি জমা (pleural effusion) শনাক্ত করতে পারবেন। এ ধরনের কিছু অধূমপায়ীর এক্স-রে ফিল্মে থাকবে না।

৩. **অ্যালভিওলাই :** ধূমপায়ীদের ফুসফুসের এক্স-রে ফিল্মে অ্যালভিওলাইয়ে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায় না কিন্তু অধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে সুষম স্বচ্ছতা দেখা যায়। তাছাড়া ধূমপায়ীদের ফুসফুসে অধূমপায়ীর চেয়ে কম সংখ্যক অ্যালভিওলাই দেখা যায়। কারণ ধূমপানের ফলে অ্যালভিওলাই নষ্ট হয়ে যায়, কালচে বর্ণ ধারণ করে, কখনওই এগুলোর পুনর্জন্ম হয় না।

৪. **সিলিয়া :** ফুসফুসের অন্তঃপ্রাচীর জুড়ে চুলের মতো সিলিয়া (cilia) থাকে। ধূমপায়ীদের সিলিয়া অবশ হয়ে পড়ে, ফলে ধূলি ও কণা ভিতরে জমা হয়। অধূমপায়ীর ক্ষেত্রে এটি ঘটে না তাই ফুসফুস ধূলি-কণা মুক্ত থাকে। এক্স-রে তে এটিও ধরা পড়ে।

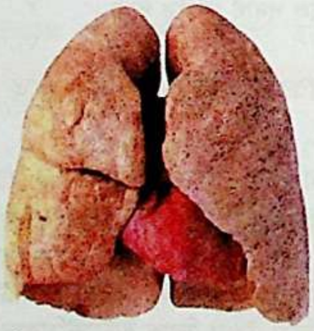

চিত্র ৫.১২ : স্বাভাবিক ফুসফুস

চিত্র ৫.১৩ : ধূমপায়ীর ফুসফুস

৫. **প্রাচীর :** এক্স-রে ফিল্মে ধূমপায়ীর ফুসফুস ও অ্যালভিওলাসের প্রাচীর পাতলা ও দুর্বল দেখায়। কিন্তু অধূমপায়ীর এদুটি অংশের প্রাচীর স্বাভাবিক পুরু এবং সবল।

৬. **এমফাইসেমা :** সিগারেটের ধোঁয়ায় অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে যে ক্ষতি হয় তার ফলে অ্যালভিওলাস আয়তনে বেড়ে যায় এবং কোনো কোনো স্থান ফেটে ফুসফুসে ফাঁকা স্থান সৃষ্টি করে। এগুলোকে **এমফাইসেমা** (emphysema) বলে। ধূমপায়ীদের এক্স-রে ফিল্মে এমফাইসেমার চিহ্ন দেখা যায় যা অধূমপায়ীদের এক্স-রে ফিল্মে অনুপস্থিত।

৭. **ব্রঙ্কিওল :** ধূমপায়ীর এক্স-রে ফিল্মে ব্রঙ্কিওলের মিউকাস গ্রন্থিগুলোতে বর্ধিত স্ফীতি দেখা যায়। অধূমপায়ীর এক্স-রে ফিল্মে গ্রন্থিগুলোর গঠন স্বাভাবিক দেখায়।

৮. **টিউমার :** ধূমপায়ীদের ফুসফুসের এক্স-রে ফিল্মে অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিউমার উপবৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যায় যা অধূমপায়ীদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

৯. **ক্যান্সার কোষ :** ধূমপায়ীদের ফুসফুসের এক্স-রে ফিল্মে অনেক সময় ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোষের চিহ্ন দেখা যায় অর্থাৎ কোথাও কোথাও সাদা ঘন জায়গা পরিলক্ষিত হয়। অধূমপায়ীদের এক্স-রে ফিল্মে সাধারণত ক্যান্সার সৃষ্টিকারী কোনো ধরনের কোষের চিহ্ন দেখা যায় না।

কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস (Artificial Respiration)

কোনো কারণে কারও শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে এমন জরুরী পরিস্থিতিতে সে ব্যক্তির মুখ বা নাক দিয়ে যান্ত্রিক বা কায়িক ছন্দময় প্রক্রিয়ায় বাতাস অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে বা বের করে দিয়ে পুনরায় শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগে সক্ষম করে তুলে ভুক্তভোগি ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলাই হচ্ছে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের উদ্দেশ্য। বিপদ-আপদ বলে কয়ে আসে না, তাই কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা সবারই জেনে রাখা ভাল। কোনো দুঃসময় বা দুর্গমস্থানে কারও শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

হাসপাতাল, অ্যাম্বুলেন্স বা এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিলেও আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে তোলা অসাধ্য হতে পারে। কিন্তু ঐ সময় যদি সঙ্গী-সাথি কারও কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জানা থাকে তাহলে খুব কম সময়ের মধ্যে সে একটি অমূল্য প্রাণ রক্ষা করতে পারে। তবে এ কাজটি করতে হবে একজন প্রশিক্ষিত ব্যক্তিকে এবং কাজ শুরুর আগে কাউকে বলে রাখতে হবে ডাক্তার বা অ্যাম্বুলেন্সকে খবর দিয়ে রাখতে। এভাবে, জীবন রক্ষায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা হিসেবে মুখ থেকে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের গুরুত্ব অপরিসীম।

মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস (Mouth to Mouth Artificial Respiration)

সময়মত সাহায্য পেলে কিভাবে একটি জীবন বেঁচে যেতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মুখ হতে মুখের সাহায্যে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা গ্রহণ। পানিতে ডুবে, কোনো কারণে অক্সিজেনের অভাব, বৈদ্যুতিক শক, বিষপান বা গ্যাস গ্রহণ প্রভৃতি নানা কারণে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। যে কারণেই হোক শিশু বা কিশোরকে (কিংবা পূর্ণবয়স্ককে) বাঁচাতে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে দ্রুত মুখ থেকে মুখে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে।

অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধকে গুলিয়ে ফেললে হবে না। এ কারণে প্রথমেই দেখতে হবে বুকের উঠানামা বা কফের লক্ষণ আছে কিনা। না থাকলে ধাপে ধাপে মুখ-মুখে শ্বাসপ্রশ্বাস কার্যক্রম চালু করতে হবে।

চিত্র–১

ধাপ–১ : চিৎকার করে কাউকে অ্যাম্বুলেন্স বা ডাক্তার ডাকার অনুরোধ করতে হবে।

ধাপ–২ : শিশুর জিভ সামনের দিকে টেনে দেখতে হবে মুখ-তালু-গলায় কিছু আটকে আছে কিনা, থাকলে আস্তে উপুড় করে আঙুলের সাহায্যে বের করে আনতে হবে।

ধাপ–৩ : শিশুকে শক্ত খাট, টেবিল বা মাটিতে চিৎ করে এমনভাবে শুইয়ে দিতে হবে যাতে নাক সোজা ছাদের দিকে বা আকাশের দিকে থাকে। এবার যতখানি খোলা যায় মুখ হা করতে হবে। এতে শ্বাসনালির ভিতর বাতাস ঢুকে সহসা শ্বাসপ্রশ্বাস শুরু হয়ে যেতে পারে।

চিত্র–২

ধাপ–৪ : শ্বাসপ্রশ্বাসের লক্ষণ দেখা না গেলে মুখ-মুখে শ্বসনের ব্যবস্থা নিতে হবে। এ কাজের শুরুতে গভীর শ্বাস নিতে হবে। ছোট শিশু হলে তার নাক-মুখ ঢেকে নিজের মুখ চেপে ধরতে হবে (সামান্য বাতাসও যেন বেরোতে না পারে; চিত্র–১)। এরপর আস্তে আস্তে ফুঁ দিতে হবে, লক্ষ রাখতে হবে যেন রোগীর বুক সামান্য ফুলে উঠে। জোরে ফুঁ দেওয়া যাবে না, তাহলে শিশুর ফুসফুসের কোথাও ছিঁড়ে যেতে পারে।

একটু বয়স্ক শিশুর ক্ষেত্রে, একহাতে ওর নাক চেপে ধরে মুখের উপরে মুখ স্থাপন করতে হবে (চিত্র–২)। তখন সজোরে ফুঁ দিয়ে শিশুর বুক উঁচু হয় তা নিশ্চিত হতে হবে। এভাবে দুবার ফুঁ দিতে হবে। বুক যদি উঠা-নামা না করে তাহলে ধাপ-২ আবার প্রয়োগ করতে হবে।

চিত্র–৩

ধাপ–৫ : ধাপ ৪ চলাকালীন কখনওবা রোগীর হৃৎস্পন্দন থেমে যেতে পারে। এমন অবস্থায় দুবার প্রশ্বাস দেয়ার পর রোগীর নাড়ি চেপে দেখতে হবে। কনুইয়ের সামনে দু-আঙুলে হালকা চাপ দিয়ে নাড়ির অবস্থা বুঝতে হবে। সামান্য বয়স্কশিশুর ক্ষেত্রে ঘাড়ে শ্বাসনালির পাশে আঙুলের চাপে নাড়ির স্পন্দন একেবারেই না পাওয়া গেলে বুকের মাঝখানে উরঃফলকে চাপ দিয়ে মালিশ করতে হবে।

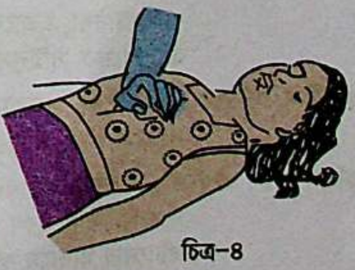
চিত্র–৪

ধাপ–৬ : ঘটনাস্থলে একাধিক ব্যক্তি থাকলে একজন বুক মালিশ করবে, আরেকজন মুখ-মুখে শ্বাস চালিয়ে যেতে হবে। কম বয়সি শিশুর ক্ষেত্রে ৩ আঙুল দিয়ে নিপলের ঠিক নিচে চাপ দিয়ে মালিশ করতে হবে (চিত্র–৩)। ঘরে যদি আর

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কেউ না থাকে তাহলে একবার মুখ-মুখে একবার শ্বাস দিয়ে ৫ বার মালিশ করতে হবে। আরেকটু বয়স্ক শিশুর ক্ষেত্রে বেশি চাপের প্রয়োজন হতে পারে, তখন হাতের তালুর গোড়া (palm of hand) ব্যবহার করা যেতে পারে (চিত্র–৪)। মালিশের সময় বুক প্রায় দেড় ইঞ্চি পর্যন্ত চেপে নিচে নামিয়ে দিতে হতে পারে। নাড়ির স্পন্দন না পাওয়া পর্যন্ত কিংবা মৃত্যু নিশ্চিত না জানা পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।

বিশেষ মুখ-মুখে শ্বাস প্রশ্বাস : অনেক সময় শিশু-কিশোর-যুবক বয়সি লোক পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করে। যে কোনো কারণেই হোক ডুবন্ত ব্যক্তিকে টেনে এনে উদ্ধারকারী ব্যক্তি কূলের কাছে এসে একটু দাঁড়ানোর জায়গা পেলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ-থেকে মুখে শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া শুরু করে দিতে হবে (চিত্র–৫)।

চিত্র–৫

চিত্র ৫.১৪ : কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়া

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

নাসাগলবিল : নরম প্যালেটের উপরে গলবিলের অংশ বিশেষ।

কার্বামিনো যৌগ : কার্বন ডাইঅক্সাইড ও প্রোটিনের সংগে যুক্ত অ্যামিনো গ্রুপের সংযুক্তিতে যে যৌগ উৎপন্ন হয়।

প্লিউরা : যে সূক্ষ্ম পর্দা দিয়ে ফুসফুস আবৃত থাকে।

DPT : Diptheria Pertuisis Tetani।

হিমোগ্লোবিন : লোহিত কণিকায় অবস্থিত শ্বাসরঞ্জক হিসেবে কাজ করে।

মায়োগ্লোবিন : একটি পেশিনিহিত প্রোটিন বা পেশির বর্ণের জন্য যেমন দায়ী তেমনি অক্সিজেন সঞ্চয় স্থান হিসেবে প্রধানত কাজ করে।

ব্রঙ্কাইটিস : দূষিত ধূলিকণা আর্দ্র বাতাসের সাথে শ্বাসনালিতে প্রবেশ করে শব্দসহ কাশি ও ক্লেশদায়ক কষ্ট সৃষ্টি করে।

এমফাইসেমা : শ্বাসনালি সরু ও ফুসফুসে অতি স্ফীতি সৃষ্টিজনিত অস্বাভাবিকতা এবং প্রদাহ।

হাঁপানি : শ্বাসনালিতে অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী বস্তু প্রবেশের ফলে সৃষ্ট কষ্টদায়ক শ্বাসগ্রহণ ও তারও অধিক কষ্টদায়ক শ্বাসত্যাগ।

COPD : এর পূর্ণরূপ Chronic Obstructive Pulmonary Disease। দীর্ঘস্থায়ী ধূমপায়ীদের ফুসফুসে এ রোগ সৃষ্টি হয়। এতে শ্লেষ্মা নিঃসরণকারী গ্রন্থিগুলো বড় হয়ে বেশি বেশি শ্লেষ্মা তৈরি করে এ কাশি হয়।

অ্যালভিওলাস : ফুসফুসের গঠনগত ও কার্যগত একক হল অ্যালভিওলাস। এটি ক্ষুদ্র বুদবুদ সদৃশ বায়ুকুঠুরি বিশেষ।

সারফেকটেন্ট : অ্যালভিওলাসের প্রাচীরে বিশেষ ধরনের কোষ থাকে যার প্রাচীরের ভিতরের দিকে সারফেকটেন্ট নামক ডিটারজেন্ট জাতীয় পদার্থ ক্ষরণ করে। এ পদার্থ অ্যালভিওলাসের স্ফীতি অবস্থা বজায় রেখে গ্যাস বিনিময় সহজ করে। এছাড়াও এটি অ্যালভিওলাসে আগত রোগজীবাণু ধ্বংস করে।

ক্লোরাইড শিফট বিক্রিয়া : লোহিত কণিকা থেকে যতটি HCO_3^- প্লাজমায় আসে ততটি Cl^- প্লাজমা থেকে লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। একে ক্লোরাইড শিফট বিক্রিয়া বা হ্যামবার্গার বিক্রিয়া বলে। লোহিত কণিকা থেকে বাইকার্বোনেট আয়ন (HCO_3^-) প্লাজমায় প্রবেশ করার ফলে ঋণাত্মক আয়নের যে ঘাটতি হয় প্লাজমার ক্লোরাইড আয়ন (Cl^-) লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে সে ঘাটতি পূরণ করে। এর ফলে রক্তের অম্ল-ক্ষার ($pH = ৭.৪$) সমতা বজায় থাকে।

সাইনুসাইটিস : মুখমন্ডলের নাকের আশপাশে অবস্থিত চারজোড়া বায়ুপূর্ণ বিশেষ গহবরকে সাইনাস বলে। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাকের সংক্রমণে বা এলার্জিজনিত কারণে সাইনাসের মিউকাস পর্দায় যে প্রদাহের সৃষ্টি হয় তাকেই সাইনুসাইটিস বলে।

ওটিটিস মিডিয়া : মধ্যকর্ণের সংক্রমণজনিত প্রদাহকে ওটিটিস মিডিয়া বলে। ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাকের সংক্রমণে এ রোগ হয়।

কৃত্রিম শ্বাস প্রশ্বাস : পানিতে ডোবা, বৈদ্যুতিক আঘাত, কার্বন মনোক্সাইডের বিষক্রিয়া ইত্যাদি কারণে শ্বাসক্রিয়ার ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে যে বিশেষ কৌশলে কৃত্রিমভাবে ফুসফুসে বাতাস সরবরাহ করে গ্যাস বিনিময় ঘটানোর মাধ্যমে শ্বসন প্রক্রিয়া চালু রাখা হয় তাকে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস বলে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সাইনাসের প্রদাহকে কী বলে ?
ক) ওটিটিস মিডিয়া খ) সাইনুসাইটিস
গ) এলার্জি ঘ) এমফাইসেমা

২. পেরিট্রিম আবরণ কিসের অংশ ?
ক) স্পাইরাকল খ) ট্রাকিয়া
গ) ট্রাকিওল কোষ ঘ) ট্রাকিওল

৩. বাম ফুসফুস কয়টি লোবিওলে বিভক্ত ?
ক) ২ খ) ৩ গ) ১০ ঘ) ৮

৪. অক্সিজেন পরিবহনে সহায়তাকারী রক্ত কণিকার নাম কী ?
ক) লিম্ফোসাইট খ) মনোসাইট
গ) এরিথ্রোসাইট ঘ) থ্রোম্বোসাইট

৫. নিচের কোন প্রবাহ চিত্রটি সঠিক ?
ক) ট্রাকিয়া→ব্রঙ্কাই→ব্রঙ্কিওল→অ্যালভিওলার নালি →অ্যালভিওলরা থলি→ অ্যালভিওলাই
খ) ব্রঙ্কাই→ট্রাকিয়া→ব্রঙ্কিওল→অ্যালভিওলার নালি →অ্যালভিওলার থলি→অ্যালভিওলাই
গ) ট্রাকিয়া→অ্যালভিওলির থলি→ব্রঙ্কাই অ্যালভিওলার নালি→অ্যালভিওলার থলি → অ্যালভিওলাই
ঘ) ট্রাকিয়া→অ্যালভিওলার থলি→ব্রঙ্কাই→ব্রঙ্কিওল →অ্যালভিওলার নালি→অ্যালভিওলাই

৬. নবজাতক শিশুর ফুসে কত মিলিয়ন অ্যালভিলাই থাকে ? [য.বো.১৭]
ক) ২০ খ) ৩০
গ) ৪০ ঘ) ৫০

৭. ডান ফুসফুস কয়টি লোবিওলে বিভক্ত ? [সি.বো. ১৫]
ক) ২ খ) ৩
গ) ১০ ঘ) ৮

৯. শ্বসনতন্ত্রের কোন অংশে এপিগ্লটিস অবস্থিত ? [য.বো. ১৫]
ক) শ্বাসনালি খ) স্বরযন্ত্র
গ) গলবিল ঘ) ভেস্টিবিউল

১০. উপরের চিত্রের অঙ্গটির কাজ কী ?
ক) রোগ প্রতিরোধ খ) গ্যাসীয় পদার্থের বিনিময়
গ) ভারসাম্য রক্ষা ঘ) হরমোন নিঃসরণ

১১. শ্বসনতন্ত্রের কোন অংশে অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড বিনিময় হয় ? [রা.বো., দি.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো., ব.বো. ১৮]
ক) ট্রাকিওল খ) ট্রাকিয়া
গ) ব্রঙ্কাস ঘ) অ্যালভিওলাস

১২. মানব ভ্রূণে কত সপ্তাহ বয়স থেকে সারফেকটেন্ট ক্ষরণ শুরু হয় ? [ঢা.বো.১৮]
ক) ২১ খ) ২২
গ) ২৩ ঘ) ২৪

১৩. অ্যালভিওলাসে কোন ধরনের গ্যাসের বিনিময় ঘটে ?
ক) O_2 এবং CO_2 খ) O_2 এবং NO_2
গ) CO_2 এবং N_2 ঘ) O_2 এবং CO

১৪. মধ্যচ্ছদা নিচের দিকে নেমে আসলে কী ঘটে ?
ক) বক্ষ গহ্বরের ব্যাস হ্রাস পায়
খ) ফুসফুসের মধ্যকার বায়ুচাপ বৃদ্ধি পায়
গ) অরীয় পেশি সংকুচিত হয়
ঘ) ফুসফুস হতে বায়ু বের হয়ে যায়

১৫. ফুসফুসের প্রদাহকে কী বলা হয় ? [চ.বো. ১৫]
ক) ওটিটিস মিডিয়া খ) সাইনুসাইটিস
গ) এলার্জি ঘ) এমফাইসেমা

১৬. ওটিটিস মিডিয়া রোগের সংক্রমণ কোথায় ঘটে ?
ক) ফুসফুসে খ) পাকস্থলিতে
গ) মধ্যকর্ণে ঘ) বৃক্কে

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৭. রক্তে CO_2 এর পরিমাণ বেড়ে গেলে– [কু.বো.১৭]
(i) কেমোরিসেপ্টর উদ্দীপ্ত হয়
(ii) প্রশ্বাসের হার কমে যায়
(iii) দেহের এনজাইম ও প্রোটিন ধ্বংস হয়
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৮. অ্যালভিওলাস– [য.বো. ১৭]
(i) ফুসফুসের গঠন ও কার্যের একক
(ii) প্রাচীরে কোলাজেন তন্তু থাকে
(iii) জীবাণু ধ্বংস করে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৯. প্রশ্বাস কার্যক্রমে উত্তোলিত হয় [কু.বো. ১৭]
(i) ডায়াফ্রাম
(ii) স্টার্নাম
(iii) পর্শুকার শ্যাফট
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৬ মানব শারীরতত্ত্ব : বর্জ্য ও নিষ্কাশন
Human Physiology : Wastes & Elimination

অপচিতিমূলক বিপাক (catabolic metabolism) এর ফলে দেহে উৎপন্ন নাইট্রোজেনঘটিত দূষিত পদার্থকে **রেচন পদার্থ** বলে। যে প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেনঘটিত দূষিত পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশিত হয় তাকে **রেচন** (excretion) বলে এবং যে তন্ত্রের মাধ্যমে এসব বর্জ্য দেহ থেকে অপসারিত হয় তাকে বলা হয় **রেচন/ইউরিনারি/রেনাল তন্ত্র** (excretory/urinary/renal system)। মানুষের প্রধান রেচন পদার্থ হচ্ছে অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ইউরোক্রোম ইত্যাদি এবং প্রধান রেচন অঙ্গ হলো বৃক্ক। এ অধ্যায়ে বৃক্কের গঠন, কাজ ও এর জটিলতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)
- ❒ বৃক্ক ❒ নেফ্রন
- ❒ অসমোরেগুলেশন
- ❒ মূত্র ❒ ডায়ালাইসিস

পিরিয়ড সংখ্যা-৬ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. বৃক্কের গঠন ও কাজের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। ২. রেচনের শারীরবৃত্ত ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. মানব শরীরে রেচন ও অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের কার্যক্রমের যথার্থতা মূল্যায়ন করতে পারবে। ৪. বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের লক্ষণ ও ঐ মুহূর্তে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. রক্ত ও মূত্রে হরমোনের ক্রিয়া বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. **ব্যবহারিক :** বৃক্কের অনুচ্ছেদ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।	● বৃক্ক ○ গঠন ও কাজ ● রেচনের শারীরবৃত্ত ● বৃক্কের ভূমিকা ○ রেচন ○ অসমোরেগুলেশন ● বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল, লক্ষণ ও করণীয় ● হরমোনাল ক্রিয়া ○ মূত্রের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ ○ রক্তের পিএইচ নিয়ন্ত্রণ ● ব্যবহারিক ● বৃক্কের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ

মানুষের রেচনতন্ত্র (Human Excretory System)

রেচন পদার্থ নিষ্কাশনের জন্য মানবদেহে একটিমাত্র সুনির্দিষ্ট তন্ত্র রয়েছে যা **রেচনতন্ত্র** নামে পরিচিত। এর মাধ্যমেই শতকরা ৮০ ভাগ রেচন পদার্থ নিষ্কাশিত হয়। বাকি ২০ ভাগ রেচন পদার্থ বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে উৎপন্ন ও বিভিন্ন অঙ্গের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হয়। এসব অঙ্গ সহকারী রেচন অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।

মানুষের রেচনতন্ত্র –একজোড়া **বৃক্ক**, একজোড়া **ইউরেটার**, একটি **মূত্রথলি** ও একটি **মূত্রনালি** নিয়ে গঠিত।

১. বৃক্ক (Kidney) : বক্ষপিঞ্জরের ঠিক নিচে উদর গহ্বরের কটি অর্থাৎ কোমর অঞ্চল (lumbar region)-এ মেরুদণ্ডের দুপাশে একটি করে মোট দুটি বৃক্ক থাকে। বৃক্কের উপরের প্রান্ত দ্বাদশ থোরাসিক কশেরুকার নিচে এবং নিচের প্রান্ত তৃতীয় লাম্বার কশেরুকার উপরে অবস্থিত। উদর গহ্বরে যকৃতের অবস্থানের কারণে বাম বৃক্কটি ডান বৃক্কের তুলনায় সামান্য উপরে অবস্থিত। বৃক্ক দেখতে অনেকটা শিম বীজের মতো। এর পার্শ্বদেশ উত্তল, ভিতরের দিক অবতল।

২. রেচন নালি বা ইউরেটার (Ureter) : বৃক্কের পেলভিস থেকে সৃষ্টি হয়ে পৃষ্ঠউদরীয় প্রাচীর ঘেঁষে পশ্চাৎভাগে অগ্রসর হয়ে যে নালি মূত্রথলিতে উন্মুক্ত হয়েছে তাকে ইউরেটার বলে। প্রত্যেকটি নালি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার। এ নালি বৃক্ক থেকে মূত্রথলিতে মূত্র পরিবহন করে।

৩. মূত্রথলি (Urinary bladder) : মূত্রথলি পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট এবং **ডেট্রুসর** (detrusor) নামক অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে গঠিত একটি ত্রিকোণাকার থলি বিশেষ। এটি সংকোচন প্রসারণক্ষম। মূত্রথলি ৭০০-৭৫০ মিলিলিটার মূত্র ধারণ করতে পারে। তবে ২৮০-৩২০ মিলিলিটার মূত্র মূত্রথলিতে জমা হলেই ত্যাগের ইচ্ছা জাগে। মূত্র সাময়িকভাবে ধারণ করা ও সময়ে সময়ে নিষ্কাশন করা এর কাজ।

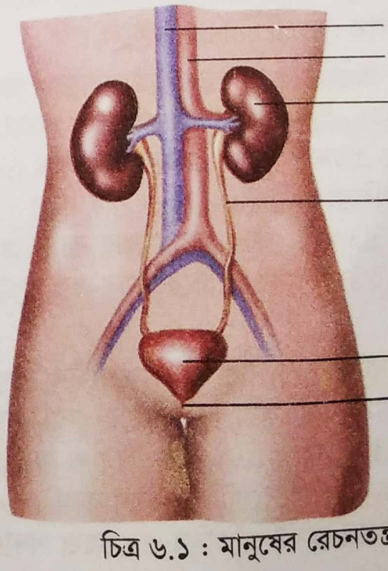

চিত্র ৬.১ : মানুষের রেচনতন্ত্র

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৪. মূত্রনালি বা ইউরেথ্রা (Urethra) : পুরুষে মূত্রথলির পশ্চাৎপ্রান্ত থেকে মূত্রনালি উৎপন্ন হয়ে লিঙ্গের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্যন্ত একটি ছিদ্রের মাধ্যমে বাইরে উন্মুক্ত। প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষে এ নালির দৈর্ঘ্য ১৮–১৯ সেন্টিমিটার। নারীদেহে মূত্রনালি একটি পৃথক ছিদ্রের মাধ্যমে দেহের বাইরে উন্মুক্ত এবং এর দৈর্ঘ্য মাত্র ৩.৫–৪ সেন্টিমিটার। মূত্র দেহের বাইরে নিষ্কাশন করা এর প্রধান কাজ। তাছাড়া পুরুষের ইউরেথ্রার মাধ্যমে বীর্য দেহের বাইরে নির্গত হয়।

বৃক্কের গঠন ও কাজ

বাহ্যিক গঠন : প্রতিটি বৃক্ক নিরেট, চাপা দেখতে অনেকটা শিম বীজের মতো এবং কালচে লাল রংয়ের। একটি পরিণত বৃক্কের দৈর্ঘ্য ১০–১২ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ৫–৬ সেন্টিমিটার এবং স্থূলত্ব ৩ সেন্টিমিটার। একেকটির ওজন পুরুষে ১৫০–১৭০ গ্রাম এবং নারীদেহে ১৩০–১৫০ গ্রাম। বৃক্কের বাইরের দিক উত্তল ও ভিতরের দিক অবতল। অবতল অংশের ভাঁজকে **হাইলাম** (hilum) বলে। হাইলামের মধ্য দিয়ে ইউরেটার ও রেনাল শিরা বহির্গত হয় এবং রেনাল ধমনি ও স্নায়ু বৃক্কে প্রবেশ করে। সম্পূর্ণ বৃক্ক **ক্যাপসুল** (capsule) নামক তন্তুময় যোজক টিস্যুর সুদৃঢ় আবরণে বেষ্টিত।

অন্তর্গঠন : বৃক্কের লম্বচ্ছেদে তিনটি সুস্পষ্ট অংশ দেখা যায় : বাইরে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত গাঢ় অঞ্চলটি **কর্টেক্স** (cortex), মধ্যখানে হালকা লাল রঙের **মেডুলা** (medulla) এবং ভিতরে সাদাটে **পেলভিস** (pelvis)।

বৃক্কের সর্ববহিঃস্থ ও শক্ত তন্তুময় যোজক টিস্যুতে এবং অসংখ্য রেনাল করপাসল (খালি চোখেও দেখা যায়) ও নেফ্রনের অংশবিশেষ নিয়ে কর্টেক্স গঠিত।

কর্টেক্সের নিচে হালকা লাল রঙের মেডুলা অংশ ৮–১৮টি পিরামিড আকৃতির অংশ নিয়ে গঠিত। এগুলো **রেনাল পিরামিড** (renal pyramid)। নেফ্রনের নালিকাময় অংশ ও রক্তবাহিকা নিয়ে একেকটি পিরামিড নির্মিত হয়। পিরামিডের গোড়া থাকে কর্টেক্সের দিকে, আর ১০-২৫টি ছিদ্রযুক্ত চূড়া বা প্যাপিলা (papilla) থাকে রেনাল পেলভিসে উন্মুক্ত। দুই রেনাল পিরামিডের কর্টেক্সের কিছু অংশ স্তম্ভের মতো মেডুলার গভীরে প্রবেশ করেছে। এগুলোকে **রেনাল কলাম** (renal column) বলে।

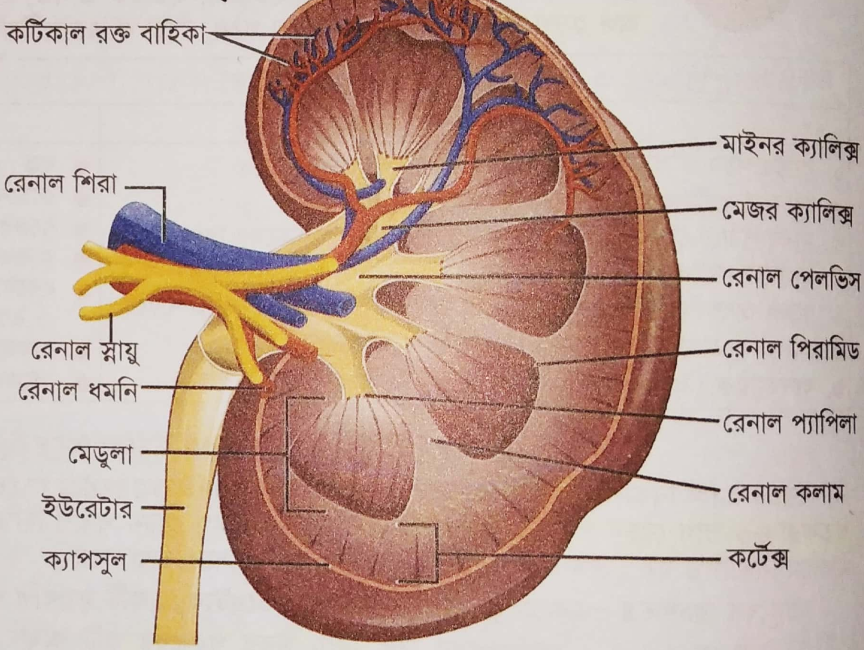

চিত্র ৬.২ : বৃক্কের লম্বচ্ছেদ

বৃক্কের অভ্যন্তরে অবস্থিত ইউরেটারের অংশটি উপর দিকে ফানেলের মতো প্রসারিত অংশে পরিণত হয়ে **রেনাল পেলভিস** (renal pelvis) গঠন করেছে। প্রশস্ত পেলভিসটি উপর দিকে কয়েকটি শখা-প্রশাখায় রূপ নিয়েছে। এর মধ্যে ২-৩টি হচ্ছে প্রধান শাখা যা **মেজর ক্যালিক্স** (major calyx) নামে পরিচিত। মেজর ক্যালিক্স বিভক্ত হয়ে মোট ৮–১৪টি **মাইনর ক্যালিক্স** (minor calyx) সৃষ্টি করে। বৃক্কে মূত্র সৃষ্টি হলে প্রথমেই তা রেনাল প্যাপিলা হয়ে মাইনর ক্যালিক্সে প্রবেশ করে। এখান থেকে মূত্র মেজর ক্যালিক্স হয়ে রেনাল পেলভিস অতিক্রম করে ইউরেটারে বাহিত হয়। ক্যালিক্স, পেলভিস ও ইউরেটারের প্রাচীরে এমন এক ধরনের সংকোচনশীল উপাদান থাকে যার প্রভাবে মূত্র মূত্রথলির দিকে ধাবিত হয়।

বৃক্কের কাজ : (i) রক্ত থেকে প্রোটিন বিপাকে সৃষ্ট নাইট্রোজেন জাত বর্জ্য অপসারণ করা। (ii) দেহে এবং রক্তে পানির ভারসাম্য রক্ষা করা। (iii) রক্তে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফেট এবং ক্লোরাইডসহ বিভিন্ন লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা। (iv) রক্তে অম্ল ও ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করা। (v) যথাযথ আয়নিক গঠন বজায় রাখা। (vi) হরমোন (যথা-এরিথ্রোপয়েটিন) ক্ষরণ করা। (vii) এনজাইম (যথা-রেনিন, renin) ক্ষরণ করা। (viii) রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা। (ix) দেহে প্রবিষ্ট প্রতিবিষ ও ভেষজ পদার্থসমূহকে দেহ থেকে অপসারণ করা।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বৃক্কের সূক্ষ্ম গঠন (Ultra structure of kidney)

বৃক্কের গাঠনিক ও কার্যিক একককে **নেফ্রন** (nephron) বলে। মানুষের প্রত্যেক বৃক্কে ১০ লক্ষ থেকে ১২ লক্ষ নেফ্রন রয়েছে। প্রতিটি নেফ্রন প্রায় ৩ থেকে ৫ সে.মি. লম্বা। এ হিসেবে প্রত্যেক বৃক্কে নেফ্রনের নালিকাগুলো সম্মিলিতভাবে ৩৬ কি.মি. (প্রায় ২২.৫ মাইল) এরও বেশি লম্বা হবে। এর ফলে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় ক্ষেত্র ব্যাপক বিস্তৃত হয়েছে। বৃক্কের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে রক্ত থেকে ১২৫ ঘন সেমি. তরল পদার্থ পরিশ্রুত হয়। প্রায় ৯৯% পানিই আবার রক্তে ফিরে যায়, সাধারণত প্রতি মিনিটে কেবল ১ ঘন সেমি. মূত্র সৃষ্টি হয়।

১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে **স্যার উইলিয়াম বোম্যান** (Sir Willium Bowman) প্রথম বৃক্কের সূক্ষ্ম গঠনের সঠিক বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর মতে– প্রত্যেক নেফ্রন ২টি প্রধান অংশে বিভক্ত– **রেনাল করপাসল** এবং **বৃক্কীয় নালিকা বা রেনাল টিউবিউলস**।

ক. রেনাল করপাসল (Renal corpuscle, বা ম্যালপিজিয়ান করপাসল বা ম্যালপিজিয়ান বডি): নেফ্রনের অগ্রপ্রান্তকে **রেনাল করপাসল** বলে। এটি বৃক্কের কর্টেক্সে অবস্থিত এবং **বোম্যানস ক্যাপসুল** (Bowman's capsule) ও **গ্লোমেরুলাস** (glomerulus) নিয়ে গঠিত।

i. **বোম্যানস ক্যাপসুল** : রেনাল করপাসলে গ্লোমেরুলার কৈশিকজালিকাগুচ্ছকে ঘিরে অবস্থিত ০.২ মিলিমিটার ব্যাসের ও আঁইশাকার এপিথেলিয়ামে গঠিত দ্বিস্তরী পেয়ালার মতো প্রসারিত অংশকে **বোম্যানস ক্যাপসুল** বলে। এর গ্লোমেরুলাস সংলগ্ন স্তরকে ভিসেরাল স্তর, বহিঃপ্রাচীরকে প্যারাইটাল স্তর এবং দুই স্তরের মাঝখানে সংকীর্ণ গহ্বরকে **ক্যাপসুলার স্পেস** (capsular space) বলে। ভিসেরাল স্তরটি **পোডোসাইট** (podocyte) নামক বিশেষ ধরনের প্রবর্ধনযুক্ত কোষে এবং প্যারাইটাল স্তর স্বাভাবিক আঁইশাকার এপিথেলিয়াল কোষে নির্মিত।

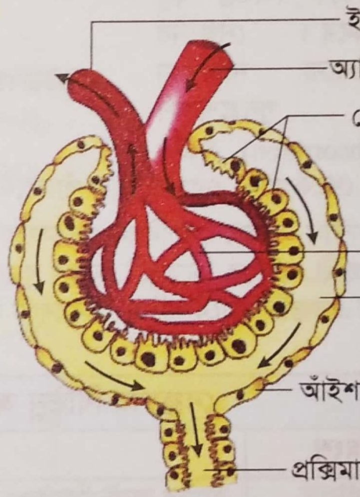

চিত্র ৬.৩ : একটি রেনাল করপাসল

ii. **গ্লোমেরুলাস** : বোম্যানস ক্যাপসুলের অভ্যন্তরে ঘনিষ্ঠভাবে গ্লোমেরুলাস অবস্থান করে। রেনাল ধমনি থেকে সৃষ্ট একটি ক্ষুদ্র **অন্তর্বাহী ধমনিকা** বা **অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল** (afferent arteriole) বোম্যানস ক্যাপসুলে প্রবেশ করে এবং ৫০-৬০টি কৈশিক জালিকায় বিভক্ত হয়ে গ্লোমেরুলাস গঠন করে। কৈশিকজালিকাগুলো পুনরায় মিলিত হয়ে **বহির্বাহী ধমনিকা বা ইফারেন্ট আর্টারিওল** (efferent arteriole) রূপে বোম্যানস ক্যাপসুল থেকে বেরিয়ে আসে। ইফারেন্ট আর্টারিওলের ব্যাস অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলের চেয়ে কম হওয়ার কারণে গ্লোমেরুলাসে সর্বদা উচ্চ রক্তচাপ বজায় থাকে।

রেনাল করপাসল-এ রক্তের আল্ট্রাফিল্ট্রেশন ঘটে এবং রক্ত থেকে রেচন বর্জ্য, পানি ও অন্যান্য দ্রব্য পরিস্রুত হয়ে **গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট** (glumerular filtrate) হিসেবে বোম্যানস ক্যাপসুলে জমা হয়।

খ. বৃক্ক নালিকা বা রেনাল টিউবিউলস (Renal tubules) : এটি নেফ্রনের পশ্চাৎ অংশ এবং বোম্যানস ক্যাপসুলের পিছন থেকে সৃষ্টি হয়ে সংগ্রাহী নালি পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রত্যেক রেনাল টিউবিউল প্রায় ৩ সেন্টিমিটার লম্বা এবং গড় ব্যাস প্রায় ৬০ মাইক্রোমিটার। এটি নিচে বর্ণিত ৩টি অংশে বিভক্ত।

i. নিকটবর্তী বা প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকা (Proximal convoluted tubule) : বোম্যানস ক্যাপসুলের সাথে সংযুক্ত এটি প্রায় ১৪ মিলিমিটার লম্বা প্যাঁচানো নালিকা। রেনাল টিউবিউলের এ অংশ বৃক্কের কর্টেক্সে অবস্থিত। এর প্রাচীর একস্তরী এপিথেলিয়াল কোষে গঠিত। কোষগুলোর একপ্রান্তে অসংখ্য অতিআণুবীক্ষণিক আঙুলের মতো অভিক্ষেপ বা **মাইক্রোভিলাই** (microvilli) থাকে।

ii. নেফ্রন ফাঁস বা হেনলির লুপ (Loop of Henle): প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকার শেষ প্রান্ত সোজা হয়ে বৃক্কের মেডুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং একটি U আকৃতির ফাঁস বা **লুপ** (loop) গঠন করে পুনরায় কর্টেক্স অঞ্চলে ফিরে আসে। এর আবিষ্কারক জার্মান চিকিৎসক Friedrich Gustav Jakob Henle-র নামানুসারে একে **হেনলির লুপ** বলা হয়। এর নিম্নগামী নালিকে **ডিসেন্ডিং বাহু** (descending limb) এবং ঊর্ধ্বগামী নালিকে **অ্যাসেন্ডিং বাহু** (ascending limb) বলে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

iii. দূরবর্তী বা ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা (Distal convoluted tubule) : হেনলির লুপ-এর পরবর্তী এ প্যাঁচানো নালিকা প্রায় ৫ মিলিমিটার লম্বা এবং এটি বৃক্কের কর্টেক্সে অবস্থান করে। এর শেষপ্রান্ত সংগ্রাহী নালির সাথে যুক্ত থাকে। এর প্রাচীর একস্তরী এপিথেলিয়াম কোষে গঠিত।

রেনাল টিউবিউলের বৃক্ক নালিকা প্রক্সিমাল ও ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা সূক্ষ্ম কৈশিকজালিকা বা **পেরিটিউবিউলার রক্তজালক** (peritubular capillaries) দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। এগুলো নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন বস্তু পুনঃশোষণ করে। নেফ্রনের প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকায় **নির্বাচনমূলক পুনঃশোষণ** (selective reabsorption) ঘটে। এর হেনলির লুপ থেকে পানি এবং ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা থেকে সামান্য পানি ও অন্যান্য বস্তু পুনঃশোষিত হয়।

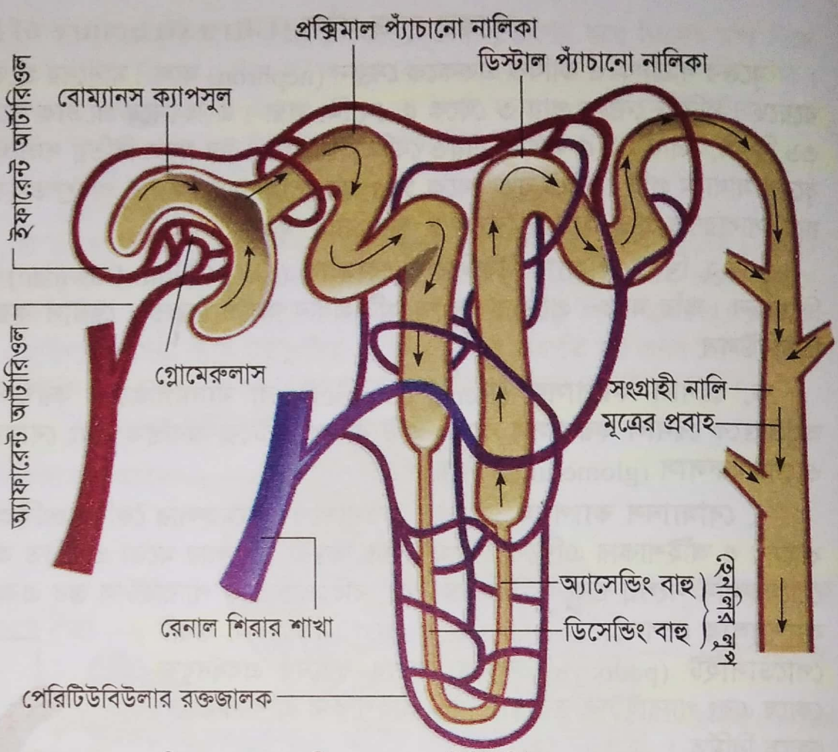

চিত্র ৬.৪ : একটি নেফ্রন (পেরিটিউবিউলার রক্তজালকসহ)

নেফ্রনের ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা যে সোজা নালির সাথে যুক্ত থাকে তাকে **সংগ্রাহী নালি** (collecting duct) বলে। একটি সংগ্রাহী নালিতে কয়েকটি নেফ্রন যুক্ত থাকে। এর কিছু অংশ কর্টেক্সে এবং কিছু অংশ মেডুলায় অবস্থান করে। এর প্রাচীর একস্তরী কোষে গঠিত। কয়েকটি সংগ্রাহী নালি মিলিত হয়ে **ডাক্ট অব বেলিনি** (duct of Bellini) গঠন করে।

নেফ্রনের বিভিন্ন অংশ ও সংগ্রাহী নালির কাজের ছক

নেফ্রনের অংশ	কাজ
১. রেনাল করপাসল	রক্তের আল্ট্রাফিল্ট্রেশন ঘটে। রক্ত থেকে প্রতি মিনিটে ১২৫ মিলিলিটার রেচন বর্জ্য, পানি ও অন্যান্য দ্রব্য পরিস্রুত হয়ে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট হিসেবে বোম্যানস ক্যাপসুলে জমা হয়।
২. প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকা	ফিল্ট্রেশন : Na^+, Cl^-, H_2O. পুনঃশোষণ : HCO_3^-, K^+, গ্লুকোজ, HPO_4^{2-}, অ্যামিনো এসিড, ইউরিক এসিড, ইউরিয়া। ক্ষরণ : H^+, NH_4^+, জৈব এসিড, ক্ষার।
৩. হেনলির লুপ	পুনঃশোষণ : H_2O, Na^+, Cl^-, K^+, Ca^{2+}.
৪. ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা	ক্ষরণ : Na^+, Cl^-, HCO_3^-, H_2O, H^+, NH_4^+, K^+.
৫. সংগ্রাহী নালি	পুনঃশোষণ : Na^+, Cl^-, H_2O, ইউরিয়া। ক্ষরণ : H^+, NH_4, K^+।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

রেচনের শারীরবৃত্ত (Physiology of Excretion)

আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে দেহে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্যপদার্থ সৃষ্টি হয়। এসব বর্জ্য দেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং যতশীঘ্র সম্ভব দেহ থেকে নিষ্কাশন করা অত্যাবশ্যক। মানুষের প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত রেচন বর্জ্য হলো– ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি। এর মধ্যে ইউরিয়ার পরিমাণ সর্বাধিক এবং এটি মূত্রের সাথে দেহ থেকে বেরিয়ে যায়। যকৃতে ইউরিয়া উৎপন্ন হয় এবং রক্তের মাধ্যমে পরিবাহিত হয়ে বৃক্কে পৌঁছায়। বৃক্কে মূত্র তৈরি হয়। রেচনে এরূপ ইউরিয়ার আধিক্য থাকাকে **ইউরিওটেলিজম** (ureotelism) বলে। যেসব প্রাণীতে ইউরিওটেলিজম দেখা যায় তাদের **ইউরিওটেলিক প্রাণী** (ureotelic animal) বলা হয়। মানুষ ইউরিওটেলিক হওয়ার কারণে রেচনের শারীরবৃত্তকে তাই দুটি শিরোনামে আলোচনা করা হলো :

ক. নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য উৎপাদন এবং **খ. মূত্র সৃষ্টি**।

ক. নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য উৎপাদন (Production of Nitrogenous waste)

আমিষ খাদ্য পরিপাক হয়ে অ্যামিনো এসিডে পরিণত হয়। অ্যামিনো এসিড প্রধানত দেহ গঠন ও বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়। যকৃতে অব্যবহৃত ও অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড থেকে **ডিঅ্যামাইনেজ** এনজাইমের উপস্থিতিতে **ডিঅ্যামিনেশন** (deamination) প্রক্রিয়ায় অ্যামিনো গ্রুপ ($-NH_2$) হয়ে কিটো এসিড ও NH_2 সৃষ্টি করে। কিটো এসিড শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। অ্যামিনো গ্রুপ পরিবর্তিত হয়ে NH_3 (অ্যামোনিয়া) উৎপন্ন করে।

১. আমিষ খাদ্য $\xrightarrow{\text{এনজাইম}}$ অ্যামিনো এসিড

২. অ্যামিনো এসিড $\xrightarrow{\text{ডিঅ্যামিনেশন}}$ কিটো এসিড + $-NH_2$

৩. $-NH_2 + H^+ \longrightarrow NH_3$ (অ্যামোনিয়া)

৪. $2NH_3 + CO_2 \xrightarrow{\text{অরনিথিন চক্র}} CO(NH_2)_2$ (ইউরিয়া) + H_2O

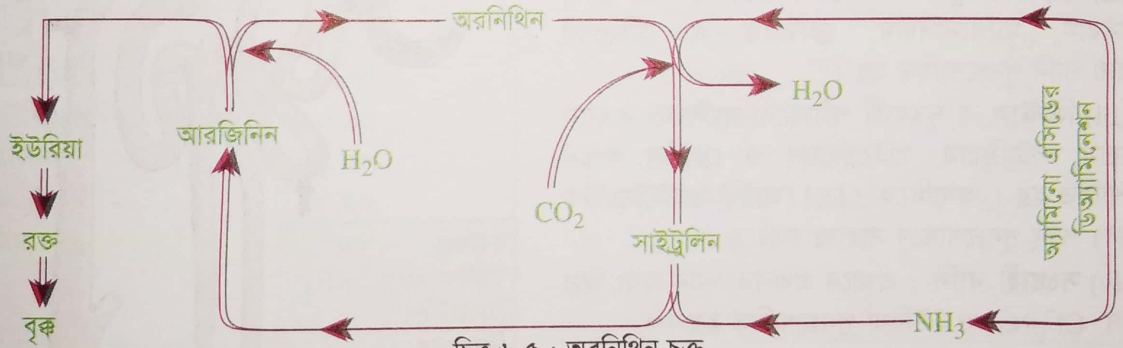

চিত্র ৬.৫ : অরনিথিন চক্র

NH_3 অত্যন্ত বিষাক্ত যা CO_2 এর সাথে মিলিত হয়ে যকৃতে অরনিথিন চক্রের (ornithine cycle) মাধ্যমে কম ক্ষতিকর ও পানিতে দ্রবণীয় **ইউরিয়া** (urea)-য় পরিণত হয়। এটি ইউরিয়া চক্র নামেও পরিচিত। ইউরিয়া প্লাজমায় (রক্তরসে) অবস্থান করে এবং সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে বৃক্কে পৌঁছায়।

খ. মূত্র সৃষ্টি (Formation of Urine)

স্কটিশ শারীরবিজ্ঞানী Arthur Robertson Cushney (1917)-র মতে, নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ রক্তের মাধ্যমে বৃক্কে আসার পর তিনটি ধাপে মূত্র সৃষ্টি হয়, যথা: **(১) অতিসূক্ষ্ম পরিস্রাবণ, (২) টিউবিউলার পুনঃশোষণ** এবং **(৩) সক্রিয় ক্ষরণ**। নিচে ধাপগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. অতিসূক্ষ্ম পরিস্রাবণ বা আল্ট্রাফিল্ট্রেশন (Ultrafiltration): মূত্র তৈরির প্রথম ধাপ হচ্ছে রক্তের অতিসূক্ষ্ম পরিস্রাবণ। নেফ্রনের রেনাল করপাসলে এ পদ্ধতি সংঘটিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় হৃৎপিণ্ড থেকে পৃষ্ঠীয় ধমনি, রেনাল ধমনি এবং অ্যাফারেন্ট আর্টারিওলের মাধ্যমে রক্ত অতি উচ্চ চাপে গ্লোমেরুলাসে প্রবেশ করে। সাধারণত অ্যাফারেন্ট

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

আর্টারিওলের তুলনায় ইফারেন্ট আর্টারিওলের ব্যাস সংকীর্ণ হওয়ায় গ্লোমেরুলাসে রক্তের উচ্চ চাপ সৃষ্টি হয়। এ হাইড্রোস্ট্যাটিক চাপে রক্তের প্রোটিন ও রক্তকণিকা ছাড়া সমস্ত পানি, লবণ, শর্করা, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড প্রভৃতি কৈশিক জালিকার এন্ডোথেলিয়াম ও ভিত্তিঝিল্লি এবং রেনাল ক্যাপসুলের এপিথেলিয়াম ভেদ করে **ক্যাপসুলার স্পেস**-এ জমা হয়। এ পরিস্রুত তরলকে **গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট** (glomerular filtrate) বা **প্রাথমিক মূত্র** বলে। মানবদেহের দুটি বৃক্কের মাধ্যমে প্রতি মিনিটে প্রায় 1200 ml/CC রক্ত প্রবাহিত হয়। এ রক্ত থেকে প্রায় 125 ml গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট (পরিস্রুত) উৎপন্ন হয়ে বোম্যানস ক্যাপসুল-এ জমা হয়। অন্যদিকে পরিস্রুত রক্ত পরে ইফারেন্ট আর্টারিওলে প্রবেশ করে। যে চাপের মাধ্যমে রক্তের দ্রাব্য বস্তু পরিস্রুত হয়, তাকে বলে **কার্যকর পরিস্রাবণ চাপ** (effective filtration pressure)। পরিস্রাবণ প্রক্রিয়াটি চাপ প্রয়োগের ফলে সংঘটিত হয় বলে একে **আল্ট্রাফিল্ট্রেশন** বলা হয়।

২. টিউবিউলার পুনঃশোষণ (Tubular reabsoption) বা **নির্বাচিত পুনঃশোষণ** (Selective reabsorption): বোম্যানস ক্যাপসুল থেকে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট বৃক্ক নালিকা বা রেনাল টিউবিউলে প্রবেশ করে। এখানে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেটের ৮০% নির্বাচিত পদার্থ পুনঃশোষিত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে। টিউবিউলের প্রাচীরের কোষগুলো পুনঃশোষণের জন্য বিশেষভাবে অভিযোজিত। যেমন- (i) কোষগুলোর একপাশে মাইক্রোভিলাই ও বেসাল চ্যানেল থাকায় এদের শোষণতল বেশি, (ii) সাইটোপ্লাজমে বেশি সংখ্যক মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে এবং (iii) রক্তের কৈশিক জালিকার সাথে ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে।

রেনাল টিউবিউলসের বিভিন্ন অংশে যেসব পদার্থের পুনঃশোষণ হয় তা হলো –

(i) **প্রক্সিমাল বা নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকা** : এখানে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটের ৬০% পুনঃশোষিত হয়। গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ভিটামিন, হরমোন, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্লোরাইড, ফসফেট, বাইকার্বোনেট, পানি, কিছু ইউরিয়া ইত্যাদি এ অংশে পুনঃশোষিত হয়।

(ii) **হেনলির লুপ** : এখানে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরাইড ও অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি পুনঃশোষিত হয়।

(iii) **ডিস্টাল বা দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা**: এখানে সোডিয়াম, পটাসিয়াম, হাইড্রোজেন ও ক্লোরিন আয়ন পুনঃশোষিত হয়। অন্যদিকে ADH (অ্যান্টি ডাইইউরেটিক হরমোন) পানি পুনঃশোষণে সাহায্য করে।

(iv) **সংগ্রাহী নালি** : এখানে প্রধানত পানি এবং অল্প পরিমাণ Cl^-, Na^+ ও ইউরিয়া পুনঃশোষিত হয়।

৩. সক্রিয় ক্ষরণ (Active secretion) : বিপাক ক্রিয়ায় সৃষ্ট কিছু অপ্রয়োজনীয় উপজাত পদার্থ, যথা–ক্রিয়েটিনিন ও কিছু ইউরিয়া প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকার চারপাশে রক্তজালক থেকে সক্রিয় ক্ষরণের মাধ্যমে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেটের সাথে যুক্ত হয়। ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকায় হাইড্রোজেন আয়ন, পটাসিয়াম ও অ্যামোনিয়াম আয়ন, সেরোটোনিন, কোলিন, হিস্টামিন ইত্যাদি ক্ষরিত হয়ে ফিলট্রেটের সাথে মিশে **মূত্রে** (urine) পরিণত হয়। উৎপন্ন মূত্র অতঃপর সংগ্রাহী নালিকা, ইউরেটার হয়ে মূত্রথলি এবং মূত্রথলি থেকে মূত্রনালির মাধ্যমে বাইরে নিষ্কাশিত হয়।

মূত্র বা নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশনের গতিপথ নিচে দেখানো হলো :

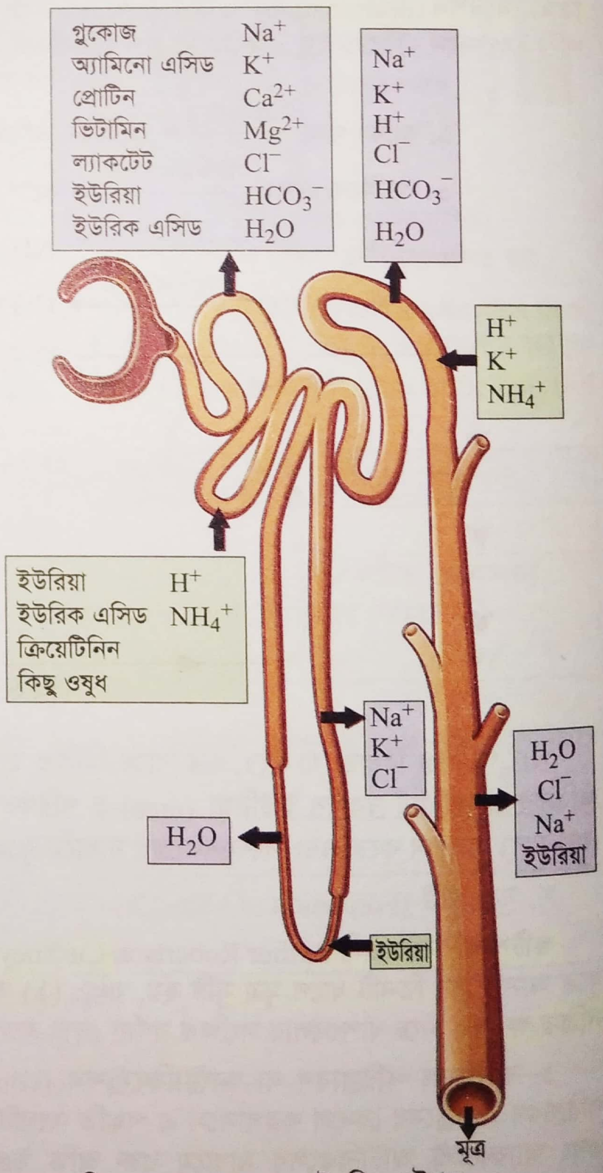

চিত্র ৬.৬ : নেফ্রনে মূত্র তৈরির কৌশল

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

হৃৎপিণ্ড→অ্যাওর্টা→পৃষ্ঠীয় মহাধমনি→রেনাল ধমনি→অ্যাফারেন্ট আর্টারিওল→গ্লোমেরুলাস→বোম্যান্স ক্যাপসুলের গহ্বর→রেনাল টিউবিউলস→সংগ্রাহী নালি→বৃক্কের পেলভিস→ইউরেটার→মূত্রথলি→মূত্রনালি → রেচন ছিদ্র→দেহের বাইরে নিষ্কাশন।

মূত্র (Urine)

নেফ্রনের রেনাল টিউবিউলসে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেটের নির্বাচিত পুনঃশোষণের পর যে খড় বর্ণের, তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত ও অম্লধর্মী তরল রেচন বর্জ্য মূত্রথলিতে জমা হয় তাকে **মূত্র** বলে। একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক গড়ে ১.৫ লিটার মূত্র ত্যাগ করে। তবে কিছু কারণে এ পরিমাণ প্রভাবিত হয়ে থাকে। যেমন–খাদ্যে তরল পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকলে মূত্রের মাত্রা বৃদ্ধি পায় ও শরীরে ঘাম বেশি হলে মূত্রের পরিমাণ কমে যায়। খাদ্যের প্রকৃতিও অনেক সময় মূত্রের পরিমাণের পার্থক্য ঘটায়। লবণাক্ত খাদ্য সাধারণত মূত্রের পরিমাণ বাড়ায়। বহুমূত্র (diabetes), বৃক্ক প্রদাহ (nephritis) প্রভৃতি রোগ প্রস্রাবের হার ও মাত্রা উভয়কে প্রভাবিত করে। কিছু দ্রব্য মূত্রের স্বাভাবিক প্রবাহকে বাড়িয়ে দেয়। এসব দ্রব্য **ডাইইউরেটিকস** (diuretics) বা **মূত্রবর্ধক** নামে পরিচিত। পানি, লবণাক্ত পানি, চা ও কফি এ ধরনের দ্রব্য।

মূত্রের বৈশিষ্ট্য

১. **পরিমাণ :** প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের বৃক্কে দৈনিক ০.৫ থেকে ২.৫ লিটার মূত্র উৎপন্ন হয়।

২. **বর্ণ :** মূত্রে **ইউরোক্রোম** নামক রঞ্জক পদার্থ থাকায় এটি খড় (হালকা হলুদ) বর্ণের হয়।

৩. **গন্ধ :** মূত্রের গন্ধ অনেকটা ঝাঁঝালো। দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ **ইউরিনোড** (C_6H_8O)-এর উপস্থিতির জন্য মূত্রে এরূপ গন্ধ হয়।

৪. **রাসায়নিক ধর্ম :** মূত্র সামান্য অম্লীয়; এর pH মান ৫.০ - ৬.৫।

৫. **আপেক্ষিক গুরুত্ব :** মূত্রের স্বাভাবিক আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০০৮ – ১.০৩০।

মূত্রের উপাদান (Composition of urine)

মূত্রের রাসায়নিক উপাদানের মধ্যে ৯৫% (৯৫-৯৭%) পানি এবং ৫% (৩-৫%) কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের মধ্যে জৈব ও অজৈব উপাদান রয়েছে। নিচে ছক আকারে জৈব ও অজৈব উপাদানগুলো দেখানো হলো।

জৈব উপাদান	শতকরা হার	অজৈব উপাদান	শতকরা হার
ইউরিয়া	২	সোডিয়াম	০.৩৫
ইউরিক এসিড	০.০৫	পটাসিয়াম	০.১৫
হিপপিউরিক এসিড	০.০৫	ক্যালসিয়াম	০.০৩
ক্রিয়েটিনিন	০.০৭	অ্যামোনিয়াম	০.০৪
কিটোন বডিস	০.০২	ম্যাগনেসিয়াম	০.০১
ক্রিয়েটিন	০.০১	ক্লোরাইড	০.৬০
		সালফেট	০.১৮
		ফসফেট	০.২৭

এছাড়াও মূত্রে আয়োডিন, সিসা, আর্সেনিকসহ অন্যান্য উপাদান পাওয়া যায়।

রেচন ও অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা

কোষ থেকে নাইট্রোজেনঘটিত বিপাকীয় বর্জ্যের অপসারণের আরেক নাম **রেচন**। বিপাকীয় বর্জ্য দেহের জন্য অপ্রয়োজনীয়। দেহকোষ, টিস্যু ও অঙ্গে যে অসংখ্য রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে তার ফলে দেহের জন্য ক্ষতিকর যেসব বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় তা রেচনে এবং দেহের অসমোরেগুলেশনে (রক্তে পানি ও আয়নসাম্য রক্ষা) বৃক্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নিম্নে রেচন ও অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা উল্লেখ করা হলো।

রেচনে বৃক্কের ভূমিকা (Role of Kidney in Excretion)

বৃক্ক প্রধানত নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশন করে। আমিষ জাতীয় খাদ্য বিপাকের ফলে দেহে নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য সৃষ্টি হয়। অ্যামোনিয়া, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি মানুষের প্রধান নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য। এদের **রেচন বর্জ্য** বলে। এগুলো রক্তের মাধ্যমে সারাদেহে প্রবাহিত হয়। এগুলো বিষাক্ত ও দেহের জন্য ক্ষতিকর। তাই এসব রেচন পদার্থ দেহ থেকে নিষ্কাশন করা অত্যাবশ্যক। বৃক্ক এসব রেচন পদার্থ দেহ থেকে অপসারণ করে দেহকে সুস্থ রাখে। নিম্নলিখিত উপায়ে বৃক্ক এসব বর্জ্য নিষ্কাশনে করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১. ইউরিয়া বর্জ্য : আমিষ জাতীয় খাদ্য পরিপাক হয়ে অ্যামিনো এসিডে পরিণত হয়। অ্যামিনো এসিড প্রধানত দেহ গঠন ও বৃদ্ধির কাজ করে থাকে। অ্যামিনো এসিডের বৈশিষ্ট্য হলো দেহে যতটুকু অ্যামিনো এসিড প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই ব্যবহৃত হতে পারে, অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড দেহে সঞ্চিত থাকতে পারে না।

অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড যকৃতে ডি-অ্যামাইনেজ এনজাইমের উপস্থিতিতে **ডি-অ্যামিনেশন** (deamination) প্রক্রিয়ায় কিটো এসিড ও অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) সৃষ্টি করে। কিটো এসিড শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং অ্যামিন মূলক ($-NH_2$) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এর সাথে যুক্ত হয়ে অ্যামোনিয়া (NH_3) সৃষ্টি করে। অ্যামোনিয়া (NH_3) অত্যন্ত বিষাক্ত। এটি CO_2 এর সাথে যুক্ত হয়ে যকৃতে অরনিথিন চক্রের মাধ্যমে কম ক্ষতিকারক ও পানিতে দ্রবণীয় ইউরিয়াতে পরিণত হয়। ইউরিয়া রক্তের প্লাজমায় অবস্থান করে এবং সংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে বৃক্কে পৌঁছে। এরপর মূত্র সৃষ্টির মাধ্যমে দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়।

২. ইউরিক এসিড বর্জ্য : যকৃতের কোষে নিউক্লিক এসিডের পিউরিন ক্ষারক বিপাকের ফলে ইউরিক এসিড সৃষ্টি হয়। এটি ইউরিয়া অপেক্ষা কম বিষাক্ত। ইউরিক এসিড রক্তের মাধ্যমে বৃক্কে পৌঁছে এবং দেহ থেকে বহিষ্কৃত হয়।

৩. ক্রিয়েটিনিন বর্জ্য : দেহের পেশিতে অবস্থিত **ক্রিয়েটিন** (creatine) নামক অ্যামিনো এসিডের বিপাকের ফলে ক্রিয়েটিনিন বর্জ্য সৃষ্টি হয়। দেহে বিদ্যমান প্রায় ২% ক্রিয়েটিন বিপাক প্রক্রিয়া পেশিতে শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং ক্রিয়েটিনিন সৃষ্টি করে। ক্রিয়েটিনিন রক্তের মাধ্যমে বৃক্কে পৌঁছে। বৃক্কে রক্ত থেকে ক্রিয়েটিনিন পরিস্রুত হয়ে মূত্রের সাথে দেহ থেকে বের হয়ে যায়। রক্তে ক্রিয়েটিনিনের মাত্রা দ্বারা বৃক্কের সুস্থ্যতা নির্ণয় করা হয়। তাই রক্তের ক্রিয়েটিনিন মাত্রাকে **বৃক্কের রোগ নির্ণয়ের নির্দেশক** (diagnostic index of kidney) হিসেবে গণ্য করা হয়। রক্তে ক্রিয়েটিনিন স্বাভাবিক মাত্রা পুরুষের 0.6 - 1.2 mg/dl এবং মহিলাদের 0.5 - 1.1 mg/dl. অন্যান্য বর্জ্য বৃক্কের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষ, অতিরিক্ত ঔষধ, হরমোন ইত্যাদিও মূত্রের সাথে বহিষ্কৃত হয়।

অসমোরেগুলেশনে বৃক্কের ভূমিকা (Role of Kidney in Osmoregulation)

অসমোরেগুলেশন প্রক্রিয়া বলতে জীবন্ত কোষ বা দেহের অন্তঃ ও বহিঃপরিবেশের মধ্যে অভিস্রবণিক চাপের **সমতা রক্ষাকে বুঝায়**। বৃক্ক দেহের **অভ্যন্তরীণ** পরিবেশের স্থিতি বজায় রাখতে (homeostasis) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেহের পানি ও সোডিয়াম, পটাসিয়াম লবণ এবং ক্লোরাইড আয়নের মধ্যে একটি আন্তরসাম্য রক্ষা প্রক্রিয়াকে **অসমোরেগুলেশন** বলা হয়। দেহে অন্তঃঅভিস্রবণিক চাপের সমতা বিধান দেহের জন্য অপরিহার্য। এতে করে দেহ তরল (body fluid) খুব ঘনও হয়না আবার খুব হালকাও হয়না। দেহের মধ্যস্থ তরল পদার্থ ও দ্রবীভূত লবণসমূহের ঘনত্বের উপর অভিস্রবণ প্রক্রিয়া নির্ভর করে। কোষের অভ্যন্তরের তরল পদার্থ এবং কোষের বাইরে, যেমন-রক্তের প্লাজমা অংশ, টিস্যুরস ও লিম্ফ ইত্যাদি তরল পদার্থের গঠন একটি সুনির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

দেহে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পানি ও লবণের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যেমন, শ্বসনের মাধ্যমে কিছু পানি হারিয়ে যায়। ঘাম নিঃসরণের মধ্য দিয়ে শরীর থেকে কিছু পরিমাণ পানি নিষ্কাশিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেহ তরলের অভিস্রবণিক চাপের তেমন তারতম্য ঘটে না। কারণ বৃক্ক এই অভিস্রবণিক চাপকে তেমন বাড়তে বা কমতে দেয় না। মূত্রের সঠিক পরিমাণকে বজায় রেখে বৃক্ক দেহ তরলের পরিমাণ ও অভিস্রবণিক চাপকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন– খুব বেশি পরিমাণ পানি এক সঙ্গে পান করা হলে ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিমাণ মূত্র ত্যাগ হয়। এরপর মূত্রের পরিমাণ স্বাভাবিক হয়ে আসবে। বৃক্ক জানে কি পরিমাণ অতিরিক্ত পানি গ্রহণ করা হয়েছিল, আর প্রায় সেই পরিমাণ পানি শরীর থেকে নিষ্কাশিত করতে হবে।

অসমোরেগুরেশন পদ্ধতি : দেহে পানির সমতা রক্ষা করার জন্যে **অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন** (Antidiuretic Hormone, ADH) নামক একটি হরমোন রয়েছে। ADH-কে **ভ্যাসোপ্রেসিন** (vasopressin)-ও বলা হয়। দেহের পানির পরিমাণ কম হলে রক্তে ADH এর পরিমাণ বেড়ে যায়, ফলে বৃক্ক অল্প পরিমাণ (মিনিটে ০.৫ মিলিলিটার) মূত্র উৎপন্ন করে এবং দেহের পানির পরিমাণ ঠিক রাখে। অন্যদিকে কোন কারণে পানির আধিক্য দেখা দিলে রক্তে ADH অতিমাত্রায় কমে যায় এবং দেহের পানির পরিমাণ বেড়ে যায় কারণ বৃক্কে পানি শোষণের ক্ষমতা কমে যায়। এ অবস্থায় মূত্রের পরিমাণ প্রতি মিনিটে ১৬ মিলিলিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। মস্তিষ্কের গোড়ায় **হাইপোথ্যালামাস** অংশে কিছু স্নায়ুকোষ এ ADH ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। এখান থেকে **নিউরোসিক্রেশন** (neurosecretion) পদ্ধতির মাধ্যমে নিঃসৃত ADH পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থির মধ্যে পরিবাহিত হয় এবং রক্তে অবমুক্ত হয়। হাইপোথ্যালামাসের মধ্যে উপস্থিত **অসমোরিসেপ্টর** (osmoreceptor) নামক স্নায়ুকোষ দেহ তরলের অভিস্রবণিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল, লক্ষণ ও করণীয় (Acute Kidney Failure, Symptoms and Measures)

বয়স বাড়ার সাথে সাথে বৃক্কের কাজকর্মেও (বিশেষ করে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ায়) পরিবর্তন ঘটে, সক্ষমতা ধীরে ধীরে কমে আসে। বলা হয়ে থাকে, ৭০ বছর বয়স্ক মানুষের বৃক্ক মাত্র ৫০% কাজে সক্ষম থাকে। রোগ-ব্যাধির কারণে বৃক্কের সক্ষমতা কমে যাওয়াকে **বৃক্ক বিকল** (kidney failure) বলে। বৃক্কের বৈকল্য দুভাবে দেখা দিতে পারে, একটি হচ্ছে **দীর্ঘক্ষণিক** (chronic), অন্যটি **তাৎক্ষণিক** (acute)।

বৃক্কের বৈকল্য ঘটতে যদি কয়েক বছর লেগে যায় (অর্থাৎ ধীরে ধীরে বিকল হতে থাকে) তখন তা **দীর্ঘক্ষণিক বিকল**। অন্যদিকে, মাত্র ৪৮ ঘন্টার মধ্যে যখন বৃক্ক দেহের বর্জ্যপদার্থ অপসারণে, পানিসাম্য ও ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে অক্ষম হয়ে পড়ে তখন বৃক্কের এ অবস্থাকে বৃক্কের **তাৎক্ষণিক বিকল** বলে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। কারণ বৃক্ক বিকলের ফলে দেহে যে পটাশিয়াম আয়ন উৎপন্ন হয় তা অপসারিত হয় না ফলে রক্তে K^+ এর পরিমাণ বেড়ে যায় যা হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করে দিতে পারে।

যেহেতু মানবদেহে দুটি বৃক্ক থাকে তাই একটি বৃক্ক ক্ষতিগ্রস্ত হলে অন্যটি যদি সুস্থ থাকে তাহলে সুস্থ বৃক্কই দুটি বৃক্কের কাজ সম্পন্ন করে।

এ উপঅধ্যায়ে সিলেবাসভুক্ত বৃক্কের শুধু তাৎক্ষণিক বিকল, লক্ষণ ও করণীয় সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের কারণ

বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকলের কারণগুলো হচ্ছে–

i. ডিহাইড্রেশন;
ii. বড় কোনো ক্ষত থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে বৃক্কে রক্ত প্রবাহ কমে গেলে;
iii. অতিমাত্রায় ডায়ারিয়া ও বমির কারণে;
iv. শক, হার্ট অ্যাটাক, অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, ভুল রক্ত দেয়ার জন্য, মারাত্মক অগ্নিদগ্ধ হওয়ায়, রক্ত প্রবাহ কমে গেলে;
v. বৃক্কে পাথর, মূত্রনালিতে টিউমার বা জন্মগত ত্রুটি থাকলে, পুরুষে প্রোস্টেট গ্রন্থি বড় হয়ে গেলে;
vi. অতি মাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক (যেমন-জেন্টামাইসিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন), ব্যাথানাশক ঔষধ (যেমন-অ্যাসপিরিন, আইবুপ্রোফেন), রক্তচাপের ঔষধ (যেমন-এসিই ইনহিবিটর) সেবনে;
vii. বিষাক্ত পদার্থ, যেমন কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, আর্সেনিক, লেড, মার্কারি ইত্যাদি গ্রহণে; এবং
viii. বৃক্কের টিস্যু ও পরিস্রাবক এককগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হলে।

বৃক্ক বিকলের লক্ষণ

তাৎক্ষণিক বৃক্ক বিকল-এর লক্ষণগুলো হচ্ছে–

i. অতি অল্প, ঘন ও গাঢ় মূত্র ত্যাগ বা মূত্র একেবারেই না হওয়া;
ii. রক্তে নাইট্রোজেনজাত বর্জ্যপদার্থ সঞ্চিত হওয়া;
iii. শরীর ফুলে যাওয়া (অতিরিক্ত পানি দেহে জমে যাওয়ায়);
iv. পাঁজর ও কোমরের মাঝামাঝি দুপাশে ব্যথা (flank pain);
v. ক্ষুধামান্দ্য, বমি-বমিভাব ও বমি করা;
vi. উচ্চ রক্তচাপ;
vii. রক্ত পায়খানা;
viii. হাত-পায়ে সংবেদ কমে যাওয়া;
ix. অনেকক্ষণ ধরে হেঁচকি তোলা;
x. ঘন ঘন শ্বাস প্রভৃতি।

প্রতিকার / করণীয় (Measures)

বৃক্ক বিকল অত্যন্ত জটিল রোগ। তাৎক্ষণিক বৃক্ক বিকল আরও জটিল বিষয়। তাই এ রোগের প্রতিকার করতে হলে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। লক্ষণের দু-একটি বৈশিষ্ট্য দেখেই খাদ্য ও পথ্য বিষয়ে নিজে থেকে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ জীবনের জন্যে মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। শুধু তাই নয়, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে এ রোগের চিকিৎসার আরেক অর্থ হচ্ছে "অর্থ দিয়ে অনর্থ" ডেকে আনা।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বৃক্ক বিকলের প্রতিকারে বিশেষজ্ঞরা নিচে বর্ণিত পন্থার কথা উল্লেখ করেছেন–

i. উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

ii. যে পরিমাণ প্রস্রাব হয় সে পরিমাণ পানির সাথে অতিরিক্ত ৫০০ মি.লি. পানি তাকে খেতে দিতে হবে।

iii. প্রোটিন জাতীয় খাবার বেশি দেয়া যাবে না অর্থাৎ প্রতিদিন ৪০ গ্রাম এর বেশি নয়।

iv. দেহে দেহরস ও ইলেকট্রোলাইট এর ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

v. ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে।

vi. পঞ্চাশোর্ধ বয়সে নিজের বা পরিবারের অন্য কারো ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ থাকলে তাদের বৃক্ক নিয়মিত পরীক্ষা করতে হবে।

উপরে উল্লিখিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও যদি রক্তে ইউরিয়ার মাত্রা বেশি থাকে তাহলে বৃক্ককে **ডায়ালাইসিস** প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা দেওয়া, নয়তো সবশেষে বৃক্ক প্রতিস্থাপনের কথা চিন্তা করতে হবে।

ডায়ালাইসিস (Dialysis)

একটি বৈষম্যভেদ্য ঝিল্লির ভিতর দিয়ে নির্বাচনমূলক ব্যাপন প্রক্রিয়ায় কোনো দ্রবণের কলয়ডাল পদার্থ থেকে দ্রবীভূত পদার্থের পৃথকীকরণকে **ডায়ালাইসিস** বলে। তাৎক্ষণিক বৃক্ক বিকল চিকিৎসায় এ প্রক্রিয়াকে কৃত্রিম বৃক্কের পরিবেশ রচনা করে রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থ ও অতিরিক্ত পানি অপসারণ করা হয়।

ডায়ালাইসিস দুধরনের– ক. হিমোডায়ালাইসিস (Haemodialysis) এবং খ. পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস (Peritoneal dialysis)।

ক. হিমোডায়ালাইসিস : এ প্রক্রিয়ার শুরুতে কিছু যন্ত্রপাতি, দ্রবণ ও টিউবের সমন্বয়ে একটি **কৃত্রিম বৃক্ক** নির্মাণ করা হয়। কৃত্রিম বৃক্ক আসল বৃক্কের মতো একই নীতি অনুসরণ করে কাজ করে। সংক্ষেপে বলতে গেলে রক্তকে পাম্প করে শরীর থেকে বের করে বর্জ্যপদার্থ অপসারণের উদ্দেশে পরিস্রুত করে যেভাবে আবার দেহে ফেরত পাঠানো হয় তাকে **হিমোডায়ালাইসিস** বলে। পদ্ধতিটি নিম্নরূপ–

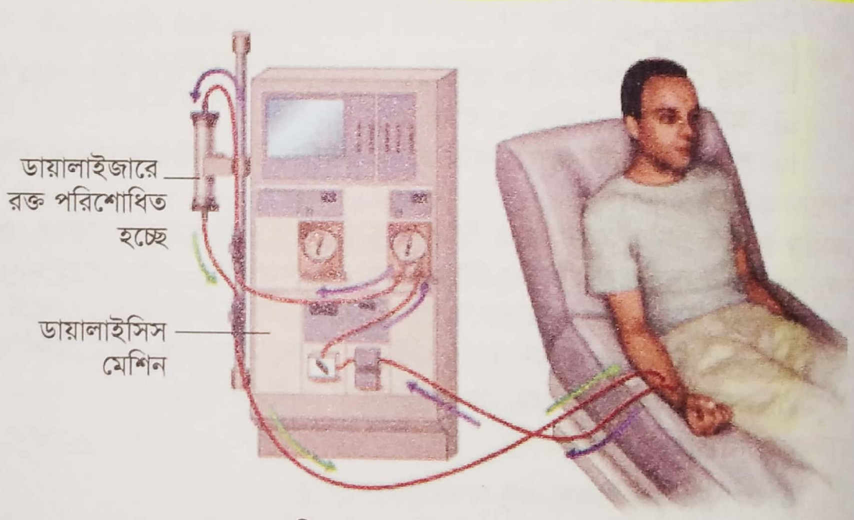

চিত্র ৬.৭ : হিমোডায়ালাইসিস

রোগীর দেহে একটি ধমনির ভিতর ফাঁপা নলাকার সূঁচ ঢোকানো হয়। এর নাম **ক্যাথেটার** (catheter)। এটি পিছন দিকে একটি নমনীয় টিউবের সাথে লাগানো থাকে। টিউবটি প্রথমে কিডনি মেশিনের সঙ্গে যুক্ত হয়, পরে একটি শিরায় এসে মিলিত হয়। বাহুর নিম্নপ্রান্ত বা পায়ে ক্যাথেটার লাগানো হয়। যাদের ঘন ঘন ডায়ালাইসিস হয় তাদের ক্ষেত্রে একটি ছোট টিউবসহ ক্যাথেটারটি স্থায়ীভাবে লাগিয়ে রাখা হয়।

পাম্পের সাহায্যে সযত্নে ধমনি থেকে রক্ত বের করে শিরার দিকে চালনা করা হয়। রক্তে **হেপারিন** (heparin) মেশানো হয় যাতে জমাট না বাঁধে। রক্ত ধীরে ধীরে কিডনি মেশিনের **ডায়ালাইসিস দ্রবণ** বা **ডায়ালাইসেট** (dialysate) এ শায়িত টিউবের ভিতর দিয়ে সংবহিত হয়। টিউবগুলো কৃত্রিম **আংশিক ভেদ্য** (partially permeable) ঝিল্লি-নির্মিত যা ব্যাপন প্রক্রিয়ায় অতিক্ষুদ্র অণু ও পানিকে ব্যাপিত হওয়ার সুযোগ দেয়। রক্তকণিকা, প্লেইটলেট (অণুচক্রিকা) ও প্রোটিন অণু বড় হওয়ায় ব্যাপিত হতে পারে না।

রক্ত ও ডায়ালাইসেট (ডায়ালাইসিস দ্রবণ)–এর মধ্যে সমতা না আসা পর্যন্ত বিনিময় অব্যাহত থাকে। রক্তের অবাঞ্ছিত বস্তু বিশেষ করে ইউরিয়া ও অতিরিক্ত সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি অপসারিত হয়, প্রয়োজনীয় বস্তু থেকে যায়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

প্রতি সপ্তাহে রোগীকে অন্ততঃ দুবার হিমোডায়ালাইসিসের সম্মুখীন হতে হয়। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে ৪-৫ ঘন্টা সময় লাগে। প্রতিবার সদ্য বানানো ডায়ালাইসেট ব্যবহার করতে হয়।

ডায়ালাইসেটের উপাদান : হিমোডায়ালাইসিসের উদ্দেশে ডায়ালাইসিস টিউবগুলোকে যে দ্রবণে রাখা হয় তাকে **ডায়ালাইসেট** বলে। এর উপাদনগুলো হচ্ছে- সঠিক তাপমাত্রা (স্থির দেহ তাপমাত্রা); সঠিক আয়নিক ভারসাম্য, বিশেষ করে Na^+, K^+, Cl^-, Mg^{2+}, Ca^{2+} ও HCO_3^- (এসিটেট রূপে); অতিরিক্ত পুষ্টি, যেমন গ্লুকোজ; সঠিক pH ও বাফারিং ক্ষমতা (buffering capacity) ইত্যাদি।

খ. পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস : কৃত্রিম ঝিল্লির পরিবর্তে দেহে অবস্থিত **পেরিটোনিয়াল ঝিল্লি** (পেরিটোনিয়াম)-কে ডায়ালাইসিং ঝিল্লি হিসেবে ব্যবহার করে বৃক্কের ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়াকে **পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস** বলে। এ প্রক্রিয়ার শুরুতে রোগীর উদর প্রাচীরে একটি ছোট চেরাছিদ্র করে তার ভিতর দিয়ে সরু প্লাস্টিক টিউব উদরীয় গহ্বরে প্রবেশ করানো ও স্থায়ীভাবে রেখে দেওয়া হয়। উদরীয় গহ্বরের প্রাচীরটি পেরিটোনিয়াম যা আংশিক ভেদ্য এবং ডায়ালাইসিং ঝিল্লি হিসেবে কাজ করে। প্লাস্টিক টিউবের ভিতর দিয়ে ডায়ালাইসেট উদরীয় গহ্বরে প্রবেশ করিয়ে কয়েক ঘন্টা রেখে দেয়া হয়। ডায়ালাইসেট ও উদরের বাকি অংশের টিস্যু-তরলের মধ্যে উপাদানের বিনিময় ঘটে। দিনে ৩-৪ বার ডায়ালাইসেট প্রতিস্থাপন করা যায়।

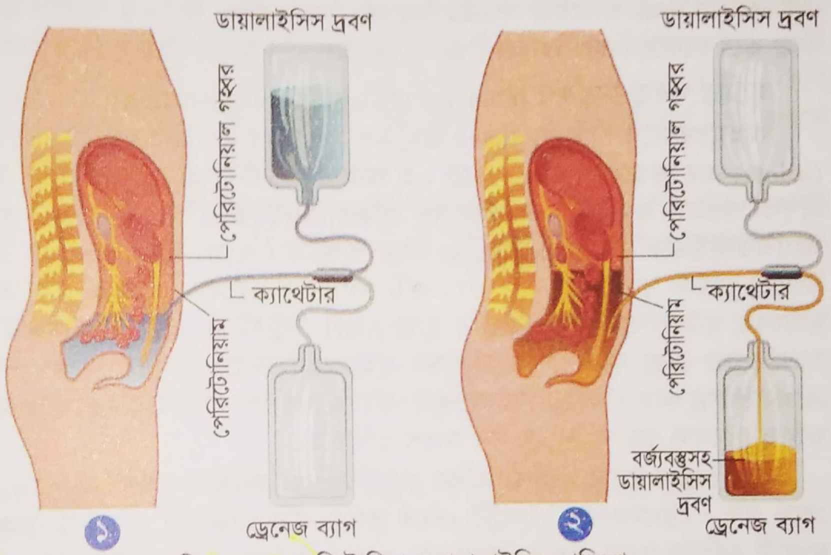

চিত্র ৬.৮ : পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়া

বৃক্ক প্রতিস্থাপন (Kidney Transplant)

বৃক্ক বিকলের দীর্ঘকালীন সমাধানে রোগীর দেহে ভিন্ন ব্যক্তির সুস্থ ও সঠিক বৃক্ক স্থাপনকে **বৃক্ক প্রতিস্থাপন** বলে। বৃক্ক বিকলের চিকিৎসায় ডায়ালাইসিস পদ্ধতি সাময়িক সমাধান হতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যয় সাপেক্ষ মনে হলেও দীর্ঘকালীন হিসেবে বৃক্ক প্রতিস্থাপনই ভালো পদক্ষেপ বলে বিবেচিত হচ্ছে। স্থায়ীভাবে নষ্ট বৃক্কের বিকল্প হিসেবে একটি সুস্থ বৃক্ক প্রতিস্থাপনই স্থায়ী সমাধান হতে পারে।

বৃক্ক প্রতিস্থাপনে অবশ্য স্মরণীয় বিষয় হচ্ছে–

১. বৃক্কদাতা (অনাত্মীয় বা আত্মীয়) যেই হোক না কেন তার দেহ থেকে সংগ্রহের ঠিক ৪৮ ঘন্টার মধ্যে রোগীর দেহে স্থাপন করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে যতখানি সময় বৃক্কটি বাইরে থাকে ততক্ষণ বৃক্কের উপর দিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে ঠান্ডা স্যালাইন দ্রবণ প্রবাহিত করা হয়। দাতা মৃত হলে সদ্যমৃত দাতার দেহ থেকে বৃক্ক সংগ্রহ করতে হবে।

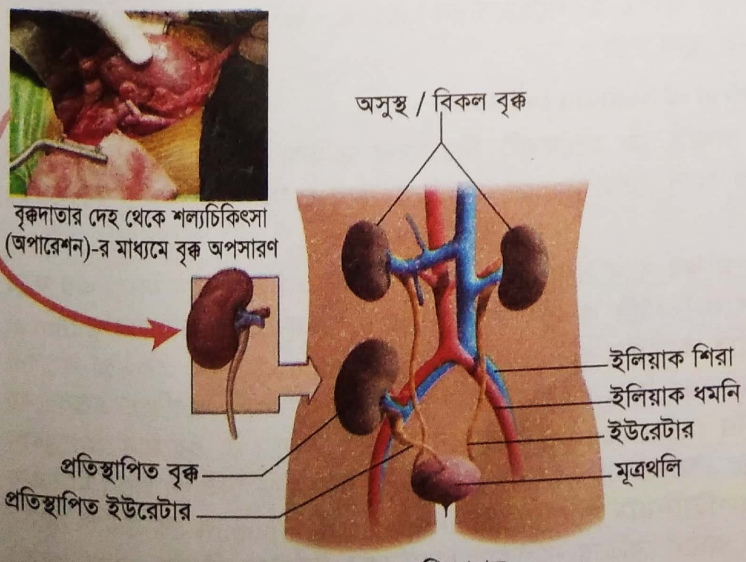

চিত্র ৬.৯ : বৃক্ক প্রতিস্থাপন

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. সংগৃহীত বৃক্কটি সুস্থ হতে হবে (HIV বা অন্যান্য সংক্রমণমুক্ত হতে হবে)।

৩. বৃক্কদাতা ও গ্রহীতার ব্লাড গ্রুপ এবং টিস্যুর ধরণ এক হতে হবে।

৪. বৃক্ক প্রতিস্থাপনের সময় প্রথমে গ্রহীতার শ্রোণিদেশে অপারেশনের মাধ্যমে দাতাবৃক্কটিকে স্থাপন করা হয়। দাতাবৃক্কের ধমনি ও শিরাকে গ্রহীতার ধমনি ও শিরার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। নতুন বৃক্কের ইউরেটারকে পৃথকভাবে মূত্রথলির সাথে জুড়ে দেয়া হয়। এভাবে বৃক্কের প্রতিস্থাপন ঘটে।

হরমোনাল ক্রিয়া (Hormonal Activities)

উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি শারীরবিজ্ঞানী **ক্লড বার্নার্ড** (Claude Bernard) সর্বপ্রথম প্রাণিদেহের অন্তঃস্থ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার কৌশলের উল্লেখ করেন। পরবর্তীতে আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে মানবদেহে মূত্রের ঘনত্ব, রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা ও রক্তের পিএইচ নিয়ন্ত্রণে মূল কার্যকর উপাদান হিসেবে **হরমোন** কিভাবে জটিল ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে চলেছে বিজ্ঞানীরা তা উদ্ভাবন করেছেন। নিচে এ বিয়য়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

মূত্রের ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ (Control of Urine Concentration)

আহারের সঙ্গে পানি গ্রহণ এবং ঘাম, মল-মূত্র ত্যাগ ইত্যাদির মাধ্যমে পানি ত্যাগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেহ রক্তের **দ্রব** (solute)-এর স্থিতাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রক্রিয়ায় সুনির্দিষ্টভাবে প্রভাব ফেলে অ্যান্টিডাইইউরেটিক হরমোন (ADH)। বিপুল পরিমাণ কম ঘন মূত্র উৎপাদন প্রক্রিয়া **ডাইইউরেসিস** (diuresis) এবং এর বিপরীত প্রক্রিয়াটি স্বভাবতই **অ্যান্টিডাইইউরেসিস** (antidiuresis) নামে পরিচিত। ADH কার্যগতভাবে অ্যান্টিডাইউরেটিক, অতএব বেশি ঘন মূত্র উৎপন্নে ভূমিকা পালন করে। ADH একটি পেপটাইড হরমোন। এটি ভ্যাসোপ্রেসিন (vasopressin) নামেও পরিচিত। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে উৎপন্ন হয়ে ADH পিটুইটারি গ্রন্থির পশ্চাৎখন্ডে প্রবেশ করে। রক্তে পানির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে কমে গেলে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত অসমোরিসেপ্টর কোষগুলো উত্তেজিত হয় এবং ADH উৎপন্ন করে। নিউরোনের অ্যাক্সন বেয়ে ADH পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থিতে প্রবেশ করে এবং রক্তস্রোতে ক্ষরিত হয়। ক্ষরিত হরমোন বৃক্কসহ দেহের সব অংশে বাহিত হয়।

বৃক্কে নেফ্রনগুলোর সংগ্রাহী নালির কোষঝিল্লিতে অবস্থিত গ্রাহক অণু ADH গ্রহণ করে, ফলে ঝিল্লির পানিভেদ্যতা বেড়ে যায়। গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট থেকে তখন পানি অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় বৃক্কের সংগ্রাহী নালিতে পুনঃশোষিত হয়। সংগ্রাহী নালিতে তরল বেশ ঘন হয়ে যায় এবং ব্যক্তি অল্প পরিমাণ অতিঘন মূত্র উৎপন্ন করে।

অন্যদিকে, রক্তে পানির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে হাইপোথ্যালামাসের অসমোরিসেপ্টর কোষগুলো তেমন উত্তেজিত হয় না এবং অতি অল্প পরিমাণ ADH ক্ষরিত হয়। তখন সংগ্রাহী নালির কোষগুলো প্রায় পানি-অভেদ্য হয়ে যায়, ফলে গ্লোমেরুলার ফিলট্রেট থেকে পানি পুনঃশোষণ বন্ধ থাকে। সংগ্রাহী নালিতে তখন ফিলট্রেট অনেক তরল হয়ে যায় এবং ব্যক্তি বেশি পরিমাণ অতি তরল মূত্র উৎপন্ন করে। দেহে পানির সমতা ফিরে না আসা পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যাহত থাকে। রেনাল ক্যাপসুলে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়া সবসময় অব্যাহত থাকে। পানির অভাবে রক্তরসের গাঢ়তা বাড়লে কিংবা পরিমাণ কমে গেলে অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত **অ্যালডোস্টেরন** (aldosterone) হরমোন মূত্রে সোডিয়াম আয়নের রেচন কমিয়ে পরোক্ষভাবে পানির রেচনও হ্রাস করে।

রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ (Control of Sodium in Blood)

রক্তের প্লাজমায় সোডিয়ামের মাত্রা স্থির রাখতে যে হরমোনটি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে সেটি হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন (aldosterone)। এ হরমোনও পানি পুনঃশোষণকে প্রভাবিত করে। অ্যালডোস্টেরন ক্ষরিত হয় অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স (বহিঃস্থ) অঞ্চল থেকে ।

রক্তে সোডিয়াম কম হলে অভিস্রবণের মাধ্যমে কম পানি প্রবেশ করে, তাই রক্তের আয়তন কমে যায়। এর ফলে রক্তচাপও হ্রাস পায়। চাপ ও আয়তন হ্রাস পেলে ডিস্টাল বা দূরবর্তী নালিকা ও অ্যাফারেন্ট ধমনিকার (afferent arteriole) মাঝখানে অবস্থিত জাক্সটাগ্লোমেরুলার কমপ্লেক্স (juxtaglomerular complex) নামে একগুচ্ছ সংবেদী কোষ উদ্দীপ্ত হয় এবং রেনিন (renin) এনজাইম ক্ষরণ করে। যকৃত থেকে উৎপন্ন ও প্লাজমায় অবস্থিত একধরনের প্রোটিনকে রেনিন সক্রিয় করে অ্যানজিওটেনসিন (angeotensin) হরমোনে পরিণত করে। এ হরমোন অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে অ্যালডোস্টেরন ক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে। অ্যালডোস্টেরন রক্তবাহিত হয়ে বৃক্কের ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকায় পৌঁছায় এবং নালিকার কোষগুলোতে সোডিয়াম-পটাসিয়াম পাম্প (sodium-potassium pump)-কে উদ্দীপ্ত করে। ফলে দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা থেকে সোডিয়াম আয়ন বেরিয়ে নালিকার চারপাশের কৈশিকজালিকায় প্রবেশ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

অন্যদিকে, পটাসিয়াম আয়ন প্রবেশ করে কৈশিকজালিকা থেকে দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকায়। অ্যালডোস্টেরন অন্ত্রে সোডিয়াম শোষণকে এবং ঘামে কম সোডিয়াম ত্যাগকে উদ্দীপ্ত করে। এ দুই প্রক্রিয়ার ফলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। এ কারণে অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় রক্তে প্রচুর পানি প্রবেশ করে রক্তের আয়তন ও চাপ উভয়ই বেড়ে যায়।

রক্তের পিএইচ নিয়ন্ত্রণ (Control of Blood p^H)

পিএইচ (p^H) হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন ঘনত্বের একটি পরিমাপক। নিরপেক্ষ p^H হচ্ছে 7.0, এসিড p^H হয় 7-এর নিচে, আর ক্ষারীয় p^H হছে 7-এর উপরে। কিছু রাসায়নিক পদার্থ দ্রবণে p^H-এর পরিবর্তনকে প্রতিহত করতে সক্ষম। এসব পদার্থকে বলে **বাফার** (buffers)। রক্তের প্লাজমার স্বাভাবিক p^H হচ্ছে 7.4। এ মাত্রা যথাসম্ভব বজায় না রাখলে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।

দেহে ক্ষারের চেয়ে এসিড বেশি উৎপন্ন হয়। অতএব, এসিডিটি কমানোর বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। এসিডিটি বেড়ে যাওয়ার একটি কারণ হচ্ছে কোষীয় শ্বসনে উৎপন্ন CO_2। এটি দ্রবীভূত হয়ে H_2CO_3 (কার্বনিক এসিড) নামে একটি দুর্বল এসিডে পরিণত হয়। এটি ভেঙ্গে H^+ ও HCO_3^- (হাইড্রোজেন কার্বনেট আয়ন) উৎপন্ন হয়। CO_2 এর ঘনত্ব বেশি হয়ে গেলে পরিত্রাণ পেতে প্রতিবর্ত সাড়া হিসেবে শ্বাসপ্রশ্বাসের হার বেড়ে যায়। HCO_3^- বাফার হিসেবে কাজ করতে পারে কারণ H^+ এর ঘনত্ব বেশি হয়ে গেলে এগুলো H_2CO_3 গঠন করে।

রক্তে HCO_3^- ও ফসফেট বাফার অতিরিক্ত H^+ প্রতিরোধে সাহায্য করে। এ কারণে রক্তের p^H কমে না। প্লাজমার স্বাভাবিক p^H এ যেন পরিবর্তন না ঘটে সে উদ্দেশে নেফ্রনের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা এবং সংগ্রাহী নালি নিম্নোক্ত দুভাবে কাজ করে।

১. রক্ত অতিএসিডিক হতে শুরু করলে দূরবর্তী নালিকা ও সংগ্রাহী নালির কোষগুলোর সাহায্যে রক্ত থেকে H^+ সক্রিয় পরিবহন (active transport)-এর মাধ্যমে নালিকাতে পরিবাহিত হয়। CO_2 যদি H^+ এর উৎস হয়ে থাকে তাহলে HCO_3^- ও উৎপন্ন হয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় রক্তে ফেরত যাবে। p^H বেড়ে গেলে বিপরীত ঘটনা ঘটবে। এসব পরিবর্তনের কারণে মূত্রের p^H 4.5 – 8.5 পর্যন্ত হতে পারে।

২. p^H কমে গেলেও বৃক্ককোষে অ্যামোনিয়াম বেইস (base) আয়ন (NH_4^+) সৃষ্টিতে উদ্দীপ্ত হয়। NH_4^+ এসিডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বৃক্কে বাহিত হয় এবং অ্যামোনিয়াম লবণ হিসেবে রেচিত হয়।

ব্যবহারিক

বৃক্কের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণ

বৃক্কের অনুচ্ছেদের স্থায়ী স্লাইড পর্যবেক্ষণে নিচে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখা যাবে।

১. বাইরে কর্টেক্স ও ভিতরে মেডুলা-এ দুটি অংশ নিয়ে গঠিত।

২. এতে অসংখ্য প্যাঁচানো নালিকা বা নেফ্রন অবস্থিত।

৩. প্রত্যেক নেফ্রনের অগ্রভাগে একটি করে পেয়ালার মতো গঠন রয়েছে। এর নাম বোম্যানস ক্যাপসুল। পেয়ালার অভ্যন্তরে গ্লোমেরুলাস নামক একগুচ্ছ কৈশিকনালি রয়েছে।

৪. নেফ্রনের ফাঁকে ফাঁকে মেডুলারি রশ্মি অবস্থিত।

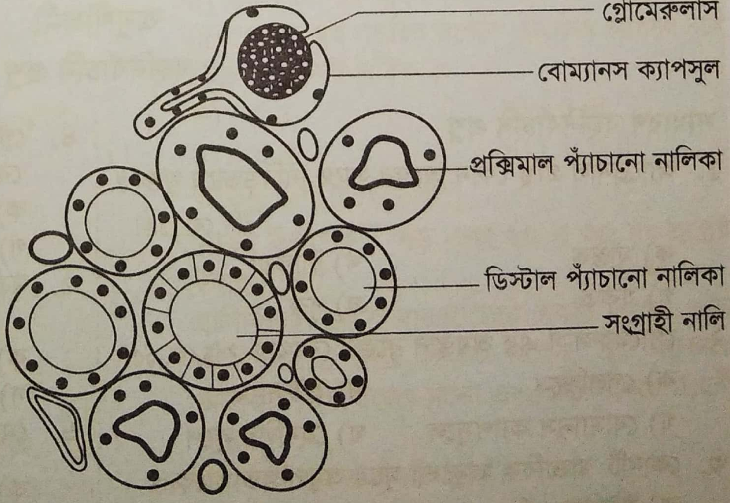

চিত্র ৬.১০ : বৃক্কের অনুচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

নেফ্রন : বৃক্কের গঠন ও কাজের একককে নেফ্রন বলে। মানুষের এক একটি বৃক্ক প্রায় ১০-১২ লক্ষ নেফ্রন নিয়ে গঠিত।

রেনাল করপাসল : বৃক্কের কর্টেক্স অঞ্চলে অবস্থিত নেফ্রনের সম্মুখ অংশকে রেনাল করপাসল বলে। এটি প্রায় ০.২ মিমি ব্যাসের একটি গোলাকার অংশ। আবিষ্কারক Marcello Malpighi-র নামানুসারে একে **ম্যালপিজিয়ান বডি** বলে। এটি দুটি অংশ নিয়ে গঠিত– (i) বোম্যানস ক্যাপসুল ও (ii) গ্লোমেরুলাস।

বোম্যানস ক্যাপসুল : রেনাল করপাসলে গ্লোমেরুলাসকে ঘিরে অবস্থিত একটি বদ্ধ ও পেয়ালার মতো অঙ্গকে ব্যোম্যানস ক্যাপসুল বলে।

গ্লোমেরুলাস : বোম্যানস ক্যাপসুলের অভ্যন্তরে অন্তর্বাহী রেনাল ধমনিকার কৈশিকনালির জালিকাকার গুচ্ছকে গ্লোমেরুলাস বলে।

হেনলির লুপ : নেফ্রনের প্রক্সিমাল বা নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকার শেষ প্রান্ত সোজা হয়ে মেডুলা অঞ্চলে প্রবেশ করে একটি 'U' আকৃতির লুপ গঠন করে, একে হেনলির লুপ বলে।

মূত্র : নেফ্রনের গ্লোমেরুলাসে রক্তের আল্ট্রাফিল্ট্রেশনের পর বৃক্কয় নালিকার বিভিন্ন অংশে পরিস্রুত তরলের পুনঃশোষণ এবং সক্রিয় ক্ষরণের পর হালকা খড় বর্ণের এবং বিশেষ ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত যে অপ্রয়োজনীয় নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য তরল মূত্রনালি পথে দেহের বাইরে নিষ্কাশিত হয় তাকে মূত্র বলে।

অসমোরেগুলেশন : জীবন্তকোষ বা দেহের অন্তঃ ও বহিঃ পরিবেশের অভিস্রবণিক চাপের সমতা রক্ষার প্রক্রিয়াকে অসমোরেগুলেশন বলে।

বৃক্ক বিকল : বৃক্কের কার্যকারিতা কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়াকে বৃক্ক বিকল বলে।

ডায়ালাইসিস : বৃক্ক বিকল হলে কৃত্রিম উপায়ে রক্ত থেকে বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থাকে ডায়ালাইসিস বলে।

বৃক্ক প্রতিস্থাপন : যখন কোনো ব্যক্তির বৃক্ক স্থায়ীভাবে বিকল বা অকেজো হয়ে পড়ে তখন কোনো সুস্থ ব্যক্তির বৃক্ক তার দেহে সংযোজন করা হয়, তখন তাকে বৃক্ক প্রতিস্থাপন বলে।

বাফার : দেহ তরলের pH পরিবর্তনে বাধাদানকারী বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যকে বাফার বলে।

অরনিথিন চক্র : দেহে অব্যবহৃত অ্যামিনো এসিড বিশ্লিষ্ট হয়ে যে অ্যামোনিয়া তৈরি করে তা বিষাক্ত। অ্যামোনিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে মিলিত হয়ে যকৃতে অরনিথিন চক্রের মাধ্যমে কম ক্ষতিকারক ও পানিতে দ্রবণীয় ইউরিয়ায় পরিণত হয়। ইউরিয়া প্লাজমায় অবস্থান করে এবং সংবহন তন্ত্রের মাধ্যমে বৃক্কে পৌঁছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি কোন অঙ্গের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত? [দি.বো. ১৫]
ক) মস্তিষ্ক খ) ট্রাকিয়া
গ) যকৃত ঘ) বৃক্ক

২. গ্লোমেরুলাস এর অবস্থান বৃক্কের কোথায়? [চ.বো. ১৫]
ক) পেলভিসে খ) হাইলামে
গ) বোম্যানস ক্যাপসুলে ঘ) হেনলির লুপে

৩. কোনটি স্বাভাবিক মানুষের মূত্রে অনুপস্থিত থাকে?
ক) ইউরিক এসিড খ) ক্রিয়েটিনিন
গ) গ্লুকোজ ঘ) ইউরিয়া

৪. গ্লোমেরুলারস ফিলট্রেটের অধিকাংশ পুনঃশোষিত হয় কোন অংশে? [দি.বো. ১৭]
ক) নিকটবর্তী প্যাঁচানো নালিকা খ) হেনলির লুপ
গ) দূরবর্তী প্যাঁচানো নালিকা ঘ) সংগ্রাহী নালিকা

৫. মূত্রথলি হতে মূত্র পরিবহনের কাজ করে কোনটি? [চ.বো. ১৭]
ক) ওভিডাক্ট খ) ইউরেথ্রা
গ) ইউরেটার ঘ) ভাস ডিফারেন্স

৬. নেফ্রনের কোন অংশে অধিকাংশ পুনঃশোষণ ঘটে? [ব.বো. ১৫]
ক) প্রক্সিমাল প্যাঁচানো নালিকায়
খ) হেনলির লুপে
গ) ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকায়
ঘ) সংগ্রাহক নালিকায়

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৭. নেফ্রনের কোন অংশে আল্ট্রাফিল্ট্রেশন হয় ?
ক) গ্লোমেরুলাস খ) হেনলির লুপ
গ) ডিস্টাল প্যাঁচানো নালিকা ঘ) মূত্রথলি

৮. বৃক্ক বিকল হলে রোগীর দেহে কোন বিষাক্ত তরল পদার্থ জমে ?
ক) নেফ্রেমিয়া খ) ক্রোমোমিয়া
গ) ইউরেমিয়া ঘ) কিটোমিয়া

৯. ডায়ালাইসিস কত প্রকার ? [ব.বো. ১৫]
ক) ২ খ) ২
গ) ৪ ঘ) ৫

১০. মূত্রথলিতে কী পরিমাণ মূত্র জমা হলে মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা হয় ?
ক) ১৫০-১৭০ মি.লি. খ) ২৮০-৩২০ মি.লি.
গ) ৫২০-৬২০ মি.লি. ঘ) ৭০০-৭৫০ মি.লি.

১১. দেহ কোষের অন্তঃপরিবেশ ও বহিঃপরিবেশের মধ্যে অভিস্রবণিক চাপের সমতাকে কী বলে ?
ক) রেচন খ) সমঅভিস্রবণ
গ) অসমোরেগুলেশন ঘ) ফিল্ট্রেশন

১২. আমাদের দেহে প্রতি মিনিটে কত ঘন সে.মি. মূত্র তৈরি হয় ?
ক) ১ খ) ৩
গ) ৩ ঘ) ৪

১৩. দেহের পানি সমতা রক্ষার জন্য দায়ী হরমোন কোনটি ?
ক) ADH খ) FSH
গ) TSH ঘ) LH

১৪. বৃক্কের কোন অংশের মধ্য দিয়ে বৃক্কীয় শিরা প্রবেশ করে ?
ক) কর্টেক্স খ) হাইলাম
গ) ইউরেটার ঘ) প্যাপিলা

১৫. বৃক্কের অবতল অংশের ভাঁজটিকে কী বলা হয় ?
ক) কর্টেক্স খ) হাইলাম
গ) মেডুলা ঘ) ক্যালিক্স

১৬. নেফ্রন কত প্রকার ?
ক) ৫ খ) ৩
গ) ৭ ঘ) ৪

১৭. বৃক্কের সমস্ত নেফ্রনের সম্মিলিত দৈর্ঘ্য কত ?
ক) ৩-৪ সে.মি. খ) ৩-৪ মি.
গ) ৭২-৮০ মি. ঘ) ৭২-৮০ কি.মি.

১৮. গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেটে কোনটি অনুপস্থিত ? [চ.বো.১৭]
ক) প্রোটিন খ) গ্লুকোজ
গ) আয়ন ঘ) ইউরিয়া

১৯. কোন পদার্থের কারণে মূত্রের রং খড়ের মত হয় ?
[রা.বো., দি.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো., ব.বো.১৮]
ক) ইউরিয়া খ) ক্রিয়েটিনিন
গ) অ্যামোনিয়া ঘ) ইউরোক্রোম

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

২০. বৃক্ক –
i) দেহের রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে
ii) অতিরিক্ত হরমোন সঞ্চয় করে
iii) বিপাকীয় বর্জ্য নিষ্কাশন করে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

২১. নেফ্রনের বন্ধ ও স্ফীত অংশ বোম্যান্স ক্যাপসুল। এটি–
i) U আকৃতির বিশিষ্ট ii) দুইস্তর বিশিষ্ট
iii) গ্লোমেরুলাসযুক্ত
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২২. বৃক্কের কাজ হলো – [য.বো. ১৭]
i) নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য অপসারণ
ii) দেহের পানি সাম্যতা রক্ষা
iii) রক্তে হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক রাখা
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২৩. নেফ্রনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক ? [ঢা.বো. ১৭]
i) ভিসেরাল স্তর পোডাসাইট কোষ দ্বারা গঠিত
ii) প্যারাইটাল স্তর আঁইশাকার এপিথেলিয়াল কোষে গঠিত
iii) পেয়ালার মত প্রসারিত অংশকে বোম্যানস ক্যাপসুল বলে
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ২৪ ও ২৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও : [রা.বো. ১৭]

প্রাণিবিজ্ঞান ক্লাসে মানবদেহের একটি অঙ্গের গঠন বর্ণনা করতে গিয়ে শিক্ষক বলেন, এটি আকারে অনেকটা শিম বীজের মতো এবং এটি লালচে খয়েরী রঙের।

২৪. উদ্দীপকে বর্ণিত অঙ্গটি হলো –
ক) যকৃত খ) পাকস্থলি
গ) অগ্ন্যাশয় ঘ) বৃক্ক

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২৫. উদ্দীপকে বর্ণিত অঙ্গটির অন্তঃগঠনে পাওয়া যায় –
i) অ্যালভিওলাস ii) রেনাল পিরামিড iii) পেলভিস
নিচের কোনটি সঠিক ?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. শ্রেণিশিক্ষক বোর্ডে শিমবীজের ন্যায় একটি চিত্র অংকন করে বললেন যে, অঙ্গটির উল্লেখযোগ্য দু'টি কাজ হল–
মানবদেহের মূত্র তৈরিতে ভূমিকা রাখে।
মানবদেহের পানিসাম্যতা নিয়ন্ত্রণ করে। [কু.বো.১৭]
ক) উপযোজন কী ?
খ) পিটুইটারি গ্রন্থিকে মাস্টার গ্লান্ড বলা হয় কেন ?
গ) উদ্দীপকের অঙ্গটির চিত্রসহ অন্তর্গঠন বর্ণনা কর।
ঘ) উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট অঙ্গটি কিভাবে দ্বিতীয় কাজটি সম্পন্ন করে তা বিশ্লেষণ কর।

২. রাহাতের বাবা হঠাৎ একদিন খেয়াল করলেন তাঁর পা'দুটি ফুলে গেছে আর প্রশ্রাবের পরিমাণও খুব কম। ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি বললেন– 'আপনার ক্রিয়েটিনিন মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.৮ বেশি'।
ক) নেফ্রন কাকে বলে ?
খ) একটি রেনাল করপাসল কী কী নিয়ে গঠিত ?
গ) উদ্দীপকে রাহাতের বাবার সমস্যাজনিত অঙ্গের গঠন বর্ণনা কর।
ঘ) রাহাতের বাবার যে রোগ হয়েছে তা থেকে পরিত্রাণের উপায় ব্যাখ্যা কর।

৩. তন্ত্র A : নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন
তন্ত্র B : CO_2 নিষ্কাশন
ক) এপিগ্লটিস কী ?
খ) অতিসূক্ষ্ম ছাঁকন বলতে কী বুঝ ?
গ) উদ্দীপকে তন্ত্র A এর গঠনগত ও কার্যগত এককের চিহ্নিত চিত্র আঁক।
ঘ) উদ্দীপকে তন্ত্র A ও তন্ত্র B, ভিন্নতন্ত্রের অন্তর্ভূক্ত হলেও তারা বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন করে– তা বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

জ্ঞানমূলক

১. রেচন কী ? [য.বো.১৬, ঢা.বো. ১৭]
২. বৃক্ক কী ?
৩. নেফ্রন কী ? [সি.বো. ১৬]
৪. বোম্যানস ক্যাপসুল কী ?
৫. প্যাপিলা কী ?
৬. পোডোসাইট কী ?
৭. সমসারক সূত্র কী ?
৮. ক্রিয়েটিনিন কী ?
৯. অসমোরেগুলেশন কী ? [দি.বো. ১৭]
১০. হিমোডায়ালাইসিস কী ? [চ.বো. ১৭, কু.বো., ১৫]
১১. পেলভিস কী ?
১২. গ্লোমেরুলাস কী ?
১৩. ডিঅ্যামিনেশন কী ?
১৪. অরনিথিন চক্র কী ?
১৫. হেনলির লুপ কী ?
১৬. ডাইইউরেটিকস কী ?
১৭. ডায়ালাইজার কী ?
১৮. কর্টেক্স কী ?
১৯. মূত্র কী ?
২০. p^H কী ?

অনুধাবনমূলক

১. ম্যালপিজিয়ান বডি বলতে কী বোঝায় ? [চ.বো. ১৭]
২. হেনলির লুপ বলতে কী বোঝায় ?
৩. নেফ্রনের কাজগুলো লিখ।
৪. সক্রিয় ক্ষরণ বলতে কী বোঝায় ? [ঢা.বো. ১৬]
৫. মূত্রের উপাদানগুলোর নাম লিখ। [ব.বো. ১৭]
৬. প্রবাহ চিত্রের মাধ্যমে রেচনতন্ত্রের সাহায্যে মূত্র অপসারণ দেখাও।
৭. অসমোরেগুলেশন বলতে কী বোঝায় ? [য.বো. ১৭, ব.বো.১৭]
৮. অতিসূক্ষ্ম ছাঁকন বলতে কী বোঝ ? [সকল বোর্ড ১৮]
৯. ক্যাথেটার বলতে কী বোঝায় ?
১০. হিমোডায়ালাইসিস বলতে কী বোঝায় ?
১১. বৃক্ক প্রতিস্থাপন বলতে কী বোঝায় ?
১২. বৃক্ক প্রতিস্থাপনে অনুসরণীয় বিষয়গুলো লিখ।
১৩. বৃক্কের তাৎক্ষণিক বিকল অবস্থা কীভাবে সৃষ্টি হয় ?
১৪. অসমোরেগুলেশনে হরমোনের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
১৫. রেচনে সংগ্রাহী নালিকার ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
১৬. মূত্র অম্লীয় প্রকৃতির হয় কেন ?
১৭. নেফ্রন ও নিউরোনের মধ্যে পার্থক্য কী ?
১৮. ম্যালপিজিয়ান করপাসল ও ম্যালপিজিয়ান নালিকার মধ্যে পার্থক্য কী ?
১৯. বৃক্ক কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
২০. বৃক্ক প্রতিস্থাপনের শর্তগুলো কী কী ?
২১. ডায়ালাইসিস ঝিল্লি কিভাবে কাজ করে ?
২২. ডায়ালাইসেটের উপাদানগুলো কী কী ?
২৩. ক্যাথেটারের কাজ কী ?
২৪. ঘন ঘন ডায়ালাইসিস করানোর চেয়ে বৃক্ক প্রতিস্থাপন করা অনেক ভালো কেন ?

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL BDNIYOG.COM COPYRIGHT

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৭ অধ্যায় মানব শারীরতত্ত্ব : চলন ও অঙ্গচালনা
Human Physiology : Locomotion & Movement

প্রধান শব্দাবলি (Key words)
- অস্থিসন্ধি
- প্যাটেলা
- মচকানো
- টেনডন
- লিগামেন্ট
- অস্থিভঙ্গ

চলন ও অঙ্গচালনা প্রাণিদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এদুটি কাজ সম্পাদনে প্রধানত তিনটি অঙ্গতন্ত্র সক্রিয় থাকে কঙ্কালতন্ত্র, পেশিতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র। চলাফেরা, খাদ্য অন্বেষণ, আত্মরক্ষা, প্রজনন প্রভৃতি যাবতীয় কাজকর্মের সবই কঙ্কাল-পেশি ক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত। কঙ্কাল-পেশির সংকোচন ও প্রসারণের ফলে অঙ্গের বা দেহাংশের চলন ঘটে। মানবদেহের ভারবহনকারী শক্ত কাঠামোটি হচ্ছে কঙ্কালতন্ত্র। আর এ কঙ্কালতন্ত্রের উপর আচ্ছাদন থাকে **পেশিতন্ত্রের**। এ অধ্যায়ে মানুষের কঙ্কালতন্ত্র গঠনকারী অস্থি, তরুণাস্থি ও পেশির সমন্বিত ক্রিয়া এবং অস্থিভঙ্গ ও সন্ধির আঘাত নিয়ে আলোচনা করা হবে।

পিরিয়ড সংখ্যা-১২ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের প্রধান অংশসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।	● মানুষের কঙ্কালতন্ত্র ○ প্রধান ভাগ ○ অস্থি ও তরুণাস্থির গঠন
২. অস্থি ও তরুণাস্থির গঠনের তুলনা করতে পারবে।	
৩. ব্যবহারিক : মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের অস্থিসমূহ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে।	● ব্যবহারিক ○ মানুষের বিভিন্ন অস্থি (মডেল) পর্যবেক্ষণ
৪. বিভিন্ন প্রকার পেশির গঠন ও কাজের তুলনা করতে পারবে।	● পেশির গঠন ও কাজ ○ প্রধান ভাগ ○ মসৃণ ○ হৃদ ○ কঙ্কাল
৫. পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয় না ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয়না
৬. ব্যবহারিক : প্রস্তুতকৃত স্লাইডের সাহায্যে মসৃণ ও হৃৎপেশির কাঠামোর তুলনা করতে পারবে।	● ব্যবহারিক ○ প্রস্তুতকৃত স্লাইডের সাহায্যে মসৃণ ও হৃদপেশির কাঠামোর তুলনা
৭. কঙ্কালের প্রধান কার্যক্রম 'রডস ও লিভার' একটি তন্ত্র হিসেবে কাজ করে বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● কঙ্কালের কার্যক্রম ও 'রডস ও লিভার' তন্ত্র
৮. মানুষের হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশির সমন্বয় ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশির সমন্বয়
৯. বিভিন্ন ধরনের অস্থিভঙ্গ এবং এদের প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● অস্থিভঙ্গ এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ○ সাধারণ ○ যৌগিক ○ জটিল
১০. বিভিন্ন ধরনের অস্থিসন্ধিতে আঘাত ও এদের প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● সন্ধির আঘাত এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ○ স্থানচ্যুতি ○ মচকানো

মানব কঙ্কালতন্ত্র (Human Skeletal System)

ভ্রূণীয় মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত **অস্থি** ও **তরুণাস্থি** (কার্টিলেজ) নামক যোজক টিস্যু সমন্বয়ে গঠিত যে তন্ত্র দেহের কাঠামো সৃষ্টির মাধ্যমে দেহকে নির্দিষ্ট আকৃতি দান করে, দেহের ভার বহন করে, পেশি সংযোগের স্থান প্রদান করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন অঙ্গসমূহ রক্ষা করে তাকে **কঙ্কাল তন্ত্র** বলে। মানবদেহের কঙ্কাল মূলত **অন্তঃকঙ্কাল**। বাইরে থেকে অন্তঃকঙ্কাল দেখা যায় না।

কঙ্কালতন্ত্রের কাজ (Functions of skeletal system)

ক. যান্ত্রিক কাজ (Mechanical functions)

১. **দৈহিক কাঠামো গঠন** : কঙ্কালতন্ত্র মানবদেহের কাঠামো গঠন ও নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করে।

২. **সুরক্ষা** : মানবদেহের গুরুত্বপুর্ণ অঙ্গাদে যেমন মস্তিষ্ক, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, সুষুম্নাকাণ্ড প্রভৃতি বিশেষভাবে নির্মিত কঙ্কালে সুরক্ষিত থাকে।

৩. **সংযোগতল সৃষ্টি** : দেহের অধিকাংশ পেশি, লিগামেন্ট ও টেনডন কঙ্কালে সংযুক্ত থেকে বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটায়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৪. **চলন :** অস্থিসন্ধি গঠন এবং পেশির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কঙ্কালতন্ত্র মানুষের চলনে প্রধান ভূমিকা রাখে।

৫. **ভারবহন :** পেশিসমূহ কঙ্কালের সাথে আটকে থেকে দেহের ভার বহন করে।

খ. **শারীরবৃত্তীয় কাজ** (Physiological functions)

৬. **রক্ত কণিকা উৎপাদন :** পরিণত মানব দেহের রক্ত উৎপাদনকারী প্রধান টিস্যু হচ্ছে লাল **অস্থিমজ্জা**। স্টার্নাম, পাঁজর, কশেরুকা, করোটি এবং ফিমার ও হিউমেরাসের মস্তকে অবস্থিত অস্থিমজ্জা থেকে লোহিত কণিকা উৎপন্ন হয়। অস্থিমজ্জা থেকে প্রতি সেকেন্ডে গড়ে প্রায় ২৬ লক্ষ লোহিত কণিকা সৃষ্টি হয়। অবিরামভাবে লোহিতা কণিকা উৎপাদন ছাড়াও লাল অস্থিমজ্জা অণুচক্রিকা উৎপন্ন করে এবং ম্যাক্রোফেজ ধারণ করে।

৭. **শ্রবণ :** কঙ্কালতন্ত্র কিছু শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। বক্ষপিঞ্জর শ্বাস-প্রশ্বাসে এবং মধ্যকর্ণের কর্ণাস্থি শ্রবণে সহায়তা করে।

৮. **রোগ প্রতিরোধ :** অস্থির রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়ালতন্ত্র দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় অংশ নেয়।

৯. **খনিজ লবণ সঞ্চয় :** ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়াম সঞ্চয় করে এবং প্রয়োজনে রক্তে সরবরাহ করে।

১০. **চাপ ও আয়নিক সমতা রক্ষা :** দেহের অভ্যন্তরীণ চাপ নিয়ন্ত্রণে ও আয়নিক সমতা রক্ষায় অস্থিসমূহ কাজ করে।

১১. **হরমোনাল নিয়ন্ত্রণ :** অস্থির কোষ থেকে অস্টিওক্যালসিন (osteocalcin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয় যা দেহে রক্তের চিনি ও চর্বির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

১২. **রাসায়নিক শক্তি :** মানুষের বয়স বাড়ার সাথে সাথে কিছু লোহিত অস্থিমজ্জা পরিবর্তিত হয়ে পীত অস্থিমজ্জা (yellow bone marrow) গঠন করে। পীত অস্থিমজ্জায় প্রচুর পরিমাণে অ্যাডিপোজ কোষ (adepose cell) থাকে যেগুলো দেহের সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তির আধার হিসেবে ভূমিকা রাখে।

কঙ্কালতন্ত্রের উপাদান

কঙ্কালতন্ত্র পাঁচ ধরনের তন্তুময় ও খনিজসমৃদ্ধ প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত।

১. **অস্থি** (Bone) : অস্থি কঙ্কালতন্ত্রে উপস্থিত সুদৃঢ় যোজক টিস্যু যা প্রধানত ক্যালসিয়াম লবণ দিয়ে গঠিত।

২. **কোমলাস্থি বা তরুণাস্থি** (Cartilage) : কোমলাস্থি কঙ্কালতন্ত্রে অবস্থিত স্থিতিস্থাপক ধরনের যোজক টিস্যু। তবে এতে সাধারণত কোন ক্যালসিয়াম থাকে না।

৩. **লিগামেন্ট** (Ligament) : লিগামেন্ট বা অস্থিবন্ধনী হচ্ছে ঘন, শ্বেত বর্ণের তন্তুময় ও স্থিতিস্থাপক বন্ধনী যা দিয়ে একটি অস্থি অন্য একটি অস্থির সাথে যুক্ত থাকে। এগুলো বিভিন্ন অঙ্গকে সঠিক স্থানে ধরে রাখতে সহায়তা করে।

৪. **টেনডন** (Tendon) : টেনডন হলো ঘন, মজবুত, শ্বেত বর্ণের নমনীয় ও অস্থিতিস্থাপক তন্তুময় যোজক টিস্যু যেগুলো মাংসপেশির প্রান্তে অবস্থান করে পেশি ও অস্থির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।

৫. **অস্থিসন্ধি** (Joint) : একটি অস্থি অন্য একটি অস্থির সাথে সংযুক্ত হয়ে যে সন্ধিস্থল গঠন করে তাকে অস্থিসন্ধি বলে। অস্থিসন্ধি থাকার কারণে দেহের বিভিন্ন অঙ্গকে বিভিন্ন মাত্রায় সঞ্চালন করা যায় ফলে চলন, নড়ন, ভারবহন ও বিভিন্ন কাজকর্ম সহজ হয়।

কঙ্কালতন্ত্রের প্রধান ভাগ

মানব কঙ্কালতন্ত্রের অধিকাংশই অস্থি নির্মিত। মোট ২০৬টি অস্থি নিয়ে গঠিত সমগ্র কঙ্কালতন্ত্রকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা– ১. **অক্ষীয় কঙ্কাল** (Axial skeleton) এবং ২. **উপাঙ্গীয় কঙ্কাল** (Appendicular skeleton)।

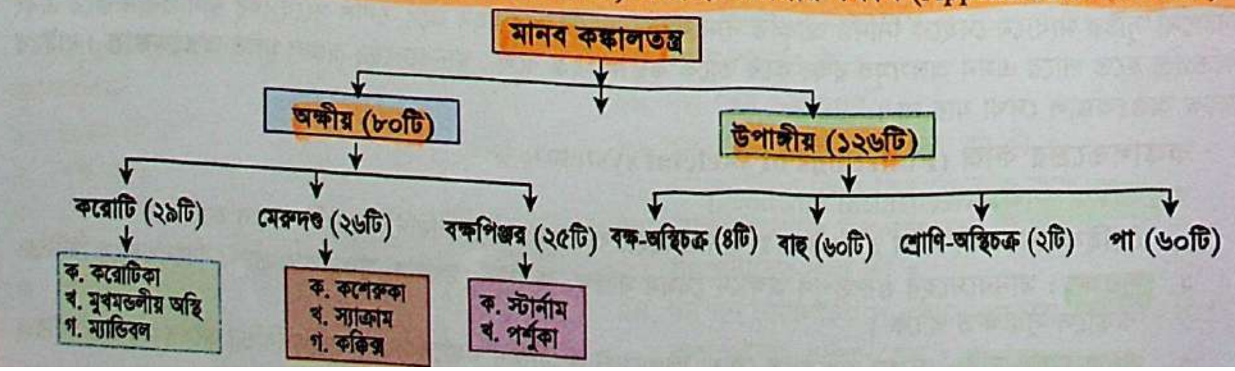

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

পরিণত মানব কঙ্কালের অস্থিসমূহ (Bones of Adult Human Skeleton)

প্রধান ভাগ	অন্তর্ভুক্ত অংশ		বিন্যাস ও সংখ্যা		মোট সংখ্যা
অক্ষীয় কঙ্কাল (৮০টি)	করোটি ২৯টি	করোটিকা	ফ্রন্টাল অস্থি	১টি	৮টি
			প্যারাইটাল অস্থি	২টি	
			টেমপোরাল অস্থি	২টি	
			অক্সিপিটাল অস্থি	১টি	
			স্ফেনয়েড অস্থি	১টি	
			এথময়েড অস্থি	১টি	
		মুখমণ্ডলীয় অস্থি	ম্যাক্সিলা	২টি	১৪ টি
			ম্যান্ডিবল	১টি	
			জাইগোম্যাটিক অস্থি	২টি	
			ন্যাসাল অস্থি	২টি	
			ল্যাক্রিমাল অস্থি	২টি	
			ইনফিরিয়র ন্যাসাল কঙ্কা	২টি	
			ভোমার	১টি	
			প্যালেটিন অস্থি	২টি	
		কর্ণাস্থি	ম্যালিয়াস	২টি	৬ টি
			ইনকাস	২টি	
			স্টেপিস	২টি	
		হাইওয়েড		১ টি	১ টি
	মেরুদণ্ড		সারভাইকাল কশেরুকা	৭টি	২৬টি (৩৩ টি)
			থোরাসিক কশেরুকা	১২টি	
			লাম্বার কশেরুকা	৫টি	
			স্যাক্রাল কশেরুকা	১টি (৫টি)	
			কক্কিক্স	১টি (৪টি)	
	বক্ষপিঞ্জর		স্টার্নাম	১টি	২৫ টি
			পর্শুকা (প্রতিপাশে ১২টি)	২৪টি	
উপাঙ্গীয় কঙ্কাল (১২৬টি)	বক্ষ-অস্থিচক্র		স্ক্যাপুলা	২টি	৪টি
			ক্ল্যাভিকল	২টি	
	বাহু (দুটি)		হিউমেরাস	২টি	৬০টি
			রেডিয়াস	২টি	
			আলনা	২টি	
			কার্পাল	১৬টি	
			মেটাকার্পাল	১০টি	
			ফ্যালাঞ্জেস	২৮টি	
	শ্রোণি-অস্থিচক্র		ইলিয়াম	১টি	২টি
			ইশ্চিয়াম	১টি	
			পিউবিস	১টি	
			(প্রতিপাশের অস্থিগুলো (৩+৩) মিলিত হয়ে একটি করে হিপ বোন গঠন করে। সে হিসেবে দুপাশে দুটি হিপ বোন থাকে)		
	পা (দুটি)		ফিমার	২টি	৬০টি
			টিবিয়া	২টি	
			ফিবুলা	২টি	
			প্যাটেলা	২টি	
			টার্সাল	১৪টি	
			মেটাটার্সাল	১০টি	
			ফ্যালাঞ্জেস	২৮টি	
					সর্বমোট = ২০৬ টি

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

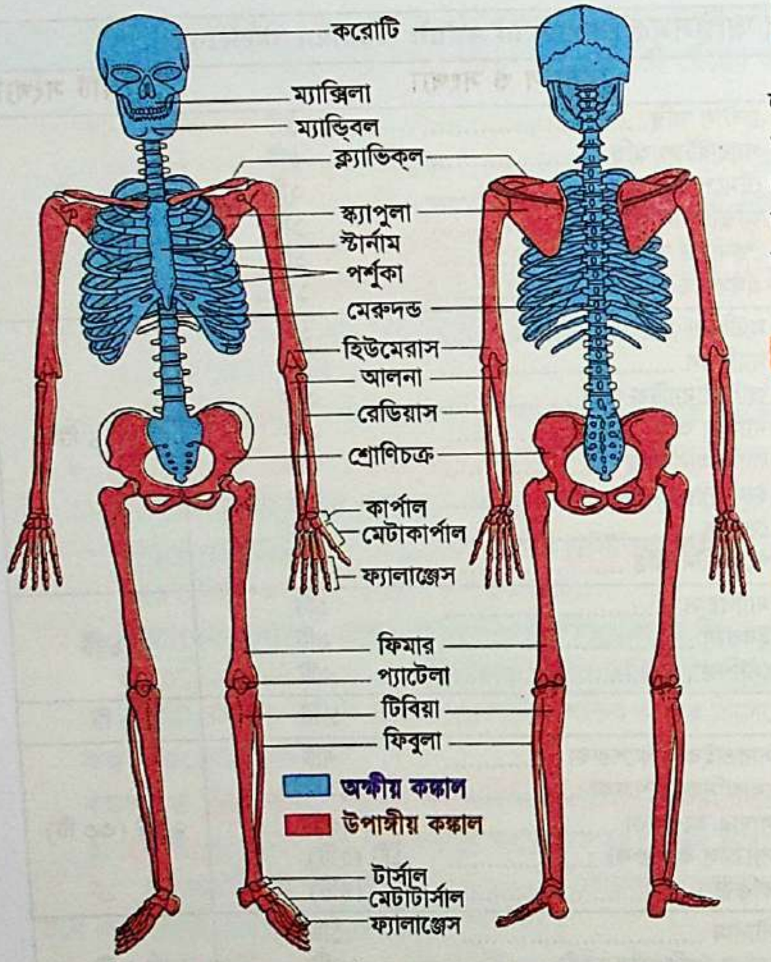

চিত্র ৭.১ : মানব কঙ্কাল (বায়ে-সম্মুখদৃশ্য; ডানে-পশ্চাৎদৃশ্য)

১. অক্ষীয় কঙ্কাল (Axial Skeleton)

কঙ্কালতন্ত্রের যে অস্থিগুলো দেহের লম্বঅক্ষ বরাবর অবস্থান করে কোমল, নমনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলোকে ঘিরে রাখে এবং দেহকান্ডের বিভিন্ন অংশকে যুক্ত করে অবলম্বন দান করে সেগুলোকে একত্রে **অক্ষীয় কঙ্কাল** বলে।

অক্ষীয় কঙ্কাল করোটি, মেরুদন্ড এবং বক্ষপিঞ্জর-এ বিভক্ত। নিচে এসব অংশের বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. করোটি (Skull)

মুখমণ্ডলীয় ও করোটিকা-অস্থি নিয়ে গঠিত মাথার কঙ্কালিক গঠনকে করোটি বলে। ২৯টি অস্থি নিয়ে করোটি গঠিত। করোটির অস্থিগুলো **করোটিকা** বা খুলির অস্থি এবং **মুখমন্ডলীয় অস্থি** এ দুভাগে বিভক্ত।

i. করোটিকা (Cranium)

করোটির যে অংশ মস্তিষ্ক আবৃত করে রাখে তাকে **করোটিকা** বলে। ছয় ধরনের মোট আটটি সুগঠিত, চাপা ও শক্ত অস্থি নিয়ে করোটিকা গঠিত। অস্থিগুলো খাঁজকাটা কিনারাযুক্ত হওয়ায় একত্রে ঘন সন্নিবেশিত ও একে অন্যের সাথে **সূচার সন্ধির** (suture joint) মাধ্যমে দৃঢ়সংলগ্ন থাকে।

করোটিকা যে সব অস্থি নিয়ে গঠিত সেগুলো হচ্ছে– কপাল নির্মাণকারী বড় ঝিনুকের মতো একটি **ফ্রন্টাল** (frontal), চারকোণা পেটের মতো দুটি **প্যারাইটাল** (parietal), চার অংশে বিভক্ত দুটি **টেমপোরাল** (temporal), খোলসের মতো একটি **অক্সিপিটাল** (occipital), ডানার মতো একটি **স্ফেনয়েড** (sphenoid) এবং ছিদ্রাল আড়াআড়ি প্লেটের মতো একটি **এথময়েড** (ethmoid)।

কাজ : করোটিকা মস্তিষ্ককে আবৃত ও সুরক্ষিত করে।

ii. মুখমন্ডলীয় অস্থি (Facial bones)

করোটিকার সামনের ও নিচের দিকের অংশ মুখমন্ডল। একটি জোড়অস্থি বা **ম্যাক্সিলা** (ঊর্ধ্বচোয়াল), U আকৃতির একটি **ম্যান্ডিবল** (mandible; নিম্নচোয়াল), চারকোণা দুটি **জাইগোম্যাটিক** (zygomatic), আয়তাকার দুটি **ন্যাসাল** (nasal), খাদ ও ঝুঁটি সম্বলিত **ল্যাক্রিমাল** (lacrimal), চারকোণা একটি **ভোমার** (vomer) এবং অনুলম্ব প্লেটে গঠিত দুটি **প্যালেটিন** (palatine) নিয়ে মুখমন্ডল গঠিত।

কাজ : মুখমন্ডলীর অস্থিগুলো সুসজ্জিত হয়ে চোখ, কান, নাক ও মুখগহ্বর সৃষ্টি করে।

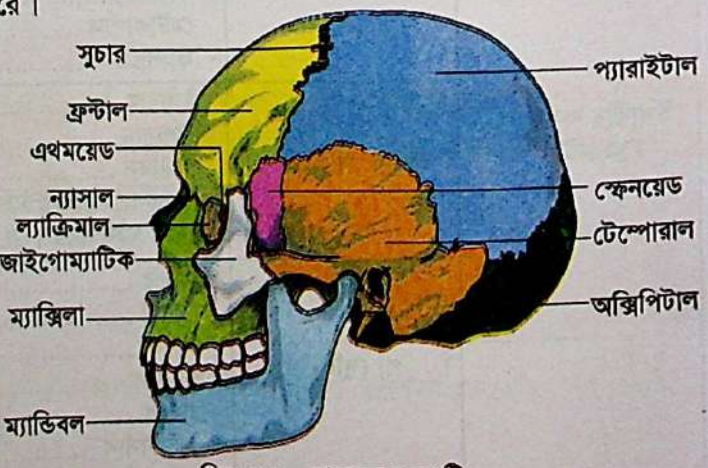

চিত্র ৭.২ : মানুষের করোটি

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

খ. মেরুদন্ড (Vertebral Column)

অ্যাটলাস (atlas) থেকে কক্কিক্স (coccyx) পর্যন্ত প্রলম্বিত, সুষুম্না কান্ড (spinal cord) কে ঘিরে অবস্থিত একসারি কশেরুকা নিয়ে গঠিত এবং দেহের অক্ষকে অবলম্বনদানকারী অস্থিময় ও নমনীয় গঠনকে **মেরুদণ্ড** বলে। মেরুদন্ডকে শিরদাঁড়া, স্পাইন, স্পাইনাল কলাম প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। ৩৩টি অনিয়ত আকৃতির অস্থিখন্ড নিয়ে মেরুদণ্ড গঠিত। মেরুদন্ডের প্রত্যেকটি অস্থিখন্ডকে **কশেরুকা** (vertebra, বহুবচনে vertebrae) বলে।

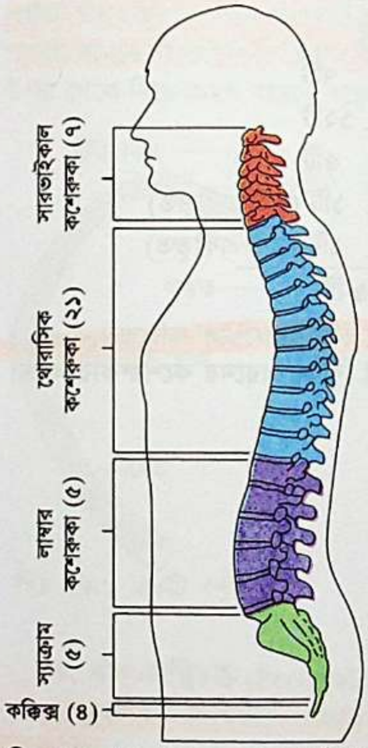

চিত্র ৭.৩ : মানুষের মেরুদণ্ড (পার্শ্বদৃশ্য)

একটি আদর্শ কশেরুকার গঠন

দেহের বিভিন্ন অঞ্চলের এমনকি একই অঞ্চলের বিভিন্ন কশেরুকায়ও পার্থক্য দেখা যায়। তা সত্ত্বেও সকল কশেরুকাই একটি মৌলিক গড়নের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিচে মানুষের একটি আদর্শ কশেরুকার (মধ্য-বক্ষদেশীয় কশেরুকা) বর্ণনা দেয়া হলো।

১. **সেন্ট্রাম (Centrum) বা ভার্টিব্রাল বডি** (Vertebral body): এটি কশেরুকার বৃহত্তম ও সম্মুখস্থ স্থূল অংশ, দেখতে ডিম্বাকার রডের একটি খন্ডের মতো। কোমলাস্থি নির্মিত সিমফাইসিস (symphysis) বা আন্তঃকশেরুকীয় চাকতি (intervertebral disc)-র সাহায্যে সমস্ত কশেরুকার দেহ পরস্পরের সঙ্গে আটকে থাকে। সেন্ট্রাম শক্ত, পুরু ও স্পঞ্জি অস্থিতে গঠিত।

২. **আর্চ (Arch)** : এটি কশেরুকা-দেহের পৃষ্ঠতলে অবস্থিত রিংয়ের মতো গঠন। আর্চ নিম্নোক্ত অংশগুলো ধারণ করে।

- **পেডিকল (Pedicle)** : কশেরুকা-দেহের উভয় পশ্চাৎ-পার্শ্ব থেকে উত্থিত ও পিছনে বর্ধিত খাটো শক্ত গঠন।
- **ট্রান্সভার্স প্রসেস (Transverse process)** : উভয় পাশে পেডিকল ও ল্যামিনার সংযোগস্থল থেকে উত্থিত পার্শ্বীয় প্রবর্ধন।
- **ল্যামিনা (Lamina)** : উভয় পাশে ট্রান্সভার্স ও স্পাইনাস প্রসেসের মাঝখানে অবস্থিত চওড়া, চাপা, তির্যক ও ঢালু প্লেটের মতো অস্থি।
- **আর্টিকুলার প্রসেস (Articular process)** : উভয় পাশে ল্যামিনা ও পেডিকলের সংযোগস্থল থেকে উদগত একটি সুপিরিয়র ও একটি ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস। একটি কশেরুকার সুপিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেস অন্য কশেরুকার ইনফিরিয়র আর্টিকুলার প্রসেসের সংগে যুক্ত থাকে।
- **স্পাইনাস প্রসেস (Spinous process)**: দুই ল্যামিনির সংযোগস্থল থেকে একটি পশ্চাৎ মধ্যরেখীয় প্রবর্ধন যা নিম্নমুখী প্রসারিত। ২য়-৬ষ্ঠ সারভাইকাল কশেরুকার এ প্রসেস প্রান্তের দিকে দ্বিখন্ডিত।

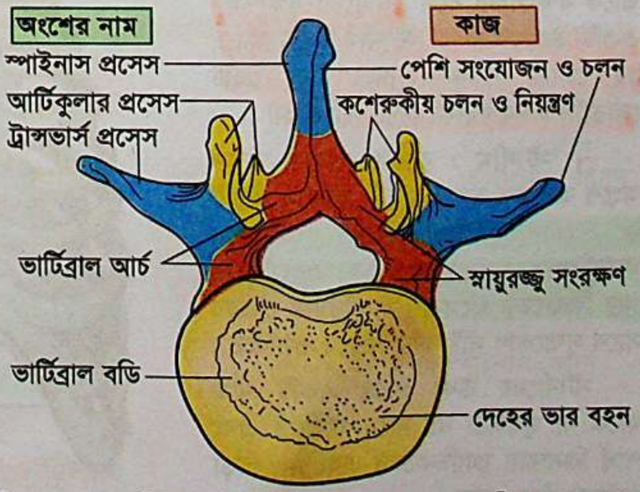

চিত্র ৭.৪ : একটি আদর্শ কশেরুকা (৫ম থেকে ৮ম বক্ষীয় কশেরুকা)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কশেরুকার ছিদ্রপথ ও নালি : পেডিকলের উর্ধ্ব ও নিম্নদেশে যে খাঁজ (notch) থাকে তা সম্মিলিতভাবে **ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন** (intervertebral foramen) গঠন করে। এ ছিদ্রের ভিতর দিয়ে সুষুম্না স্নায়ু ও রক্তবাহিকা অতিক্রম করে। কশেরুকার যে বড় ছিদ্রটি সামনে দেহ, পিছনে আর্চ ও পাশে পেডিকলে নির্মিত, তাকে **ভার্টিব্রাল ফোরামেন** (vertebral foramen) বলে। সকল কশেরুকার ছিদ্র সম্মিলিতভাবে **ভার্টিব্রাল ক্যানেল** (vertebral canal) নির্মাণ করে। এর ভিতরে **ঝিল্লিসহ সুষুম্না কান্ড** (spinal cord) ও রক্তনালিকা সুরক্ষিত থাকে।

কশেরুকার প্রকারভেদ (Types of Vertebrae)

অবস্থান অনুযায়ী কশেরুকাগুলোকে নিম্নোক্ত ৫টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়ে থাকে;

১. **সারভাইকাল (গ্রীবাদেশীয়) কশেরুকা** (Cervical vertebrae) .... ৭টি
২. **থোরাসিক (বক্ষদেশীয়) কশেরুকা** (Thoracic vertebrae) .... ১২টি
৩. **লাম্বার (কটিদেশীয়) কশেরুকা** (Lumbar vertebrae) .... ৫টি
৪. **স্যাক্রাল (শ্রোণিদেশীয়) কশেরুকা** (Sacral vertebrae) .... ১টি (৫টি একীভূত)
৫. **কক্কিজিয়াল (পুচ্ছদেশীয়) কশেরুকা** (Coccygeal vertebrae) .... ১টি (৪টি একীভূত)

মোট ২৬ টি

পরিণত বয়সে স্যাক্রাল কশেরুকাগুলো একীভূত হয়ে **স্যাক্রাম** (sacrum) এবং কক্কিজিয়ালগুলো **কক্কিক্স** (coccyx) গঠন করে। ফলে, সর্বমোট কশেরুকার সংখ্যা কমে ২৬টি হয়। ব্যবহারিক অংশে বিভিন্ন ধরনের কশেরুকার বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

মেরুদন্ডের কাজ

- দেহকান্ডের সুষ্ঠু সঞ্চালনে মজবুত ও নমনীয় অবলম্বন হিসেবে কাজ করে।
- সুষুম্না কান্ড ও সুষুম্না স্নায়ুমূলকে বেষ্টন ও রক্ষা করে।
- মাথাকে অবলম্বন দেয় এবং **পিভট** (pivot)-এর মতো কাজ করে।
- পর্শুকা সংযোগের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে দেহের অক্ষরূপে কাজ করে।
- দেহের ভঙ্গি দানে ও চলাফেরায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ. বক্ষপিঞ্জর (Thoracic cage)

পর্শুকাগুলো একদিকে থোরাসিক কশেরুকা ও অন্যদিকে স্টার্নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে খাঁচার মতো আকৃতি দান করে, তাকে **বক্ষপিঞ্জর** বলে। মানুষের বক্ষপিঞ্জর একটি **উরঃফলক বা স্টার্নাম** (sternum), ১২ জোড়া **পর্শুকা** (ribs) এবং ১২টি **থোরাসিক কশেরুকা** নিয়ে গঠিত হয়।

- **স্টার্নাম :** বুকের কেন্দ্রীয় সম্মুখ অংশে অবস্থিত চাপা অস্থিটি স্টার্নাম। এটি ৩ অংশে বিভক্ত-উপরের ত্রিকোণা ম্যানুব্রিয়াম; মাঝের লম্বা দেহ; এবং নিচের ক্ষুদ্র জিফয়েড প্রসেস। ম্যানুব্রিয়াম দেহের সাথে সূক্ষ্মকোণ সৃষ্টি করে সম্মুখে প্রসারিত।

স্টার্নামের উর্ধ্ব প্রান্তে একটি খাঁজ থাকে যা জুগুলার নচ নামে পরিচিত এবং পার্শ্ব কিনারায় ক্ল্যাভিকলের এবং ৭ জোড়া পর্শুকার খাঁজ থাকে।

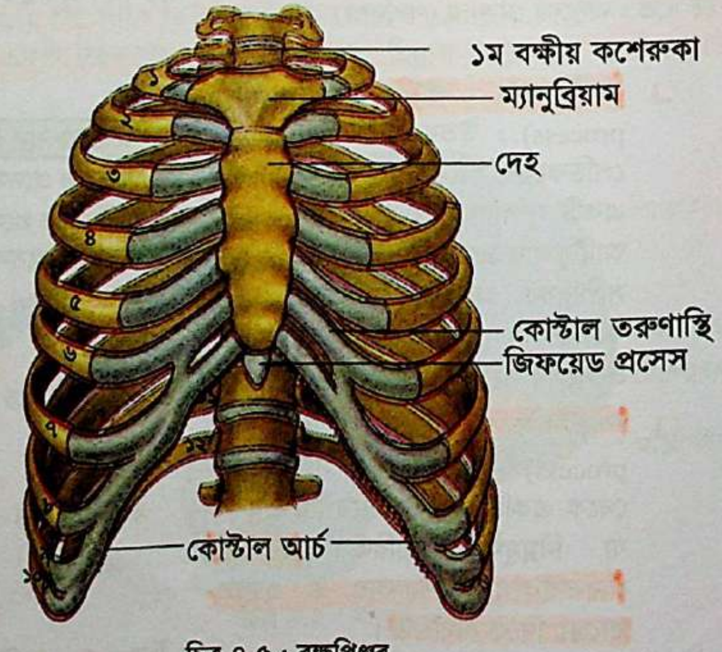

চিত্র ৭.৫ : বক্ষপিঞ্জর

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

□ **পর্শুকা** : পর্শুকাগুলো লম্বা, সরু, চাপা ও বাঁকা অস্থি। মানুষের দেহে ১২ জোড়া পর্শুকা থাকে। একটি আদর্শ পর্শুকা পশ্চাৎপ্রান্তে ফ্যাসেটবাহী **মস্তক** (ক্যাপিচুলাম), ক্রেস্টবাহী **গ্রীবা**, সংযোগী তলসহ **টিউবার্কল** এবং কোণ সৃষ্টি করে বাঁকানো **দেহ** নিয়ে গঠিত। মস্তক থোরাসিক কশেরুকার দেহের সাথে এবং টিউবার্কল দিয়ে একই কশেরুকার ট্রান্সভার্স প্রসেসের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

পর্শুকার সম্মুখ প্রান্ত তরুণাস্থিময়। প্রথম ৭ জোড়া পর্শুকা এদের তরুণাস্থি দিয়ে স্টার্নামের সাথে যুক্ত থাকে, এগুলো **আসল** (প্রকৃত) পর্শুকা। বাকি ৫ জাড়া (৮ম–১২শ) স্টার্নামের সাথে যুক্ত নয় বলে তা **নকল** পর্শুকা। ৮ম, ৯ম ও ১০শ পর্শুকা উপরস্থিত পর্শুকার তরুণাস্থির সাথে একীভূত হয়ে **কোস্টাল আর্চ** (costal arch) নির্মাণ করে। ১১শ ও ১২শ পর্শুকা সামনে মাংসপেশিতে উন্মুক্ত থাকে। এগুলো সরল, ক্ষুদ্র ও **ভাসমান** পর্শুকা নামে অভিহিত। প্রকৃত পর্শুকার দৈর্ঘ্য উপর থেকে নিচে ক্রমশ বাড়তে থাকে, কিন্তু নকল পর্শুকার ক্ষেত্রে ঘটে উল্টো ঘটনা।

চিত্র ৭.৬ : একটি পর্শুকা

পর্শুকার অন্তর্তলের নিচের কিনারায় কোস্টাল খাঁজে স্নায়ু ও রক্তবাহিকা অবস্থান করে। প্রথম পর্শুকা জোড়ার উপরতলে পেশি সংযোজনের জন্য দুটি এবং সাবক্ল্যাভিয়ান ধমনি ও শিরা ধারণের জন্য দুটি খাঁজ থাকে। বহিঃ ও অন্তঃ ইন্টারকোস্টাল পেশি প্রতি দুই কশেরুকার মধ্যে তির্যকভাবে বিন্যস্ত। উপরে ও নিচে দুই কোস্টাল তরুণাস্থির মধ্যবর্তী ফাঁকা **স্থানটি ইন্টারকোস্টাল স্পেস**।

বক্ষপিঞ্জরের কাজ : হৃৎপিন্ড, ফুসফুস প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বক্ষপিঞ্জরের ভিতরে সুরক্ষিত থাকে।

২. উপাঙ্গীয় কঙ্কাল (Appendicular Skeleton)

ঊর্ধ্বাঙ্গ (দুই বাহু ও বক্ষ-অস্থিচক্র) ও **নিম্নাঙ্গ** (দুই পা ও শ্রোণি-অস্থিচক্র)-এর অস্থিগুলোকে একত্রে **উপাঙ্গীয় কঙ্কাল** বলে।

ঊর্ধ্বাঙ্গের অস্থিসমূহ

বক্ষ–অস্থিচক্র ও **দুবাহু** নিয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গ গঠিত। দেহের উভয় পাশের ৩২টি করে মোট ৬৪টি অস্থি ঊর্ধ্বাঙ্গের অন্তর্গত।

ক. বক্ষ-অস্থিচক্র (Pectoral Girdle)

মানুষের বক্ষ–অস্থিচক্র ২ জোড়া অস্থি নিয়ে গঠিত, যথা–একজোড়া **ক্ল্যাভিকল** (clavicle) ও একজোড়া **স্ক্যাপুলা** (scapula)।

□ **ক্ল্যাভিকল** দেখতে ইটালিক '*f*' এর মতো বাঁকা অস্থি। এটি একটি দেহ ও দুটি প্রান্ত, যথা **স্টার্নাল** (স্টার্নামের ম্যানুব্রিয়ামে যুক্ত থাকে) এবং **অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস** (স্ক্যাপুলায় যুক্ত থাকে) নিয়ে গঠিত।

□ **স্ক্যাপুলা** দেখতে চাপা ও ত্রিকোণা অস্থি। এর একটি **সম্মুখ বা কোস্টাল তল** (costal surface), একটি পশ্চাৎ তল বা **কোরাকয়েড প্রসেস** (coracoid process), একটি **অ্যাক্রোমিয়াল প্রসেস** (acromial process) এবং **গ্লিনয়েড গহ্বর** (glenoid cavity) নামে একটি সংযোগী অবতল আছে।

সম্মুখ তল পর্শুকাগুলোর দিকে মুখ করে থাকে। এতে **সাবস্ক্যাপুলার ফসা** (subscapular fossa) নামে একটি অবতল অংশ আছে। গ্লেনয়েড গহ্বরে হিউমেরাসের মস্তক আটকানো থাকে।

পশ্চাৎতলে **স্ক্যাপুলার কাঁটা** (spine of scapula) থাকে যা স্ক্যাপুলার পশ্চাৎতলকে **সুপ্রাস্পাইনাস** (supraspinous) ও **ইনফ্রাস্পাইনাস** (infraspinous) ফসা (fossa)-য় বিভক্ত করে।

চিত্র ৭.৭ : স্ক্যাপুলা (পৃষ্ঠদৃশ্য)

খ. বাহুর অস্থি (Bones of Upperlimb)

বাহুকে ৩টি অঞ্চলে ভাগ করা যায়, যথা **ঊর্ধ্ববাহু, সম্মুখবাহু এবং হাতের অস্থি**।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১. ঊর্ধ্ববাহুর অস্থি বা হিউমেরাস (Humerus) : ঊর্ধ্ববাহু হিউমেরাস নামে একটি লম্বা, নলাকার হাড়ে গঠিত। এর ঊর্ধ্বপ্রান্তে রয়েছে মসৃণ, গোল মস্তক যা স্ক্যাপুলার গ্লেনয়েড গহ্বরে প্রবিষ্ট থাকে। তা ছাড়াও আছে ছোট ও বড় **টিউবার্কল** এবং এর মাঝখানে **অ্যানাটমিকাল গ্রীবা** (anatomical neck) নামে একটি খাঁজ।

টিউবার্কলের নিচে যে সরু অংশ থেকে হিউমেরাসের মূল দেহ গঠিত হয় তাকে **সার্জিকাল গ্রীবা** (surgical neck) বলে (কারণ, দুর্ঘটনায় এ অংশেই সচরাচর ফাটল ধরে)। মূল দেহের মধ্যভাগে পেশি সংযুক্তির জন্য খসখসে **ডেলটয়েড রিজ** (deltoid ridge) রয়েছে। দেহের কিনারা নিম্নপ্রান্তে এসে **এপিকন্ডাইল** (epicondyle) গঠন করে। এপিকন্ডাইলের নিচে **কন্ডাইল** (condyle) থাকে যা **ক্যাপিচুলাম** (capitulum) ও **ট্রকলিয়া** (trochlea)-য় বিভক্ত।

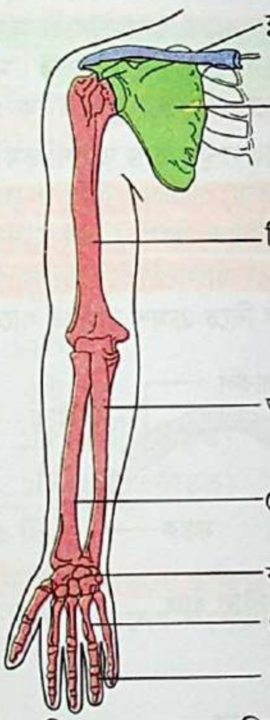

চিত্র ৭.৮ : বাহুর অস্থিসমূহ

২. সম্মুখবাহুর অস্থি বা রেডিয়াস-আলনা (Radius–Ulna) : সম্মুখবাহু দুটি লম্বা, নলাকার ও ঘনসংলগ্ন অস্থি নিয়ে গঠিত, যথা–আলনা ও রেডিয়াস। অন্তর্ভাগের অস্থিটি আলনা। এর ঊর্ধ্বপ্রান্তে **করনয়েড প্রসেস ও ওলেক্রেনন প্রসেস**, একটি **ট্রকলিয়ার নচ** ও একটি **টিউবারোসিটি** (অর্বুদ) অবস্থিত। নিম্নপ্রান্ত **মাথা ও স্টাইলয়েড প্রসেস**-এ বিভক্ত। রেডিয়াসের ঊর্ধ্বপ্রান্তে রয়েছে একটি খাঁজসহ মাথা, গ্রীবা ও অর্বুদ এবং নিম্নপ্রান্তে কার্পাল অস্থির সংযোগী তল ও একটি স্টাইলয়েড প্রসেস। ঊর্ধ্বপ্রান্তে রেডিয়াস ও আলনা অ্যানুলার পেশিতে এবং বাকি অংশ অ্যান্টিব্রাকিয়াল ঝিল্লি দিয়ে যুক্ত থাকে।

৩. হাতের অস্থি : কব্জি, করতল ও আঙ্গুল নিয়ে হাত গঠিত।

কব্জি : দুসারিতে ৪টি করে মোট ৮টি ছোট ছোট বিভিন্ন আকৃতির **কার্পাল** (carpal) অস্থিতে কব্জি গঠিত। গোড়ার দিকের সারিতে থাকে স্ক্যাফয়েড (নেভিকুলার), লুনেট, ট্রাইকুয়েট্রাল ও পিসিফর্ম অস্থি, এবং প্রান্তের দিকে থাকে ট্র্যাপেজিয়াম, ট্র্যাপেজয়েড, ক্যাপিটেট ও হ্যামেট অস্থি।

করতল : করতলের ৫টি অস্থিকে **মেটাকার্পাল** (metacarpal) বলে। এগুলো লম্বা ও নলাকার এবং একটি গোড়া, শ্যাফট ও মাথা নিয়ে গঠিত।

আঙ্গুল : আঙ্গুলের অস্থিগুলোকে **ফ্যালাঞ্জেস** (phalanges; একবচনে phalanx) বলে। এগুলো খাটো ও নলাকার। বৃদ্ধাঙ্গুলে ২টি এবং অন্য আঙ্গুলগুলোতে ৩টি করে ফ্যালাঞ্জেস থাকে।

নিম্নাঙ্গের অস্থিসমূহ

শ্রোণি-অস্থিচক্র ও দু'পা নিয়ে নিম্নাঙ্গ গঠিত। দেহের উভয় পাশের ৩১টি করে মোট ৬২টি অস্থি নিম্নাঙ্গের অন্তর্গত। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. শ্রোণি-অস্থিচক্র (Pelvic Girdle)

এটি **ইলিয়াম** (ilium), **ইশ্চিয়াম** (ischium) ও **পিউবিস** (pubis) অস্থি নিয়ে গঠিত। প্রাপ্ত বয়স্ক মানবে এ অস্থিগুলো একত্রিত হয়ে **নিতম্বাস্থি** (hip bone) গঠন করে। দুটি নিতম্বাস্থি একত্রে মিলে গঠিত হয় শ্রোণি-অস্থিচক্র।

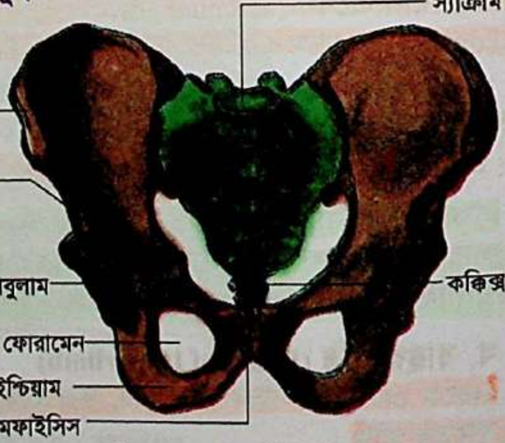

চিত্র ৭.৯ : শ্রোণি-অস্থিচক্র

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

▫ **ইলিয়ামটি** দেহ ও ডানায় বিভক্ত। ডানার কিনারাকে ইলিয়াক ঝুঁটি (ক্রেস্ট) বলে। কিনারা দুটি উঁচু অংশে সমাপ্ত হয়েছে, এদের সম্মুখ সুপিরিয়র ও পশ্চাৎ সুপিরিয়র কাঁটা বলে। এদের নিচে থাকে সম্মুখ ইনফিরিয়র ও পশ্চাৎ ইনফিরিয়র কাঁটা। তা ছাড়াও ইলিয়ামে আর্কুয়েট রেখা, ইলিয়াক ফসা, গ্লুটিয়াল রেখা ও একটি অরিকুলার সংযোগী তল থাকে।

▫ **পিউবিসটি** দেহ ও দুটি শাখায় বিভক্ত। শাখা দুটিকে ঊর্ধ্ব ও নিম্ন র‍্যামি (একবচনে–র‍্যামাস) বলে। ঊর্ধ্ব র‍্যামাসে একটি পিউবিক অর্বুদ (টিউবারোসিটি) এবং একটি পিউবিক ঝুঁটি থাকে।

▫ **ইশ্চিয়ামটি** দেহ, ঊর্ধ্ব ও নিম্ন র‍্যামি, ইশ্চিয়াল অর্বুদ এবং ইশ্চিয়াল কাঁটা নিয়ে গঠিত। কাঁটাটি বড় ইশ্চিয়াল খাঁজকে ছোটটি থেকে পৃথক করেছে। পিউবিক ও ইশ্চিয়াল র‍্যামি অবটুরেটর ছিদ্রকে বেষ্টন করে রাখে। ছিদ্রটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে যোজক টিস্যুর ঝিল্লিতে আবৃত। ইলিয়াম, ইশ্চিয়াম ও পিউবিসের সংযোগস্থলে **অ্যাসিটাবুলাম** (acetabulum) নামে একটি অগভীর অংশ রয়েছে। এতে ফিমারের মস্তক আটকানো থাকে।

শ্রোণি-অস্থিচক্রের কাজ : বস্তিকোটর, মূত্রাশয়, অন্ত্রের নিম্নাংশ প্রভৃতি অঙ্গে অবলম্বন দান করা, ভার বহন করা এবং সুরক্ষা করা শ্রোণিচক্রের কাজ। ফিমারের মস্তক অ্যাসিটাবুলাম-এ যুক্ত থাকে।

Ilium ও Ileum এর মধ্যে পার্থক্য

Ilium	Ileum
১. মেরুদণ্ডী প্রাণিদের শ্রোণিচক্রের একটি বিশেষ অস্থি।	১. সকল মেরুদণ্ডী ও কিছু অমেরুদণ্ডী প্রাণিদের পৌষ্টিকনালির ক্ষুদ্রান্ত্রের একটি অংশ।
২. ডানার মতো আকার।	২. সরু নালি বিশেষ।
৩. অস্থি নির্মিত।	৩. বিভিন্ন পেশিস্তরে গঠিত।
৪. ফিমারকে মেরুদণ্ডের সাথে যুক্ত রাখে।	৪. খাদ্য পরিপাক ও শোষণে সাহায্য করে।

পুরুষ ও মহিলার শ্রোণিচক্রের পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	পুরুষের শ্রোণিচক্র	মহিলার শ্রোণিচক্র
১. অস্থির গঠন	ভারী এবং আকারে বড়।	হালকা ও আকারে ছোট।
২. পেলভিসের ছিদ্র	অপেক্ষাকৃত ছোট।	অধিকতর বড়।
৩. স্যাক্রাম	সরু।	খাটো, প্রশস্ত ও চ্যাপ্টা।
৪. পিউবিক সিমফাইসিস	অগভীর।	গভীরতর।
৫. অ্যাসিটাবুলাম	বড়, পার্শ্ব অভিমুখী।	ছোট, সম্মুখ অভিমুখী।

খ. পা-এর অস্থি (Bones of Lowerlimb)

মানুষের পা ঊর্ধ্ব পা, নিম্ন পা ও চরণ নিয়ে গঠিত।

১. ঊর্ধ্ব পা-এর অস্থি বা ফিমার (Femur) : ঊর্ধ্ব পা-এর অস্থিকে **ফিমার** বলে। এটি মানবদেহের সবচেয়ে দীর্ঘ অস্থি। এর ঊর্ধ্বপ্রান্তে একটি গোল মস্তক, গ্রীবা এবং ছোট ও বড় ট্রোক্যান্টার অবস্থিত। দেহটি শক্ত ও নলাকার। এর পশ্চাৎতল একটি অমসৃণ আলযুক্ত। নিম্নপ্রান্ত দুটি কন্ডাইলবিশিষ্ট। দুই কন্ডাইলের মাঝখানে থাকে আন্তঃকন্ডাইলার ছিদ্র, প্যাটেলার সংযোগী তল এবং দুপাশে একটি করে **এপিকন্ডাইল** নামে সামান্য উঁচু জায়গা।

ফিমারের প্রান্তে **প্যাটেলা** (patella) নামে একটি প্রায় ত্রিকোণাকার অস্থি অবস্থিত। প্যাটেলা একটি সিসাময়েড অস্থি (sesamoid bone), কারণ এর উৎপত্তি পেশির টেনডন থেকে। প্যাটেলার পশ্চাৎভাগের ঊর্ধ্বাংশ ফিমারের সাথে এবং নিম্নাংশ টিবিয়ার সাথে সংযুক্ত।

২. নিম্ন পা-এর অস্থি বা টিবিয়া-ফিবুলা (Tibia-fibula): নিম্ন পা-এ দুটি অস্থি থাকে, যথা–**টিবিয়া** ও **ফিবুলা**। টিবিয়া বেশি মোটা। এর ঊর্ধ্বপ্রান্ত দুটি কন্ডাইল, একটি আন্তঃকন্ডাইলার স্ফীতি, ফিমারের সাথে সংযুক্ত হওয়ার জন্য দুটি সংযোগী তল এবং পেশি সংযোজনের জন্য একটি **টিউবারোসিটি** বহন করে। টিবিয়ার দেহ ত্রিধারবিশিষ্ট। এর

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

সম্মুখ কিনারা ঝুঁটি নামে পরিচিত। টিবিয়ার নিম্নপ্রান্তে ম্যালিওলাস নামে দুপাশে উঁচু অংশ থাকে। এতে ট্যালাস (টার্সাল অস্থি)-এর সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য সংযোগী তলও রয়েছে।

ফিবুলা দেখতে একটি দীর্ঘ যষ্টির মতো। এর মস্তক চোখা ধরনের। ঊর্ধ্বপ্রান্তে টিবিয়ার সংযোগের জন্য একটি সংযোগী তল থাকে। নিচের প্রান্তে থাকে ম্যালিওলাস।

৩. চরণ : গোড়ালি, পদতল ও আঙ্গুল নিয়ে চরণ গঠিত। গোড়ালি ও পদতলের পৃষ্ঠভাগ গঠিত হয় ৭টি বিভিন্ন আকৃতির টার্সাল (tarsal) অস্থি দিয়ে [একটি করে ক্যালকেনিয়াস, ট্যালাস, কিউবয়েড, নেভিকুলার ও ৩টি কুনিফর্ম]। মেটাটার্সাল–এর সংখ্যা ৫। এগুলো নলাকার ও সামান্য লম্বা এবং পদতল গঠন করে। পায়ের আঙ্গুলের অস্থিগুলো ফ্যালাঞ্জেস (phalanges)। এগুলো হাতের আঙ্গুল অপেক্ষা খাটো। বৃদ্ধাঙ্গুল ২টি এবং বাকি আঙ্গুলগুলো ৩টি করে ফ্যালাঞ্জেসে গঠিত। পা-এর অস্থিগুলো পরস্পরের সাথে সন্ধির মাধ্যমে যুক্ত। এদের ভিতর নিতম্ব সন্ধি, হাঁটু সন্ধি ও গোড়ালি সন্ধি সবচেয়ে বড়।

পায়ের কাজ : পা দুটি প্রত্যক্ষভাবে ভারবহন করে ও গমনের সাথে জড়িত।

চিত্র ৭.১০ : মানুষের পায়ের অস্থি

অস্থি ও তরুণাস্থি (Bone and Cartilage)

অস্থি ও তরুণাস্থি হচ্ছে বিশেষ ধরনের যোজক টিস্যু যাদের মাতৃকা (matrix) কঠিন বা অর্ধকঠিন পদার্থে তৈরি। এদের কঙ্কাল যোজক টিস্যু বলে।

অস্থি (Bone)

গঠন : অস্থি হচ্ছে দেহের সবচেয়ে সুদৃঢ় টিস্যু। এর মাতৃকা বা ম্যাট্রিক্স বিভিন্ন জৈব (৪০%) ও অজৈব (৬০%) পদার্থে গঠিত হওয়ায় সম্পূর্ণ টিস্যুটি কঠিন আকার ধারণ করে। জৈব অংশটি কোলাজেন (collagen) ও অসিমিউকয়েড (osimucoid)-এ গঠিত। অজৈব অংশটিতে প্রধানত ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বোনেট রয়েছে। মাতৃকায় প্রধানত তিন ধরনের অস্থিকোষ থাকে– অস্টিওব্লাস্ট (osteoblast), অস্টিওক্লাস্ট (osteoclast) এবং অস্টিওসাইট (osteocytes)। পেরিঅস্টিয়াম

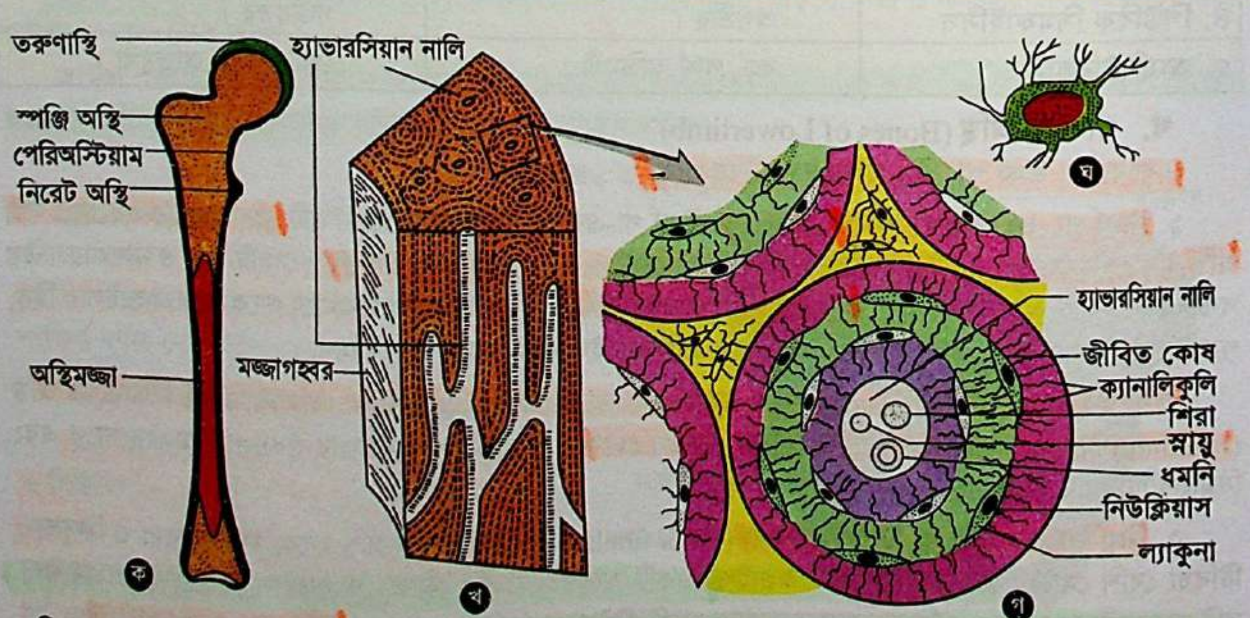

চিত্র ৭.১১ :অস্থির বিভিন্ন অংশ; (ক) লম্বচ্ছেদ; (খ) নিরেট অস্থির অংশবিশেষ; (গ) হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র; (ঘ) একটি অস্থিকোষ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

(periosteum) নামক তন্তুময় যোজক টিস্যু নির্মিত পাতলা ও মসৃণ আবরণ প্রতিটি অস্থিকে ঘিরে রাখে। অস্থিতে প্রচুর রক্ত সরবরাহ বিদ্যমান। এ টিস্যু মেরুদণ্ডী প্রাণীর দৈহিক কাঠামো নির্মাণ করে।

অস্থির প্রকারভেদ : উপাদানের ঘনত্ব, দৃঢ়তা ও গঠনের ভিত্তিতে অস্থিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়; যেমন–নিরেট অস্থি (compact bone) এবং স্পঞ্জি অস্থি (spongy bone)। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. নিরেট অস্থি (Compact bone) : নিরেট অস্থির ম্যাট্রিক্স কতকগুলো স্তরে (৫-১৫টি) সাজানো। স্তরগুলোকে **ল্যামেলি** (lamellae) বলে। ল্যামেলি একটি সুস্পষ্ট নালির চারদিকে চক্রাকারে বিন্যস্ত। কেন্দ্রীয় এ নালিটি হচ্ছে **হ্যাভারসিয়ান নালি** (haversian canal)। প্রতিটি হ্যাভারসিয়ান নালি ও একে বেষ্টনকারী ল্যামেলির সমন্বয়ে একটি **হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র** (haversian system) গড়ে উঠে। প্রত্যেক ল্যামেলায় (একবচন) **ল্যাকুনা** (lacuna) নামে কতকগুলো ক্ষুদ্র গহ্বর পাওয়া যায়। অস্থিকোষ ল্যাকুনার ভিতরে অবস্থান করে। প্রতিটি ল্যাকুনার চারদিক থেকে সূক্ষ্ম কতকগুলো নালিকা বেরোয়। এদের **ক্যানালিকুলি** (canaliculi) বলে। এসব নালিকার মাধ্যমে একটি হ্যাভারসিয়ান তন্ত্রের বিভিন্ন ল্যাকুনা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। অস্থির অভ্যন্তরে হ্যাভারসিয়ান নালিগুলো পরস্পরের আড়াআড়ি নালি দিয়ে যুক্ত থাকে। এসব নালিকে বলে **ভকম্যানস ক্যানাল** (Volkmann's canal)। হ্যাভারসিয়ান তন্ত্রসমূহের অন্তর্বর্তীস্থানে কঠিন ম্যাট্রিক্স ও অস্টিওসাইট উপস্থিত থেকে অস্থি সুদৃঢ় করে। অস্থির কেন্দ্রস্থলে যে গহ্বর থাকে তার নাম **মজ্জা গহ্বর**। গহ্বরটি **লাল বা হলুদ মজ্জা** (red or yellow bone marrow)–য় পূর্ণ থাকে। ফিমার ও হিউমেরাস এ ধরনের অস্থি।

২. স্পঞ্জি অস্থি (Spongy bone) : নিরেট অস্থির অভ্যন্তরে বিদ্যমান স্পঞ্জি অস্থি অপেক্ষাকৃত হালকা, অসংখ্য কুঠুরিযুক্ত স্পঞ্জের মতো। এসব অস্থির গঠন স্পঞ্জ বা মৌচাকের মতো বলে এদেরকে **ক্যানসেলাস** (cancellous) বা **ট্রাবেকুলার** (trabecular) **অস্থি** বলা হয়। মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের মোট ওজনের প্রায় ২০% স্পঞ্জি অস্থি। স্পঞ্জি অস্থির গাঠনিক ও কার্যকরি একককে **ট্রাবেকুলা** (trabecula) বলে যা ল্যামিলি, অস্টিওসাইট, ল্যাকুনি ও ক্যানালিকুলির সমন্বয়ে গঠিত। ট্রাবেকুলাসমূহের মধ্যবর্তী স্থান লোহিত অস্থিমজ্জা দ্বারা পূর্ণ থাকে। অস্থি আবরণ **পেরিঅস্টিয়াম** থেকে রক্তনালিকা ট্রাবেকুলাতে প্রবেশ করে অস্থির কোষমূহকে পুষ্টি সরবরাহ করে। স্পঞ্জি অস্থিতে ক্যালসিয়াম লবণের পরিমাণ কম থাকে। এতে হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র থাকে না। স্তন্যপায়ীদের করোটিকা, চ্যাপ্টা হাড়, বৃহৎ অস্থির প্রান্তভাগ এবং পাখিদের সকল অস্থি স্পঞ্জি ধরনের। শিশুদের প্রায় সকল অস্থিই স্পঞ্জি প্রকৃতির।

নিরেট অস্থি ও স্পঞ্জি অস্থির মধ্যে পার্থক্য

নিরেট অস্থি	স্পঞ্জি অস্থি
১. এদের কর্টিকেল অস্থি বলা হয়।	১. এদের ট্রাবেকুলার অস্থি বলা হয়।
২. হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র নামক এককে গঠিত।	২. ট্রাবেকুলা নামক এককে গঠিত।
৩. ঘন, ভারী ও মজবুত ধরনের।	৩. পাতলা ও হালকা ধরনের।
৪. এটি অস্থির বাইরের প্রধান স্তর গঠন করে।	৪. এটি নিরেট অস্থির ভিতরে অবস্থান করে।
৫. মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের মোট ওজনের প্রায় ৮০% নিরেট অস্থি।	৫. মানবদেহের কঙ্কালতন্ত্রের মোট ওজনের প্রায় ২০% স্পঞ্জি অস্থি।

অস্থির কাজ : অস্থি মানবদেহের নিচে বর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করে।

১. অস্থি দেহের দৃঢ় ও মজবুত স্থাপত্য কাঠামো গঠন করে এবং দেহকে নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি প্রদান করে।
২. দেহের গুরুত্বপূর্ণ (অঙ্গাদি যেমন-মস্তিষ্ক, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, সুষুম্নাকাণ্ড প্রভৃতি) অস্থি নির্মিত কঙ্কাল দ্বারা সুরক্ষিত থাকে।
৩. দেহের অধিকাংশ পেশি, লিগামেন্ট ও টেনডন অস্থিতে সংযুক্ত থেকে বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন ঘটায়।
৪. অস্থিসন্ধি গঠন এবং পেশির সাথে সমন্বয় দ্বারা অস্থি নির্মিত কাঙ্কালতন্ত্র প্রাণীর চলনে প্রধান ভূমিকা রাখে।
৫. অস্থির ভিতরে অবস্থিত লোহিত অস্থিমজ্জা (red bone marrow) থেকে প্রতিনিয়ত লোহিত রক্তকণিকা সৃষ্টি হয়। পীত অস্থিমজ্জা (yellow bone marrow) সঞ্চিত চর্বির আধার হিসেবে কাজ করে।
৬. ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস জাতীয় খনিজ লবণ অস্থিতে সঞ্চিত হয়।
৭. কঙ্কালতন্ত্রের সবচেয়ে ছোট অস্থি অন্তঃকর্ণের মেলিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস শ্রবণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

তরুণাস্থি বা কোমলাস্থি (Cartilage)

তরুণাস্থির ম্যাট্রিক্স বা মাতৃকা কনড্রিন (chondrin) নামে একধরনের অর্ধ-কঠিন ও স্থিতিস্থাপক পদার্থে গঠিত। কনড্রিন কনড্রোমিউকয়েড (chondromucoid) ও কনড্রোঅ্যালবুনয়েড (chondroalbunoid) নামক দুধরনের প্রোটিনে গঠিত। তরুণাস্থিকোষকে কনড্রোসাইট (chondrocyte) বলে। ম্যাট্রিক্সে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু গহ্বর দেখা যায়। প্রত্যেকটি গহ্বর ল্যাকুনা (lacuna) নামে পরিচিত। প্রতিটি ল্যাকুনা এক বা একাধিক কনড্রোসাইট বহন করে। ল্যাকুনাগুলো তরলে পূর্ণ থাকে। পেরিকন্ড্রিয়াম (perichondrium) নামক রক্তনালি সমৃদ্ধ তন্তুময় আবরণীতে তরুণাস্থি আবৃত থাকে। আবরণী ও মাতৃকা ভেদ্য বলে তরুণাস্থি টিস্যুতে রক্তনালি প্রয়োজন হয়না। রক্তের বস্তুসমূহ ব্যাপনের (diffusion) মাধ্যমে কোষে প্রবেশে সক্ষম।

কাজ : (i) ম্যাট্রিক্সের বৈশিষ্ট্যের জন্য অন্যান্য টিস্যু অপেক্ষা অনেক বেশি চাপ ও টান (tension) সহ্য করতে পারে। (ii) বিভিন্ন অঙ্গের আকৃতি দান করে। (iii) অস্থিসন্ধিতে অবস্থান করে অস্থির প্রান্তভাগকে ঘর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করে। (iv) মেরুদন্ডী প্রাণিদের ভ্রূণীয় কঙ্কাল ও কন্ড্রিকথিস জাতীয় মাছের অন্তঃকঙ্কাল গঠন করে।

তরুণাস্থির প্রকারভেদ

ম্যাট্রিক্সের গঠনের উপর ভিত্তি করে নিচে বর্ণিত চার ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায় :

১. **স্বচ্ছ বা হায়ালিন (Hyaline) তরুণাস্থি :** এর ম্যাট্রিক্স সামান্য স্বচ্ছ, নীলাভ, নমনীয় এবং তন্তুবিহীন। স্তন্যপায়ীর নাক, শ্বাসনালি, স্বরযন্ত্র প্রভৃতি স্থানে এবং ব্যাঙ ও হাঙরের ভ্রূণে বা পরিণত দেহে প্রচুর পরিমাণে এ ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায়।

২. **স্থিতিস্থাপক (Elastic) বা পীত-তন্তুময় তরুণাস্থি :** এর ম্যাট্রিক্স অস্বচ্ছ ও হাল্কা হলুদ বর্ণের। ম্যাট্রিক্সে স্থিতিস্থাপক পীততন্তু ছড়ানো থাকে। বাইরের দিকের তুলনায় ভিতরের তন্তুগুলো অপেক্ষাকৃত ঘনবিন্যস্ত। বহিঃকর্ণ বা পিনা, ইউস্টেশিয়ান নালি, এপিগ্লটিস প্রভৃতি অংশে এ ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায়।

৩. **শ্বেত-তন্তুময় (White fibrous) তরুণাস্থি :** এর ম্যাট্রিক্সে প্রচুর পরিমাণ সাদা বর্ণের, অশাখ, অস্থিতিস্থাপক, কোলাজেন নির্মিত তন্তু সমান্তরালে বিন্যস্ত থাকে। বিশেষ কয়েকটি সন্ধিতে, যেমন–দুটি কশেরুকার মধ্যবর্তী অঞ্চলে এ ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায়।

৪. **চুনময় বা ক্যালসিফাইড (Calcified) তরুণাস্থি :** এ ক্ষেত্রে ম্যাট্রিক্সে প্রচুর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট জমা থাকে, ফলে অনেকটা অস্থির মতো শক্ত রূপ ধারণ করে। হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তকে এ ধরনের তরুণাস্থি পাওয়া যায়।

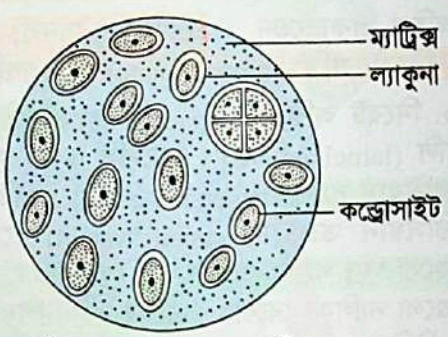

চিত্র ৭.১২ : স্বচ্ছ তরুণাস্থি

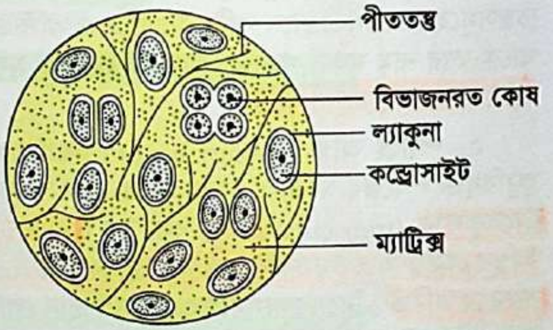

চিত্র ৭.১৩ : স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি

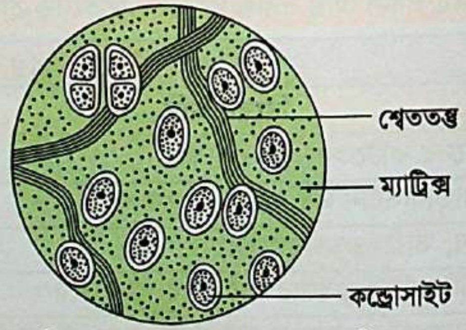

চিত্র ৭.১৪ : শ্বেত-তন্তুময় তরুণাস্থি

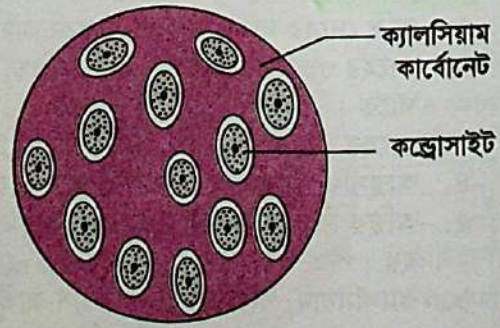

চিত্র ৭.১৫ : ক্যালসিফাইড তরুণাস্থি

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

তরুণাস্থি ও অস্থির মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বৈশিষ্ট্য	তরুণাস্থি (কোমলাস্থি)	অস্থি
১. অবস্থান	অস্থির সংযোগস্থলে, পর্শুকার শেষপ্রান্তে, নাসিকা, কর্ণছত্র, স্বরযন্ত্র প্রভৃতি স্থানে।	দেহের অন্তঃকঙ্কালরূপে।
২. গঠন	অকঠিন, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক এবং বিভিন্ন তন্তু ও কোষ নিয়ে গঠিত।	কঠিন, অনমনীয়, অস্থিতিস্থাপক এবং বিভিন্ন ধরনের অস্থিকোষ নিয়ে গঠিত।
৩. ম্যাট্রিক্স (মাতৃকা)	ম্যাট্রিক্সে কন্ড্রিন নামক জৈব পদার্থ থাকে।	ম্যাটিক্সে জৈব পদার্থের মধ্যে কোলাজেন তন্তু, মিউকোপলিস্যাকারাইড এবং অজৈব পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ইত্যাদি থাকে।
৪. কোষের গঠন	গোলাকার বা ডিম্বাকার।	মাকড়সার জালের মত।
৫. আবরণ	পেরিকন্ড্রিয়াম আবরণ দিয়ে আবৃত।	পেরিঅস্টিয়াম আবরণ দিয়ে আবৃত।
৬. হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র	থাকে না।	উপস্থিত।
৭. কাজ	দেহের আকৃতি ও ঋজুতা দান; অস্থি গঠন; এবং অস্থির সংযোজক অংশকে দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক করায় সহায়তা দান।	দেহের কাঠামো গঠন; নির্দিষ্ট আকৃতি দান; ভারবহন; দেহযন্ত্রের সুরক্ষা; এবং রক্তকণিকা উৎপাদনে সহায়তা দান।

ব্যবহারিক অংশ

মানুষের বিভিন্ন অস্থি পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ

মানুষের করোটি (Skull)

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. করোটিকার অস্থি, মুখমন্ডলের অস্থি,কর্ণাস্থি ও হাইওয়েড অস্থির সমন্বয়ে করোটি গঠিত।
২. চোয়াল ও ইন্দ্রিয়কোটর (নাক, কান, চোখ) বিদ্যমান।
৩. করোটির পেছনে ও নিচে একটি বড় ছিদ্রপথ বা **মহাবিবর** (foramen magnum) বিদ্যমান।
৪. করোটিকার অস্থিগুলো হচ্ছে- ফ্রন্টাল, প্যারাইটাল, অক্সিপিটাল, টেম্পোরাল, স্ফেনয়েড ও এথময়েড।

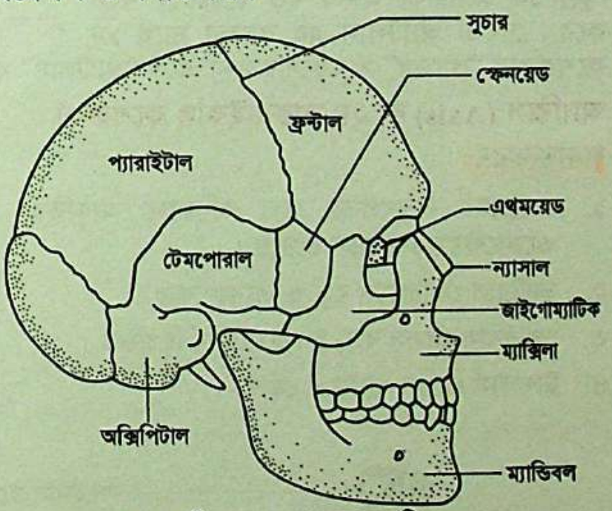

চিত্র ৭.১৬ : মানুষের করোটি

মানুষের ম্যান্ডিবল (নিম্নচোয়াল)

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. করোটির নিম্নচোয়াল গঠনকারী সর্ববৃহৎ, মজবুত ও অযুগ্ম অস্থি।
২. এটি একটি "U" আকৃতির **মূলদেহ** এবং দুটি চওড়া **র‍্যামি** (বহুবচন–rami; একবচন–ramus) নিয়ে গঠিত।
৩. মূলদেহ **বেস** ও **অ্যালভিওলার প্রসেস** নিয়ে গঠিত; অ্যালভিওলার প্রসেসে দাঁতের গোড়া প্রোথিত থাকে।
৪. প্রতিটি র‍্যামাস হাতলের মতো অংশ; এতে **করোনয়েড** ও **কন্ডাইলয়েড** নামক দুটি প্রবর্ধন এবং একটি ম্যান্ডিবুলার ছিদ্র থাকে।

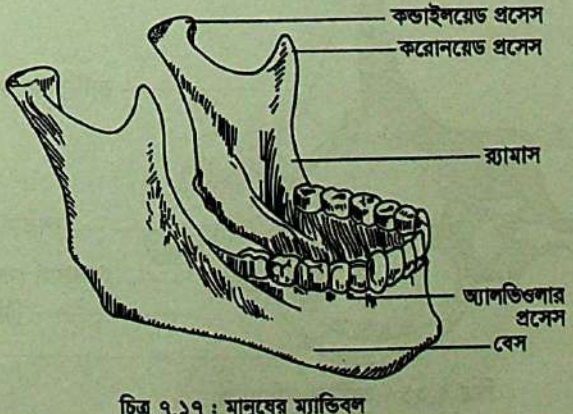

চিত্র ৭.১৭ : মানুষের ম্যান্ডিবল

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

হাইওয়েড (Hyoid) অস্থি

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. এটি একটি "U" আকৃতির অস্থি।
২. অস্থির মাঝখানের অংশটির নাম হাইওয়েড বডি।
৩. বডি থেকে দুই জোড়া কাঁটা বা কর্নুয়া (cornua) বিস্তৃত।
৪. একজোড়া কর্নুয়া ছোট, এরা পার্শ্বীয়ভাবে অবস্থান করে।
৫. অন্যজোড়া কর্নুয়া বড় এবং পশ্চাৎদিকে অবস্থান করে।

চিত্র ৭.১৮ : হাইওয়েড অস্থি (সম্মুখদৃশ্য)

অ্যাটলাস (Atlas) বা প্রথম সারভাইকাল (গ্রীবাদেশীয়) কশেরুকা

শনাক্তকরণ

১. অস্থিটি দেখতে আংটির মতো।
২. সেন্ট্রাম ও স্পাইনাস প্রসেস অনুপস্থিত।
৩. ভার্টিব্রাল ফোরামেন (নিউরাল নালি) বেশ বড়।
৪. ট্রান্সভার্স প্রসেস বেশ বড় এবং ধমনি ছিদ্র (ফোরামেন) যুক্ত।
৫. একজোড়া সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট থাকে।

[ক্ষুদ্র ১ম কশেরুকা অনেক বড় করোটিকে বহন করে। দেবতা অ্যাটলাস-এর কাজের সাথে ১ম কশেরুকার "কাজের" সামঞ্জস্যের জন্য একে "অ্যাটলাস" বলা হয়।]

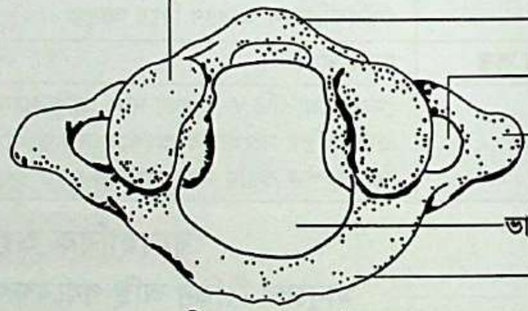

চিত্র ৭.১৯ : অ্যাটলাস

অ্যাক্সিস (Axis) বা ২য় সারভাইকাল কশেরুকা

শনাক্তকরণ

১. সেন্ট্রামের সম্মুখপ্রান্তে লম্বা কনিক্যাল আকৃতির ওডোন্টোয়েড প্রসেস রয়েছে।
২. ভার্টিব্রাল ফোরামেন বড় ও ত্রিকোণাকার।
৩. স্পাইনাস প্রসেস বড়, চওড়া ও শীর্ষ দ্বিখন্ডিত।
৪. ট্রান্সফার্স প্রসেস খাটো ও ভোঁতা।

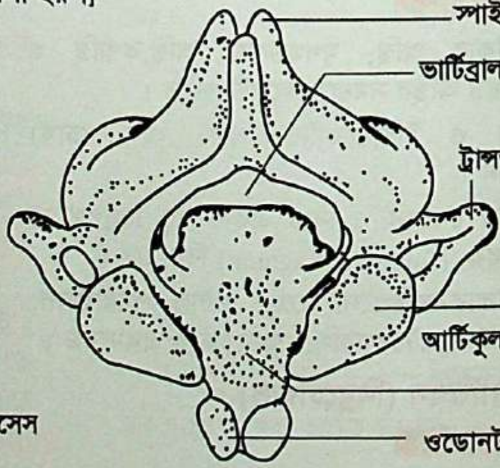

চিত্র ৭.২০ : অ্যাক্সিস

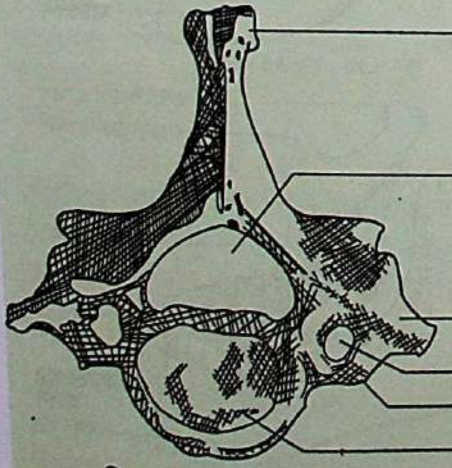

চিত্র ৭.২১ : ভার্টিব্রা প্রমিন্যান্স

ভার্টিব্রা প্রমিনেন্স (Vertebra Prominens) বা ৭ম সারভাইকাল কশেরুকা

শনাক্তকরণ

১. স্পাইনাস প্রসেস অসাধারণভাবে দীর্ঘ ও অবিভক্ত।
২. ট্রান্সভার্স প্রসেস বেশ প্রশস্ত এবং ক্ষুদ্র ট্রান্সভার্স ফোরামেন যুক্ত।
৩. ট্রান্সভার্স ফোরামেনের পশ্চাৎ অংশে সুস্পষ্ট টিউবার্কল থাকে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

থোরাসিক (বক্ষদেশীয়) কশেরুকা

শনাক্তকরণ

১. সেন্ট্রাম মাঝারী ও হৃৎপিন্ড আকৃতির।
২. ভার্টিব্রাল ফোরামেন ছোট ও গোলাকার।
৩. সেন্ট্রামের উভয় পাশে দেহ ও আর্চের সংযোগস্থলে পর্শুকার মস্তক সংযোগে **কোস্টাল ফ্যাসেট** উপস্থিত।
৪. ট্রান্সভার্স প্রসেসের প্রান্তে মসৃণ **টিউবারকুলার ফ্যাসেট** বিদ্যমান।
৫. স্পাইনাস প্রসেস লম্বা ও সরু।

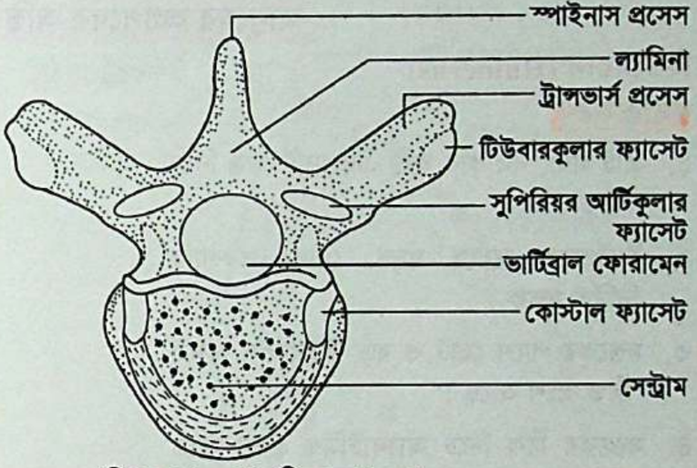

চিত্র ৭.২২ : থোরাসিক কশেরুকা

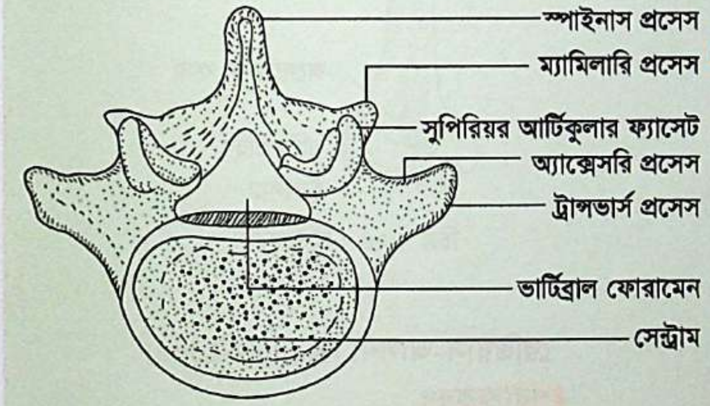

চিত্র ৭.২৩ : লাম্বার কশেরুকা

লাম্বার (কটিদেশীয়) কশেরুকা

শনাক্তকরণ

১. সেন্ট্রাম বড়, মজবুত ও বৃক্ক আকৃতির।
২. ভার্টিব্রাল ফোরামেন বড় ও ত্রিকোণাকার।
৩. ট্রান্সভার্স প্রসেস লম্বা; ট্রান্সভার্স ফোরামেন নেই।
৪. ট্রান্সভার্স প্রসেসের পশ্চাৎ তলে **ম্যামিলারি ও অ্যাক্সেসরি প্রসেস** উপস্থিত।
৫. স্পাইনাস প্রসেস খাটো, মোটা ও চতুষ্কোণা।

স্যাক্রাম (Sacrum)

শনাক্তকরণ

১. শ্রোণি অঞ্চলে মেরুদণ্ডের পাঁচটি কশেরুকা মিলিত হয়ে ত্রিকোণাকার এবং বৃহৎ **স্যাক্রাম** গঠন করে।
২. সকল ভার্টিব্রাল ফোরামেন বা নিউরাল ছিদ্র মিলিতভাবে **স্যাক্রাল নালি** গঠন করে।
৩. সকল স্পাইনাস প্রসেস মিলিত হয়ে স্যাক্রামের পৃষ্ঠদিকে **স্যাক্রাল ক্রেস্ট** গঠন করে।
৪. পঞ্চম স্যাক্রাল কশেরুকায় একটি ডিম্বাকৃতির ফ্যাসেট থাকে যার সাথে **কক্সিক্স** যুক্ত হয়।
৫. বেস বা ভিত্তির অগ্র-অঙ্কীয় ভাগে একটি **স্যাক্রাল প্রমোন্টরি** নামক প্রবর্ধন থাকে।
৬. স্যাক্রামের পৃষ্ঠ-অঙ্কীয় দেশে ৪ জোড়া **স্যাক্রাল ছিদ্র** বিদ্যমান।

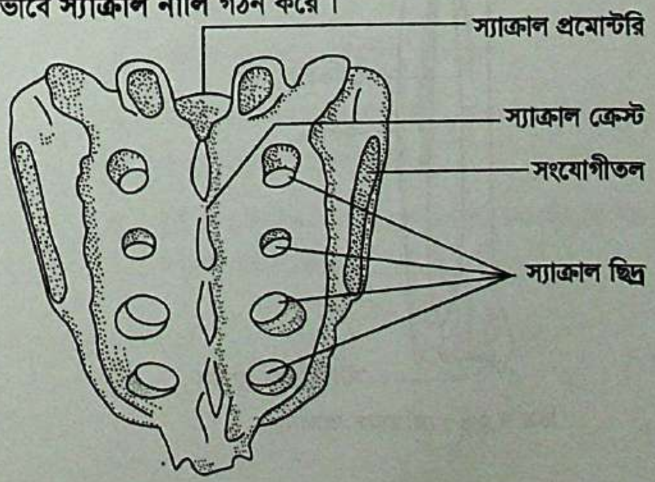

চিত্র ৭.২৪ : স্যাক্রাম

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মানুষের অগ্রপদের অস্থি পর্যবেক্ষণ

হিউমেরাস (Humerus)

শনাক্তকরণ

১. এটি লম্বা, নলাকার অস্থি এবং দুটি প্রান্ত নিয়ে গঠিত।

২. উর্ধ্বপ্রান্তে রয়েছে মসৃণ, গোল, তরুণাস্থি নির্মিত **মস্তক**।

৩. মস্তকের পাশে ছোট ও বড় **টিউবার্কল** নামক স্ফীত অংশ আছে।

৪. মস্তকের ঠিক নিচে **অ্যানাটমিক গ্রীবা** নামে একটি খাঁজ আছে।

৫. মূলদেহের মধ্যভাগে **ডেল্টয়েড রিজ** নামক উঁচু অঞ্চল রয়েছে।

৬. নিম্নপ্রান্তে উত্তল **ক্যাপিচুলাম** এবং কপিকলের মতো **ট্রকলিয়া** বিদ্যমান।

চিত্র ৭.২৫ : হিউমেরাস

চিত্র ৭.২৬ : রেডিয়াস-আলনা

রেডিয়াস-আলনা (Radius-Ulna)

শনাক্তকরণ

১. রেডিয়াস ও আলনা নামক পৃথক অথচ পরস্পরের সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ দুটি অস্থি নিয়ে গঠিত।

২. রেডিয়াসের উপরে **মস্তক**-এর নিচে সংকুচিত **গ্রীবা** এবং একটু পরেই একটি উঁচু **টিউবারোসিটি** বিদ্যমান।

৩. এর নিচের অংশটি চ্যাপ্টা এবং **স্টাইলয়েড প্রসেস** নামক উঁচু অংশ আছে।

৪. আলনার উর্ধ্বপ্রান্তে অবতল **ট্রকলিয়ার নচ** পাওয়া যায়।

৩. আলনার অগ্রাংশে উঁচু **ওলেক্রেনন প্রসেস** ও **করনয়েড প্রসেস** বিদ্যমান।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

হাতের অস্থি

শনাক্তকরণ

১. দুই সারিতে ৪টি করে মোট ৮টি বিভিন্ন আকৃতির কার্পাল অস্থি দিয়ে কব্জি গঠিত।

২. লম্বা, নলাকার ৫টি মেটাকার্পাল অস্থি দিয়ে গঠিত করতল।

৩. বৃদ্ধাঙ্গুলে ২টি এবং অন্যান্য আঙ্গুলগুলোতে ৩টি করে ফ্যালাঞ্জেস বিদ্যমান।

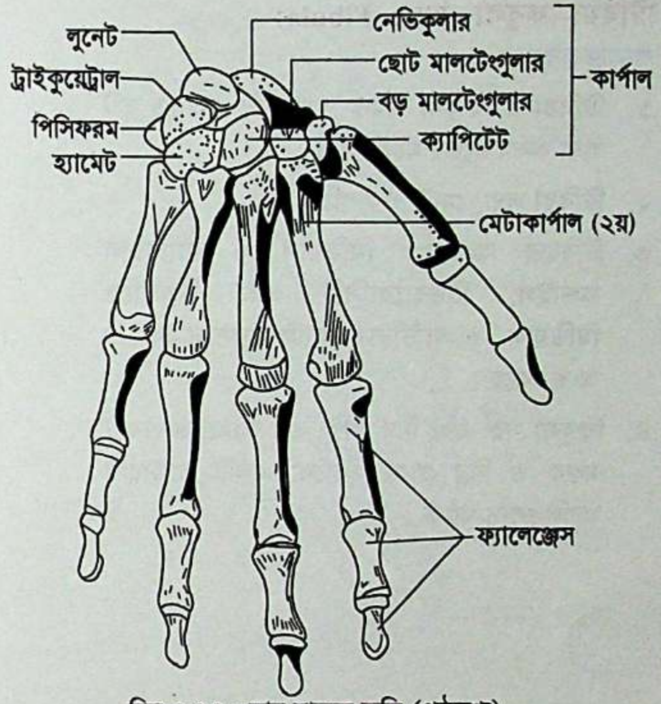

চিত্র ৭.২৭ : ডান হাতের অস্থি (পৃষ্ঠদৃশ্য)

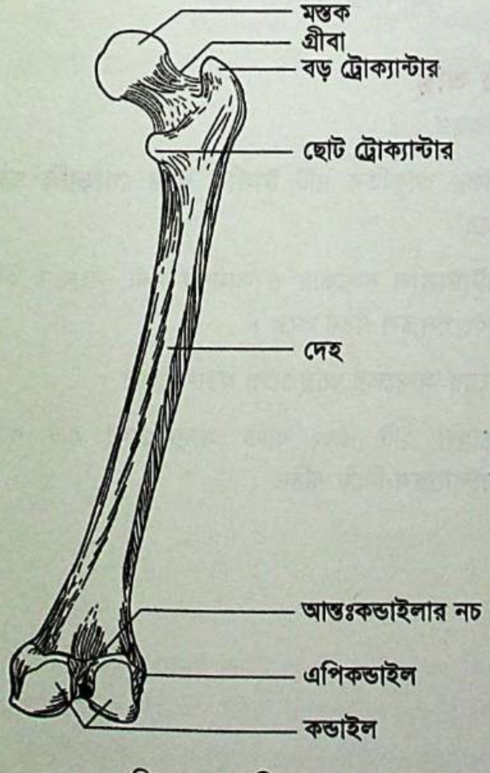

চিত্র ৭.২৮ : ফিমার

মানুষের পশ্চাৎপদের অস্থি পর্যবেক্ষণ

ফিমার (Femar)

শনাক্তকরণ

১. শক্ত, নলাকার ও দেহের **বৃহত্তম অস্থি।**

২. উর্ধ্বপ্রান্তে **মস্তক,** গ্রীবা, বড় ও ছোট **ট্রোক্যান্টার** অবস্থিত।

৩. অস্থির পশ্চাৎতল অমসৃণ আলযুক্ত।

৪. নিম্নপ্রান্তটি প্রসারিত হয়ে দুটি **কন্ডাইল** (মিডিয়াল ও ল্যাটারাল) গঠন করে।

৫. দুই কন্ডাইলের মাঝখানে **আন্তঃকন্ডাইলার নচ** নামক গর্ত রয়েছে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

টিবিয়া-ফিবুলা (Tibia-Fibula)

শনাক্তকরণ

১. **টিবিয়া** ও **ফিবুলা** নামক পাশাপাশি অবস্থিত দুটি লম্বা অসম রডের মতো অস্থি।

২. **টিবিয়া** লম্বা, মোটা ও সুগঠিত।

৩. টিবিয়ার অগ্রপ্রান্তে **মিডিয়াল** ও **ল্যাটারাল কন্ডাইল, টিউবারোসিটি** এবং **নিম্নপ্রান্তে মিডিয়াল** ও **ল্যাটারাল ম্যালিওলাস** নামক উঁচু অংশ আছে।

৪. **ফিবুলা** সরু এবং দীর্ঘ অস্থি; এর অগ্রপ্রান্তে একটি মস্তক ও নিম্ন প্রান্তে সূঁচালো একটি ল্যাটারাল ম্যালিওলাস থাকে।

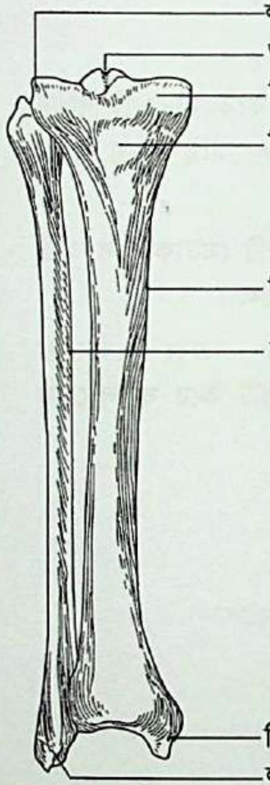

চিত্র ৭.২৯ : টিবিয়া-ফিবুলা

চিত্র ৭.৩০ : ডান পায়ের অস্থি (উপরিদৃশ্য)

পায়ের অস্থি

শনাক্তকরণ

১. বিভিন্ন আকৃতির ৭টি **টার্সাল** অস্থি গোড়ালি গঠন করে।

২. **মেটাটার্সাল** নলাকার ও সামান্য লম্বা, সংখ্যায় ৫টি এবং **পদতল** গঠন করে।

৩. পায়ের আঙ্গুলের অস্থিগুলো **ফ্যালাঞ্জেস**।

৪. বৃদ্ধাঙ্গুল ২টি এবং বাকি আঙ্গুলগুলো ৩টি করে **ফ্যালাঞ্জেস** নিয়ে গঠিত।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বক্ষপিঞ্জর (Thoracic case)

শনাক্তকরণ

১. পর্শুকাগুলো একদিকে থোরাসিক ও অন্যদিকে স্টার্নামের সাথে যুক্ত হয়ে পিঞ্জরের মতো গঠন তৈরি করেছে।

২. এতে একটি **স্টার্নাম**, ১২ জোড়া **পর্শুকা** (Rib) এবং ১২টি **থোরাসিক কশেরুকা** থাকে।

৩. স্টার্নাম তিন অংশে বিভক্ত– **ম্যানুব্রিয়াম, দেহ** ও **জিফয়েড প্রসেস**।

৪. পর্শুকাগুলো লম্বা, সরু, চাপা ও বাঁকা অস্থি।

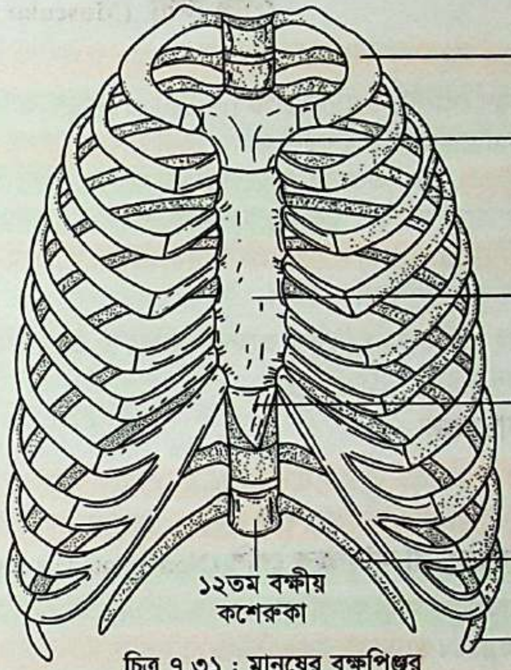

চিত্র ৭.৩১ : মানুষের বক্ষপিঞ্জর

শ্রোণি-অস্থিচক্র বা পেলভিক গার্ডেল (Pelvic girdle)

শনাক্তকরণ

১. ২টি সমান অংশের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট অস্থি।

২. প্রতিটি অর্ধাংশ **ইলিয়াম, ইশ্চিয়াম** এবং **পিউবিস** এ তিনটি অস্থির সমন্বয়ে গঠিত।

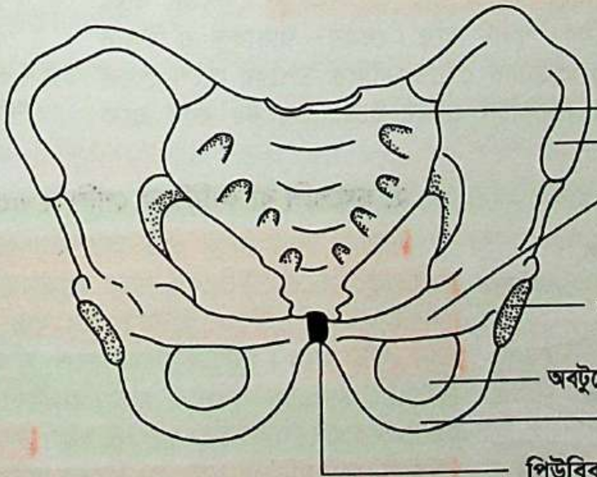

চিত্র ৭.৩২ : পেলভিক গার্ডেল

৩. ইশ্চিয়ামের উপরের দিকে একটি কাঁটা এবং নিচের দিকে **টিউবারোসিটি** বর্তমান।

৪. ইলিয়াম ও পিউবিস দিয়ে পরিবেষ্টিত একটি বড় ছিদ্র **অবটুরেটর ফোরামেন** রয়েছে।

৫. তিনটি অস্থির মিলনস্থলে একটি গভীর অবতল গহ্বর **অ্যাসিটাবুলাম** অবস্থিত।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

পেশি টিস্যু (Muscular Tissue)

মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত যে টিস্যু সংকোচন–প্রসারণক্ষম ও অসংখ্য তন্তুর সমন্বয়ে গঠিত তাকে পেশি বা পেশি টিস্যু বলে।

পেশির সাধারণ বৈশিষ্ট্য : মায়োব্লাস্ট (myoblast) নামক আদিকোষ রূপান্তরিত হয়ে তন্তুর মতো লম্বা পেশিকোষ সৃষ্টি করে। পেশিকোষকে তাই **পেশিতন্তু** বলে। প্রতিটি কোষ সুস্পষ্ট নিউক্লিয়াসযুক্ত এবং **সারকোলেমা** (sarcolemma) নামক ঝিল্লিতে আবৃত; এর ভিতরের সাইটোপ্লাজমকে **সারকোপ্লাজম** (sarcoplasm) বলে। সারকোপ্লাজমের মধ্যে পরস্পর সমান্তরালভাবে অবস্থিত অসংখ্য **মায়োফাইব্রিল** (myofibril) নামক সূক্ষ্ম তন্তু থাকে। গুচ্ছবদ্ধ **অ্যাকটিন** (actin) ও **মায়োসিন** (myosin) নামক প্রোটিন ফিলামেন্ট দিয়ে মায়োফাইব্রিল গঠিত। পেশি টিস্যু প্রায় ৭৫ শতাংশ পানি ও অবশিষ্টাংশ কঠিন পদার্থে গঠিত।

কাজ : পেশিই প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালনের জন্য দায়ী। অস্থিসংলগ্ন পেশির সংকোচন-প্রসারণের ফলে প্রাণী স্থানান্তরে গমন করতে পারে।

পেশির প্রকারভেদ

গঠন, অবস্থান ও কাজের তারতম্যের ভিত্তিতে পেশিকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়:

১. মসৃণ বা অনৈচ্ছিক; ২. হৃৎপেশি এবং ৩. রৈখিক বা ঐচ্ছিক।

১. মসৃণ (ভিসেরাল) বা অনৈচ্ছিক পেশি (Non-striated or Involuntary muscle)

এ পেশির কোষগুলো মাকু আকৃতির, ১৫–২০০ μm পর্যন্ত দীর্ঘ। কোষের চওড়া অংশের ব্যাস ৮–১০μm। প্রত্যেক কোষে নিউক্লিয়াসের সংখ্যা একটি এবং এটি কোষের চওড়া অংশে অবস্থান করে। কোষের আবরণী বা সারকোলেমা অস্পষ্ট। কোষের সাইটোপ্লাজম বা সারকোপ্লাজম-এ অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম মায়োফাইব্রিল পেশিতন্তুর দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত। মায়োফাইব্রিলে কোনো আড়াআড়ি রেখা দেখা যায় না। পৌষ্টিকনালি, রক্তনালি, শ্বাসনালি, মূত্রথলি, জরায়ু প্রভৃতি অঙ্গের প্রাচীরে এ পেশি পাওয়া যায়। মসৃণ পেশিগুলো **আন্তরযন্ত্রীয়** (visceral) অঙ্গের প্রাচীরে থাকে বলে এগুলোকে **ভিসেরাল** পেশিও বলে।

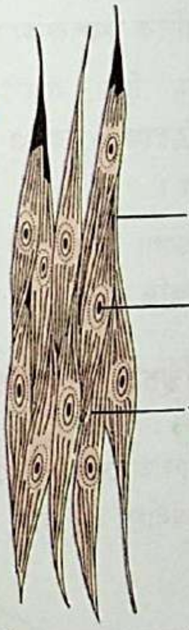

চিত্র ৭.৩৩ : অন্ননালির প্রাচীরে অবস্থিত মসৃণ পেশি

কাজ : এ টিস্যুর সংকোচন-প্রসারণ ক্ষমতা ধীর ও দীর্ঘস্থায়ী। বিভিন্ন বস্তুর যাতায়াত নিয়ন্ত্রণে এ টিস্যু অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। যেমন– খাদ্যবস্তু এ টিস্যুর মাধ্যমে **পেরিস্ট্যালসিস** (peristalsis) প্রক্রিয়ায় পৌষ্টিকনালির উপরের অংশ থেকে নিচের দিকে ধাবিত হয়। এ পেশির সংকোচন প্রাণীর ইচ্ছানির্ভর নয় বলে একে **অনৈচ্ছিক পেশি** বলা হয়ে থাকে।

২. হৃৎপেশি বা কার্ডিয়াক পেশি (Cardiac muscle)

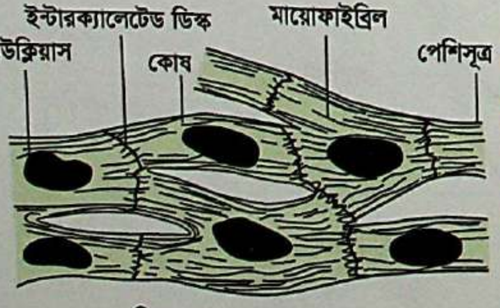

চিত্র ৭.৩৪ : হৃৎপেশি

গঠনের দিক থেকে এটি অনেকটা রৈখিক পেশির মতো। পেশিতন্তুর মায়োফাইব্রিলের গায়ে আড়াআড়ি রেখা থাকে; কিন্তু পেশিতন্তুগুলো পরস্পর অনিয়তভাবে যুক্ত থেকে জালের মতো গঠন সৃষ্টি করে। সারকোলেমা বেশ সূক্ষ্ম এবং নিউক্লিয়াসটি কোষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে। কোষগুলোর দৈর্ঘ্য প্রায় ০.৮ মিলিমিটার এবং ব্যাস ১২–১৫ μm হয়। কোষগুলোর সংযোগস্থলে কোষপর্দা ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে এক বিশেষ অনুপ্রস্থ রেখার সৃষ্টি করে। একে **ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক** (intercalated disc) বলে। এ ডিস্ক হৃৎপেশির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। একমাত্র হৃৎপিন্ডের প্রাচীরে এ ধরনের পেশি টিস্যু পাওয়া যায়।

কাজ : এ টিস্যুর সংকোচন-প্রসারণ ক্ষমতা পরিমিতভাবে দ্রুত, কখনও ক্লান্ত হয় না। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে প্রাণিদেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করা হৃৎপেশির কাজ। হৃৎপেশির কার্যকারিতা প্রাণীর ইচ্ছানির্ভর নয়। তাই কাজের দিক থেকে এ পেশি অনৈচ্ছিক। হৃৎপেশি কখনও ক্লান্ত হয়না।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৩. কঙ্কাল বা রৈখিক (চিহ্নিত) বা ঐচ্ছিক পেশি (Striated or Voluntary muscle)

প্রাণিদেহের যে অংশগুলোকে সাধারণত আমরা মাংস বলে থাকি প্রকৃতপক্ষে সেগুলোই **কঙ্কাল বা রৈখিক বা চিহ্নিত পেশি**। কোষগুলো দেখতে নলাকার (cylindrical), ১-৪ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ১০-৪০ µm ব্যাসবিশিষ্ট হয়। তাই কোষগুলোকে সূক্ষ্ম তন্তুর মতো দেখায় এবং **পেশিতন্তু** (muscle fibre) নামে আখ্যায়িত করা হয়। তন্তুগুলো আলাদা বা বিক্ষিপ্ত না থেকে গুচ্ছবদ্ধ থাকে। পেশিতন্তুর এধরনের গুচ্ছকে **ফ্যাসিকুলাস** (fasciculus; বহুবচনে fasciculi) বলা হয়। প্রতিটি গুচ্ছ **পেরিমাইসিয়াম** (perimysium) নামক যোজক টিস্যু নির্মিত আবরণে আবৃত। অনেক ফ্যাসিকুলি একত্রিত হয়ে একটি বড় গুচ্ছ গঠন করে। গুচ্ছটি **এপিমাইসিয়াম** (epimysium) নামক আরেক ধরনের যোজক টিস্যু নির্মিত আবরণে আবৃত থাকে। ঐচ্ছিক পেশিগুলো দেহাভ্যন্তরে এভাবে গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। প্রতিটি পেশিতন্তু **সারকোলেমা** (sarcolemma) নামক সুস্পষ্ট এক আবরণে আবৃত। এর ঠিক নিচে কয়েকশ' গোল বা ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস দেখা যায়। প্রতিটি পেশিকোষের অভ্যন্তরে কতকগুলো অতি সূক্ষ্ম তন্তু পাওয়া যায়, এগুলো **মায়োফাইব্রিল** (myofibril)। প্রধানত **অ্যাকটিন** (actin) ও **মায়োসিন** (myosin) নামক প্রোটিন দিয়ে মায়োফাইব্রিল গঠিত হয়। অণুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে এসব উপতন্তুগুলোর সমস্ত দেহ জুড়ে পর্যায়ক্রমিকভাবে অবস্থিত কতকগুলো অনুপ্রস্থ রেখা দেখা যায়। এ রেখাগুলোর (দাগগুলো) উপস্থিতির জন্য এ পেশিটিস্যুকে রৈখিক পেশি বা চিহ্নিত পেশি বলে।

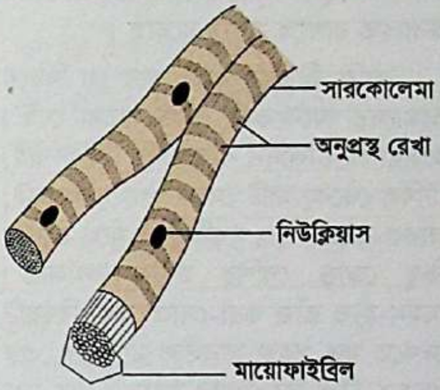

চিত্র ৭.৩৫ : রৈখিক পেশি

অবস্থান : বড় বড় অস্থির সংযোগস্থলে এ ধরনের পেশি বেশি পাওয়া যায়, আর সে কারণেই এগুলোকে **কঙ্কাল পেশি** (skeletal muscle)–ও বলা হয়ে থাকে। চোখে, জিহ্বায়, গলবিলেও এপেশি অবস্থান করে।

কাজ : এ ধরনের পেশির সংকোচন-প্রসারণ ক্ষমতা খুব **দ্রুত ও শক্তিশালী**। হাত ও পা-এর বড় বড় অস্থিসহ দেহের অন্যান্য অস্থির সঞ্চালনে এ পেশিটিস্যুই দায়িত্ব পালন করে। প্রাণীর চলন এ পেশির মাধ্যমে ঘটে। এ পেশির কাজ প্রাণীর ইচ্ছা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়, তাই রৈখিক পেশিকে **ঐচ্ছিক পেশি** বলে আখ্যায়িত করা হয়।

চিহ্নিত পেশির প্রকারভেদ : কাজের ভিত্তিতে চিহ্নিত বা ঐচ্ছিক পেশি বিভিন্ন ধরনের হয়।

- **ফ্লেক্সর পেশি** (Flexor muscle) : এ পেশি দেহের কোন অংশকে অপর কোন অংশের উপর ভাঁজ হতে সাহায্য করে। যেমন- **বাইসেপস** পুরোবাহুকে (fore arm) উর্ধ্ব বাহুর (upper arm) উপর ভাঁজ হতে সহায়তা করে।
- **এক্সটেনসর পেশি** (Extensor muscle) : এ পেশি ভাঁজ করা অংশকে পুনরায় সোজা হতে সহায়তা করে। যেমন- **ট্রাইসেপস** ভাঁজ করা পুরোবাহুকে সোজা হতে সাহায্য করে।
- **অ্যাবডাকটর পেশি** (Abductor muscle) : এটি দেহের কোন অংশকে দেহের অক্ষ থেকে দূরে সরে যেতে সহায়তা করে। যেমন : **ডেলটয়েড** হাতকে সামনে প্রসারিত হতে সহায়তা করে থাকে।
- **অ্যাডাক্টর পেশি** (Adductor muscle) :এ পেশি দেহের কোন অংশকে দেহ অক্ষের কাছে নিকটে আনতে সাহায্য করে যেমন- **ল্যাটিসিমাস ডরসি** হাতকে পিছনে এবং উপরে উঠাতে সাহায্য করে।
- **ডিপ্রেসর পেশি** (Depressor muscle) : এটি দেহের কোন অংশকে নিচে নামাতে অংশ নেয়; যেমন **ডিপ্রেসর ম্যান্ডিবুলার** নিম্ন চোয়ালকে নিচের দিকে নামাতে সাহায্য করে; ফলে মুখ খুলতে পারে।
- **লিভেটর পেশি** (Levator muscle) :এটি দেহের কোন অংশকে উপরে উঠতে সহায়তা করে; যেমন- **ম্যাসেটর পেশি** নিম্ন চোয়ালকে উপরের দিকে উঠতে সাহায্য করে; ফলে খোলা মুখ বন্ধ হয়ে যায়।
- **রোটেটর পেশি** (Rotator muscle) : এটি দেহের কোন অংশের আবর্তনে সহায়তা করে। যেমন-**পাইরিফরমিস পেশি** ফিমারকে ঘূর্ণনে সাহায্য কাজ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয় না (Muscle can Pull but can not Push)

পেশি আমাদের চলন ও ভঙ্গিমা নিয়ন্ত্রণ করে, মানবদেহের স্বাভাবিক কর্মকান্ড পরিচালনায় প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে। পেশির ব্যবহার এক-দুদিনের নয়, নিত্যদিনের। প্রতিটি কাজ পেশি নির্ভর। আমরা জানি মানবদেহে ৩ ধরনের পেশি আছে। মসৃণপেশি, হৃৎপেশি ও কঙ্কালপেশি। এগুলো সুসমন্বিত কাজের মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে সচেষ্ট রয়েছে।

পেশি কীভাবে কাজ করে সে বিষয়ে আমাদের অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। আমরা প্রত্যেকদিন কাজ করি। বাঁকা হই, টেবিল থেকে, মাটি থেকে কিছু তুলে নেই, আরও কতো কি। সবকিছুরই মূলে রয়েছে কিছু জোড় পেশির জটিল কর্মকান্ড। যেমন-হাত ভাঁজ করা-সোজা করা বিষয়টি দেখতে যত সহজ সাবলীল মনে হয়, এর গূঢ়তত্ত্ব ঠিক ততোখানি কঠিন। এর মূল রহস্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পেশিগুলো সংকুচিত হয় ও টান দেয়, কিন্তু ধাক্কা দেয় না বরং প্রসারিত থাকে।

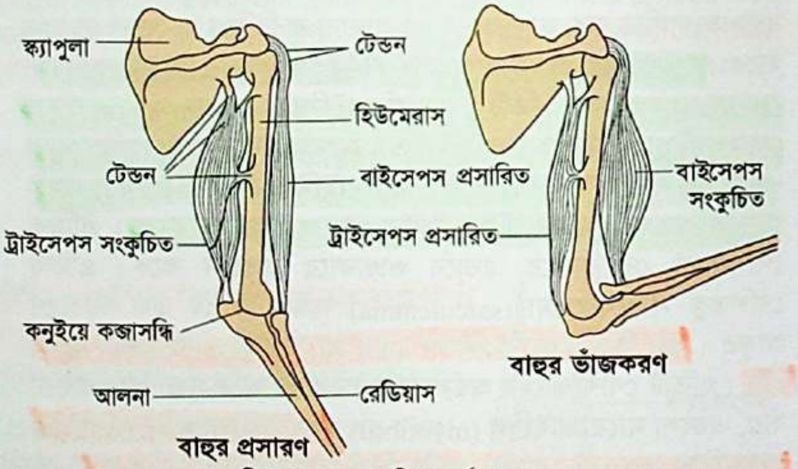

চিত্র ৭.৩৬ : পেশির কর্মকান্ড

মানবদেহের কঙ্কালিক পেশিগুলো জোড়ায় জোড়ায় থাকে, এগুলোর কাজ পরস্পর বিপরীতমুখী (প্রতিপক্ষীয় জোড়, antagonistic pairs)। বাইসেপস (biceps) ও ট্রাইসেপস (triceps) বাহুর অন্যতম প্রধান পেশি। বাইসেপস হচ্ছে নিম্নবাহুর রেডিয়াসের উপরে অবস্থিত পেশি যা কনুই সন্ধিকে বাঁকিয়ে নিম্নবাহুকে উর্ধ্ববাহুর উপর ভাঁজ হতে সাহায্য করে। অন্যদিকে, আলনার নিচে অবস্থিত পেশি ট্রাইসেপসের কাজ হলো কনুই সোজা করে ভাঁজ হওয়া নিম্নবাহুকে টেনে সোজা করে উর্ধ্ববাহু থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া। পেশিগুলো এমনভাবেই গঠিত যাতে কেবল **সংকুচিত হতে পারে (অর্থাৎ টান দিতে পারে), ধাক্কা দিতে পারে না**। পেশি নিজে বাঁকা হয় না, সন্ধিকে টেনে বাঁকিয়ে আনে। এভাবে বাঁকিয়ে এনে সন্ধি-কোণ কমিয়ে দেওয়ার কাজে নিয়োজিত বাইসেপসকে **ফ্লেক্সর** (flexor) এবং সন্ধি-কোণকে বাড়িয়ে দিয়ে অর্থাৎ সোজা করিয়ে দেয়ায় ট্রাইসেপককে **এক্সটেন্সর** (extensor) বলে।

অ্যাকটিন ও মায়োসিন এ দুধরনের প্রোটিন থাকে বলে পেশি টানতে পারে। এসব প্রোটিন পেশিকোষের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। সংশিষ্ট পেশির প্রতিটি কোষ মস্তিষ্কের কোনো অংশ থেকে সংকোচনের সংকেত পেলে মস্তিষ্কের অন্য অংশ থেকে পৃথক বৈদ্যুতিক উদ্দীপনাগুলোকে সমন্বিত করে 'টান' দেওয়ার কাজটি সম্পন্ন করে। হাড়কে আগের অবস্থানে ফিরিয়ে নিতে বিপরীতধর্মী পেশিও সম্মিলিতভাবে একই কাজ করে অর্থাৎ টেনে সোজা করে দেয়। এ কারণেই বলা হয় যে, **পেশিতে টান পড়ে কিন্তু ধাক্কা দেয় না।**

ব্যবহারিক (Practical)

প্রস্তুতকৃত স্লাইডের সাহায্যে মসৃণ পেশি ও হৃৎপেশির তুলনা পর্যবেক্ষণ।

পাশাপাশি দুটি অণুবীক্ষণযন্ত্রে একটিতে মসৃণ পেশির স্লাইড এবং অন্যটিতে হৃৎপেশির স্লাইড স্থাপন করে উভয় পেশি পর্যবেক্ষণ করে এদের কাঠামোগত তুলনা লিপিবদ্ধ করা হলো।

চিত্র ৭.৩৭ : মসৃণ পেশি (বায়ে) এবং হৃৎপেশি (ডানে)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মসৃণ পেশি ও হৃৎপেশির তুলনা		
তুলনীয় বিষয়	মসৃণ পেশি	হৃৎপেশি
১. আকার ও আকৃতি	পেশিতন্তুগুলো লম্বা ও মাকু আকৃতির এবং শাখাবিহীন।	পেশিতন্তুগুলো খাটো ও বেলনাকার এবং শাখাযুক্ত।
২. অনুপ্রস্থ রেখা	তন্তুতে অনুপ্রস্থ রেখা নেই।	অনুপ্রস্থ রেখা উপস্থিত।
৩. ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক	থাকে না।	কোষগুলোর সংযোগস্থলে থাকে।
৪. সারকোলেমা	পেশিকোষের আবরণ বা সারকোলেমা অস্পষ্ট।	সারকোলেমা সূক্ষ্ম।
৫. নিউক্লিয়াস	কোষের চওড়া অংশে অবস্থান করে।	কোষের কেন্দ্রে অবস্থান করে।
৬. মায়োফাইব্রিল	পেশিতন্তুর দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তৃত।	পরস্পর অনিয়তভাবে যুক্ত হয়ে জালিকা গঠন করে।

কঙ্কালের কার্যক্রম এবং 'রডস ও লিভার' তন্ত্র
(The action of Skeleton and "Rods & Lever" System)

কঙ্কালিক পেশি আলাদাভাবে কাজ করতে পারে না। একটি পেশি যখন কঙ্কালের সঙ্গে যুক্ত থাকে তখন সংযোগের স্থান ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয় এর বল, গতি ও সঞ্চালনের মাত্রা কেমন হবে। এসব বৈশিষ্ট্য স্বাধীন এবং এদের সম্পর্ক নির্ভর করে পেশি ও কঙ্কালতন্ত্রের সাধারণ গঠনের উপর। নির্দিষ্ট একটি পেশির সংকোচনে যে বল, গতি ও সঞ্চালনের দিক প্রকাশ পায় তা বদলে দেওয়া যাবে যদি ঐ পেশিকে একটি লিভারের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া যায়। **লিভার** (lever) এমন একটি অনমনীয় রড (rod) যা সন্ধির মাধ্যমে সৃষ্ট একটি স্থায়ী পয়েন্ট বরাবর ঘুরতে সক্ষম। শিশুদের দোলায়মান বা টলায়মান দাঁড়ান বা হাঁটা লিভার ক্রিয়ার পরিচিত উদাহরণ। লিভারের মাধ্যমে (১) আরোপিত (applied) দিক, (২) আরোপিত বলের ফলে সৃষ্ট চলনের দূরত্ব ও গতি এবং (৩) আরোপিত বলের কার্যকর শক্তি (effective strength) পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ পেশিটানের ক্রিয়া কঙ্কালতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে যেভাবে প্রকাশিত হয় তাতে কঙ্কালতন্ত্রে রড ও লিভার তন্ত্রের প্রভাব এবং আমাদের হাত-পাগুলোকে মেশিন ছাড়া আর কিছু ভাবার উপায় নেই। লিভারের প্রতি যে কোন বলপ্রয়োগকে বলে **প্রচেষ্টা** (effort)। যে বলপ্রয়োগে লিভারের চলন বাধাগ্রস্থ হয় (যেমন- দন্ডের উপর ওজনের কারণে নিম্নমূখি বল প্রয়োগ) তাকে বলে **ভার** (load) বা **প্রতিবন্ধক** (resistance)। পেশির সংকোচন হচ্ছে প্রচেষ্টা, আর এতে সংশ্লিষ্ট দেহের অংশটি হচ্ছে ভার বা বাধা। শরীরের হাড়গুলো লিভার (যান্ত্রিক কৌশল) হিসেবে কাজ করে, ফলে গতি বা শক্তির এক যান্ত্রিক সুবিধার সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ লিভারের ব্যবহারে একটি ক্ষুদ্র **বল** (force) বিরাট বল-এ পরিবর্তিত হতে পারে। পায়ের পেশির সামান্য সংকোচনের ফলে পায়ের শীর্ষে বৃহত্তর সঞ্চালন একটি ফুটবলকে সজোরে দূরে পাঠাতে সাহায্য করে। এটাই হচ্ছে যান্ত্রিক সুবিধা (mechanical advantage)।

লিভারের গঠন (Structure of Lever)

একটি লিভার ৪টি অংশ দিয়ে গঠিত :

১. **লিভার-বাহু** (Lever arms)- হাড়গুলো লিভার-বাহু হিসেবে কাজ করে;

২. **পিভট** (Pivot)- যে অস্থিসন্ধিকে কেন্দ্র করে লিভারের কাজ কর্ম পরিচালিত হয়;

৩. **প্রচেষ্টা** (Effort)- ভার সরানো বা নড়ানোর জন্য পেশি যে বল (force) সরবরাহ করে; এবং

৪. **ভার** (Load)- দেহের কোনো অংশের ওজন যা সরাতে হবে বা উঠাতে হবে কিংবা দেহের ভিতরে বা বাইরে নিতে হবে।

লিভারের প্রকারভেদ (Types of Lever)

পিভট, প্রচেষ্টা ও ভার-এর অবস্থানের ভিত্তিতে লিভার নিচে বর্ণিত ৩ রকম।

১. **প্রথম-শ্রেণির লিভার** (First-class lever) : এ ধরনের লিভারে পিভটটি ভার ও প্রচেষ্টার মাঝখানে অবস্থান করে। কাঁচি এ ধরনের লিভার, কিন্তু মানবদেহে প্রথম-শ্রেণি লিভার দুর্লভ। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, মাথা ও প্রথম কশেরুকার মধ্যবর্তী সন্ধিটি। এক্ষেত্রে মাথার খুলি হচ্ছে লিভার-বাহু; খুলি ও প্রথম কশেরুকা (অ্যাটলাস)-র মধ্যকার সন্ধিটি পিভট; মাথার পিছনে অবস্থিত পেশি থেকে আসা পেশল ক্রিয়া হচ্ছে প্রচেষ্টা; এবং ভার হচ্ছে মাথার

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ওজন যা প্রচেষ্টার কর্মকান্ডে উঁচু হয়ে থাকে (ওজনের বিরুদ্ধে)। পেশি (প্রচেষ্টা) শিথিল হলে মাথা ঝুঁকে পড়ে। এ লিভারের মাধ্যমে **অল্প বল প্রয়োগে বেশি ফল পাওয়া যায়**।

২. দ্বিতীয়-শ্রেণির লিভার (Second-class lever) : এ ধরনের লিভারে ভারের অবস্থান থাকে পিভট ও প্রচেষ্টার মাঝখানে। ঠেলাগাড়ি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঠেলাগাড়ির মেঝেয় যে মাল রাখা হয় সেটি ভার। এ অংশটি থাকে পিভটরূপী হুইল আর প্রচেষ্টারূপী ঠেলাচালকের হাতের মধ্যবর্তী স্থানে। পায়ের আঙ্গুলের ডগায় দাঁড়ালে দ্বিতীয় শ্রেণির লিভার সৃষ্টি হয়। তখন আঙ্গুলের সন্ধিগুলো হয় পিভট, দুপা লিভার-বাহু, কাফ-পেশি ও গোড়ালির টেন্ডন প্রচেষ্টা (যখন কাফ পেশি সংকুচিত হয়) এবং দেহের ওজন হচ্ছে ভার (যা পেশি সংকোচনের ফলে উপরে উত্থিত হয়)। এ ধরনের লিভারের সাহায্যে সামান্য প্রচেষ্টায় বেশি ওজনকে উপরে তুলে ধরা সহজ হয়।

৩. তৃতীয়-শ্রেণির লিভার (Third-class lever) : এ ধরনের লিভারের প্রচেষ্টা থাকে পিভট ও ভার-এর মাঝখানে। উদাহরণ হিসেবে নখ কাটার যন্ত্রের (nail flipper) কথা উল্লেখ করা যায়। মানবদেহে তৃতীয়-শ্রেণির লিভারের সংখ্যা অনেক। একটি **ভাঁজ করা বাহুকে** তৃতীয়-শ্রেণির লিভার বলা যায়। এ ক্ষেত্রে কনুইয়ে রয়েছে পিভট (কনুই-সন্ধি), সম্মুখ বাহু হচ্ছে লিভার-বাহু, বাইসেপস পেশি প্রচেষ্টার যোগান দেয়, আর সম্মুখ বাহু কিংবা কোনো ওজনদার বস্তুসহ সম্মুখ বাহু হচ্ছে ভার। তৃতীয় শ্রেণির লিভারে প্রচেষ্টার অবস্থান ভার ও পিভটের মাঝে বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রচেষ্টা আর পিভট খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। প্রচেষ্টার চেয়ে ভার বেশি হওয়ায় এ ক্ষেত্রে কোনো যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় না। তবে বাইসেপস পেশির সামান্য সংকোচনে সম্মুখ বাহুতে বৃহত্তর সঞ্চালনের সৃষ্টি হয় বলে যান্ত্রিক অসুবিধাটুকু পূরণ হয়ে যায়। **দ্রুতগতির সঞ্চালন** (movement) সুবিধা পাওয়া যায় এ ধরনের লিভার থেকে।

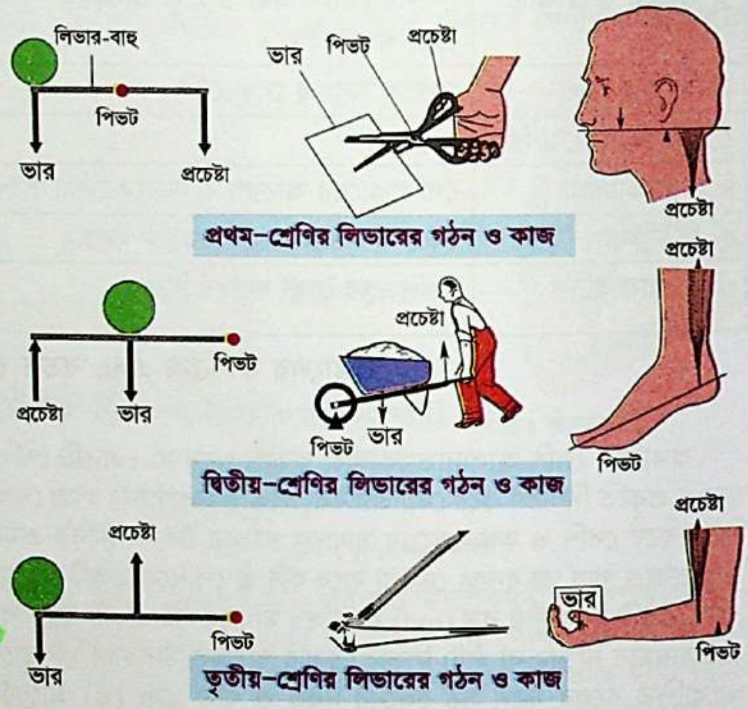

চিত্র ৭.৩৮ : বিভিন্ন ধরনের লিভারের গঠন ও কাজ

হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশির সমন্বয়
(Coordination of Bones and Muscles in the Knee Movement)

মানুষের চলনে শুধু পেশি নয়, পেশির সঙ্গে যুক্ত অস্থির ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অস্থি দেহের কঙ্কালতন্ত্র গঠন করে। কঙ্কালতন্ত্র দেহের অবয়বের কাঠামো। কাঠামোর উপরে আচ্ছাদন হিসেবে থাকে পেশিতন্ত্র (muscular system)। এ পেশি **ঐচ্ছিক** (voluntary) প্রকৃতির হওয়ায় মানুষ দেহকে বা দেহের কোনো উপাঙ্গকে যথেচ্ছ আন্দোলিত করতে পারে। **কন্ডরা বা টেন্ডন** (tendon) দিয়ে পেশি অস্থির সংগে যুক্ত থাকে। তাই কোনো অঙ্গকে যথেচ্ছ পরিচালনা করা বা স্থানান্তরে নেয়া **পেশি-কঙ্কালতন্ত্রের** (musculo-skeletal system) পারস্পরিক ছন্দোবদ্ধ ক্রিয়াকলাপের উপর নির্ভরশীল। হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশি যেভাবে সমন্বয় সাধন করে তা নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১. বক্রীকরণ পেশি (Flexor) : জানুসন্ধি (knee joint) পিছন দিকে বাঁকাতে দুটি পেশিগুচ্ছের প্রয়োজন হয়, এদের **হ্যামস্ট্রিং পেশি** (hamstring muscle) এবং **গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস পেশি** (gastrocnemius muscle) বলে। হ্যামস্ট্রিং পেশি তিনটি পেশি নিয়ে গঠিত। এগুলো যথাক্রমে **বাইসেপস ফিমোরিস** (biceps femoris), **সেমিমেম্ব্রোনোসাস** (semimembronosus) এবং **সেমিটেন্ডিনোসাস** (semitendinosus)। পেশিগুলো উরুর পিছনে থাকে। এগুলো শ্রোণিচক্রের **ইস্কিয়াম** (ischium) অংশে উৎপন্ন হয়ে ফিমারের পিছন দিয়ে **টিবিয়া** (tibia)-র উপরে যুক্ত হয়েছে। এদের সঙ্কোচনে ফিমার ও টিবিয়া কাছাকাছি আসে এবং হাঁটুসন্ধিতে ভাঁজ সৃষ্টি হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস পেশি টিবিয়ার পেছনে অবস্থিত পায়ের ডিম বা গুলির প্রধান পেশি। এটি ফিমারের **কনডাইল** (condyle) থেকে সৃষ্টি হয়ে টিবিয়ার পেছন দিয়ে গোড়ালিঅস্থি বা **ক্যালকেনিয়াস** (calcaneus) -এর সঙ্গে **অ্যাকিলিস কন্ডরা** (achilles tendon or calcanean tendon) দিয়ে যুক্ত হয়। এর সঙ্কোচনে ফিমার ও টিবিয়া নিকটবর্তী হয়, ফলে হাঁটুসন্ধি পেছন দিকে ভাঁজ হয়।

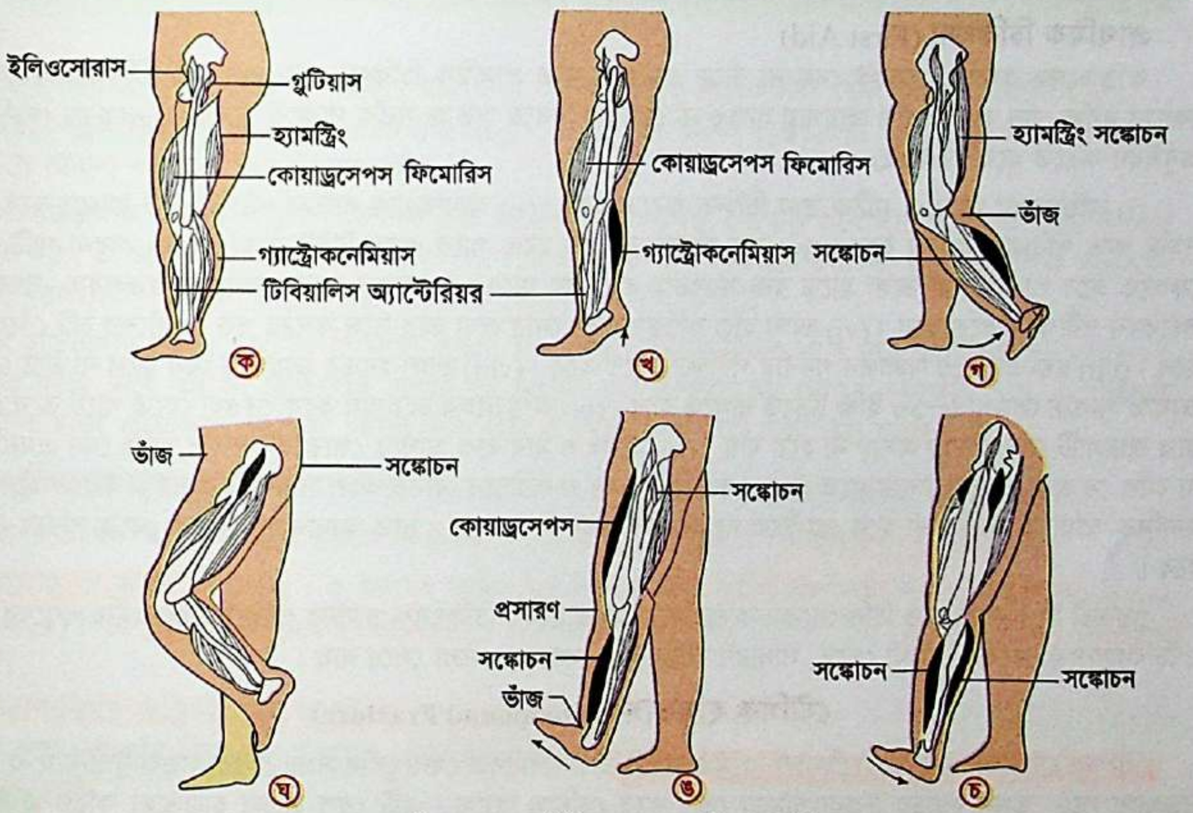

চিত্র ৭.৩৯ : হাঁটু সঞ্চালনে অস্থি ও পেশির সমন্বয়

২. প্রসারণ পেশি (Extensor) : উরুর সামনে অবস্থিত চারটি পেশি নিয়ে গঠিত **কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিস** (quadriceps femoris) হাঁটুসন্ধির প্রসারণ ঘটায়। এটি শ্রোণি থেকে উৎপন্ন **রেকটাস ফিমোরিস** (rectus femoris) এবং ফিমারের সামনে থেকে উৎপন্ন তিনটি ভ্যাসটি পেশি **ভ্যাসটাস মিডিয়ালিস** (vastas medialis), **ভ্যাসটাস ল্যাটারালিস** (vastas lateralis) এবং **ভ্যাসটাস ইন্টারমিডিয়াস** (vastas intermedius) নিয়ে গঠিত। এ তিনটি পেশি একসঙ্গে প্যাটেলা (patella)-র টেন্ডনের মাধ্যমে টিবিয়ার সামনে যুক্ত হয়। এসব পেশির সঙ্কোচনে হাঁটুসন্ধির প্রসারণ ঘটে।

অস্থিভঙ্গ বা হাড়ভাঙ্গা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা (Fracture of Bone and First Aid)

অস্থিভঙ্গ হচ্ছে এমন এক চিকিৎসাগত অবস্থা যেখানে রোগী অভিন্ন হাড়ের কোথাও ভেঙ্গে যাওয়াজনিত অসুস্থতায় ভোগে। প্রচন্ড শক্তি, চাপ কিংবা বিভিন্ন অসুখে (অস্টিওপোরোসিস, অস্থিক্যান্সার ইত্যাদি) ভঙ্গুর হয়ে যাওয়ায় অস্থিভঙ্গ অবস্থার সৃষ্টি হয়। অস্থিভঙ্গ প্রধানত তিন ধরনের : সাধারণ, যৌগিক ও জটিল। নিচে এদের বিবরণ দেয়া হলো।

সাধারণ হাড়ভাঙ্গা (Simple Fracture)

যে ধরনের অস্থিভঙ্গে ভঙ্গ অস্থি চামড়া বিদীর্ণ করে বের হয় না তাকে **সাধারণ অস্থিভঙ্গ** বলে। এ ধরনের অস্থিভঙ্গে হাড় শুধু দুই টুকরা হয়ে যায়, এর বেশি কিছু নয়। হাড় ভেঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসে না বলে এ ধরনের অস্থিভঙ্গের আরেক নাম **বদ্ধ অস্থিভঙ্গ** (closed fracture)।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

সাধারণ অস্থিভঙ্গের লক্ষণ (Symptoms of Simple Fracture)

(i) আঘাতপ্রাপ্ত স্থান সঙ্গে সঙ্গে ফুলে যায়; (ii) রক্ত জমে কাল শিরা পড়ে; (iii) আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গ নড়াচড়া করতে ব্যথা লাগে এবং ভতরে সূঁচ ফুটার মতো ব্যথা অনুভূত হয়; (iv) প্রচণ্ড ব্যথা হয়; (iv) সামান্য ভারী কোনো জিনিস তুলতে পারে না; (vi) হাত, পা অসাড় হয়; (vii) হাত, পা অথবা সন্ধির আকার পরিবর্তন হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা (First Aid)

অস্থিভঙ্গের কারণে দেহকষ্ট যেন না বাড়ে সে জন্য দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োজন। এ চিকিৎসা সম্বন্ধে অজ্ঞ কোনো ব্যক্তি যেন আঘাতপ্রাপ্ত জায়গায় হাতও না দেয় সে বিষয়ে অত্যন্ত সর্তক থাকতে হবে এবং দ্রুত যে পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে হবে তা হচ্ছে:

(i) অস্থিভঙ্গের মাত্রা ও সঠিক স্থান চিহ্নিত করতে হবে। (ii) আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির নড়াচড়া বন্ধ রাখতে হবে। (iii) সমস্ত ক্ষত পরিষ্কার করতে হবে। (iv) রক্ত সঞ্চালনে বাধা হতে পারে এমন টাইট জামা-কাপড়, গয়না-গাটি সরিয়ে ফেলতে হবে তা না হলে ভাঙ্গা হাড়ে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। (v) ভাঙ্গা হাড়ের জায়গায় রক্তপ্রবাহ, সঞ্চালন ও সংবেদন পরীক্ষা করতে হবে। (vi) ভাঙ্গা হাড় যথাস্থানে বসানোর জন্য তার সঙ্গে কাঠের খন্ড বা বাঁশের চটি বেঁধে দিতে হবে। (vii) রক্ত প্রবাহ ও সঞ্চালন পুনর্বার পরীক্ষা করতে হবে। (viii) ভাঙ্গা হাড়ের জায়গাটি যেন ফুলে না উঠে সে জন্য আঘাত পাওয়া জায়গা ৬–১০ ইঞ্চি উঁচুতে রাখতে হবে। (ix) অস্থিভঙ্গের জায়গায় বরফ দেওয়া যেতে পারে তবে দেখতে হবে জায়গাটি যেন ঠান্ডায় অসাড় না হয়ে যায়। (x) "হঠাৎ ও মারাত্মক আঘাত পেয়েছে" আহত ব্যক্তি যেন এমনটি মনে না করে সে জন্য তাকে চাঙ্গা রাখতে হবে এবং মাথা, ঘাড় ও শরীরের বিভিন্ন অংশ সাবধানে নড়াচড়া করতে হবে। (xi) মানসিক আঘাতে কাহিল না হলে রোগীকে ব্যথানাশক ওষুধ দিতে হবে। দ্রুত আঘাতপ্রাপ্তির স্থল থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

পরবর্তী ধাপ হচ্ছে দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। চিকিৎসক প্লাস্টার লাগিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা ও চিকিৎসাপত্র দেবেন। দেখা গেছে, সাধারণ অস্থিভঙ্গ ৮ সপ্তাহের মধ্যে সেরে যায়।

যৌগিক হাড়ভাঙ্গা (Compound Fracture)

যৌগিক হাড়ভাঙ্গা উন্মুক্ত হাড়ভাঙ্গা নামেও পরিচিত। সাধারণত খেলাধূলার সময় কিংবা সড়ক দুর্ঘটনায় এ ধরনের হাড়ভাঙ্গা ঘটে, তখন হাড়ের টুকরা চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসে। এটি বেশ জটিল হাড়ভাঙ্গা কারণ এতে প্রচুর পরিমাণ রক্তপাত হয় এবং দ্রুত সংক্রমণ ঘটে। যৌগিক হাড়ভাঙ্গার ক্ষেত্রেও সাধারণ হাড়ভাঙ্গার মতো প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া যেতে পারে, তবে তা ক্ষণকালীন। কারণ যৌগিক হাড়ভাঙ্গা এত গুরুতর যা অস্ত্রোপচার ছাড়া বিকল্প চিকিৎসা নেই।

যৌগিক হাড়ভাঙ্গার প্রকারভেদ

হাড়ভাঙ্গার প্রকৃতির ভিত্তিতে যৌগিক হাড়ভাঙ্গাকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।

ধরন ১ : ক্ষতের পরিমাণ কম, চামড়ায় ১ সে.মি.-এর বেশি ক্ষত দেখা যায় না এবং রক্তপাতও হয় কম।

ধরন ২ : ক্ষতের পরিমাণ বেশি, চামড়ায় ১ সে.মি.-এর বেশি ক্ষত, টিস্যুর ক্ষতি দেখা যায় না এবং চামড়ারও তেমন ক্ষতি হয় না।

ধরন ৩ : এক্ষেত্রে চামড়া, টিস্যু ও হাড়ের মারাত্মক ক্ষতি হয়। রক্তপাত, সংক্রমণ এড়াতে দ্রুত চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয়।

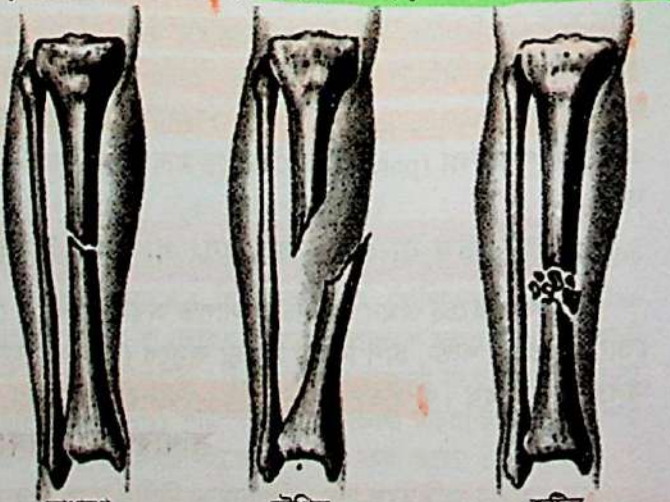

চিত্র ৭.৪০ : বিভিন্ন ধরনের হাড়ভাঙ্গা

যৌগিক হাড়ভাঙ্গার লক্ষণ

হাড় ভেঙ্গে টিস্যু ও চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে আসা, প্রচুর রক্তপাত ও যন্ত্রণাময় ক্ষত সৃষ্টি হওয়া যৌগিক হাড়ভাঙ্গার লক্ষণ।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

জটিল হাড়ভাঙ্গা (Complex Fracture)

জটিল হাড়ভাঙ্গার ফলে বেশ কয়েকটি হাড়, অস্থিসন্ধি, টেন্ডন ও লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যৌগিক হাড়ভাঙ্গার মতো এক্ষেত্রে হাড়ের টুকরা চামড়া ভেদ করে বেরিয়ে থাকে। জটিল হাড়ভাঙ্গাকে নানা ধরনে ভাগ করা যায়, এর মধ্যে প্রধান দুটি হচ্ছে:

১. **বহু-টুকরাবিশিষ্ট** (Multifragmentary fracture) : এক্ষেত্রে হাড় অনেকগুলো ছোট টুকরায় পরিণত হয়।

২. **কয়েক-টুকরাবিশিষ্ট** (Comminuted fracture) : এ ধরনের জটিল হাড়ভাঙ্গায় হাড়ের টুকরাগুলো আগের ধরনের চেয়ে সামান্য বড় এবং সংখ্যায় কম থাকে।

জটিল হাড়ভাঙ্গার লক্ষণাদি দেখে চিকিৎসক দ্রুত অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা নেবেন, তবে তার আগে এক্স-রে রিপোর্ট দেখে নিতে হয়। এ ধরনের হাড়ভাঙ্গা থেকে রক্ষা পেতে হলে সড়ক পথে সাবধানে চলাচল, উঁচু স্থান থেকে সাবধানে লাফ দেয়া, বয়স্কদের হাড় ভঙ্গুর হওয়ায় তাঁদের আরও বেশি সতর্ক থাকতে হবে।

জটিল হাড়ভাঙ্গার ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা বলতে কিছু নেই। দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে হাসপাতাল ও চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ছাড়া এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ ও পরিচর্যা অব্যাহত রাখা ছাড়া, প্রয়োজনে পুনর্বাসন কেন্দ্রে নিয়ে রাখা ও খোঁজ-খবর নেয়া ছাড়া কিছু করার নেই।

সন্ধির আঘাত ও প্রাথমিক চিকিৎসা (Injuries of Joints of Bones and First Aid)

দুই বা ততোধিক অস্থির সংযোগ স্থলকে অস্থিসন্ধি (joints of bones) বলে। অস্থিসন্ধি ৩ প্রকার। যথা–

১. **তন্তুময় বা অনড় অস্থিসন্ধি** : এ ধরনের অস্থিসন্ধির মিলিত অস্থি দুটির প্রান্তদেশ শ্বেততন্তুময় টিস্যু (white fibrous tissue) দিয়ে পরস্পরের সাথে সংলগ্ন থাকে। ফলে অস্থিগুলো অনড় প্রকৃতির হয়। করোটিতে এ রকম সন্ধি দেখা যায়।

২. **তরুণাস্থিময় অস্থিসন্ধি বা আংশিক সচল অস্থিসন্ধি** : এ রকম অস্থিসন্ধিতে মিলিত অস্থি দুটির প্রান্তদেশ পরস্পরের সঙ্গে তরুণাস্থি দিয়ে সংলগ্ন থাকে। পিউবিস সিমফাইসিস (শ্রোণিচক্রের দুটি পিউবিক অস্থির সংযোগ স্থল) এ ধরনের অস্থিসন্ধি।

৩. **সাইনুভিয়াল বা সচল অস্থিসন্ধি** : এ রকম অস্থিসন্ধির মিলিত অস্থি দুটি একটি তরল পূর্ণ গহ্বর দিয়ে পৃথক থাকে। এ তরল সংযুক্ত অস্থি দুটিকে সংঘর্ষণের আঘাত থেকে রক্ষা করে। অস্থির প্রান্ত আর্টিকুলার তরুণাস্থি দিয়ে বেষ্টিত থাকে। লিগামেন্ট অস্থি দুটিকে সংযুক্ত রাখে এবং টেনডন অস্থি দুটিকে পেশির সঙ্গে সংলগ্ন রাখে। এ ধরনের সন্ধি সচল প্রকৃতির। মানুষে অধিকাংশ অস্থি সন্ধি এ ধরনের। যেমন-কাঁধের সন্ধি, কনুই সন্ধি, হাঁটু সন্ধি, গোড়ালি সন্ধি, আঙুলের সন্ধি ইত্যাদি।

দেহের সকল অস্থিসন্ধি অনন্য গড়ন ও সঞ্চালন ক্ষমতা নিয়ে মানবদেহকে সুস্থতা ও কর্মক্ষমতা দান করে। হাত-পায়ের লম্বা অস্থিগুলো বেশি ব্যবহৃত হয় বলে ক্ষতির ঝুঁকির মুখেও থাকে বেশি। আঘাতের লক্ষণের প্রকাশ ঘটে হালকা ব্যথা প্রকাশের মাধ্যমে। অস্থিসন্ধি আঘাতপ্রাপ্ত হলে অস্থি, লিগামেন্ট ও অস্থিসন্ধির অন্যান্য টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ক্ষতি তাৎক্ষণিক বা ক্ষণস্থায়ী, হতে পারে দীর্ঘস্থায়ীও। এ বিষয়ে ধারণা অর্জনের জন্য নিচে স্থানচ্যুতি ও মচকানো সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

১. স্থানচ্যুতি (Dislocation)

একটি অস্থিসন্ধিতে অবস্থিত দুটি অস্থির মধ্যে একটি সরে গেলে **স্থানচ্যুতি** ঘটে। সাধারণত প্রচন্ড আঘাতে হাড়ের স্থানচ্যুতি ঘটে। এর ফলে যে প্রচন্ড ব্যথা ও অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয় তাতে মনে হতে পারে হাড় হয়তো ভেঙে গেছে। যে হাড়টি আঘাতে অস্থিসন্ধি বা সকেট থেকে সরে যায় জরুরী চিকিৎসা না করালে তার লিগামেন্ট ও স্নায়ুর ক্ষতি হতে পারে। অস্থিসন্ধিতে অবস্থান করে এমন যে কোনো হাড়ই স্থানচ্যুত হতে পারে, তবে সাধারণত কাঁধ, নিতম্ব ও আঙুলের হাড়ে স্থানচ্যুতি বেশি ঘটে।

লক্ষণ

১. স্থানচ্যুতির প্রাথমিক লক্ষণ হলো– ঐ অস্থি তার কাজে অক্ষম হয় অর্থাৎ ঐ অস্থি নড়াচড়া করা যায় না।

২. স্থানচ্যুতি ঘটলে ঐ স্থানটিতে প্রচণ্ড ব্যথা এবং রক্ত জমাট বেঁধে বিভিন্ন মাত্রার কাল শিরার সৃষ্টি হয়।

৩. স্থানচ্যুতির কারণে অস্থি, অস্থিসন্ধি থেকে সরে যাওয়ার ফলে ঐ স্থানটি উঁচু হয়ে ফুলে থাকে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৪. কাঁধ ও নিতম্বের স্থানচ্যুতি ঘটলে হাত ও পা নড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে।
৫. আঙ্গুলে স্থানচ্যুতি ঘটলে গোটা হাতই অকেজো হয়ে পড়ে।
৬. স্নায়ু অথবা রক্তনালি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে অস্থি সন্ধি সাময়িকভাবে অবশ হয়ে যায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

১. স্থানচ্যুত অস্থির নড়াচড়া বন্ধ করতে হবে।
২. কোনো অবস্থাতেই নিজেরাই চাপাচাপি করে বিচ্যুত অস্থিকে পূর্বের স্থানে বসানোর চেষ্টা করা যাবে না। এতে অস্থি সন্ধির চারিদিকের লিগামেন্ট, টেন্ডন পেশি ছিঁড়ে গিয়ে পরিণতি আরও খারাপ হতে পারে।
৩. কাঁধ, কনুই সন্ধি বা গোড়ালিতে স্থানচ্যুতি ঘটলে বিচ্যুত অস্থিকে যথাস্থানে বসানোর পর ঐ স্থানে চটি বা ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে হবে যাতে অস্থিটি আরও সরে না যায়।
৪. ত্বকে ক্ষতের সৃষ্টি হলে পানি দিয়ে পরিষ্কার করে জীবাণুর সংক্রমণ রোধ করতে হবে।
৫. ক্ষতস্থান ফুলে গেলে ফোলা কমানোর জন্য আইস প্যাক বা বরফ লাগাতে হবে।
৬. ব্যথা উপশমের জন্য ভরা পেটে ব্যথানাশক ওষুধ সেবন করানো যেতে পারে।
৭. দুর্ঘটনা যদি মারাত্মক হয় তবে যত দ্রুত সম্ভব বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

প্রতিরোধ

দুর্ঘটনায় স্থানচ্যুতি হলে আঘাতের ফলাফল নিয়ে মন্তব্য করা কঠিন। তবে সবসময় সাবধানতা অবলম্বন করলে স্থানচ্যুতির মতো যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। অতএব, খেলাধূলা, চলাফেরা বা যানবাহনে চলার সময় আগে থেকেই সর্তক থাকলে অনেক গুরুতর ক্ষতি থেকে বাঁচা সম্ভব হয়।

২. মচকানো (Sprains)

অস্থিসন্ধিতে আঘাতের ফলে সন্ধিকে অবলম্বন দানকারী লিগামেন্টে সৃষ্টি হয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি বা টান কিংবা লিগামেন্ট ছিঁড়েও যেতে পারে। এমন অবস্থাকে সাধারণভাবে **মচকানো** নামে অভিহিত করা হয়। লিগামেন্ট হচ্ছে টিস্যু-নির্মিত স্থূল ব্যান্ড যা সন্ধিকে নির্দিষ্ট দিকে সঞ্চালনে অনুমতি দেয়। কিছু সন্ধি বিভিন্ন দিকে সঞ্চালিত হতে পারে। এ কারণে লিগামেন্টের একাধিক গুচ্ছ অস্থিসন্ধিকে সঠিক বিন্যাসে ধরে রাখে। যখনই অস্থিসন্ধির একটি লিগামেন্টে অতিরিক্ত টান পড়ে বা ছিঁড়ে যায় তখনই মচকানো ঘটে। বলা যেতে পারে, মচকানোর প্রাথমিক ধাপে লিগামেন্ট তন্তু সটান হয়ে পড়ে; দ্বিতীয় ধাপে লিগামেন্টের কোনো অংশে চিড় ধরে; এবং শেষ ধাপে লিগামেন্ট সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যায়।

মচকানোর স্থান

মচকানোর ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটে গোড়ালিতে। দ্রুত ঘোরাতে বা মোচড়াতে গেলে গোড়ালির বাইরের ও পাশের অংশের লিগামেন্ট ছিঁড়ে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি মচকায় গোড়ালি। সামান্য মচকানো সারিয়ে তোলা গেলেও গুরুতর মচকানোর কারণে অনেকের খেলোয়াড়ি জীবন অকালে শেষ হয়ে যায়। হাঁটুর ৪টি লিগামেন্ট কব্জাসন্ধির মতো কাজ করে। এগুলো সামনে-পিছনে-দুপাশে বিন্যস্ত হয়ে হাঁটুকে সচল ও সক্রিয় রাখে। কিন্তু হাঁটুর সামনের দিকে অবস্থিত লিগামেন্ট (anterior cruciate ligament, ACL) সম্পূর্ণ ছিঁড়ে গেলে সবচেয়ে ক্ষতিকর মচকানো ঘটে। গাড়ি দুর্ঘটনায় ঘাড় মচকানো রোগীর সংখ্যা বেশি থাকে। গাড়ি হঠাৎ থমকে যাওয়াতে মাথার প্রচন্ড ঝাঁকুনির ফলে এ মচকানোর সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে গ্রীবা কশেরুকাগুলোর ক্ষতি হয় না; বরং যে সব লিগামেন্ট কশেরুকাগুলো যথাস্থানে রাখতে সাহায্য করে সেগুলোর ক্ষতি হয়। এর ফলে সাধারণত প্রচন্ড ব্যথা ও ঘাড় ফুলে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়, কিন্তু কখনও কখনও ঘাড় বেশি বেঁকে গেলে সুষুম্না কান্ড (স্পাইনাল কর্ড) মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়। কব্জি মচকে যাওয়ার ঘটনাও কম নয়। বেস বল, ফুটবল, বোলিং, স্কেইটবোর্ডিং, টেনিস প্রভৃতি খেলায় কব্জি মচকানো সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ বিপরীতমুখি উল্টে গেলে বৃদ্ধাঙ্গুলসহ যে কোনো আঙ্গুল মচকে যেতে পারে।

মচকানোর লক্ষণ

মচকানোর প্রথম লক্ষণ হচ্ছে ব্যথা। অনেক ক্ষেত্রে ব্যথা অনুভবের বিষয়টি দেরিতেও হতে পারে। যেমন- কোনো ব্যক্তি যদি ঘরের ভিতর রংয়ের কাজ করে এবং দিনের পর দিন হাতের উঠা-নামা চলে তাহলে অনেকদিন পর সে মচকানোর বিষয় টের পাবে। এর কারণ হচ্ছে প্রদাহ, ফুলে যাওয়া ও পেশি আক্ষেপ দেখা দিতে সময় লাগতে পারে। শরীরে ব্যথা হলেই ধরে নিতে হবে কোথাও গন্ডগোল হয়েছে। অর্থাৎ মস্তিষ্কে খবর পৌঁছে যায় কোন অস্থিসন্ধিতে ব্যাঘাত ঘটেছে এবং তার নিরাময় দরকার। কাজ, ব্যায়াম, খেলাধুলা শেষে ব্যথা সৃষ্টির বিষয়টি নজরে আসে। সন্ধিতে আঘাত

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

পাওয়ার কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে জায়গাটি ফুলে যায়। লিগামেন্ট তন্তু ছিঁড়ে গেলে রক্তপাত হয়। কিছু সময় পর চামড়ার উপরে কালশিরা পড়ে। মচকানোর জায়গায় ব্যথা ও ফুলে উঠার সঙ্গে সঙ্গে জায়গা ঘিরে পেশি-আক্ষেপের সৃষ্টি হয়, ফলে পেশি শক্ত হয়ে যায়। ব্যথা, ফোলা ও পেশি-আক্ষেপ মিলে হাঁটা-চলাই দায় হয়ে পড়ে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা

চিকিৎসা নির্ভর করে মচকানোর ধরণ ও ব্যাপকতার উপর। চিকিৎসকের পরামর্শে **নন-স্টেরয়ডাল** (non-steroidal) ওষুধ খাওয়া যেতে পারে ব্যথা কমানোর জন্যে। ভারী কিছু বহন করার ক্ষেত্রে সাবধান থাকতে হবে। তবে প্রথমেই যা করতে হবে তা হচ্ছে মচকানো গুরুতর হলে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে প্রাথমিক চিকিৎসা ও বিশ্রাম নিতে হবে। গুরুতর মচকানোর ক্ষেত্রে বিশ্রাম নিতেই হবে এবং চারটি কাজ গুরুত্ব সহকারে করতে হবে। এ ৪টি কাজের ইংরেজী শব্দের প্রথম অক্ষর দিয়ে RICE নাম দিয়ে প্রচলিত আছে; বিশ্রাম (Rest) + বরফ (Ice) + ক্ষত পরিষ্কার (Compression) + উচ্চতায় রাখা (Elevation) = RICE.

বিশ্রাম : মচকানো রোগীকে বিশ্রামে রাখতে হবে। কোনো অতিরিক্ত চাপ দেওয়া যাবে না। গোড়ালি মচকালে খুব সাবধানে হাঁটতে হবে।

বরফ : মচকানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা ও ফোলা সীমিত রাখতে আক্রান্ত স্থানে বরফ দিতে হবে। এক নাগাড়ে দিনে ৩-৪ বার ১০-১৫ মিনিট করে বরফ লাগাতে হবে; এর বেশি সময় দিলে কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে।

ক্ষত পরিষ্কার : ক্ষত পরিষ্কার করে নতুন ব্যান্ডেজ এমনভাবে লাগিয়ে দিতে হবে যেন সন্ধিটি অনড় ও সঠিক অবলম্বনে থাকে। এ কাজটি অভিজ্ঞ নার্স দিয়ে করানো ভাল।

উচ্চতায় রাখা : মচকানো সন্ধিটি দেহের বাকি অংশের চেয়ে সামান্য উঁচুতে তুলে রাখতে হবে। এতে ফোলা কমে যাবে।

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

মায়োব্লাস্ট : ভ্রূণজ কোষ যা পরিশেষে পেশিকোষে রূপান্তরিত হয়।

প্যাটেলা : মানুষের হাঁটুতে অতিরিক্ত অস্থি হিসেবে হাঁটুর সন্ধিতে প্যাটেলা অবস্থান করে। অস্থিটি প্রায় ত্রিকোণাকার এবং ভিতরের দিকটি ফিমারের সাথে সন্ধি তৈরি করে। এটি হাঁটুকে সুরক্ষিত রাখে।

সিনসাইটিয়াম : হৃৎপিণ্ডের পেশিকোষ কোনো কোনো স্থানে এত নিবিড়ভাবে সহাবস্থান করে যে মনে হয় তারা যেন প্রোটোপ্লাজম দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। এসব স্থানের সংযোগকে সিনসাইটিয়াম বলা হয়।

টেনডন : পেশিগুচ্ছের প্রান্তদুটি শ্বেততন্তু দিয়ে গঠিত ও চ্যাপ্টাকৃতি। এ গুচ্ছটি যখন নলাকার হয় তখন তাকে টেনডন বলে। টেনডন দিয়ে পেশি অস্থির সাথে যুক্ত থাকে।

লিগামেন্ট : সন্ধি সৃষ্টিকারী অস্থিগুলোর সংযোগকারী আর্টিকুলার ক্যাপসুল পুরু বা মোটা করার বস্তু হলো লিগামেন্ট। এটি সন্ধিস্থলের অস্থিগুলোকে যথাস্থানে সুরক্ষিত রাখে।

লিভার : অস্থি ও পেশির আন্তঃক্রিয়ায় এক বিশেষ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হওয়াকে লিভার (lever) বলে।

পেরিঅস্টিয়াম : অস্থি টিস্যু পেরিঅস্টিয়াম নামক পাতলা আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে।

অস্থিভঙ্গ : আকস্মিক কোনো কিছুর আঘাতের কারণে কোনো অস্থি বা হাড় ভেঙে গেলে বা অস্থিতে ফাটল ধরলে তাকে বলা হয় অস্থিভঙ্গ বা হাড়ভাঙা। সংক্ষেপে, যেকোন কারণে হাড় ফেটে যাওয়া বা **ভেঙে যাওয়াই হলো অস্থিভঙ্গ বা ফ্রাকচার।**

স্থানচ্যুতি : একটি অস্থি অপর একটি অস্থির সঙ্গে যে স্থানে মিলিত হয় সে স্থানই হচ্ছে অস্থিদুটির সন্ধিস্থান। এ সন্ধিস্থান থেকে কোনো অস্থি যদি সরে যায় তখন তাকে স্থানচ্যুতি বা সন্ধিচ্যুতি বলা হয়। সাধারণত কাঁধ, কনুই, কজি, বৃদ্ধাঙ্গুল, নিম্নচোয়াল, হাঁটু ইত্যাদি অঙ্গে সন্ধিচ্যুতি হতে দেখা যায়।

মচকানো : অস্থি বা হাড়ে ঝাঁকুনি লাগলে বা মুচড়ে গেলে সে স্থানের অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট ও এর চারদিকের তন্তুগুলো ছিঁড়ে যায় বলে খুব কষ্টদায়ক অবস্থাকেই মচকানো বলে। অন্যভাবে বলা যায়, আঘাতজনিত বা অন্য কোনো কারণে লিগামেন্ট তার নিজস্ব ক্ষমতার বাইরে প্রসারিত হলে বা ছিঁড়ে গেলে তাকে মচকানো বা স্প্রেইন (sprain) বলে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

আরো দেখুন

প্রতিদিনের চাকুরীর সার্কুলার পেতে এখানে ক্লিক করুন

প্রতি মাসের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স পিডিএফ এখানে ক্লিক করুন

চাকুরীর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিসিএস এর প্রয়োজনীয় পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

প্রতি সপ্তাহের চাকুরী পত্রিকা ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

সকল নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান এখানে ক্লিক করুন

বিডিনিয়োগ.কম দেশের সেরা পিডিএফ কালেকশন

SSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

HSC এর প্রয়োজনীয় সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সকল পিডিএফ বই এখানে ক্লিক করুন

সকল ধরনের সাজেশন ডাউনলোড এখানে ক্লিক করুন

ORIGINAL BDNIYOG.COM COPYRIGHT

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১২ প্রাণীর আচরণ
Animal Behavior

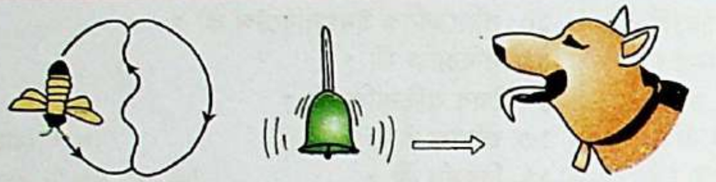

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- উদ্দীপনা
- ট্যাক্সেস
- প্রতিবর্ত ক্রিয়া
- সহজাত আচরণ
- অপত্য যত্ন
- শিখন আচরণ

উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেয়া প্রতিটি জীবের বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাপেক্ষে একটি প্রাণীর সাড়া দেয়া বা প্রতিক্রিয়াকে **প্রাণীর আচরণ** বলে। সম্পূর্ণ দেহের সঞ্চালন বা অংশবিশেষের সঞ্চালন, দেহভঙ্গি, মুখের ভঙ্গি, স্বর উৎপাদন ভঙ্গি এমনকি বর্ণের পরিবর্তন, গন্ধ সৃষ্টি প্রভৃতি আচরণের অন্তর্গত। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় প্রাণীর আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে **আচরণবিদ্যা বা ইথোলজি** (Ethology; গ্রিক *ethos* = আচরণ এবং *logos* = জ্ঞান) বলে। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণ পর্যবেক্ষণ, যাচাইকরণ ও প্রাণীর আচরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পিরিয়ড সংখ্যা-৮ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. আচরণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● আচরণের প্রকৃতি ○ উদ্দীপনায় আচরণগত পরিবর্তন ○ আচরণ ও বংশগতির মধ্যে পার্থক্য
২. সহজাত আচরণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● সহজাত (Innate) আচরণ ○ চলন (Taxes) ○ প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflexes) ○ সহজাত আবেগ (Instincts)
৩. প্রত্যেক প্রাণীর (শীতের পাখির মাইগ্রেশন, মাকড়শার জাল, অপত্যের প্রতি যত্ন– মাছ, ব্যাঙ, পাখি) সহজাত আচরণ যাচাই করতে পারবে।	● সহজাত আচরণ যাচাই ○ শীতের পাখির মাইগ্রেশন ○ মাকড়শার জাল ○ অপত্যের প্রতি যত্ন–মাছ, ব্যাঙ, পাখি
৪. শিখন ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● শিখন (Learning) ○ অভ্যাসগত (Habituation) ○ অনুকরণ (Imprinting)
৫. কুকুরের লালার প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (reflexes) উপর Pavlov এর তত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবে।	● Pavlov এর তত্ত্ব ○ কুকুরের লালার প্রতিবর্তী ক্রিয়া
৬. মৌমাছির সামাজিক সংগঠন এর আলোকে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা (altruism) ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● সামাজিক আচরণ ○ পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা (Altruism) -মৌমাছির সামাজিক সংগঠন

আচরণের প্রকৃতি (The Nature of Behavior)

বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়ার প্রেক্ষিতে যে কোনো আচরণগত সাড়ার ব্যাপ্তি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে। নির্দিষ্ট প্রাণীতে সব সময় একই উদ্দীপনা একই সাড়া ফেলতে পারে না। শুধু পারিপার্শ্বিক অবস্থাই নয়, সাড়া দানে পার্থক্যের বিষয়টি বহিঃস্থ বা অন্তঃস্থ উদ্দীপনার কারণেও ঘটে থাকতে পারে। যেমন–একটি ক্ষুধার্ত প্রাণীর সামনে পেটভর্তি খাবার যে প্রেরণার সৃষ্টি করবে তা ভরপেট প্রাণীতে করবে না।

একটি প্রাণী যদি একদিকে প্রচন্ড ক্ষুধার্ত থাকে, অন্যদিকে শিকারী প্রাণীর ধাওয়ায় দৌড়ের উপরে থাকে আর তখন যদি লোভনীয় খাবার ওই প্রাণীর মুখের সামনে বাড়িয়ে দেয়া হয় তখন তার আচরণ হবে ভিন্ন। বিপদ না যাওয়া পর্যন্ত পলায়নপর প্রাণী কিছুই খাবে না। এভাবে, কোনো আচরণগত সাড়ার ব্যাপ্তি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটার পেছনে বিভিন্ন উদ্দীপনার সম্মিলন কাজ করে। বিভিন্ন উদ্দীপনার এ সম্মিলন মোটিভেশন (motivation) বা প্রেরণা নামে পরিচিত।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কিছু প্রাণীর জননগত আচরণে মোটিভেশন উপাদান জড়িত থাকে। যেমন– অনেক প্রজাতির স্ত্রী সদস্য বছরের নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময়ে জননে অংশ নেয় না। এ সময়কালটি প্রাণিদেহে রজঃচক্রের (এস্ট্রাস চক্র) সঙ্গে জড়িত থাকে। তখন নিষেক, গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদান ঐ প্রাণীর জন্য নিরাপদ ও অনুকূল। এ আচরণগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে **জৈবনিক ছন্দ** (biological rhythms)। অনেক প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ সদস্যে এ ছন্দ (বা মোটিভেশন) মিলে যায়, অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রার মোটিভেশন প্রয়োজন হয়। প্রাইমেট জাতীয় অনেক স্ত্রী সদস্যে যৌনাঙ্গের রং ও স্ফীতি এস্ট্রাস চক্রকে প্রকাশ করে। পুরুষ সদস্য তাতে আকৃষ্ট হয়ে জনন সম্পন্ন করে। আচরণগত পরিবর্তনে সহায়ক এ ধরনের সংকেতকে **সাংকেতিক উদ্দীপনা** (sign stimuli) বলে। উৎপত্তি বা কাজের ভিত্তিতে সাংকেতিক উদ্দীপনা তিন রকম : মোটিভেশনাল, রিলিজিং এবং টার্মিনেটিং উদ্দীপনা।

উদ্দীপনায় আচরণগত পরিবর্তন (Behavioural Changes due to Stimulus)

মোটিভেশন (Motivation) বা **প্রেরণাদায়ক উদ্দীপনা :** এ উদ্দীপনা অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক হতে পারে। দিনের সময়কাল বেড়ে গেলে পাখির বিচরণ পরিসীমা রক্ষা ও জনন আচরণ প্রভাবিত হয়। এটি **বাহ্যিক উদ্দীপনা**। অন্যদিকে, শীতযাপনকালে আহার অন্বেষণের ভয়ংকর বাস্তবতার কথা চিন্তা করে দেহে সঞ্চিত চর্বি থেকে শক্তি আহরণ করার বিষয়টি হচ্ছে **অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা**। প্রেরণাদায়ক উদ্দীপনা প্রাণীকে এমন 'তাড়না' বা 'লক্ষ' ('drive' or 'goal') সরবরাহ করে যাতে প্রাণী দ্বিতীয় সাংকেতিক উদ্দীপনা অর্থাৎ রিলিজিং বা নির্গমণ উদ্দীপনা প্রদর্শনে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।

রিলিজিং (Releasing) বা **নির্গমণ উদ্দীপনা : রিলিজার** হচ্ছে একটি সাধারণ উদ্দীপনা। কোনো প্রজাতির এক সদস্য যখন একই প্রজাতির আরেক সদস্যের উদ্দেশে আচরণগত সাড়ার অংশ হিসেবে ক্রমাগত উদ্দীপনার প্রকাশ ঘটায় তখন তাকে রিলিজার (releasers) বলে। বিখ্যাত আচরণবিজ্ঞানী **লরেঞ্জ** (Lorenz) **সর্বপ্রথম** Releaser শব্দ প্রয়োগ করেন এবং আরেক পৃথিবীখ্যাত বিজ্ঞানী **টিনবারগেন** (Tinbergen) আচরণে এর ভূমিকা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। **হেরিংগাল** (গাংচিল, *Larus argentatus*)-এর খাদ্য গ্রহণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের সময় রিলিজারের কার্যকারিতার বিষয়টি জানা যায়। হেরিং গাল যখন শাবকদের জন্য খাবার নিয়ে আসে শাবক তখন পিতা-মাতার হলদে রংয়ের নিম্নচোয়ালে অবস্থিত একটি লাল ফোঁটায় ঠোকর মেরে মাছ উগরে দেওয়ার সংকেত দেয়। উগরে দেওয়া মাছ শাবক হেরিংগাল গলাধঃকরণ করে। বিজ্ঞানী টিনবারগেন ও পারডেক (Tinbergen and perdeck) এ প্রক্রিয়ার রহস্য উদঘাটনে নিয়ন্ত্রিত ও ধারাবাহিক গবেষণা করেন। তাঁরা কাগজের শক্ত বোর্ড দিয়ে পূর্ণবয়স্ক হেরিংগালের মাথা বানিয়ে তাতে ঠোঁটের মধ্যে কড়া বৈসাদৃশ্য প্রদর্শনকারী (contrast) রংয়ের ফোঁটা মেখে লক্ষ করেন যে ঠোঁটের ফোঁটাই খাদ্য চেয়ে আকুতি জানানোর একমাত্র রিলিজার। শুধু তা-ই-নয়, তাঁরা আরও লক্ষ করেন যে পূর্ণবয়স্কের ঠোঁটে একটিমাত্র ফোঁটার বদলে তাঁদের তৈরি একটি দন্ডের মধ্যে দু-তিনটি আড়াআড়ি দাগ দিয়ে শাবকের চোখের সামনে ধরলে সেটাকে আরও বেশি ঠোকারাতে থাকে।

টারমিনেটিং (Terminating) বা **সমাপ্তিকরণ উদ্দীপনা :** যে উদ্দীপনায় আচরণগত সাড়ার সমাপ্তিকরণ ঘটে তাকে **টারমিনেটিং উদ্দীপনা** বলে। এটি বাহ্যিকও হতে পারে, অভ্যন্তরীণও হতে পারে। পাখির দৃষ্টি উদ্দীপনা (visual stimuli) যখন একটি বাসা নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে মনে করে তখন পাখি বাসা নির্মাণ বন্ধ করে দেয়। এটি হচ্ছে **বাহ্যিক টারমিনেটিং উদ্দীপনা**। অন্যদিকে, ভরপেট না হওয়া পর্যন্ত (অর্থাৎ পাকস্থলি ভরে না খাওয়া পর্যন্ত) খাওয়া চালিয়ে যাওয়া, পাকস্থলি পূর্ণ হলে অর্থাৎ পরিতৃপ্তির পর খাওয়া বন্ধ করা হচ্ছে **অন্তঃস্থ টারমিনেটিং উদ্দীপনা**।

কাজ : মোটিভেশন, রিলিজিং ও টারমিনেটিং এর মধ্যে পার্থক্যগুলো ছকের মাধ্যমে দেখাও।

আচরণ ও বংশগতির মধ্যে সম্পর্ক (Relation between Behaviour and Heredity)

মানব ইতিহাসের গোড়ার দিকে DNA-র উত্তরাধিকার কিংবা জিনগত তথ্য থেকে শারীরিক, শারীরবৃত্তিক বা আচরণগত অনুবাদের পদ্ধতি সবকিছু ছিল অজানা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আদি মানুষ তাদের স্বতঃলব্ধ জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পেরেছে যে উত্তরাধিকার কোনো না কোনোভাবে আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। যৌন মিলন নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তারা মানুষের উপকারী পশু-পাখি পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করতে পেরেছে। গবাদি পশু, পাখি, কুকুর প্রভৃতির আচরণ দেখলেই বোঝা

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

যাবে প্রাণিগুলো ওদের বন্য পূর্বপুরুষ থেকে কতোখানি ভিন্ন। মানব ইতিহাসে উন্নয়নের ধারার অন্যতম প্রধান উপাদান হচ্ছে নির্বাচনমূলক প্রজনন সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত ও প্রাণী বাছাই বিষয়টি। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে পর্যন্ত ডারউইন ও মেন্ডেলের যুগান্তকারী আবিষ্কার ও বর্ণনা প্রকাশের আগে আমরা উন্নত প্রাণী সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়ার মূল রহস্য জানতে পারিনি।

বর্তমান সময়ে খুব সহজেই জানতে পারছি যে, জিন ও পরিবেশ উভয়ই আচরণকে প্রভাবিত করে। আচরণে এ দুই উপাদানের মিথস্ক্রিয়া নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। জিনের প্রভাবে প্রাণীর শারীরিক ও শারীরবৃত্তিক যে কাঠামো নির্মিত হয় তার ভিতরে পরিবেশের কর্মকান্ডে একেকটি প্রাণিসদস্যে আচরণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। পরিবেশ প্রাণীর দৈহিক ও শারীরবৃত্তিক পরিস্ফুটনকে প্রভাবিত করতে পারে, সে অনুযায়ী ঐ প্রাণীর আচরণও প্রভাবিত হয়।

জিনগুলো শিক্ষণ, স্মৃতি ও জ্ঞানের এক অস্থায়ী তথ্য ভান্ডার গড়ে তোলে, প্রাণী তার পরিবেশ উপযোগী আচরণে প্রয়োজনীয় তথ্য এ ভান্ডার থেকে গ্রহণ ও সঞ্চয় করতে পারে। মানুষ শিক্ষণ আচরণের মাধ্যমে অনেক কিছু জেনে বুঝে অর্থাৎ অভিজ্ঞতার আলোকে আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, অন্যদিকে, অনেক প্রাণিপ্রজাতির আচরণ দেখলে মনে হবে স্বয়ংক্রিয় (automatic), অর্থাৎ আগে থেকেই প্রোগ্রাম করা আচরণ। এসব বিষয় বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আচরণ ও বংশগতির মধ্যে সম্পর্কের বিস্তারিত ও জটিল ব্যাখ্যা বেরিয়ে এসেছে। ১৯৬০ সালের আগে প্রাণী আচরণ নিয়ে আচরণবিজ্ঞানীরা দুশিবিরে বিভক্ত ছিলেন: একটি **ইউরোপিয়ান**, অন্যটি **আমেরিকান**। অস্ট্রিয়ান প্রাণিবিজ্ঞানী **কনরাড লরেঞ্জ** (Konred lorenz)-এর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে আচরণবিদ্যা (ethology) দিক নির্দেশনা ফিরে পায়। বিজ্ঞানী লরেঞ্জ আচরণগুলোকে প্রধান দুটি ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন একটি **অর্জিত** (acquired), অন্যটি **সহজাত** (innate বা instinct)।

সহজাত আচরণের প্রকাশ ঘটে কোনো প্রাকচিন্তাভাবনা ছাড়াই, তা ছাড়া এ আচরণ শিক্ষণের মাধ্যমে বদলানোরও উপায় নেই। সহজাত আচরণের নমুনা সবার চোখেই পড়েছে। অন্ততঃ অন্ধকার ঘরে হঠাৎ আলো জ্বললে তেলাপোকা যে দ্রুত অন্ধকার কোণে দৌড়ায়- এ ঘটনা কারও নজর এড়িয়েছে বলে মনে হয় না। এমন ছোট-খাট ঘটনা অর্থাৎ নির্দিষ্ট উদ্দীপনায় নির্দিষ্ট সাড়া দেওয়ার প্রক্রিয়ায় শিক্ষণের কিছু নেই, সম্পূর্ণ জিনগত বিষয় জড়িত। বংশপরম্পরায় এ আচরণের পরিবর্তনও হয় না। অনুরূপভাবে, কোনো প্রজাতির সকল সদস্য একইভাবে সংকেতও প্রদর্শন করে। যে সংকেতটি প্রদর্শিত হয় তা ঐ প্রজাতির সকল সদস্যে একই কারণে এবং একইভাবে প্রকাশিত হয়। এক কুকুরের প্রতি রেগে গেলে আরেক কুকুরের মুখের অভিব্যক্তি, গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাওয়া এবং লেজের ভঙ্গি সার্বজনীন। অর্থাৎ বিষয়টি সহজাত। অন্যান্য প্রাণী জিনগত ও শিক্ষণ তথ্যের সমন্বয়ে সংকেত সৃষ্টি করে। পাখিকে যদি অন্য পাখির গান একেবারেই শুনতে না দেওয়া হয় তাহলেও পাখি প্রজাতি-নির্দিষ্ট গানের মতো করে গাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পরিস্ফুটনকালে নির্দিষ্ট গান শুনতে দিলে পাখিটি প্রজাতি-নির্দিষ্ট গান নিখুঁত গাইতে পারবে। অর্থাৎ সহজাত আচরণ সব সময় গাঁথুনি হিসেবে কাজ করে।

অর্জিত–সহজাত বিভাজনে (acquired - innate dichotomy) যে বিষয়টি অস্পষ্ট তা হচ্ছে প্রাণীর শিক্ষণ তখনই সম্ভব যখন সে যথারীতি নির্দিষ্ট পথে নিজ আচরণের উৎকর্ষ ঘটাতে জিন-নিয়ন্ত্রিত হয়ে পরিচালিত হয়। একটি প্রাণীর শিক্ষণ ভাল হতে পারে কিন্তু কোন অভিজ্ঞতা নিজের আচরণের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় তা নির্ভর করে প্রাণীর পূর্বপুরুষের জিনগত নির্দিষ্ট সাফল্যের উপর। অন্যদিকে, একটি প্রাণী জীবদ্দশায় যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এবং সে অভিজ্ঞতা প্রাণীর জিনকে যেভাবে সক্রিয় করে তা পরবর্তীতে প্রাণীর আচরণ নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। আধুনিক আচরণবিজ্ঞানীরা অর্জিত বনাম সহজাত আচরণকে অত্যন্ত সাদামাটা চোখে দেখে থাকেন। তাঁদের ধারণা, কোনো আচরণই শতভাগ অর্জিত নয়, বা সহজাতও নয়। বরং **সমস্ত আচরণই হচ্ছে জিন ও পরিবেশের এক জটিল মিথস্ক্রিয়া।**

প্রাণী আচরণে বিবর্তন এমনভাবে কাজ করেছে যেন জিন ও পরিবেশ পরিপূরক হয়ে কোনো প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষায় যেসব সংকটের মুখোমুখি হয় তার আচরণগত সমাধান বের করতে পারে। সহজাত সাড়া প্রাণীকে আচরণের উপর বংশ পরম্পরায় প্রাকৃতিক নির্বাচন থেকে প্রাপ্ত উপকার পাওয়ার সুযোগ করে দেয়। শিক্ষণের মাধ্যমে প্রাণী এমন হাতিয়ার অর্জন করে যার সাহায্যে সে স্থানীয় অবস্থা ও পরিবর্তনশীল পরিবেশে সাড়া দিতে সক্ষম হয়। মানুষের আচরণ নির্ধারণে জিন ও পরিবেশের আপেক্ষিক ভূমিকা প্রকাশিত হওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে মতভিন্নতা। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা উপসংহার টানছেন এ কথা বলে যে আচরণ হচ্ছে বিবর্তনিক প্রক্রিয়ার ফল যা কখনও জেনেটিক কোডিং-এর মাধ্যমে প্রাণীর জন্য

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

আচরণগত নির্দেশনা সৃষ্টি করে, কখনওবা এমন নমনীয় কৌশল উদ্ভাবন করে যাতে প্রাণী তার নিজস্ব পরিবেশে উদ্ভূত সমস্যা নিজের সমাধান করতে পারে।

সহজাত আচরণ (Innate behavior)

সহজাত আচরণ হচ্ছে এমন আচরণ যা জন্মগত পাওয়া অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাপ্ত ও সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনকারী আচরণ। পরিবেশের হঠাৎ পরিবর্তনে প্রজাতির অস্তিত্ব বাঁচাতে সাড়া হিসেবে এ আচরণের প্রকাশ ঘটে। একটি প্রজাতির সকল সদস্যে সহজাত আচরণ এক রকম হয়। যেমন- তরুণ বা বয়স্ক সব বয়সের বাবুই পাখি ডিমপাড়ার সময় হলে যে সুনিপুণ কারিগরি জ্ঞানে বাসা বুনে সেটি সহজাত আচরণ। এ আচরণ বংশ পরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। নিচে সহজাত আচরণের সিলেবাসভুক্ত প্রকারভেদ (ট্যাক্সিস, রিফ্লেক্সেস ও ইনসটিংক্টস) আলোচনা করা হয়েছে।

ট্যাক্সেস (Taxes)

দিকমুখি উদ্দীপনা বা উদ্দীপনা মাত্রার তীব্রতার প্রতি একটি জীবের সহজাত আচরণগত সাড়া দেওয়াকে ট্যাক্সিস (taxis, গ্রিক *taeksi* = arrangement বা বিন্যাস; বহুবচনে ট্যাক্সেস, taxes) বলে। এটি অন্যতম সহজাত আচরণ এবং অভিযোজনযোগ্য। ট্যাক্সিসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

১. জীব অপরিবর্তনীয় সাড়া দান করে;
২. স্থানিক দিকমুখিতা প্রদর্শন করে;
৩. দিকমুখিতায় সম্পূর্ণ দেহ জড়িত থাকে;
৪. চলনের দিক অবিরাম বহিঃউদ্দীপনায় পরিচালিত হয়; এবং
৫. দিকমুখি চলন সরাসরি উদ্দীপনা শক্তির সমানুপাতিক।

ট্যাক্সিসের প্রকারভেদ

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে সাড়াদানের ভিত্তিতে ট্যাক্সিসের প্রকারভেদ করা হয়ে থাকে, যেমন– উদ্দীপনার উৎস, উদ্দীপনার বিষয়, সংবেদী অঙ্গের উপস্থিতি ইত্যাদি। প্রাণীর অবস্থান পরিবর্তন সব সময় উদ্দীপকের উৎসের সাথে নির্দিষ্ট কোণে সম্পাদিত হয় বা সরাসরি উৎসের দিকে কিংবা উৎস থেকে দূরে সরে যায়।

দেহের দিকমুখিতার ভিত্তিতে ট্যাক্সিস নিম্নোক্ত দুরকম

১. পজিটিভ বা ধনাত্মক ট্যাক্সিস (Positive taxis) : এক্ষেত্রে প্রাণী উদ্দীপকের উৎসের দিকে ঘুরে যায় বা গমন করে।
২. নেগেটিভ বা ঋণাত্মক ট্যাক্সিস (Negetive taxis) : এক্ষেত্রে প্রাণী উদ্দীপকের উৎস থেকে দূরে সরে যায়।

উদ্দীপনার উৎসের ভিত্তিতে জীবে নিম্নোক্ত বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্সেস দেখা যায়।

১. অ্যারোট্যাক্সিস (Aerotaxis) : জীব যখন অক্সিজেন ঘনত্বের পার্থক্যের কারণে সাড়া দেয়।
২. কেমোট্যাক্সিস (Chemotaxis) : জীব এক্ষেত্রে পরিবেশে রাসায়নিক ঘনত্বের তারতম্যের কারণে সাড়া দেয়।
৩. এনার্জি ট্যাক্সিস (Energy taxis) : এ ধরনের দিকমুখিতায় জীবকোষের অন্তঃস্থ শক্তির অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ বিপাকীয় কাজের দিকে সাড়া দেয়।
৪. গ্র্যাভিট্যাক্সিস (Gravitaxis) বা জিওট্যাক্সিস (Geotaxis) : এটি হচ্ছে জীবের অভিকর্ষজনিত সাড়াদান। বিভিন্ন প্রাণীর লার্ভা দশায় পজিটিভ ও নেগেটিভ দুধরনের গ্র্যাভিট্যাক্সিসই দেখা যায়।
৫. গ্যালভানো ট্যাক্সিস (Galvanotaxis) বা ইলেক্ট্রোট্যাক্সিস (Electrotaxis) : এ ক্ষেত্রে সাড়াদানের উৎস হচ্ছে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র (electrical field)।
৬. ম্যাগনেটোট্যাক্সিস (Magnetotaxis) : এটি চুম্বক-ক্ষেত্রসংশ্লিষ্ট সাড়াদান।
৭. ফোনোট্যাক্সিস (Phonotaxis) : এটি হচ্ছে শব্দের প্রতি সাড়া দিয়ে জীবের চলন।
৮. ফটোট্যাক্সিস (Phototaxis) : এটি আলোর তীব্রতা ও দিকের প্রতি সাড়া দিয়ে জীবের চলন।
৯. রিওট্যাক্সিস (Rheotaxis) : এটি হচ্ছে তরল পদার্থে প্রাণীর স্রোতজনিত ট্যাক্সিস।
১০. থার্মোট্যাক্সিস (Thermotaxis) : এটি জীবের তাপের ক্রমমাত্রা বরাবর প্রাণীর চলন।
১১. থিগমোট্যাক্সিস (Thigmotaxis) : এটি দৈহিক স্পর্শজনিত ট্যাক্সিস।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ট্যাক্সিসের দিকমুখিতার ভিত্তিতে আচরণ নিম্নোক্ত ৫ রকম।

১. **ক্লাইনোট্যাক্সিস** (Klinotaxis) : যে সব প্রাণীতে এ ট্যাক্সিস ঘটে সে সব প্রাণীতে কোনো জোড় সংবেদ অঙ্গ থাকে না, বরং সংবেদগ্রাহী কোষগুলো সমগ্র দেহ জুড়ে, বিশেষ করে সম্মুখ অংশে অবস্থান করে। সম্মুখ অংশটি এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে উদ্দীপনার ব্যাপকতা যাচাই করে। সবদিক থেকে ব্যাপকতার সমতা এলে প্রাণী সোজা চলতে শুরু করে। ব্লোফ্লাই (blowfly) ও বাটারফ্লাই (butterfly)-এর লার্ভায় এ ধরনের ট্যাক্সিস দেখা যায়।

২. **মেনোট্যাক্সিস** (Menotaxis) : এ ধরনের ট্যাক্সিসে প্রাণীর দিকমুখিতা থাকে কৌণিক (angular) ধরনের। যেমন–সূর্যের প্রতি সাড়া দিয়ে পিঁপড়ার চলন।

৩. **নেমোট্যাক্সিস** (Mnemotaxis; Gk, *mneme* = স্মৃতি) : এটি কোনো প্রাণীর স্মৃতিমূলক সাড়াদান। এসব প্রাণী কোথাও গেলে চলার পথের আশ-পাশের কোনো বস্তুকে চিহ্ন হিসেবে মনে রাখে, ফেরার সময় ওই চিহ্নগুলো মনে করে ফিরে আসে। দুএকটা স্মৃতিচিহ্ন উঠিয়ে নিলে প্রাণীর বাসায় ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৪. **টেলোট্যাক্সিস** (Telotaxis) : এটি হচ্ছে শক্তিশালী উদ্দীপকের প্রতি সাড়াদান। এ ক্ষেত্রে প্রাণিদেহে জোড় সংবেদ অঙ্গ থাকে। একটি মৌমাছি যখন খাদ্যের খোঁজে চাক থেকে বের হয় তখন একদিকে সূর্য, অন্যদিকে ফুল-এ দুটি উদ্দীপক থাকে। এ দুই উদ্দীপকের মধ্যে ফুল-এর উদ্দীপনা বেশি হওয়ায় মৌমাছি ফুলে গিয়ে বসে, ভারসাম্য বজায় রেখে মধ্যপথে অগ্রসর হয় না।

৫. **ট্রোপোট্যাক্সিস** (Tropotaxis) : এটি হচ্ছে দুই বা ততোধিক সংবেদগ্রাহী অঙ্গে একটি উদ্দীপকের উদ্দীপনা একসঙ্গে গৃহীত হলে ভারসাম্যমূলক ট্যাক্সিস। এক্ষেত্রে প্রাণিদেহে জোড় সংবেদাঙ্গ উপস্থিত থাকে। মাছের উকুনে (fish louse) এ ধরনের ট্যাক্সিস দেখা যায়।

ট্যাক্সেসের অভিযোজনিক গুরুত্ব

ট্যাক্সেসের অভিযোজনিক গুরুত্ব অপরিসীম। যেমন–প্রজাপতির দিকমুখিতা ও চলন শত্রুর হাত থেকে বাঁচাতে সাহায্য করে; পিঁপড়া ও পাখির বাসায় ফেরার বিষয়টি ট্যাক্সিসের নিয়মে পরিচালিত হয়; এবং ঋণাত্মক ফটোট্যাক্সিসের ফলে মাছির লার্ভা অন্ধকার কোণে পিউপায় রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ পায়। এক কথায় বলতে গেলে, উদ্দীপনায় যথাসময়ে সঠিক সাড়া দিয়ে প্রাণী বংশবৃদ্ধি থেকে শুরু করে নীড় নির্মাণ, অপত্য যত্ন, আহার সংগ্রহ, শত্রুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করে নির্বংশ হওয়া থেকে টিকে থাকে।

প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflex action)

মস্তিষ্ক হচ্ছে দেহের সকল কাজ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র। দেহের কোনো অংশে মশা বসলে **সংবেদী স্নায়ু** (sensory nerve) দিয়ে সেই সংবাদ মস্তিষ্কে পৌছে। মস্তিষ্ক তখন **চেষ্টীয় স্নায়ু** (motor nerve) দিয়ে হাতের পেশিকে নির্দেশ প্রদান করে, ফলে আমরা হাতটি সরিয়ে নিই অথবা মশাকে মারতে চেষ্টা করি। কিন্তু অনেক সময় কোনো জরুরি প্রয়োজনে এ নির্দেশ মস্তিষ্কের পরিবর্তে **সুষুম্না কাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ড** (spinal cord) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন– তীব্র আলোতে চোখের পাতা দুটি তাৎক্ষণিতভাবে বন্ধ হয়ে যায়, গরম ইস্ত্রিতে হাত পড়লে চট করে হাত দূরে সরে যায়। এসব জরুরি প্রক্রিয়াগুলো অনৈচ্ছিক এবং স্পাইনাল কর্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। এ প্রক্রিয়াগুলো হলো **প্রতিবর্তী ক্রিয়া**। ঘুমন্ত অবস্থায় মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, ঐ সময় মশা কামড়ালে আমরা হাত, পা সরিয়ে নেই। এগুলো স্পাইনাল কর্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং এটিও এক রকম প্রতিবর্তী ক্রিয়া। **কোন উদ্দীপকের প্রভাবে মস্তিষ্কের নির্দেশ ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্তভাবে পেশি বা কোন অঙ্গে যে অনৈচ্ছিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাকে প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলে।** প্রতিবর্ত ক্রিয়া সুষুম্না কাণ্ডের নিয়ন্ত্রণে **প্রতিবর্ত চক্র** নামক এক বিশেষ সংক্ষিপ্ত স্নায়ু পথ দিয়ে ঘটে থাকে।

প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য

১. এটি সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিক ধরনের প্রতিক্রিয়া, এর পেছনে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা থাকে না।
২. এটি সহজে সংশোধিত বা পরিবর্তিত হয় না; এক ধরনের উদ্দীপক এক ধরনের প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করে।
৩. প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজাত বা জন্মগত, শিক্ষালব্ধ নয়।
৪. এটি সহজ প্রকৃতির।
৫. প্রতিবর্তী ক্রিয়া খুব দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়; সংবেদনের সাথে সাথেই দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

প্রতিবর্তী চক্র (Reflex Cycle)

প্রতিবর্ত ক্রিয়ার স্নায়ুর উদ্দীপনা যে পথে সংঘটিত হয় তাকে প্রতিবর্ত চক্র (reflex arc) বলে। এ চক্র পাঁচটি অংশ নিয়ে গঠিত।

১. একটি গ্রাহক (Receptor) : এটি সংবেদী উদ্দীপনা সৃষ্টি করে।

২. অন্তর্বাহী পথ (Afferent path) : এটি একটি সংবেদী স্নায়ু যা গ্রাহক অঙ্গ থেকে উদ্দীপনা কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রে বহন করে নিয়ে যায়।

৩. কেন্দ্র (Center) : এটি প্রকৃতপক্ষে সুষুম্না কান্ডে অবস্থিত একটি সিন্যাপস যার মাধ্যমে অন্তবার্হী স্নায়ুর উদ্দীপনা চেষ্টীয় নিউরনে পরিবাহিত হয়।

৪. বহির্বাহী পথ (Efferent path) : এটি একটি চেষ্টীয় স্নায়ু। এর মাধ্যমে বহির্গামী স্নায়ু উদ্দীপনা কেন্দ্র থেকে প্রভাবিত অঙ্গে প্রেরিত হয়।

৫. প্রভাবিত অঙ্গ (Effector organ) : এটি একটি পেশি বা একটি গ্রন্থি হতে পারে যা যথাক্রমে সংকোচন বা নিঃসরণের মাধ্যমে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রভাব প্রদর্শন করে।

প্রতিবর্ত ক্রিয়া সংঘটন পদ্ধতি

প্রতিবর্ত ক্রিয়া সংঘটন পদ্ধতি একটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হলো।

অসতর্কভাবে সেলাই করার সময় হঠাৎ আঙুলে সূঁচ ফুটলে, কিংবা গরম পাত্রে হাত লাগলে তাৎক্ষণিকভাবে হাত ক্ষিপ্রতার সাথে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে সরে যায়। এটি একটি **পলিসিন্যাপটিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া** যা নিম্নরূপে সংঘটিত হয়:

ধাপ-১ : গরম পাত্রে বা আগুনে হাত লাগলে আঙুলের ত্বকে অবস্থিত সংবেদী নিউরনের ডেনড্রাইটসমূহ ব্যথার অনুভূতির উদ্দীপনা গ্রহণ করে। এখানে গ্রাহক বা ত্বক **রিসেপ্টর অঙ্গ** হিসেবে কাজ করে।

ধাপ-২ : আঙুলের ত্বক থেকে উদ্দীপনা সংবেদী নিউরনের অ্যাক্সনের মাধ্যমে সুষুম্না কান্ডের গ্রে ম্যাটার অংশে পৌঁছায়।

ধাপ-৩ : সুষুম্না কাণ্ডের গ্রে ম্যাটার অংশে অবস্থিত সংবেদী নিউরনের অ্যাক্সন ও রিলে নিউরনের ডেনড্রাইটের মধ্যবর্তী সিন্যাপস এর মধ্য দিয়ে তড়িৎ রাসায়নিক পদ্ধতিতে (electrochemical process) উদ্দীপনা চেষ্টীয় নিউরনের ডেনড্রাইটে প্রবেশ করে এবং অ্যাক্সন কর্তৃক পরিবাহিত হয়ে আঙুলের বা বাহুর পেশিতে পৌঁছে।

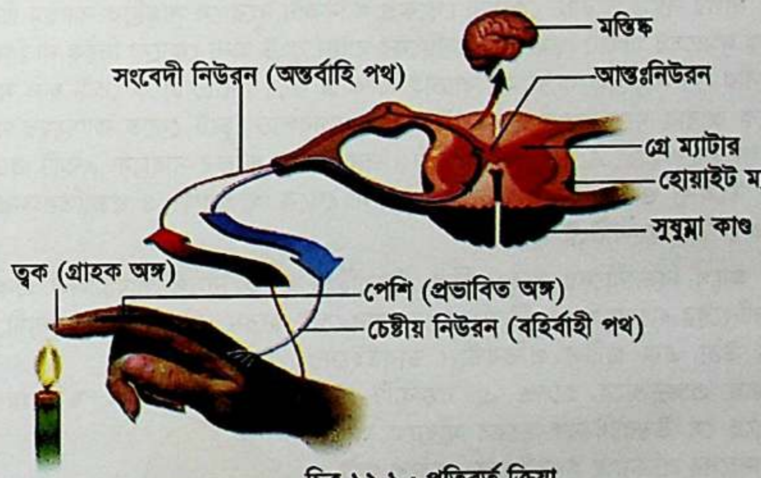

চিত্র ১২.১ : প্রতিবর্ত ক্রিয়া

ধাপ-৪ : স্নায়ু উদ্দীপনা পেশিতে পৌঁছালে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নির্দেশে পেশি বা প্রভাবিত অঙ্গের (effector organs) সংকোচন ঘটে। ফলে উদ্দীপনার স্থান থেকে সম্পূর্ণ অনৈচ্ছিকভাবে হাত সরে যায়। এভাবে একটি সরল প্রতিবর্তী চক্র সম্পন্ন হয় এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

প্রতিবর্ত ক্রিয়ার প্রকারভেদ

বিখ্যাত সোভিয়েত বিজ্ঞানী আইভান প্যাভলভ (Ivan Pavlov) প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে দুটি ভাগে ভাগ করেন।

১. **সহজাত প্রতিবর্তী ক্রিয়া বা আনকন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স** ও

২. **অর্জিত বা সাপেক্ষ বা কন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স।**

১. **সহজাত বা আনকন্ডিশন্ড রিফ্লেক্স (Unconditioned Reflex) :** যেসব প্রতিবর্তী ক্রিয়া জন্মগত, স্থির এবং কোনো শর্তাধীন নয় তাদের **সহজাত প্রতিবর্তী ক্রিয়া** বলে। যেমন- (i) খাবার দেখলে বা খাবারে গন্ধে লালা নিঃসৃত

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

হওয়া, (ii) উজ্জ্বল আলোতে চোখের পিউপিলের সংকুচিত হওয়া, (iii) হাতে বা পায়ে গরম স্যাঁক বা কাঁটার খোঁচা লাগলে সাথে সাথে হাত বা পা সরিয়ে নেয়া ইত্যাদি।

সহজাত প্রতিবর্তী আবার তিন প্রকার। যথা–

i. **উপরিগত বা সুপারফিসিয়াল প্রতিবর্তী** (Superficial Reflex) : এক্ষেত্রে উদ্দীপনা ত্বক থেকে গৃহীত হয়। পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিয়ে পায়ের পাতা সংকুচিত হয়। এটি সুপারফিশিয়াল প্রতিবর্তীর উদাহরন।

ii. **গভীর বা ডিপ প্রতিবর্তী** (Deep Reflex) : এক্ষেত্রে উদ্দীপনা দেহের গভীরে অবস্থিত টেনডন (tendon) থেকে গৃহীত; ফলে টেনডন সংলগ্ন পেশি সংকুচিত হয়। পা ঝুলিয়ে বসে হাঁটুতে মৃদু আঘাত করলে হাঁটুতে ঝাঁকুনির সৃষ্টি হয়। এটি ডিপ প্রতিবর্তীর উদাহরই।

iii. **আন্তরযন্ত্রীয় বা ভিসেরাল প্রতিবর্তী** (Visceral Reflex) : এধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় (autonomic) এবং দেহের আন্তর যন্ত্রসমূহ থেকে উৎপন্ন হয়। হৃৎপিন্ড, পাকস্থলি, অন্ত্র, ফুসফুস, মূত্রাশয় ইত্যাদির প্রতিবর্তী।

২. **অর্জিত বা কনডিশন্ড রিফ্লেক্স** (Conditioned Reflex) : যেসব প্রতিবর্তী ক্রিয়া জন্মগত নয়, বার বার অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং শর্তসাপেক্ষ, তাদের **অর্জিত বা কনডিশন্ড রিফ্লেক্স** বলে।

সাপেক্ষ প্রতিবর্তীর বৈশিষ্ট্য : (i) এটি অর্জিত, (ii) এটি পূর্বের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। (iii) এটি স্থায়ী হতে পারে অথবা বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। (iv) এটি বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় না, (v) এটি জটিল অর্থাৎ এ প্রকার প্রতিবর্তী ক্রিয়ার জন্য মস্তিষ্কের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। (vi) এটি প্রাথমিকভাবে কোনো সহজাত প্রতিবর্তী ক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল।

সহজাত আবেগ বা ইনসটিংক্টস (Instincts)

সাগর পাড়ে সর্বোচ্চ জোয়ার থেকেও খানিকটা দূরে যে সামুদ্রিক কাছিম ডিম পেড়ে বালু দিয়ে ঢেকে রেখে যায় তা থেকে দুমাসের মাথায় ডিম ফুটে কাছিমের বাচ্চা ফুটে অন্য কোনো দিকে না গিয়ে সোজা সমুদ্রের পানিতে আশ্রয় নেয়। পৃথিবীর সব সামুদ্রিক কাছিমের বাচ্চাই এ কাজ করে। বাচ্চাটাকে কেউ যদি সমুদ্রবিমুখে ঘুরিয়ে দেয় তাহলে খানিকটা থমকে আবার ঘুরে সাগরপানে ছুটে যায়। সাগরপানে ছুটে যেতে কাছিমের বাচ্চাকে কেউ নির্দেশ দেয়নি, বরং এটি জিনগতভাবে স্থায়ী ও বংশগত আচরণ। জন্মগত যে শক্তির সাহায্যে একটি প্রজাতির সকল সদস্য কোনো শিক্ষণ ছাড়া এবং উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্বন্ধে অবহিত না থেকে আত্মরক্ষা ও প্রজাতিরক্ষায় বংশ পরম্পরায় একইভাবে কাজ করে থাকে সেটাই **ইনসটিংক্ট**।

আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, ইনসটিংক্ট হচ্ছে নিসর্গ পরিচালিত এক শক্তি। **ডারউইন** (১৮৫৯) সর্বপ্রথম ইনসটিংক্টের বাস্তবমুখি একটি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর সংজ্ঞা অনুযায়ী, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে গড়ে উঠা এক জটিল প্রতিবর্তী। ডারউইনের সংজ্ঞায় প্রচ্ছন্নভাবে হলেও এ বক্তব্যটি উঠে এসেছে যে উত্তরাধিকার সূত্রের মাধ্যমে আগত সাড়াদানের প্রক্রিয়ায় ইনসটিংক্টের প্রকাশ ঘটে।

লরেঞ্জ (Lorenz, 1937) ডারউইনের বক্তব্য মেনে নিলেও কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করে বলেন যে প্রত্যেক প্রাণি-প্রজাতির আচরণ কতকগুলো **স্থায়ী** (বা অপরিবর্তনীয়) **অ্যাকশন প্যাটার্ণ** (Fixed Action Pattern, FAP) নিয়ে গঠিত, আর এইগুলো হচ্ছে প্রজাতি-নির্দিষ্ট, অতএব জিনগতভাবে নির্ধারিত (genetically determined)। লরেঞ্জ আরও বলেছেন যে প্রতিটি FAP-ই ইনসটিংক্ট এবং প্রাণিদেহে অনেক ইনসটিংক্ট কেন্দ্র রয়েছে। টিনবারগেন (Tinbergen, 1951) লরেঞ্জ প্রদত্ত ধারণাকে সামগ্রিকভাবে সমর্থন জানিয়েছেন।

চিত্র ১২.২ : রিলিজারের সঙ্গে IRM ও FAP-এর সম্পর্ক

যা হোক, সদ্যজাত হেরিংগাল ও তার মায়ের মধ্যে যে সাড়া (response) প্রদর্শিত হয় তা থেকে ইনসটিংক্টের সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ক্ষুধার্ত হেরিংগাল ছানা চাক্ষুষ উদ্দীপনার প্রতি সংবেদনশীল। অন্যদিকে, বাসায় ছানার উপস্থিতি

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

পূর্ণাঙ্গ হেরিংগাল-এ **চাক্ষুষ উদ্দীপনা** (visual stimuli) হিসেবে কাজ করে। রিলিজিং উদ্দীপনার মাধ্যমে যে বার্তার সৃষ্টি হয় তা অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের একটি কেন্দ্রে বাহিত হয়। এ কেন্দ্রই সুনির্দিষ্ট বার্তার প্রতি নির্দিষ্ট সাড়া দেয়। এ প্রক্রিয়াটি **সহজাত রিলিজিং পদ্ধতি** (Innate Releasing Mechanism, IRM)। IRM নির্দিষ্ট পেশিকে সংকোচন ও প্রসারণের নির্দেশ দেয়। ফলে ছানার ঠোকর পড়ে পূর্ণাঙ্গ হেরিংগাল-এর ঠোঁটে অবস্থিত লাল ফোঁটার উপর। এটাই হচ্ছে **স্থায়ী অ্যাকশন প্যাটার্ন** (FAP)।

FAP এর বৈশিষ্ট্য

বিশ্বখ্যাত আচরণবিজ্ঞানী লরেঞ্জ (১৯৩২) প্রদত্ত মানদন্ড অনুযায়ী একটি FAP-কে অবশ্যই নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে হবে।

১. **ছাঁচসম্মত** (Stereotypy) : আচরণ সব সময় একই রকম হবে।
২. **সার্বজনীনতা** (Universality) : একটি প্রজাতির সকল সদস্যে এ আচরণ প্রদর্শিত হবে।
৩. **ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বহির্ভূত** (Independence of individual experience) : বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকলেও প্রজাতির সব সদস্যে একই আচরণ প্রকাশিত হবে।
৪. **ব্যালিসটিকনেস** (Ballisticness) : সাড়া একবার দেওয়া হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন সাপেক্ষেও তা অপরিবর্তিত থাকে।
৫. **উদ্দেশ্যের একনিষ্ঠতা** (Singleness of purpose) : একটিমাত্র কাজ করে।

টুনটুনি পাখির বাসা নির্মাণ

টুনটুনি পাখির বাসা বাঁধা ইনসটিংক্টের এক চমৎকার উদাহরণ। এক লম্বালেজি তরুণী টুনটুনি সঙ্গী নির্ধারণ শেষে তার প্রথম নীড় বাঁধার কাজে সক্রিয় হয়। বেশ কয়েকটি গাছ ঘুরে খুঁজে দেখে কোথায় দুটি বড় ঝুলন্ত পাতা রয়েছে যেখানে বাসা বাঁধলে শাবকগুলো নিরাপদে বড় হবে। মনমতো গাছ-পাতা-জায়গা পেলে শুরু করে দেয় বাসা বাঁধা। পাতাদুটির কিনারা ঠোঁট দিয়ে ছিদ্র করে চটের বস্তা সেলাই করার মতো ছিদ্রগুলোর ভিতর দিয়ে মাকড়সার জাল, ককুন-এর রেশম প্রভৃতি দিয়ে সুতা বানিয়ে কিনারাগুলো আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে। সুতা যেন ছুটে না যায় সেজন্য বিশেষ উপায়ে গিঁট দিতে ভুলেনা টুনটুনি। টেনে-টুনে দেখে থলির মতো গড়নের বাসা। বাসার মেঝেয় ছোট ছোট ডালের টুকরা, ঘাস বিছিয়ে নরম গদির মতো করে তোলে। এখানে ডিম পাড়া হবে, শাবক পালিত হবে।

চিত্র ১২.৩ : টুনটুনির বাসা নির্মাণ

প্রথমবার যে টুনটুনি বাসা বানায় সে বয়স্ক পাখির নীড় বাঁধার কর্মকান্ড বা কৌশল সম্বন্ধে কিছুই জানে না। তা সত্ত্বেও যে বাসাটি বাঁধে সেটি নিখুঁত না হলেও শাবক লালনে চলনসই গণ্য হয়।

টুনটুনি পাখির বাসা বাঁধার প্রক্রিয়া একটি ইনসটিংক্টিভ আচরণের সুলভ ও যথাযথ উদাহরণ।

কাজ : ট্যাক্সিস, রিফ্লেক্স ও ইনসটিংক্ট এর মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

সহজাত আচরণ যাচাই

আগেই বলা হয়েছে যে সহজাত আচরণ বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয়। এ কথার সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায় পরিযায়ী পাখিদের নির্দিষ্ট ঋতুতে বংশপরম্পরায় একই বিচরণ ভূমিতে সাময়িক ফিরে আসার মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর অতিবিপন্ন (Critically Endangered, CR) একটি পাখি হচ্ছে চামচঠোঁটি কাদাখোচা (Spoon-billed Sandpiper, *Eurynorhynchus pygmeus*)। এটি প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ে বাংলাদেশের উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চলে আহার, আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্য রাশিয়া থেকে পরিযায়ী হয়। পরিযায়ী পাখি সহজাত আচরণকে কাজে লাগিয়ে বুঝে নেয় কোন সময় ও কোন পথে পরিযায়ী হতে হবে এবং এখানে এসে হাওর-বাওর-নদী ফেলে উপকূলীয় কাদাময় দ্বীপে হেঁটে হেঁটে আহার খুঁজতে হবে–এসব কর্মকান্ড সহজাত আচরণের বহিঃপ্রকাশ। পেটপুরে খেয়েদেয়ে নির্দিষ্ট সময়ে পুনরায় স্থায়ী বাসস্থানে ফিরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে এদের বাংলাদেশ সফরের সমাপ্তি ঘটে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

শীতের পাখির মাইগ্রেশন বা পরিযান

প্রত্যেক প্রাণীর জন্যই পরিবেশে কিছু না কিছু প্রতিকূল বিষয় থাকে। এসব বিষয় অনেক সময় ঋতুভিত্তিক দেখা দেয়। ঋতুগতভাবে পরিবর্তনশীল পরিবেশ মোকাবিলায় প্রাণী যে সব কার্যকর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে তারই একটি হচ্ছে **মাইগ্রেশন** (migration) বা **পরিযান**। প্রাণী তখন অনুকূল পরিবেশের উদ্দেশে যাত্রা করে। প্রকৃত অর্থে পরিযান বলতে উভয়মুখি চলাচলকে বুঝায় অর্থাৎ স্থায়ী বাসভূমি থেকে নতুন কোনো অনুকূল পরিবেশে যাত্রা এবং সেখানে সাময়িক বসবাসের পর পুনরায় স্থায়ী বসতিতে প্রত্যাগমন। এরকম যাতায়াত সাধারণত একই পথ অনুসরণ করে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত হয়। পাখির পরিযান এধরনের। পাখির জগতে পরিযান ব্যাপক বিস্তৃত। প্যালিআর্কটিক অঞ্চলের ৪০ শতাংশ পাখি-প্রজাতি পরিযায়ী। পাখিদের পরিযান বিজ্ঞানীদের কাছে আজও রহস্যাবৃত ঘটনা, তবে যে কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ উল্লিখিত হয়েছে তা হচ্ছে–খাদ্যের স্বল্পতা, শীতের তীব্রতা, পূর্বপুরুষীয় বাসভূমিতে প্রত্যাবর্তন ইত্যাদি।

স্থানীয় পরিযান সাধারণত কয়েকশ ফুট থেকে ১-২ মাইল পর্যন্ত হয়, যেমন-হিমালয়ান পার্ট্রিজ (একধরনের তিতির)। অন্যদিকে, আর্কটিক টার্ণ ১১ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে শীতকালে অ্যান্টার্কটিকার উপকূলে এসে হাজির হয়। কিছু পাখি মাটির সামান্য উপর দিয়ে উড়ে গেলেও সুশৃঙ্খল পরিযানের অংশগ্রহণকারী পাখি মাটি থেকে প্রায় ৩ হাজার থেকে ২০ হাজার ফুট উচ্চতায় আন্দিজ ও হিমালয় পর্বতকেও অতিক্রম করে যায়। পাখিরা সাধারণত একদিনে ৫ - ৬ ঘন্টা উড়বার পর খাদ্য ও পানীয়ের জন্য বিশ্রাম নেয়, কিন্তু গোল্ডেন পোভার পাখির বিরতিহীনভাবে উড়ে ১৪০০ মাইল দূরবর্তী দক্ষিণ আমেরিকায় পৌছার প্রমাণ আছে। পরিযানের সময় পাখিরা সুশৃঙ্খল রীতি মেনে চলে। প্রথমে বয়স্ক পাখিরা পরিযায়ী হতে শুরু করে, পরে স্ত্রী ও তরুণরা অনুসরণ করে। ফিরতি অভিযানে তরুণরাই নেতৃত্ব দেয় বলে জানা গেছে। পরিযানের নিয়ম ও সময় সবসময় ঠিক থাকে। অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় কিছুটা ব্যতিক্রম না ঘটলে কিছু প্রজাতির পরিযান-সময় ও শীতভূমি পরিত্যাগ-সময় বছরের পর বছর প্রায় একই থাকে, দুএকদিন এদিক-ওদিক হতে পারে। তা ছাড়া, পাখিরা সবসময় একই পথ ধরে পরিযায়ী হয় এবং ঠিক আগের জায়গায় গিয়ে পৌছে।

পরিযানের গমনপথ : পরিযায়ী পাখিরা নিজস্ব গমনপথ ধরে এগিয়ে চলে। এ পথ অনেক সময় একই থাকে। পাখির বিভিন্ন গমন পথের মধ্যে রয়েছে সমুদ্র, উপকূলীয় নদী ও নদী-বিধৌত ভূখন্ড ও পার্বত্য পথ। সমুদ্র পথ সাধারণত সামুদ্রিক পাখিরা ব্যবহার করে। কিছু স্থলচর পাখি সমুদ্র পথে ৪০০ মাইল পর্যন্ত অতিক্রম করে যায়, কিন্তু মধ্যবর্তী কোন স্থানে দ্বীপ থাকলে তারা আরও বেশি পথ অতিক্রম করতে পারে। বিশেষ করে জলচর পাখিরা উপকূলীয় পথ ধরে পরিযায়ী হয়। সমতল থেকে পাহাড়ে এবং পাহাড় থেকে সমতলে গমনাগমনের সময় পরিযায়ী পাখি নদী ও নদীবিধৌত ভূখন্ডকে গমনপথ হিসেবে বেছে নেয়। এশিয়ার বড় নদীগুলো পরিযানের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। খুব কম পাখিই পর্বত অতিক্রম করে। পর্বতগুলো পরিযায়ী পাখিদের নির্দেশক চিহ্ন হিসেবে কাজ করে, তবে কিছু জলচর পাখিতে হিমালয় পর্বত অতিক্রম করতেও দেখা যায়। ঐ পাখিদের জন্য এটি একটি গমন পথ।

পরিযানের গুরুত্ব

উপকারী ভূমিকা : মাইগ্রেশনের ফলে পাখি আবহাওয়ার প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা পায়; বিচিত্র ও পর্যাপ্ত আহার পায় এবং পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা হ্রাস পায়; গ্রীষ্মে স্বদেশ ভূমিতে এসে উপযোগী ও নিষ্কন্টক জনন ক্ষেত্র ফিরে পায়, কম কষ্টে পর্যাপ্ত আহার পায়, তখন পাখি সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। বিভিন্ন প্রজাতির মিলনে জিন সংযুক্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

অপকারী ভূমিকা : মাইগ্রেশন পাখির জন্য বেশ বিরূপ প্রভাব ফেলে, যেমন– অনেক সময় বিরতিহীন ভ্রমণে ক্লান্ত অসংখ্য পাখি সমুদ্রে পড়ে মারা যায়; আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তনে, যেমন- প্রবল বর্ষণ, তুষারপাত ও ঝড়ে পড়ে বিপুল সংখ্যক পরিযায়ী পাখি মৃত্যুবরণ করে; তরুণ পাখিরা দূর পরবাসে অনেক প্রাকৃতিক শত্রুর মুখোমুখি হয়; বৈদ্যুতিক তার ও লাইট হাউজ ছাড়াও অগণিত পাখি মানুষের শিকারে পরিণত হয়; এবং মানুষের শিকারে পরিণত হয়ে অকালে প্রাণ হারায়।

বাংলাদেশের পরিযায়ী পাখি

বাংলাদেশ প্রধানত শীতকালে পরিযায়ী পাখির আগমনে মুখরিত থাকে। সারা বছরই পরিযায়ী পাখির আনাগোনা অব্যাহত থাকে। এসব পাখি দেশের পাখি হতে পারে, আবার বিদেশিও হতে পারে। সময়কাল ভেদে এগুলো **গ্রীষ্মকালীন** ও **শীতকালীন** পাখি নামে পরিচিত। কিছু পাখি আছে যা অন্যদেশে যাওয়ার আগে দুএকদিন বাংলাদেশে অবস্থান করার পর নির্দিষ্ট দেশে উড়াল দেয়। এসব পাখি **ট্রানসিয়েন্ট পরিযায়ী**।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বাংলাদেশে যে সব বিদেশি পাখি পরিযায়ী হয় তার বেশির ভাগ আসে হিমালয় ও তার বাইরে থেকে। অনেক প্রজাতির আগমন ঘটে ইউরোপ ও দূরপ্রাচ্য (যেমন সাইবেরিয়া) থেকে। অর্থাৎ ইউরেশিয়া থেকে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ায় শীতে পাখি পরিযায়ী হয়। শরৎ ও বসন্তকালেও কিছু পাখির যাতায়াত চোখে পড়ে। আর দেশি পাখির পরিযান সারা বছরই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হতে থাকে। বাংলাদেশের প্রায় ৫০০ প্রজাতির স্থায়ী পাখি রয়েছে, অস্থায়ী বা বিদেশি পাখি প্রজাতির সংখ্যা প্রায় ৩০০। অনেক বিদেশি পরিযায়ী পাখি রয়েছে যা স্বদেশে বিপন্ন বা অতিবিপন্ন হয়ে আছে এমন পাখিও বাংলাদেশে এসে কিছু দিনের জন্যে হলেও স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে যায় (যেমন-Spoon-billed Sandpiper)। বাংলাদেশে হাঁস, রাজহাঁসসহ বিভিন্ন প্রজাতির জলচর পাখিসহ অসংখ্য শিকারি পাখিও (চিল, বাজ) পরিযায়ী হয়। এসব পাখি দেশের বড় বড় হাওড়, নদী ও উপকূল জুড়ে বিস্তৃত থাকে। লক্ষ লক্ষ সদস্যের দৃশ্যমান পরিযায়ী পাখির পাশাপাশি অদৃশ্য পতঙ্গভুক্ত পাখিরা বন-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। অক্টোবর-মার্চ মাস পর্যন্ত মাইগ্রেটরি পাখি দেখার ধুম পড়ে যায়। সমস্ত হাওর এলাকা পরিযায়ী পাখির জন্য সংরক্ষিত ঘোষণা করা হয়েছে, আইনে বিশেষ বিধান করে এগুলো সুরক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপসংহার : পাখি প্রকৃতির এক অপূর্ব সৃষ্টি। এদের পরিযান হচ্ছে একদিকে প্রাণিজগতের অন্যতম সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ, অন্যদিকে, অন্যতম রহস্যময় ঘটনা। শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ তা অবলোকন করেছে, নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছে। একবিংশ শতাব্দীতেও এর রহস্য উন্মোচন করা সম্ভব হয়নি। কিসের আশায় ও কিসের নেশায় পাখি পরিযায়ী হয়, প্রাকৃতিক নির্বাচনের সেই নিগূঢ় রহস্য উন্মোচন করতে পারলে হয়তো মানব প্রজাতিও তা কাজে লাগাতে পারবে।

মাকড়শার জাল (Spider Web)

মাকড়শার বৃত্তাকার জালক হচ্ছে অতি জটিল ও অপরিবর্তনীয় আচরণগত প্যাটার্ণের ফলশ্রুতি। মাকড়শার অস্তিত্ব রক্ষায় এ জাল মূল ভূমিকা পালন করে। জালটি উড়ন্ত শিকার ধরার ফাঁদ হিসেবে কাজ করে, জালের সুতার উপর দিয়ে দ্রুত গতিতে মাকড়শা নিজে দৌড়াতে পারে।

মাকড়শা বৃত্তের জাল বোনে রেশমি সুতা দিয়ে। উদরীয় বিশেষ সিল্ক গ্রন্থি (silk glands) থেকে ক্ষরিত পদার্থকে শতশত অণুনালিকাযুক্ত তিনজোড়া বুননকারী (spinnerets)-র মাধ্যমে সুতা নির্মাণ করা হয়। সিল্ক গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত স্ক্লেরোপ্রোটিন (scleroprotein) থেকে সৃষ্ট সুতা বাতাসের সংস্পর্শে এসে শক্ত রেশমি সুতায় পরিণত হয়। একই ব্যাসের ইস্পাতের সুতা অপেক্ষা মাকড়শার সুতা বেশি শক্তিশালী। টান দিয়ে ছিঁড়তে গেলে ছেঁড়ার আগে এ সুতা এক-পঞ্চমাংশ পর্যন্ত লম্বা হতে পারে।

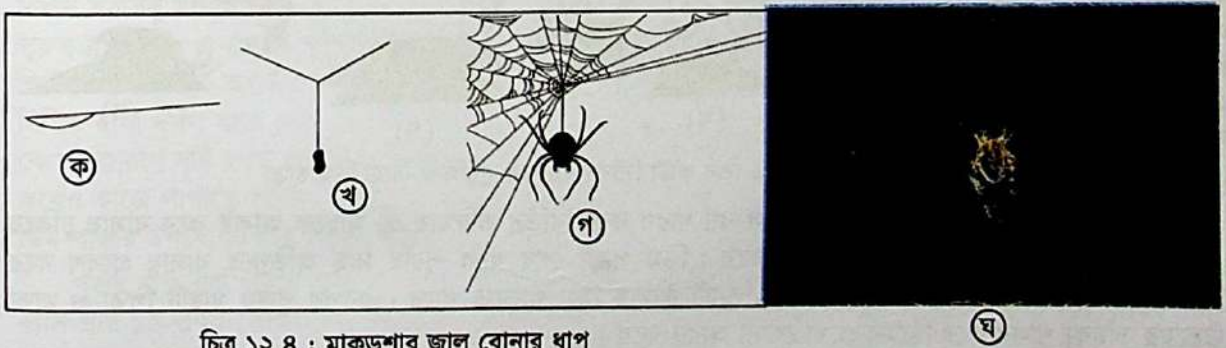

চিত্র ১২.৪ : মাকড়শার জাল বোনার ধাপ

সারা পৃথিবীতেই মাকড়শা জাল বোনে, সময় লাগে আধ ঘন্টারও কম। মাঠে যেসব মাকড়শা বাস করে তাদের অধিকাংশই খুব ভোরে সুর্যোদয়ের সময় জাল বোনে। জালিকা বৃত্ত একটি নিয়ত গঠন– এতে রয়েছে কাঠামো frame), **অরীয় স্পোক** (radial spokes) এবং **আঠাল প্যাঁচ** (viscid spirals)। **হ্যান্স পিটার্স** (Hans Peters, 1939) সর্বপ্রথম মাকড়শার জাল বোনার ধাপ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

মাকড়শার জাল বোনার শুরুতে একটি Y-আকৃতির ভারা (রাজ মজুরদের ভারা) নির্মাণ করে, এরপর কাঠামো ও অরীয় স্পোক, এবং সবশেষে অন-আঠাল ও আঠাল প্যাঁচ সৃষ্টি করে। প্রত্যেক ধাপে সৃষ্ট জালকগুলো সঠিক কোণ ও দূরত্ব অনুসরণ করে নির্মিত হয়। এভাবে নিখুঁত কৌণিক বৃত্তাকার জাল নির্মাণ মাকড়শার সহজাত আচরণের অন্যতম উদাহরণ।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

অপত্যের প্রতি যত্ন– মাছ, ব্যাঙ, পাখি (Parental Care—Fish, Toad, Bird)

ডিমপাড়া বা সন্তান ধারণ করা থেকে শুরু করে এদের লালন পালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ মাতা বা পিতা কিংবা উভয়ের সহজাত আচরণ। শিশুর জন্মলাভ ও তাদের স্বনির্ভর হওয়া পর্যন্ত পিতামাতা কর্তৃক পরিচর্যা নেয়াকে **অপত্যের প্রতি যত্ন**-নেয়া বা Parental care বলে। মাছ, উভচর, পাখি, স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এরূপ আচরণ লক্ষ করা যায়।

মাছের অপত্য যত্ন

প্রাণী আচরণ গবেষণায় **তিন-কাঁটা স্টিকলব্যাক** (Three-spined stickleback, *Gastrosteus aculeatus*) মাছের গুরুত্ব অনেক। এ মাছের বিস্তৃতি দক্ষিণে কৃষ্ণ সাগর (Black sea), দক্ষিণ ইতালি, আইবেরিয়ান পেনিনস্যুলা, উত্তর আফ্রিকা, পূর্ব এশিয়ায় জাপানের উত্তর অংশে, উত্তর আমেরিকা এবং গ্রীনল্যান্ডে। আচরণবিদ্যার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ মাছের আচরণের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়েছে। প্রখ্যাত আচরণবিজ্ঞানী **টিনবারগেন** (Tinbergen) তিন-কাঁটা স্টিকলব্যাকের উপর গবেষণা করেছেন। তাঁর গবেষণার ভিত্তিতে এ মাছের অপত্যের প্রতি যত্নের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

এক থেকে তিন বছর বয়সে তিন-কাঁটা স্টিকলব্যাক পরিণত (mature) হয়। জননকাল ছাড়া অন্য সময়ে ঝাঁকবদ্ধ হয়ে বাস করে। বসন্তকালে অর্থাৎ জননকালে পরিণত স্টিকলব্যাকেরা দলহীন হয়ে উপকূলবর্তী অগভীর পানির জলাশয়ে নিজস্ব বিচরণ পরিসীমা নির্ধারণ করে সর্তক পাহারায় নিযুক্ত থাকে। কারও অনুপ্রবেশে হানাহানি না করে বিভিন্ন শারীরিক কসরত ও বর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়ে ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দেয়। বিচরণ পরিসীমা প্রতিষ্ঠার পর সেখানে বাসা নির্মাণ শুরু করে। বাসা নির্মাণে শুধু পুরুষ সদস্যই কাজ করে। বাসা নির্মাণের জন্য নির্ধারিত জায়গার তলদেশ থেকে মুখভর্তি বালু তুলে প্রায় ১৫ সেন্টিমিটার দূরে নিক্ষেপ করে। এভাবে একটি অগভীর গর্তের সৃষ্টি হলে পুরুষ মাছ সূত্রাকার শৈবাল ও অন্য জলজ উদ্ভিদ, নুড়ি ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ জড়ো করে বৃক্ক থেকে ক্ষরিত এক ধরনের প্রোটিনজাত আঠালো পদার্থে আটকে দেয়। সকল তিন-কাঁটা স্টিকলব্যাকের বাসার নির্মাণশৈলী এক হয় না, স্বতন্ত্র রুচির বিষয় মাছের বেলায়ও প্রযোজ্য। কোন কাঠামো কোন স্ত্রী মাছের পছন্দ হবে তারও ব্যাপার আছে। যা হোক, বাসাটি দুমুখ খোলা, মধ্যভাগ ফাঁকা ও সামান্য চওড়া ধরনের।

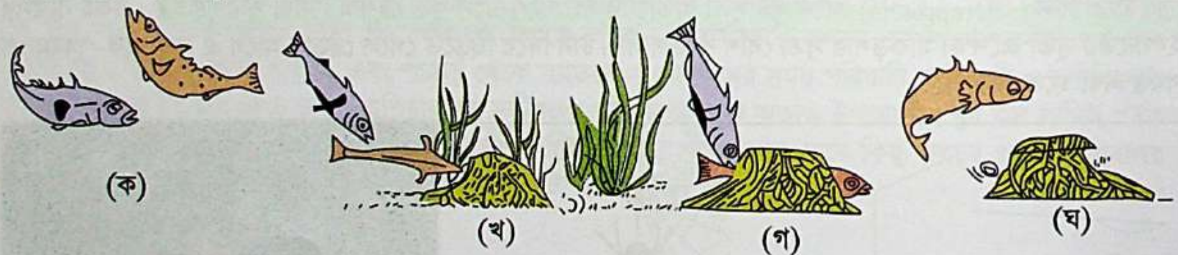

চিত্র ১২.৫ : তিন কাঁটা স্টিকলব্যাকের সুরক্ষিত নীড়ে ডিম ছাড়া

বাসা নির্মাণ শেষ হলে পুরুষ মাছ উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে বিভিন্ন ভঙ্গিমায় স্ত্রী মাছকে আকৃষ্ট করে বাসায় ঢুকিয়ে লেজটাকে ধাক্কা দিয়ে ডিম পাড়তে উদ্বুদ্ধ করে। ডিম পাড়া শেষ হলে পুরুষ মাছ অতিদ্রুত বাসায় প্রবেশ করে ডিমগুলোকে নিষিক্ত করে। একটি বাসায় দু-তিনটি স্ত্রীমাছ ডিম পাড়তে পারে। এরপর পুরুষ মাছটি পিতা ও মাতা উভয়ের ভূমিকা পালন করে ডিমের দেখা শোনা আরম্ভ করে।

নীড় ও নীড়ের ভেতর থাকা নিষিক্ত ডিমগুলো থেকে সুস্থ পোনা উৎপাদন, রক্ষা, যত্ন নেওয়া ও সবশেষে নিরাপদে পরিবেশে ফিরে যাওয়া অনুকূলে রাখতে পুরুষ মাছ সদাব্যস্ত থাকে। এ সময় বাসার কাছে নিজ প্রজাতির সদস্যসহ কোনো মাছ বা ক্ষতিকর প্রাণীর প্রবেশ রোধ করতে মাছ সদা তৎপর থাকে। ডিম ফোটার অনুকুল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য স্টিকলব্যাক এক অদ্ভুত আচরণ করে। বাসায় প্রবেশ পথের সামনে মাথা নিচু করে তীর্যকভাবে অবস্থান নিয়ে বক্ষপাখনা সামনের দিকে সঞ্চালিত করে। এভাবে অক্সিজেন চাহিদা নিশ্চিত করতে পানিস্রোত অব্যাহত রাখে। এ প্রক্রিয়ার নাম ফ্যানিং (fanning)।

সাত-আটদিনের মধ্যে ডিম ফুটে পোনা বেরিয়ে বাসা ত্যাগ করতে শুরু করলে ফ্যানিং বন্ধ করে দেয়। পোনাগুলো পাহারা দেওয়ার সময় স্টিকলব্যাক আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে। পোনার দল অটুট রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কোনো কারণে দলের কিছু পোনা দলছুট হলে পুরুষ মাছটি দ্রুত সেগুলোকে মুখে তুলে এনে মূলদলে ছেড়ে দেয়। দুসপ্তাহ পর পোনা

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

দলবদ্ধ চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এ পর্যায়ে অতিযত্ন ও সতর্কতার মধ্যে রেখে বড় করে তোলা ভবিষ্যৎ বংশধরগুলোকে ছেড়ে নিজের পূর্ণবয়স্ক ঝাঁকে ফিরে যায়।

ব্যাঙের অপত্য যত্ন

ভবিষ্যৎ বংশধরের পরিস্ফুটন যেন নির্বিঘ্ন হয় সে উদ্দেশে সর্তক-সযত্নে বাসা নির্মাণ করে ডিম পাড়া কিংবা সদ্য পরিস্ফুটিত বংশধর বেড়ে না উঠা পর্যন্ত পিতা-মাতার যে কোনো একজন বা উভয়কেই সঙ্গে থাকাকে **অপত্য যত্ন** বলে। অপত্য যত্ন অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি যা প্রায় সব প্রাণিগোষ্ঠীতেই কম-বেশি দেখা যায়। উভচরেও বিচিত্র অপত্য যত্নের পরিচয় পাওয়া যায়, বিশেষ করে গ্রীষ্মমন্ডলীয় উভচরে এমন যত্নের উদাহরণ বেশি। উভচরের অপত্য যত্নকে প্রধান দুটি শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করা হয়: (ক) বাসা, আঁতুরঘর বা আশ্রয় নির্মাণের মাধ্যমে যত্ন এবং (খ) ডিম বা লার্ভা পরিবহনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ যত্ন।

নিচে গ্লেডিয়েটর ব্যাঙ নামে পরিচিত দক্ষিণ আমেরিকার (*Hypsiboas rosenbergi*) গেছো ব্যাঙের অপত্য যত্নের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

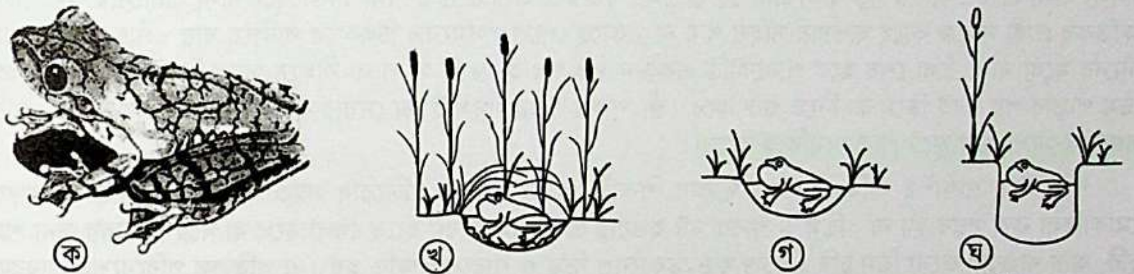

চিত্র ১২.৬ : *Hypsiboas rosenbergi* : (ক) একটি পুকুর ব্যাঙ; (খ) পুরুষ ব্যাঙের স্বহস্তে বাসা নির্মাণ; (গ) কর্দমাক্ত গর্ত নীড়ে পরিণত; (ঘ) গবাদি পশুর পায়ের চাপে কর্দমাক্ত গর্তকে নীড়ে পরিণত করা।

কাদা-মাটির নীড় (mud-nest) নির্মাণ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষার উদ্দেশে বসতির আশেপাশে পুকুর, ডোবা বা এ ধরনের স্থায়ী জলার পাড়ে বাসা বানিয়ে ডিম পাড়ে। জননকালে পুরুষ ব্যাঙ এমন এক জায়গা বেছে নেয় যাতে গর্তখোঁড়া সহজ হয়, নির্মাণ কাজ রাতারাতি সম্পন্ন হয়। বাসা নির্মাণ, সে বাসা স্ত্রী ব্যাঙের পছন্দ হওয়া এবং নিরাপত্তা বিধান সবকিছু মাথায় রেখে স্ত্রী ব্যাঙ ডিম পাড়ে। অতএব বাসা নির্মাণকে প্রাধান্য দিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাতে হয় পুরুষ ব্যাঙকে। এ ক্ষেত্রে পুরুষ ব্যাঙ তিন উপায়ে বাসা নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রথমত সে নিজেই বাসা বানায়; দ্বিতীয়ত পানি ভর্তি অগভীর গর্তকে সামান্য মেরামত করে বাসায় পরিণত করে; এবং তৃতীয়ত অন্য এক পুরুষ ব্যাঙের নির্মিত বাসা দখল করে নেয়। এখানে আলোচ্য গ্লেডিয়েটর পুরুষ ব্যাঙ সাধারণত বেলে বা কাদামাটিতে আগে থেকে কোনো কারণে সৃষ্টি হওয়া গর্তকে দ্রুত বাসা বানিয়ে ফেলে। আগের জনন ঋতুতে ব্যবহৃত বাসাকে ডিম পাড়ার উপযোগী করেও কাজে লাগাতে পারে। গবাদি পশু হেঁটে গেলে জলার কিনারে যে গর্ত হয় সেটাকেও একটু বড়সড় ও মসৃণ করে ডিম পাড়ার উপযোগী করে নিতে পারে।

পুরুষ ব্যাঙ গর্ত খুঁড়তে গিয়ে এমনভাবে মাটি সরায় যাতে মাটি স্তুপাকারে পড়ে গেলে উঁচু কিনারার রূপ নেয়। গর্তের ব্যাস প্রায় ১২-৩৭২ সেন্টিমিটার, আর ৫-৭ সেন্টিমিটার গভীর। তিরিশ মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টার মধ্যে বাসা নির্মাণ সমাপ্ত হয়। বাসা নির্মাণ সম্পন্ন হলে পুরুষ ব্যাঙের ডাকে স্ত্রী ব্যাঙ সাড়া দিলেও বাসা ঘুরে-ফিরে দেখে পছন্দ হলে তবেই ডিম ছাড়তে উদ্যত হয়। ডিম ফুটে লার্ভা নির্গত হলে ওদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়, নিরাপত্তা বজায় থাকে সবদিক বিবেচনা করে স্ত্রী ব্যাঙ সিদ্ধান্ত নেয়। ডিম ছাড়ার পর এলাকাভেদে পুরুষ ব্যাঙ তার বংশ রক্ষায় তৎপর থাকে। যেখানে বাসা তৈরির জায়গা কম কিন্তু পুরুষ ব্যাঙের সংখ্যা বেশি থাকে সে সব জায়গায় আগ্রাসী বা সন্ত্রাসী পুরুষ ব্যাঙ অন্য ব্যাঙের বাসা দখল করে স্ত্রী ব্যাঙকে ডিম ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করে। অবস্থা বুঝে পুরুষ ব্যাঙ শক্ত হাতে বাসা রক্ষা করে। লার্ভা তরুণ ব্যাঙে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত গর্তের পাশে থেকে পাহারা দেয়।

গ্লেডিয়েটর ব্যাঙে মার্চ-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জননকাল হিসেবে পরিচিত। স্ত্রী ব্যাঙ উপযুক্ত বাসায় ১০ মিনিটের মধ্যে প্রায় তিন হাজার ডিম ছাড়ে। দুই তিন দিনের মধ্যে ডিম ফুটে লার্ভা নির্গত হয়। চল্লিশ দিনের মধ্যে এদের রূপান্তর ঘটে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

পাখির অপত্য যত্ন

পাখিমাত্রই অপত্য যত্নে সমৃদ্ধ প্রাণী। সুস্পষ্ট ও সুশৃঙ্খল অপত্য যত্নে পাখি একটি বৈশিষ্ট্যমন্ডিত প্রাণিগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃত। কোনো প্রাণীর জনন সাফল্য নির্ভর করে সুস্থ-সবল সন্তানকে প্রকৃতির বুকে স্বাবলম্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। অন্যদিকে, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনার অন্যতম প্রধান বিষয় হচ্ছে প্রত্যেকটি প্রাণী সম্বন্ধে তার বাস্তুগত ও প্রজননিক যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা রাখা। এখানে ছোট পানকৌড়ি সংক্ষেপে পানকৌড়ি (Little cormorant, *Phalacrocorax niger*) পাখির অপত্য যত্নের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

বাংলাদেশে পানকৌড়ির জননকাল মে-অক্টোবর। তবে জুলাই-আগস্ট মাসে নীড় বাঁধার হার সবচেয়ে বেশি হয়। জননকালে এদের গায়ের ও মুখমন্ডলের পালকের রংয়ে পার্থক্য দেখা দেয়। পানকৌড়িরা যেখানে বাসা বাঁধে সেখানে ছোট বক (Egretta garzetta) ও কানি বক (Ardeola grayii)-ও বাসা বাঁধে। প্রধানত আম ও বট গাছ, সঙ্গে কড়ই, শেওড়া গাছেও বাসা বাঁধে। পানির ধারে ও সহজে মানুষের হাতের নাগালে পাওয়া যায় না এমন উচ্চতায় (৬–১০ মিটার) বিভিন্ন গাছের খড়কুটা দিয়ে অর্থাৎ বাসা বাঁধার জায়গার আশেপাশে যে সব খড়কুটা পাওয়া যায় তা দিয়ে জোড়ের উভয় সদস্য বাসা বাঁধে। বাসার গড় ব্যাস প্রায় ১৫ সে.মি., গভীরতা প্রায় ৫.৫ সে.মি.। দলবেঁধে বাসা বানানোয় অন্য কোনো ক্ষতিকর প্রাণী সহজে কাছে যাওয়ার সাহস পায় না। কাছে গেলেও সমবেত চিৎকারে পালিয়ে যায়। পাঁচ থেকে এগারো দিনের মধ্যে বাসা বাঁধা শেষ হলে পানকৌড়ি একদিন পর পর ২–৬ টি সাদা বা নীলচে-সাদা ডিম পাড়ে। তবে প্রথম ডিম পাড়ার পর পরই ডিমে তা দিতে শুরু করে। স্ত্রী-পুরুষ উভয় সদস্যই অ দেয়ার কাজ ভাগাভাগি করে নেয়। দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটে শাবক বেরিয়ে আসে।

পানকৌড়ি শান্তশিষ্ট পাখি। দলবদ্ধ থাকায় শিকারী পাখির হামলা প্রতিরোধ সহজ হয়। কিন্তু দুরন্ত কিশোরদের মোকাবিলা করা সম্ভব হয় না। ডিম ও শাবক নষ্ট হওয়ার প্রধানতম কারণ হচ্ছে খেলাচ্ছলে বা ঘরে পোষার জন্য শাবক চুরি, আর খাওয়ার জন্যে ডিম চুরি। প্রচন্ড ঝড়-তুফানেও ডিম ও শাবকের ক্ষতি হয়। এ প্রতিকূল পরিবেশেও শাবকদের যত্ন নেওয়ার কাজে স্ত্রী-পুরুষ উভয় পাখি যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকে। শুধু তাই নয়, শাবকের শরীর প্রথম সাত দিন একেবারে নগ্ন থাকে। শরীরের সংবেদনশীল ত্বক যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য বাসা নির্মাণের মাল-মসলার মধ্যে সরু আঁশ, শুকনো পাতা ইত্যাদি থাকে, সে সঙ্গে চলে বিরামহীন শাবকগুলোকে আগলে রাখার চেষ্টা করা। রাতে সারাক্ষণ স্ত্রী পাখি বাসায় বসে থাকে, পুরুষ পাখি বাসার কাছাকাছি ডালে বসে পাহারায় থাকে। ১৫–২০ দিন পর্যন্ত পানকৌড়ি শাবকদের আগলে রাখে। এক মাসের মধ্যেই পানকৌড়ির শাবক নীড় ছেড়ে স্বাধীন জীবন যাপনে সক্ষম হয়ে উঠে।

শিখন (Learning)

যে প্রক্রিয়া এককে সদস্যের আচরণে অভিজ্ঞতার আলোকে অভিযোজনিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সে প্রক্রিয়া শিখন নামে অভিহিত। মূলত পারিপার্শ্বিক কারণে অনুশীলন প্রক্রিয়ায় প্রাণীর আচরণে পরিবর্তন ঘটে।

নিচে শিখন আচরণ থেকে সিলেবাসভুক্ত **অভ্যাসগত** ও **অনুকরণজনিত** শিখন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

অভ্যাসগত (Habituation)

অভ্যাসগত আচরণ হচ্ছে সরলতম ধরনের শিক্ষণ। এ ধরনের আচরণে কোনো পুরস্কার বা তিরস্কারের (শাস্তির) সঙ্গে সম্পর্কিত নয় এমন একটি উদ্দীপনার ঘন ঘন পুনরাবৃত্তির ফলে আচরণগত সাড়াদানে ক্রমশ ভাটা পড়ে যায়, এক সময় প্রাণী ওই উদ্দীপনায় আর কোনো সাড়াই দেয় না। এ আচরণের মাধ্যমে প্রাণী নতুন পরিবেশে ক্রমান্বয়ে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে অভিযোজিত হয়। অভ্যাসগত আচরণে প্রাণী শুধু নতুন উদ্দীপনায় অভ্যস্তই হয় না, বরং কম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দীপনা বর্জনেও উদ্যোগী হয়।

যেমন– একটি পোষা কুকুরের উপস্থিতিতে শব্দ করলে কুকুরটি মাথা উঁচু করে সাড়া দেয়। যদি ঘন ঘন শব্দ সৃষ্টি করা হয় তখন আর তেমন সাড়া পাওয়া যায় না। এ পরিবর্তন অবসাদগ্রস্ততার কারণে কিংবা সংবেদগ্রাহকগুলোর অভিযোজনের ফলে ঘটে না, বরং অভ্যাসজনিত কারণে ঘটে থাকে। এ সাড়াদান দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে, এমনকি সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হলে প্রাণীটি ওই উদ্দীপনায় আর কখনওই সাড়া দেবে না। তা কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পর প্রয়োগ করলেও কাজ হবে না। প্রাণিজগতের তথা জীবজগতের সব গোষ্ঠীতেই, অভ্যাসগত শিক্ষণ আচরণ দেখা যায়। শস্যক্ষেতে আপদ পাখি তাড়ানোর জন্য বাংলাদেশের সবখানে মাটির হাড়িতে রং মেখে যে ভয়াল চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয় তা দেখে আপদ পাখি কিছুদিন ভয়ে থাকে। পরে চলৎশক্তিহীন গড়নটিকে আর আমলে নেয় না, বরং ফিঙ্গে পাখির বসার জায়গা হয়

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

(পোকা-মাকড় খাওয়ার জন্যে উড়তে সুবিধা হয়)। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এমন ঘটনা ঘটে। রেলস্টেশনের পাশে অবস্থিত বাসা বাড়ীতে ট্রেনের শব্দে রাত যাপনের কথা অনেকে চিন্তাই করতে পারবে না, কিন্তু কিছুদিন বাস করলে ট্রেনের শব্দ বা হুইসেল কোনোটাই আর ঘুমের ব্যাঘাতের কারণ হবে না। এটাই অভ্যাসগত আচরণ। মাথার উপরে বিরক্তিকর শোঁ শোঁ শব্দে ঘুরতে থাকা ফ্যানের শব্দে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা বা আলোচনা সভা কোনটিতেই এর প্রভাব পড়ে না। এ আচরণের সমস্ত আদর্শ, বৈশিষ্ট্য ও পুনরুদ্ধার (recovery) একটি নিউরন ও নিউরোমাসকুলার সংযোগেও প্রদর্শিত হতে পারে।

অনুকরণ

অনুকরণ অন্যতম শিক্ষণ আচরণ। এটি হচ্ছে প্রাণীর পরিস্ফুটনকালে তরুণ প্রাণীতে অত্যন্ত সংবেদনশীল ধাপে (critical period) একটি নির্দিষ্ট উদ্দীপনার প্রতি সৃষ্ট স্থায়ী আচরণ। ডিম ফুটে সদ্যজাত হাঁসশাবক নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে হাটতে সক্ষম হলেই নীড় ছেড়ে কেবল মাকে অনুকরণ করে দূরে চলে যায়, অন্য কাউকে অনুসরণ করে না। কিন্তু ডিম যদি ইনক্যুবেটারে ফুটানো হয় কিংবা ডিমফুটে হাঁসশাবক বের হওয়ার পরপরই মা-হাঁসকে সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে শাবকগুলো চোখ মেলে প্রথম যে বড় সচল বস্তু দেখবে তাকেই অনুসরণ করবে। তরুণ বয়সেও ওই সচল বস্তুকে অনুসরণ করে চলবে। তখন আসল মাকে ফিরিয়ে দিলেও 'নকল' মা-ই ওদের কাছে আসল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ নকল মা-ই হাঁস শাবকদের কাছে আসল মা হিসেবে স্থায়ীভাবে 'মুদ্রিত' হয়ে যাবে। এভাবে পরিস্ফুটনের মুহূর্তে কোনো সচল বস্তু, ব্যক্তি কিংবা গন্ধ-ও উদ্দীপনা হিসেবে কাজ করতে পারে। পরিস্ফুটনকালে সংবেদনশীল মুহূর্ত প্রজাতিভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। এ সময়কাল জন্মের কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিন বা মাস এমনকি কয়েক বছরও হতে পারে। তবে জন্মের পর পাখি বা স্তন্যপায়ীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালনের উদ্যোগ নিলে পোষ মানানো সহজ হয়। সার্কাসে পশু নিয়ে খেলা দেখানোর প্রাণিগুলোকে একারণে খুব কম বয়সে আসল মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়।

শুধু সচল বড় বস্তুই নয়, আগেই বলা হয়েছে যে, গায়ের গন্ধও শাবকরা অনুসরণ করে। **চিকা** (shrew) নামে পরিচিত গন্ধ মুষিকের শাবকেরা মায়ের গায়ের গন্ধে উদ্দীপ্ত হয়। বাচ্চাসহ কোথাও যেতে চাইলে মায়ের গা থেকে ক্ষরিত গন্ধে শাবকরা একজন আরেকজনের শরীর কামড়ে ধরে রেলের বগির মতো পরস্পরের পেছনে থেকে অগ্রসর হয়, মায়ের অবস্থান থাকে একেবারে সামনে। গবেষণায় দেখা গেছে, জন্মের পর ৫ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে মুষিকশাবকেরা গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ৫-৬ দিন বয়সি শাবকদের যদি অন্য প্রজাতির মা-মুষিককে বিকল্প হিসেবে দেওয়া হয় তাহলে 'বিকল্প' বা 'নকল' মাকেই আসল মনে করে দিন কাটায়। দিন ১৫ পর যদি শাবকগুলোর কাছে আসল মাকে ফেরত দেওয়া হয় তাহলেও আর গৃহীত হয় না। কিন্তু বিকল্প মায়ের গায়ের গন্ধে মাখানো কাপড়ের টুকরাকেও তারা অনুসরণ করতে রাজী থাকে।

Pavlov এর তত্ত্ব

ইভান পিত্রোভিচ প্যাভলভ (Ivan Petrovich Pavlov, 1849 – 1936) ছিলেন একাধারে একজন বিখ্যাত রুশ শারীরবিজ্ঞানী (Physiologist) ও মনোবিজ্ঞানী (Phychologist)। সাপেক্ষ প্রতিবর্ত (conditioned reflex) সম্বন্ধে তিনি যুগান্তকারী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কুকুরের দেহে কিভাবে এসব প্রতিবর্ত সৃষ্টি হয় ও কাজ করে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন। ১৯০৪ সালে তিনি শারীরবিজ্ঞান বা চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

কুকুরের লালার প্রতিবর্তী ক্রিয়া (Reflex Action of Dog's Saliva)

বিজ্ঞানী প্যাভলভ প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে দুভাগে ভাগ করেছেন : (১) অনপেক্ষ (unconditioned) এবং (২) সাপেক্ষ (conditioned) প্রতিবর্ত ক্রিয়া। অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজাত বা জন্মগত এবং কোনো শর্তের অধীন নয়। অন্যদিকে, সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া সহজাত নয়, বারংবার অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জিত হয়, এবং শর্তের অধীন। কুকুরের লালা ক্ষরণের সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়ার চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিজ্ঞানী প্যাভলভ।

বিজ্ঞানী প্যাভলভ কুকুরের দেহে পরিপাকের শারীরবৃত্ত নিয়ে গবেষণা করেন। কুকুরদের খাওয়া পরিবেশনের দায়িত্বে ছিলেন গবেষণাগারের নির্দিষ্ট টেকনিশিয়ান। প্যাভলভ লক্ষ করলেন শুধু খাবার দেখলেই কুকুরের লালাক্ষরণ হতো না, যে টেকনিশিয়ান খাবার পরিবেশন করতেন তাঁর গায়ের সাদা গবেষণা কোট (lab-coat) দেখলেই লালাক্ষরণ শুরু হয়ে যেত। এ পর্যবেক্ষণ থেকে প্যাভলভ ধারণা করেন যে খাবার দেওয়ার সময় সুনির্দিষ্ট উদ্দীপনা যদি কুকুরের চারপাশে থাকে তাহলে সেই উদ্দীপনা খাবারের সঙ্গে মিশে গিয়ে কুকুরের লালাক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে। এ উদ্দীপনাকে তিনি মানসিক উদ্দীপনা (psychic stimulation) নামকরণ করেছেন। প্রাথমিক এ ধারণার ভিত্তিতে প্যাভলভ প্রকৃত গবেষণায় নিয়োজিত হন।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

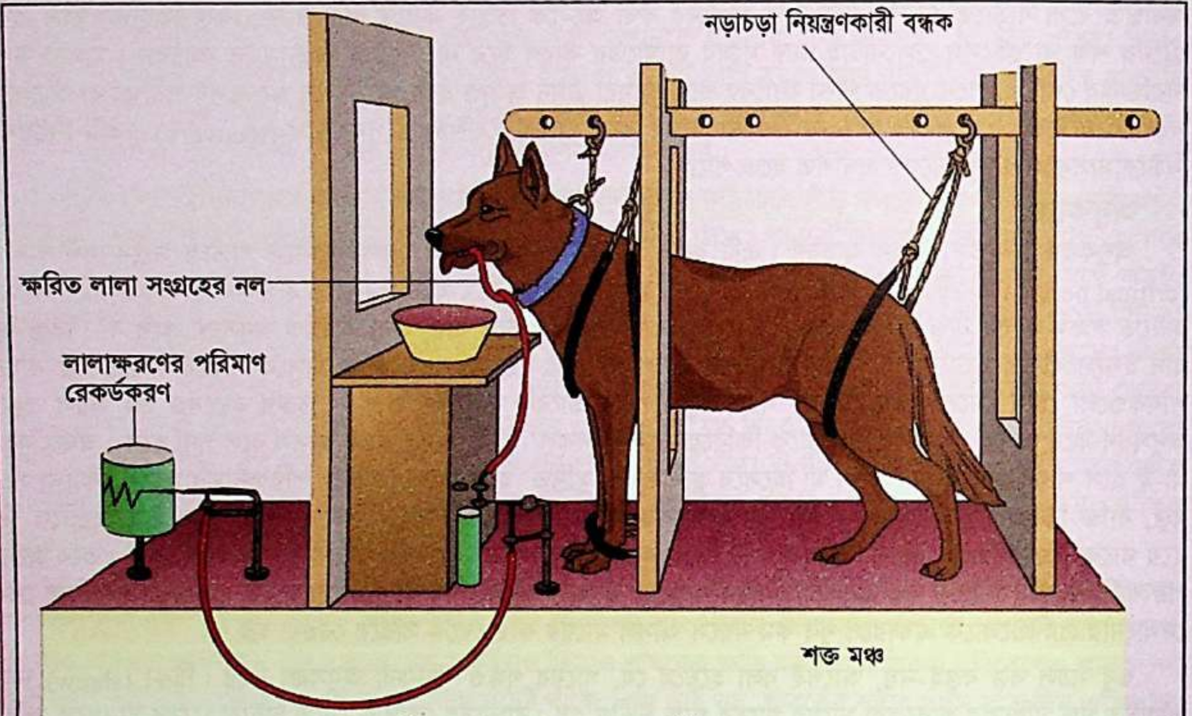

চিত্র ১২.৭ : প্যাভলভ-এর পরীক্ষা

চিত্র ১২.৮.: চিরায়ত সাপেক্ষণ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বিজ্ঞানী প্যাভলভ গবেষণার খাতিরে একটি ক্ষুধার্ত কুকুরকে বিশেষভাবে নির্মিত শক্ত মঞ্চে দাঁড় করিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় বেল্ট লাগিয়ে দিলেন যেন কোনো অসুবিধা না হয়। বিশেষ প্রক্রিয়ায় লালা নালির সঙ্গে একটি নলের সংযোগ করে দেওয়া হলো। খাবার হিসেবে মাংসচূর্ণ দেওয়ার পর তিনি লালাক্ষরণের পরিমাণ রেকর্ড করে রাখেন। সঠিক পরিমাণ মাংসচূর্ণ মুখে গেলে নির্দিষ্ট পরিমাণ লালা ক্ষরণ হতে দেখা যায়। প্যাভলভ ক্ষুধার্ত কুকুরের মুখে মাংসচূর্ণ দেওয়ার ঠিক আগমূহূর্তে ঘন্টা বাজান। প্রথম দিকে বেশ কয়েকবার (১২বার) সমলয়ে ঘন্টাধ্বনি শোনানো ও মাংসচূর্ণ সরবরাহের পরও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। অন্ততঃ ১২ বার ঘন্টাধ্বনির পর উদ্দীপনার প্রতি সাড়া পাওয়া গেছে। তখন শুধু ঘন্টাধ্বনি শুনলেই কুকুরের লালাক্ষরণ শুরু হয়েছে। ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে এমন সামঞ্জস্য রচিত হলো যে মাংসচূর্ণ না দিয়ে প্যাভলভ যতবার ঘন্টা বাজিয়েছেন ততবারই কুকুরে লালাক্ষরণ হয়েছে। ক্ষরণের পরিমাণ শুধু মাংসচূর্ণ দিলে যতোখানি হয় ঠিক ততোখানি।

উপরোক্ত গবেষণার আলোকে **প্যাভলোভিয়ান কন্ডিশনিং** (Pavlovian conditioning) **বা চিরায়ত সাপেক্ষণ** (classical conditioning)-কে সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়।

১. এমন অনেক বিষয় আছে যা একটি কুকুরের জানার প্রয়োজন নেই– এ ধারণা থেকে প্যাভলভ তাঁর গবেষণা শুরু করেন। যেমন– যখন আহার দেখবে তখন লালাক্ষরণ করবে এমন বিষয় শেখার দরকার নেই। এ প্রতিবর্ত কুকুরে নিহিত আছে। এটি একটি **অনপেক্ষ সাড়া** (unconditioned response, অর্থাৎ উদ্দীপনা-সাড়াদান শেখার বিষয় নয়)।

২. প্যাভলভ আবিষ্কার করেন যে খাবারের সঙ্গে এমন কিছু (যেমন- গবেষণা টেকনিশিয়ান) জড়িত রয়েছে যা অনপেক্ষ সাড়াদানকে উসকে দেয়।

৩. গবেষণা টেকনিশিয়ানের গায়ে সাদা ল্যাব-কোট প্রথমে **নিরপেক্ষ উদ্দীপনা** (neutral stimulus) ছিল। কারণ এটি কোনো **সাড়া** (response) সৃষ্টি করেনি। কিন্তু ল্যাব-কোট গায়ে দেয়া মানুষটি (নিরপেক্ষ উদ্দীপনা) খাদ্যরূপী অনপেক্ষ উদ্দীপনার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে।

৪. প্যাভলভ তাঁর গবেষণায় একটি ঘন্টাকে নিরপেক্ষ উদ্দীপনা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি কুকুরকে খাবার দেওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে ঘন্টা বাজাতেন।

৫. দেখা গেল, অনেকবার পুনরাবৃত্তির পর কুকুরটি ঘন্টাধ্বনি ও খাদ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত এক নতুন আচরণে শিক্ষিত হয়েছে। যেহেতু সাড়াটি শিক্ষণজনিত (বা সাপেক্ষ) তাই একে **সাপেক্ষ সাড়া** (conditioned response) বলে। এভাবে নিরপেক্ষ উদ্দীপনা অনপেক্ষ উদ্দীপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে **সাপেক্ষ উদ্দীপনা** (conditioned stimulus)-য় পরিণত হয়েছে।

সামাজিক আচরণ (Social Behaviour)

সামাজিক প্রাণী বললেই প্রথমে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠে **মৌমাছিসহ** একটি মৌচাকের ছবি। কিন্তু এদের সামাজিক জীবনযাত্রার গভীর কর্মকান্ড দেখার সুযোগ ও সময় আমাদের হয়না। একটি মৌচাকে যে সদস্যরা থাকে তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে অবস্থান ও কাজে নিযুক্ত থাকে। চাকের প্রত্যেক সদস্য নিজের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে অন্য সদস্যদের কল্যাণে একমনে কাজ করে যায়। সমাজের সদস্যদের এমন মনোভাবকে **পারস্পরিক সহযোগিতা বা পরার্থিতা বা অ্যালট্রুইজম** (altruism) বলে।

পরার্থিতা মৌমাছির সামাজিক জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট। যেমন-বিশেষ ধরনের নাচের মাধ্যমে সতর্ক ও শান্ত হওয়া কিংবা ফুলের দিকে নির্দেশনা পেয়ে সমস্ত মৌমাছি পারস্পরিক যোগাযোগের বিষয়টি সম্পন্ন করে। রাণী মৌমাছির দেহনির্গত ফেরোমোনের প্রভাবে একটিমাত্র চাকে প্রায় এক লক্ষ মৌমাছির সুশৃংখল হয়ে বাস করে। চাকের বিভিন্ন বয়সের ও গঠনের সদস্য ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে। রাণীর কাজ ডিম পেড়ে সেগুলো থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুরুষ ও কর্মী মৌমাছি সৃষ্টি করা। রাণীর সঙ্গে যৌন মিলন পুরুষ মৌমাছির একমাত্র কাজ, খাদ্যের জন্য কর্মী মৌমাছির উপর নির্ভরশীল। কর্মী মৌমাছি হচ্ছে বন্ধ্যা স্ত্রী সদস্য। এদের কাজ লার্ভার দেখভাল করা, মৌচাকের গড়ন ঠিক রাখা, চাক পাহারা দেওয়া, ফুল থেকে মধু সংগ্রহ করা প্রভৃতি। এভাবে সামাজিক বন্ধন অটুট রাখতে সব ধরনের মৌমাছি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মৌমাছির সামাজিক সংগঠন (Social Structure of Honey Bee)

প্রত্যেকটি মৌচাকে মৌমাছিরা বসতিবদ্ধ হয়ে একটি বড় পরিবার বা সমাজ গড়ে বাস করে। আকার-আকৃতি ও কাজের ভিত্তিতে মৌমাছিরা তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত : ১. রাণী মৌমাছি যা একমাত্র উর্বর মৌমাছি; ২. ড্রোন বা পুরুষ মৌমাছি; এবং ৩. কর্মী মৌমাছি বা বন্ধ্যা মৌমাছি।

চিত্র ১২.৯ : বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মৌমাছি

একটি মৌবসতিতে ৩ সম্প্রদায়ের মৌমাছি মিলে-মিশে এক অনন্য সমাজ গড়ে তুলেছে। প্রতিটিতে একটি রাণী মৌমাছি, কয়েকশ পুরুষ মৌমাছি এবং ১০-৮০ হাজার কখনওবা লক্ষাধিক কর্মী মৌমাছি থাকে।

মৌমাছি সামাজিক প্রাণী। এককেটি বড় পরিবার গড়ে বা বসতবদ্ধ হয়ে মৌচাকে বাস করে। প্রত্যেকটি কলোনিতে মৌমাছির ৩টি সম্প্রদায়ভুক্ত সদস্যরা সম্মিলিতভাবে সামাজিক উন্নয়নে নিরলস কাজ করে চলে। একটি মাত্র রাণীর নেতৃত্ব কয়েকশ ড্রোন (বা পুরুষ মৌমাছি) এবং ঋতুভেদে ১০- ৮০ হাজার কর্মী মৌমাছি (বন্ধ্যা স্ত্রী মৌমাছি) যে সুশৃঙ্খল উপায়ে নীরবে নিভৃতে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে চলেছে তা লক্ষ বছর ধরে মানুষ জানবার চেষ্টা করেছে। তাদের এ মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা মৌমাছি গোষ্ঠীর সকল মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে প্রাণিজগতে অনন্য নজির স্থাপন করেছে। নিচে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপব্যবস্থাবলীর মাধ্যমে মৌমাছিরা দৃঢ় সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে বাস করে।

১. **শ্রম বন্টন :** কর্মীদের মধ্যে অস্থায়ী দায়িত্ব বন্টন মৌমাছি কলোনির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কর্মী মৌমাছির আচরণ সাধারণত বয়স, চাকের অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। কলোনিবাসীর জন্য নিবেদিত প্রাণ কর্মী মৌমাছিদের শৈশব বলতে কিছু নেই। ৩-৪ দিন বয়সেই তারা চাকের মধু-কুঠুরি পরিষ্কারের কাজে লেগে যায়। ১৮–২০ দিন বয়স হলে মধু আহরণে বের হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত তারা রক্ষী হিসেবে বাসা পাহারা দেয়। শেষ বয়সে কর্মী মৌমাছি পানি বহন করে, অবসর যাপন করে এবং বেশি দূরে যায় না। বিবর্তনের গতিপথে তারা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের অধিকারী হয়েছে, যথা– বহিঃপরিবেশগত অবস্থার হঠাৎ পরিবর্তন ঘটলে কলোনির স্বার্থে বয়স নির্বিশেষে সবাই এক কাজ ছেড়ে অন্য কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অনেক সময় বাইরে অবস্থানরত মৌমাছিরা ঝড়-বাদলে আটকা পড়ে কলোনিতে ফিরতে পারে না, কিংবা শস্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়ায় অনেকে মারা গেলে বয়স অনুযায়ী কাজের ধারা বিঘ্নিত হয়। তরুণ সদস্যরা সুধা আহরণের গতিকে কখনও ছিন্ন হতে দেয় না।

২. **খাদ্যের যোগান :** যে কোনো সমাজের প্রথম ও প্রধান মৌলিক চাহিদা খাদ্য। মৌ-নেতৃত্ব এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ আপোসহীন। দুর্যোগ মোকাবেলায় বিশেষ করে শীতকালে এবং প্রতিদিনকার খাদ্যের সংস্থান ও মজুত গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি কলোনির অগণিত কর্মী মৌমাছি সকাল-সন্ধ্যা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলে। মৌচাকের এক নির্দিষ্ট স্থানে নিজেদের জন্য এবং ভাবী বংশধরদের জন্য খাদ্য জমিয়ে রাখে।

চিত্র ১২.১০ : মৌমাছির নৃত্য

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৩. **ভাব বিনিময় :** সুশৃঙ্খলতাই একটি জাতির সমৃদ্ধি ও উন্নতির চাবিকাঠি। মৌমাছির কলোনি প্রাণিজগতের অন্যতম সুশৃঙ্খলতম ও আদর্শ গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃত। মৌমাছিরা তাদের ভাবাবেগ কিছুটা প্রকাশ করে গুঞ্জনের মধ্যে দিয়ে পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় করে গন্ধবস্তু ও বিশেষ নৃত্য-ভঙ্গিমায়। রাণী মৌমাছির ত্বক-নিঃসৃত হরমোনের গুণযুক্ত এসিড চাকের সবখানে বিসরিত হয়ে সকল মৌমাছির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। নির্দিষ্ট ধরনের গতিবিধি বা মৌ-নৃত্য কলোনির মৌমাছিদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের অন্যতম প্রধান উপায়। সন্ধানী কর্মী মৌমাছিরা বাইরে থেকে এসে বিশেষ বিশেষ নাচের মাধ্যমে সুধা ও পরাগের প্রকৃতি, দূরত্ব ও বিপুল উৎসের খবর মৌচাকে অন্য সদস্যদের জানিয়ে দেয়। সন্ধানীর দেহে লেগে থাকা সুধা ও পরাগ দেখে খাদ্যের ধরণ সম্বন্ধেও মৌমাছিরা অবহিত হয়।

৪. **পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষা :** বিবর্তনের গতিপথে মৌমাছিরা অনেক রোগ প্রতিরোধের উপায় করে নিয়েছে। কোনো ক্ষেত্রে প্রতিরোধের উপায় না থাকলে সামান্য মাত্রায় দমনের ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম। দেহের কাইটিনময় আবরণে আছে অ্যান্টিবায়োটিক গুণসম্পন্ন পদার্থ যা ক্ষতিকর অণুজীবের বৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধি দমন, এমনকি মেরেও ফেলতে পারে। মৌরুটি, মধু, এমনকি মৌচাকেও আছে অ্যান্টিবায়োটিক পদার্থ। মৌমাছিরা বাসা ও মৌচাকের প্রাচীর প্রোপেলিশ (বা মৌসিরিশ) নামে যে এক ধরনের জৈব রেজিনের প্রলেপ দিয়ে রাখে তাও ক্ষতিকারক অণুউদ্ভিদ-এর বৃদ্ধি প্রতিহত করে। রোগাক্রান্ত বা মৃত লার্ভাকে ঢাকের বাইরে ফেলে দিয়ে মৌমাছিরা সম্ভাব্য সংক্রমণ থেকে কলোনিকে রক্ষা করে। ঋতুভেদে চাকে তাপের তারতম্য ঘটে থাকে। মোমে গঠিত মৌচাক প্রায় তাপ অপরিবাহী হওয়ায় চাকে সব সময় তাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে যা জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরমে মৌমাছিরা মৌচাকের প্রবেশ মুখে সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধ হয়ে সবার মাথা একদিকে রেখে ডানা ঝাঁপিয়ে ভিতরে শীতল বাতাস সঞ্চালিত করে।

৫. **প্রতিরক্ষা :** মৌমাছি খুবই শান্তিপ্রিয়। অকারণে আক্রমণ করা তাদের স্বভাববিরুদ্ধ। তবু তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ-মধু অবৈধভাবে সংগ্রহের উদ্দেশে আণুবীক্ষণিক জীব থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত অনেকেই চাকে হানা দেয়। তাদের প্রতিহত করতে প্রকৃতি মৌমাছিকে হুল নামক মারাত্মক বিষাক্ত অস্ত্রে সজ্জিত করেছে। একটি হুলের দংশন যে কোনো পতঙ্গ বা ইঁদুরজাতীয় ক্ষুদ্রদেহী স্তন্যপায়ীর মৃত্যু ঘটাতে যথেষ্ট।

৬. **সোয়ার্মিং ও জিনগত উন্নতি সাধন :** কলোনি-বিভক্তির মাধ্যমে মৌমাছিদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। একটি মৌচাকে কর্মী মৌমাছির সংখ্যাধিক্য ঘটলে স্থানাভাবসহ আরও অনেক কিছুরই অভাব দেখা দেয়। তখন রাণী মৌমাছি কিছু কর্মী মৌমাছির চাপে নতুন আবাস গড়ার উদ্দেশে চাকের প্রায় অর্ধেক কর্মী মৌমাছিসহ ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়। এ প্রক্রিয়াকে সোয়ার্মিং বলে। পরিত্যক্ত চাকে নতুন রাণী পরিস্ফুটিত হয়। নতুন রাণী কয়েকটি পুরুষ অনুগামীসহ নাপসিয়াল উড্ডয়ন-এ পুরুষ (ড্রোন) মৌমাছির পর্যাপ্ত শুক্রাণু সংগ্রহ করে চাকে ফিরে আসে। সংগৃহীত শুক্রাণু দিয়ে রাণী আজীবন যত ডিম পাড়ে তার সবগুলোকেই নিষিক্ত করতে পারে। তাই রাণী জীবনে একবারই মাত্র সঙ্গমে লিপ্ত হয়। ডিম পাড়বার সময় রাণী ইচ্ছানুযায়ী ডিম নিষিক্ত করে। চাকের প্রয়োজনে নিষিক্ত বা অনিষিক্ত ডিম প্রসবিত হয়। অনিষিক্ত ডিম থেকে পুরুষ এবং নিষিক্ত ডিম থেকে কর্মী মৌমাছি বা ভাবী রাণী মৌমাছি সৃষ্টি হয়। এর ফলে একদিকে, কলোনিতে জনবিস্ফোরণ রোধ হয় ও খাদ্য আহরণ ক্ষেত্রের বিস্তার ঘটে, অন্যদিকে ভাবী বংশধরের জিনগত পটভূমিও উন্নত হয়। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ পদ্ধতিতে সম্ভবত মৌমাছিরা সংরক্ষণ ও সাফল্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে কাজ করেছে।

৭. **জনগণতান্ত্রিকতা :** একটি কলোনিতে রাণীই প্রধানতম ব্যক্তিত্ব। রাণীর উপরই নির্ভর করে একটি চাকের সম্পূর্ণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ও ক্ষমতা, জীবনের প্রতিটি ছন্দ ও কর্মশক্তি। সমগ্র মৌমাছি গোষ্ঠীকে রাণীই পরিচালিত করে। তাই রাণী মৌমাছিকে একটি জাতির সম্রাজ্ঞী, এমনকি দেবী হিসেবে অভিহিত করা হয়। তা সত্ত্বেও রাণীর অনেক কাজই কলোনির অন্যান্য সদস্যের সিদ্ধান্তে করতে হয়। যেমন- উপযুক্ত সময় এবং মৌমাছিদের সঠিক প্রস্তুতি ছাড়া রাণী একটি ডিমও পাড়ে না। জন্মগত বিরোধিতার কারণেই রাণী কখনও শূন্য রাণী কুঠুরিতে ডিম পাড়ে না, কিন্তু অন্যেরা তাকে সে কাজেই বাধ্য করে। সোয়ার্মিং এর সময়ও রাণী তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বাস্তুত্যাগে উৎসাহী মৌমাছিদের চাপে চাক ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। রাণী অন্যান্য মৌমাছিদের কাছ থেকে যেমনি শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করে, রাণীও তার বিনিময়ে খাদ্যের নিশ্চয়তা বিধান ও মৌমাছিদের সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে নেতৃত্বে বহাল থাকে। অপরদিকে ভবিষ্যৎ সোয়ার্মিং- এ অংশগ্রহণকারীদের চাপে শূন্য রাণী কুঠুরিতে ভাবী রাণী সৃষ্টির উদ্দেশে ডিম পেড়ে গণতন্ত্রের সুবাতাস বইতেও সাহায্য করে। এ কারণেই মৌমাছির কলোনি একদিকে চিত্তাকর্ষক, অনুসরণীয়, অন্যদিকে, স্বৈরাচারদের জন্য এক ঈর্ষণীয় সমাজবন্ধন।

কাজ : তোমার কাছাকাছি কোন স্থানে মৌচাকের সন্ধান পেলে সেখানে গিয়ে তা পর্যবেক্ষণ কর। এবং কি দেখলে তা লিপিবদ্ধ করে শিক্ষককে দেখাও।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৮. উত্তরাধিকার নির্বাচন : মৌচাকে রাণীর মৃত্যু হলে মৌমাছিদের মধ্যে আতংকের ভাব ফুটে উঠে। রাণী ছাড়া মৌমাছিরা বাঁচতে পারে না বলে তারা তিন দিন বয়সের এক বা একাধিক ডিম বেছে নিয়ে সুপ্রশস্ত খোপে রেখে দেয়। রাণী হিসেবে নির্বাচিত লার্ভাকে বিশেষভাবে প্রস্তুত **রাজসিক জেলি** খাওয়ানো হয় বলে সেটি রাণী মৌমাছিরূপে বেড়ে উঠে। এভাবে ষোল দিনের মধ্যে মৌমাছিরা নতুন রাণীকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলে।

৯. রাণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ : অনুচর কর্মী মৌমাছিরা রাণীর পরিচর্যা করে। রাণীর দেহ পরিস্কার করা, শরীর আঁচড়ান, মৌচাক থেকে মল অপসারণ ও পুষ্টিকর রাজসিক জেলি খাওয়ানো তাদের কাজ। রাণী মৌচাকের যাবতীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে আজীবন এক অটুট সমাজ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। তাই বলে রাণীর জুলুম-নির্যাতন ওরা মুখ বুজে সহ্য করে না, বরং আক্রমণাত্মক বিদ্রোহ ঘোষণা করে রাণী-মৌমাছিকে হয় তাড়িয়ে দেয় নয়তো মেরে ফেলে। এভাবে একেকটি চাকের মৌ-সমাজ টিকে থাকে।

১০. চুরি-ডাকাতি : একটি জাতি যখন অসতর্ক ও বিশৃঙ্খল থাকে, সে সুযোগে বহিঃশত্রু কীভাবে অনধিকার প্রবেশ ঘটিয়ে সর্বস্ব লুটে নেয় তাও মৌমাছি-কলোনির অবস্থা দেখে অনুমান করা যায়। যে কোনো তুচ্ছ ব্যাঘাতের কারণে কলোনি-জীবনের ঐকতান ছিন্ন হয়ে যায়, চাকে ও মাঠে কাজের ছন্দপতন ঘটে। তখন খোলা চাক থেকে মধুর কড়া গন্ধ ছড়াতে থাকে। মৌমাছিরা শত শত মিটার দূর থেকে এ গন্ধ পায়। খোলা চাকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মধুর গন্ধে বিমোহিত হয়ে অন্য চাকের মৌমাছিরা দ্রুত যাত্রাপথের পরিবর্তন ঘটিয়ে রক্ষীবিহীন, অরক্ষিত প্রবেশ পথের ভেতর দিয়ে চাকে প্রবেশ করে, এবং আকুণ্ঠ মধু পান করে লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ চাকে ফিরে যায়। ফেরার আগে অঞ্চলটি চিনে রাখার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে। এখানে একটি খোলা চাক আছে এমন সংকেতও দিয়ে যায় যাতে অন্যরা মধু লুট করতে পারে।

মৌমাছির সামাজিক জীবনযাত্রা এমনই চিত্তকর্ষক, তাদের আচরণ ও কাজের বৈচিত্র্য এমন বিস্ময়কর যা দেখলে মনে হবে মানুষের মতো মৌমাছিরও হয়তো আবেগ, আনন্দ, দুঃখ, ভালোবাসা আছে, আছে আত্মত্যাগের মনোভাব। মৌমাছির সামাজিক জীবন এভাবে মানুষকে লক্ষ বছর ধরে ভাবিত করে রেখেছে, এখনও অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

রাণী মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি ও কর্মী মৌমাছির মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	রাণী মৌমাছি	পুরুষ মৌমাছি	কর্মী মৌমাছি
১. আকার	আকারে বড়।	আকারে কিছুটা ছোট। তবে কর্মী মৌমাছির চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড়।	আকারে সবচেয়ে ছোট।
২. প্রজনন	প্রজননে সক্ষম।	প্রজননে সক্ষম।	প্রজননে অক্ষম।
৩. মধু ও পরাগ সংগ্রহ	মধু ও পরাগ সংগ্রহে অংশ নেয় না।	অংশ নেয় না।	অংশ নেয়।
৪. ফেরোমন	নিঃসৃত করে।	নিঃসৃত করে না।	নিঃসৃত করে না।
৫. আয়ুষ্কাল	প্রায় ২-৩ বছর।	প্রায় ৫০-৬০ দিন	প্রায় ৫০ দিন।
৬. প্রতি মৌচাকে সংখ্যা	একটি।	কয়েকটি।	১০-৮০ হাজার।

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

প্রেরণা : কোনো আচরণগত সাড়ার ব্যাপ্তি ও প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটার পিছনে বিভিন্ন উদ্দীপনার সম্মিলন কাজ করে। বিভিন্ন উদ্দীপনার এই সম্মিলনকে মোটিভেশন বা প্রেরণা বলে।

উদ্দীপনা : আচরণগত পরিবর্তনের সহায়ক সংকেতকে সাংকেতিক উদ্দীপনা বা উদ্দীপনা বলে।

ট্যাক্সিস : দিকমুখি উদ্দীপনা বা উদ্দীপনা মাত্রার তীব্রতার প্রতি একটি জীবের সহজাত আচরণগত সাড়া দেয়া হচ্ছে ট্যাক্সিস।

সহজাত আবেগ : জন্মগত যে শক্তির সাহায্যে একটি প্রজাতির সকল সদস্য কোনো শিক্ষণ ছাড়া এবং উদ্দেশ্য ও ফলাফল সম্বন্ধে অবহিত না থেকে আত্মরক্ষা ও প্রজাতি রক্ষায় বংশ পরম্পরায় একই ভাবে কাজ করে থাকে সেটি সহজাত আবেগ বা ইনসটিংক্ট।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মাইগ্রেশন : স্থায়ী বাসভূমি থেকে নতুন কোনো অনুকূল পরিবেশে যাত্রা এবং যেখানে সাময়িক বসবাসের পর পুনরায় স্থায়ী বসতিতে প্রত্যাগমনকে পরিযান বা মাইগ্রেশন বলে।

শিখন : যে প্রক্রিয়া এককে সদস্যের আচরণের অভিজ্ঞতার আলোকে অভিযোজনিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় সে প্রক্রিয়া শিখন নামে পরিচিত।

অভ্যাসগত-আচরণ : যে আচরণে প্রাণী শুধু নতুন উদ্দীপনায় অভ্যস্তই হয়না, বরং কম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দীপনা বর্জনেও উদ্যোগী হয় তাকে অভ্যাসগত আচরণ বলে।

অনুকরণ : শৈশবে প্রতিটি প্রাণীর মগজে যা কিছু মুদ্রিত (imprint) হয় পরবর্তীতে তার আলোকেই সে বিভিন্ন উদ্দীপনায় সাড়া প্রদান করে থাকে। একে অনুকরণ বলে।

সামাজিক আচরণ : কোনো একটি প্রাণী প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মাঝে নির্দিষ্ট সময়ে বা সারাজীবন ব্যাপী আত্মত্যাগ, সংহতি, সহনশীলতা, শৃঙ্খলাবদ্ধতার ভিত্তিতে বসবাসের জন্য যে আচরণ প্রকাশিত হয় তাকে সামাজিক আচরণ বলে।

অ্যাল্ট্রাইজম : সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে যে প্রক্রিয়ায় একই প্রজাতির কতক প্রাণী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বা ব্যক্তিগত প্রজননিক (reproductive) অসুবিধা ভোগ করে অপর সদস্যদের কল্যাণে নিজের সময় ও শক্তি উৎসর্গ করে তাকে অ্যাল্টুইজম বলে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শব্দ উৎসের প্রেক্ষিতে সম্পন্ন ওরিয়েন্টেশনকে কী বলা হয়?
ক) কেমোট্যাক্সিস খ) ফটোট্যাক্সিস
গ) ফোনোট্যাক্সিস ঘ) জিওট্যাক্সিস

২. মাকড়সার জালে কোন ধরনের প্রোটিন থাকে?
ক) গ্লাইকোপ্রোটিন খ) স্ক্লেরোপ্রোটিন
গ) ফসফোপ্রোটিন ঘ) সালফোপ্রোটিন

৩. প্রতিবর্ত চক্র কয়টি অংশে বিভক্ত?
ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

৪. ক্ষুধার্ত প্রাণী অন্যকে খাবার খেতে দেখলে তার লালা ক্ষরণ হয়, এটি– [য. বো. ১৫]
ক. সহজাত আচরণ খ. সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া
গ. অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া ঘ. শিক্ষণ আচরণ

৫. পাখির বাসা বানানোর আচরণের সাথে কোনটি জড়িত?
ক. অভ্যন্তরীণ উদ্দীপক খ. জিন
গ. শিখন ঘ. প্রতিবর্তী ক্রিয়া

৬. নিচের কোনটি শিক্ষণ আচরণ? [চ. বো. ১৭]
ক. বাবুই পাখির বাসা তৈরি খ. ময়ূরের নৃত্য পরিবেশন
গ. হাঁসের ছানার মাকে অনুসরণ ঘ. শীতের পাখির মাইগ্রেশন

৭. প্রাণীদের ক্ষেত্রে অ্যাল্ট্রুইজম হলো – [য. বো. ১৫]
ক. পরার্থপরতা খ. স্বার্থপরতা
গ. অস্বাভাবিকতা ঘ. অর্জিত গুণ

৮. প্রাণীর আচরণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাকে কী বলা হয়? [চ. বো. ১৫]
ক. Ethology খ. Taxonomy
গ. Ecology ঘ. Embryology

৯. জিগ-জ্যাগ নৃত্য প্রদর্শন করে কোন প্রাণী? [ঢা. বো. ১৭]
ক. ব্যাঙ খ. মৌমাছি
গ. স্টিকলব্যাক ঘ. টুনটুনি

১০. সহজাত আচরণের সাথে নিচের কোনটির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে?
ক. জিন খ. অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা
গ. বহিরাগত উদ্দীপনা ঘ. সামগ্রিক পরিবেশ

১১. প্রজনন ঋতুতে কোন জীবের স্বরথলি ফুলে যায়?
ক. পুরুষ কোলা ব্যাঙ খ. স্ত্রী কোলা ব্যাঙ
গ. পুরুষ সাপ ঘ. স্ত্রী সাপ

১২. ইথোলজির জনক কে? [রা. বো., দি. বো., কু. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো., ব. বো. ১৮]
ক. কোনরাড লরেঞ্জ খ. নিকো টিনবার্জেন
গ. আই. পি. প্যাভলভ ঘ. কার্ল ফন ফ্রিস

বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন

১৩. প্রাণীর সহজাত আচরণ কোনটি?
i) মাকড়সার জাল তৈরি
ii) টুনটুনি পাখীর বাসা নির্মাণ
iii) কুকুরের মুখে লালাক্ষরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৪. অর্জিত প্রতিবর্তী ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হলো–

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

লাল-সবুজে দাগানো

TEXT BOOK

প্রাণিবিজ্ঞান

উন্মেষ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৯ মানব জীবনের ধারাবাহিকতা
Continuation of Human Life

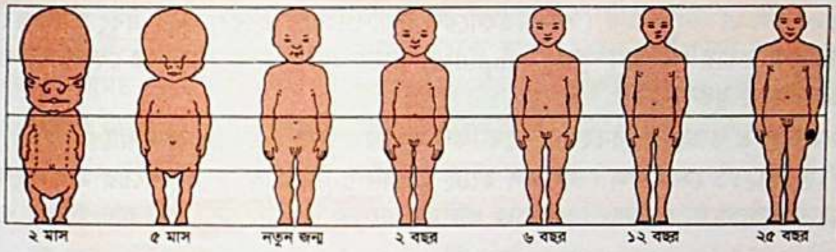

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- বয়ঃসন্ধিকাল
- ইমপ্ল্যান্টেশন
- নিষেক
- ভ্রূণীয় স্তর
- গ্যাস্ট্রুলেশন
- IVF
- গর্ভ নিরোধক
- সিফিলিস
- রজঃচক্র
- গনোরিয়া

প্রজনন প্রক্রিয়ায় জীব নিজ সত্তাবিশিষ্ট অপত্য বংশধর সৃষ্টি করে নিজ প্রজাতির স্থায়িত্ব বজায় রাখে। মানুষের বংশবৃদ্ধি যৌন জনন প্রক্রিয়ায় সাধিত হয়। মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী। এদের পুরুষ ও স্ত্রী জননাঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন দেহে অবস্থান করে। এ অধ্যায়ে মানুষের পুরুষ ও স্ত্রী জননতন্ত্র, যৌনবাহিত রোগ এবং প্রজননজনিত সমস্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

পিরিয়ড সংখ্যা-১১ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. পুরুষ ও স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ও এর হরমোনাল ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা বর্ণনা করতে পারবে। ৩. গর্ভাবস্থায় করণীয় দিকসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে। ৪. গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করতে পারবে। ৫. আইভিএফ পদ্ধতির উপযোগিতা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. প্রজননজনিত সমস্যাসমূহের প্রতিকার বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. যৌনবাহিত রোগসমূহের লক্ষণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারবে। ৮. প্রজননজনিত সমস্যা সম্পর্কে সচেতন এবং এর সুস্থতা রক্ষায় সচেষ্ট হবে।	● পুরুষ প্রজননতন্ত্র ও এর হরমোনাল ক্রিয়া ● স্ত্রী প্রজননতন্ত্র ও এর হরমোনাল ক্রিয়া ● প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা ○ রজঃচক্র ও বয়ঃসন্ধিকাল ও এ সময়ের পরিবর্তনসমূহ ○ গ্যামেট সৃষ্টি, নিষেক, ইমপ্ল্যান্টেশন ○ ভ্রূণ গঠন ও তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি ● গর্ভাবস্থা ও পরিচর্যা ● গর্ভনিরোধক পদ্ধতি; কৃত্রিম গর্ভধারণ ● প্রজনন তন্ত্রের সমস্যা ○ পুরুষ ও নারীর প্রজননে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা ● যৌনবাহিত রোগ (সিফিলিস, গনোরিয়া, এইডস) লক্ষণ ও প্রতিকার

ক. পুরুষ প্রজননতন্ত্র (Male Reproductive System)

মানুষের শুক্রাণু উৎপাদন, সঞ্চয় ও পরিবহন কাজের ভিত্তিতে পুরুষ জননতন্ত্রকে দুভাবে ভাগ করা যায়: **মুখ্য** (primary) ও **আনুষঙ্গিক** (accessory)। যে অঙ্গ শুক্রাণু উৎপন্ন করে, তাকে **মুখ্য জনন অঙ্গ**; এবং যে সব অঙ্গ শুক্রাণু সঞ্চয় ও পরিবহনের কাজে নিয়োজিত সেগুলোকে **আনুষঙ্গিক জনন অঙ্গ** বলে।

শুক্রাশয় হচ্ছে মুখ্য জননাঙ্গ, বাকি অঙ্গগুলো আনুষঙ্গিক। পুংজননতন্ত্র নিম্নোক্ত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

১. **শুক্রাশয়** (Testes) : একজোড়া ডিম্বাকার শুক্রাশয় **স্ক্রোটাম** (scrotum) নামক একটি থলির ভিতর আবদ্ধ এবং শুক্ররজ্জু দিয়ে লাগানো অবস্থায় দু'পায়ের উরুসন্ধিতে উপাঙ্গের মতো ঝুলে থাকে। স্ক্রোটামের ভিতর শুক্রাশয় দুটি পাশাপাশি অবস্থান করে। বাম দিকের স্ক্রোটাম বড় এবং কিছুটা ঝোলা। প্রতিটি শুক্রাশয় লম্বায় প্রায় ৪ সে.মি. ও ১০-১২ গ্রাম ওজনবিশিষ্ট। প্রত্যেক শুক্রাশয়ের ভিতরে প্রায় ১০০০টি সূক্ষ্ম ও প্যাঁচানো **সেমিনিফেরাস নালিকা** (seminiferous tubules) থাকে। এসব নালিকা কতকগুলো সংগ্রাহক নালিকায় উন্মুক্ত হয়ে এক জালিকাকার গঠন সৃষ্টি করে, একে **রেটি টেসটিস** (rete testis) বলে। রেটি টেসটিস থেকে প্রায় বিশটি ৪-৬ মিলিমিটার লম্বা সংগ্রাহক নালি সৃষ্টি হয়ে প্রত্যেক শুক্রাশয়ের শীর্ষদেশ থেকে শুক্রাশয় ত্যাগ করে এপিডিডাইমিসে মিলিত হয়। সংগ্রাহক নালিগুলোকে **ভাসা ইফারেন্সিয়া** (vasa efferentia) বলে।

কাজ : শুক্রাণু মাতৃকোষ থেকে শুক্রাণু উৎপন্ন করে এবং টেস্টোস্টেরন নামক হরমোন ক্ষরণ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. **এপিডিডাইমিস** (Epididymis) : প্রত্যেক শুক্রাশয়ের ভাসা ইফারেন্সিয়া একত্রে মিলিত হয়ে একটি করে ৪-৬ মিটার লম্বা অত্যন্ত প্যাঁচানো এপিডিডাইমিস গঠন করে। এর শেষ অংশটি সোজা হয়ে ভাস ডিফারেন্সে মিলিত হয়।

কাজ : এপিডিডাইমিস শুক্রাণুর ভিতর থেকে তরল ও কঠিন অসার পদার্থ আলাদা করে শুক্রাণুর নিষেক ক্ষমতা বাড়ায় এবং পুষ্টি পদার্থ ক্ষরণ করে এগুলোকে সতেজ রাখে।

৩. **ভাস ডিফারেন্স** (Vas deferens) বা **শুক্রনালি :** প্রতিটি এপিডিডাইমিস প্রায় ৪০-৫০ সেন্টিমিটার লম্বা, বড় গহ্বর ও মোটা প্রাচীরবিশিষ্ট এককেটি ভাস ডিফারেন্স-এ উন্মুক্ত হয়। ভাস ডিফারেন্স শ্রোণিগহ্বরে প্রবেশ করে এবং মূত্রথলির উপর বেঁকে অবস্থান করে। মূত্রনালি অতিক্রম করার পর **অ্যাম্পুলা** (ampulla) নামক একটি মাকু আকৃতির ফোলা অংশ গঠন করে। অ্যাম্পুলা পরে সেমিনাল ভেসিকলে যুক্ত হয়।

কাজ : প্রধান কাজ হচ্ছে সঙ্গমের সময় দ্রুত শুক্রাণু পরিবহন। তবে কিছু সময়ের জন্য শুক্রাণুও জমা রাখে।

৪. **সেমিনাল ভেসিকল** (Seminal vesicle) : সেমিনাল ভেসিকল হচ্ছে মূত্রথলির নিম্নপ্রান্ত ও মলাশয়ের মাঝখানে অবস্থিত একজোড়া ছোট, আঙ্গুলের মতো কোঁচানো থলিকা। প্রত্যেক থলিকা এককেটি প্যাঁচানো নালিকায় গঠিত ও যোজক টিস্যুতে আবৃত।

কাজ : বীর্য বা সিমেন (semen) উৎপন্নের জন্য বিপুল পরিমাণ পিচ্ছিল থকথকে পদার্থ ক্ষরণ করে। ক্ষরণের ফ্রুক্টোজ সচল শুক্রাণুর শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে।

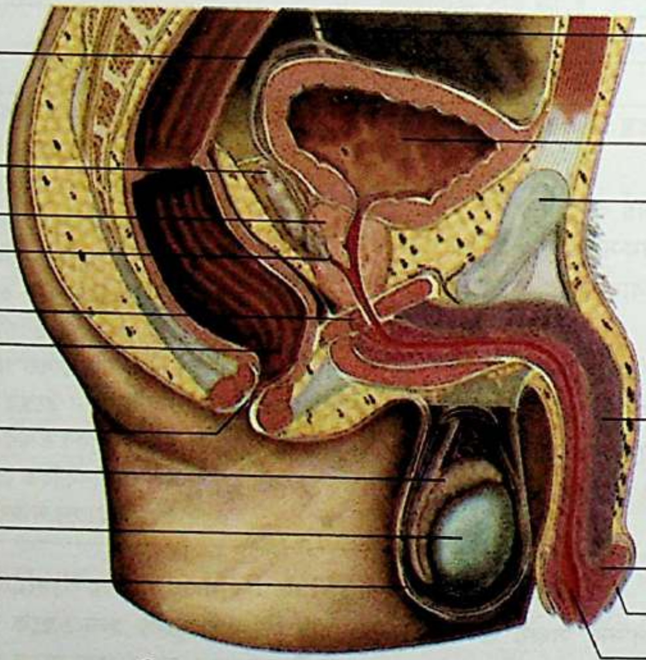

চিত্র ৯.১ : পুংজননতন্ত্র (পার্শ্ব দৃশ্য)

৫. **ক্ষেপন নালি** (Ejaculatory duct) : প্রত্যেক সেমিনাল ভেসিকল থেকে সৃষ্ট একটি করে খাটো নালি প্রত্যেক ভাস ডিফারেন্সের সাথে একীভূত হয়ে ০.৩ মিলিমিটার ব্যাসের ১৯ মিলিমিটার লম্বা অভিন্ন ক্ষেপন নালি গঠন করে। দুটি চেরাছিদ্র পথে ইউরেথ্রার প্রস্টেটিক অংশে ক্ষেপণনালি মুক্ত হয়।

কাজ : সেমিনাল ভেসিকলের ক্ষরণসহ শুক্রাণুকে ইউরেথ্রায় পৌঁছে দেয়।

৬. **ইউরেথ্রা** (Urethra) : এটি রেচনতন্ত্র ও প্রজননতন্ত্রের একটি অভিন্ন নালি যা প্রায় ২০ সেন্টিমিটার লম্বা এবং শিশ্নের শীর্ষদেশে উন্মুক্ত হয়।

কাজ : এ নালির মাধ্যমে বীর্য বাইরে স্খলিত হয় এবং মূত্র নিষ্কাশিত হয়।

৭. **বহিঃযৌনাঙ্গ** (External genitalia) : এটি দুরকম, যথা– **স্ক্রোটাম** ও **শিশ্ন**।

ক. **স্ক্রোটাম** (scrotum) বা **অন্ডথলি :** এটি দুই উরুর মাঝখানে ঝুলে থাকা ও ত্বকে আবৃত থলি বিশেষ। ত্বকের নিচে পাঁচ ধরনের পেশিস্তর ক্রমান্বয়ে বিন্যস্ত থাকে। সবকটি স্তর মিলিত হয়ে যে ব্যবধায়ক নির্মাণ করে সেটি স্ক্রোটামের গহ্বরকে দুভাগে ভাগ করে। প্রত্যেক ভাগ একটি করে শুক্রাশয় ও তার এপিডিডাইমিস এবং শুক্রাণুর কিছু অংশ ধারণ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কাজ : স্ক্রোটাম শুক্রাণু উৎপন্নের অনুকূল তাপমাত্রা রক্ষা করে। এছাড়া শুক্রাশয়কে চাপজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। চাপের মুখে শুক্রাশয় থলির ভিতর সহজেই পিছলে যেতে পারে।

খ. শিশ্ন (Penis) বা **পুরুষাঙ্গ :** শিশ্ন হচ্ছে পুরুষের এমন একটি বহিরাঙ্গ যার ভিতর দিয়ে ইউরেথ্রা অতিক্রম করে বাইরে উন্মুক্ত হয়। এর ত্বকের নিচে চর্বি নেই কিন্তু পাতলা টিস্যু আছে। তাই শিশ্নের ত্বক এত আলগা। যে অংশ থেকে শিশ্ন উঠেছে তাকে **শিশ্নমূল** (root) বলে। সেখানে কয়েক গোছা চুল থাকে। শিশ্নের যে অংশ ঝুলে থাকে, সেটি শিশ্নদেহ। এর ডগায় ব্যাঙের ছাতা আকৃতির লাল মুন্ডিকে **গ্লান্স পেনিস** (glans penis) বলে। এতে সবচেয়ে বেশি স্নায়ুর প্রান্তদেশ উন্মুক্ত। এ মুন্ডিকে যে চামড়া ঢেকে রাখে, তাকে **প্রীপিউস** (prepuce) বলে (মুসলমান পুরুষে এ অংশটি খতনার সময় কেটে ফেলা হয়)। শিশ্নদেহ দুধরনের **ইরেকটাইল** (erectile) টিস্যুতে গঠিত: (i) **কর্পোরা ক্যাভারনোসা** (corpora cavernosa) ও (ii) **কর্পোরা স্পঞ্জিওসাম** (corpora spongiosum)। এ টিস্যু দৃঢ় হলে শিশ্ন প্রসারিত হয়।

কাজ : প্রজনন ক্রিয়ায় দৃঢ় ও প্রসারিত হয়ে এটি ইউরেথ্রার মাধ্যমে বীর্য স্ত্রী জননতন্ত্রের অভ্যন্তরে প্রেরণ করে।

৮. জনন গ্রন্থি : মানুষের জনননালি সংশ্লিষ্ট নিচে বর্ণিত দুটি গ্রন্থি পাওয়া যায়।

ক. প্রস্টেট গ্রন্থি (Prostate gland) : এটি শ্রোণিগহ্বরে মূত্রথলির নিচে অবস্থিত নাশপাতি আকৃতির গ্রন্থি এবং গোড়া ও চূড়ায় বিভক্ত। এটি পেশল ও গ্রন্থিময় টিস্যুতে গঠিত। গ্রন্থিময় টিস্যু কতকগুলো খন্ডযুক্ত। খন্ডগুলোর নালিকা ইউরেথ্রায় উন্মুক্ত হয়। এ গ্রন্থির ক্ষরণ পেশল টিস্যুর সংকোচনে ইউরেথ্রায় মুক্ত হয়।

কাজ : এ গ্রন্থি থেকে একধরনের ক্ষারীয় তরল নিঃসৃত হয় যা বীর্যরসের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। তাছাড়া এ তরল যোনির ভিতরের অম্লীয় অবস্থাকে প্রশমিত করে শুক্রাণুকে বেঁচে থাকতে সহায়তা করে।

খ. বাল্বোইউরেথ্রাল (Bulbo-urethral) বা **কাওপার-এর গ্রন্থি** (Cowper's gland) : এ গ্রন্থি হচ্ছে ইউরেথ্রার দুপাশে অবস্থিত দুটি মটর দানার মতো গ্রন্থি যা থেকে নালিকা বেরিয়ে ইউরেথ্রায় মিলিত হয়।

কাজ : সংগমের সময় এ গ্রন্থি **মিউকাস** (পিচ্ছিল পদার্থ) ক্ষরণ করে।

পুরুষ প্রজননতন্ত্রের হরমোনাল ক্রিয়া (Hormonal Action of Male Reproductive System)

পুরুষ প্রজননতন্ত্রের সাথে জড়িত বিভিন্ন হরমোন ও সেগুলোর কাজ নিচে উল্লেখ করা হলো–

১. শুক্রাশয়ের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ থেকে ক্ষরিত **টেস্টোস্টেরন** (testosterone) হরমোন মুখ্য ও আনুষঙ্গিক জননাঙ্গের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং বিভিন্ন গৌণ বা সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে।

২. অগ্র পিটুইটারি গ্রন্থির সম্মুখ লোব (lobe) থেকে ক্ষরিত **ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন** (Follicle Stimulating Hormone-FSH) ও **লুটিনাইজিং হরমোন** (Luteinising Hormone-LH) এর প্রভাবে যৌন হরমোন **টেস্টোস্টেরন** এর ক্ষরিত হয়।

৩. পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **লুটিওট্রফিক হরমোন** (Luteotrophic Hormone—LTH) গৌণ যৌন অঙ্গের বিকাশ ঘটায়।

৪. অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **গোনাডোকর্টিকয়েড** (Gonadocorticoids) হরমোন ভ্রূণের যৌন বিভেদ নিয়ন্ত্রণ করে এবং যৌনগ্রন্থি, যৌনাঙ্গ ও গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

৫. শুক্রাশয় থেকে ক্ষরিত **অ্যান্ড্রোস্টেরন** (Androsterone) পুরুষের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায় এবং স্পার্মাটোজেনেসিস বা শুক্রাণুজননে শুক্রাশয়কে উদ্বুদ্ধ করে।

৬. শুক্রাশয়ের **সারটলি কোষ** (sertoli cell) থেকে ক্ষরিত **ইনহিবিন** (Inhibin) হরমোন শুক্রাণু তৈরিতে সাহায্য করে।

খ. স্ত্রী প্রজননতন্ত্র (Female Reporoductive System)

মানুষের স্ত্রী প্রজননতন্ত্র নিচে বর্ণিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

১. ডিম্বাশয় (Ovary) : শ্রোণির পিছনে ফাঁপা গহ্বরে জরায়ুর দুপাশে ইউরেটারের নিচে বাদাম আকৃতির একজোড় ডিম্বাশয় অবস্থিত। প্রত্যেক ডিম্বাশয় ৩–৫ সেন্টিমিটার লম্বা, ২–৩ সেন্টিমিটার চওড়া ও ০.৬–১.৫ সেন্টিমিটার পুরু এবং জরায়ু ও ফেলোপিয়ান নালিসহ উদরে একটি পেরিটোনিয়াম পর্দার ভাঁজ করা টিস্যুর সাহায্যে আটকে থাকে। প্রতিটি ডিম্বাশয়ের ওজন ২.০–৩.৫ গ্রাম।

কাজ : ডিম্বাণু উৎপন্ন করা ডিম্বাশয়ের প্রধান কাজ। তাছাড়া স্ত্রী যৌন হরমোন–ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন ক্ষরণ করে থাকে। এসব হরমোনের প্রভাবে রজঃচক্র, গর্ভ, অমরা, জননেন্দ্রিয়, মাতৃস্তন পুষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. **ডিম্বনালি বা ফেলোপিয়ান নালি** (Fallopian tube) : জরায়ুর দুপাশে দুটি পেশল ও ১২ সেন্টিমিটার লম্বা ডিম্ব নালি অবস্থিত। নালির একপ্রান্ত ডিম্বাশয়ের কাছে পেরিটোনিয়াল গহ্বরে ও অন্যপ্রান্ত জরায়ু-গহ্বরে উন্মুক্ত। ডিম্বাশয় সংলগ্ন প্রান্তটি অসংখ্য আঙ্গুলের মতো প্রবর্ধনযুক্ত হয়ে ঝালর বা **ফিমব্রি** (fimbriae)-তে পরিণত হয়। পরের ফানেলাকার অংশটি **ইনফান্ডিবুলাম** (infundibulum)। এর স্ফীত অংশ **অ্যাম্পুলা** (ampulla) এবং যে মধ্য অংশটি জরায়ু-প্রাচীরের কাছে থাকে তা **ইসথমাস** (isthmus)।

কাজ : ডিম্বনালি ডিম্বাশয় থেকে মুক্ত পরিণত ডিম্বাণুকে গ্রহণ করে জরায়ুতে পৌঁছে দেয় এবং রস ক্ষরণ করে শুক্রাণুকে উর্ধ্বপ্রান্তে উঠে ডিম্বাণুকে নিষিক্তকরণে সাহায্য করে।

৩. **জরায়ু** (Uterus) : এটি দেখতে উল্টানো নাশপাতির মতো, ফাঁপা, মাংসল অঙ্গ এবং মূত্রাশয়ের পিছনে ও মলাশয়ের সামনে শ্রোণিগহ্বরে অবস্থিত। জরায়ু-প্রাচীর বহিঃস্থ **পেরিমেট্রিয়াম** (perimetrium), মধ্যস্থ **মায়োমেট্রিয়াম** (myometrium) এবং অন্তঃস্থ **এন্ডোমেট্রিয়াম** (endometrium)-এ গঠিত। জরায়ুর উপর দিকে গম্বুজ আকৃতির অংশকে **ফান্ডাস** (fundus), মাঝের অংশকে **জরায়ুদেহ** (body of uterus) এবং নিচের অংশকে **সারভিক্স** (cervix) বা জরায়ুকণ্ঠ বলে। বয়ঃসন্ধিক্ষণে জরায়ু পূর্ণতা লাভ করে, কিন্তু গর্ভাবস্থায় এটি প্রায় ২০ গুণ বৃদ্ধি পায়।

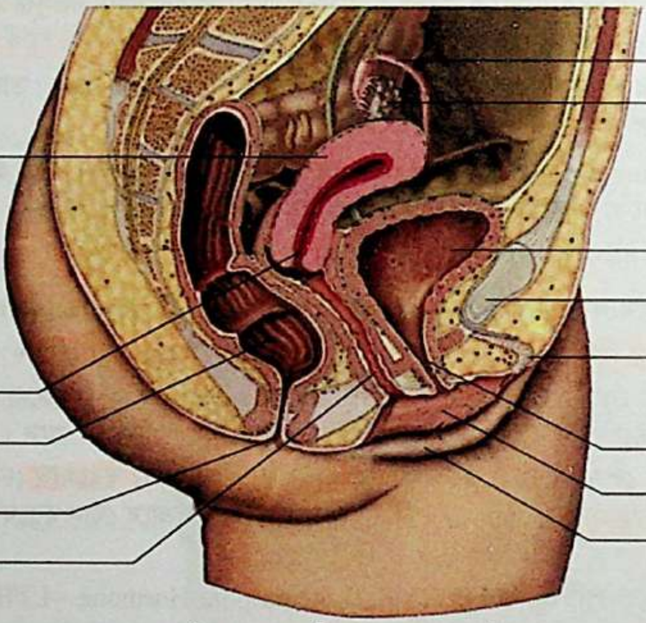

চিত্র ৯.২ : স্ত্রীজননতন্ত্র (পার্শ্ব দৃশ্য)

কাজ : জরায়ু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভ্রূণকে আগলে রক্ষা করে এবং পরিস্ফুটন সম্ভবপর করে তোলে। এখান থেকে অমরা সৃষ্টি হয়ে ভ্রূণের পুষ্টি, রেচন ও শ্বসন সম্পন্ন করে। শুক্রাণুর আগমনকে ত্বরান্বিত করে। সারভিক্সের নিঃসৃত ক্ষারকীয় রস শুক্রাণুর চলনশক্তি বৃদ্ধি করে।

৪. **যোনি** (Vagina) : এটি শুক্রাণু গ্রহণের সাথে সম্পর্কযুক্ত স্ত্রীদেহের একটি মাংসল, ৮-১০ সেন্টিমিটার লম্বা নলাকার খাদ যা মূত্রাশয়ের নিচ দিয়ে দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত জরায়ু থেকে বাইরে উন্মুক্ত। যোনির প্রাচীরে রুগী (rugae) নামক অসংখ্য ভাঁজ থাকে।

কাজ : যোনি মাংসল প্রাচীরের সাহায্যে যে কোনো আকারের শিশ্নকে গ্রহণ করে। বীর্য স্খলনের জন্য প্রয়োজনীয় উত্তেজনা প্রদান করে। স্খলিত বীর্য গ্রহণ করে এবং প্রসব ঝামেলামুক্ত করে।

৫. **বহিঃযৌনাঙ্গ** (External genitalia) : যোনির মুখে স্নায়ুসমৃদ্ধ কতকগুলো অঙ্গ দেখা যায়, এগুলোকে একত্রে ভালভা (vulva) বলে। দুজোড়া মাংসল ভাঁজ উভয় পার্শ্ব থেকে যোনিপথকে কপাটের মতো ঢেকে রাখে। এদের মধ্যে বাইরের অধিকতর মোটা এবং বৃহদাকার ভাঁজকে **লেবিয়া মেজরা** (labia majora) এবং ভিতরের দিকে তুলনামূলকভাবে পাতলা এবং ক্ষুদ্রাকার ভাঁজকে **লেবিয়া মাইনরা** (labi minora) বলে।

লেবিয়া মেজোরার একেবারে উপরে জোড়ের কাছে একটি উঁচু ছোট মাংসপিন্ড দেখা যায়, একে **ক্লাইটোরিস**

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

(clitoris) বলে। বার্থোলিন গ্রন্থি (Bartholin's gland) বা ভগাংকুর নামে দুটি বড় গ্রন্থিও লেবিয়া মাইনোরায় উন্মুক্ত হয়েছে।

কাজঃ লেবিয়া মেজোরা ও লেবিয়া মাইনোরা যোনিপথকে ডেকে রাখে। বার্থোলিন গ্রন্থিক্ষরণ যৌনমিলনের সময় যোনিপথকে পিচ্ছিল করে তোলে। ক্লাইটোরিস সঙ্গমের সময় উত্তেজনা প্রদান করে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের হরমোনাল ক্রিয়া (Hormonal Action of Female Reproductive System)

মানুষের স্ত্রী প্রজননতন্ত্রের কার্যাবলি বিভিন্ন ধরনের হরমোনের ক্রিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এদের কিছু হরমোন সরাসরি প্রজনন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং কিছু হরমোন অন্য হরমোনের ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। যেসব হরমোনের ক্রিয়া দ্বারা মানব স্ত্রীজননতন্ত্রের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. ডিম্বাশয়ের কর্পাস লুটিয়ার কোষগুলো **ইস্ট্রোজেন** (estrogen) ও **প্রোজেস্টেরন** (progesterone) নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্ত্রী যৌন হরমোন ক্ষরণ করে। ইস্ট্রোজেন হরমোন স্ত্রী জননাঙ্গের যেমন-স্তনের এবং এন্ডোমেট্রিয়ামের বৃদ্ধি ঘটায়। এটি স্ত্রী চরিত্রের পরিস্ফুটন এবং পরিণত বয়সে মাসিক বা রজঃচক্র নিয়ন্ত্রণ করে।

২. প্রোজেস্টেরন ভ্রূণের পরিস্ফুটনের জন্য জরায়ুর ভিতর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৩. পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন** (FSH) ওভারিয়ান ফলিকলের বৃদ্ধি, ওভিউলেশন ও ইস্ট্রোজেন সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

৪. পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **লুটিনাইজিং হরমোন** (LH) এর প্রভাবে গ্রাফিয়ান ফলিকল করপাস লুটিয়ামে পরিণত হয়।

৫. অমরা থেকে ক্ষরিত hCG (Human Chorionic Gonadotropin) হরমোনগুলো স্ত্রীজননাঙ্গের বৃদ্ধি, দুগ্ধ ক্ষরণ ও ফিটাসের বর্ধনের জন্য গ্লুকোজ সরবরাহ নিশ্চিত করে।

৬. hCG কর্পাস লুটিয়ামকে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরণ সংশ্লেষ ও বিতরণে উদ্দীপ্ত করে।

৭. ডিম্বাশয় ও অমরা থেকে ক্ষরিত **রিলাক্সিন** (relaxin) হরমোন মহিলাদের প্রসবের সময় শ্রোণিদেশীয় লিগামেন্ট ও পেশির প্রসারণ ঘটিয়ে প্রশব সহজতর করে।

প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা (Different Stages and Phases of Reproduction)

মানুষ একলিঙ্গ প্রাণী। যৌন জনন প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ ভিন্নধর্মী গ্যামেট সৃষ্টি ও নিষেকের মাধ্যমে গ্যামেটের নিউক্লিয়াসের একীভবনের মধ্য দিয়ে সৃষ্ট **জাইগোট** (zygote) দ্রুত বিভাজিত হয়ে **ব্লাস্টোসিস্ট** (blastocyst) নামক কোষগুচ্ছে পরিণত হয়। এটি ফেলোপিয়ান নালির ভিতর দিয়ে বাহিত হয়ে **ইমপ্ল্যান্টেশন** (implantation) প্রক্রিয়ায় জরায়ুগাত্রে স্থাপিত হলে **গর্ভধারণ** সম্পন্ন হয়। এরপর শুরু হয় ভ্রূণ গঠন প্রক্রিয়া। ভ্রূণ গঠনের প্রাথমিক ধাপেই তিনটি ভ্রূণীয় স্তর সৃষ্টি হয়। এ তিনটি স্তর থেকেই পরবর্তীতে দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উৎপত্তি হয়। এ কারণে ভ্রূণের পরিস্ফুটনকালীন দশাটি মানবজননের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। প্রজননের বিভিন্ন পর্যায় ও দশা সাতটি শিরোনামের মাধ্যমে বর্ণনা করা যায়। যেমন- **১. বয়ঃসন্ধিকাল, ২. রজঃচক্র, ৩. গ্যামেট সৃষ্টি, ৪. নিষেক, ৫. ইমপ্ল্যান্টেশন, ৬. ভ্রূণের পরিস্ফুটন এবং ৭. ভ্রূণের বিকাশ**।

১. বয়ঃসন্ধিকাল বা বয়ঃপ্রাপ্তি (Puberty or Adolescence)

কৈশোর অতিবাহিত হওয়ার পরপরই নারী ও পুরুষের দেহে শারীরিক এবং মানসিক পরিবর্তনের সাথে সাথে শারীরবৃত্তীয় অনেক পরিবর্তন শুরু হয়। ফলে যৌন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবসহ জননাঙ্গের পুনঃবর্ধন ঘটে। **জীবনের যে পর্যায়ে নারী ও পুরুষের গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের** (secondary sexual characteristics) **উদ্ভবসহ প্রজননতন্ত্রের অঙ্গগুলো সক্রিয়তা লাভে সমর্থ হয় তাকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। অর্থাৎ কৈশোর এবং সাবালকত্ব প্রাপ্তির অন্তবর্তীকালীন সময় হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকাল** (puberty is the time between childhood and adulthood)। পুষ্টি, সামাজিক অবস্থা, আবহাওয়া, জলবায়ু এবং বংশগত কারণে পৃথিবীর সব অঞ্চলে নারী-পুরুষের বয়ঃসন্ধিকাল একই সময় হয় না। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালের বয়স ১৩-১৫ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ১১-১৩ বছর বলে বিবেচনা করা হয়। শীতপ্রধান দেশের ছেলেমেয়েদের এ ঘটনা আরো ৩-৪ বছর পর ঘটে। বয়ঃসন্ধিকালে জননাঙ্গের হরমোন নিঃসরণ ও গ্যামেট উৎপাদনের সূচনা ঘটে। শিশু-কিশোর বিশেষজ্ঞ James M. Tanner সর্বপ্রথম মানবদেহের এসব পরিবর্তনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাঁর নামানুসারে বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলোকে Tanner stages (টেনার দশা) বলা হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বয়ঃসন্ধিতে হরমোনের ভূমিকা (Role of hormone in puberty)

ছেলেদের ক্ষেত্রে হরমোনের প্রভাব

১. পিটুইটারি গ্রন্থি ক্ষরিত **ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন** (FSH) শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালিকার বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে এবং শুক্রাণু উৎপাদন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

২. পিটুইটারি গ্রন্থি ক্ষরিত **লুটিনাইজিং হরমোন** (LH) শুক্রাশয়ের **লেডিগ কোষ** (leydig cells) থেকে **টেস্টোস্টেরন** হরমোনের ক্ষরণ ঘটায়।

৩. শুক্রাশয়ের টেস্টোস্টেরন হরমোন মুখ্য ও গৌণ জননাঙ্গের বিকাশ ঘটায়, শুক্রাণু সৃষ্টি করে এবং গৌণ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়।

৪. অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি ক্ষরিত **সেক্স কর্টিকয়েড হরমোন** (SCH) পুরুষ জননাঙ্গের পূর্ণতা আনে এবং গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

মেয়েদের ক্ষেত্রে হরমোনের প্রভাব

১. পিটুইটারি গ্রন্থি ক্ষরিত **ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন** (FSH) ডিম্বাশয়ের ফলিকলের পরিপক্বতা আনে এবং ডিম্বাণু সৃষ্টি প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।

২. পিটুইটারি গ্রন্থি ক্ষরিত **লুটিনাইজিং হরমোন** (LH) ডিম্বাশয়ের কর্পাস লিউটিয়াম থেকে ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন হরমোন এর ক্ষরণ ঘটায়।

৩. ডিম্বাশয়ের ইস্ট্রোজেন হরমোন মুখ্য ও গৌণ জনননাঙ্গের বিকাশ ঘটায়, ডিম্বাণু সৃষ্টি করে এবং গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটায়।

৪. ডিম্বাশয়ের প্রোজেস্টেরন হরমোন জরায়ুর প্রাচীরকে ভ্রূণ সংলগ্ন হওয়ার উপযোগী করে।

৫. অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি ক্ষরিত **সেক্স কর্টিকয়েড হরমোন** স্ত্রীজননাঙ্গের পূর্ণতা আনে এবং গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

ছেলে ও মেয়ের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন

নিচের ছকের মাধ্যমে ছেলে ও মেয়ের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তনগুলো উল্লেখ করা হলো।

ছেলে ও মেয়ের বয়ঃসন্ধিকালীন পরিবর্তন

আলোচ্য বৈশিষ্ট্য	ছেলে	মেয়ে
	দৈহিক পরিবর্তন	
১. লোম	১. মুখ, বগল, শ্রোণিদেশে লোম।	১. বগল ও শ্রোণিদেশে লোম।
২. পেশি	২. বলিষ্ঠ ও সুগঠিত হয়।	২. তেমন নয়।
৩. মেদ	৩. মুখ ও পেটে সঞ্চিত হয়।	৩. কোমর ও নিতম্বে সঞ্চিত হয়।
৪. স্তন	৪. প্রায় স্বাভাবিক থাকে।	৪. প্রচুর মেদ সঞ্চিত হয়ে সুডৌল ও উন্নত হয়।
৫. কণ্ঠস্বর	৫. গাঢ়, ভারী ও গম্ভীর হয়ে উঠে।	৫. মেয়েলী স্বর প্রকাশ পায়।
	শারীরবৃত্তিক পরিবর্তন	
১. হৃৎপিন্ডের গতি ও রক্তচাপ	১. বৃদ্ধি পায়।	১. বৃদ্ধি পায়।
২. শ্বাসপ্রশ্বাস	২. গভীর হয়।	২. গভীর হয়।
৩. মৌল বিপাকীয় হার	৩. বৃদ্ধি পায়	৩.হ্রাস পায়
৪. লোহিত রক্তকণিকা	৪. অনেক বৃদ্ধি পায়	৪. কিছু পরিমাণ হ্রাস পায়।
৫. জননাঙ্গের হরমোন	৫. উৎপন্ন ও ক্ষরিত হতে থাকে।	৫. উৎপন্ন ও ক্ষরিত হতে থাকে।
৬. জননকোষ	৬. শুক্রাণুসহ বীর্য উৎপন্ন ও স্খলিত হয়।	৬. রজঃচক্র আরম্ভ হয়।
৭. আনুষঙ্গিক জনন অঙ্গ	৭. সুগঠিত ও কার্যক্ষম হয়ে উঠে	৭.সুগঠিত ও কার্যক্ষম হয়ে উঠে।
	মানসিক পরিবর্তন	
১. বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ	১. মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।	১. ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।
২. ভাব	২. বিচিত্র খেয়াল ও ভাব মনে জেগে উঠে।	২. নারীসুলভ মানসিকতার প্রকাশ ঘটে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. রজঃচক্র (Menstrual cycle; ল্যাটিন *mensis* = month)

বয়ঃপ্রাপ্ত নারীর সমগ্র যৌনজীবনে প্রায় নিয়মিত, গড়ে ২৮ দিন (২৪–৩২ দিন) পরপর জরায়ু থেকে রক্ত, মিউকাস, এন্ডোমেট্রিয়ামের ভগ্নাংশ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত অনিষিক্ত ডিম্বাণুর চক্রীয় নিষ্কাশনকে **রজঃচক্র** বলে। গোনাডোট্রপিক হরমোন (GTH)–এর প্রভাবে ১২–১৫ বছর বয়সে এ চক্রের সূত্রপাত ঘটে এবং ৪৫–৫০ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

রজঃচক্রকালে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম (অন্তঃস্তর)-এর পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে রজঃচক্রকে নিচে বর্ণিত ৪টি পর্বে ভাগ করা হয়ে থাকে।

ক. নিরাময় পর্ব (Regenerative/Repairing/Resting phase) : বিগত রজঃচক্র শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী চক্রের প্রারম্ভে জরায়ুতে যে প্রক্রিয়ায় পুনর্গঠনমূলক কাজ শেষে এন্ডোমেট্রিয়াম স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, তাকে **নিরাময় পর্ব** বলে। এর স্থায়িত্বকাল **রজঃস্রাব শুরুর তিন দিন পর থেকে ষষ্ঠ দিন পর্যন্ত**। এসময় সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে **FSH** (ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন) ও **LH** (লুটিনাইজিং হরমোন)-এর ক্ষরণ সামান্য বৃদ্ধি পায়, ডিম্বাশয়ে ফলিকলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং এন্ডোমেট্রিয়াম ১ মিমি. পুরু হয়।

খ. বৃদ্ধি পর্ব (Proliferative phase) : রজঃচক্রের যে পর্বে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ডিম্বাশয় থেকে সেকেন্ডারি উওসাইট নিষেকের উদ্দেশে বিচ্ছিন্ন হয় (ডিম্বপাত), তাকে **বৃদ্ধিপর্ব** বলে। এ পর্বের স্থায়িত্বকাল **৭ম থেকে ১৪তম দিন পর্যন্ত**। এ সময় বর্ধনশীল ফলিকলের ফলিকল কোষ থেকে প্রচুর পরিমাণ **ইস্ট্রোজেন** হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে এন্ডোমেট্রিয়ামের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং এতে উপস্থিত নলাকার গ্রন্থি ও রক্তনালি দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এন্ডোমেট্রিয়াম প্রায় ৩–৪ মি.মি. পুরু হয়, FSH ও LH-এর ক্ষরণ বন্ধ করে দেয় (সম্মুখ পিটুইটারির মাধ্যমে) এবং ডিম্বাশয়ের ফলিকল ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠে।

চক্রের ১২তম দিনে হঠাৎ LH-এর ক্ষরণ বেড়ে যায় এবং ইস্ট্রোজেনের ক্ষরণ কমে যায়। ১৪ দিনের মাথায় (চক্র যদি ২৮ দিনের হয়) পরিণত ফলিকল থেকে ডিম্বপাত ঘটে। ডিম্বপাতের পর ফলিকলের বাকি কোষগুলো LH-এর প্রভাবে একত্রে **কর্পাস লুটিয়াম** (corpus luteum) নামক এক বড়, হলদে বস্তুতে পরিণত হয়ে সাময়িকভাবে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে এবং প্রোজেস্টেরন হরমোন ক্ষরণ করে। এ হরমোনও এন্ডোমেট্রিয়ামের বৃদ্ধি ও ডিম্বপাতে প্রভাব বিস্তার করে। ডিম্বপাতের পরপরই প্রোজেস্টেরন ক্ষরণে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায়।

গ. প্রাক-রজঃস্রাবীয় পর্ব (Premenstrual phase) : রজঃচক্রের যে পর্বে ব্লাস্টোসিস্ট ধারণের জন্য জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম পূর্ণগঠিত পর্যায়ে অপেক্ষমান থাকে, তাকে **প্রাক-রজঃস্রাবীয় পর্ব** বলে। এ পর্বের স্থায়িত্বকাল রজঃচক্রের **১৫-২৮তম দিন পর্যন্ত** (অর্থাৎ ১৩–১৪ দিন)। এ পর্বে কর্পাস লুটিয়ামের কোষ থেকে প্রচুর পরিমাণ প্রোজেস্টেরন ও অল্প পরিমাণ ইস্ট্রোজেন ক্ষরণ অব্যাহত থাকে। প্রোজেস্টেরনের প্রভাবে এন্ডোমেট্রিয়াম আরও রক্তবাহিকাসমৃদ্ধ হয়, এর

চিত্র ৯.৩: রজঃচক্র

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কোষগুলোতে পুষ্টি পদার্থ (গ্লাইকোজেন ও লিপিড) বেড়ে যায়। পরিশেষে এন্ডোমেট্রিয়াম ৫–৬ মিমি. পুরু হয়ে ব্লাস্টোসিস্টের ধারণ ও পোষণে সক্ষম হয়।

ঘ. রজঃস্রাবীয় বা ব্লিডিং পর্ব (Menstrual / Destructive / Bleeding phase) : ডিম্বপাতের পর ডিম্বাণু **৩৬ ঘন্টার মধ্যে নিষিক্ত না হলে** কর্পাস লুটিয়াম থেকে নিঃসৃত ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের প্রভাবে সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থি FSH ও LH ক্ষরণ বন্ধ করে দেয়। LH (লুটিনাইজিং হরমোন)–এর অভাবে কর্পাস লুটিয়ামের কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে বিধ্বস্ত হয়। চক্রের এ পর্বে ৪টি হরমোনের (ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন ও লুটিনাইজিং হরমোন) ক্ষরণ মাত্রাই নিম্নতম পর্যায়ে থাকে।

ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের ক্ষরণমাত্রা কমে যাওয়ায় এন্ডোমেট্রিয়ামের আর বৃদ্ধি ঘটে না, বরং তা ভাঙতে শুরু করে। রক্তের অভাবে তখন এন্ডোমেট্রিয়ামের ধমনিকুন্ডলী প্রসারিত হয়, ফলে ধমনিকা ও কৈশিকজালিকা ছিন্নভিন্ন হলে **রক্তক্ষরণ** শুরু হয়। পরে অবশ্য কিছু রক্তবাহিকার সংকোচনে স্থানীয় রক্তপাত বন্ধ হয়, কিন্তু অন্যান্য রক্তবাহিকার অক্ষমতার জন্য রক্তক্ষরণ ৪–৫ দিন স্থায়ী হয়। এ সময় রক্তের সাথে এন্ডোমেট্রিয়াম, রক্তবাহিকার ভগ্নাংশ ও অনিষিক্ত ডিম্বাণু যোনিপথে নিষ্কাশিত হয়। এসব পদার্থকে **রজঃস্রাব** বলে। প্রত্যেক রজঃস্রাবের পরিমাণ ৩০–৪০ মিলিলিটার।

ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের ক্ষরণমাত্রা অনেক নিচে নেমে গেলে সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থির উপর নিয়ন্ত্রণ কমে যায়, তখন আবার FSH ও LH ক্ষরণ শুরু হয়। সেই সাথে শুরু হয় নতুন রজঃচক্র সৃষ্টির তৎপরতা।

রজঃচক্রের তাৎপর্য : রজঃচক্র মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতার সূচনা ঘটায়। স্ত্রীলোকের সন্তান ধারণক্ষমতা নির্দেশ করে এটি প্রতিমাসে একবার গর্ভসঞ্চারনের সুযোগ সৃষ্টি করে। নিয়মিত রজঃচক্র মেয়েদের প্রজননিক সুস্থতার বহিঃপ্রকাশ। অনিয়মিত রজঃচক্র মেয়েদের বিভিন্ন শারীরিক ও যৌন সমস্যার একটি উপসর্গ।

৩. গ্যামেট সৃষ্টি (Formation of Gamates) বা গ্যামেটোজেনেসিস (Gametogenesis)

যেসব প্রাণী যৌন প্রজননের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে সেসব ক্ষেত্রে **নিষেক**-এর পর **পরিস্ফুটন** শুরু হয়। নিষেকের জন্য একটি শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু অত্যাবশ্যক, যা সাধারণত একটি প্রজাতির পরিণত বয়সের পুরুষ ও স্ত্রী সদস্য সৃষ্টি করতে সক্ষম।

যে প্রক্রিয়ায় জনন অঙ্গের (শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়) প্রাইমর্ডিয়াল জননকোষ (জনন মাতৃকোষ) থেকে গ্যামেট (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) উৎপন্ন হয়ে নিষেকে সক্ষম হয়ে উঠে তাকে **গ্যামেটোজেনেসিস** (গ্রিক *gamos* = জননকোষ এবং *genesis* = উৎপত্তি হওয়া) বলে। শুক্রাণু উৎপন্নের প্রক্রিয়াকে **শুক্রাণুজনন** বা **স্পার্মাটোজেনেসিস** এবং ডিম্বাণু উৎপন্নের প্রক্রিয়াকে **ডিম্বাণুজনন** বা **উওজেনেসিস** বলা হয়।

নিচে স্পার্মাটোজেনেসিস এবং উওজেনেসিসের বিভিন্ন ধাপের সচিত্র বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. শুক্রাণুজনন বা স্পার্মাটোজেনেসিস

পূর্ণাঙ্গ শুক্রাণু সৃষ্টি হওয়ার পদ্ধতিকে **স্পার্মাটোজেনেসিস** (spermatogenesis; গ্রিক *sperma* = শুক্রাণু + *genesis* = জনন বা সৃষ্টি) বলে। পুরুষ জননাঙ্গে অর্থাৎ শুক্রাশয়ে এ প্রক্রিয়া ঘটে। মেরুদন্ডী প্রাণিদের শুক্রাশয় অসংখ্য **সেমিনিফেরাস নালিকা** (seminiferous tubules)-য় গঠিত। এসব নালিকার প্রাচীর **জার্মিনাল এপিথেলিয়াম** (germinal epithellium) নামক আবরণী কোষে আবৃত থাকে। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এসব এপিথেলিয়ামের প্রতিটি কোষ শুক্রাণুতে রূপান্তরিত হতে সক্ষম। তবে সব কোষ স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না। যেসব কোষ এ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে শুক্রাণু গঠন করে সেগুলোকে **প্রাইমর্ডিয়াল জননকোষ** (primordial germ cell) বা **জনন মাতৃকোষ** বলে। অবশ্য স্তন্যপায়ী প্রাণীতে জার্মিনাল কোষগুলোর ফাঁকে ফাঁকে দেহকোষও দেখা যায়। এগুলোকে **সারটলি কোষ** (sertoli cell) বলে যা বৃদ্ধিশীল শুক্রাণুর পুষ্টি সরবরাহ করে।

নিচে স্তন্যপায়ী প্রাণীর (মানুষ) স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো। ক্রমবর্ধনের উপর ভিত্তি করে সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে নিচে বর্ণিত চারটি ধাপে ভাগ করা যায়।

i. সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায় (Multiplication phase) : শুক্রাশয়ের সেমিনিফেরাস নালিকার **জার্মিনাল এপিথেলিয়াল কোষ** (germinal epithelial cell, 2n) বার বার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়। উৎপন্ন কোষগুলোকে **স্পার্মাটোগোনিয়া** (spermatogonia, একবচনে-spermatogonium) বলে। **স্পার্মাটোগোনিয়ামকে** (2n) **শুক্রাণু মাতৃকোষ**-ও বলা হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ii. পরিবর্ধন পর্যায় (Growth phase) : প্রতিটি স্পার্মাটোগোনিয়াম সেমিনিফেরাস নালিকার সার্টলি কোষ থেকে খাদ্য শোষণ করে আয়তনে বড় হয়। এ কোষগুলোকে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট (primary spermatocyte) বলে। প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটের নিউক্লিয়াস আয়তনে বেশ বড় এবং ক্রোমোজোমগুলোতে মিয়োসিসের ইন্টারফেজ দশার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

iii. পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায় (Maturation phase) : এ পর্যায়ের শুরুতে প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটগুলোতে প্রথম মিয়োসিস বিভাজন ঘটে, ফলে সৃষ্ট কোষগুলো হ্যাপ্লয়েড (n) প্রকৃতির হয়। এদের সেকেন্ডারি স্পার্মাটোসাইট (secondary spermatocyte) বলে। এদের প্রতিটি দ্বিতীয় মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে দুটি করে স্পার্মাটিড (spermatid) সৃষ্টি করে। এভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায়ে একটি ডিপ্লয়েড প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট (2n) থেকে চারটি হ্যাপ্লয়েড স্পার্মাটিড (n) গঠিত হয়।

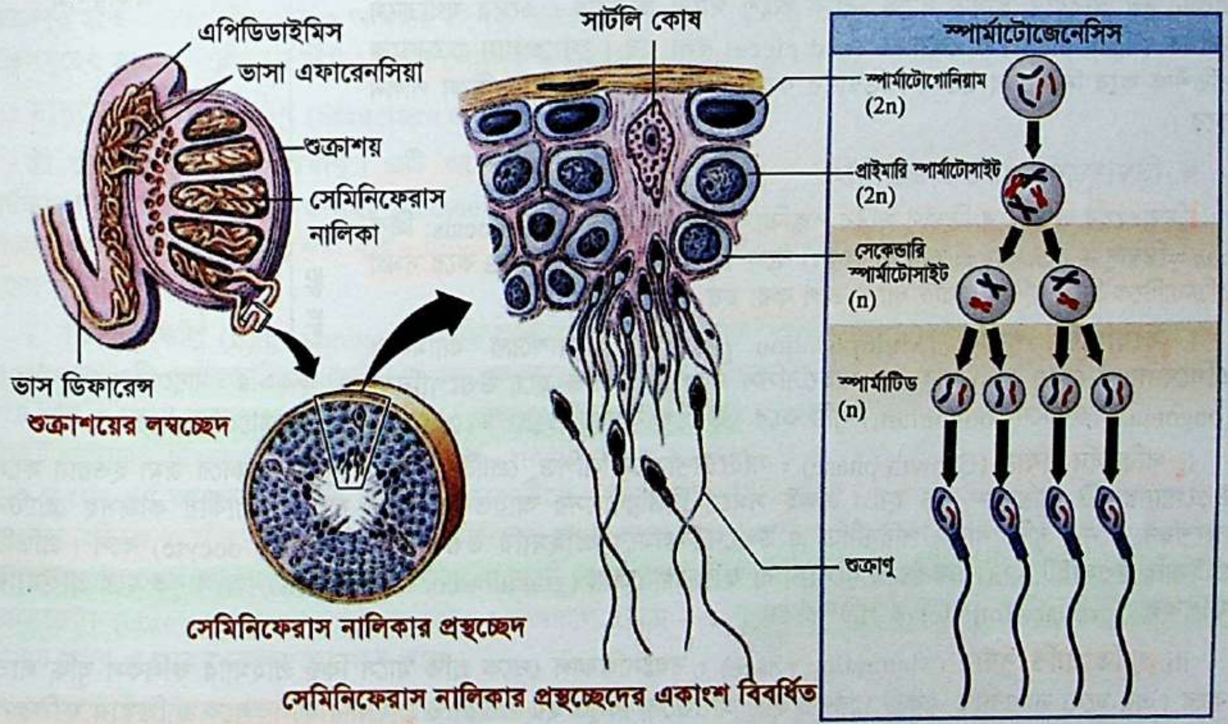

চিত্র ৯.৪ : শুক্রাশয়ের অভ্যন্তরে স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়

iv. স্পার্মিওজেনেসিস (Spermiogenesis) : যে জটিল প্রক্রিয়ায় চলাচলে অক্ষম, গোলাকার স্পার্মাটিড ধারাবাহিক ও সম্পূর্ণ আঙ্গিক পরিবর্তনের মাধ্যমে, আর কোন বিভাজন ছাড়াই সচল শুক্রাণুতে পরিণত হয় তার নাম স্পার্মিওজেনেসিস। প্রথমে স্পার্মাটিডের নিউক্লিয়াসটি পানি, RNA ও নিউক্লিয়াস পরিত্যাগ করে সঙ্কুচিত হয় এবং শুক্রাণুর মাথা গঠন করে। স্পার্মাটিডে গলজি বডি থেকে অ্যাক্রোসোম (acrosome) সৃষ্টি হয়ে শুক্রাণুর মাথায় টুপির মতো অবস্থান করে। স্পার্মাটিডের সেন্ট্রিওল শুক্রাণুর অক্ষীয় সূত্রক ও লেজ গঠন করে। এভাবে স্পার্মাটিড রূপান্তরিত সচল, লম্বাকৃতির ও প্রায় সাইটোপ্লাজমবিহীন শুক্রাণুতে পরিণত হয়। এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে ৬০-৭০ দিন সময় লাগে।

মানুষের শুক্রাণুর গঠন (Structure of Human sperm)

একটি শুক্রাণুদেহ চারটি প্রধান অংশে বিভক্ত। এসব অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেয়া হলো।

i. মাথা : মাথা হচ্ছে শুক্রাণুর সামনের অংশ যা দেখতে স্ফীতকায়, কোণাকৃতি বা লেন্সের মত। শুক্রাণুর সম্পূর্ণ মাথা একটি পাতলা সাইটোপ্লাজমীয় স্তরে আবৃত থাকে। মাথার সাইটোপ্লাজমের অধিকাংশ জুড়ে থাকে একটি ডিম্বাকার নিউক্লিয়াস। এতে ক্রোমোজোম (n সংখ্যক) থাকায় পিতার বংশগতি সন্তানে সঞ্চারিত হয়। এর সামনের অর্ধেক অংশের উপরে নিউক্লিয়াসকে ঢেকে থাকে অ্যাক্রোসোম। অ্যাক্রোসোম একটি থলি বিশেষ। অ্যাক্রোসোমে উপস্থিত টিস্যু গলনকারী এনজাইমসমূহ ডিম্বাণুর ঝিল্লি ভেদ করে ভিতরে প্রবেশে সাহায্য করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ii. **গ্রীবা** (Neck) : গ্রীবা হচ্ছে শুক্রাণুর মাথার ঠিক পেছনে মাথা ও মধ্যখন্ডের মাঝখানে অবস্থিত একটি সরু, স্বচ্ছ সংযোগস্থল। এখানে পরস্পরের সাথে সমকোণে দুটি **সেন্ট্রিওল** থাকে।

iii. **মধ্য খন্ড** (Middle piece) : সাইটোপ্লাজম, মাইটোকন্ড্রিয়া এবং অক্ষীয় সূত্রে গঠিত অংশটি হচ্ছে শুক্রাণুর মধ্য খন্ড। এর মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়ার অংশই বেশি। মাইটোকন্ড্রিয়া ফ্ল্যাজেলাম সঞ্চালনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দেয়।

iv. **লেজ বা ফ্ল্যাজেলাম** (Tail or Flagellum) : শুক্রাণুর মধ্যখণ্ডের সাইটোপ্লাজম ও মাইটোকন্ড্রিয়ার সমাপ্তির অংশ থেকে শুরু করে পেছনের সবটুকুই লেজ বা ফ্ল্যাজেলাম। এটি শুক্রাণুর দীর্ঘতম অংশ। এতে অক্ষীয় সূত্রের এক অংশ একটি স্থূল আবরণে আবৃত থাকে, বাকি অংশ থাকে অনাবৃত। এদের যথাক্রমে **মূলখন্ড** (main piece) ও **শেষখন্ড** (end piece) বলা হয়। ফ্ল্যাজেলাম শুক্রাণুকে গতিশীল করে নিষেকের উদ্দেশে ডিম্বাণুর কাছে পৌছাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

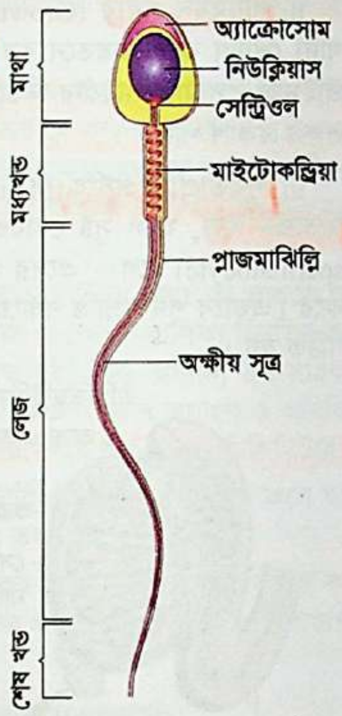

চিত্র ৯.৫ : মানুষের শুক্রাণু গঠন

খ. ডিম্বাণুজনন বা উওজেনেসিস

ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে ডিম্বাণু সৃষ্টির পদ্ধতিকে **উওজেনেসিস** (oogonesis; গ্রিক *oon* =ডিম্বাণু + *genesis* = সৃষ্টি বা জনন) বলে। ক্রমবর্ধনের উপর ভিত্তি করে সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে নিচে বর্ণিত চারটি ধাপে ভাগ করা হয়।

i. **সংখ্যাবৃদ্ধি পর্যায়** (Multiplication phase) : ডিম্বাশয়ের জার্মিনাল এপিথেলিয়াল কোষ (2n) বার বার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হয়ে **উওগোনিয়া** (oogonia, একবচনে- oogonium) সৃষ্টি করে। উওগোনিয়ামে ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে।

ii. **পরিবর্ধন পর্যায়** (Growth phase) : সাইটোপ্লাজমে লিপিড, প্রোটিন ইত্যাদি কুসুম আকারে জমা হওয়ার ফলে উওগোনিয়ামটি আয়তনে বড় হয়। একই সময়ে নিউক্লিয়াসের আয়তনও বেড়ে যায়। বিপাকীয় কাজসহ প্রোটিন সংশ্লেষণ অনেক বৃদ্ধি পায়। পরিবর্ধিত এ উওগোনিয়ামকে **প্রাইমারি উওসাইট** (primary oocyte) বলে। প্রতিটি **প্রাইমারি উওসাইট** (2n) একস্তর **গ্রানুলোসা বা ফলিকল কোষ** (granulosa or follicle cells)-এ আবৃত হয়ে **প্রাইমারি ফলিকল** (primary follicle)-এ পরিণত হয়।

iii. **পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায়** (Maturation phase) : বয়ঃসন্ধিকাল থেকে প্রতি মাসে কিছু প্রাইমারি ফলিকল বৃদ্ধি লাভ করে। এর মধ্যে সাধারণত একটি পরিণত হয়, অন্যগুলো বিলুপ্ত হয়। পরিণত প্রাইমারি ফলিকলকে **গ্রাফিয়ান ফলিকল**

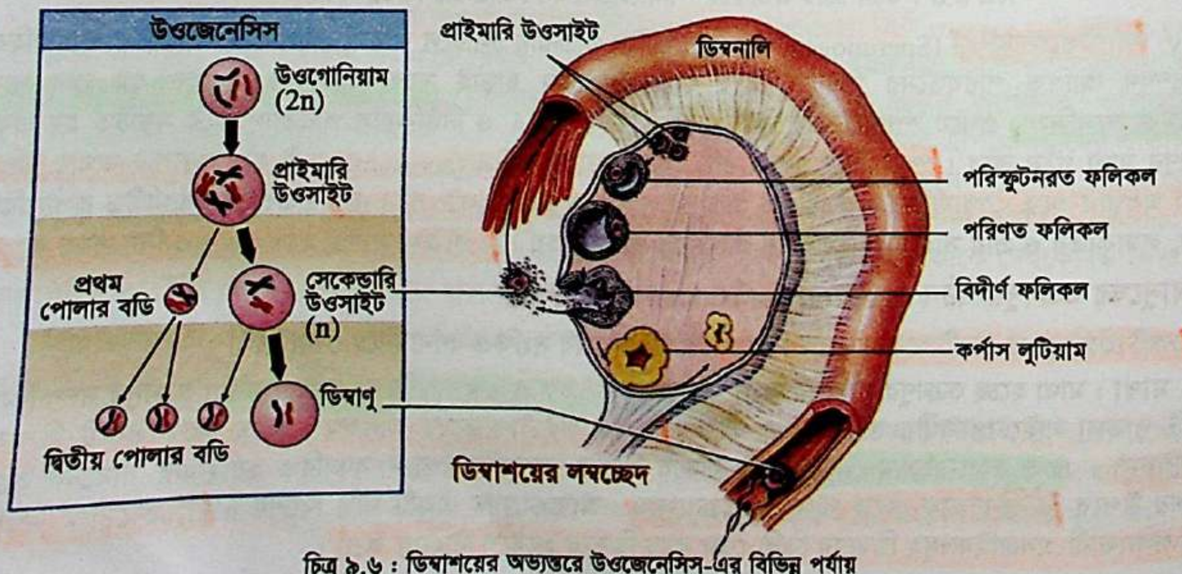

চিত্র ৯.৬ : ডিম্বাশয়ের অভ্যন্তরে উওজেনেসিস-এর বিভিন্ন পর্যায়

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

(graafian follicle) বলে। বৃদ্ধিরত প্রাইমারি ফলিকলের অভ্যন্তরস্থ প্রাইমারি উওসাইট প্রথম মিয়োটিক বিভাজন-এর মাধ্যমে দুটি অসম কোষ উৎপন্ন করে। বড় কোষটিকে সেকেন্ডারি উওসাইট (secondary oocyte, n) এবং ছোট কোষটিকে ১ম পোলার বডি (1st polar body) বলে। এরপর ১ম পোলার বডি মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে দুটি পোলার বডি তৈরি করে। অন্যদিকে, সেকেন্ডারি উওসাইটটি নিষেকের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। সেকেন্ডারি উওসাইট অবস্থায় ডিম্বপাত বা ওভিউলেশন (ovulation) ঘটে। নিষেকের সময় কোন শুক্রাণু ডিম্বাণুর জোনা পেলুসিডা ভেদ করতে পারলে তখন সেকেন্ডারি উওসাইটে দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন সম্পন্ন হয়। এ বিভাজনে সেকেন্ডারি উওসাইটটি অসমভাবে বিভক্ত হয়ে একটি বড় হ্যাপ্লয়েড উওটিড (ootid) ও একটি ছোট পোলার বডি (n) সৃষ্টি করে। এভাবে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যায়ে একটি প্রাইমারি উওসাইট থেকে একটি বড় উওটিড ও তিনটি ছোট পোলার বডি সৃষ্টি হয়।

iv. **রূপান্তর পর্যায় :** এ পর্যায়ে উওটিড রূপান্তরিত হয়ে কার্যকর **ওভাম** (ovum) বা **ডিম্বাণু**-তে পরিণত হয়। তবে শুক্রাণুর মতো এক্ষেত্রে আকৃতি ও আকারে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে না। কেবল নিষেকের প্রস্তুতি লাভের জন্য এর ভিতরের বস্তুসমূহের সামান্য পরিবর্তন ঘটে। সকল পোলার বডি বিনষ্ট হয়ে পরিত্যক্ত হয়।

মানুষের ডিম্বাণুর গঠন (Structure of Human ovum or egg)

স্ত্রী জননকোষের নাম **ডিম্বাণু**। এটি অনেকটা গোল এবং ১০৪-১২০ মাইক্রোমিটার ব্যাসবিশিষ্ট। ডিম্বাশয়ের গ্রাফিয়ান ফলিকলের ভিতর **উওসাইট** (oocyte) বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে পরিণত ডিম্বাণুতে রূপ নেয়। প্রতিটি পরিপক্ক ডিম্বাণুকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। যথা : **ডিম্বাণু ঝিল্লি, নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম**। নিচে এদের বর্ণনা দেয়া হলো।

i. **ডিম্বাণু ঝিল্লি** (Egg membrane) : ডিম্বাশয় থেকে যে ডিম্বাণুর নির্গমন ঘটে তা সম্পূর্ণ পরিণত ডিম্বাণু নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি **সেকেন্ডারি উওসাইট** যা আরেক দফা বিভাজনের মাধ্যমে (দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন) দ্বিতীয় পোলার বডি সৃষ্টি ও ত্যাগ করবে। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ ডিম্বাণু গ্লাইকোপ্রোটিন সমৃদ্ধ **জোনা পেলুসিডা** (zona pellucida) নামক একটি প্রাইমারি আবরণে দৃঢ়ভাবে আবৃত থাকে। পরবর্তী সময়ে চারদিকে জোনা পেলুসিডা ও সাইটোপ্লাজমের মধ্যবর্তী স্থান তরলে পূর্ণ জায়গায় পরিবৃত হয়। এ জায়গাটিকে **পেরিভাইটেলাইন ফাঁক** (perivitelline space) বলে। প্রথম পোলার বডিকে এ ফাঁকা স্থানে দেখা যায়। ডিম্বাশয় থেকে যখন ডিম্বাণু মুক্ত হয় তখন জোনা পেলুসিডা চারদিক ঘিরে ফলিকল কোষের স্তর বহন করে আনে। এ স্তরটি **করোনা রেডিয়েটা** (corona radiata) নামে পরিচিত। ডিম্বনালি বেয়ে নামার সময় এ স্তরের কোষগুলো খসে পড়ে।

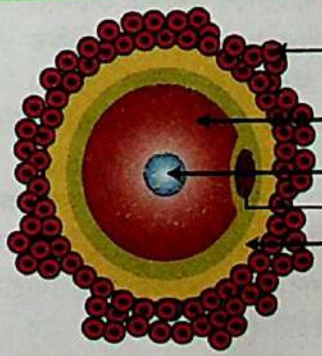

চিত্র ৯.৭ : মানুষের ডিম্বাণু

ii. **সাইটোপ্লাজম বা উওপ্লাজম** (ooplasm) : ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজম উওপ্লাজম নামে পরিচিত। এতে প্রচুর গলজি বডি, মাইটোকন্ড্রিয়া, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ও কর্টিক্যাল গ্রানিউল (cortical granule) থাকে। মানুষের ডিম্বাণুতে কুসুমের পরিমাণ অতি সামান্য। সাইটোপ্লাজমে কুসুম সমানভাবে ছড়ানো থাকে। তাই মানুষের ডিম্বাণুকে **মাইক্রোলেসিথাল ডিম্বাণু** (microlecithal egg) বলে।

iii. **নিউক্লিয়াস** (Nucleus) : ডিম্বাণুর নিউক্লিয়াস বেশ বড়, তবে কেন্দ্র থেকে একটু সরে অবস্থান করে। নিষেকের সময় নিউক্লিয়াসটি কেন্দ্রে আসে। নিউক্লিয়াসে প্রচুর RNA ও ২৩টি ক্রোমোজোম থাকে।

গ্যামেটোজেনেসিস এর তাৎপর্য

১. যৌন জননে অংশগ্রহণকারী জীব গ্যামেটোজেনেসিসের মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ক্রোমোজোম সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখে। গ্যামেটোজেনেসিস ছাড়া জেনেটিক ভারসাম্যযুক্ত অপত্য জীব সৃষ্টি সম্ভব হতোনা।

২. গ্যামেটোজেনেসিসের সময় মিয়োসিস বিভাজন সংঘটিত হয়। এ সময় ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন জেনেটিক গঠন বিশিষ্ট জনন কোষ উৎপন্ন হয়, যা জীবজগতে প্রকরণের উদ্ভব ঘটায়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৩. উওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় প্রতিমাসে সাধারণত একটি নিশ্চল ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে স্পার্মাটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় প্রতিদিন কোটি কোটি সচল শুক্রাণু উৎপন্ন হয়। এটি নিষেক ঘটার সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করে এবং প্রজাতির ধারা অব্যাহত রাখে।

৪. ডিম্বাণুতে সঞ্চিত কুসুম নিষেক পরবর্তী ভ্রূণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির যোগান দেয়।

৪. নিষেক (Fertilization)

মানবদেহে যে নিষেক ঘটে তা প্রকৃতপক্ষে সেকেন্ডারি উওসাইট ও পরিণত শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসের একীভবন। এ প্রক্রিয়ার ধাপগুলো নিম্নরূপ।

i. স্খলিত শুক্রাণুগুলোর অ্যাক্রোসোম থেকে হায়ালিউরোনিডেজ (hyaluronidase) নামক এনজাইম ক্ষরিত হয়। ডিম্বাণুর চারদিকে অবস্থিত ফলিকল কোষগুলো যে সব পদার্থের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত থাকে সে সব পদার্থকে এ এনজাইম পরিপাকের মাধ্যমে শুক্রাণুর গমন পথের সৃষ্টি করে।

ii. গমন পথ ধরে শুক্রাণুর লেজের সাহায্যে চালিত হয়ে ডিম্বাণুর জোনা পেলুসিডার বহির্দেশে পৌঁছে (সেকেন্ডারি উওসাইটের চতুর্দিক ঘিরে অবস্থিত পুরু স্তরকে জোনা পেলুসিডা বলে)। এ স্তরে অবস্থিত বিশেষ সংগ্রাহক প্রোটিনে শুক্রাণুর মস্তক-ঝিল্লির সংগ্রাহকগুলো বন্ধনের সৃষ্টি করে।

iii. বন্ধনের ফলে উদ্দীপ্ত হয়ে শুক্রাণু-মস্তক আরেক ধরনের এনজাইম ক্ষরণ করে। এ এনজাইম জোনা পেলুসিডার অংশকে হজম করে একটি পথের সৃষ্টি করে। এ পথ ধরে শুক্রাণু ডিম্বাণু-ঝিল্লির বহির্তলে এসে পৌছায়। এর মস্তকটি ডিম্বাণুর ভিলাই-সমৃদ্ধ প্লাজমামেমব্রেনের সাথে একীভূত হয় এবং ডিম্বাণুর সাইপ্লোজমে প্রবেশ করে।

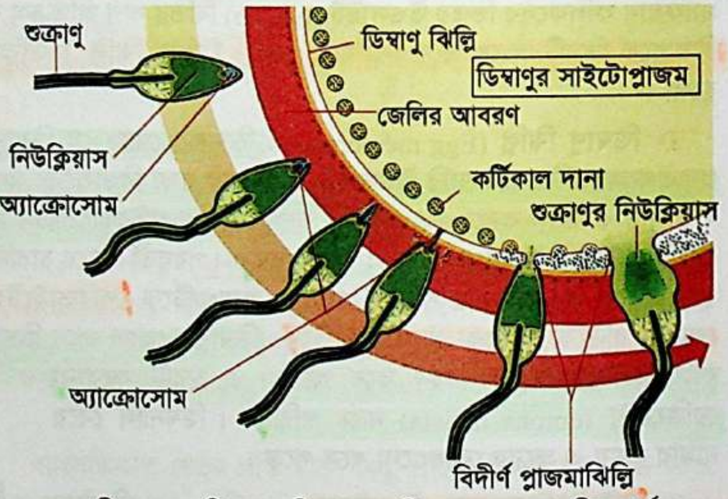

চিত্র ৯.৮ : নিষেক প্রক্রিয়ায় একটি শুক্রাণুর ধারাবাহিক পর্যায়

iv. শুক্রাণু-মস্তক ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশের সাথে সাথে ডিম্বাণুর বহির্দেশে অবস্থিত কর্টিকাল দানা (cortical granules) নামে পরিচিত লাইসোজোমগুলো এনজাইম ক্ষরণ করে। এনজাইমের প্রভাবে জোনা পেলুসিডা পুরু ও শক্ত হয়ে নিষেক ঝিল্লি (fertilization membrance) নির্মাণ করে। ফলে আর কোনো শুক্রাণু নিষেকে অংশ নিতে পারে না। তাছাড়া, এনজাইমের প্রভাবে জোনা পেলুসিডা শুক্রাণু-গ্রাহক প্রোটিনগুলোও নষ্ট হয়ে যায়, ফলে কোনো শুক্রাণুই আর জোনা পেলুসিডায় যুক্ত হতে পারে না।

v. শুক্রাণু প্রবেশের ফলে সেকেন্ডারি উওসাইটটি উদ্দীপ্ত হয়ে দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজন (মিয়োসিস-২) ঘটিয়ে পরিণত ডিম্বাণু ও দ্বিতীয় পোলার বডি সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় পোলার বডি দ্রুত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং শুক্রাণু লেজ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে মিশে যায়। এ সময় শুক্রাণু-নিউক্লিয়াসে ক্রোমাটিনগুলো ঢিলে-ঢালা হয়ে পড়ে, ফলে নিউক্লিয়াসটি স্ফীত হয়। এ পর্যায়ের শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসকে যথাক্রমে **পুরুষ** ও **স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াই** (male and female pronuclei) বলে।

vi. পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসটি ডিম্বাণুর কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয়ে স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াসের সাথে একীভূত হলে ডিম্বাণুটি ডিপ্লয়েড জাইগোট ($n + n = 2n$)-এ পরিণত হয়।

নিষেকের গুরুত্ব বা তাৎপর্য

যৌন জননকারী প্রাণিদের জন্য নিষেক অত্যন্ত তাৎপর্য পূর্ণ। নিচে নিষেকের কয়েকটি তাৎপর্য উল্লেখ করা হলো–

১. নিষেক পিতা-মাতার বৈশিষ্ট্যকে সমন্বিত করে।

২. নিষেকের ফলে জাইগোটে জিনের নতুন সমন্বয় ঘটে এবং এতে জীবে প্রকরণের সূচনা হয়।

৩. নিষেকের ফলে ডিম্বাণু পরবর্তী পর্যায়ের বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৪. নিষেক জীবের ডিপ্লয়েড সংখ্যাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে।
৫. নিষেক ডিম্বাণুর বিপাক হার ও প্রোটিন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করে।
৬. নিষেকের মাধ্যমে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়।
৭. নিষেক জীবের বংশ রক্ষার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করে।

৫. গর্ভধারণ বা ইমপ্ল্যান্টেশন (Implantation)

নিষেকের পর ৬ থেকে ৯ দিনের মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় জাইগোটটি ব্লাস্টোসিস্ট অবস্থায় জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে (স্তন্যপায়ী প্রাণীর জরায়ুর অন্তর্গাত্রে অবস্থিত রক্তবাহিকা ও গ্রন্থিসমৃদ্ধ স্থূল মিউকাস ঝিল্লি) সংস্থাপিত হয় তাকে **গর্ভধারণ** বা **ইমপ্ল্যান্টেশন** বলে।

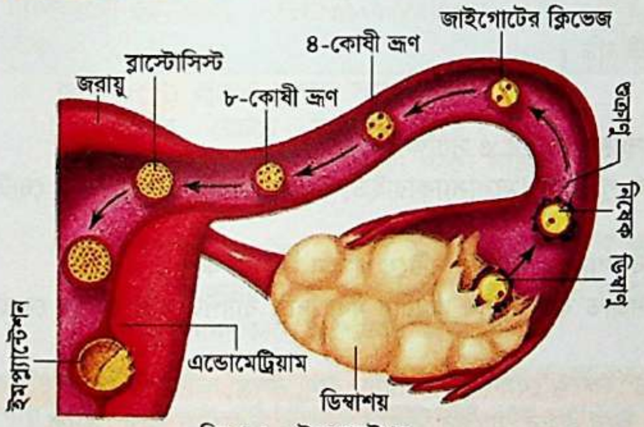

চিত্র ৯.৯ : ইমপ্ল্যান্টেশন

ডিম্বাণু ডিম্বনালির (ফেলোপিয়ান নালি) ঊর্ধ্বপ্রান্তে নিষিক্ত হয়ে জাইগোটে পরিণত হয়। এটি দ্রুত বিভক্ত হয়ে **মরুলা** (morula) নামক একটি নিরেট কোষপুঞ্জের সৃষ্টি করে এবং ডিম্বনালির সিলীয় আন্দোলন ও ক্রমসংকোচনের ফলে নিম্নগামী হয়। জাইগোটের পর্যায়ক্রমিক মাইটোসিস বিভাজনকে **ক্লিভেজ** (cleavage) বলে। নিরেট কোষপুঞ্জটি ডিম্বনালি থেকে সংগৃহীত তরলে পূর্ণ অন্তঃস্থ গহ্বর (ব্লাস্টোসিল) সমন্বিত ও এককোষস্তরীয় **ব্লাস্টোসিস্ট** (blastocyst)-এ পরিণত হয়। ব্লাস্টোসিস্টে প্রায় ১০০টির মতো কোষ থাকে। প্রতিটি কোষকে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere) বলে। ব্লাস্টোমিয়ারের স্তরকে বলে **ট্রফোব্লাস্ট** (trophoblast)। ৪-৫ দিনের ভিতর ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুতে এসে পৌঁছালে দুদিনের মধ্যে এর জোনা পেলুসিডা আবরণ অদৃশ্য হয়ে যায়। তখন ট্রফোব্লাস্ট কোষ ও জরায়ুর এন্ড্রোমেট্রিয়াম (ভিতরের প্রাচীর) কোষের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয়। ব্লাস্টোসিস্ট এন্ডোমেট্রিয়ামের যেখানে প্রোথিত হবে সেখানকার আবরণী টিস্যু ট্রফোব্লাস্ট থেকে নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে বিগলিত হয়। তখন ব্লাস্টোসিস্টটি সেখানে যুক্ত হয়। এভাবে নিষেকের ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম দিনের মধ্যে নিষিক্ত ডিম্বাণু বা জাইগোটটি ব্লাস্টোসিস্ট অবস্থায় জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে আবদ্ধ হয়। জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে ব্লাস্টোসিস্টের প্রোথিত হওয়ার এ প্রক্রিয়ার নামই **ইমপ্ল্যান্টেশন**।

অমরা বা প্লাসেন্টা (Placenta)

ভ্রূণীয় ও মাতৃটিস্যুতে গঠিত যে চাকতির মতো গঠন ফিটাস ও মাতৃদেহে বিভিন্ন পদার্থের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে **অমরা বা প্লাসেন্টা** বলে। এটি কোরিওন-এর একটি অংশ যার মাধ্যমে ফিটাস ও মায়ের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হয়। নিষেকের ১২ সপ্তাহ পরে প্লাসেন্টা গঠিত হয় [৮ সপ্তাহ পর ভ্রূণ যখন প্রায় মানুষের অবয়ব লাভ করে তখন তাকে **ফিটাস** (fetus) বলে]।

অমরায় ফিটাসের অংশ হচ্ছে **কোরিওনিক কোষ** (chorionic cell)। কোষগুলো **কোরিওনিক ভিলাই** (chorionic villi) সৃষ্টি করে। আম্বিলিকাল ধমনি ও শিরা নামক দুটি রক্ত বাহিকা এসব ভিলাইয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে কৈশিক জালিকা নির্মাণ করে। প্রধান রক্তবাহিকাদুটি নাভীরজ্জু **বা আম্বিলিকাল কর্ড** (umbilical cord) নামক ৪০-৫০ সেমি. লম্বা একটি শক্ত গড়নের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করে। অ্যামনিওন ও কোরিওন উদ্ভূত কোষে কর্ডটি বেষ্টিত থাকে।

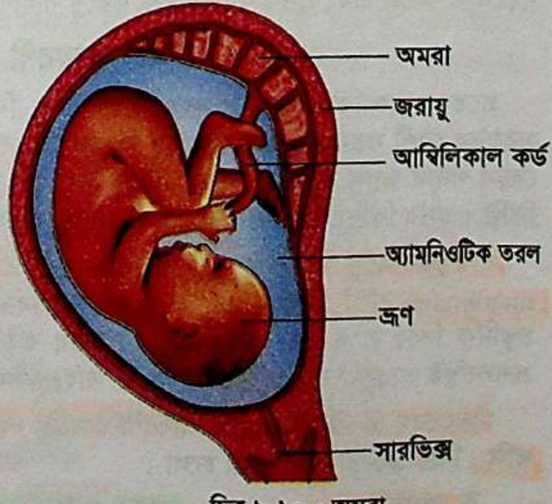

চিত্র ৯.১০ : অমরা

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

অমরায় মাতৃদেহের অংশ হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়ামের প্রবর্ধনসমূহ। এসব প্রবর্ধন কোরিওনিক ভিলাইয়ের মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে আর্টারিওল (সূক্ষ্ম ধমনি) থেকে আগত ধমনি-রক্তে পূর্ণ স্থান। এসব স্থান দিয়ে জরায়ু-প্রাচীরে রক্ত আর্টারিওল থেকে ভেনিউলে (সূক্ষ্ম শিরা) প্রবাহিত হয়।

অমরা চাকতি আকৃতির, বেশ বড় গঠন। পূর্ণ গঠিত অমরার ওজন প্রায় ৬০০ গ্রাম, ব্যাস ১৫–২০ সেমি. এবং মাঝখানে ৩ সেমি. পুরু।

অমরার মাধ্যমে ফিটাস ও মাতৃদেহের মধ্যে যে সকল বস্তুর আদান-প্রদান ঘটে তা নিম্নরূপ -

মাতা থেকে ফিটাস	ফিটাস থেকে মাতা
অক্সিজেন, গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, লিপিড, ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল, ভিটামিন, আয়ন (Na^+, K^+, Cl^-, Ca^{2+}, Fe^{2+}), অ্যালকোহল, নিকোটিন এবং অনেক ঔষধ, ভাইরাস, অ্যান্টিবডি।	কার্বন ডাইঅক্সাইড, ইউরিয়া, অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ।

অমরার কাজ

১. **সংস্থাপন :** অমরার সাহায্যে ভ্রূণ জরায়ু-প্রাচীরে সংস্থাপিত হয় ও সুরক্ষিত থাকে।

২. **পুষ্টি :** অমরা মায়ের রক্তস্রোত থেকে ভ্রূণের দেহে পুষ্টিদ্রব্য (মনোস্যাকারাইড, ডাইস্যাকারাইড, প্রোটিন ও ছোট ছোট লিপিড অণু) সরবরাহ করে।

৩. **গ্যাসীয় বিনিময় :** অমরা মাতৃদেহ ও ভ্রূণের মধ্যে গ্যাসীয় বিনিময় ঘটিয়ে শ্বসনে সাহায্য করে।

৪. **রেচন :** ভ্রূণের বিপাকীয় কাজে উদ্ভূত নাইট্রোজেনজাত বর্জ্য পদার্থ অমরার মধ্য দিয়ে ব্যাপিত হয়ে মায়ের দেহে প্রবেশ করে।

৫. **অনাক্রম্যতা :** মাতৃদেহের রক্তে কয়েকটি রোগের বিরুদ্ধে যেমন ডিপথেরিয়া, হাম, বসন্ত, স্কারলেট জ্বর প্রভৃতির জন্য উৎপন্ন অ্যান্টিবডি মাতৃদেহ থেকে ভ্রূণদেহে প্রবেশ করে ঐসব রোগের বিরুদ্ধে ভ্রূণকে অনাক্রম্য করে তোলে।

৬. **জীবাণু বহন :** কয়েক ধরনের ভাইরাসকে অমরা মাতৃদেহ থেকে ভ্রূণে প্রবেশ করতে দিয়ে ভ্রূণের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। [গর্ভকালীন সময়ে মা যদি সিফিলিস, হাম, জলবসন্ত, গুটিবসন্ত, রুবেলা এসব রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হয় তাহলে ঐ ভাইরাস ভ্রূণদেহে প্রবেশ করে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি বা অঙ্গহানি ঘটাতে পারে।]

৭. **ওষুধ সেবন :** চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ওষুধ মাতৃদেহ থেকে অমরার মাধ্যমে ব্যাপিত হয়ে ভ্রূণে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

৮. **সঞ্চয় :** অমরায় স্নেহ, গ্লাইকোজেন ও লৌহ সঞ্চিত থাকে।

৯. **হরমোন নিঃসরণ :** অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির মতো কাজ করে অমরা চার ধরনের হরমোন ক্ষরণ করে (এস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন, হিউম্যান প্লাসেন্টাল ল্যাকটোজেন ও হিউম্যান কোরিওনিক গোনাডোট্রপিন) জরায়ু-প্রাচীর ও স্তনগ্রন্থির গড়নে ও কাজে এবং প্রসব ঝামেলামুক্ত করণে সাহায্য করে।

ভ্রূণ আবরণী (Embryonic membrane)

প্রত্যেক প্রজাতিতে ভ্রূণের সহজ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপদ পরিস্ফুটনের ব্যবস্থা রয়েছে। মানবভ্রূণের ক্ষেত্রে প্রকৃতি সবচেয়ে বেশী যত্নবান হয়ে ভ্রূণের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটানোর যাবতীয় ব্যবস্থা করে দিয়েছে। পুষ্টি সরবরাহ, গ্যাসীয় বিনিময়, রেচন পদার্থ ত্যাগ ইত্যাদি কোনো প্রক্রিয়াই যেন বাধাগ্রস্ত না হয় তার জন্য ভ্রূণের চারদিকে সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলো ঝিল্লি। এসব ঝিল্লির উৎপত্তি সর্বপ্রথম সরিসৃপে ঘটলেও চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছে স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে।

পরিস্ফুটনকালে মানবভ্রূণ ৪টি ঝিল্লিতে বেষ্টিত থাকে। এগুলোকে **বহিঃভ্রূণীয় আবরণী** (extra embryonic membrane) নামে অভিহিত করা হয়। কারণ আবরণীগুলো ভ্রূণের আনুষঙ্গিক গঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়ে ভ্রূণদেহের চতুর্দিক ঘিরে রাখে এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় বর্জিত হয়। প্রাণিজগতের সরিসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীতে যে ভ্রূণসংশ্লিষ্ট আবরণী রয়েছে প্রকৃতপক্ষে তা বহিঃভ্রূণীয় আবরণী।

মানবভ্রূণে চারটি বহিঃভ্রূণীয় আবরণী রয়েছে, যথা–**ক. অ্যামনিওন, খ. অ্যালানটয়েস, গ. কোরিওন ও ঘ. কুসুম থলি**। নিচে এদের বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. অ্যামনিওন (Amnion) **:** ভ্রূণের এক্টোডার্ম ও মেসোডার্মের অংশগ্রহণে গঠিত যে থলি আকৃতির আবরণ জলীয় পদার্থে পূর্ণ থেকে ভ্রূণকে ঘিরে রাখে, তাকে **অ্যামনিওন** বলে। এতে কোনো রক্তবাহিকা থাকে না।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কাজ : (i) ভ্রূণকে শুষ্কতার হাত থেকে রক্ষা করে। (ii) ঝাঁকুনিজনিত আঘাত থেকে ভ্রূণকে রক্ষা করে। (iii) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সুষ্ঠু বিকাশে সাহায্য করে। (iv) তরলে পূর্ণ হওয়ায় বাইরের চাপ ভ্রূণদেহে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

খ. অ্যালানটয়েস (Allantois) : ভ্রূণীয় অন্ত্রের পশ্চাৎ অংশ মেসোডার্ম ও এন্ডোডার্মে গঠিত থলির মতো যে উপবৃদ্ধি সৃষ্টি হয়ে কোরিওনের নিচে বিন্যস্ত হয়, তাকে অ্যালানটয়েস বলে। এতে রক্তবাহিকা ও জালিকা থাকে। অ্যালানটয়েস বাইরের দিকে বর্ধিত ও কোরিওনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রক্তবাহিকা-সমৃদ্ধ **অ্যালানটো-কোরিওন** (allanto-chorion) সৃষ্টি করে।

কাজ : (i) ভ্রূণের শ্বসনে সাহায্য করে। (ii) ভ্রূণের রেচনে সাহায্য করে। (iii) অ্যালানটো-কোরিওন অমরা গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

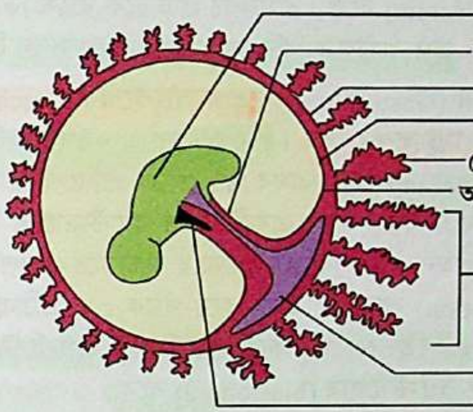

চিত্র ৯.১১ : ভ্রূণ আবরণী

গ. কোরিওন (Chorion) : ভ্রূণের সর্ববহিঃস্থ আবরণ যা এক্টোডার্ম ও মেসোডার্মে গঠিত হয়, তাকে **কোরিওন** বলে।

কাজ: (i) অ্যালানটয়েসের সঙ্গে মিলিতভাবে শ্বসনে ও পুষ্টি সরবরাহে সাহায্য করে।
(ii) অমরা গঠনে অংশগ্রহণ করে।

ঘ. কুসুম থলি (Yolk sac) : ভ্রূণের মধ্যান্ত্রের সংগে যুক্ত এবং এন্ডোডার্ম ও মেসোডার্মে গঠিত অপেক্ষাকৃত ছোট থলি আকৃতির তরলে পূর্ণ ঝিল্লিকে **কুসুম থলি** বলে। মানবভ্রূণের পুষ্টি কুসুম নির্ভর না হলেও সরিসৃপ, পাখি প্রভৃতির প্রচুর কুসুমযুক্ত ডিমে ভ্রূণের পরিস্ফুটনের সময় যে ধরনের কুসুম থলি সৃষ্টি হয়, মানবভ্রূণেও তেমনটি হয়।

কাজ : কুসুম থলি স্টেম কোষ (stem cell)-এর উৎস হিসেবে কাজ করে। এসব কোষ থেকে রক্তকণিকা ও লিম্ফয়েড কোষ উৎপন্ন হয়। স্টেম কোষগুলো পরবর্তীতে বর্ধনশীল ভ্রূণে প্রবেশ করে। তাই কুসুম থলি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝিল্লি।

৬. মানব ভ্রূণের পরিস্ফুটন (Development of the Human Embryo)

নিষেকের পর জাইগোট (2n) যে প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শিশু বা লার্ভায় পরিণত হয় তাকে **পরিস্ফুটন** বলে। প্রতিটি সদস্যের পরিস্ফুটন প্রক্রিয়াকে **ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটন** (ontogenic development) বলা হয়। যে শাখায় জীবের ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটন সম্বন্ধে অধ্যয়ন করা হয়, তাকে **ভ্রূণবিদ্যা** (embryology) বলে। জাইগোট থেকে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় **এমব্রায়োজেনেসিস** (embryogenesis)। ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুটনের ধাপগুলো নিম্নরূপ।

❑ **ক্লিভেজ** (Cleavage) : যে প্রক্রিয়ায় জাইগোট মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে বিভাজিত হয়ে অসংখ্য ভ্রূণকোষ সৃষ্টি করে তাকে ক্লিভেজ বা **সম্ভেদ** বলে। ক্লিভেজে সৃষ্ট ভ্রূণের প্রতিটি কোষকে বলে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere)।

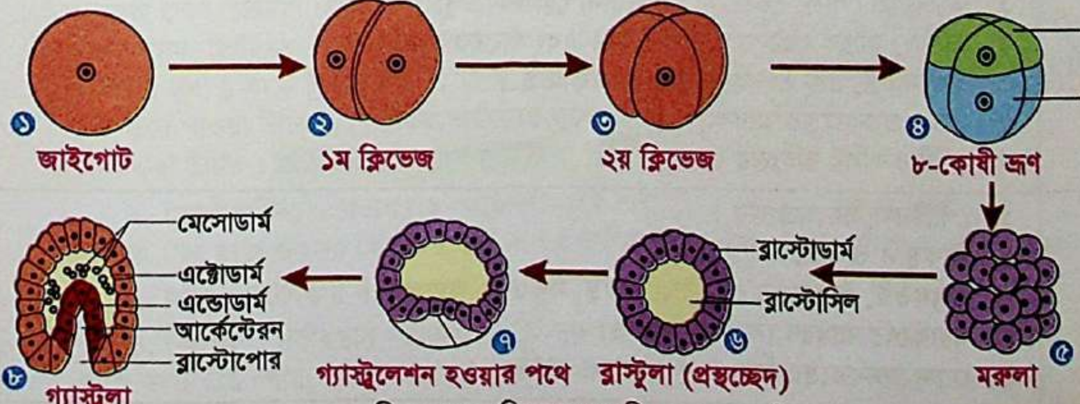

চিত্র ৯.১২ : ক্লিভেজ ও ভ্রূণীয় কোষস্তর গঠন

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ক্লিভেজ প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত কোষ বিভাজনের ফলে জাইগোটটি বহুকোষী নিরেট গোলকে পরিণত হয়। এর নাম **মরুলা** (morula)। মরুলার কোষগুলো ক্রমশ একস্তরে সজ্জিত হয় এবং এর ভিতরে একটি তরলপূর্ণ গহ্বর সৃষ্টি হয়। ভ্রূণের এ দশাকে **ব্লাস্টুলা** (blastula) বলে। ব্লাস্টুলার প্রাচীরকে **ব্লাস্টোডার্ম** (blastoderm) এবং তরলপূর্ণ গহ্বরকে **ব্লাস্টোসিল** (blastocoel) বলে। ভ্রূণ বাস্টুলায় পরিণত হওয়ার সাথে সাথে ক্লিভেজ দশার পরিসমাপ্তি ঘটে।

❑ **গ্যাস্ট্রুলেশন** (Gastrulation) : ভ্রূণে **আর্কেন্টেরন** (archenteron) নামক প্রাথমিক খাদ্যগহ্বর বা আন্ত্রিকগহ্বর সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে **গ্যাস্ট্রুলেশন** বলে। পরিস্ফুটনের এ ধাপে ব্লাস্টোডার্ম দুই বা তিনটি কোষস্তর গঠন করে। এদের বলে **ভ্রূণীয় স্তর** (germinal layers)। এসব স্তর থেকে প্রাণিদেহের বিভিন্ন অঙ্গ গঠিত হয়। এ পর্যায়ে ভ্রূণীয় স্তরগুলোতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়, ফলে একটি অংশ ব্লাস্টোডার্মের পিঠেই রয়ে যায়। পরবর্তীতে একে **এক্টোডার্ম** নামে অভিহিত করা হয়। অন্য অংশ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করে **মেসোডার্ম** ও **এন্ডোডার্ম**-এ পরিণত হয়। কোষ পরিযানের (migration) কারণেই এসব হয়ে থাকে। এ প্রক্রিয়া শেষ হলে ভ্রূণ যে রূপ ধারণ করে তাকে **গ্যাস্ট্রুলা** (gastrula) বলে। এর ভিতরে যে গহ্বর থাকে তাকে **আর্কেন্টেরন** (archenteron), আর গহ্বরটি যে ছিদ্রপথে বাইরে উন্মুক্ত থাকে, তাকে **ব্লাস্টোপোর** (blastopore) বলে।

❑ **অর্গানোজেনেসিস** (Organogenesis) : গ্যাস্ট্রুলেশনে সৃষ্ট ভ্রূণীয় স্তরগুলো থেকে **ভ্রূণের অঙ্গকুঁড়ি** (organ rudiment) সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে অর্গানোজেনেসিস বলে। তিনটি ভ্রূণীয় স্তরেরই অভিন্ন কোষপিন্ড ছোটো ছোটো কোষগুচ্ছে বিচ্ছিন্ন হয়। প্রত্যেক গুচ্ছ প্রাণিদেহের নির্দিষ্ট অঙ্গ বা অংশ নির্মাণ করে। এসব কোষগুচ্ছকে একেকটি অঙ্গের **কুঁড়ি** বলে। যে সব কুঁড়িতে ভ্রূণীয় স্তরগুলোর উপবিভক্তি ঘটে সেগুলোকে **প্রাইমারি অঙ্গকুঁড়ি** বলে। এদের কয়েকটি বেশ জটিল এবং এমন কতকগুলো কোষ নিয়ে গঠিত যারা একটি সম্পূর্ণ অঙ্গতন্ত্র গঠনেও সক্ষম। যেমন–সমগ্র স্নায়ুতন্ত্র কিংবা পৌষ্টিকতন্ত্র ইত্যাদি। প্রাইমারি অঙ্গকুঁড়ি আরও বিভক্ত হয়ে **সেকেন্ডারি অঙ্গকুঁড়ি**–তে পরিণত হয়। পরবর্তীতে অঙ্গকুঁড়ি আরও বিকশিত হয়ে প্রাণীর নির্দিষ্ট অঙ্গ গঠন করে।

তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি (Fate of three Germ Layers)

গ্যাস্ট্রুলেশনের ফলে সৃষ্ট **এক্টোডার্ম, মেসোডার্ম** এবং **এন্ডোডার্ম** ভ্রূণের গঠন ও বিকাশের যাবতীয় উপাদানের উৎস। নিচে ছকের মাধ্যমে তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি উল্লেখ করা হলো।

তিনটি ভ্রূণীয় স্তরের পরিণতি

ভ্রূণীয় স্তর	পূর্ণাঙ্গ প্রাণিদেহে যে অংশ গঠিত হয়
এক্টোডার্ম	১. ত্বকের এপিডার্মাল অংশ এবং ত্বকীয় গ্রন্থি, চুল, পালক, নখ, ক্ষুর, এক ধরনের শিং ও আঁইশ। ২. চোখ ও **অন্তঃকর্ণ**। ৩. পায়ুর আবরণ। ৪. দাঁতের এনামেলসহ মৌখিক গহ্বর। ৫. সমগ্র **স্নায়ুতন্ত্র** ও কিছু পেশি।
মেসোডার্ম	১. অধিকাংশ **পেশি**; মেদটিস্যু ও অন্যান্য যোজক টিস্যু। ২. ডার্মিস, কয়েক ধরনের আঁইশ ও শিং এবং দাঁতের ডেন্টিন। ৩. **কঙ্কালতন্ত্র, রক্ত সংবহনতন্ত্র** ও **লসিকাতন্ত্র**। ৫. রেচন-জননতন্ত্রের অধিকাংশ। ৭. পৌষ্টিকনালির বহিঃস্তর।
এন্ডোডার্ম	১. পৌষ্টিকনালির অন্তঃস্তর। ২. পাকস্থলি ও অন্ত্রের গ্রন্থিসমূহ। ৩. **শ্বসনতন্ত্র**, থাইরয়েড ও থাইমাস গ্রন্থি, যকৃত ও অগ্ন্যাশয়। ৪. মধ্যকর্ণের আবরণ (কখনও কখনও)। ৫. রেচন-জননতন্ত্রের কিছু অংশ (কখনও কখনও)।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৭. ভ্রূণ ও ফিটাসের বিকাশ (Development of Embryo and Fetus)

মায়ের জরায়ুতে ভ্রূণ সংস্থাপিত হওয়ার পর থেকে গর্ভকালীন ৮ম সপ্তাহের শিশুকে ভ্রূণ এবং এর পর থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শিশুকে ফিটাস বলে। মাতৃগর্ভে শিশু প্রায় ৯ মাস (৩৬-৪০ সপ্তাহ) থাকে এবং ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়। এসময় যেসব পরিবর্তন ঘটে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

১ম সপ্তাহ : নিষেক, ক্লিভেজের ফলে নিষেকের ৪–৫ দিন পর ব্লাস্টোসিস্টের উৎপত্তি। কোষ সংখ্যা ১০০ এর অধিক। ৬-৯ দিন পর ইমপ্ল্যান্টেশন।

২য় সপ্তাহ : এক্টোডার্ম, এন্ডোডার্ম ও মেসোডার্ম গঠন। এ পর্যায়ের পর মানব ভ্রূণ নিয়ে গবেষণা নিষিদ্ধ।

৩য় সপ্তাহ : গর্ভবতীর মাসিক বন্ধ। গর্ভাবস্থায় এটিই প্রথম লক্ষণ। মেরুদণ্ড, মস্তিষ্ক এবং স্পাইনাল কর্ডের উৎপত্তি শুরু। ভ্রূণ ২ মিলিমিটার।

৪র্থ সপ্তাহ : হৃৎপিণ্ড, রক্তনালি, রক্ত এবং অন্ত্রের উৎপত্তি শুরু। আমবিলিক্যাল কর্ড বৃদ্ধিরত। ভ্রূণ ৫ মিলিমিটার।

৫ম সপ্তাহ : মস্তিষ্ক বৃদ্ধিরত। **লিম্ব বাড** (limb bud) এর উৎপত্তি যা থেকে হাত এবং পা তৈরি হবে।

৬ষ্ঠ সপ্তাহ : চোখ এবং কান গঠনের সূত্রপাত।

৭ম সপ্তাহ : মুখমণ্ডল তৈরি হয়। চোখে রঙ দেখা যায়।

১২তম সপ্তাহ : সকল অঙ্গ, পেশি, হাড়, হাত ও পায়ের আঙ্গুলসহ পরিণত ভ্রূণ। জনন অঙ্গ সুগঠিত।

২০তম সপ্তাহ : ভ্রূ এবং অক্ষিপক্ষ (চোখের পাতার লোম) সহ লোমের উৎপত্তি শুরু। হাতের আঙ্গুলের রেখার বিকাশ।

২৪তম সপ্তাহ : চোখের পাতা খুলতে পারে।

২৬তম সপ্তাহ : অপ্রাপ্তকালে জন্ম হলে বেঁচে থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

২৮তম সপ্তাহ : বলিষ্ঠভাবে নড়াচড়ায় সক্ষম। স্পর্শ ও অতিশব্দ অনুভব করে এবং মূত্র ত্যাগ করে।

৩০তম সপ্তাহ : মাথা নিচ দিকে, জন্মের জন্য প্রস্তুত।

৩৮তম সপ্তাহ : সাধারণত ৯ মাসের শিশু জন্মগ্রহণ করে।

চিত্র ৯.১৩ : জরায়ুর অভ্যন্তরে বৃদ্ধিরত শিশুর বিভিন্ন ধাপ

শিশু প্রসব (Birth of a Baby)

নিষেকের পর ৯–১০ সপ্তাহের মধ্যে বাহ্যিকভাবে ভ্রূণকে মানুষ হিসেবে শনাক্ত করা যায়। ভ্রূণের এ অবস্থাকে **ফিটাস** (fetus) বলে। জরায়ুতে ফিটাস প্রায় ৩৮ সপ্তাহ অবস্থান করে। এ সময়কালকে **গর্ভধারণকাল** (the gestational period) বলে। গর্ভধারণকালের প্রথম ১২ সপ্তাহের মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে প্রধান অঙ্গসমূহের অধিকাংশ তৈরি হয়ে যায়।

শিশু প্রসবের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণের জন্য ৩৮ সপ্তাহের সাথে ২ সপ্তাহ যোগ করে অর্থাৎ সর্বশেষ রজঃচক্রের প্রথম দিনের সাথে ৪০ সপ্তাহ যোগ করে সম্ভাব্য প্রসব দিন (Expected Delivery Date-EDD) নির্ধারণ করা হয়। তবে প্রসব ৫ দিন পূর্বে বা পরে হতে পারে।

মানুষে **গর্ভাবস্থা** (pregnancy) কাল ৩৮ থেকে ৪০ সপ্তাহ। গর্ভাবস্থায় ১২তম সপ্তাহে প্লাসেন্টা নিঃসৃত প্রোজেস্টেরন হরমোনের প্রভাবে জরায়ুর সংকোচন বন্ধ থাকে। গর্ভাবস্থায় রক্তে প্রোজেস্টেরনের মাত্রা বাড়তে থাকে তবে ৩৮তম সপ্তাহে রক্তে প্রোজেস্টরনের মাত্রা হঠাৎ করেই কমে যায় ফলে জরায়ু সংকোচনের প্রতিবন্ধকতা দূর হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

একই সাথে মাতার পশ্চাৎপিটুইটারি গ্রন্থি থেকে **অক্সিটসিন** (oxytocin) এবং প্লাসেন্টা থেকে **প্রোস্টাগ্লান্ডিন** (prostaglandin) হরমোন ক্ষরণ শুরু হয়। ৪০তম সপ্তাহে জরায়ুর সংকোচন ঘটে। এ সংকোচনের ফলে শিশু জরায়ু থেকে বাইরে আসতে পারে। প্রক্রিয়াটি তিনটি ধাপে সংঘটিত হয়, যথা–

১. জরায়ু মুখ (cervix) ১০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত প্রসারিত হয়।
২. ফিটাস জরায়ু থেকে বাইরে আসে এবং
৩. প্লাসেন্টা ও নাভীরজ্জু বা **আমবিলিক্যাল কর্ড** (umbilical cord : ফিটাস থেকে প্লাসেন্টা পর্যন্ত আমবিলিক্যাল ধমনি ও শিরা বনহকারী অঙ্গকে নাভীরজ্জু বলে) জরায়ুর অভ্যন্তর থেকে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়।

জমজ শিশু (Twin Babies)

কখনো কখনো একসাথে দুটি বা তার বেশি শিশু জন্মগ্রহণ করে। এদের **জমজ শিশু** বলে। জমজ দুধরনের, যথা– অভিন্ন ও ভিন্ন।

❒ **অভিন্ন জমজ** (Identical twins) : একটি জাইগোট ১ম বিভাজনের সময় দুটি পৃথক কোষে পরিণত হলে পরবর্তীতে উক্ত দুটি কোষ থেকে শিশুর জন্ম হয়। এরা একই লিঙ্গ বিশিষ্ট হয়; অর্থাৎ দুটি ছেলে বা দুটি মেয়ে হয় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্যাবলি এবং চেহারা প্রায় এক রকম হয়।

❒ **ভিন্ন জমজ** (Non-identical twins) : দুটি পৃথক ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়ে দুটি জাইগোট উৎপন্ন হলে- এ দুটি জাইগোট থেকে দুটি শিশুর জন্ম হয়। এদের বৈশিষ্ট্যাবলি হুবহু একই হয় না। বরং যে কোন দুই (ছোট-বড়) ভাই-বোনের মত বৈশিষ্ট্যাবলির মিল থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। এরা দুই ভাই, দুই বোন অথবা একটি ভাই ও একটি বোনও হতে পারে।

গর্ভাবস্থা ও পরিচর্যা (Pregnancy & Care during Pregnancy)

গর্ভে সন্তান ধারণকারী মাকে **গর্ভবতী** (pregnant) বলা হয়। গর্ভাবস্থায় মায়ের পরিচর্যায় পালনীয় বিষয়গুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

ক. চিকিৎসা সংক্রান্ত পরিচর্যা

গর্ভাবস্থার শুরুতে মাকে চিকিৎসক দিয়ে পরীক্ষা করানো ও তাঁর পরামর্শমতো চলা দরকার। World Health Organization (WHO) অনুসারে গর্ভাবস্থায় কমপক্ষে ৪টি ডাক্তারি ভিজিট জরুরি সেগুলো হলোঃ ০ – ১৬ সপ্তাহে ১টি, ২৪ – ২৮ সপ্তাহে ১টি, ৩২ সপ্তাহে ১টি, ৩৬ সপ্তাহে ১টি এবং ৩৬ সপ্তাহের পর অর্থাৎ ৩৭ সপ্তাহ থেকে প্রসব না হওয়া পর্যন্ত প্রতি সপ্তাহে একবার ডাক্তারি পরীক্ষা করানো উচিত। প্রথম পরীক্ষার সময় রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করাতে হবে। এ সময় রক্তের গ্রুপ, যৌনরোগ, রক্তে শর্করার পরিমাণ, হিমোগ্লোবিন এর পরিমাণ, জন্ডিস ভাইরাস ইত্যাদিও পরীক্ষা করাতে হবে।

খ. গর্ভাবস্থায় অন্যান্য পালনীয় বিষয়

১. খাদ্য : গর্ভবতী মায়ের পুষ্টির উপরই নির্ভর করে গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি, বিকাশ ও ভবিষ্যৎ জীবনে ভালো থাকা। তাই সুষম সহজপাচ্য ও সঠিক পরিমাণ আহার প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায় সুষম আহার বলতে বোঝায় চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বেশি পরিমাণ প্রোটিন, সঠিক পরিমাণ শর্করা ও কম পরিমাণ চর্বি জাতীয় খাদ্যের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ লৌহ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ও অন্যান্য পদার্থ, যথা– জিঙ্ক, ফলিক এসিড, পটাসিয়াম, সেলেনিয়াম প্রভৃতি। সম্ভব হলে দিনে ১ লিটার দুধ, ১ বা ২ টুকরা মাছ বা মাংস, ১টি ডিম, ১টি বা ২টি ঋতুকালীন ফল, টাটকা শাকসব্জি এবং ভাত ও ডাল পেট ভরে খাওয়া উচিত। নিরামিষভোজীদের দুধের পরিমাণ বাড়াতে হবে। তা ছাড়া অঙ্কুরিত ছোলাও খাদ্য তালিকায় যোগ করা উচিত। প্রতিদিন ৬-৮ গ্লাস ফোটানো পানি খাওয়া প্রয়োজন।

২. কোষ্ঠকাঠিন্য : গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রবণতা থাকে। এর সমাধানকল্পে বেশি পরিমাণ শাকসব্জি খাওয়া দরকার। তা ছাড়া শুকনো খেজুর ও বীট খাবার তালিকায় রাখা উচিত।

৩. দাঁত : গর্ভাবস্থায় দাঁতের মাড়ি থেকে রক্তক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে। তাই এ সময় দাঁত না তোলাই ভাল।

৪. বিশ্রাম : গর্ভাবস্থায় পরিমিত বিশ্রাম দরকার। দুপুরে দুঘন্টা, রাতে আটঘন্টা বিশ্রাম নেয়া উচিত। সব সময় বাঁ পাশে কাত হয়ে শোয়া উচিত। এতে শিশুর বিকাশ স্বাভাবিক হয়।

৫. কাজকর্ম : স্বাভাবিক কাজকর্মে বাধা নেই, তবে ভারী কাজকর্ম করা একেবারেই উচিত নয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৬. গোসল : রোজ গোসল করে শরীর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। গোসল করার সময় যেন পিছলে পড়ে না যায় সেদিকে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে।

৭. কাপড় : গর্ভাবস্থায় ঢিলেঢালা কাপড় পড়া উচিত। বাংলাদেশের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সুতির কাপড়-চোপড় পড়া স্বাস্থ্যসম্মত।

৮. ভ্রমণ : ঝাঁকুনিযুক্ত ক্লান্তিকর ভ্রমণ গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস ও শেষ দুমাস না করাই ভালো। বাসের চেয়ে রেল ও বিমানে ভ্রমণ-ঝুঁকি অনেক কম।

৯. ধুমপান ও মদ্যপান : গর্ভাবস্থায় অতিরিক্ত ধূমপান ও মদ্যপান অনুচিত। তা না হলে কম ওজনের শিশু কিংবা বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হতে পারে।

১০. যৌনমিলন : গর্ভের প্রথম তিন মাস ও শেষ দেড় মাস যৌন মিলন থেকে বিরত থাকা উচিত। এতে গর্ভপাত, অকাল প্রসব ও সংক্রমণের সম্ভাবনা থাকে।

গর্ভনিরোধক পদ্ধতি ও পরিবার পরিকল্পনা (Birth Control Methods & Family Planning)

গর্ভ নিরোধ (Contraception)

গর্ভ নিরোধ হচ্ছে গর্ভ ধারণে বাধা দেয়া, অর্থাৎ শুক্রাণুকে ডিম্বাণুর সাথে মিলনে বাধা সৃষ্টি করা। পরিবারের সদস্য সংখ্যা সীমিত রাখার জন্যই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সন্তানের জন্ম বিভিন্ন উপায়ে রোধ করা সম্ভব। বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকরা গর্ভনিরোধকের নানা পদ্ধতি নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। বর্তমান সময়ে যেসব গর্ভনিরোধক পদ্ধতি অনুসৃত হয় সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো। গর্ভনিরোধক সকল ব্যবস্থাকে প্রধানত দুভাবে শ্রেণিভুক্ত করা যায়, অস্থায়ী পদ্ধতি এবং স্থায়ী পদ্ধতি।

ক. অস্থায়ী পদ্ধতি (Temporary Methods)

১. শারীরিক পদ্ধতি : গর্ভনিরোধকের শারীরিক পদ্ধতি হচ্ছে নিরাপদ সময় নির্বাচন ও শিশ্ন বহিষ্করণ :

- **নিরাপদ সময় নির্বাচন :** মাসিক রজঃচক্রের প্রথম ও শেষ সপ্তাহের দিনগুলোতে ফেলোপিয়ান নালিতে কোন পরিপক্ক ডিম্বাণু থাকে না বলে ঐ সময়কে যৌনমিলনের নিরাপদ সময় বলে।
- **শিশ্ন বহিষ্করণ :** সঙ্গমকালে শুক্রাণু স্খলনের মুহূর্তে যদি শিশ্নকে প্রত্যাহার করে দেহের বাইরে স্খলিত করা হয় তা হলে শুক্রাণু নিষেক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে না।

চিত্র ৯.১৪ : জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি

২. রাসায়নিক পদ্ধতি : শুক্রনাশক জেলি, ক্রিম, ফেনা বা ফোম বড়ি, জেল প্রভৃতি বিশেষ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যৌনমিলনের আগে স্থাপন করতে হয়। এটি ২০-৩০ মিনিট পর্যন্ত কার্যক্ষম থেকে স্খলিত শুক্রাণুকে বিনষ্ট করে দেয়।

৩. যান্ত্রিক পদ্ধতি : জন্মনিরোধক হিসেবে বেশ কয়েক ধরনের যান্ত্রিক পদ্ধতি রয়েছে:

- **কনডম :** এটি পুরুষের ব্যবহারের জন্য এক ধরনের পাতলা, লম্বাটে রবারের থলি। সঙ্গমের পূর্বে শিশ্ন কনডমে আবৃত করে নিলে স্খলিত শুক্রাণু আর জরায়ুতে প্রবেশ করতে পারে না। কিছু ক্ষেত্রে মহিলাও কনডম ব্যবহার করতে পারে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

- **ডায়াফ্রাম :** এটি মিলনের পূর্বে জেলি বা ফোম সহযোগে স্বাস্থ্যকর্মী বা চিকিৎসকের সহায়তায় যোনিতে স্থাপন করতে হয় এবং যৌন মিলনের পর অন্ততঃ ৬ ঘন্টা সেখানেই রাখতে হয়। ডায়াফ্রাম ব্যবহারে কোন স্বাস্থ্য ঝুঁকি নেই, বরং জরায়ুর ক্যান্সার এবং কিছু যৌন রোগ প্রতিরোধ সহায়ক।
- **স্পঞ্জ :** এটি ভিজিয়ে যোনিতে স্থাপন করতে হয় এবং পর মুহূর্ত থেকেই কার্যক্ষম হলে ২৪ ঘন্টা অনবরত প্রতিরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকে।
- **অন্তর্জরায়ু গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা :** এ ব্যবস্থায় পলিথিন, তামা, রূপা বা স্টেনলেস স্টিল নির্মিত একটি ফাঁস (loop) জরায়ুর অভ্যন্তরে স্থাপন করলে তা জরায়ুর ভিতরে নিষিক্ত ডিম্বাণু রোপনে বাধা দান করে।

৪. **শারীরবৃত্তীয় পদ্ধতি :** এ ব্যবস্থার প্রধান উপকরণ জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ও ইনজেকশন।

- **জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি :** এটি বিভিন্ন অনুপাতে এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরনের মিশ্রণে তৈরি এবং মুখে গ্রহণযোগ্য বড়ি। রজঃচক্রের ৫-২৫তম দিন পর্যন্ত প্রতিদিন একটি করে বড়ি গ্রহণ করতে হয়। এগুলো মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসের উপর কাজ করে ডিম্বপাতে বাধা দেয় এবং জরায়ুকণ্ঠের মিউকাস ঝিল্লিকে শুক্রাণু প্রবেশের বিরোধী করে তোলে। এটি একটি বহুল প্রচলিত জন্মনিরোধক পদ্ধতি কিন্তু অনেক নারীর সাময়িক বমি বমি ভাব, ফোঁটা ফোঁটা স্রাব, উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধির মত উপসর্গ দেখা দিতে পারে।
- **ইনজেকশন :** বেশ কয়েকমাস যাতে গর্ভধারণ ঝুঁকি নিরাপদে এড়ানো যায় তার জন্য ইদানিং এক ধরনের ইনজেকশন আবিষ্কৃত হয়েছে। অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকায় এর গুণগত মান উন্নয়নের চেষ্টা চলছে।

৫. **গর্ভপাত :** অস্ত্রোপচারের সাহায্যে ২-৩ মাস বয়সী ভ্রূণকে বিচ্যুত করিয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা যায়।

খ. স্থায়ী পদ্ধতি (Permanent Methods)

জন্মনিরোধের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন করাকে **বন্ধ্যাকরণ** (sterilisation) বলে। এটি নিচে বর্ণিত দুধরনের।

১. **ভ্যাসেকটমি (Vasectomy):** এ পদ্ধতিতে পুরুষের ক্ষেত্রে উভয় দিকের শুক্রনালির অংশকে কেটে বেঁধে দেয়া হয় যাতে শুক্রাণু বাইরে আসতে না পারে।

২. **টিউবেকটমি (Tubectomy) বা লাইগেশন (Ligation) :** এ পদ্ধতিতে মহিলাদের ক্ষেত্রে উভয় দিকের ফেলোপিয়ান নালির (ডিম্বনালি) অংশ কেটে বেঁধে দেয়া হয় যাতে শুক্রাণু প্রবেশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অধিক সন্তানবতী বা যাঁরা একেবারেই আর সন্তান চান না বা গর্ভধারণের জন্য শারীরিকভাবে অসুস্থ তাঁদের জন্য এ পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

চিত্র ৯.১৫ : (ক) পুরুষের বন্ধ্যাকরণে শুক্রনালির অপারেশন (ভ্যাসেকটমি)
(খ) মহিলাদের বন্ধ্যাকরণে ডিম্ববাহীনালির অপারেশন (লাইগেশন)

পরিবার পরিকল্পনা (Family Planning)

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা আজ নানা কারণে ভয়াবহ অনুভূত হচ্ছে। তাই সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিটি দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম জোরদার করে একে আয়ত্তে আনবার প্রচেষ্টা চলছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারলেই আমরা পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তাও সহজেই বুঝতে পারব। জনবহুলতার ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলো হচ্ছে : খাদ্যের অপ্রতুলতা; বস্ত্রের অপর্যাপ্ততা; উপযুক্ত বাসস্থানের অভাব; সুচিকিৎসার অভাব; পরিবেশ দূষণের ফলে বিশুদ্ধ পেয় পানির এমনকি কোন কোন অঞ্চলে বিশুদ্ধ বাতাসের অভাব; শিক্ষার অভাব; অপূরণীয় খনিজ সম্পদের বর্ধিত হারে উত্তোলন ও ব্যবহার; অর্থনৈতিক বিপর্যস্ততা; বেকারত্ব বৃদ্ধি; এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা।

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর সমাধানের উদ্দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এক কথায় বলতে গেলে, মানব প্রজাতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে অবশ্যই ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়

প্রত্যেকটি দেশই অনন্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে মন্ডিত। যে কোন বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের আগে এ দিকটি খতিয়ে দেখতে হয়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকেও প্রত্যেক দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা উচিত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো নিম্নোক্ত ধরনের হতে পারে:

১. বিয়ের বয়স : নারী-পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে বিয়ের বয়স নির্ধারিত থাকবে এবং আইন লংঘনকারীদের উপযুক্ত শাস্তির বিধান থাকবে।

২. সন্তান সংখ্যা : দম্পতি পিছু "এক সন্তানই যথেষ্ট"এ শ্লোগান কার্যকর করতে হবে।

৩. বিবাহ বন্ধনের নিয়মকানুন : বিভিন্ন ধর্মমতের বিবাহ পদ্ধতিকে উৎসাহিত করতে হবে। কোথাও বহুবিবাহ সিদ্ধ থাকলে সেক্ষেত্রে সন্তানসংখ্যা সম্পর্কে কঠোর আইন এবং আইন লংঘনকারীর উপযুক্ত শাস্তির বিধান করতে হবে।

৪. শিক্ষা : প্রাথমিক পর্যায় থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কুফল সম্বন্ধে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রত্যেক দম্পতিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এজন্য দক্ষ মাঠকর্মী নিয়োগ ও অদক্ষদের ছাঁটাই করতে হবে।

৫. গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা : কাঙ্ক্ষিত সন্তানসংখ্যা ও তা নির্দিষ্ট বয়স অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সক্ষম দম্পতিদের স্থায়ী গর্ভনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করাতে হবে। এ বিষয়ে গ্রামের ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও শহরের ওয়ার্ড কমিশনারদের জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৬. সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা : নির্ধারিত সময়ের পর বিয়ে এবং এক সন্তান / দুই সন্তানবিশিষ্ট পরিবারকে লেখাপড়া, ভ্রমণ ও চাকুরীতে বিশেষ সুযোগের ব্যবস্থা করতে হবে।

আইভিএফ পদ্ধতি (IVF–In Vitro Fertilization Process)–কৃত্রিম গর্ভধারণ

সাধারণত নারীদেহের অভ্যন্তরে শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসের একীভবনের মধ্য দিয়ে নিষেক সম্পন্ন হয়। নিষিক্ত ডিম্বাণুটি গর্ভাশয়ের প্রাচীরে সংস্থাপিত হয়ে প্রায় ৯ মাস পর পরিস্ফুটন শেষে একটি শিশুসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। এ প্রক্রিয়াটি **স্বাভাবিক গর্ভধারণ** (natural conception) নামে পরিচিত। ডিম্বনালি বন্ধ হয়ে গেলে, ক্ষত হলে বা এন্ডোমেট্রিওসিস ছাড়াও পুরুষের ক্ষেত্রে শুক্রাণুর সংখ্যা কম হলে বা অস্বাভাবিক গড়নের শুক্রাণু হলে, অথবা নারী ও পুরুষ উভয় থেকে শুক্রাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হলে, নারীতে ডিম্বপাত না হলে IVF গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। তখন দেহের বাইরে গবেষণাগারে কাঁচের পাত্রে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে নিষিক্ত ডিম্বাণুকে জরায়ুতে স্থাপন করে গর্ভধারণ করানোর ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রক্রিয়ার নাম **ইন ভিট্রো নিষেক** (In Vitro Fertilization, সংক্ষেপে IVF) প্রক্রিয়া। '*in vitro*' একটি ল্যাটিন শব্দ, এর অর্থ হচ্ছে **কাঁচের ভিতরে** ('within the glass')। প্রক্রিয়াটি **টেস্ট টিউব পদ্ধতি** এবং

ভূমিষ্ঠ শিশুটি **টেস্ট টিউব বেবী** নামে সাধারণভাবে প্রচলিত। ১৯৭৮ সালের ২৫ জুলাই লন্ডনের ওল্ডহ্যাম জেনারেল হসপিটালে **প্যাট্রিক স্টেপ্টো** (Patric steptoe, 1913-1988) এবং **রবার্ট জি. এডওয়ার্ডস** (Robert G. Edwards, 1925-2013) এর তত্ত্বাবধানে জন্ম নেয় বিশ্বের সর্বপ্রথম টেস্ট টিউব বেবী **লুইস ব্রাউন** (Louise Joy Brown) নামের কন্যা শিশুটি। বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসায় এ অনন্য অবদানের জন্য রবার্ট এডওয়ার্ডসকে (IVF-এর জনক) ২০১০ সালে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে প্রথম টেস্ট টিউব বেবীর জন্ম হয় ২০০১ সালে।

Louise Joy Brown

আইভিএফ পদ্ধতির ধাপসমূহ

আইভিএফ পদ্ধতি ছাড়া আর কোনও উপায়ে গর্ভধারণ সম্ভব নয় নিশ্চিত হলে যে কোনো দম্পতি প্রশিক্ষিত ও আধুনিক হাসপাতাল বা ক্লিনিকে গিয়ে চিকিৎসা শুরু করতে পারেন। সব চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রায় একই ধরনের চিকিৎসা সম্পন্ন হয়ে থাকে। নিচে এ ধাপগুলো সম্বন্ধে সংক্ষেপে সাধারণ ধারণা দেয়া হলো।

ধাপ-১. স্বাভাবিক রজঃচক্র দমন : IVF-এর প্রথম ধাপে স্ত্রীর স্বাভাবিক রজঃচক্র দমিয়ে রাখতে একটি ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। ওষুধটি ইনজেকশন হিসেবে কিংবা নাকের ভিতর স্প্রে করে দেয়া হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ধাপ–২. ডিম্বাণুর সরবরাহ বৃদ্ধি : নারীদেহে সাধারণত প্রতিমাসে একটি করে ডিম্বাণু পরিণত (mature) হয়। কিন্তু কৃত্রিম গর্ভধারণের ক্ষেত্রে একাধিক ডিম্বাণুর প্রয়োজন হয় কারণ একটিমাত্র ডিম্বাণু নিয়ে পূর্ণ-চিকিৎসা সম্পন্ন করার ঝুঁকি নেয়া ঠিক নয়। এ কারণে ডিম্বাণুর উৎপাদন বাড়াতে FSH (Follicle Stimulating Hormone) নামে হরমোনযুক্ত ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বেশি ডিম্বাণু উৎপাদিত হলে বেশি ডিম্বাণু নিষিক্ত করে যাচাই-বাছাইয়ে সুবিধা হবে। এভাবে ডিম্বাশয়কে বেশি ডিম্বাণু উৎপাদনে উদ্দীপ্ত করা হয়।

ধাপ–৩. অগ্রগতি পরীক্ষা : ডিম্বাণু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য দ্বিতীয় ধাপে প্রয়োগিত হরমোনের ফলাফল পরীক্ষা করা হয় তৃতীয় ধাপে। এ জন্য আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান (বা ছবি) ও হরমোনের মাত্রা যাচাইয়ের জন্য রক্ত ও মূত্র পরীক্ষা করা হয়।

ধাপ–৪. ডিম্বাণু সংগ্রহ : ডিম্বাণু সংগ্রহের ৩৪-৩৮ ঘন্টা আগে ডিম্বাণু পরিপক্কতায় সাহায্য করতে আরেকবার হরমোন ইনজেকশন দেয়া হয়। **ডিম্বাণু চোষক** (follicular aspiration) প্রক্রিয়ায় নারীদেহের ডিম্বাশয় থেকে বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে পরিপক্ক ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হয়। এর আগে অবশ্য ব্যথানাশক ওষুধ খাওয়ানো হয়। আল্ট্রাসাউন্ড ছবির সূত্র ধরে যোনি পথে একটি সূক্ষ্ম ফাঁপা সূঁচ প্রবেশ করিয়ে ডিম্বাশয় ও ফলিকলে (ডিম্বথলিতে) আবৃত ডিম্বাণুর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সূঁচটি চোষক যন্ত্রের সঙ্গে লাগানো থাকে। এ যন্ত্র ডিম্বাশয়ের ফলিকল থেকে সামান্য তরলসহ ডিম্বাণু সংগ্রহ করে। এভাবে একটি একটি করে সুস্থ ও পরিপক্ক ডিম্বাণু সংগৃহীত হয়। একটি ডিম্বাণু সংগ্রহের পর সেটি নির্ধারিত পাত্রে রেখে আবার আরেকটি ডিম্বাণু সংগ্রহ করা হয়। প্রত্যেক ডিম্বাশয় থেকে পর্যাপ্ত পরিপক্ক ডিম্বাণু সংগ্রহের পর নিষেকের পূর্ব পর্যন্ত পরিবেশবান্ধব নিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রায় (নারীদেহের সমান তাপমাত্রায়) সংরক্ষিত থাকে।

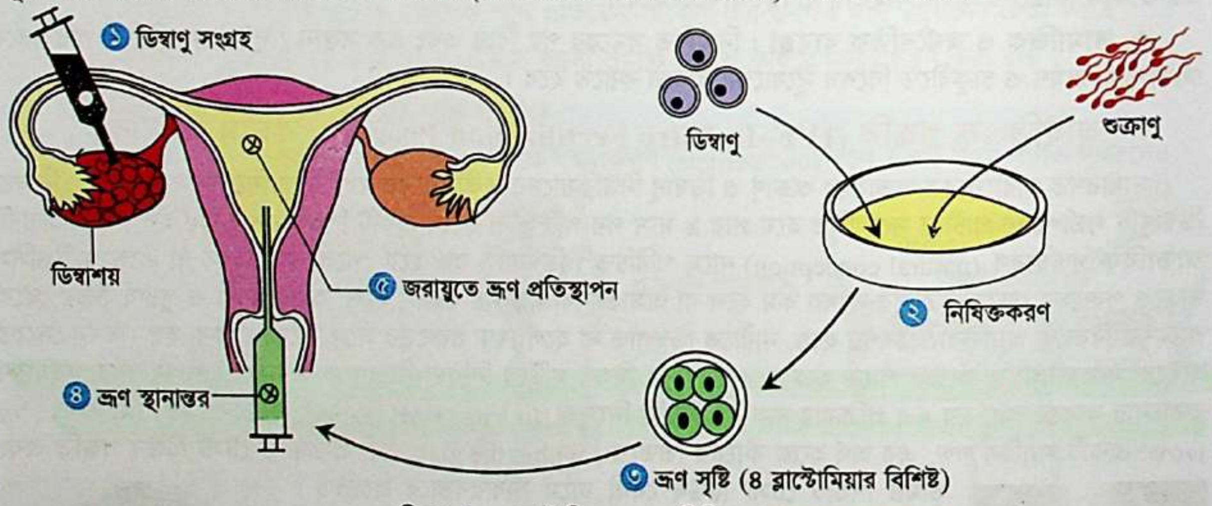

চিত্র ৯.১৮ : আই.ভি.এফ এর বিভিন্ন ধাপ

ধাপ–৫. শুক্রাণু সংগ্রহ : নারীর ডিম্বাণু সংগ্রহের সময়কালে পুরুষ সঙ্গীকে শুক্রাণু দানের জন্য আহ্বান জানানো হয়। শুক্রাণু সংগ্রহের পর কিছু সময়ের জন্য কালচার মিডিয়ামে জমা রাখা হয়। এর পর তা বিশেষ প্রক্রিয়ায় বীর্যরস পরিষ্কার করে দ্রুতগতিতে ঘূর্ণনের মাধ্যমে সুস্থ ও সক্রিয় শুক্রাণু নির্বাচন করা হয়।

ধাপ–৬. ডিম্বাণু নিষিক্তকরণ : গবেষণাগারে ইনক্যুবেটরে রাখা সর্বোচ্চ গুণগত মানের শুক্রাণু ও ডিম্বাণুকে নিষেকের জন্য একসঙ্গে ১৬-২০ ঘন্টা পেট্রিডিশ বা কাঁচের টিউবে রেখে দেয়া হয়। প্রত্যেক ডিম্বাণুর জন্য প্রায় একলক্ষ শুক্রাণুর ব্যবস্থা রাখা হয়। এরপর পরীক্ষা করে দেখা হয় কোনো ডিম্বাণু নিষিক্ত হয়েছে কিনা। নির্ধারিত সময় পর যদি নিষেক না ঘটে থাকে তখন বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে একটি ডিম্বাণুর ভিতরে একটি শুক্রাণুর প্রবেশ ঘটিয়ে নিষেকের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ প্রক্রিয়ার নাম **অন্তঃসাইটোপ্লাজমিক শুক্রাণু ইনজেকশন** (intracytoplasmic sperm injection, সংক্ষেপে ICSI)। নিষেক ঘটেছে এবং ক্লিভেজ (বিভাজন) শুরু হয়েছে এমন অবস্থা দেখা দিলেই নিষিক্ত ডিম্বাণুকে **ভ্রূণ** হিসেবে অভিহিত করা হয়।

ধাপ–৭. ভ্রূণ স্থানান্তর : নিষিক্ত ডিম্বাণু সংগ্রহের পর ১-৬ দিনের মধ্যে (সাধারণত ২-৩ দিনের মধ্যে) নারীর জরায়ুতে স্থানান্তর করা হয়। এ সময়ের ভিতর নিষিক্ত ডিম্বাণু ২-৪ ব্লাস্টোমিয়ার বিশিষ্ট ভ্রূণে রূপ নেয়। একটি সুস্থ, সক্রিয় বিভাজনশীল ভ্রূণকে ক্যাথেটারের সাহায্যে আল্ট্রাসাউন্ড প্রতিচ্ছবি দেখে গর্ভাশয়ে সাবধানে স্থাপন করা হয়। এটি একটি ব্যথাহীন প্রক্রিয়া, তবে কেউ পেশিতে সামান্য খিল ধরায় আক্রান্ত হতে পারে। ভ্রূণ যদি জরায়ু অর্থাৎ গর্ভাশয়ে

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

সংস্থাপিত হয় তাহলে গর্ভসঞ্চার হয়েছে বলে মনে করা হয়। এরপর ১০ মিনিট থেকে ৪ ঘন্টার মধ্যে গর্ভবতী বাসায় চলে যেতে পারেন। কেউ একাধিক ভ্রূণ গর্ভাশয়ে সংস্থাপন করতে পারেন। সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্যগত অবস্থা, বয়স প্রভৃতি বিশেষ বিবেচনায় নিতে হয়। অনেকে একটি ভ্রূণ সংস্থাপিত হওয়ার পর বাকি ভ্রূণগুলোকে গবেষণাগারে ভবিষ্যতে সংস্থাপনের জন্য, কেউবা অন্য কাউকে দান করার জন্য গবেষণাগারে বিশেষ প্রক্রিয়ায় জমা রাখেন।

সংস্থাপনের পরবর্তী সময়কালটি সুনির্দিষ্ট নজরদারির মধ্যে থাকতে হয়। কারণ IFV পদ্ধতিতে জীবিত সন্তান জন্মদানের হার খুব বেশি নয়।

পদ্ধতির সার্বিক ঘটনাকে নিচের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো।

ডিম্বাণু সৃষ্টির উদ্দীপনা ⇨ ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংগ্রহ ⇨ টেস্টটিউবে ডিম্বাণু-শুক্রাণুর মিশ্রণ ও নিষেক ⇨ ইনকিউবেটরে ভ্রূণ কালচার ⇨ জরায়ুতে ভ্রূণ স্থানান্তর ও সংস্থাপন

যেসব কারণে আই.ভি.এফ ব্যর্থ

সাধারণত স্ত্রীর বয়স, শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর গুণগত মান, প্রজনন অক্ষমতার মেয়াদকাল, জরায়ুর স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভরশীল হলেও বিভিন্ন কারণে আইভি.এফ সফলতা পায়না : (i) ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণুর পরিপক্কতার জন্য যে সময় প্রয়োজন সে সম্পর্কে ভুল অনুমান। (ii) ডিম্বাণু পরিণত হওয়ার আগেই পৃথক করা। (iii) পৃথকীকরণের সময় ডিম্বাণু নষ্ট হলে। (iv) নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণের বিকাশ না হওয়া। (v) ভ্রূণের ত্রুটিপূর্ণ প্রতিস্থাপন। (vi) ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ত্রুটির কারণে আই.ভি.এফ ব্যর্থ হয়।

আই.ভি.এফ পদ্ধতিতে স্বাভাবিক বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতাও কিছু ক্ষেত্রে ক্ষুন্ন হয়। **শুক্রাণু, ডিম্বাণু ও একটি জরায়ু হলেই এ পদ্ধতিতে গর্ভধারণ সম্ভব।** আজকাল দেখা যায় যে, জরায়ুতে সমস্যা থাকলে, স্বামী-স্ত্রী নিজেদের শুক্রাণু-ডিম্বাণু দিয়ে তৈরি ভ্রূণ অন্য কোনো নারীর জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করছেন। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে আগত শিশুর মানসিকতা। বয়সের সঙ্গে মা-বাবার পরিচয় নিয়েও তার মনের ভিতর সংশয় তৈরি হতে পারে। কৃত্রিম পরিবেশে ভ্রূণ সংরক্ষণ করার সময় ভ্রূণের সাথে অপ্রাকৃতিক রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ ঘটানোর ফলে গবেষণার উদ্দেশ্যে ভ্রূণের অপব্যবহারের শঙ্কা থাকে। তাছাড়া ভ্রূণকে পণ্যের মতো ব্যবহারের শঙ্কা রয়েই যায়। এত সবের পরও থেমে নেই আই.ভি.এফ পদ্ধতিতে শিশুর জন্ম। সন্তান ধারণের মাঝ দিয়ে নারী পায় তার পূর্ণতা। তাই প্রজনন সংক্রান্ত প্রতিকূলতার কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি নন প্রজননে অক্ষম পুরুষ ও নারীকুল। মাতৃত্বের আকাঙ্খা পূরণে আই.ভি.এফ পদ্ধতি তাদের কাছে আশীর্বাদস্বরূপ।

প্রথম টেস্টটিউব কুকুরের জন্ম : যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক গত ০৯/১২/২০১৫ তারিখে আইভিএফ পদ্ধতিতে সাতটি কুকুরছানার জন্ম দেয়ার কথা ঘোষণা করেন। ২০১৫ সালের জুলাই মাসে এসব গবেষকেরা একটি কুকুরীর জরায়ুতে ১৯টি ভ্রূণ স্থাপন করে এ সাফল্য পান। বিজ্ঞানীদের এ সাফল্যের প্রভাব সুদূর প্রসারী হতে পারে। কারণ এ আইভিএফ পদ্ধতি ব্যবহার করে বিলুপ্তপ্রায় বিভিন্ন প্রাণী সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করার সুযোগ তৈরি হবে।

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত : বাংলাদেশে প্রথম ত্রয়ী টেস্টটিউব বেবি হিসেবে জন্মগ্রহণ করে হীরা, মনি ও মুক্তা। এদের জন্ম হয় ২০০১ সালের ৩০ মে। এদের পিতা ও মাতা যথাক্রমে আবু হানিফ এবং ফিরোজা বেগম। এ দম্পতি Bangladesh Assisted Conception Center (BACC) and Women's Hospital (WH), ঢাকা এর Dr. Fatema Parveen এর তত্ত্বাবধায়নে ১৯৯৪ সাল থেকে চিকিৎসা নিয়ে ৬ বছর পর সন্তানত্রয় জন্মদানে সক্ষম হন। বর্তমানে বাংলাদেশে এ প্রযুক্তি নিয়ে সাফল্যজনকভাবে কাজ চলছে। বেসরকারীভাবে বেশ কয়েকটি আই.ভি.এফ সেন্টার রয়েছে।

আইভিএফ-এর সুবিধা-অসুবিধা

আইভিএফ-এর সুবিধা : এতে মাতৃত্বের বাসনা পূর্ণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ও সহজ পদ্ধতি। ডিম্বনালি ক্ষতিগ্রস্ত থাকলেও গর্ভধারণ সম্ভব। এর দীর্ঘস্থায়ী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

আইভিএফ-এর অসুবিধা : বেশিবার গর্ভধারণে গর্ভপাতের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এতে শিশুর অকাল জন্ম হতে পারে। এটি ব্যয় সাপেক্ষ চিকিৎসা। ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে। মানসিক চাপে স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দিতে পারে। টেস্ট টিউব শিশুদের বিকলাঙ্গতা ও বিরল রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে বলে বিজ্ঞানীগণ প্রমাণ করেছেন। ডিম্বাণু সংগ্রহের সময় ডিম্বাশয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে রক্তক্ষরণ ও পরবর্তীতে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটতে পারে। অনেকে টেস্ট টিউব বেবি নেয়াকে অনৈতিক মনে করেন কেননা এ পদ্ধতিতে অনেক ভ্রূণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

প্রজননতন্ত্রের সমস্যা (Problems of Reproductive System)

পুরুষ ও নারীর প্রজনন অক্ষমতা (Male and Female Infertility)

কোনো গর্ভনিরোধক পদার্থ বা পদ্ধতি ব্যবহার না করে এক বছর নিয়মিত দাম্পত্য জীবন কাটানোর পরও যদি কোনো দম্পতি গর্ভধারণে ব্যর্থ হয় তখন তা **প্রজনন অক্ষমতা** বলে বিবেচিত হবে। দম্পতির পুরুষ সঙ্গী, নারী সঙ্গী কিংবা উভয়েই প্রজননিক সমস্যায় ভুগতে পারে। অর্থাৎ তারা **অনুর্বর** (infertile)। অনুর্বর বলতে বোঝায়, নির্দিষ্ট নারী-পুরুষ দম্পতির সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা কম। তার মানে এ নয় যে তারা সন্তান উৎপাদনে **অক্ষম** বা **বন্ধ্যা** (sterile)। বন্ধ্য বা বন্ধ্যা যাই বলি না কেন তারা কোনদিন সন্তান উৎপাদনে সক্ষম হবে না, কিন্তু অনুর্বর ব্যক্তি-দম্পতি চিকিৎসার কল্যাণে গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানে সক্ষম। পৃথিবীর ১৫% দম্পতি অনুর্বর (infertile) কিন্তু মাত্র ১-২% দম্পতি বন্ধ্যা বা বন্ধ্য (sterile)। নিচে পুরুষ ও নারীর প্রজননিক সমস্যার কারণগুলো উল্লেখ করা হলো।

পুরুষে প্রজননিক সমস্যার কারণ (Cause of Male Infertility)

দম্পতির পুরুষ সদস্যে প্রজননিক সমস্যার মূলে রয়েছে নিচে বর্ণিত শুক্রাণুগত বিশৃঙ্খলা।

১. বীর্যে শুক্রাণুর অনুপস্থিতি (Absence of sperm) : বীর্যে শুক্রাণুর অনুপস্থিতিকে **অ্যাজুস্পার্মিয়া** (azoospermia) বলে। শুক্রাণু উৎপাদন না হওয়া বা কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে বীর্যে শুক্রাণু অনুপস্থিত থাকতে পারে।

২. বীর্যে শুক্রাণু সংখ্যার স্বল্পতা (Low sperm count) : বীর্যে শুক্রাণু সংখ্যার স্বল্পতাকে **অলিগোস্পার্মিয়া** (oligospermia) বলে। এক্ষেত্রে প্রতি কিউবিক সেন্টিমিটার বীর্যে শুক্রাণুর সংখ্যা ২০ মিলিয়নের কম থাকে। অলিগোস্পার্মিয়ার নির্দিষ্ট কোন কারণ জানা নেই।

৩. শুক্রাণুর অস্বাভাবিকতা (Abnormal sperm) : অনেক শুক্রাণু ডিম্বাণুর কাছে পৌঁছতে বা নিষেক ঘটাতে অক্ষম। দুটি লেজ থাকা, লেজবিহীন, মস্তকবিহীন বা অস্বাভাবিক আকৃতি ইত্যাদি হলো শুক্রাণুর অস্বাভাবিকতা।

৪. অটোইম্যুনিটি (Autoimmunity) : নিজের শুক্রাণুর প্রতি বিশেষ ইম্যুন প্রতিক্রিয়া ৫-১০% পুরুষ বন্ধ্যাত্বের কারণ। রক্তে শুক্রাণু প্রতিরোধী আয়ন থাকা এক ধরনের ইম্যুন প্রতিক্রিয়া।

৫. শুক্রাণুর অকালপতন (Premature ejaculation) : নারী যৌনাঙ্গের অভ্যন্তরে পুরুষ যৌনাঙ্গ প্রবেশের আগেই শুক্রাণুর পতন ঘটে। অভিজ্ঞতা ও অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য এ অবস্থা কাটিয়ে উঠা সম্ভব।

৬. পুরুষত্বহীনতা (Impotence) : যৌনাঙ্গের দৃঢ়তা রক্ষায় ব্যর্থতাও অন্যতম প্রজননিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। তবে উপযুক্ত মনোবৈজ্ঞানিক উপদেশ এ সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সহায়ক হতে পারে।

নারীতে প্রজননিক সমস্যার কারণ (Cause of Female Infertility)

নারীদেহে যে সব কারণে প্রজননিক সমস্যা দেখা যায় তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ নিচে বর্ণনা করা হলো।

১. ডিম্বপাতে ব্যর্থতা (Failure to ovulate) : প্রায় ১০% নারী ডিম্বপাতে ব্যর্থ বলে প্রজননিক বিষয়েও বিফল হয়। ডিম্বপাতে ব্যর্থ হওয়ার পিছনে প্রধান কারণ হচ্ছে হরমোনঘটিত। কখনও হাইপোথ্যালামাস বা পিটুইটারি গ্রন্থি স্বাভাবিকভাবে হরমোন ক্ষরণে ব্যর্থ হয়। ফলে ডিম্বাণুর ফলিকল (ডিম্ব থলি) পরিস্ফুটিত হয় না, ডিম্বপাতও ঘটে না। অন্যদিকে, ডিম্বাশয় থেকে স্বাভাবিক হরমোনগুলো ক্ষরিত না হওয়ায় কিংবা ডিম্বাশয় ক্ষতিগ্রস্ত হলে নির্ধারিত হরমোন ক্ষরিত হয় না বলে ডিম্বপাত ঘটে না। তবে খুশির কথা এই যে ৯০% ক্ষেত্রে হরমোন ক্ষরণে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে সংশ্লেষিত হরমোন ভাল কাজ দেয়।

২. ডিম্বনালির ক্ষত (Damage to the oviducts) : প্রায় ৩৫% নারীর প্রজননিক সমস্যা হিসেবে ডিম্বনালির সংক্রমণজনিত বা **এন্ডোমেট্রিওসিস** (endometriosis) নামক অবস্থার কারণকে দায়ী করা হয়। এসব সমস্যার কারণে ডিম্বনালি পথে ডিম্বাণু ডিম্বাশয় থেকে জরায়ুতে বহন করতে পারে না।

৩. জরায়ুর ক্ষত (Uterus damage): প্রায় ৫-১০% নারী জরায়ু-ক্ষতজনিত সমস্যার কারণে প্রজননিক জটিলতায় ভোগে। এমন ক্ষেত্রে গর্ভধারণ সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে গর্ভাবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা কিংবা গর্ভপাত ঠেকানো। জরায়ুতে ছোট-বড় টিউমার হলে শল্য চিকিৎসায় সারানো যায়। গর্ভনিরোধক দ্রব্যাদি ব্যবহারে ভাল কাজ করে। কখনওবা জন্মগতভাবে বিকৃত গড়নের জরায়ু দেখা যায়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৪. সার্ভিক্স বা জরায়ু গ্রীবার ক্ষত (Cervix damage) : গর্ভপাতের কারণে কিংবা সন্তান জন্মদানকালে সার্ভিক্সে ক্ষত সৃষ্টি হতে পারে। ক্ষতের টিস্যু সার্ভিক্সকে সংকীর্ণ করে দেয়, মিউকাস ক্ষরণ বন্ধ করে দিতে পারে। সার্ভিক্সের মিউকাসের মাধ্যমে জরায়ুতে শুক্রাণু সহজে পৌঁছাতে পারে। সার্ভিক্স বেশি প্রশস্ত হলে তিন মাস বয়সি ভ্রূণ গর্ভপাতের শিকার হতে পারে।

৫. শুক্রাণুর প্রতি অ্যান্টিবডি (Antibodies to sperm) : কিছু দুর্লভ ক্ষেত্রে নারী তার স্বামীর শুক্রাণুর বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে। জরায়ু, সার্ভিক্স (জরায়ু-গ্রীবা) ও ডিম্বনালিতে এগুলো পাওয়া যায়। ওষুধ প্রয়োগে অনাক্রম্যতন্ত্র দমিয়ে রেখে সমস্যার সমাধান করতে পারলেও আইভিএফ (IVF) সবচেয়ে ভালো পন্থা বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

পুরুষ ও নারীর প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা
(Imbalance of Reproductive Hormones of Male and Female)

প্রজননতন্ত্র মানুষের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গতন্ত্র। এর সুষ্ঠু কর্মকাণ্ডও সম্পন্ন হয় কয়েকটি প্রধান ও অপ্রধান প্রজননিক হরমোনের সক্রিয়তায়। এসব হরমোনের কার্যকারিতায় পরিচিত নারী ও পুরুষ এককে সময় এককে রূপে অবির্ভূত হয় বলে মনে হয়। নিচে পুরুষ ও নারীর প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

নারীর প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা

ডিম্বাশয় থেকে অনেক হরমোন ক্ষরিত হয়। তার মধ্যে **ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টেরন ও অ্যান্ড্রোজেন** প্রধান। এসব হরমোনের ক্ষরণের মাত্রা কম-বেশি হলে স্বভাবতই ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে। নিচে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ইস্ট্রোজেন সংক্রান্ত ভারসাম্যহীনতা

উচ্চমাত্রার ইস্ট্রোজেন : ৩৫ বছরের বেশি বয়স্ক নারীর দেহে উচ্চ মাত্রার ইস্ট্রোজেন থাকে। এ সংক্রান্ত জটিলতাকে বয়স ও রজঃচক্রজনিত স্বাভাবিক সমস্যা হিসেবে মেনে নিয়ে নারীরা দিন কাটায়। উচ্চমাত্রার ইস্ট্রোজেনের ফলে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায় তার মধ্যে রয়েছে **প্রাক-রজঃচক্রীয় সিন্ড্রোম** (pre-menstrual syndrome, PMS)। এর ফলে স্তন ফুলে যায়, স্পর্শকাতর ও ব্যথাকাতর হয়; শরীরে পানি জমে, ওজন বেড়ে যায়; ব্রণ উঠে, স্তনবৃন্ত থেকে স্রাব নির্গত হয়; ভালো ঘুম হয় না, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়; দুর্বল লাগে; মাথা ব্যথা, মাইগ্রেন, স্তনব্যথা, পিঠের নিচে ব্যথা হয়; মিষ্টি ও নোনতা খাবারের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে; আত্মীয় ও বন্ধুদের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখে; কোনো কাজে মন বসে না; স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে পারে; সহবাসে অনাগ্রহ জন্মে, কিংবা গর্ভপাতও হতে পারে।

নিম্নমাত্রার ইস্ট্রোজেন : রজঃনিবৃত্তকালে নিম্নমাত্রার ইস্ট্রোজেন থাকা স্বাভাবিক। তবে কারও জরায়ু অপসারিত হলে, কেমোথেরাপি বা বিকিরণ থেরাপির সম্মুখীন হলে তাদের শরীরেও ইস্ট্রোজেনের মাত্রা কমে যায়। ইস্ট্রোজেন মাত্রা কম হলে যোনিদেশের চারপাশের প্রাচীর পাতলা হয়ে শুকিয়ে যায় যে কারণে সহবাস কষ্টদায়ক হয়। এর ফলে ইউরেথ্রার প্রাচীরও পাতলা হয়ে সংক্রমণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া, অবসাদ, রাতে ঘাম হওয়া, মনোযোগে বিঘ্ন ঘটা, সন্ধিব্যথা, ত্বক শুষ্ক হওয়া, মাথাব্যথা, মাইগ্রেন, আতংকগ্রস্ত থাকা ইত্যাদিও কম এস্ট্রোজেনের কুফল।

প্রোজেস্টেরন সংক্রান্ত ভারসাম্যহীনতা

উচ্চমাত্রার প্রোজেস্টেরন : প্রোজেস্টেরন সাধারণত রজঃচক্রকালে ক্ষরিত হয়। যারা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি ব্যবহার করে তাদের দেহে এ হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়। অবসাদ ও যন্ত্রণাহরণকারী বা ব্যথানাশক ওষুধ সেবনেও প্রোজেস্টেরনের মাত্রা বেড়ে যায়, রজঃস্রাবের পরিমাণ কমে যায় এবং ইউরেথ্রার প্রাচীরে প্রভাব বিস্তার করে। দেহে উচ্চমাত্রার প্রোজেস্টেরনের লক্ষণ হচ্ছে– বুকে ব্যথাপ্রবণতা ও স্ফীত হওয়া, অস্থির মেজাজ, অতিরিক্ত ঘুমভাব, কার্যকর এস্ট্রোজেন স্বল্পতা ইত্যাদি।

নিম্নমাত্রার প্রোজেস্ট্রেরন : নারীদেহে প্রোজেস্টেরন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হরমোনের একটি। দেহের অনেক সূক্ষ্ম কাজের উদ্দীপক ও নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। এটি অন্যতম মৌলিক হরমোন যা প্রয়োজনে এস্ট্রোজেন ও কর্টিসোন উৎপন্ন করে। দেহে নিম্নমাত্রার প্রোজেস্ট্রেরনের লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে– অনুর্বরতা, পিত্তথলির অসুখ, অনিয়মিত রজঃচক্র, রজঃচক্রের সময় রক্তজমাট, স্তনব্যথা, শুষ্ক যোনিদেশ, কম ব্লাড-সুগার, অবসাদ, ম্যাগনেসিয়াম স্বল্পতা প্রভৃতি।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

অ্যান্ড্রোজেন সংক্রান্ত ভারসাম্যহীনতা

উচ্চমাত্রার অ্যান্ড্রোজেন : নারীদেহে অ্যান্ড্রোজেনের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে প্রয়োজনে এস্ট্রোজেন নামক স্ত্রীহরমোনে পরিবর্তিত হওয়া। এসব হরমোন রজঃনিবৃত্তির আগে, সময়কালীন ও পরবর্তী সময় জননতন্ত্র, অস্থি, বৃক্ক, যকৃত ও পেশিসহ দেহের অন্যান্য অঙ্গ ও সেগুলোর কাজকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। যৌন উত্তেজনা ও মিলনেও অ্যান্ড্রোজেন প্রভাব বিস্তার করে। দেহে উচ্চমাত্রার অ্যান্ড্রোজেন উপস্থিতির প্রধান লক্ষণ হচ্ছে– অনুর্বরতা, রজঃচক্র অনিয়মিত হওয়া বা একেবারে না হওয়া, পলিসিস্টিক ওভারি সিন্ড্রোম (Polycystic Ovary Syndrome, PCOS), অস্বাভাবিক স্থান লোমশ হওয়া (যেমন–মুখমন্ডল, ঠোঁট প্রভৃতি জায়গায়), চুল কমে যাওয়া, ব্রণ দেখা দেয়া, ভাল কোলেস্টেরল কমে যাওয়া, খারাপ কোলেস্টেরল বেড়ে যাওয়া, উদরের চতুর্দিক ঘিরে চর্বির পরিমাণ বেড়ে যাওয়া প্রভৃতি।

নিম্নমাত্রার অ্যান্ড্রোজেন : নিম্নমাত্রার অ্যান্ড্রোজেনে সব বয়সের নারীরা বিভিন্ন জটিলতায় ভুগতে পারে। তবে বেশি ভুক্তভোগী হচ্ছে প্রাক রজঃনিবৃত্ত ও রজঃনিবৃত্তকালীন নারী। এ সময় পিটুইটারি গ্রন্থিতে টিউমার দেখা দিতে পারে এবং হাড়ের ক্ষয় হতে পারে। অবসাদ, উত্তেজনা হ্রাস, ভাল মন্দের বাছবিচার থাকে না, যোনিদেশে শুষ্কতা প্রভৃতি নিম্নমাত্রার অ্যান্ড্রোজেনসংক্রান্ত জটিলতার লক্ষণ।

পুরুষে প্রজনন হরমোনের ভারসাম্যহীনতা

টেস্টোস্টেরন পুরুষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমোন। জননক্ষম পুরুষে এটি নিয়মিত শুক্রাশয়ে উৎপন্ন ও রক্তস্রোতে প্রবাহিত হয়ে দেহ সুস্থ রাখে। এ হরমোন পুরুষে গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের (পেশল দেহ, দাড়ি-গোঁফের প্রকাশ, কণ্ঠ পুরু ও স্বর গভীর করে তোলে, যৌনাঙ্গ সুগঠিত ও বড় করে) প্রকাশ ঘটায়। এ হরমোন যৌন উদ্দীপনাকে তাড়িত করে এবং FSH (Follicle Stimulating Hormone)-এর সহযোগিতায় শুক্রাণু সৃষ্টিতে উদ্দীপনা যোগায়। বয়স্ক পুরুষে যাদের যৌনশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, কিছু গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিলোপ ঘটে। তারা হরমোন প্রতিস্থাপনার মাধ্যমে পুনর্যৌবন ফিরে পেতে চায় কিন্তু এতে হিতে বিপরীত ফল হয়, প্রস্টেট গ্রন্থির ক্যান্সার ও অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস-এর আশঙ্কা বহুগুণ বেড়ে যায়।

সাধারণত বয়স বাড়ার সাথে সাথে পুরুষে টেস্টোস্টেরনের ভারসাম্যহীনতা প্রকট হয়ে উঠে। গড়ে ৪০–৫০ বছরের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা নিচে বর্ণিত লক্ষণগুলোর মাধ্যমে স্পষ্ট হতে থাকে।

১. অবসাদগ্রস্ত ও দুর্বল অনুভব : এ লক্ষণ নানাভাবে প্রকাশ হতে পারে, যেমন– খাওয়ার পর ক্লান্তিবোধ, স্বাভাবিকের চেয়ে কম কাজ করতে পারা, সারাদিনের সামগ্রিক কাজের পারফরমেন্স নিচুমাত্রার এবং সারাদিন অবসাদগ্রস্ত থাকা। তা ছাড়া, মিলন আকাঙ্ক্ষা কমে যাওয়া, ঘাম হওয়া, গায়ে ব্যথা হওয়া, যৌনাঙ্গ কর্মক্ষম না হওয়া প্রভৃতিও টেস্টোস্টেরন হরমোনের ভারসাম্যহীনতার ফল।

২. অকালে বুড়িয়ে যাওয়া : দৈহিক ও মানসিকভাবে বুড়িয়ে যাওয়া এ হরমোনের ভারসাম্যহীনতার ফল। চুল পাতলা বা ধূসর হয়ে যাওয়া, হাড়ের ঘনত্ব ও চামড়ার ঔজ্জ্বল্য কমে যাওয়া, কোমরে চর্বি জমা, স্মরণ শক্তি কমে যাওয়া, ঘুম না হওয়া প্রভৃতি এ হরমোনের ভারসাম্যহীনতার ফলে ঘটে।

৩. অসুখিভাব : টেস্টোস্টেরন হরমোনের ভারসাম্যহীনতায় নিজের প্রতি বিশ্বাস ও সম্মানবোধ কমে যায়। দুশ্চিন্তা, স্নায়ুদৌর্বল্য বেড়ে যাওয়া, বিষন্নতায় ভোগা, কোনো ধরনের উদ্যোগ বা প্রতিযোগিতাহীনতার প্রকাশ, উত্তেজিত হয়ে উঠা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

৪. যৌন উত্তেজনা কমে যাওয়া : টেস্টোস্টেরনের ভারসাম্যহীনতায় যৌন উত্তেজনা কমতে কমতে একেবারে কমে যায়। এমনকি যৌনাঙ্গ উত্থানেও অক্ষম হয়ে পড়ে। পুরুষে টেস্টোস্টেরনের স্বাভাবিক মাত্রা হচ্ছে ৩৫০–১২৩০ ন্যানোগ্রাম [এক ন্যানোগ্রাম = এক গ্রামের ১০০ কোটি ভাগের ১ ভাগ]। এভাবে টেস্টোস্টেরন হরমোনের অভাবে যৌন উত্তেজনা হ্রাস, যৌনাকাঙ্ক্ষার অনুপস্থিতি ও পৌরষত্বের প্রকাশহীনতাকে **অ্যান্ড্রোপজ** (andropause) বলে। অ্যান্ড্রোপজকে নারীর **মেনোপজ** (menopause) এর সঙ্গে তুলনা করা হয়।

ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় সমস্যা (Problems during Foetal Development)

ভ্রূণের বৃদ্ধি ও সন্তান ভূমিষ্ঠের ক্ষেত্রে উন্নত, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ভ্রূণের বৃদ্ধি ও সঠিক জন্মদানের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৯৭% সফল বলে দাবী করেছে CDC (2011)। সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে একটি সুস্থ সবল শিশুর জন্মদানে কতখানি সর্তক থাকতে হয় সে বিষয়ে সাধারণ ধারণা অর্জনের জন্য এখানে ভ্রূণের বৃদ্ধির সময়

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কী কী সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় এবং সাম্প্রতিককালে এসব সমস্যার মোকাবিলার উপায় সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

ভ্রূণের বৃদ্ধিকালীন সমস্যা অন্তহীন। সমস্ত সমস্যাকে আলোচনার সুবিধার জন্য প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়: (ক) জিনগত ও ক্রোমোজোমগত সমস্যা এবং (খ) টেরাটোজেনজনিত সমস্যা।

ক. জিনগত ও ক্রোমোজোমগত সমস্যা (Genetic and Chromosomal problems)

প্রকট ও প্রচ্ছন্ন জিনের কারণে জন্মের শুরুতেই সমস্যার সূত্রপাত ঘটে। অটোসোমের মধ্যে অবস্থিত জিনগুলো অটোসোমাল ব্যাধি (autosomal disorder)-র সৃষ্টি করে। X-ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোর কর্মকান্ডে দেখা দেয় সেক্স-লিংকড রোগব্যাধি। নিচে কয়েকটি ব্যাধির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. **অটোসোমাল ব্যাধি** : অধিকাংশ প্রচ্ছন্ন অটোসোমাল রোগের বিকাশ ভ্রূণে হলেও প্রকাশ ঘটে জন্মের ঠিক পর মুহূর্তে বা শিশু বয়সে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দশ হাজার শিশুর মধ্যে একজনে এমন একটি অসুখ দেখা যায় যা একটি প্রচ্ছন্ন জিনের কারণে হয়ে থাকে। এ জিনের প্রভাবে শিশু **ফিনাইলঅ্যালানিন** (phenylalanine) নামক অ্যামিনো এসিড হজম করতে পারে না। এ কারণে মস্তিষ্কে বিষাক্ত পদার্থ জমা হয়ে শিশুকে মানসিক প্রতিবন্ধিতে পরিণত করে। এ অসুখের নাম **ফিনাইলকিটোনিউরিয়া** (Phenylketonuria)। প্রকট জিনের ব্যাধি হিসেবে **হ্যান্টিংটন-স ব্যাধি** (Huntington's disease) বিখ্যাত। এ রোগ আবার শিশু পূর্ণবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত প্রকাশ পায় না। এতে মস্তিষ্কের অবনতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও স্নায়বিক বৈকল্য ত্বরান্বিত হয়। রোগ শনাক্তের জন্য আগে শিশুকে পূর্ণবয়স্ক হতে হতো, এখন রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে আরো আগেই শনাক্ত করা যায়।

২. **সেক্স-লিংকড ব্যাধি** : লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা ও হিমোফিলিয়া এ দুটি অতিপরিচিত সেক্স-লিংকড ব্যাধি। প্রচ্ছন্ন জিনের কারণে এ অসুখ হয়। আরেকটি অসুখ আছে তার নাম **ফ্র্যাজাইল-X সিন্ড্রোম** (Fragile-X Syndrome)। প্রতি চার হাজার পুরুষের একজন আর প্রতি আট হাজার নারীর একজন এ অসুখে ভোগে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি X ক্রোমোজোমে ভঙ্গুর বা ক্ষতিগ্রস্ত একটি জায়গা আছে। শিশুর বয়স যতো বাড়ে অন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার মাত্রা ততো কমে যায়। কারণ এটি মানসিক প্রতিবন্ধীগত এবং **অটিজম** (autism)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কিত রোগ।

৩. **ট্রাইসোমি** (Trisomy) : এটি ক্রোমোজোমঘটিত অন্যতম রোগ। ক্রোমোজোমের বিশৃঙ্খল আচরণে অর্ধশতাধিক অসুখে মানুষ ভোগে এবং এসব রোগের অধিকাংশের প্রতিক্রিয়ার ফলে গর্ভপাত ঘটে থাকে। ট্রাইসোমি এমন এক অবস্থা যখন ভুক্তভোগী নির্দিষ্ট অটোসোমের ৩ কপি বহন করে। যেমন সবচেয়ে পরিচিত **ডাউন সিন্ড্রোম** (একে ট্রাইসোমি 21-ও বলে)। এ ক্ষেত্রে শিশুদেহে ক্রোমোজোম ২১-এর তিনটি কপি থাকে। এ ধরনের জটিলতা নিয়ে ৮০০-১০০০ শিশুর মধ্যে ১ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে। বিশেষ আকৃতির চোখ, মুখ ও গাল, সে সঙ্গে মস্তিষ্কের ছোট আকৃতি, হৃদরোগ প্রভৃতি জটিলতা নিয়ে চরম মানসিক প্রতিবন্ধী হিসেবে শিশু জন্ম নেয়, বেড়ে উঠে।

খ. টেরাটোজেন (Teratogens) জনিত সমস্যা

সফল গর্ভধারণই সুস্থ শিশুর জন্মদানের একমাত্র উপায় নয়। ভ্রূণের বৃদ্ধি কোন পরিবেশে হচ্ছে সে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বের সঙ্গে ভেবে দেখা উচিত। মনে রাখতে হবে, ভ্রূণ এমন কোনো অবস্থায় থাকে না যা পরিবেশের আওতার বাইরে। এ কারণে, দূষিত বহিঃপরিবেশ, মায়ের অসুস্থতা ও ওষুধ গ্রহণ কিংবা মাদক সেবন সবকিছুতে ভ্রূণের বৃদ্ধি প্রভাবিত হয়। ভ্রূণ বৃদ্ধির প্রায় শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ ৬-৮ সপ্তাহের মধ্যে যখন এটি বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রে সজ্জিত ফিটাসে পরিণত হবে সে সময়কালটি সবচেয়ে বেশি বিপদসংকুল। তখন বিভিন্ন পরিবেশিক কারণে অঙ্গবিকৃতি বা অঙ্গহানি ঘটে। এ সব বিকৃতি বা হানির জন্য যে কারণগুলো দায়ী সেগুলোই হচ্ছে টেরাটোজেন। নিচে কতকগুলো টেরাটোজেন ও মানবভ্রূণে তার কুফল আলোচনা করা হলো।

১. **রুবেলা / জার্মান হাম** (Rubella / German Measles) : ভ্রূণাবস্থায় রুবেলা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে ভ্রূণের গর্ভপাত ঘটে কিংবা ভূমিষ্ঠ হলেও অন্ধ, বধির, মানসিক প্রতিবন্ধী, হৃৎপিন্ড ও স্নায়ুতন্ত্রে ত্রুটি নিয়ে জন্মায়।

২. **HIV ও হেপাটাইটিস B** : এ ধরনের ভাইরাসে আক্রান্ত মাতৃদেহে বর্ধনশীল ভ্রূণ জন্মগত অঙ্গবিকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, বরং জীবনহরণকারী সংক্রমণ হিসেবে পরিচিত।

৩. **সাইটোমেগালোভাইরাস** (Cytomegalovirus, CMV) : এটি হারপিস গ্রুপভুক্ত ভাইরাস। পূর্ণবয়স্ক মানুষে এ ভাইরাস কোনো উপসর্গ বা লক্ষণ প্রকাশ করে না বলে এর উপস্থিতি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। কিন্তু সন্তান জন্মগত পঙ্গু হয়ে জন্মায়। সিফিলিসের সংক্রমণে শিশু চোখ, কান ও মস্তিষ্কের খুঁত নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৪. **দীর্ঘকালীন অসুস্থতা** (Chronic illness) : হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও লুপাস (lupus) নামে চর্মক্ষত রোগ, ভ্রূণের পরিস্ফুটনে প্রভাব ফেলে। ডায়াবেটিস আক্রান্ত মা'দের বিপাকীয় তারতম্যের কারণে যেভাবে রক্তে চিনির মাত্রার তারতম্য ঘটে এবং তার মাত্রা সঠিক রাখতে সুচিন্তিত ব্যবস্থা না নিলে ভ্রূণের স্নায়ুতন্ত্র মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫. **ধূমপান** (Smoking) : ধূমপায়ী মায়ের ভ্রূণ বৃদ্ধিকালীন সময়ে মারাত্মক পুষ্টি সংকটে ভোগে ফলে কম ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তামাক (সিগারেট) জাতীয় দ্রব্যাদির প্রধান উপাদান নিকোটিন। নিকোটিন রক্তবাহিকার নালি সংকুচিত করে দেয় ফলে অমরায় রক্ত প্রবাহ ও পুষ্টি পদার্থের পরিমাণ কমে যায়, ভ্রূণের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

৬. **মদপান** : বর্ধনশীল ভ্রূণকে গর্ভে ধারণ করে অবাধে মদপান করলে ভূমিষ্ঠ শিশু যে অসুখে ভোগ তার নাম **ফিটাল অ্যালকোহল সিন্ড্রোম** (Foetal Alcohol Syndrome, সংক্ষেপে FAS)। যে মায়েরা অতিরিক্ত মদ্যপায়ী বা অ্যালকোহলিক তাদের গর্ভস্থ ভ্রূণ যে সব ক্ষতির সম্মুখীন হয় তার প্রকাশ ঘটে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর।

৭. **খাদ্যগ্রহণ** : গর্ভবতী মায়ের খাদ্য গ্রহণের বিষয়টি সারা পৃথিবীতে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়। শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাই অন্ততঃ এ বিষয়ে সজাগ যে ভ্রূণের স্বাভাবিক ও সুস্থ বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর ও বাড়তি খাবার প্রয়োজন। গবেষণার আলোকে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে ভ্রূণের বৃদ্ধির সময় নিউরাল নালির পরিস্ফুটনে ফলিক এসিডযুক্ত খাদ্য গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। কোনো নারীর গর্ভসঞ্চার হয়েছে কিংবা তা জানার আগেই ভ্রূণের নিউরাল নালির পরিস্ফুটন শুরু হয়ে যায়। অতএব, আহারের বাছ-বিচার অত্যন্ত জরুরী।

৮. **মানসিক অবস্থা** : ভ্রূণের বৃদ্ধিকালীন সময়কালটি বাংলাদেশের ধনী-গরীব সব পরিবারই সচেষ্ট থাকে যেন মা ও শিশু সুস্থ থাকে। পরিবারে বয়স্ক সদস্যের নির্দেশও থাকে যেন মায়ের মন সবসময় আনন্দে থাকে। আধুনিক যান্ত্রিক যুগেও এটি প্রমাণিত হয়েছে যে প্রফুল্ল থাকা মায়ের ভ্রূণ যেভাবে বর্ধিত হয় বিষন্ন মায়ের ভ্রূণ তেমনটি হয় না।

যৌনবাহিত রোগ (Sexually Transmitted Diseases)

যে সব রোগ যৌন মিলনের সময় সংক্রমণের মাধ্যমে এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে সে সব রোগকে **যৌনবাহিত রোগ** (sexually transmitted diseases, STDs) বলে। চিকিৎসাবিদ্যার সংজ্ঞা অনুযায়ী, সংক্রমণের ফলে লক্ষণ প্রকাশ পেলে তাকে রোগ (disease) বলে। যেহেতু অনেক সময় যৌনবাহিত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না তাই এ অবস্থাকে যৌনবাহিত রোগ না বলে **যৌনবাহিত সংক্রমণ** (sexually transmitted infections) বলে। রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাক না পাক সাধারণ মানুষের কাছে এগুলো যৌনবাহিত রোগ নামেই বহুল পরিচিত। অনেক ধরনের যৌনবাহিত রোগ ও সংক্রমণ রয়েছে। কেবল নিরাপদ যৌনমিলনের মাধ্যমেই এসব রোগ ও সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। এ বইয়ে সিলেবাসভুক্ত ৩টি যৌনবাহিত রোগ (সিফিলিস, গনোরিয়া ও এইডস) এর লক্ষণ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ক. সিফিলিস (Syphilis)

Treponema pallidum নামক ব্যাকটেরিয়ামের সংক্রমণে সৃষ্ট যৌনবাহিত রোগকে সিফিলিস বলে। এ রোগে দেহে দীর্ঘকালীন জটিলতা দেখা দেয় এবং সঠিক চিকিৎসা না করালে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে।

সংক্রমণ প্রক্রিয়া (Mode of Transmission)

সিফিলিস আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে সৃষ্ট **সিফিলিটিক ক্ষত** (syphilitic sore)-এর সরাসরি সংস্পর্শে এলে জনান্তরে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সিফিলিটিক ক্ষত প্রধানত বহির্যৌনাঙ্গ, যোনি, পায়ু বা মলাশয়ে অবস্থান করে, কিছু দেখা যায় ঠোঁট ও মুখে। যৌনমিলনের ধরনের উপর (যোনি, পায়ু, মুখ) সংক্রমণের উৎস নির্ভর করে। সিফিলিসে আক্রান্ত গর্ভবতী নারী সন্তান ভূমিষ্ঠের আগেই তার শরীরে সিফিলিস রোগের বিস্তার ঘটিয়ে দেয়। সিফিলিসের জীবাণুতে সংক্রমিত হলে সাধারণত ২১ দিনের মাথায় রোগের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে, তবে ব্যক্তি বিশেষে সময়কাল ১০-৯০ দিন হতে পারে।

লক্ষণ (Symptoms)

সিফিলিসের প্রথম লক্ষণ যেমন বেশ দেরিতে (অর্থাৎ ২১ দিন পর) প্রকাশ পায় তেমনি শেষ পর্যায়ে যেতেও অনেক সপ্তাহ, মাস বা বছর পেরিয়ে যায়। লক্ষণ প্রকাশের সময়কালকে ৪টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

১. **প্রাথমিক পর্যায়** (Primary stage) : ২১ দিন পর ১টি মাত্র সিফিলিটিক ক্ষত প্রকাশিত হয়। এটি দৃঢ়, গোল ও ব্যথাহীন ক্ষত। এটি দেখে বোঝা যায় জীবাণু কোন পথে সংক্রমিত হয়েছে। তিন থেকে ছয় সপ্তাহ পর ক্ষতপূরণ হয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে ধাবিত হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. **মাধ্যমিক পর্যায়** (Secondary stage) : গায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসকুড়ি (rash) দেখা দেয়া এবং সিফিলিটিক ক্ষত অমসৃণ, লাল বা লালচে বাদামী দাগ হিসেবে হাত-পায়ের তালুতে আবির্ভূত হওয়া এ পর্যায়ের লক্ষণ। ক্ষত ছাড়াও জ্বর, স্ফীত লসিকা গ্রন্থি, গলাভাঙ্গা, বিভিন্ন জায়গায় চুল উঠে যাওয়া, মাথাব্যথা, ওজন কমে যাওয়া, পেশিব্যথা, ক্লান্তি প্রভৃতিও এ পর্যায়ে দেখা দেয়।

চিত্র ৯.১৯ : সিফিলিস রোগের লক্ষণসমূহ

৩. **সুপ্ত পর্যায়** (Latent stage) : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের লক্ষণগুলো অদৃশ্য হলে শুরু হয় সুপ্ত পর্যায়। এ সময় আক্রান্তের দেহে কোনো ক্ষত, ফুসকুড়ি বা অন্যান্য লক্ষণ দেখা যায় না। বছরের পর বছর এ পর্যায় অব্যাহত থাকতে পারে।

৪. **বিলম্বিত পর্যায়** (Late stage) : জীবাণুতে প্রথম সংক্রমিত হওয়ার প্রায় ১০-২০ বছর পর সিফিলিস পূর্ণাঙ্গরূপে আবির্ভূত হয়। রোগের বিলম্বিত দশায় রোগীর মস্তিষ্ক, স্নায়ু, চোখ, হৃৎপিন্ড, রক্তকণিকা, যকৃত, গ্রন্থি ও সন্ধির ক্ষতি সাধন করে। ফলে পেশি সঞ্চালনে বিঘ্ন ঘটে, দেখা দেয় পঙ্গুত্ব, অন্ধত্ব, হতবুদ্ধি ও অস্থিরচিত্ত। এ অবস্থায় মানুষের মৃত্যু ঘটে।

প্রতিকার (Remedy)

প্রতিরোধ : সিফিলিসের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে **স্থায়ী সঙ্গীর সঙ্গে জীবনযাপন করা,** ভিন্ন সঙ্গীর কথা চিন্তাই করা উচিত নয়। কিংবা কোথাও সিফিলিস রোগী আছে এমন ঘরে যাওয়া-আসা করাও নিরাপদ নয়। তা ছাড়া, অ্যালকোহল ও মাদক জাতীয় দ্রব্য থেকে দূরে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়, কারণ এসব পান বা সেবন যৌন আচরণকে উসকে দেয়, তখন সঙ্গী নির্বাচন সঠিক নাও হতে পারে।

চিকিৎসা : সিফিলিসের লক্ষণ জানা থাকলে প্রাথমিক পর্যায়ে সহজেই চিকিৎসা করানো সম্ভব হয়। কারও দেহে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক পর্যায় বা প্রাক-সুপ্ত পর্যায়ের সিফিলিস জীবাণু থাকলে তাকে একটি মাত্র Benzathine Penicillin-G। ইনজেকশন দিলেই রোগ দূর হতে পারে। সুপ্ত পর্যায়ের শেষ অবস্থায় থাকলে তাকে প্রতি সপ্তাহে একটি করে ইনজেকশন দিতে হয়। চিকিৎসার ফলে সিফিলিস সারবে কিন্তু দেহের ক্ষতিগ্রস্থ টিস্যুর ক্ষত পূরণ হবে না। সম্পূর্ণ না সারা পর্যন্ত যৌন মিলন থেকে নিজেকে বা অন্যকে বিরত রাখতে হবে।

খ. গনোরিয়া (Gonorrhea)

Neisseria gonorrhoeae প্রজাতিভুক্ত ব্যাকটেরিয়ামের সংক্রমণে সৃষ্ট যৌনবাহিত রোগকে গনোরিয়া বলে। *N. gonorrhoeae* নারীর জনন নালি (সারভিক্স, জরায়ু, ফেলোপিয়ান নালিসহ) এবং নারী ও পুরুষের ইউরেথ্রার মিউকাস ঝিল্লিতে সংক্রমণ ঘটায়। মুখ, গলা, চোখ ও পায়ুর মিউকাস ঝিল্লিও এ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে আক্রান্ত হয়। গর্ভকালীন জটিলতা ছাড়াও নারী-পুরুষ উভয়ে বন্ধ্যা-বন্ধ্য হয়ে যেতে পারে।

সংক্রমণ প্রক্রিয়া (Mode of Transmission)

যৌন মিলনের সময় আক্রান্ত দেহের বহির্যৌনাঙ্গ, মুখ ও পায়ু থেকে সংক্রমণ ঘটে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ও আক্রান্ত মাতৃদেহ থেকে এ রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে। যে ব্যক্তি এক সময় গনোরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসায় সেরে উঠেছে এমন ব্যক্তি গনোরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে পুনর্মিলন ঘটালে সেও পুনঃসংক্রমিত হতে পারে। গনোরিয়ায় আক্রান্ত অনেক ব্যক্তির দেহে তেমন স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পায় না বলে এটি ব্যাপক বিস্তৃত যৌনবাহিত অসুখ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

লক্ষণ (Symptoms)

পুরুষে গনোরিয়ার লক্ষণ : আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন মিলনের ২–১৩ দিনের মধ্যে লক্ষণ প্রকাশ পায়। (i) পেনিসের মাথা প্রথমে লাল হয়ে ওঠে ও চুলকায়। পরবর্তীতে সেখান থেকে পুঁজ নির্গত হয়। (ii) জালাপোড়া হয়, প্রস্রাবের তীব্রতা, ঘন ঘন প্রস্রাব হয়। (iii) কুচকির লসিকাগ্রন্থি ফুলে যায় ও ব্যথা হয়। (iv) সেমিনাল ভেসিকল আক্রান্ত হলে রক্তপূর্ণ বীর্যপাত হয় এবং ব্যথা হয়। (v) প্রস্টেট আক্রান্ত হলে পায়ুর সম্মুখে ব্যথা হয় এবং মলত্যাগের সময় ব্যথা বেড়ে যায়। (vi) সাধারণত জ্বর জ্বর ভাব থাকে। (vii) দীর্ঘদিন সংক্রমণের কারণে অস্থিসন্ধিতে প্রদাহ, ত্বকে ক্ষত, মস্তিষ্কে প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের ক্ষত হতে পারে।

নারীতে গনোরিয়ার লক্ষণ : পুরুষের চেয়ে মহিলা এ রোগে কম আক্রান্ত হয়। (i) সংক্রমণের কারণে যোনির ওষ্ঠে লাল ও দগদগে ঘা হয়। (ii) যোনি পথে অস্বাভাবিক সাদা ও হলুদ বর্ণের স্রাব নিঃসৃত হয়। (iii) প্রস্রাবের যন্ত্রণা, প্রস্রাবের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ঘন ঘন প্রস্রাব হয়। (iv) ডিম্বনালি আক্রান্ত হলে এটি পুঁজ দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, ফলে সন্তান ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়। (v) তলপেটে ব্যথা হয়। (vi) মাসিক অনিয়মিত হয় ও তীব্র ব্যথা হয়। (vii) দীর্ঘদিন সংক্রমণের কারণে অস্থিসিন্ধতে প্রদাহ, ত্বকে ক্ষত, মস্তিষ্কে প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডে ক্ষত হতে পারে। (viii) পায়ুপথে সংক্রমিত হলে পায়ুপথে তীব্র প্রদাহ ও রক্ত ক্ষরণ হতে পারে। মায়ের এরোগ থাকলে শিশু অপথালমিয়া নিওন্যাটারাম নামক চোখের প্রদাহ নিয়ে জন্ম নিতে পারে।

Neisseria gonorrhoeae (পরজীবী) রোগের লক্ষণ

চিত্র ৯.২০ : গনোরিয়া রোগের লক্ষণসমূহ

প্রতিকার (Remedy)

সামান্য সতর্কতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান রাখলে গনোরিয়ার মতো মারাত্মক যৌনবাহিত রোগ থেকে নিজেকে ও ভবিষ্যৎ বংশধরকে নিরাপত্তা দেয়া খুব সহজ। এ জন্যে যা করা দরকার তা হচ্ছে : বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককে দিয়ে কম বয়সী ও গর্ভবতী নারীদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করাতে হবে; যৌনসঙ্গী নির্বাচনে অবশ্যই সর্তক ও নিশ্চিত থাকতে হবে; চিকিৎসকের প্রেসক্রিপসন অনুযায়ী ওষুধ খেতে বা লাগাতে হবে; নিরোগ না হওয়া পর্যন্ত মিলনে প্রবৃত্ত না হওয়া; প্রতিবার মিলনকালে কনডম ব্যবহার করা ইত্যাদি।

গ. এইডস (AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome)

AIDS হলো Acquired (অর্জিত) Immune (ইমিউন বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা) Deficiency (ডেফিসিয়েন্সি বা হ্রাস) Syndrome (সিনড্রোম বা অবস্থা) এর সংক্ষিপ্ত রূপ। অর্থাৎ, **বিশেষ কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়াকে এইডস (AIDS) বলে।** Human Immunodeficiency Virus, সংক্ষেপে HIV নামক ভাইরাস দ্বারা এ রোগ সৃষ্টি হয়। HIV ভাইরাসের আক্রমণে মানুষের শ্বেত রক্তকণিকার ম্যাক্রোফেজ ও T_4 লিম্ফোসাইট ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এতে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মারা যায়। বর্তমান বিশ্বে AIDS একটি মারাত্মক রোগ। ২০০০ সালে বিশ্বে HIV আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ। এদের মধ্যে মারা যায় প্রায় ৩০ লক্ষ। আফ্রিকান দেশসমূহে HIV-র আক্রমণ বেশি লক্ষ করা যায়।

চিত্র ৯.২১: লালফিতা; HIV পজেটিভ ব্যক্তি ও এইডস-এ আক্রান্তদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশের প্রতীক।

ধারণা করা হয় বানরের দেহে এই ভাইরাসটি ছিল যা সর্বপ্রথম আফ্রিকায় বানর থেকে মানুষে স্থানান্তরিত হয় এবং পরে তা আমেরিকা, ইউরোপ তথা বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৮৩ সালে ফ্রান্সের পাস্তুর ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী Dr. Lue Montagnier এবং আমেরিকার ন্যাশনাল কেমিক্যাল ইনস্টিটিউট এর Dr. Robert Gallo 1984 সালে পৃথকভাবে AIDS এর জীবাণু আবিষ্কার করেন।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

AIDS-এর বিস্তার (Spread of AIDS)

বিভিন্ন উপায়ে এইডসের ভাইরাস একজন সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। যেমন− নারী-পুরুষের অস্বাভাবিক ও অসামাজিক যৌন আচরণ, সংক্রমিত সিরিঞ্জ ব্যবহার, সংক্রমিত রক্ত গ্রহণ, সংক্রমিত মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণকারী শিশু, সেলুনে একই ব্লেড বা ক্ষুর বিভিন্ন জনে ব্যবহার করা, দন্ত চিকিৎসা ও শল্য চিকিৎসা গ্রহণকারী ইত্যাদি।

রোগের লক্ষণ

এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর শ্বেতরক্তকণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ফলে রোগীর দেহ ধীরে ধীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারাতে থাকে এবং নিচে বর্ণিত লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে থাকে−

(i) প্রাথমিক অবস্থায় দেহে জ্বর আসে এবং অপ্রত্যাশিতভাবে জ্বর দীর্ঘায়িত হয়; (ii) দেহের বিভিন্ন গ্রন্থি ফুলে যায় এবং শরীর শুকিয়ে যায় ও ওজন কমতে থাকে; (iii) পেটে ব্যথা হয় এবং খাবারে অনীহা সৃষ্টি হয়; (iv) ফুসফুসে জীবাণুর আক্রমণ ঘটে এবং বুকে ব্যথাসহ শুষ্ক কফ জমে; (v) অস্থিসন্ধিসমূহে প্রচন্ড ব্যথা সৃষ্টি হয় এবং দেহে জ্বালাপোড়া হয়; (vi) শ্বাসকষ্ট, জিহ্বায় সাদা স্তর জমা, ত্বকের মিউকাস ঝিল্লি বা যে কোনো ছিদ্র থেকে রক্তপাত, ঘন ঘন ফুসকুড়ি, সার্বক্ষণিক মাথা ব্যাথা এবং ক্রমশঃ স্মৃতিশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়; (vii) সংক্রমণের চূড়ান্ত পর্যায়ে রোগী যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অন্ধত্ব প্রভৃতি একাধিক রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে পরিশেষে মৃত্যুবরণ করে।

চিত্র ৯.২২ : এইডস-এর লক্ষণসমূহ

এইডস-এর লক্ষণ নারী-পুরুষে প্রায় এক রকম হলেও নারীদেহে কতকগুলো বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় যেমন−যোনিতে দীর্ঘস্থায়ী বা অনিরাময়যোগ্য ঈস্টের সংক্রমণ। এ সংক্রমণ সুস্থ নারীদেহে দ্রুত সেরে যায়। জননতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে সংক্রমণজনিত প্রচন্ড জ্বালাপোড়া ও ব্যথা সৃষ্টি হয়। জরায়ু-গাত্রে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV)-এর আক্রমণে টিউমার হওয়া এবং পরবর্তীতে সার্ভিক্স ক্যান্সারে রূপ নেয়া আরেকটি লক্ষণ।

রোগ শনাক্তকরণ

বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে এ রোটি শনাক্ত করা যায়। রক্ত পরীক্ষার মধ্যে বর্তমানে (TPHA test (Treponemal pallidum particle agglutination test), FTA-Abs test (Fluorescent treponemal antibody absorption test), VDRL test (Veneral disease research laboratory test) প্রচলিত।

প্রতিকার

প্রতিরোধ : এইডস প্রতিরোধে নিচে বর্ণিত পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

(i) নিরাপদ যৌন সঙ্গম করা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক বিধি মেনে চলা। (ii) অনিরাপদ যৌন মিলন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা; (iii) যৌন মিলনে কনডমের ব্যবহার এবং এইডস থেকে রক্ষায় এর ভূমিকা সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা; (iv) এইডস-এর ভয়াবহতা সম্পর্কে রেডিও, টেলিভিশন, পত্রিকা, বিলবোর্ড, পোস্টার ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করা; (v) ইনজেকশন গ্রহণের সময় ব্যবহৃত সিরিঞ্জ পুনরায় ব্যবহার না করা এবং শিরার মাধ্যমে কোন ড্রাগ গ্রহণ না করা; (vi) সেলুনে একটি ব্লেড একবারই ব্যবহার করা; (vii) সংক্রমিত ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

সম্পূর্ণভাবে আলাদা রেখে চিকিৎসা প্রদান করা; (viii) পতিতাদের নিরাপদ যৌনতা সম্পর্কে সচেতন করা; (ix) প্রতিবার মিলনকালে কনডম ব্যবহার করা প্রভৃতি।

চিকিৎসা : AIDS রোগের চিকিৎসা এখন পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। গবেষকগণ এ সংক্রান্ত অনেক ওষুধ আবিষ্কার করেছেন। তবে দুটি গ্রুপের ওষুধের ভালো ফলাফল পাওয়া গেছে। প্রথম গ্রুপের ওষুধের নাম **নিউক্লিওসাইড রিভার্স ট্রান্সক্রিপটেজ ইনহিবিটরস** (Nucleoside reverse transcriptase inhibitors)। এটি HIV সংক্রমণকে বিলম্বিত করে। দ্বিতীয় গ্রুপের ওষুধের নাম **প্রোটিয়েজ ইনহিবিটরস** (Protease inhibitors)। এটি HIV-এর প্রতিলিপনে বাঁধা সৃষ্টি করে। এই দুটি গ্রুপের ওষুধ একত্রে সেবন করতে হয়। AIDS-এর এ চিকিৎসা পদ্ধতিকে HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy) বলা হয়। HAART যদিও এইডস রোগকে উপশম করে না তবে রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা কমাতে সাহায্য করে।

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

শুক্রাশয় : পুরুষের দেহগহ্বরের বাইরে দুই উরুর মাঝে ঝুলন্ত থলি সদৃশ অঙ্গ। পুংজননতন্ত্রের অন্যতম অংশ। এখানে শুক্রাণু বা পুংগ্যামেট উৎপন্ন হয়।

স্ক্রোটাম : যে বিশেষ থলির ভিতর শুক্রাশয়দুটি অবস্থান করে তার নাম স্ক্রোটাম। এটি দুই উরুর মাঝখানে ঝুলে থাকে।

ইমপ্ল্যান্টেশন : নিষেকের পর ক্লিভেজের মাধ্যমে বিভাজিত জাইগোট ব্লাস্টোসিস্ট-এ পরিণত হয়। নিষেকের ৬ষ্ঠ–৯ম দিনের মাথায় ব্লাস্টোসিস্ট জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে যে প্রক্রিয়ায় আবদ্ধ হয় তাকে ইমপ্ল্যান্টেশন বলে।

গ্যামেটোজেনেসিস: গ্যামেট তৈরির পদ্ধতিকে গ্যামেটোজেনেসিস বলে। শুক্রাশয়ে পুংগ্যামেট সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে স্পার্মাটোজেনেসিস এবং ডিম্বাশয়ে স্ত্রীগ্যামেট সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে উওজেনেসিস বলে।

ভ্রূণ : জাইগোটের বিভাজনকে **ক্লিভেজ** বলে। এর ফলে প্রথমে **মরুলা** এবং অতঃপর **ব্লাস্টুলা** এবং ব্লাস্টোসিস্ট সৃষ্টি হয়। জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়ামে ব্লাস্টোসিস্ট প্রোথিত হওয়ার পদ্ধতিকে **ইমপ্লান্টেসন** বলে। জরায়ুতে বর্ধনশীল ব্লাস্টোসিস্টের সকল অবস্থাকে ভ্রূণ বলে।

অমরা : সন্তান প্রসবকারী স্তন্যপায়ীদের ভ্রূণের বৃদ্ধি ও বিকাশ মাতৃ প্রাণীর জরায়ুর অভ্যন্তরে ঘটে থাকে। এদের ডিম্বাণু কুসুমবিহীন হওয়ায় গঠনোম্মুখ ভ্রূণ মাতৃপ্রাণী হতে পুষ্টি গ্রহণ করে। পুষ্টি গ্রহণের নিমিত্তে ভ্রূণটিস্যু ও মাতৃটিস্যু মিলে যে বিশেষ অঙ্গ গঠন করে থাকে আমরা বা প্লাসেন্টা বলে।

বয়ঃসন্ধিকাল : বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে পুরুষে ১৩–১৫ বছরের মধ্যে এবং নারীতে ১২–১৩ বছরের মধ্যে দৈহিক ও চারিত্রিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, এগুলোকে **সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্য** বলে। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিরূপে সেকেন্ডারি বৈশিষ্ট্যের উদ্ভবসহ জননাঙ্গের সক্রিয় পরিস্ফুটনকালই বয়ঃসন্ধিকাল।

রজঃচক্র : স্ত্রীদেহের যৌন জীবনকালে ডিম্বাশয় চক্রের বিচিত্র ঘটনার সাথে সঙ্গতি রেখে জরায়ু প্রাচীরে যে ধারাবাহিক পরিবর্তন ঘটে তাকে **জরায়ু চক্র** বা **রজঃচক্র** বলে। এই চক্রের সময়সীমা ২৮ দিন।

আই.ভি.এফ পদ্ধতি : কৃত্রিম গর্ভধারণ প্রক্রিয়াকে IVF পদ্ধতি বলে। এ পদ্ধতিতে নারীর ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু এবং পুরুষের শুক্রাশয় থেকে শুক্রাণু আলাদা করে কৃত্রিমভাবে নিষিক্তকরণ করে জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করাকে আই.ভি.এফ পদ্ধতি বলে।

এইডস : HIV ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত এক ধরনের যৌন রোগ। মারাত্মক এ রোগ প্রাথমিক অবস্থায় জ্বর, পেশি ও মাথা ব্যথা, শরীরে লাল গোটা ইত্যাদি সামান্য লক্ষণ দিয়ে প্রকাশিত হলেও পরবর্তীতে তীব্র অবসাদ, জ্বর, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি নানা উপসর্গসহ শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে মৃত্যু ঘটায়। এ রোগের সঠিক চিকিৎসা অজানা। প্রতিরোধ এর মাধ্যমে এর সংক্রমণ কমানো যায়।

সিফিলিস : *Treponesa pallidum* জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত এক ধরণের যৌনবাহিত রোগ। পুরুষ ও নারীর যৌনাঙ্গে ফুসকুড়ি, ঘা থেকে পরবর্তীতে হাত, পা, তালুতে ক্ষত, লসিকা গ্রন্থি বৃদ্ধি এবং পরে অন্যান্য অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এ রোগের ফলে অন্ধত্ব, প্যারালাইসিস এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে।

গনোরিয়া : *Neisseria gonorrhoeae* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ সংক্রমিত হয়। এটি এক ধরনের যৌনবাহিত রোগ। জনন পথে, মুখ, গলা ও পায়ুতে এর ব্যাকটেরিয়া বেড়ে উঠতে পারে। আক্রান্ত অঙ্গগুলোর প্রদাহ, পুঁজ সৃষ্টি হওয়া ও ক্রমাগত জ্বর ভাব থাকে। অবৈধ ও অনিরাপদ যৌন মিলনে এ রোগ ছড়ায়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

লাল-সবুজে দাগানো

TEXT BOOK

প্রাণিবিজ্ঞান

উন্মেষ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২.৩ প্রতীক প্রাণী : রুই মাছ (*Labeo rohita*)

বাংলাদেশের তিনটি (রুই, কাতলা ও মৃগেল) বড় কার্প জাতীয় প্রজাতির মধ্যে রুই মাছ (*Labeo rohita*) স্বাদুপানির চাষযোগ্য, সুলভ, জনপ্রিয় ও প্রোটিনসমৃদ্ধ সুস্বাদু মাছ। এটি একটি দ্রুত বর্ধনশীল মাছ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় খামারে বছরে ৩৫–৪৫ সেন্টিমিটার (১–১.৫ ফুট) লম্বা, ৭০০– ৮০০ গ্রাম ওজনবিশিষ্ট হয়। কিন্তু হালদা নদীর রুইয়ের পোনার বৃদ্ধি ২–২½কেজি পর্যন্ত বাড়ে। এ কারণে হালদা নদীর রুইয়ের রেণু পোনা / ডিম পোনা (৪ দিনের বয়সের পোনা) প্রতি কেজি সর্বনিম্ন ৬০–৬৫ হাজার টাকা (যখন বিপুল পরিমাণ ডিম পাওয়া যায়), সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা। শুধু বৃদ্ধি হারের জন্যই নয়, বিভিন্ন চাষ বা লালন কেন্দ্রগুলোতে অন্তঃপ্রজননের ফলে বামনত্ব, বিকলাঙ্গতাসহ বিভিন্ন জিনগত সমস্যা দেখা দেওয়ায় হালদা-র প্রাকৃতিক ও বিশুদ্ধ জিনের পোনা এখন আরও দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে।

বসতি (Habitat) : রুই মাছ ইন্ডিয়া (মূল ভূখন্ড), পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের নদীতন্ত্রের প্রাকৃতিক প্রজাতি। স্বাদুপানির পুকুর, নদী, হ্রদ ও মোহনায় পাওয়া যায়। বাংলাদেশে বিভিন্ন বড় নদীতে বিচরণ করে, ডিম ছাড়ার সময় প্লাবনভূমিতে প্রবেশ করে। স্বাদ, সহজ চাষপদ্ধতি ও অর্থনৈতিক গুরুত্বের কারণে ও পুষ্টি ঘাটতি মেটাতে শ্রীলংকা, নেপাল, চায়না, রাশিয়ান ফেডারেশন, জাপান, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া ও আফ্রিকান দেশগুলোতে রুই মাছের চাষ হচ্ছে। ইন্ডিয়ান আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের মিঠাপানির নদীতেও অনুপ্রবেশিত রুইয়ের সফল চাষ হচ্ছে।

শ্রেণিতাত্ত্বিক অবস্থান

Phylum : Chordata (জীবনের কোন না কোন দশায় নটোকর্ড, পৃষ্ঠীয় স্নায়ুরজ্জু ও গলবিলীয় ফুলকা রন্ধ্র থাকে)
Sub-Phylum : Vertebrata (নটোকর্ড মেরুদণ্ড দিয়ে প্রতিস্থাপিত)
Class : Actinopterygii (রশ্মিযুক্ত পাখনা)
Order : Cypriniformes (পার্শ্বরেখা সংবেদী অঙ্গ লেজের শীর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত)
Family : Cyprinidae (ভোমার দাঁতবিহীন, গলবিলীয় কর্তন আল উপস্থিত)।
Genus : *Labeo*
Species : *Labeo rohita*

স্বভাব (Habit) : জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে রুইয়ের পছন্দের আহার হচ্ছে প্ল্যাংকটন জাতীয় (প্রাণিপ্ল্যাংকটন ও উদ্ভিদপ্ল্যাংকটন) জীব। আঙ্গুলিপোনা দশায় (fingerling stage) প্রধানত প্রাণিপ্ল্যাংকটন গ্রহণ করলেও ডেসমিড (desmids), ফাইটোফ্ল্যাজেলেট (phytoflagellate), শৈবাল রেণু (algal spore) প্রভৃতিও গ্রহণ করে। তরুণ ও পূর্ণবয়স্ক মাছ পানির মাঝ স্তরের শৈবাল ও নিমজ্জিত উদ্ভিদ বেশি গ্রহণ করে (অর্থাৎ প্রধানত শাকাশী)। পৌষ্টিকনালিতে পচনশীল জৈব পদার্থ ও বালু, কাদা প্রভৃতি দেখে তলদেশি খাদকও মনে হয়। খুঁটে খাওয়ার উপযোগী নরম ঝালরযুক্ত ঠোঁট এবং মুখ-গলবিলীয় অঞ্চলে দাঁতের বদলে ধারাল **কর্তন আল** (edge) দেখে বোঝা যায় রুই মাছ নরম জলজ উদ্ভিদ আহার করে। ফুলকায় সরু চুলের মতো **ফুলকা-রেকার** (gill-raker) দেখে প্রমাণ পাওয়া যায় এ মাছ অতিক্ষুদ্র প্ল্যাংকটনও ছেঁকে খায়। মাছের পোনাগুলো ঝাঁক বেঁধে চলে, বয়স্ক মাছ পৃথক জীবন অতিবাহিত করে। রুই মাছ ১৪° সেলসিয়াসের কম তাপমাত্রায় বাঁচতে পারে না।

Labeo rohita-র বাহ্যিক গঠন

রুই (*Labeo*) একটি অস্থিময় মাছ। এর দেহ অনেকটা মাকু আকৃতির অর্থাৎ মধ্যভাগ চওড়া ও দুই প্রান্ত ক্রমশ সরু। প্রস্থ অপেক্ষা উচ্চতা বেশি, প্রস্থচ্ছেদ ডিম্বাকার। চলনের সময় পানির ভিতর গতি বাধা প্রাপ্ত হয় না বলে এ ধরনের আকৃতিকে **স্ট্রিমলাইন্ড** (streamlined) বলে। রুই মাছের দেহ তিন অংশে বিভক্ত, যথা–**মাথা, দেহকাণ্ড ও লেজ**।

১. মাথা (Head)

দেহের অগ্রপ্রান্ত থেকে কানকোর পশ্চাৎপ্রান্ত পর্যন্ত অংশটি মাথা। মাথা ৪-৫ ইঞ্চি লম্বা ও পৃষ্ঠভাগ উত্তল। তুণ্ড (snout) ভোঁতা, নিচু, কিন্তু চোয়ালের সামনে বাড়ানো এবং কোনো পার্শ্বীয় খণ্ডবিহীন। মুখ অর্ধচন্দ্রাকার, নিচের দিকে উপপ্রান্তীয়ভাবে অবস্থিত ও আড়াআড়ি বিস্তৃত এবং মোটা ঝালরের মতো ঊর্ধ্ব ও নিম্নোষ্ঠে আবৃত। ঊর্ধ্বচোয়ালের পিঠের দিকে একজোড়া নরম ও ছোট **ম্যাক্সিলারি বার্বেল** (maxillary barbels) থাকে। তুণ্ডের পৃষ্ঠদেশে দুচোখের একটু সামনে একজোড়া **নাসারন্ধ্র** (nostrils) অবস্থিত। প্রত্যেক নাসারন্ধ্রের পেছনে ও মাথার দুপাশে একটি করে বড় গোল চোখ রয়েছে। চোখে পাতা থাকে না, কিন্তু কর্ণিয়া স্বচ্ছ ত্বকীয় আবরণে আবৃত। মাথা আঁইশবিহীন, দেহকাণ্ড ও লেজ মিউকাসময় **সাইক্লয়েড** (cycloid) আঁইশে আবৃত।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মাথার পিছন দিকে দুপাশে ফুলকা-প্রকোষ্ঠকে ঢেকে অবস্থান করে দুটি বেশ বড় ও পাতলা কানকো (operculum)। কানকোর নিচের কিনারায় একটি করে পাতলা ব্রাঙ্কিওস্টেগাল পর্দা (branchiostegal membrane) যুক্ত থাকে, এটি ফুলকা-প্রকোষ্ঠের বড় অর্ধচন্দ্রাকার ছিদ্রকে ঢেকে রাখে।

২. দেহকান্ড (Trunk)

কানকোর শেষভাগ থেকে পায়ু পর্যন্ত দেহের মধ্য অংশটি দেহকাণ্ড। এ অংশটি চওড়া এবং বিভিন্ন ধরনের **পাখনা** (fin) বহন করে। পাখনাগুলো পূর্ণ বিকশিত এবং অস্থিময় **পাখনা-রশ্মি** (fin rays) যুক্ত। দেহকাণ্ডের পশ্চাৎপ্রান্তের অঙ্কীয়দিকে ঠিক মাঝ বরাবর তিনটি ছোট ছিদ্র থাকে : প্রথমে পায়ুছিদ্র, মাঝে জননছিদ্র এবং সবশেষে রেচনছিদ্র।

চিত্র ২.৩.১ : *Labeo rohita*-র বাহ্যিক গঠন (পার্শ্ব দৃশ্য)

পাখনাসমূহ (Fins) : মাছের চলনাঙ্গকে পাখনা বলে। পাখনা সাধারণত চাপা ও পাখনা-রশ্মিযুক্ত। পাখনার ভিতরে অবস্থিত সমান্তরালভাবে সজ্জিত সূক্ষ্ম শলাকার অন্তঃকঙ্কালকে **পাখনা-রশ্মি** (fin rays) বলে। রুই মাছে মোট পাঁচ ধরনের পাখনা দেখা যায়–

- **পৃষ্ঠ-পাখনা** (Dorsal fin) : দেহকাণ্ডের মাঝ বরাবরের পেছনে বড়, কিছুটা রম্বস আকারের একটি মাত্র পৃষ্ঠ-পাখনা অবস্থিত। এর উপরের দিকের মধ্যভাগ অবতল। এতে ১৪-১৬ টি পাখনা-রশ্মি থাকে।
- **বক্ষ-পাখনা** (Pectoral fin) : কানকোর ঠিক পেছনে দেহকাণ্ডের সম্মুখ পার্শ্বদিকে একজোড়া বক্ষ-পাখনা রয়েছে। প্রতিটি পাখনা ১৭-১৮টি পাখনা-রশ্মিযুক্ত।
- **শ্রোণি-পাখনা** (Pelvic fin) : একজোড়া শ্রোণি-পাখনা বক্ষ-পাখনার সামান্য পেছনে অবস্থিত এবং ৯টি করে পাখনা-রশ্মিযুক্ত।
- **পায়ু-পাখনা** (Anal fin) : পায়ুর ঠিক পেছনে দেহের অঙ্কীয়দেশের মধ্যরেখা বরাবর একটি পায়ু-পাখনা থাকে। এটি ৬-৭টি পাখনা-রশ্মিযুক্ত।
- **পুচ্ছ-পাখনা** (Caudal fin) : লেজের পশ্চাতে অবস্থিত পাখনাই পুচ্ছ-পাখনা। এতে আছে ১৯টি পাখনা-রশ্মি। পুচ্ছ-পাখনা রুই মাছের চলাচলে এবং অন্যান্য পাখনা দেহের ভারসাম্য রক্ষায় কাজ করে।

দেহের দুপাশে একসারি ছোট গর্ত আছে যা আঁইশের নিচে অবস্থিত একটি লম্বা খাদের সঙ্গে যুক্ত। এ খাদ ও গর্তের সমন্বয়ে মাছের **পার্শ্বরেখা** অঙ্গ (lateral line organ) গঠিত হয়। এতে অবস্থিত **সংবেদী কোষ** পানির তরঙ্গ থেকে পানির গুণাগুণ সংক্রান্ত রাসায়নিক সংবেদ গ্রহণ করে।

৩. লেজ (Tail)

পায়ুর পরবর্তী অংশটি লেজ। এর শীর্ষে রয়েছে হোমোসার্কাল (homocercal) ধরনের পুচ্ছ-পাখনা। এটি উল্লম্বতলে (vertical plane) প্রসারিত এবং পেছনে, উপরে ও নিচে দুটি প্রতিসম বাহ্যিক খণ্ডে বিভক্ত। ডার্মাল রশ্মিগুলো উপরে ও নিচের খণ্ডে বড়, মাঝখানে ছোট।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

আঁইশ (Scales)

রুই মাছের দেহকাণ্ড ও লেজ মিউকাসময় সাইক্লয়েড (cycloid) ধরনের (কারণ গোলাকৃতি) আঁইশে আবৃত। এগুলো পাতলা, প্রায় গোল ও রূপালি চকচকে। পৃষ্ঠদেশীয় আঁইশের কেন্দ্র লালচে, প্রান্ত কালো রংয়ের। কেন্দ্রের লালচে রং জনন ঋতুতে আরও গাঢ় ও উজ্জ্বল হয়। জলচর উদ্ভিদসমৃদ্ধ পরিবেশের রুই মাছে পৃষ্ঠদেশের রং লালচে-সবুজ হতে পারে। আঁইশে এককেন্দ্রিক বৃত্তাকার স্তরে স্তরে অস্থি-উপাদান জমা হওয়ায় আঁইশের উপরিভাগে বৃত্তাকার উঁচু আল ও নিচু খাদ সৃষ্টি হয়। স্তরগুলোর কেন্দ্রটি হচ্ছে ফোকাস (focus)। এটি সাধারণত একপাশে থাকে। উঁচু আলগুলোকে বলে সার্কুলাস (বহুবচনে–সার্কুলি) বা বৃদ্ধিরেখা। এগুলোর সাহায্যে বাৎসরিক বৃদ্ধির ও বিভিন্ন ঋতুতে বৃদ্ধি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা পাওয়া যায়। সাধারণত বসন্তকালে ও গ্রীষ্মে আঁইশের বৃদ্ধি বেশি হয়। আঁইশের সম্মুখভাগ তন্তুময় যোজক টিস্যু-নির্মিত এবং ডার্মিসের পকেটে প্রবিষ্ট থাকে। পশ্চাৎভাগ ডেন্টিন-নির্মিত ও উন্মুক্ত। উন্মুক্ত অংশে থাকে স্পষ্ট বৃদ্ধিরেখা ও অনেক রঞ্জক কোষ। আঁইশগুলো পরস্পরকে আংশিক ঢেকে লম্বালম্বি ও কোণাকুণি সারিতে বিন্যস্ত থাকে। আঁইশগুলো সবসময় মিউকাসের পাতলা পিচ্ছিল আস্তরণে আবৃত থাকে।

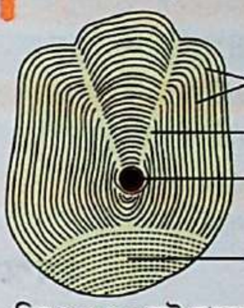

চিত্র ২.৩.২ : রুই মাছের আঁইশ

Labeo rohita-র রক্ত সংবহনতন্ত্র

রক্তবাহিকাবিস্তৃত এবং হৃৎপিণ্ড দিয়ে নিয়ন্ত্রিত এ তন্ত্রের মাধ্যমে রক্ত দেহের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালিত হয়। রুই মাছের রক্ত লাল। এটি রক্তরস (plasma) ও রক্তকণিকা (blood corpuscles) নিয়ে গঠিত। রক্তকণিকা দুধরনের– লোহিতকণিকা ও শ্বেতকণিকা। লোহিতকণিকা প্রায় ডিম্বাকার ও নিউক্লিয়াসযুক্ত। শ্বেতকণিকা দেখতে অ্যামিবার মতো (amoeboid)। হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা ও কৈশিকনালির সমন্বয়ে *Labeo*-র রক্ত সংবহনতন্ত্র গঠিত।

হৃৎপিণ্ড (Heart)

রুই মাছের ফুলকাদুটির পেছনে পেরিকার্ডিয়াল গহ্বর (pericardial cavity) নামে এক বিশেষ ধরনের গহ্বরে হৃৎপিণ্ড অবস্থান করে। পেরিকার্ডিয়াম (pericardium) নামক আবরণে হৃৎপিণ্ডটি আবৃত থাকে। অন্যান্য মাছের মতো রুই মাছের হৃৎপিণ্ডটিও দুই প্রকোষ্ঠবিশিষ্ট–একটি **অলিন্দ** বা **অ্যাট্রিয়াম** (atrium) এবং অন্যটি **নিলয়** বা **ভেন্ট্রিকল** (ventricle)। এছাড়া **সাইনাস ভেনোসাস** (sinus venosus) নামে একটি উপপ্রকোষ্ঠ রয়েছে। নিচে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন উপ-প্রকোষ্ঠ ও প্রকোষ্ঠসমূহের বর্ণনা দেয়া হলো।

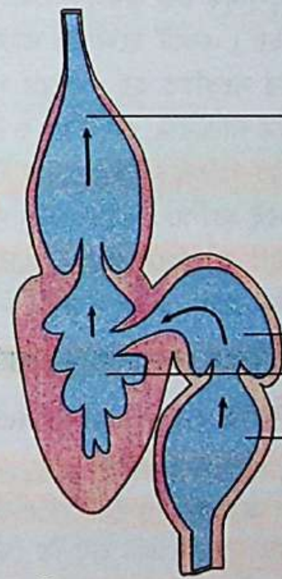

চিত্র ২.৩.৩ : রুই মাছের হৃৎপিণ্ড (লম্বচ্ছেদ)

- **সাইনাস ভেনোসাস** : এটি পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট উপপ্রকোষ্ঠ যা হৃৎপিণ্ডের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত এবং **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল** (sino-atrial) ছিদ্রপথে অ্যাট্রিয়ামের সাথে যুক্ত। এ পথে শিরা থেকে সংগৃহীত CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত অ্যাট্রিয়ামে প্রবেশ করে।
- **অ্যাট্রিয়াম (অলিন্দ)** : এটি পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরের সম্মুখ পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট বৃহত্তম প্রকোষ্ঠ। এটি একদিকে সাইনাস ভেনোসাস অন্যদিকে **অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার** (atrio-ventricular) ছিদ্রপথে ভেন্ট্রিকলে উন্মুক্ত।
- **ভেন্ট্রিকল (নিলয়)** : এটি হৃৎপিণ্ডের সর্বশেষ প্রকোষ্ঠ। পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরের অঙ্কীয়দেশে অবস্থিত এ প্রকোষ্ঠটির প্রাচীর পুরু ও মাংসল এবং সম্মুখে **বাল্বাস আর্টারিওসাস** (bulbus arteriosus)-তে উন্মুক্ত।

বাল্বাস আর্টারিওসাস : রুই মাছের হৃৎপিণ্ডে কোনাস আর্টারিওসাস (conus arteriosus) নেই। তার পরিবর্তে বাল্বাস আর্টারিওসাস নামক একটি গঠন দেখা যায় যা মূলত ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টার স্ফীত হওয়া গোড়া বা মূল। এটি হৃৎপিণ্ড থেকে ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টায় রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। এটি হৃৎপিণ্ডের কোন অংশ নয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কপাটিকাসমূহ (Valves)

হৃৎপিণ্ডের উপপ্রকোষ্ঠ ও প্রকোষ্ঠগুলোর সংযোগ ছিদ্রে **কপাটিকা** (valve) থাকে। কপাটিকাগুলো শুধু সামনের দিকে খুলে, ফলে রক্তের পশ্চাৎগতি রুদ্ধ হওয়ায় রক্তের প্রবাহ থাকে একমুখি। বিপরীত প্রবাহে কপাটিকাগুলো বাধা দেয়। রুই মাছের হৃৎপিন্ডে নিচে বর্ণিত কপাটিকাগুলো পাওয়া যায়।

- **সাইনো-অ্যাট্রিয়াল কপাটিকা** (sino-atrial valve) : সাইনাস ভেনোসাস ও অ্যাট্রিয়ামের মাঝে অবস্থিত ছিদ্রপথে এ কপাটিকা থাকে।
- **অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার কপাটিকা** (Atrio-ventricular valve) : অ্যাট্রিয়াম ও ভেন্ট্রিকলের মাঝে অবস্থিত অ্যাট্রিও-ভেন্ট্রিকুলার ছিদ্রপথে এ কপাটিকা অবস্থান করে।
- **ভেন্ট্রিকুলো-বাল্বাস কপাটিকা** (Ventriculo-bulbus valve) : এটি ভেন্ট্রিকল ও বাল্বাস অ্যাওর্টার মাঝে অবস্থিত কপাটিকা।

হৃৎপিণ্ডের মাধ্যমে রক্ত সংবহন (Blood circulation)

সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড রক্ত পরিবহন করে। কপাটিকাসমূহের নিয়ন্ত্রণের ফলে হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠগুলোর মধ্যে রক্ত সংবহনের একমুখিতা দেখা যায় এবং এ ধরনের হৃৎপিণ্ডকে **এক চক্র হৃৎপিণ্ড** (single circuit heart) বলে। হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে কেবল CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত বাহিত হয় বলে রুই মাছের হৃৎপিণ্ডকে **ভেনাস হার্ট** (venous heart) বা **শিরা হৃৎপিন্ড** বলা হয়ে থাকে।

হৃৎপিণ্ড থেকে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত একমুখী প্রবাহে O_2-সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য ফুলকায় প্রেরিত হয়। একটি ছন্দোময় তালে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশ নির্দিষ্ট সময় অন্তর সংকুচিত হয়। প্রথমে সাইনাস ভেনোসাসে সঙ্কোচন ঘটে। পরে ক্রমে অ্যাট্রিয়াম, ভেন্ট্রিকল ও বাল্বাস আর্টারিওসাস সংকুচিত হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রতিবার সঙ্কোচনকে **সিস্টোল** (systole) বলে। সিস্টোলের পরপরই হৃৎপিণ্ড প্রসারিত হয়ে পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ প্রক্রিয়াকে বলে **ডায়াস্টোল** (diastole)। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন কপাটিকা রক্তের একমুখী প্রবাহ নিশ্চিত করে।

চিত্র ২.৩.৪ : রুই মাছের রক্ত সংবহন

রক্তের গতিপথ : সাইনাস ভেনোসাস → অ্যাট্রিয়াম → ভেন্ট্রিকল → বাল্বাস আর্টারিওসাস → ফুলকা

রুই মাছের ধমনিতন্ত্র (Arterial System)

Labeo-র ধমনিতন্ত্র প্রধানত **অন্তর্বাহী** (afferent) ও **বহির্বাহী** (efferent) ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি নিয়ে গঠিত। হৃৎপিণ্ডের ভেন্ট্রিকল থেকে **ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা** (অঙ্কীয় মহাধমনি) সৃষ্টি হয়ে সামনের দিকে বিস্তৃত। এ ধমনির গোড়া স্ফীত হয়ে **বাল্বাস আর্টারিওসাস** গঠন করে। এটি হৃৎপিন্ড থেকে ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টায় রক্তের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে। ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা থেকে যেসব পার্শ্বীয় রক্তনালি পথে CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত দুপাশের ফুলকায় বাহিত হয় সেগুলো **অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি**। ফুলকায় CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত O_2-সমৃদ্ধ হওয়ার পর যে পার্শ্বীয় নালিগুলো দিয়ে ঐ রক্ত **ডর্সাল অ্যাওর্টা** (পৃষ্ঠীয় মহাধমনি)-তে বাহিত হয় সেগুলো **বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি**।

ক. অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি (Afferent Branchial Artery) : বাল্বাস আর্টারিওসাস থেকে সৃষ্ট ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা বা অঙ্কীয় মহাধমনির প্রতিপাশ থেকে ৪টি করে মোট ৪ জোড়া অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি বের হয়। ১ম জোড়া ধমনি প্রথম ফুলকা-জোড়ায় প্রবেশ করে। অনুরূপভাবে, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ জোড়া ধমনি যথাক্রমে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ফুলকা-জোড়ায় CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

খ. বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি (Efferent Branchial Artery) : চারজোড়া ফুলকা থেকে চারজোড়া বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনির সৃষ্টি হয়। প্রথম বহির্বাহী ধমনি অঙ্কীয়দেশে হাইওয়েড আর্চের সিউডোব্রাঙ্কে রক্ত বহন করে এবং সিউডোব্রাঙ্কের সম্মুখে **অপথ্যালমিক ধমনি** (ophthalmic artery) হিসেবে বিস্তৃত হয়। প্রতি পাশের ১ম ও ২য় বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি মিলে লম্বালম্বি পার্শ্বীয় ধমনি বা ল্যাটেরাল অ্যাওর্টা (lateral aorta) গঠন করে। ৩য় ও ৪র্থ বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি ল্যাটেরাল আওর্টায় উন্মুক্ত হওয়ার আগে একত্রে মিলিত হয়। ল্যাটেরাল অ্যাওর্টা সম্মুখে ক্যারোটিড ধমনিরূপে বিস্তৃত হয় এবং করোটিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। দুপাশের ল্যাটেরাল অ্যাওর্টা পশ্চাতে একীভূত হয়ে ডর্সাল অ্যাওর্টা (dorsal aorta) গঠন করে এবং পেছন দিকে বিস্তৃত হয়। দুই পাশের ল্যাটেরাল অ্যাওর্টা ও ক্যারোটিড ধমনি মিলে গলবিল অঞ্চলের পৃষ্ঠীয়দেশে একটি ডিম্বাকার ধমনি বলয় সৃষ্টি করে। এর নাম **সারকিউলাস সেফালিকাস** (circulus cephalicus)।

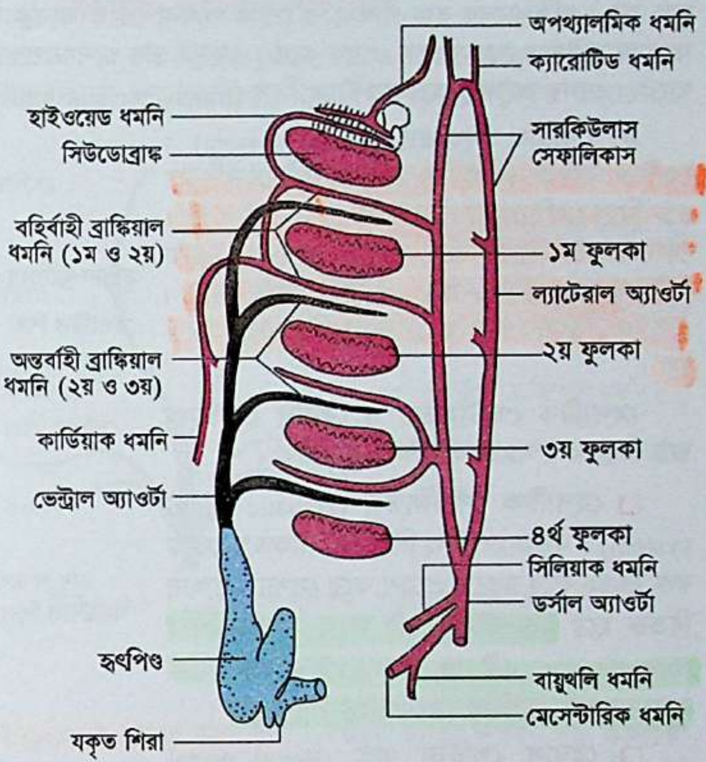

চিত্র ২.৩.৫ : *Leabeo*-র অন্তর্বাহী (▬) ও বহির্বাহী (▬) ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি

ডর্সাল অ্যাওর্টা মেরুদণ্ডের নিচে মধ্যরেখা বরাবর লেজ পর্যন্ত প্রসারিত। যাত্রাপথে এটি যে সব প্রধান নালিকা সৃষ্টি করে তা হচ্ছে–

১. **সাবক্ল্যাভিয়ান ধমনি** (Subclavian artery) : বক্ষপাখনা ও বক্ষচক্রের দিকে বিস্তৃত হয়।

২. **সিলিয়াকো-মেসেন্টারিক ধমনি** (Coeliaco-mesenteric artery) : পাকস্থলি, অন্ত্র, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, মলাশয় প্রভৃতি আন্ত্রিক অঙ্গে রক্ত পরিবহন করে।

৩. **প্যারাইটাল ধমনি** (Parietal artery) : দেহ প্রাচীরে রক্ত সরবরাহ করে।

৪. **রেনাল ধমনি** (Renal artery) : বৃক্কে রক্ত বহন করে।

৫. **ইলিয়াক ধমনি** (iliac artery) : শ্রোণি-পাখনায় রক্ত পরিবহন করে।

৬. **কডাল ধমনি** (caudal artery): লেজে রক্ত সরবরাহ করে।

রুইমাছের শিরাতন্ত্র (Venous System)

কৈশিক জালিকা (blood capillaries) থেকে উৎপন্ন হয়ে, যেসব রক্তনালি দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে অক্সিজেনবিহীন (deoxygenated) রক্ত সংগ্রহ করে হৃৎপিন্ডের সাইনাস ভেনোসাসে নিয়ে আসে, সেগুলোই সম্মিলিতভাবে **শিরাতন্ত্র** গঠন করে। রুইমাছের শিরাতন্ত্রকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-**১. সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র** এবং **২. পোর্টাল শিরাতন্ত্র**। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র (Systemic Venus System) : যেসব শিরার মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বা তন্ত্র থেকে রক্ত সরাসরি হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে সেগুলোকে **সিস্টেমিক শিরা** বলে। সিস্টেমিক শিরার সমন্বয়ে গঠিত হয় সিস্টেমিক শিরাতন্ত্র। একজোড়া **সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা**, একজোড়া **জুগুলার শিরা** ও একজোড়া **পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা** রুই মাছের সিস্টেমিক শিরাতন্ত্রের প্রধান অংশ গঠন করে। শরীরের সম্মুখ অংশ থেকে সম্মুখ কার্ডিনাল শিরা ও জুগুলার শিরা রক্ত সংগ্রহ করে সেপাশের **ডাক্টাস কুভিয়ে** (ductus cuvieri)-তে উন্মুক্ত হয়। পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা দেহের পশ্চাৎভাগ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে এবং সেপাশের ডাক্টাস কুভিয়েতে উন্মুক্ত হয়। উভয় পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা সেগমেন্টাল শিরা, রেনাল শিরা, জেনিটাল শিরা ইত্যাদি থেকেও রক্ত গ্রহণ করে। উভয় ডাক্টাস কুভিয়ে হৃৎপিণ্ডের সাইনাস ভেনোসাসে

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মুক্ত হয়। প্রতিপাশের বক্ষ-পাখনা ও শ্রোণি-পাখনা থেকে **সাবক্ল্যাভিয়ান শিরা** রক্ত সংগ্রহ করে ডাক্টাস ক্যুভিয়ে-এর মাধ্যমে সাইনাস ভেনোসাসে প্রেরণ করে। এছাড়া ডান ও বাম পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা কতিপয় অনুপ্রস্থ শিরা দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এদের **অনুপ্রস্থ অ্যানাস্টোমোসিস** (transverse anastomosis) বলে।

২. পোর্টাল শিরাতন্ত্র (Portal system) : কৈশিক নালিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে অক্সিজেনবিহীন রক্ত নিয়ে হৃৎপিণ্ডে যাওয়ার পথে যে সব শিরা অন্য কোনো অঙ্গে প্রবেশ করে আবার কৈশিক নালিতে পরিণত হয়, সেগুলোকে **পোর্টাল শিরা** বলে। পোর্টাল শিরাগুলো নিয়ে **পোর্টাল শিরাতন্ত্র** গঠিত হয়।

হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র ও রেনাল পোর্টাল-তন্ত্র নিয়ে রুই মাছের পোর্টালতন্ত্র গঠিত।

❑ **হেপাটিক পোর্টালতন্ত্র** (Hepatic portal system) : যকৃত পোর্টাল শিরা পরিপাকতন্ত্র থেকে রক্ত সংগ্রহ করে যকৃতে প্রবেশ করে সেখানে শাখায় বিভক্ত হয়ে রক্ত জালক সৃষ্টি করে। **যকৃত শিরা** (hepatic vein) এই রক্ত জালক থেকে রক্ত সংগ্রহ করে সরাসরি সাইনাস ভেনোসাসে উন্মুক্ত হয়।

❑ **রেনাল পোর্টাল তন্ত্র** (Renal portal system) : দেহের লেজ অঞ্চল থেকে **কডাল শিরা** (caudal vein) রক্ত সংগ্রহ করে দেহকাণ্ডে প্রবেশ করে এবং দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। ডান শাখাটি ডান পশ্চাৎ **কার্ডিনাল শিরা** হিসেবে সম্মুখে অগ্রসর হয়, বাম শাখাটি বৃক্কে প্রবেশ করে বিভক্ত হয়ে জালিকা সৃষ্টি করে। একে **রেনাল পোর্টাল শিরা** বলে। বৃক্ক থেকে রক্ত বাম পশ্চাৎ কার্ডিনাল শিরা দিয়ে সংগৃহীত হয়ে ডাক্টাস ক্যুভিয়ের মাধ্যমে সাইনাস ভেনোসাসে পৌঁছায়।

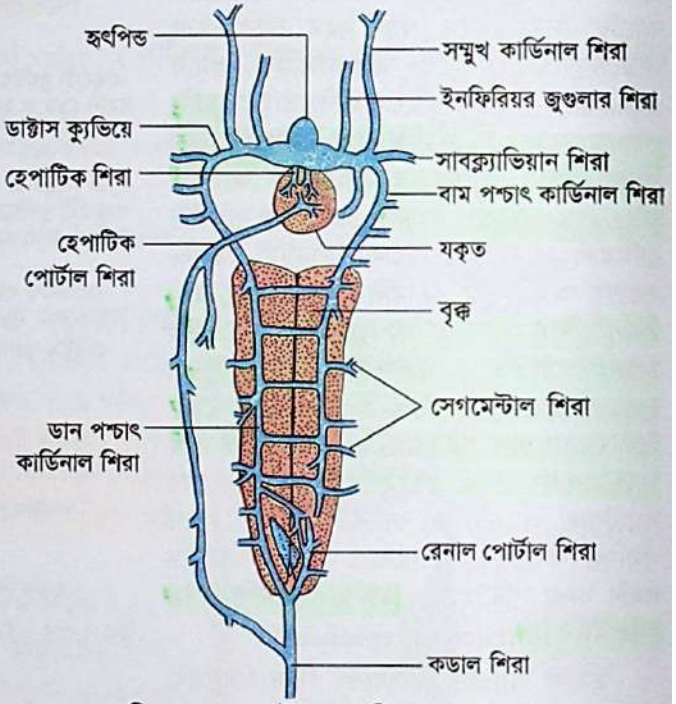

চিত্র ২.৩.৬ : রুই মাছের শিরাতন্ত্র

ব্যবহারিক অংশ

১. রুই / কাতলা / মৃগেল মাছের অন্তর্বাহী বা অ্যাফারেন্ট ব্রাঙ্কিয়াল ধমনিতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি : একটি রুই মাছকে চিৎ করে ট্রেতে রেখে বক্ষ অস্থিচক্র সাবধানে কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে। অঙ্কীয়দেশে দেহত্বক ও পেশি কেটে ফেলতে হবে। হৃৎপিণ্ড বহনকারী পেরিকার্ডিয়াম অপসারণ করে হৃৎপিণ্ডকে উন্মুক্ত করতে হবে। এরপর হৃৎপিণ্ডের সম্মুখ প্রান্তে অবস্থিত **ভেন্ট্রাল অ্যাওর্টা** (ventral aorta; অঙ্কীয় মহাধমনি)-র উৎপত্তি ও গন্তব্য অনুসরণ করে পেশি কেটে পরিষ্কার করার পর দেখা যাবে উভয় পাশে চারটি করে অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি বেয়ে সেই পাশের ফুলকায় প্রবেশ করেছে। পেশিপর্দা ও ফুলকা ঝিল্লি পরিষ্কার করলে এগুলো স্পষ্ট দেখা যাবে। এবার ঘোলাটে পানি পাল্টে পরিষ্কার পানির নিচে ধমনিগুলো যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণের পর চিত্র দেখে ব্যবহারিক খাতায় চিহ্নিত চিত্র আঁকতে হবে।

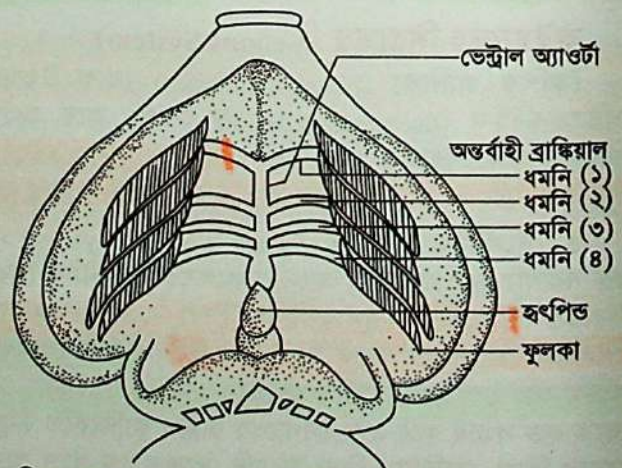

চিত্র ২.৩.৭ : *Labeo*-র অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনিতন্ত্র

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. রুই /কাতলা / মৃগেল মাছের বহির্বাহী বা ইফারেন্ট ধমনিতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি : অন্তর্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনি শনাক্তের পর রুই মাছের মুখগহ্বরের এক পাশের ফুলকা ও কানকো কেটে ফেলতে হবে। হৃৎপিন্ডের পিছনে গলবিলের নিচের দিকে আড়াআড়িভাবে কেটে মুখগহ্বরকে উন্মুক্ত করতে হবে এবং সাবধানে মুখগহ্বরের ছাদের ঝিল্লি অপসারণ করলে ডর্সাল অ্যাওর্টা (dorsal aorta; পৃষ্ঠীয় মহাধমনি) দেখা যাবে। পিছনদিক থেকে ডর্সাল অ্যাওর্টা অনুসরণ করে সামনে অগ্রসর হলে বহির্বাহী ধমনিগুলো পাওয়া যাবে। এখন অপরিষ্কার পানি পাল্টে ধমনিগুলো পরিষ্কার পানির নিচে যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণের পর চিত্র দেখে ব্যবহারিক খাতায় চিহ্নিত চিত্র আঁকতে হবে।

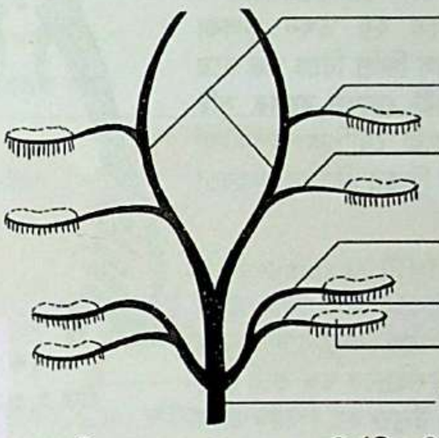

চিত্র ২.৩.৮ : *Labeo*-র বহির্বাহী ব্রাঙ্কিয়াল ধমনিতন্ত্র

Labeo rohita-র শ্বসনতন্ত্র

যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় কোষমধ্যস্থ খাদ্য জারিত হয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গত করে এবং খাদ্যের স্থিতিশক্তিকে গতিশক্তিরূপে মুক্ত করে, সে প্রক্রিয়া **শ্বসন** (respiration) নামে পরিচিত।

Labeo একটি অস্থিময় মাছ। চারজোড়া ফুলকা (gill) এ মাছের শ্বসন অঙ্গ। এগুলো মাথার দুপাশে দুটি কানকো (operculum)-তে আবদ্ধ **ফুলকা-প্রকোষ্ঠ** (branchial chamber)-এর ভিতর রক্ষিত এবং গলবিলের পার্শ্বপ্রাচীরে ও মেঝেয় অবস্থিত। কানকোর পশ্চাৎ কিনারা একটি পাতলা **ব্রাঙ্কিওস্টেগাল ঝিল্লি** (branchiostegal membrane) যুক্ত যা মাথার অঙ্কীয়দেশে সেঁটে থাকে। ঝিল্লিটি কতকগুলো অস্থিনির্মিত দণ্ড বহন করে। এটি কানকোকে দেহপৃষ্ঠে আটকে রেখে ফুলকা প্রকোষ্ঠ বাইরে থেকে বন্ধ রাখে, এভাবে ''শ্বাস পানি'' আবদ্ধ রেখে মাছকে শ্বসনে সাহায্য করে।

চিত্র ২.৩.৯ : *Labeo*-র (ক) বামপাশের ফুলকা; (খ) ফুলকা-সূত্রের সাধারণ গঠন; (গ) একটি ফুলকা সূত্রের লম্বচ্ছেদ

ফুলকার গঠন (Structure of Gill)

প্রত্যেকটি ফুলকা দেখতে সুতার মতো এবং একেকটি **হোলোব্রাঙ্ক** (পূর্ণফুলকা), কারণ প্রত্যেক ফুলকা দুটি সদৃশ অর্ধাংশ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক অর্ধাংশকে বলে **হেমিব্রাঙ্ক** (অর্ধফুলকা)। প্রত্যেক হেমিব্রাঙ্ক একসারি করে **ফুলকা সূত্র** (gill filament) বা **ফুলকা ল্যামেলা** (gill lamella) বহন করে। এগুলো গোড়ায় যুক্ত, শীর্ষে মুক্ত। প্রতিটি সূত্র এপিথেলিয়ামে আবৃত অসংখ্য অনুপ্রস্থ প্লেট বহন করে। এপিথেলিয়াম রক্ত-জালিকা সমৃদ্ধ। প্রত্যেক ফুলকা একেকটি অস্থিময় **ফুলকা আর্চ** (gill arch)-এ অবলম্বিত। এভাবে প্রত্যেক আর্চে দুটি ফুলকা-সারি যুক্ত থাকে। আর্চের অন্তঃকিনারা প্রসারিত হয়ে কাঁটাযুক্ত পাতলা **ফুলকা রেকার** (gill raker) গঠন করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

শ্বসন কৌশল (Mechanism of Respiration)

রুই মাছে দুই ধাপে শ্বাসক্রিয়া ঘটে– শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ। এক্ষেত্রে ফুলকা প্রকোষ্ঠ চোষণ পাম্প (suction pump) হিসেবে কাজ করে।

১. শ্বাসগ্রহণ বা প্রশ্বাস (Inspiration) : কানকোদুটি যখন উত্তোলিত হয় তখন ফুলকা প্রকোষ্ঠের মুখ ব্রাঙ্কিওস্টেগাল ঝিল্লি দিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এতে গলবিলে একটি চোষণ-বলের সৃষ্টি হয়। ফলে মুখছিদ্র রক্ষাকারী মৌখিক কপাটিকা খুলে যায় এবং পানি মুখের ভিতর দিয়ে মুখগহ্বরে প্রবেশ করে।

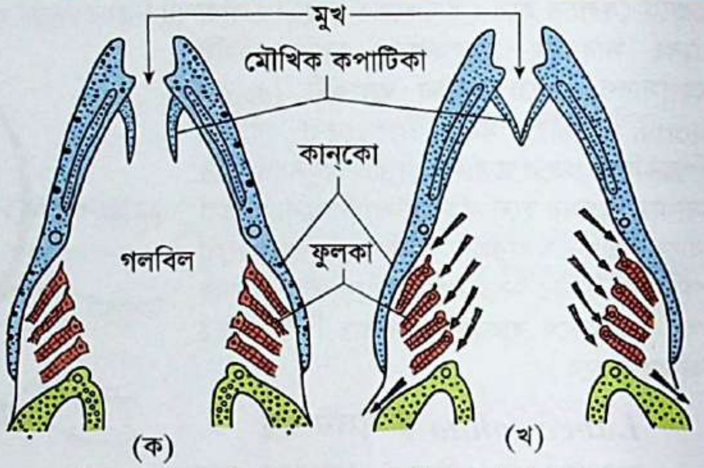

চিত্র ২.৩.১০ : *Labeo*-র শ্বসন কৌশল : (ক) প্রশ্বাস; (খ) নিঃশ্বাস। তীরচিহ্ন পানির গতি নির্দেশক

২. শ্বাসত্যাগ বা নিঃশ্বাস (Expiration) : কানকো যখন পেশি-সংকোচনের ফলে নেমে আসে তখন গলবিল ও মুখগহ্বরে চাপ বেড়ে যায়। সাথে সাথেই মৌখিক কপাটিকা মুখছিদ্রকে বন্ধ করে দেয় এবং ফুলকা-প্রকোষ্ঠের ছিদ্র উন্মুক্ত হয়। পানি তখন এ ছিদ্রপথেই বেরিয়ে যায়। মুখ ও গলবিলের ভিতর দিয়ে অতিক্রমের সময় স্রোতপ্রবাহ নিচে অবস্থিত ফুলকাগুলোকে ভিজিয়ে দেয়।

শ্বসনের শারীরতত্ত্ব (Physiology of respiration)

অন্তর্বাহী ফুলকা ধমনি CO_2-সমৃদ্ধ রক্ত বয়ে এনে ফুলকা সূত্রকের কৈশিক জালকে ছেড়ে দেয়। এসময় শ্বাস গ্রহণকালে নেয়া O_2-সমৃদ্ধ পানি ফুলকা সূত্রকের উপর দিয়ে বয়ে গেলে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় গ্যাসীয় বিনিময় ঘটে। রক্ত পানিতে CO_2 ত্যাগ করে ও পানি থেকে O_2 গ্রহণ করে। O_2-সমৃদ্ধ রক্ত তখন বহিঃফুলকা ধমনির সাহায্যে গৃহীত হয় এবং সারাদেহে ছড়িয়ে পড়ে।

বায়ুথলি বা পটকা (Air bladder / Swim bladder)

Labeo-র মেরুদণ্ডের নিচে এবং পৌষ্টিকনালির উপরে অবস্থিত পাতলা প্রাচীরবিশিষ্ট থলির নাম **বায়ুথলি** বা **পটকা**। এটি দেখতে চকচকে সাদা থলির মতো এবং বিভিন্ন ধরনের গ্যাসে (অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড) পূর্ণ থাকে। বায়ুথলিটি সম্মুখস্থ ছোট ও পেছনের বড় প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। দুটি প্রকোষ্ঠের মাঝখানে একটি খাঁজ রয়েছে। সম্মুখ প্রকোষ্ঠ একটি সরু নল দিয়ে অন্ননালির সাথে যুক্ত থাকে। এ নলের নাম **নিউম্যাটিক নালি** (pneumatic duct)। এটি অন্তঃকর্ণের **ওয়েবেরিয়ান অসিকল** (weberian ossicle)-এর সাথে যুক্ত থাকে। বায়ুথলির বাইরের দিক ঘনসন্নিবিষ্ট রক্তজালক সমৃদ্ধ। এর প্রাচীর দুটি স্তর নিয়ে গঠিত। বাইরে যোজক টিস্যু দিয়ে গঠিত স্তরটি **টিউনিকা এক্সটার্না** (tunica externa) এবং ভিতরে মসৃণ পেশি নির্মিত স্তর **টিউনিকা ইন্টারনা** (tunica interna)। বায়ুথলির অন্তঃপ্রাচীরের এপিথেলিয়াম সংলগ্ন একটি লাল রঙের গ্যাস গ্রন্থি থাকে। এ গ্রন্থিতে ঘনসন্নিবিষ্ট অসংখ্য কৈশিকনালি থাকে যা **রেটিয়া মিরাবিলিয়া** (retia mirabilia) নামে পরিচিত। সামনের প্রকোষ্ঠের এ গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত গ্যাসে বায়ুথলি পূর্ণ হয়। কিন্তু পিছনের প্রকোষ্ঠে অবস্থিত এ গ্রন্থি গ্যাস শোষণ করে।

চিত্র ২.৩.১১ : মাছের দেহে বায়ুথলির অবস্থান

বায়ুথলির কাজ

১. বায়ুথলি প্লাবতা রক্ষাকারী অঙ্গ হিসেবে কাজ করে।
২. বায়ুথলির প্রাচীরে অবস্থিত কৈশিকনালি থেকে বায়ুথলিতে অতিরিক্ত গ্যাস সরবরাহ করে অথবা বায়ুথলি থেকে রক্তে গ্যাস শোষণ করে মাছ তার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৩. বায়ুথলি মাছের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ করে পানির নিচে বিভিন্ন গভীরতায় মাছকে স্থির থাকতে সাহায্য করে।

৪. মাছ বায়ুথলির মাধ্যমে শব্দ গ্রহণ করতে পারে। বায়ুথলির সাথে **ওয়েবেরিয়ান অসিকল** (Weberian ossicles) এর মাধ্যমে অন্তঃকর্ণের সংযোগ থাকে। শব্দ তরঙ্গ বায়ুথলি থেকে ওয়েবেরিয়ান অসিকলের মাধ্যমে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে।

৫. অনেক মাছের বায়ুথলি শব্দ উৎপাদনে সক্ষম।

৬. অক্সিজেনের ভান্ডার হিসেবে বায়ুথলি ব্যবহৃত হয়।

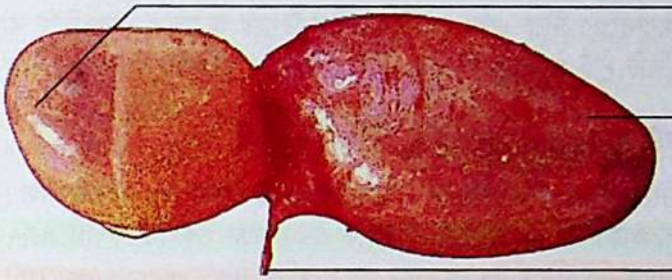

চিত্র ২.৩.১২: রুইমাছের বায়ুথলি

ব্যবহারিক অংশ

১. রুই মাছের ফুলকা পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি : একটি রুই মাছ নিয়ে এর এক পাশের কানকো বা অপারকুলামটি সাবধানে কেটে ফেললে ফুলকা উন্মুক্ত হবে।

পর্যবেক্ষণ

১. ফুলকা (gill) হচ্ছে রুই মাছের শ্বসন অঙ্গ। এটি গাঢ় লাল বর্ণের এবং এর এক প্রান্ত চিরুনির দাঁতের মতো সূক্ষ্ম করে চেরা। প্রতিটি ফুলকা দুটি অনুরূপ অর্ধাংশ দিয়ে গঠিত।

২. কানকো দিয়ে আবৃত প্রতিটি ফুলকা প্রকোষ্ঠতে চারটি করে ফুলকা পর পর সজ্জিত থাকে।

৩. গলবিলের প্রাচীরের উভয় দিকে পাঁচটি করে ফুলকা ছিদ্র থাকে। ফুলকা ছিদ্রগুলো চারটি ফুলকা আর্চ (gill arch) দিয়ে বিভক্ত।

৪. প্রতিটি ফুলকা আর্চের ভিতরের অবতল প্রান্তে দাঁতের মতো ফুলকা-র‍্যাকার এবং বাইরের উত্তল প্রান্তে দুই সারি ফুলকা সূত্র (gill filament) থাকে।

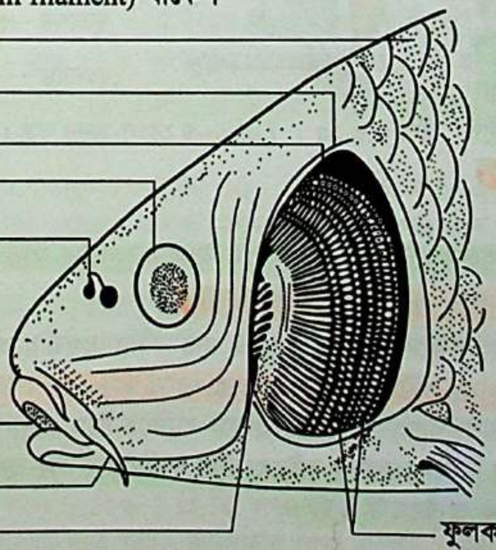

চিত্র ২.৩.১৩ : রুই মাছের ফুলকা

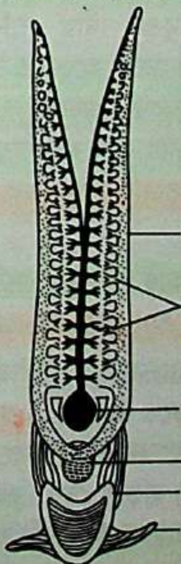

চিত্র ২.৩.১৪ : রুই মাছের ফুলকা সূত্র

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. রুই মাছের বায়ুথলি বা পটকা পর্যবেক্ষণ

ব্যবচ্ছেদ পদ্ধতি : একটি রুই মাছ চিৎ করে ট্রের উপর রেখে লেজ ও কানকোর দিকে পিন দিয়ে আটকে দিতে হবে। একটি ধারালো স্কালপেলের সাহায্যে পেটের দিকে ছিদ্র করে লম্বালম্বি পায়ু থেকে গলবিল পর্যন্ত চিরে মাংসপেশি ও ত্বক কেটে নিতে হবে। অন্ত্রের উপরের মিউকাস পর্দাটি ফরসেপস দিয়ে ধীরে ধীরে পরিষ্কার করে অন্ত্রের প্যাঁচ খুলে বিভিন্ন অংশ পিন দিয়ে আটকে দিতে হবে। পৌষ্টিকতন্ত্রের অঙ্গগুলো লক্ষ করে দেহাভ্যন্তরের অন্যান্য অংশ সরিয়ে নিলে বায়ুথলি দেখা যাবে (চিত্র : ২.৩.১২)।

পর্যবেক্ষণ : মেরুদণ্ডের নিচে এবং পৌষ্টিকনালির উপরে অবস্থিত বায়ুথলিটি বায়ুপূর্ণ এবং দেখতে চকচকে সাদা থলির মতো। বায়ুথলিটি দুটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। দুই প্রকোষ্ঠের মাঝখানে একটি গভীর খাঁজ রয়েছে।

রুই মাছের প্রজনন ও জীবনবৃত্তান্ত (Reproduction and Life-history)

প্রজনন তন্ত্র (Reproductive system) : জনন ঋতুতে জনন অঙ্গ বা গোনাড (gonad) পূর্ণ বিকশিত হয়। পুরুষ মাছে একজোড়া লম্বা শুক্রাশয় (testis) ও স্ত্রী মাছে একজোড়া লম্বা ডিম্বাশয় (ovary) পটকার নিচে উদরীয় গহ্বরের পিছনে শায়িত। শুক্রাশয় পেরিটোনিয়ামের ভাঁজ মেসোরকিয়াম (mesorchium) পর্দা দিয়ে দেহপ্রাচীরে ঝুলানো থাকে। ডিম্বাশয় পেরিটোনিয়ামের ভাঁজ মেসোভেরিয়াম (mesovarium) দিয়ে দেহপ্রাচীরে ঝুলানো থাকে। প্রত্যেক শুক্রাশয় থেকে একটি করে শুক্রনালি সৃষ্টি হয়। দুটি শুক্রাশয়ের দুটি শুক্রনালি পেছন দিকে এক হয়ে রেচনজনন রন্ধ্র পথে বাইরে মুক্ত। স্ত্রী মাছে ডিম্বাশয় জোড়া আকারে বড় ও ডিম্বনালিহীন। পরিপক্ক ডিম্বাশয় থেকে জনন ঋতুতে ডিম দেহগহ্বরে মুক্ত হয়। এখান থেকে ডিম রেচন-জনন সাইনাসের অগ্রপ্রাচীর থেকে অস্থায়ীভাবে গঠিত একজোড়া জনন রন্ধ্র (genital aperture) পথে দেহের বাইরে বেরিয়ে যায়। রুই মাছের ডিম প্রচুর কুসুম (yolk) সমৃদ্ধ।

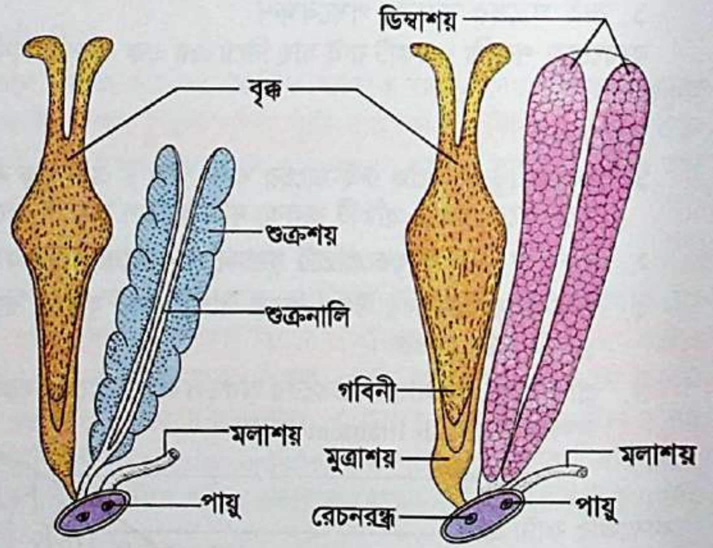

চিত্র ২.৩.১৫ : *Labeo*-র রেচন-জনন তন্ত্র (বায়ে-পুরুষ ও ডানে-স্ত্রী)

প্রজনন (Reproduction) : রুই মাছ সাধারণত দুবছর বয়সে জননক্ষম হয়ে ওঠে। জনন ঘটে স্রোতযুক্ত নদীর পানিতে, বদ্ধ পানিতে নয়। বাংলাদেশে আগে ৩ বছর বয়সে জননক্ষম হতো। কিন্তু অন্তঃপ্রজননের (inbreeding) কারণে এখন রুই মাছে এক বছর বয়সেই জনন ঘটে। জুন-জুলাই মাসের দিকে এরা প্রজননের জন্য তৈরি হয়।

সাধারণত স্ত্রী মাছ ৫১–৭০ সেমি এবং পুরুষ মাছ ৬৫ সেমি. লম্বা হলে প্রজননের জন্য তৈরি হয়। এ মাছ প্রতি কেজি দেহ ওজনের জন্য এক লক্ষ থেকে চার লক্ষ ডিম উৎপাদন করে থাকে।

নিষেক (Fertilization) : নদীর পানি যখন ফুলে ওঠে তখন রুই মাছ নদীর অগভীর অংশে প্রবল বর্ষণের মধ্যে ঝাঁক বেঁধে ডিম ছাড়তে উদ্বুদ্ধ হয়। প্রজননের সময় নদীর পানির তাপমাত্রা থাকে ২৭-৩০° সেলসিয়াসের মধ্যে। এসময় পানিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন থাকে এবং পানি ঘোলা থাকে। স্ত্রী মাছ প্রথমে পানিতে ডিম (egg) ছাড়লে পুরুষ মাছ তার উপর বীর্য (sperm) ছড়িয়ে দেয়। রুই মাছের নিষেক দেহের বাইরে নদীর পানিতে সম্পন্ন হয় বলে একে বহিঃনিষেক (external fertilization) বলে। নিষিক্ত ডিমকে জাইগোট বলে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

রুই মাছের জীবন চক্র (Life cycle)

জাইগোট সৃষ্টির ৩০-৪৫ মিনিট পরই ক্লিভেজ শুরু হয়। ক্লিভেজ মেরোব্লাস্টিক ধরনের। কোনো প্রাণীর ডিমে যখন ভেজিটাল পোলে (মেরুতে) বেশি পরিমাণে কুসুম থাকায় সম্পূর্ণ ডিমটি ক্লিভেজ প্রক্রিয়ায় বিভক্ত হতে পারেনা তখন নিষিক্ত নিউক্লিয়াসটি কুসুমের পৃষ্ঠতলে একটি ক্ষুদ্র অংশে আশ্রয় নিয়ে ক্লিভেজের প্রস্তুতি নেয়। অংশটি ক্রমশ একটি ছোট ঢিবির মতো দেখায়। এ অংশের ভিতর ক্লিভেজ ঘটে। এ ধরনের ক্লিভেজকে মেরোব্লাস্টিক ক্লিভেজ (meroblastic cleavage) বলে।

ক্লিভেজ শুরু হওয়ার পর নিউক্লিয়াসটি ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ এমন সংখ্যক কোষে বিভক্ত হতে থাকে। ক্লিভেজের ফলে সৃষ্ট প্রতিটি কোষকে **ব্লাস্টোমিয়ার** (blastomere) বলে। ভ্রূণটি এসময় এক থোকা আঙ্গুরের মতো দেখায়। এর নাম **মরুলা** (morula)। ভ্রূণের পরিস্ফুটনের ক্ষেত্রে মরুলা ধাপটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বেশি ঝাঁকুনিতে ভ্রূণ কুসুম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করতে পারে। ব্লাস্টোমিয়ারগুলো আরও বিভক্ত ও সুশৃঙ্খল হয়ে **ব্লাস্টোডার্ম** (blastoderm) নামক এককোষীয় স্তরে বিন্যস্ত হয়। ক্লিভেজ এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্লাস্টোমিয়ারগুলোর মাঝে একটি ফাঁপা জায়গা সৃষ্টি হয়ে বৃদ্ধি পায়। এ ফাঁপা স্থানটি হচ্ছে **ব্লাস্টোসিল** (blastocoel)। ভ্রূণটিকে তখন **ব্লাস্টুলা** (blastula) বলে।

ব্লাস্টোডার্মের কোষগুলো প্রথম দিকে কুসুমের উপর টুপির মতো বিন্যস্ত থাকে। কোষ বিভাজন অব্যাহত থাকায় কোষগুলো কুসুমকে ঘিরে প্রসারিত হয় এবং এক পর্যায়ে **ব্লাস্টোপোর** (blastopore) নামক একটি ছিদ্রপথ ছাড়া সমগ্র কুসুমপিন্ড আবৃত হয়ে পড়ে। পরে অবশ্য ব্লাস্টোপোরও বন্ধ হয়ে যায়। ব্লাস্টুলা ধীরে ধীরে দ্বিস্তরী **গ্যাস্ট্রুলা** (gastrula)-য় পরিবর্তিত হয়।

গ্যাস্ট্রুলার পিছন দিক থেকে লেজ ও সামনের দিক থেকে বিভিন্ন অঙ্গের সূচনা হয়। যে প্রক্রিয়ায় গ্যাস্ট্রুলা থেকে বিভিন্ন অঙ্গ তৈরি হয় তার নাম **অর্গানোজেনেসিস** (organogenesis)। ভ্রূণের মধ্যে নানা ধরনের পরিবর্ধন দেখা দেয় এবং ১৫-১৮ ঘন্টার মধ্যে ডিমের ভিতর থেকে **লার্ভা** (larva) বেরিয়ে আসে। এ লার্ভাকে **ডিমপোনা বা রেণুপোনা** বলে। এমন অবস্থায় পোনা কোন খাদ্য গ্রহণ করে না এবং কুসুম থেকে পুষ্টি নেয়। লার্ভা দশার পরিবর্তনগুলো নিম্নরূপ।

- ৬ ঘন্টা পর লার্ভা মাঝে মধ্যে উপরে-নিচে নড়া-চড়া করে। কুসুমের দুই প্রান্ত তখন সরু হয় এবং লার্ভার হৃৎপিন্ডের কুসুম থলির সামনে অবস্থান নেয়। তখন কুসুম থলি বেশ বড় থাকে। এ অবস্থায় লার্ভা পানির তলদেশে বেশ সময় কাটায় এবং কুসুম থলি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে।
- ১২ ঘন্টা পর লার্ভার চোখের রঙ কালো হতে থাকে। ক্রোমাটোফোর উৎপন্ন হওয়ায় এমন হয়। এসময় কুসুম থলি সরু ও লম্বা হয়।
- ২৪ ঘন্টা পর কুসুম থলির পিঠে কালো দাগ দেখা দিতে শুরু করে। লার্ভায় ফুলকা আর্চ দৃশ্যমান হয়। চোখ মাথার উপরে অবস্থান নেয় এবং নটোকর্ড পিছন দিকে (লেজের দিকে) উর্ধ্বমুখী হয়। তখন লেজ ও পায়ু-পাখনা স্পষ্ট দেখা যায়। এ সময় লার্ভা স্বচ্ছ থাকে, তবে ফ্যাকাশে হলদে রঙেরও হতে পারে।
- ৩৬ ঘন্টা পর লার্ভায় বক্ষ-পাখনা ও নিচের ঠোঁট স্পষ্ট দেখা যায়। পৃষ্ঠ-পাখনায় কিছু কালো দাগ এবং পুচ্ছ-পাখনায় পুচ্ছ দণ্ড দেখা দেয়।
- ৪৮ ঘন্টা পর লার্ভা কিছুটা লম্বা হয়ে ৬.০-৬.৪ মি.মি. হয়। এ সময় কুসুম থলি সামনের দিকে সামান্য উত্তল হয় এবং বায়ু থলি দেখা দেয়। লার্ভার মাথায় ক্রোমাটোফোর উৎপন্ন হতে থাকে, তাই মাথা কালো রঙ ধারণ করে। তখন ফুলকা আর্চ স্পষ্ট এবং দেহ ফ্যাকাশে হলদে রঙে পরিবর্তিত হয়।
- ৭২ ঘন্টা পর লার্ভার বায়ু থলি ডিম্বাকার ধারণ করে এবং বক্ষীয়-পাখনা স্পষ্ট হতে শুরু করে। পিঠের দু'পাশ উজ্জ্বল হলুদ রঙ ধারণ করে, কুসুম থলি বিলীন হয়ে যায় এবং লার্ভা দশার সমাপ্তি ঘটে। তাপমাত্রার কারণে এ সময়ের কম-বেশি হতে পারে।
- ৯৬ ঘন্টা পর লার্ভার মুখ স্পষ্ট হয়ে খাদ্য গ্রহণ শুরু করে। কুসুম থলি প্রায় মিলিয়ে যায় এবং এটি **ধানীপোনা** বা **আঙ্গুলিপোনা** হিসেবে পরিচিত হয়।
- ৫ দিন বয়সের পোনা ৮.০-৮.৫ মি.মি. লম্বা হয়। এ সময় লেজের কাছে লাল দাগ দেখা যায়, যা দেখে একে রুই মাছের পোনা বলে শনাক্ত করা যায়। কানকোর রেখা সুস্পষ্ট গঠিত হয়, নটোকর্ডের শেষ প্রান্ত কিছুটা বেঁকে যায় এবং পাখনাগুলোতে রশ্মি আরও স্পষ্ট হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

❑ ১০ দিন বয়সে পোনার দৈর্ঘ্য হয় ১৫–১৮ মি.মি.। সবগুলো পাখনায় পূর্ণাঙ্গ সংখ্যক পাখনা-রশ্মি বিকশিত হয়। নাসারন্ধ্র দেখা যায় এবং অন্তঃস্থ বিভাজন স্পষ্ট হয়।

❑ ১৫ দিন বয়সের পোনার দৈর্ঘ্য হয় ২৩ মি.মি.। তখন মুখের দুপাশে একটি করে বার্বেল (barbel) দেখা দেয়, পায়ুর অবস্থান ও খাদ্যনালি স্পষ্ট হয়। এ অবস্থায় আঁইশ দৃশ্যমান না হলেও পোনার দৈহিক গড়ন মোটামুটি সম্পূর্ণ হয়

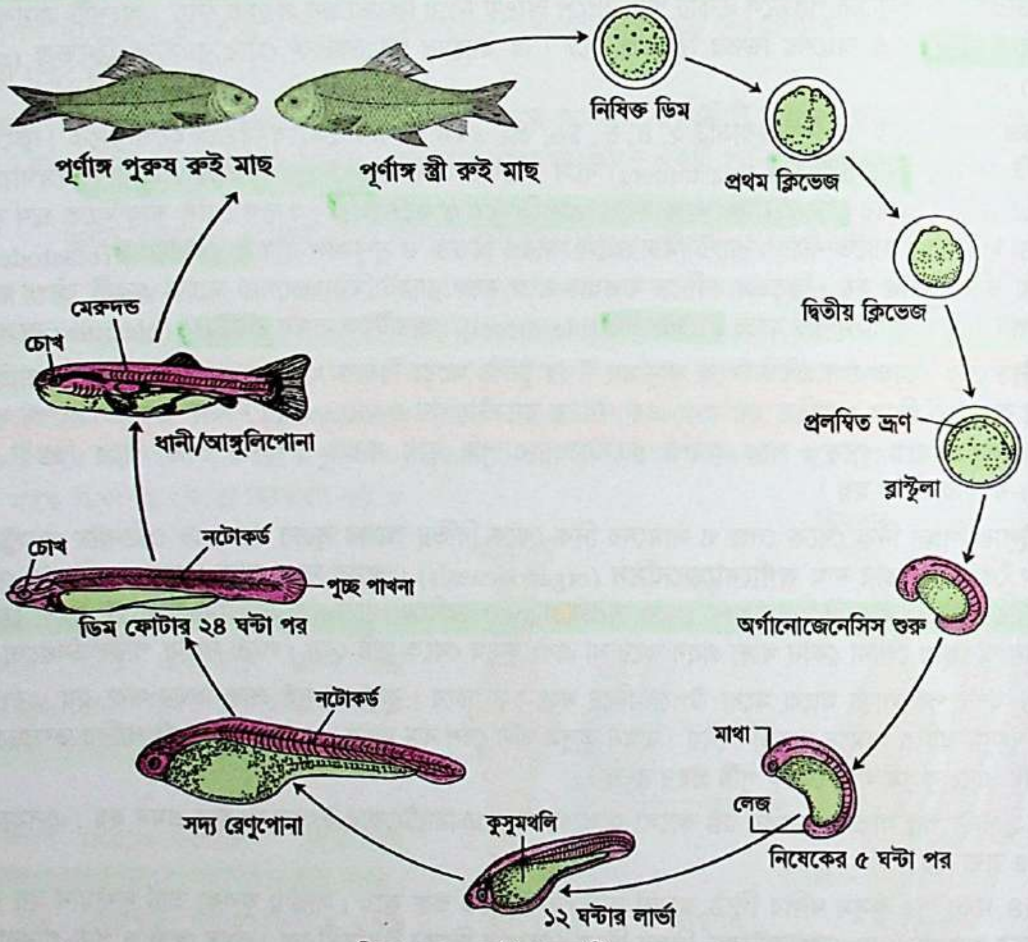

চিত্র ২.৩.১৬ : রুই মাছের জীবন চক্রের ধাপসমূহ

❑ এর পর মাছটির কেবল আঙ্গিক পরিবর্তন ও আকারের পরিবর্ধন ঘটে। স্ত্রীমাছ আকারে পুরুষ অপেক্ষা বড় হয়। পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষ মাছ যৌন পরিপক্কতা লাভ করে ও প্রজননে সক্ষম হয়।

রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ (Natural conservation of *Labeo*)

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পুষ্টির যোগান দিতে, ঝামেলাবিহীন মাছ পেতে ও স্বাদের দিকে নজর রাখতে রুই মাছের চাষ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ব্যাপকহারে বেড়েছে। বিভিন্ন খামারে যতো উন্নত পদ্ধতিতেই চাষ করা হোক না কেন তাকে ছাপিয়ে বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক সংরক্ষণের দাবী ও প্রচার বেড়েছে অনেক গুণ বেশি। বিভিন্ন হ্যাচারিতে চাষের কারণে সীমিত ও নির্দিষ্ট মাছের মধ্যে যেভাবে অন্তঃপ্রজনন ঘটে তার ফলে যে কোনো মাছের ভাল গুণাবলী হারিয়ে যায়, জিনগত বৈচিত্র্য বিনষ্ট হয়, রোগাক্রান্ত মাছের আধিক্য দেখা দেয় ও স্বাদবিহীন মাছের প্রাচুর্যে বাজার সয়লাব হয়ে যায়। মাছ থেকে 'মাছের' স্বাদ পেতে হলে মাছকে 'মাছ' হিসেবে বড় হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, ভূখন্ড বাড়েনি। অতএব, মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি অব্যাহত রাখতে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্টের পাশাপাশি প্রাকৃতিক জীবের সংকটও বেড়েছে, নদী প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং হাওর-বিল-বাওর ভরাট ও দখল হয়ে যাওয়ায় মাছের প্রাকৃতিক জননক্ষেত্র ও লালনভূমি বহুগুণ কমে গেছে। তবে এর

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মধ্যেও কিছু নদী বা তার আশ-পাশ নিয়ে সতর্ক হলে হয়তো কিছু বিশুদ্ধ জিনধারী মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ সম্ভব হতে পারে। তাই পরিবেশগত, প্রজাতিগত ও জিনগত বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ রেখে মাছের প্রজাতি বৈচিত্র্য রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে।

রুই মাছ বাংলাদেশের অতিপরিচিত, সুস্বাদু ও জনপ্রিয় মাছ। এটি Cypriniformes বর্গের Cyprinidae গোত্রভুক্ত প্রজাতি। এ গোত্রের মাছগুলো **কার্প জাতীয় মাছ** (carps) নামে পরিচিত। বাংলাদেশে রুই ছাড়া কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস প্রভৃতি কার্প জাতীয় মাছও পাওয়া যায়। এগুলোকে **বড় কার্প জাতীয় মাছ** বলে। বাংলাদেশের প্রায় সব বড় বড় নদী (পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী, হালদা) ও মূল শাখা নদীতে, কাপ্তাই হ্রদ এবং বিভিন্ন হাওরে রুই মাছ বিস্তৃত।

বড় নদীগুলো হচ্ছে রুই মাছের প্রজনন ক্ষেত্র। গ্রীষ্ম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালবৈশাখি ও ভরা অমাবস্যা-পূর্ণিমায় রুই মাছ নদীতে ডিম ছাড়ে। ডিম থেকে মাছের পোনা যখন আঙ্গুলের সমান বড় হয় (আঙ্গুলিপোনা) তখন সংগ্রহ করে মাছের খামারে লালন-পালন শেষে বাজারজাত করা হয়। বাংলাদেশের এসব অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক উৎস ক্রমশ কমে আসছে (নদী দখল, ভরাট, অপরিকল্পিত বাঁধ, দূষণ ইত্যাদি কারণে), পানির গুণগতমানও নষ্ট হচ্ছে। ফলে মাছের জিনগত বৈশিষ্ট্যও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। **হ্যাচারির মাছ কখনও প্রাকৃতিক মাছের প্রতিনিধিত্ব করে না।** বিজ্ঞানীরা তাই প্রাকৃতিক পরিবেশ ও রুই মাছের আবাসস্থলের যথাযথ সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। অভ্যন্তরীণ নদীগুলো থেকে প্রাকৃতিক রুই মাছ পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছে। এ কারণে, অন্ততঃ বিশুদ্ধ রুই মাছের সংরক্ষণে সবার নজর এখন বাংলাদেশের হালদা নদীর দিকে।

হালদা নদী বাংলাদেশের একমাত্র দেশি নদী নয়, এটি একমাত্র জোয়ার-ভাটার নদী যেখান থেকে মাছচাষীরা পোনার বদলে রুই মাছের নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে নিয়ে যান। এসব ডিম থেকে ফোটানো পোনার বৃদ্ধি যতো দ্রুত ও বেশি হয় অন্য কোনো জায়গা থেকে সংগৃহীত পোনায় তা হয় না, হ্যাচারীতেতো হয়ই না। এ জন্য এক কেজি রেণুপোনার দাম প্রায় ৬০ হাজার টাকা, যা দেশের অন্য জায়গার পোনার দামের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি। হালদা নদীকে তাই প্রাকৃতিক জিনব্যাংক সমৃদ্ধ 'মৎস্য খনি' নামে অভিহিত করা হয়। এ নদীসহ অন্যান্য স্থানে রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণে প্রথম কাজ হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রুই মাছের প্রাকৃতিক বিচরণ স্থলগুলোকে মৎস্য **অভয়াশ্রম** ঘোষণা করা। লক্ষ ও উদ্দেশ্য এবং জলাশয় ভেদে মৎস্য অভয়াশ্রম নিচে বর্ণিত বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

১. মৌসুমি অভয়াশ্রম : নির্দিষ্ট প্রজাতির মাছ বছরের নির্দিষ্ট সময়ে উপযুক্ত বা নির্দিষ্ট প্রজনন ক্ষেত্রে বংশবৃদ্ধি ঘটিয়ে নির্দিষ্ট আবাসে বিচরণ করে থাকে। তাই অবাধ প্রজনন ও বিচরণের জন্য সুনির্দিষ্ট জলাশয় বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মাছের অভয়াশ্রম হিসেবে সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়। যেমন- হালদা নদীর মদুনা ঘাট এলাকা, কাপ্তাই লেকের লং জাদু ও বিলাইছড়ি এলাকা। এখানে হালদা নদীর সামান্য একটি অংশকে (মদুনা ঘাট এলাকা) অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। তাও মৌসুমি অভয়াশ্রম। কিন্তু এ নদীতে সারা বছরই কম-বেশি রুই মাছের আনাগোনা দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময় এ নদী অরক্ষিত থাকে তাই মানুষ গোপনে সারা বছরই মা-রুই মাছ আহরণে ব্যস্ত থাকে। অতএব বিষয়টি পর্যালোচনা করে যথাশীঘ্র সম্ভব সম্পূর্ণ হালদা নদীকে **সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম** ঘোষণা করে কঠোর নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে। দেশের অন্যান্য নদীতে মৌসুমি অভয়াশ্রম কার্যকর হলেও হালদা নদীকে রুই মাছের জন্য সাংবাৎসরিক অভয়াশ্রম ঘোষণা করতে হবে।

২. বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা : হালদা নদী রুই মাছের বিশুদ্ধ জিন সংরক্ষণে অবদান রেখে চলেছে। তাছাড়া, এটি একমাত্র জোয়ার ভাটার নদী যা দেশেরই এক প্রান্তে উৎপত্তি লাভ করে দেশেরই এক স্থানে সমাপ্ত হয়েছে। জোয়ার-ভাটা সমৃদ্ধ অঞ্চল এমনিতেই খুব সমৃদ্ধ কিন্তু অত্যন্ত সংবেদনশীল অঞ্চল। সংবেদনশীলতা ধরে রাখতে পারলে রুইয়ের প্রজনন ও বিচরণ অব্যাহত থাকবে। এ কারণে হালদা নদীকে **বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা** হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

অন্ততঃ হালদা নদীতে রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ করতে হলে নদীপাড়ে প্রতিষ্ঠিত দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন বন্ধ করতে হবে, মা-মাছ শিকারে কঠোর আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে, অপরিকল্পিত বাঁধ, ড্যাম ও স্লুইস গেইট নির্মাণ বন্ধ করতে হবে এবং রুই মাছের ডিম ছাড়ার যে নির্দিষ্ট বাঁক রয়েছে তার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে হবে। এ বিষয় পর্যবেক্ষণে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি অবশ্যই থাকতে হবে। যে সব নদীতে প্রাকৃতিক রুই মাছ পাওয়া যায় সে সব নদীর পাশে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞানীদের তত্ত্বাবধানে রুই মাছের প্রাকৃতিক সংরক্ষণ যথাযথ হবে বলে আশা করা যায়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

হাইড্রা – *Hydra vulgaris*

ডিপোব্লাস্টিক প্রাণী: ভ্রূণ অবস্থায় যে সব প্রাণীর দেহে এক্টোডার্ম ও এন্ডোডার্ম নামের দুটি কোষস্তর থাকে, তারাই ডিপোব্লাস্টিক বা দ্বিস্তরী বা দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী। যেমন- হাইড্রা।

হাইপোস্টোম : *Hydra*-র দেহের সম্মুখ প্রান্তের উঁচু, ছোট, মোচাকার অংশ যা মুখছিদ্রকে ঘিরে রাখে তার নাম হাইপোস্টোম।

নিডোসাইট : *Hydra* সহ Cnidaria পর্বের সকল প্রাণীতে এপিডার্মিসের পেশি–আবরণী কোষের মধ্যবর্তী স্থানে গোল, ডিম্বাকার বা নাসপাতি আকারের কোষকে নিডোসাইট বলে। বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এসব কোষ শিকার ধরা, চলাচল, আত্মরক্ষা, দেহকে কোনো বস্তুর সঙ্গে আটকে রাখতে সাহায্য করে।

নেমাটোসিস্ট : *Hydra*-র নিডোসাইটের স্ফীত মধ্যাংশের তরল পদার্থ পূর্ণ ও প্যাঁচানো সূত্রক সম্বলিত ক্ষুদ্র থলিকে নেমাটোসিস্ট বলে।

হিপ্নোটক্সিন : নেমাটোসিস্টের ভিতরের আমিষ ও ফেনলে গঠিত বিষাক্ত তরল পদার্থকে হিপ্নোটক্সিন বলে।

মেসোগ্লিয়া : *Hydra*-র দেহপ্রাচীরের এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত স্বচ্ছ, স্থিতিস্থাপক, কোষবিহীন, জেলির মতো আঠালো পদার্থকে মেসোগ্লিয়া বলে। এটি এপিডার্মিস ও গ্যাস্ট্রোডার্মিসের ভিত্তিতল এবং পেশি প্রবর্ধনগুলোর সংযুক্তিতল হিসেবে কাজ করে এক ধরনের স্থিতিস্থাপক কঙ্কালের সৃষ্টি করে।

গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর: *Hydra*-র দেহের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ফাঁকা গহ্বরকে সিলেন্টেরন বলে। সিলেন্টেরনে খাদ্যবস্তুর বহিঃকোষীয় পরিপাক ঘটে। এর মাধ্যমে খাদ্যসার, শ্বসন ও রেচন পদার্থ পরিবাহিত হয়। সে কারণে সিলেন্টেরনকে গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার গহ্বর (পরিপাক-সংবহন গহ্বর) বলা হয়।

ঘাসফড়িং – *Poekilocerus pictus*

কিউটিকল : পতঙ্গের দেহের বহিঃস্থ এপিথেলিয়াম (হাইপোডার্মিস) থেকে নিঃসৃত অকোষীয় জৈবিক স্তরে নির্মিত দেহের প্রতিরক্ষা আবরণকে কিউটিকল বলে।

স্ক্লেরাইট : পতঙ্গের বহিঃকংকাল গঠনকারী প্রতিটি প্লেটকে স্ক্লেরাইট বলে।

প্লুরা : ঘাসফড়িংসহ অন্যান্য পতঙ্গের প্রতি দেহখন্ডকের পৃষ্ঠদেশীয় স্ক্লেরাইট অর্থাৎ **টার্গাম** এবং অঙ্কীয়দেশীয় স্ক্লেরাইট অর্থাৎ **স্টার্নাম** দেহের পার্শ্বদেশে প্লুরা নামের পর্দা দিয়ে পরস্পর যুক্ত থাকে।

ক্রপ : ঘাসফড়িংসহ অন্যান্য পতঙ্গের পৌষ্টিকনালির পাতলা প্রাচীর বিশিষ্ট থলির মতো অংশ যেখানে খাদ্য সাময়িকভাবে জমা থাকে।

ওভিপজিটর : স্ত্রী ঘাসফড়িংয়ের উদরের শেষ প্রান্তে অবস্থিত ডিম পাড়ার অঙ্গকে ওভিপজিটর বলে।

নিম্ফ : ঘাসফড়িং, আরশোলা ইত্যাদি পতঙ্গে ডিম ফুটে যে শিশু দশা বেরিয়ে আসে তাকে নিম্ফ বলে। নিম্ফ এর গঠন, খাদ্যরুচি প্রায় পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতোই তবে এরা আকৃতিতে ছোট, মস্তক তুলনামূলকভাবে বড়, অ্যান্টিনা খাটো, জননঅঙ্গ অসম্পূর্ণ ও এদের ডানা থাকে না।

ইনস্টার : ঘাসফড়িংয়ের জীবনচক্রে নিম্ফগুলো কয়েকবার খোলস নির্মোচনের পর পূর্ণাঙ্গ দশা প্রাপ্ত হয়। পরপর দুটি নির্মোচনের মধ্যবর্তী অবস্থাকে ইনস্টার বলে।

পুঞ্জাক্ষি : ঘাসফড়িংয়ের (পতঙ্গের) মস্তকের উভয় পাশে কালো, বৃন্তহীন, বৃত্তাকার উত্তল গঠনকে পুঞ্জাক্ষি বলে। পুঞ্জাক্ষি দর্শন ইন্দ্রিয়। প্রতিটি পুঞ্জাক্ষি প্রায় বিশ হাজার দর্শন একক বা ওমাটিডিয়া নিয়ে গঠিত।

ওমাটিডিয়াম : স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে প্রতিবিম্ব গঠনে সক্ষম পুঞ্জাক্ষির প্রতিটি সরলাক্ষি বা দর্শন একক বা একক আলোক সংবেদী অঙ্গকে ওমাটিডিয়াম বলে।

অসম্পূর্ণ রূপান্তর : যে ধারাবাহিক ও দ্রুত পরিবর্তনের মাধ্যমে শিশু অবস্থা থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী সৃষ্টি হয় তাকে রূপান্তর বলে। যে রূপান্তরে শিশু দশার প্রাণীটি গঠন, বসতি, খাদ্য, খাদ্যাভ্যাস পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর মতোই তবে এরা আকৃতিতে ছোট, ডানা ও জনন অঙ্গ থাকে না এবং আংশিক পরিবর্তনের মাধ্যমে কয়েকবার খোলস

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বদলানোর মধ্য দিয়ে পূর্ণাঙ্গ দশা প্রাপ্ত হয় সেই ধরনের রূপান্তরকে অসম্পূর্ণ রূপান্তর বলে। অসম্পূর্ণ রূপান্তরের শিশু দশাকে নিম্ফ (nymph) বলে। যেমন- ঘাসফড়িং, আরশোলা ইত্যাদি।

রুই মাছ - *Labeo rohita*

কার্প : মিঠাপানির যেসব মাছের মাথায় আঁইশ থাকে না কিন্তু সারাদেহ সাইক্লয়েড আঁইশ দিয়ে আবৃত থাকে, দেহগহ্বরে পটকা থাকে যে সব মাছকে কার্পজাতীয় মাছ বলে। কার্পজাতীয় মাছের মধ্যে যেগুলো আকৃতিতে বড়, দ্রুত বর্ধনশীল এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোকে বলা হয় **মেজর কার্প**। যেমন- রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউস ইত্যাদি।

সাইক্লয়েড আঁইশ : রুই মাছের দেহ যে ধরনের আঁইশ দিয়ে আবৃত থাকে তাকে সাইক্লয়েড আঁইশ বলে। আঁইশগুলো পাতলা, স্বচ্ছ ও মোটামুটি গোল। আঁইশের কেন্দ্রস্থলের স্বচ্ছ অংশকে **ফোকাস** বলে। ফোকাসকে ঘিরে বৃত্তাকার **বৃদ্ধি রেখা** থাকে। এই বৃদ্ধি রেখা দেখে মাছের বার্ষিক বৃদ্ধি, বয়স নির্ণয় করা যায়।

পার্শ্বরেখা : রুই মাছের মস্তকের পিছন থেকে লেজ পর্যন্ত দুপাশে দুটি লম্বা দাগ থাকে। দাগদুটিকে পার্শ্বরেখা বলে। এতে সংবেদী কোষ থাকে। পার্শ্বরেখার সাহায্যে মাছ পানির কম্পন অনুভব করে পানির বিভিন্ন স্তরে এদের আবাসস্থল নিরূপণ করতে পারে।

ভেনাস হার্ট : যে ধরনের হৃৎপিন্ডের মধ্য দিয়ে কখনই অক্সিজেনযুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় না বরং শুধু কার্বন ডাইঅক্সাইড যুক্ত রক্ত প্রবাহিত হয় তাকে ভেনাস হার্ট বলে। অর্থাৎ এধরনের হৃৎপিন্ড শিরার বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। যেমন - মাছের হৃৎপিন্ড।

স্পনিং : ডিম পাড়া ও শুক্রাণু নিঃসরণ প্রক্রিয়াকে স্পনিং বলে। স্রোতযুক্ত স্বাদু পানিতে রুই মাছের স্পনিং ঘটে।

রেণুপোনা : ডিম ফুটে বের হওয়া সদ্যজাত লার্ভাকে রেণুপোনা বা হ্যাচলিং বলে। রেণুপোনার দেহের অঙ্কীয়দেশে কুসুমথলি থাকে। কুসুমথলির সঞ্চিত খাদ্য খেয়ে এরা পুষ্টি লাভ করে ও বৃদ্ধি পায়। ডিমপোনার বয়সকাল ৭২ ঘন্টা।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি হাইড্রার দেহে দেখা যায় ?
ক) মেসোগ্লিয়া খ) হিমোসিল
গ) স্ক্লেরাইট ঘ) মায়োফাইব্রিল

২. হাইড্রার নিডোসাইট সবচেয়ে বেশি থাকে কোথায় ?
ক) দেহকাণ্ডে খ) কর্ষিকায়
গ) হাইপোস্টোমে ঘ) পাদ-চাকতিতে

৩. হাইড্রার পরিস্ফুটনের সঠিক ধাপ কোনটি ?
ক) জাইগোট → ব্লাস্টুলা → মরুলা → গ্যাস্ট্রুলা
খ) জাইগোট → গ্যাস্ট্রুলা → মরুলা → হাইড্রুলা → ব্লাস্টুলা → পূর্ণাঙ্গ
গ) জাইগোট → মরুলা → ব্লাস্টুলা → গ্যাস্ট্রুলা → হাইড্রুলা → পূর্ণাঙ্গ
ঘ) জাইগোট → গ্যাস্ট্রুলা → মরুলা → হাইড্রুলা → ব্লাস্টুলা → পূর্ণাঙ্গ

৪. কোন নিমাটোসিস্টে হিপনোটক্সিন থাকে ?
ক) পেনিট্রান্ট খ) ভলভেন্ট
গ) স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট ঘ) স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট

৫. বার্ব এবং বার্বিউল যুক্ত নেমাটোসিস্ট কোনটি ?
ক) পেনিট্রান্ট খ) ভলভেন্ট
গ) স্ট্রেপটোলিন গ্লুটিন্যান্ট ঘ) স্টেরিওলিন গ্লুটিন্যান্ট

৬. কোনটি মিথোজীবী প্রজাতি ?
ক) *Hydra vulgaris* খ) *Hydra oligactis*
গ) *Hydra gangetica* ঘ) *Chlorohydra viridissima*

৭. দস্তক কোন উপাঙ্গের অংশ ?
ক) ম্যান্ডিবল খ) ল্যাব্রাম গ) ল্যাবিয়াম ঘ) ম্যাক্সিলা

৮. ম্যাক্সিলারি পাল্পের কাজ হলো -
ক) রেচনে সাহায্য করে খ) খাদ্যের স্বাদ গ্রহণে সাহায্য করে
গ) দর্শনে সাহায্য করে ঘ) শ্বসনে সাহায্য করে

৯. কোনটি ঘাসফড়িং-এর স্পাইরাকলকে পরিবেষ্টিত করে রাখে ?
ক) টিনিডিয়া খ) ইন্টিমা গ) অপারকুলাম ঘ) পেরিট্রিম

১০. ঘাসফড়িং- এর বক্ষ অঞ্চলে কত জোড়া শ্বাসরন্ধ্র থাকে ?
ক) ২ খ) ৫ গ) ৮ ঘ) ১০

১১. মৎস্য খনি কোন নদীকে বলা হয় ?
ক) পদ্মা খ) হালদা গ) পশুর ঘ) রূপসা

১২. পাশের চিত্রের প্রাণীটির খাদ্যাভ্যাস কোন ধরনের ? [ঢা.বো.১৮]
ক) তৃণভোজী খ. মাংসাশী গ) মৃতজীবী ঘ. সর্বভুক

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

লাল-সবুজে দাগানো

TEXT BOOK

প্রাণিবিজ্ঞান

উন্মেষ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১০ মানবদেহের প্রতিরক্ষা (ইমিউনিটি)
Protection of Human Body (Immunity)

মানবদেহে সংক্রমণ এড়ানোর প্রধান উপায় হচ্ছে দেহের ভিতরে জীবাণুর প্রবেশে বাধা দেয়া। চামড়া, ক্ষত, নাক, মুখ বা অন্য যেকোনো উপায়ে জীবাণু দেহে প্রবিষ্ট হলে শুরু হয় আক্রান্ত জীবাণুর সংক্রমণ থেকে দেহকে বাঁচানোর প্রাণান্তকর প্রয়াস। দেহের ভিতরে ও বাইরে রোগ জীবাণু ধ্বংসের এক জটিল ব্যবস্থাপনা রয়েছে যা **ইমিউনতন্ত্র** নামে পরিচিত। যে প্রক্রিয়ায় দেহ ক্ষতিকর অণুজীব এবং বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে নিজেকে রক্ষা করে তাকে **ইমিউনিটি** (immunity) বা **অনাক্রম্যতা** বলে। ইমিউনিটি দুর্বল হলে **ভ্যাক্সিন** বা **টিকা** দিয়ে সবল করে তোলা হয়।

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

- অ্যান্টিবডি
- নিউট্রোফিল
- ম্যাক্রোফেজ
- প্রতিরক্ষা স্তর
- ফ্যাগোসাইটোসিস
- সহজাত প্রতিরক্ষা
- অ্যান্টিজেন
- অর্জিত প্রতিরক্ষা

পিরিয়ড সংখ্যা-৯ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. মানবদেহের প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর হিসেবে ত্বকের কাজ বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করার ক্ষেত্রে পরিপাক নালির এসিড ও এনজাইমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. মানবদেহের সহজাত ও অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. মানবদেহের প্রতিরক্ষায় অ্যান্টিবডি এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরির ক্ষেত্রে টিকার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। ৮. দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরক্ষা তৈরিতে মেমোরি কোষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ● প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর ○ প্রতিরক্ষায় ত্বকের ভূমিকা ○ খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে পরিপাক নালির এসিড ও উৎসেচকের ভূমিকা ● দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর ○ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ (Macrophages) ○ নিউট্রোফিলস (Neutrophils) ● তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর ○ সহজাত (Inborn) ○ অর্জিত (Acquired) ● প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অ্যান্টিবডির ভূমিকা ● প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় টিকার (Vaccine) ভূমিকা ● দেহের প্রতিরক্ষায় স্মৃতি (Memory) কোষের ভূমিকা

ইমিউন প্রতিরক্ষায় বিভিন্ন কোষের ভূমিকা

ইমিউন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় (immune defense) অনেক ধরনের কোষ, অসংখ্য ও বৈচিত্র্যময় কাজের মাধ্যমে দেহকে সুস্থ-সবল রাখতে সদা তৎপর রয়েছে। নিচে এসব কোষের নাম, উৎপত্তিস্থল ও কাজের উল্লেখ করা হলো।

কোষের নাম	উৎপত্তি	কাজ
লিউকোসাইট (নিউট্রোফিল)	অস্থিমজ্জা	ফ্যাগোসাইটোসিস; প্রদাহকে ঘিরে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ক্ষরণ।
বেসোফিল	অস্থিমজ্জা	প্রদাহ সৃষ্টিতে হিস্টামিন ও অন্যান্য রাসায়নিক ক্ষরণ।
ইওসিনোফিল	অস্থিমজ্জা	বহুকোষী জীবাণু ধ্বংস; দ্রুত অতিসংবেদনশীল প্রতিক্রিয়ায় সাড়া দান।
মনোসাইট	অস্থিমজ্জা	ম্যাক্রোফেজের অনুরূপ (নিচে দেয়া আছে)।
লিম্ফোসাইট	ভ্রূণীয় স্টেমকোষ	নির্দিষ্ট ইমিউন সাড়ার শনাক্তকারী কোষ (recognition cells) হিসেবে কাজ করে।
B-কোষ	–	নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনকে B-কোষের কোষঝিল্লির রিসেপ্টরে যুক্ত করে অ্যান্টিজেননির্ভর ইমিউন সাড়ার সূত্রপাত ঘটায়; নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনকে হেলপার T-কোষের সামনে তুলে ধরে।
সাইটোটক্সিক T-কোষ	–	টার্গেট কোষের কোষঝিল্লিতে যুক্ত হয়ে সরাসরি কোষকে ধ্বংস করে।
হেলপার T-কোষ	–	সাইটোকাইন (cytokines) ক্ষরণ করে B-কোষ, সাইটোটক্সিক T-কোষ, NK-কোষ ও ম্যাক্রোফেজকে সক্রিয় করে।
NK-কোষ	–	ভাইরাস আক্রান্ত ও ক্যান্সার কোষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধ্বংস করে।
প্লাজমা কোষ	প্লীহা, টনসিল, লসিকা গ্রন্থি	অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে।
ম্যাক্রোফেজ	সমস্ত টিস্যু ও অঙ্গ	ফ্যাগোসাইটোসিস; বিষাক্ত রাসায়নিক ক্ষরণের মাধ্যমে বহিঃকোষীয় ধ্বংস কার্যক্রম; হেলপার T-কোষের কাছে অ্যান্টিজেন উপস্থাপন।
মাস্ট কোষ	সমস্ত টিস্যু ও অঙ্গ	প্রদাহের সঙ্গে জড়িত হিস্টামিন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (Defense Mechanism of Human Body)

রোগ-ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পেতে মানবদেহ ৩টি প্রতিরোধ কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। প্রত্যেকটি কৌশলকে একেকটি **প্রতিরক্ষা স্তর** (line of defense) নামে অভিহিত করা হয়। প্রতিটি ব্যবস্থা ভৌত ও রাসায়নিক প্রতিবন্ধক হিসেবে সদা সর্তক রয়েছে। মানবদেহের ৩টি প্রতিরক্ষা স্তর (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়) নিচে উল্লেখ করা হলো।

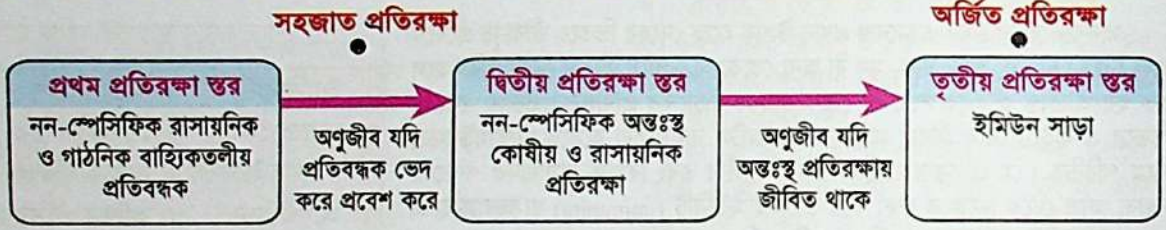

১. প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর (First line of Defense)

মানবদেহের প্রতিরক্ষায় যে প্রতিরক্ষা স্তর রাসায়নিক ও ভৌত বাহ্যিকতলীয় প্রতিবন্ধক (chemical and physical surface barriers) হিসেবে বহিরাগত যে কোনো অণুজীব বা কণাকে দেহের ভিতরে প্রবেশে বাধা দেয় তাকে **প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর** বলে। এ প্রতিরক্ষা স্তর কোনো নির্দিষ্ট বহিরাগত বস্তুকে ক্ষতিকর হিসেবে টার্গেট না করে সব বহিরাগত পদার্থকেই ক্ষতিকর বিবেচনা করে দেহে প্রবেশে নিম্নোক্ত ভৌত-রাসায়নিক প্রতিবন্ধকের মিলিত কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলে। তাই এ স্তরটি **নন-স্পেসিফিক** (non-specific) স্তর নামে পরিচিত।

ক. **ত্বক** (skin/Integument; integere = to cover) : ত্বক চারভাবে একটি কার্যকর প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে: (i) গাঠনিকভাবে কেরাটিনময়, বায়ুরোধী, জলাভেদ্য (waterproof) ও অধিকাংশ পদার্থের প্রতি অভেদ্য; (ii) সবসময় প্রতিস্থাপিত হয়; (iii) এসিডিক pH; এবং (iv) ঘামগ্রন্থি ও স্বেদগ্রন্থি থেকে উৎপন্ন অ্যান্টিবায়োটিকের উপস্থিতি।

খ. **লোম** (Hairs) : নাকের ভিতরকার লোম ধূলা-ময়লা আটকে দেহের অভ্যন্তরে ক্ষতিকর পদার্থের যাতায়াত বন্ধ করে রাখে।

গ. **সিলিয়া** (Cilia) : দেহের প্রবেশ পথগুলো মিউকাস ঝিল্লিতে (mucous membrane) আবৃত থাকে। মিউকাস ঝিল্লিময় অনেক অংশ (যেমন– শ্বাসনালি) আণুবীক্ষণিক ও সদা বহির্মুখী আন্দোলনরত সিলিয়ায় আবৃত থাকে। বহিরাগত কণা ও অণুজীব এ ঝিল্লির আঠালো মিউকাসে আটকে দলা পাকিয়ে হাঁচি-কাশি-থুথু হিসেবে বহির্গত হয় কিংবা পাকস্থলিতে এসে পৌঁছায়।

ঘ. **অশ্রু ও লালা** (Tears and Saliva) : অশ্রু ও লালা আমাদের অজান্তে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। অশ্রু ও লালায় যে **লাইসোজাইম** (lysozyme) এনজাইম রয়েছে তা ব্যাকটেরিয়ানাশক হিসেবে কাজ করে। লালা মুখগহ্বরকে শুধু সিক্ত ও পিচ্ছিল রাখে না, গহ্বরের প্রাচীর যেন শুকিয়ে ফেটে না যায় সে কাজও করে। এ কারণে কেনো জীবিত ব্যাকটেরিয়া মুখের ক্ষতি করতে পারে না। বরং লালামিশ্রিত হয়ে সরাসরি পাকস্থলিতে পৌঁছে আরও শক্তিশালী এসিডের ক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়। চোখকে বারংবার ভিজিয়ে দিয়ে অশ্রু বহিরাগত কণা ও অণুজীবের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে।

ঙ. **সিরুমেন** (Cerumen or Ear wax) : বহিঃকর্ণের কর্ণকুহর নামক অংশের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হলদে-বাদামি রংয়ের মোমের মতো পদার্থকে সিরুমেন বলে। কানের পর্দায় যেন ময়লা ও অণুজীবের সংক্রমণে শ্রবণে ব্যাঘাত না ঘটে সেজন্য সিরুমেনে আটকে শক্ত দলায় অর্থাৎ কানের **খইল**–এ পরিণত হয়।

চ. **পৌষ্টিকনালির এসিড** : খাদ্য ও পানির সঙ্গে অনেক ধরনের ক্ষতিকর অণুজীব পাকস্থলিতে এসে জমা হয় এবং পাকস্থলির শক্তিশালী হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও প্রোটিওলাইটিক এনজাইমের ক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়।

ছ. **রেচন-জননতন্ত্রের এসিড** : রেচন-জননতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত অঙ্গের ক্ষরণ প্রচন্ড এসিডিক ও আঠালো হয়ে থাকে। অনুপ্রবেশিত অণুজীব সহজেই আঠালো ক্ষরণে আটকে যায় এবং পরে ফ্যাগোসাইট এগুলোকে গ্রাস করে বা মূত্রত্যাগের সময় সবেগে নিষ্ক্রান্ত হয়। যোনিতে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া ল্যাকটিক এসিড ক্ষরণ করে অন্য অণুজীবের বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

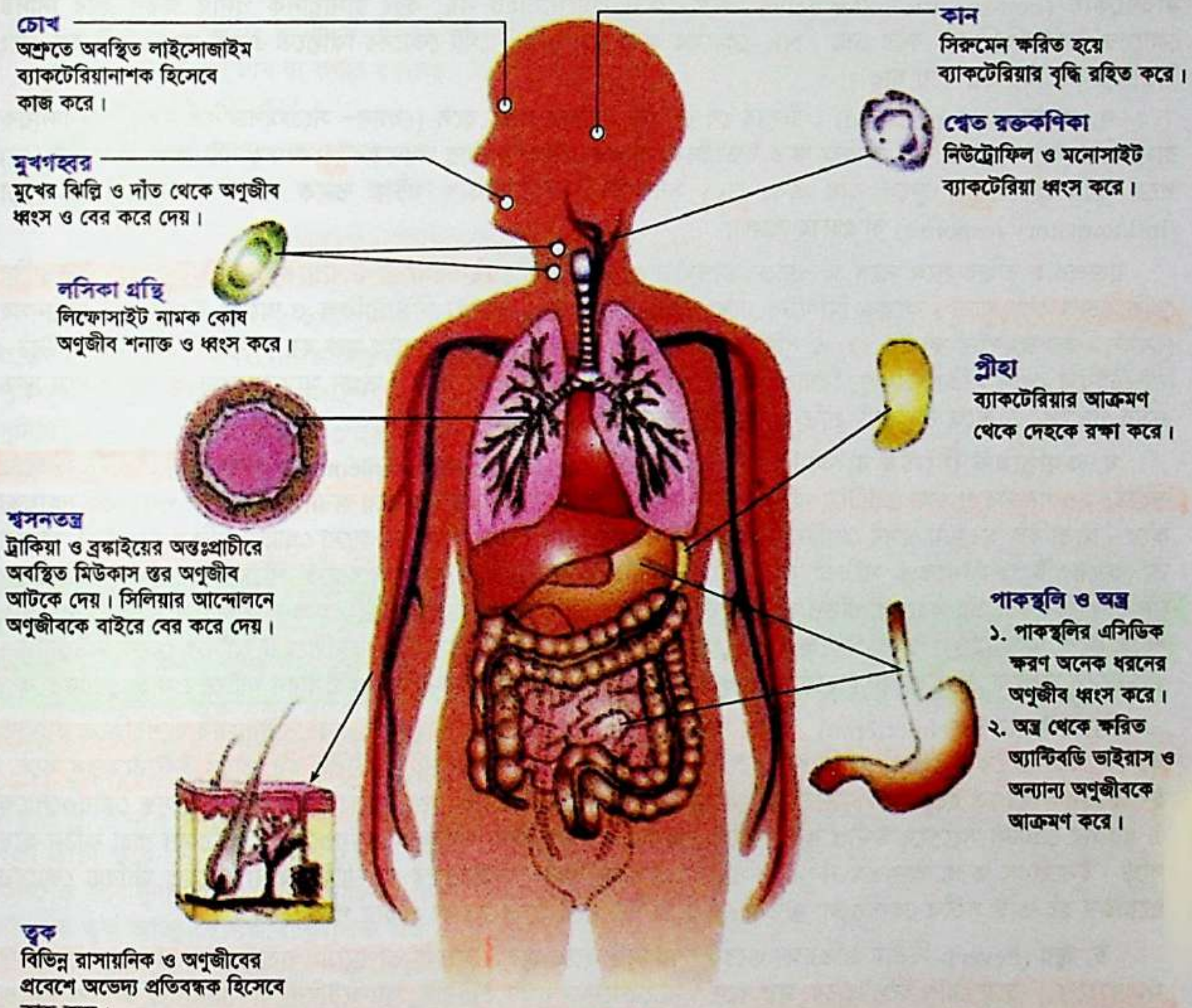

চিত্র ১০.১ : মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

২. দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর (Second line of Defense)

বাহ্যিকতলীয় প্রতিরক্ষা স্তর ভেদ করে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশকারী যে কোনো অণুজীব বা অণুকণার বিরুদ্ধে দেহাভ্যন্তরীণ কোষীয় ও রাসায়নিক প্রতিরক্ষা (internal cellular and chemical defenses) নিয়ে গঠিত যে স্তর সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলে তাকে **দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর** বলে। এটিও একটি নন-স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা স্তর। সংজ্ঞা দিতে হবে। নিচে বর্ণিত অন্ততঃ ৬ ধরনের নন-স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা পদ্ধতি নিয়ে দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর গঠিত।

ক. ফ্যাগোসাইট (Phagocytes) : বড় আকারের শ্বেত রক্তকণিকা যা অণুজীব, অন্য কোষ ও বহিরাগত কণা ভক্ষণ করে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অবদান রাখে তাকে **ফ্যাগোসাইট** বলে। দুটি প্রধান ফ্যাগোসাইটিক কণিকা হচ্ছে নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ। এগুলো অস্থিমজ্জা থেকে উৎপন্ন হয়। দেহে জীবাণুর সংক্রমণ হলে তার প্রতি সাড়াদান হিসেবে নিউট্রোফিল রক্তে, আর ম্যাক্রোফেজ নির্দিষ্ট টিস্যুতে ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণু গ্রাস করে। শুধু জীবাণু গ্রাস ও হজম করাই নয়, ম্যাক্রোফেজ পুরনো রক্তকণিকা, মৃত টিস্যু-খন্ড ও কোষীয় ময়লা গ্রাস করে ধাঙ্গর কোষ হিসেবে কাজ করে।

খ. সহজাত মারণকোষ (Natural killer cells, সংক্ষেপে NK cells) : এক ধরনের লিম্ফোসাইট জাতীয় বিশেষ শ্বেত রক্তকণিকা যা টিউমার কোষ ও ভাইরাসে আক্রান্ত কোষের প্লাজমাঝিল্লিতে কিছু নির্দিষ্ট পরিবর্তনকে শনাক্ত করে কোষগুলোকে ধ্বংস করে দেয় সেসব কোষকে **সহজাত মারণকোষ** (NK-কোষ) বলে। এগুলো নন-স্পেসিফিক

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মারণকোষ (non-specific killer cells)। NK-কোষ ফ্যাগোসাইট নয়, বরং রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে নির্দিষ্ট কোষের প্লাজমাঝিল্লি নষ্ট করে দেয়। NK-কোষের আক্রমণে দ্রুত টার্গেট কোষের ঝিল্লিতে একটি রন্ধ্রের সৃষ্টি হয় এবং নিউক্লিয়াসটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

গ. প্রদাহ (Inflammation) : টিস্যুর যে কোনো ধরনের ক্ষতি হলে (যেমন– সংক্রমণজনিত দহন, যন্ত্রণাদায়ক রাসায়নিক বা আঘাতজনিত দৈহিক ক্ষত ইত্যাদি) যে ধারাবাহিক ঘটনার শুরুতে– (i) ক্ষতস্থানটি লাল হয়ে যায়, (ii) পরে গরম হয়, (iii) ফুলে যায় এবং (iv) সবশেষে ব্যথার প্রকাশ ঘটায় তাকে সম্মিলিতভাবে **প্রদাহ-সাড়া** (inflammatory response) বা **প্রদাহ** বলে।

রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থানে তাপমাত্রাও বেড়ে যায়। হিস্টামিনের উপস্থিতির জন্য কৈশিকনালির প্রাচীর বেশি ভেদ্য হয়ে পড়ে। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রাচীর ভেদ করে অসংখ্য নিউট্রোফিল ও অনেক উপকারী উপাদানসহ (যেমন - রক্তজমাটের ফ্যাক্টর, O_2 ও পুষ্টি পদার্থ ইত্যাদি) তরল পদার্থ রক্তপ্রবাহে মুক্ত হয়। ফলে ক্ষতস্থান ফুলে উঠে। নিউট্রোফিল রোগ সৃষ্টির জীবাণু, বিষাক্ত পদার্থ ও মৃতকোষ ভক্ষণ শুরু করে। তখন ম্যাক্রোফেজ আবির্ভূত হয়ে দ্রুত এসব পদার্থের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রতি আক্রমণে নিযুক্ত হয়।

ঘ. কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম বা কমপ্লিমেন্ট (Complement system or complement) : কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে অন্ততঃ ২০ ধরনের প্লাজমা প্রোটিনে গঠিত এমন একটি গ্রুপ যা রক্তে সংবহিত হয়ে অন্যান্য প্রতিরক্ষা পদ্ধতিকে সহায়তা করে। স্বাভাবিক অবস্থায় এসব প্রোটিন নিষ্ক্রিয়ভাবে সংবহিত হয়। একবার যদি কোনো প্রোটিন সক্রিয় হয়ে উঠে তাহলে তা আরেকটি প্রোটিনকেও সক্রিয় করে তুলে। এভাবে সমস্ত প্রোটিন পরস্পরকে সক্রিয় করে স্পেসিফিক ও নন-স্পেসিফিক উভয় ধরনের প্রতিরক্ষা পদ্ধতিকে উসকে দেয়। ফলশ্রুতিতে NK-কোষ দক্ষতার সঙ্গে টিউমার কোষ ধ্বংস করে; নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ দ্রুত ক্ষতস্থানে পৌঁছায়; অণুজীবের গায়ে কমপ্লিমেন্ট আটকে থেকে নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজকে কোষভক্ষণে সহযোগিতা করে (চিনিয়ে দেয়); এবং রক্তবাহিকার প্রসারণ ঘটিয়ে প্রদাহ ত্বরান্বিত করে।

ঙ. ইন্টারফেরন (Interferon) : ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটাতে আক্রান্ত কোষ থেকে যে বিশেষ ধরনের ক্ষুদ্র গ্লাইকোপ্রোটিন উৎপন্ন ও ক্ষরিত হয় তাকে **ইন্টারফেরন** বলে। ইন্টারফেরন ব্যাপিত হয়ে আশপাশের সুস্থ কোষে ছড়িয়ে পড়ে, ঐসব কোষের ঝিল্লিতে যুক্ত হয় এবং সুস্থ কোষগুলোকে এ ধরনের প্রোটিন সংশ্লেষে উদ্দীপ্ত করে, ফলে ভাইরাসের পক্ষে অন্য সুরক্ষিত কোষগুলোতে আক্রমণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইনফেরন ক্ষরণ অন্যতম নন-স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা স্তর। ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির জন্য যেহেতু জীবিত কোষের প্রয়োজন হয় তাই সজীব কোষগুলো দ্রুত সাড়া দিয়ে ইন্টারফেরনের সুরক্ষা প্রাচীর গড়ে তুলে।

চ. জ্বর (Fever): দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তরের শেষ অস্ত্র হচ্ছে জ্বর। দৈহিক তাপমাত্রা স্বাভাবিকের (97—99°F অর্থাৎ 36–37.2°C) চেয়ে বেশি হলে তাকে **জ্বর** বলে। ম্যাক্রোফেজ যখন ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা বহিরাগত কণাকে শনাক্ত ও আক্রমণ করে তখন কোষগুলো রক্তপ্রবাহে **পাইরোজেন** (pyrogen) নামক পলিপেপটাইড ক্ষরণ করে। পাইরোজেন মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে বিপাকীয় পরিবর্তন ঘটিয়ে দেহের তাপমাত্রাকে উচ্চতর মাত্রায় নির্ধারণ করায়। তখন শরীর কেঁপে উঠে ও জ্বর আসে। জ্বরমাত্রই ক্ষতিকর নয়। কম বা মাঝারি ধরনের জ্বর (102 — 104°F) দেহের উপকারই করে। এমন জ্বরে দেহের ভিতরে জীবাণু তেমন সুবিধা পায় না, বরং সংক্রমণের বিরুদ্ধে দেহের যুদ্ধ করার সক্ষমতা বেড়ে যায়। জ্বর হলে দেহকোষের বিপাকীয় হার বেড়ে যায়, প্রতিরক্ষা পদ্ধতি ও টিস্যুর ক্ষয়পূরণ দ্রুততর হয়। জ্বরশেষে ম্যাক্রোফেজগুলো পাইরোজেন ক্ষরণ বন্ধ করে দেয়, দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে। যে জ্বর দুদিনের বেশি স্থায়ী হয়, কিংবা ১০০°এ ছাড়িয়ে যায় তখনই চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

৩. তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর (Third line of Defense)

যে প্রতিরক্ষা স্তর দেহে অনুপ্রবেশকারী সুনির্দিষ্ট ধরনের বহিরাগত রোগসৃষ্টিকারী অণুজীব বা কণা বা ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করে এবং প্রথমবার আক্রান্ত হওয়ার পর এসব নির্দিষ্ট ক্ষতিকর টার্গেটকে আজীবন মনে রেখে পরবর্তী যে কোনো আক্রমণের সময় দ্রুত ও কার্যকর সাড়া দেয় তাকে **তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর** বলে। এ স্তরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডটি **ইমিউন সাড়া** (immune response) নামে পরিচিত।

বহিরাগত অণুজীব বা কণা কোনোভাবে ১ম ও ২য় প্রতিরক্ষা স্তর অতিক্রম করে (অর্থাৎ সমস্ত নন-স্পেসিফিক প্রতিরক্ষা পেরিয়ে) দেহে অনুপ্রবিষ্ট হলে প্রতিরক্ষা স্তরের সর্বোত্তম, সক্রিয়, শক্তিশালী ও স্থায়ী অনাক্রম্য সাড়ার সম্মুখীন হয়। এ সাড়া নিম্নোক্ত ৩টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যযুক্ত :

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ক. বহিরাগত অণুজীব বা কণা শনাক্ত করে টার্গেটে পরিণত করতে পারে। নিজের স্বাস্থ্যবান কোষকে অসুস্থ (যেমন– ক্যান্সার কোষ) বা মৃতপ্রায় বা মৃতকোষ থেকে পৃথক করতে পারে।

খ. বহিরাগত অণুজীব বা কণার সংক্রমণ 'স্মৃতি'তে ধরে রেখে বছরের পর বছর নির্দিষ্ট বহিরাগতের অনুপ্রবেশ দ্রুত ঠেকানোর চেষ্টা করে।

গ. এটি সমগ্র দেহকে রক্ষা করে এবং অনুপ্রবেশকারী উদ্ভূত অনাক্রম্যতা দেহের নির্দিষ্ট অংশে কার্যকর না থেকে শরীরের যে কোনো অংশে কার্যকর হতে পারে।

দেহের প্রতিরক্ষায় ত্বকের ভূমিকা (প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর)
(Role of Skin in Defense of the Body)

মানবদেহকে সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রথমে দরকার দেহে জীবাণুর প্রবেশ বন্ধ করা। একাজে প্রতিবন্ধক হিসেবে **ত্বক** (skin) অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এ কারণে প্রথম সারির প্রতিরক্ষক হিসেবে ত্বক সুপরিচিত। এটি অন্যতম **নন-স্পেসিফিক** (non-specific) বহিঃস্থ প্রতিবন্ধক। যে প্রতিবন্ধক কোনো জীবিত বস্তুকে সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত না করতে পেরে তাকে জীবাণু মনে করে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে ধরনের প্রতিবন্ধককে **অনির্দিষ্ট বা নন-স্পেসিফিক প্রতিবন্ধক** বলে। নিচে দেহের প্রতিরক্ষায় ত্বকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

❑ ত্বকের বাইরের স্তরটি **এপিডার্মিস** (epidermis)। এটি একটি হর্ণি স্তর যা মৃত ও চাপা কোষে গঠিত এবং **স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম** (stratum corneum) নামে পরিচিত। এটি জীবাণুরোধী স্তর এবং ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসের প্রবেশে **ভৌত প্রতিবন্ধক** (physical barrier) হিসেবে কাজ করে। কতকগুলো ভাইরাস ছাড়া এমন কোনো রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু নেই যা অক্ষত ত্বকের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে।

❑ মানবত্বকে অক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া সব সময়ই থাকে, কিন্তু ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া সেখানে বাঁচতে পারে না। কারণ ত্বকের **স্বেদ বা সিবেসাস গ্রন্থি** (sebaceous gland) ও **ঘাম গ্রন্থি** (sweat gland) থেকে যথাক্রমে যে তেল (বা স্বেদ) ও ঘাম ক্ষরিত হয় তা ত্বককে এসিডিক (p^H 3.0-5.0) করে তুলে। এমন পরিবেশে জীবাণু বাঁচতে বা বংশবৃদ্ধি করতে পারে না। অন্যদিকে, ত্বকে যে সব অক্ষতিকর বা উপকারী ব্যাকটেরিয়া থাকে সেগুলোও যে এসিড ও বিপাকীয় বর্জ্য ত্যাগ করে সে সব পদার্থও ত্বকের উপরে ব্যাকটেরিয়া দমনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। স্বেদ ও ঘাম গ্রন্থির ক্ষরণেও জীবাণুনাশক (অ্যান্টিবায়োটিক) পদার্থ থাকে (যেমন –ডার্মিসাইডিন নামে পেপটাইড)। এসব পদার্থ থাকায় মানুষের ত্বক **আত্ম-রোগজীবাণুনাশক অঙ্গ** (self-disinfecting organ) হিসেবে কাজ করে।

❑ মানুষের দেহগাত্রে স্বাভাবিকভাবে বসবাসরত ব্যাকটেরিয়া অন্যান্য অণুজীবের সংক্রমণ আশঙ্কা থেকে দেহকে রক্ষা করে। যেমন–যোনিতে যে ব্যাকটেরিয়া বাস করে তা ল্যাকটিক এসিড ক্ষরণ করে p^H মাত্রা কমিয়ে দেয়। কেউ অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণ করলে এসব ব্যাকটেরিয়া মারা যেতে পারে, ফলে যোনিদেশে p^H বেড়ে যায়। এ সুযোগে সেখানে *Candida* বা অন্যান্য অণুজীবের বংশবৃদ্ধি ঘটে ক্ষতরোগের সৃষ্টি করে।

❑ ত্বক কেটে গেলে বা পুড়ে গেলে ব্যাকটেরিয়ার প্রবেশ ও অভ্যন্তরীণ টিস্যুতে সংক্রমণের আশংকা বহুগুণ বেড়ে যায়। কাটা স্থান দিয়ে নির্গত রক্ত জমাট বেঁধে শুধু যে রক্তক্ষরণ বন্ধ করে তাই না, বাইরে থেকে অণুজীব প্রবেশেও বাধা দেয়। দ্রুত ও আপদকালীন ব্যবস্থা হিসেবে এ প্রাকৃতিক চিকিৎসা অত্যন্ত কার্যকর।

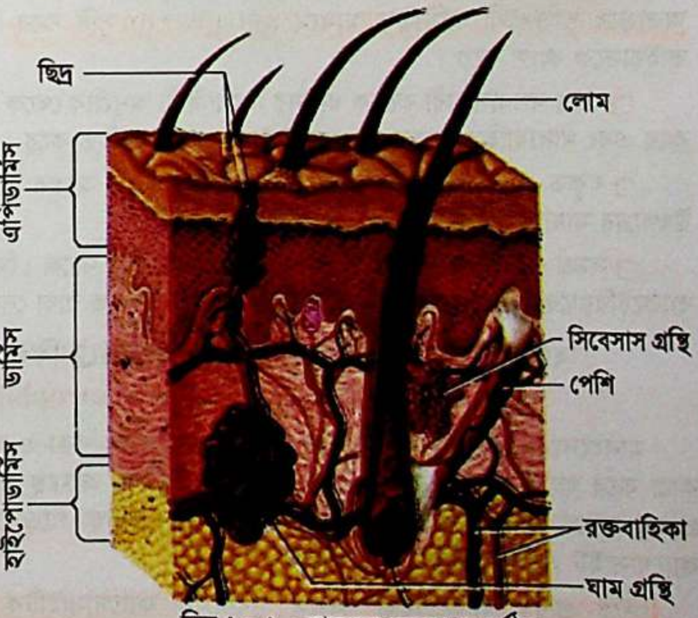

চিত্র ১০.২ : মানুষের ত্বকের অন্তর্গঠন

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

❑ দেহের সিক্ত অংশগুলো সবসময় কোনো না কোনো ব্যাকটেরীয় সংক্রমণের ঝুঁকিতে থাকে। অনেক অংশ আবার ব্যাকটেরিয়ানাশকও বহন করে, যেমন–অশ্রু, নাসিকাঝিল্লি ও লালায় **লাইসোজাইম** (lysozyme); সিমেনে **স্পার্মিন** (spermin); দুধে **ল্যাক্টোপারঅক্সিডেজ** (lactoperoxidase) ইত্যাদি।

❑ কানের ভিতরে **সিরুমিনাস** গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত **সিরুমেন** (cerumen) বা **কানের মোম** কানের গভীরে ধূলা-বালি, ব্যাকটেরিয়া ও ছোট পোকার প্রবেশ প্রতিরোধ করে। সিরুমিনাস গ্রন্থি কর্ণকুহরে এক ধরনের ত্বকীয় গ্রন্থি।

খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে পরিপাকনালির এসিড ও এনজাইমের ভূমিকা (প্রথম প্রতিরক্ষা স্তর) (Role of Digestive Acid and Enzyme in the Destruction of Bacteria in Food)

আমরা প্রতিনিয়ত অসংখ্য ধরনের ব্যাকটেরিয়া (ও ভাইরাস)-র মুখোমুখি হচ্ছি। সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হচ্ছে, খাদ্যের সঙ্গে ব্যাকটেরিয়া গ্রহণ। বাঁচার জন্যে আহার করি, কিন্তু তা যদি ব্যাকটেরিয়া যুক্ত হয় তাহলে জীবনধারণই অসাধ্য হয়ে পড়ে। কিছু ব্যাকটেরিয়া সব সময়ই খাদ্যবাহিত হয়ে দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় থাকে বলে আমরা তা টেরও পাই না।

নাসিকা-গহ্বর, গলবিল ও ট্রাকিয়ার মিউকাস ঝিল্লি যে **মিউকাস** (mucous) ক্ষরণ করে তাতে লাইসোজাইম (lysozyme) নামে এক ধরনের প্রোটিন থাকে যা ব্যাকটেরিয়ানাশক হিসেবে কাজ করে। ট্রাকিয়ার মিউকোসা শুধু মিউকাসই ক্ষরণ করে না, এর প্রাচীর সিলিয়াময়ও বটে। সিলিয়া থাকায় ধূলা-বালি বা বহিরাগত বস্তু প্রবেশে বাধা পায়, সিলিয়ায় আটকা পড়ে এবং সিলিয়ার বহির্মুখি আন্দোলনে ব্যাকটেরিয়া মিউকাস মিশ্রিত হয়ে গলবিলে এসে পড়ে। গলবিল হয়ে এসব ব্যাকটেরিয়া পাকস্থলিতে পৌঁছালে গ্যাস্ট্রিক জুসের HCl-এর ক্রিয়ায় ধ্বংস হয়ে যায়।

খাদ্যদ্রব্যের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে পরিপাকনালির এসিড ও বিভিন্ন এনজাইম নিচে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

❑ লালাগ্রন্থিতে **লাইসোজাইম** নামে এক ধরনের এনজাইম থাকে। এটি মুখ ও গলায় সংক্রমণকারী *Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus* প্রভৃতি ব্যাকটেরিয়াসহ অনেক ধরনের জীবাণু ধ্বংস করে। ব্যাকটেরিয়ার পলিস্যাকারাইড-নির্মিত কোষপ্রাচীর বিগলিত করে এদের বিনষ্ট করে।

❑ লাইসোজাইম, লালা এবং লালায় অবস্থিত সামান্য পরিমাণ হাইড্রোজেন কার্বনেট আয়ন (এটি দাঁতে এসিডের উপস্থিতিকে প্রশমিত বা নিষ্ক্রিয় করে) মিলে দাঁত ক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। লালারসের অবিরাম ক্ষরণে মুখের ভিতরে বা দাঁতে খাদ্যকণা জমতে পারে না, ফলে ব্যাকটেরিয়াও জন্মাতে পারে না।

❑ পাকস্থলি প্রাচীরের প্যারাইটাল বা অক্সিনেটিক কোষ-ক্ষরিত গ্যাস্ট্রিক জুসে বিপুল পরিমাণ HCl পাকস্থলির অভ্যন্তরে শক্তিশালী **এসিডিক মাধ্যম** (pH 1.0–2.0) সৃষ্টি করে। এসিডিক মাধ্যম খাদ্যে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাসকে ধ্বংস করে।

❑ অন্ত্রে বসবাসকারী কয়েক ধরনের মিথোজীবী অণুজীব থেকে ক্ষরিত অ্যান্টিবায়োটিক ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে এবং খাদ্যবাহিত কয়েক ধরনের ভাইরাসের বৃদ্ধি রহিত করে।

❑ যকৃত থেকে ক্ষরিত **পিত্ত** (ক্ষারীয় রস pH ৮.০) অন্ত্রের ডিওডেনামে অবস্থিত **কাইম** (chyme)-এ অ্যান্টিবডি উৎপন্নের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি প্রতিহত করে।

❑ সমগ্র পৌষ্টিকনালির অন্তঃপ্রাচীর মিউকাসে আবৃত থাকে। মিউকাসে অবস্থিত এক ধরনের রাসায়নিক রয়েছে যা ব্যাকটেরিয়াকে ঘিরে ধরে এবং প্রাচীরগাত্রে আটকে থাকতে বাধা দেয়।

ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল-এর ভূমিকা (দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর) (Role of Macrophages and Neutrophils in Destroying Bacteria)

মানবদেহের প্রতিরক্ষায় সদা ব্যস্ত বিভিন্ন শ্বেত রক্তকণিকা ও রক্তবাহিকা মিলে **দ্বিতীয় সারির প্রতিরক্ষক** হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রতিরক্ষা স্তরকে **নন-স্পেসিফিক অন্তঃস্থ প্রতিবন্ধক** বলে। প্রথম স্তর পেরিয়ে দেহের ভিতরে প্রবেশ করলে জীবাণুর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে দ্বিতীয় স্তর। এ স্তর টিস্যু, রক্তবাহিকা এবং ফ্যাগোসাইট ও লিম্ফোসাইট নিয়ে গঠিত।

দেহে প্রবিষ্ট ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে দুধরনের ফ্যাগোসাইটিক কোষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে: ১. **ম্যাক্রোফেজ** ও ২. **নিউট্রোফিল**। নিচে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে এদের ভূমিকা বর্ণনা করা হলো।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১. ম্যাক্রোফেজ (Macrophage : গ্রিক *makros* = large : *phagein* = eat, অর্থাৎ big eaters)

মনোসাইট হচ্ছে বৃক্কাকার ও দানাহীন সাইটোপ্লাজমবিশিষ্ট শ্বেত রক্তকণিকা দেহের মোট শ্বেত-রক্তকণিকার ৪ শতাংশ মনোসাইট। অস্থিমজ্জার স্টেমকোষ থেকে উৎপন্ন হয়ে এসব কোষ ১০-২০ ঘন্টা রক্তে সংবহিত হওয়ার পর কৈশিকনালির প্রাচীরের ভিতর দিয়ে টিস্যুতে অভিযাত্রী হয়ে ফুলতে শুরু করে এবং প্রায় ৫ গুণ বড় হয়ে ৬০-৮০ মাইক্রোমিটার পর্যন্ত হয়। পরিণত এ মনোসাইটকে ম্যাক্রোফেজ বলে। কিছু ম্যাক্রোফেজ সারা শরীরে পরিভ্রমণ করে, অন্যগুলো স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট টিস্যুতে (যেমন- ফুসফুস, যকৃত, বৃক্ক, যোজক টিস্যু, মস্তিষ্ক ও বিশেষ করে লসিকা গ্রন্থি ও প্লীহা) অবস্থান নেয়। প্রয়োজনে এখানে ম্যাক্রোফেজ ৪০ মাইক্রোমিটার / মিনিট গতিতে ক্ষণপদীয় চলনের সাহায্যে স্থানান্তরিত হয় এবং বেশ কয়েক মাস পর্যন্ত জীবিত থাকে।

ম্যাক্রোফেজ দেহে প্রবিষ্ট বিজাতীয় পদার্থের প্রতি ইমিউন সাড়াদানে মূল ভূমিকা পালন করে। তখন মনোসাইটগুলো টিস্যুতে অভিযাত্রী হয়ে ম্যাক্রোফেজে পরিণত হয়। ম্যাক্রোফেজের উপস্থিতি দেখেই ধারণা করা যায় যে দেহে বহিরাগতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ইমিউনতন্ত্রের মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে ম্যাক্রোফেজ নিউট্রোফিলের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ফ্যাগোসাইট হিসেবে কাজ করে। তখন একেকটি ম্যাক্রোফেজ প্রায় ১০০টির মতো ব্যাকটেরিয়া গ্রাস করতে পারে, কখনওবা সম্পূর্ণ লাল-রক্তকণিকা, ছত্রাক বা ম্যালেরিয়ার জীবাণুর মতো বড় পদার্থও গ্রাস করে। ম্যাক্রোফেজ এসব পদার্থ গ্রহণ ও পরিপাক শেষে অপাচ্য অংশ বহিষ্করণের পরও অনেক সময় জীবিত থাকে এবং আরও কয়েক মাস সক্রিয় থাকে। সাইটোকাইন (cytokine) নামক রাসায়নিক বার্তাবাহক ক্ষরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কোষকে একত্রিত করে ক্ষত নিরাময়ে ভূমিকা পালন করে।

২. নিউট্রোফিল (Neutrophils)

নিউট্রোফিল হচ্ছে ১২-১৫ মাইক্রোমিটার ব্যাসসম্পন্ন, ২-৫ খন্ডবিশিষ্ট নিউক্লিয়াসযুক্ত (খন্ডগুলো পরস্পরের সাথে সূক্ষ্ম তন্তুর সাহায্যে যুক্ত) ও সূক্ষ্ম দানাময় সাইটোপ্লাজমবিশিষ্ট শ্বেত রক্তকণিকা। দেহের মোট শ্বেত রক্তকণিকার ৬০-৭০ শতাংশই নিউট্রোফিল। এসব কণিকা ক্ষণপদীয় চলন প্রদর্শন করে (৪০ মাইক্রোমিটার/মিনিট) এবং অস্থিমজ্জার স্টেমকোষ থেকে উৎপন্ন হয়। একজন স্বাভাবিক পূর্ণবয়স্ক মানুষে দৈনিক প্রায় ১০০ বিলিয়ন (১০ হাজার কোটি) নিউট্রোফিল উৎপন্ন হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে পরিণত নিউট্রোফিলে রূপ নেয়। এগুলো ক্ষণস্থায়ী রক্তকণিকা, রক্ত প্রবাহে প্রবেশের পর ১২ ঘন্টা থেকে ৩ দিন পর্যন্ত জীবিত থাকে, তবে টিস্যুতে প্রবেশ করলে কিছুদিন বেশি বাঁচে। কণিকাগুলো যেহেতু ক্ষণজীবী তাই দেহের সুরক্ষায় কখন এসব কণিকার প্রয়োজন পড়ে সে কারণে বিপুল সংখ্যক নিউট্রোফিল অস্থিমজ্জায় সব সময় মজুদ থাকে। অস্থিমজ্জার বাইরে সংবহিত ১০০ বিলিয়ন নিউট্রোফিলের মধ্যে অর্ধেক থাকে টিস্যুতে, বাকি অর্ধেক রক্ত বাহিকায়। যেগুলো রক্তবাহিকায় থাকে তার অর্ধেক থাকে মূল ও দ্রুত রক্তস্রোতে, বাকি অর্ধেক চলে ধীরে সুস্থে রক্তবাহিকার অন্তপ্রাচীর ঘেঁষে (সংকেত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন টিস্যুতে প্রবেশ করতে পারে)।

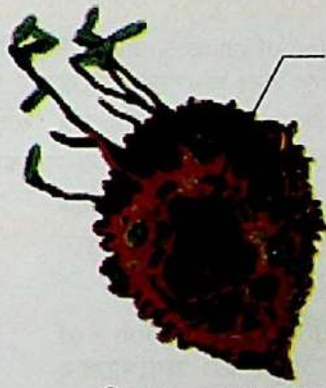

চিত্র ১০.৩ : ম্যাক্রোফেজ

চিত্র ১০.৪ : নিউট্রোফিল

নিউট্রোফিল হচ্ছে সক্রিয় ফ্যাগোসাইটিক শ্বেত রক্তকণিকা। এগুলো বহিরাগত ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস বা যে কোনো আণুবীক্ষণিক প্রোটিন কণা গ্রাস করে নেয়। কণিকার অভ্যন্তরে লাইসোজোম যে সক্রিয় প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ধারণ করে রাখে তার সাহায্যে গৃহীত বস্তু ধ্বংস করে। নিউট্রোফিলের পক্ষে ব্যাকটেরিয়ার চেয়ে বড় পদার্থকে গ্রাস করা সম্ভব হয় না। একটি নিউট্রোফিল ৩-২০ টি ব্যাকটেরিয়া গ্রাস করতে পারে। এরপর সেটি নিজেই নিষ্ক্রিয় হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ফ্যাগোসাইটোসিস

(Phagocytosis : গ্রিক *phagein* = to eat; *kytos* = cell; *oisis* = process ; কোষভক্ষণ প্রক্রিয়া)

যে প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধরনের শ্বেত রক্তকণিকা দেহরক্ষার অংশ হিসেবে ক্ষণপদ সৃষ্টি করে দেহে অনুপ্রবেশকারী জীবাণু (ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতি) বা টিস্যুর মৃতকোষ ও অন্যান্য বহিরাগত কণাকে গ্রাস ও এনজাইমের সাহায্যে ধ্বংস করে দেহকে আজীবন সুস্থ রাখতে সচেষ্ট থাকে তাকে **ফ্যাগোসাইটোসিস** বলে। ইমিউনতন্ত্রের প্রধানতম কাজ হচ্ছে সমন্বিত ও কার্যকর ফ্যাগোসাইটোসিস চালু রাখা।

ফ্যাগোসাইটোসিসের ধাপসমূহ (Steps of Phagocytosis)

সম্পূর্ণ ফ্যাগোসাইটোসিস জুড়ে এমন জৈব রাসায়নিক, জৈব পদার্থবিজ্ঞান-এর কর্মকান্ড অব্যাহত থাকে যার ফলে এ প্রক্রিয়ার সুচিন্তিত ধাপ শনাক্ত করা প্রায় অসম্ভব বলা চলে। প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনার সুবিধার জন্য ফ্যাগোসাইটোসিসকে নিচে বর্ণিত ৭টি ধাপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

১. ম্যাক্রোসাইটের সক্রিয় হওয়া (Activation of macrocytes) : জীবাণু সংক্রমণের ফলে প্রদাহস্থলে ক্ষতিগ্রস্ত রক্তকণিকা, টিস্যু বা রক্তজমাট থেকে উৎপন্ন কাইনিন, হিস্টামিন, প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিনস ইত্যাদি রাসায়নিকে উদ্দীপ্ত হয়ে ম্যাক্রোসাইটগুলো (ম্যাক্রোফেজ/নিউট্রোফিল) কৈশিকনালির প্রাচীর ভেদ করে ক্ষতস্থানে অভিযাত্রী হয়। ম্যাক্রোসাইটগুলো যখন সংক্রমণকারী ব্যাকটেরিয়ার বিভিন্ন রাসায়নিক ক্ষরণে উদ্দীপ্ত হয়ে ক্ষতস্থানে জড়ো হতে থাকে সে প্রক্রিয়াকে বলে **কেমোট্যাক্সিস** (chemotaxis)।

২. অণুজীব ভক্ষণ (Ingestion) : সক্রিয় হওয়ার পর ক্রমশঃ অণুজীবের দেহতলের সংস্পর্শে এলে ফ্যাগোসাইটে (ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল) দ্রুত যে ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তার ফলে ফ্যাগোসাইট ক্ষণপদ সৃষ্টি করে অণুজীব ভক্ষণে উদ্যত হয় এবং মাত্র ০.০১ সেকেন্ডে একটি ব্যাকটেরিয়াম ভক্ষণ সম্পন্ন করতে পারে।

৩. ফ্যাগোজোম সৃষ্টি (Formation of phagosome) : অণুজীব ভক্ষণের উদ্দেশে ফ্যাগোসাইট ক্ষণপদ বের করে ব্যাকটেরিয়াকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে এবং ক্ষণপদের মাঝে সৃষ্ট গহ্বরে আবদ্ধ করে। দুদিক থেকে আসা ক্ষণপদের অগ্রভাগ আরো এগিয়ে পরস্পর একীভূত হয়। এভাবে সৃষ্ট ঝিল্লিবেষ্টিত থলিকাটি **ফ্যাগোজোম** নামে পরিচিত। ফ্যাগোসাইটের সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত অ্যাকটিন ও অন্যান্য সংকোচনশীল তন্তু ফ্যাগোজোমের চতুর্দিক ঘিরে রাখে। এসব তন্তুর সংকোচনে ফ্যাগোসাইটের ঝিল্লি থেকে ফ্যাগোজোম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে সাইটোপ্লাজমের অভ্যন্তরে ঝিল্লিবেষ্টিত থলিকার মতো চালিত হয়।

৪. ফ্যাগোলাইসোজোম সৃষ্টি (Formation of phagolysosome): আবদ্ধ ব্যাকটেরিয়াসহ ফ্যাগোজোম সাইটোপ্লাজমের অভ্যন্তরে পরিযায়ী হয়। এ সময় সাইটোপ্লাজমে অবস্থিত গোল, ঝিল্লিবেষ্টিত ও হাইড্রোলাইটিক এনজাইমপূর্ণ দুএকটি **লাইসোজোম** নামক কোষ–অঙ্গাণু ও অন্যান্য সাইটোপ্লাজমিক দানা ফ্যাগোজোমের ঝিল্লির সঙ্গে একীভূত হয়। একীভূত লাইসোজোম থেকে ব্যাকটেরিয়ানাশক (bactericidal agents) ও পরিপাক এনজাইম (digestive enzyme) ফ্যাগোজোমে ক্ষরিত হয়। ফ্যাগোজোমটি তখন ঝিল্লিবেষ্টিত একটি **পরিপাক থলিকা** (digestive vesicle)-য় পরিণত হয়। থলিকাটিকে **ফ্যাগোলাইসোজোম বলে**।

চিত্র ১০.৫ : ফ্যাগোসাইটোসিসের ধাপসমূহ

৫. ব্যাকটেরিয়ার অন্তঃকোষীয় মারণ ও পাচন (Intracellular killing and digestion of bacteria): ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস ও পরিপাকের জন্য লাইসোজোম ফ্যাগোজোমের সঙ্গে একীভূত হয়ে দুধরনের রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। গ্রাসের কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যাকটেরিয়ার চলন, রেচন, জননসহ যাবতীয় কার্যকলাপ রুদ্ধ হয়ে যায়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য বহিরাগত প্রোটিন অণুকে হজম করার জন্য ফ্যাগোসাইটের লাইসোজোম থেকে বিপুল পরিমাণ প্রোটিওলাইটিক এনজাইম ক্ষরিত হয়। অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া পরিপাকে এসব এনজাইম যথেষ্ট। অন্যান্য বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ এনজাইম কার্যকর হয়, ব্যর্থ হলে যক্ষ্মার মতো অসুখের সৃষ্টি হতে পারে।

৬. অপাচ্য অংশসহ ব্যাকটেরিয়ার অবশেষ (Residual body containing indigestible materials): ফ্যাগোজোম ঝিল্লিবেষ্টিত পরিপাক গহ্বর হওয়ায় ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস বা হজমের কোনো পর্যায়ে ক্ষতিকর কোনো অংশ ফ্যাগোলাইসোজোমের সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করতে পারে না। তবে উপযুক্ত পুষ্টি পদার্থ উৎপন্ন হলে তা ফ্যাগোজোমের সাইটোপ্লাজমে শোষিত হয়।

৭. বর্জ্যপদার্থ নিষ্কাশন (Discharge of waste materials) : বেশি সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া গ্রাস করায় এবং তা পরিপাকের পর বর্জিত বিষাক্ত পদার্থ সঞ্চয় বা লাইসোজোমের ধ্বংসাত্মক রাসায়নিক পদার্থ সঠিকভাবে ফ্যাগোজোমে পতিত না হয়ে ফ্যাগোসাইটের সাইটোপ্লাজমে মুক্ত হওয়ায় প্রতিটি নিউট্রোফিলই মৃত্যুবরণ করে। অন্যদিকে, ম্যাক্রোফেজ উৎপন্ন বিষাক্ত ও অপাচ্য অংশ ত্যাগ করে নতুন ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসে তৎপর হয়।

সহজাত ও অর্জিত অনাক্রম্যতা (তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর) (The Innate & Acquired immunity)

মানবদেহকে রোগাক্রান্ত করতে সর্বশেষ যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় জীবাণুকে পরাস্ত করতে হয় সেটি হচ্ছে তৃতীয় প্রতিরক্ষা স্তর। এ স্তরটি দুধরনের, যেমন– সহজাত প্রতিরক্ষা (Innate or Inborn Immunity) এবং অর্জিত প্রতিরক্ষা (Acquired Immunity)। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

সহজাত প্রতিরক্ষা (Innate Immunity)

মানবদেহে যে প্রতিরক্ষা বা অনাক্রম্যতা অমরার মাধ্যমে প্রাপ্ত ও জন্মের সময় থেকে আজীবন উপস্থিত থাকে এবং প্রতিরক্ষায় দ্রুত কার্যকর হয় তাকে **সহজাত প্রতিরক্ষা** বলে। সহজাত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বংশগতির সাথে সম্পর্কযুক্ত ও প্রজাতি নির্দিষ্ট। অর্থাৎ মানব প্রজাতির সকল সদস্যের মধ্যে একই ধরনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো থাকলেও তার কার্যকারিতার মাত্রা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে ভিন্নতর হয়।

এটি নিচে বর্ণিত ধরনের হতে পারে, যেমন–

১. প্রজাতিগত প্রতিরক্ষা (Species immunity) : অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরজীবীর আক্রমণ বিশেষ প্রজাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন, ম্যালেরিয়ার পরজীবী (*Plasmodium vivax*) মানুষ ও মশকীর উপর পরজীবী।

২. গোষ্ঠীগত প্রতিরক্ষা (Racial immunity) : কোন বিশেষ পরজীবী দ্বারা মানুষের কোন কোন গোষ্ঠী আক্রান্ত হয়। অপর গোষ্ঠীভুক্ত মানুষ পরজীবীটির আক্রমণ সহজেই প্রতিরোধ করে। যেমন কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ শ্বেতাঙ্গ মানুষের চেয়ে বেশি যক্ষ্মার শিকার হতে দেখা যায়।

৩. ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষা (Individual immunity) : কোন কোন মানুষ নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য পরজীবীর সংক্রমণ প্রতিহত করতে পারে।

সহজাত প্রতিরক্ষা নিম্নোক্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

১. প্রতিবন্ধক (Barriers) : প্রতিবন্ধক টিস্যুগুলো হচ্ছে ত্বক, পৌষ্টিকনালি, শ্বসনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশ এবং নারীদের ক্ষেত্রে জননণালির প্রাচীর প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে।

২. প্রদাহ (Inflammation) : টিস্যুর কোনো ক্ষতি হলে মাস্টকোষের তৎপরতায় নানা ধরনের কণিকা বিশেষ করে নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজ জড়ো হয়ে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে ফলে যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার অবসান ঘটে।

৩. কমপ্লিমেন্ট (Complement) : অন্ততঃ ২০ ধরনের প্লাজমা প্রোটিনে গঠিত এমন একটি আন্তঃসম্পর্কিত গ্রুপ যা নিষ্ক্রিয়ভাবে রক্তে সংবহিত হয়ে বিভিন্ন প্রতিরক্ষা পদ্ধতিকে সাহায্য করে তাকে কমপ্লিমেন্ট বলে। সক্রিয় হলে অণুজীবের কোষঝিল্লিতে আটকে থেকে নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজকে কোষভক্ষণে সহযোগিতা করে, কিংবা কোষধ্বংসে অংশ গ্রহণ করে।

৪. ইন্টারফেরন (Interferon) : ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রতিক্রিয়া হিসেবে এবং কোষের অভ্যন্তরে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধিতে ব্যাঘাত ঘটাতে আক্রান্ত কোষ থেকে ইন্টারফেরন নামক বিশেষ ধরনের গ্লাইকোপ্রোটিন উৎপন্ন ও ক্ষরিত হয়ে দেহকোষকে রক্ষা করে।

৫. সহজাত মারণকোষ (Natural killer cells) : এগুলো লিম্ফোসাইট জাতীয় বিশেষ শ্বেত রক্তকণিকা যা টিউমার

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কোষ ও ভাইরাসে আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করে।

৬. **সহজীবী ব্যাকটেরিয়া** (Symbiotic bacteria) : পরিপাকতন্ত্র, ত্বক ও নারীদের জননতন্ত্রে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া স্থায়ীভাবে বাস করে। এগুলো ক্ষতিকর নয়, বরং উপকারী ব্যাকটেরিয়া (যেমন কোলনে বাসকারী ব্যাকটেরিয়া ভিটামিন B ও K সংশ্লেষ করে)। কিছু অণুজীব রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে অনুপ্রবিষ্ট জীবাণুর বৃদ্ধি রহিত করে দেয়।

অর্জিত প্রতিরক্ষা (Acquired Immunity)

মানবদেহে যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জন্মসময় থেকে নয়, বরং জন্মের পর কোনো নির্দিষ্ট জীবাণুর বিরুদ্ধে সাড়া দেওয়ায় কিংবা ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ফলে সৃষ্টি হয় তাকে **অর্জিত প্রতিরক্ষা** বলে। অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা একটি **স্পেসিফিক ইমিউনিটি** (specific immunity)। অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুরকম: (ক) **সক্রিয় প্রতিরক্ষা** এবং (খ) **অক্রিয় প্রতিরক্ষা**।

ক. সক্রিয় প্রতিরক্ষা (Active immunity)

এটি এমন ধরনের অর্জিত প্রতিরক্ষা যাতে দেহের কোষ অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এটি দুধরনের– **প্রাকৃতিক** ও **কৃত্রিম**।

i. **প্রাকৃতিক সক্রিয় প্রতিরক্ষা** (Natural Active Immunity) : এ ধরনের প্রতিরক্ষায় অনিচ্ছাকৃত জীবাণুর সংস্পর্শে আসায় সংক্রমণ ঘটে এবং জীবাণুর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরক্ষা গড়ে উঠে। যেমন-হাসপাতাল বা ক্লিনিকে সংক্রমণ। এ ধরনের প্রতিরক্ষা দীর্ঘদিন থাকে, কখনওবা আজীবন থাকে।

ii. **কৃত্রিম সক্রিয় প্রতিরক্ষা** (Artificial Active Immunity) : এ ধরনের প্রতিরক্ষায় ভ্যাক্সিনেশনের পর জীবাণুর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরক্ষা গড়ে উঠে। **যেমন-DPT ভ্যাক্সিন** ডিপথেরিয়া, টিটেনাস (ধনুস্টংকার) ও পারটাসিস (হুপিংকাশি)-এর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলে।

খ. অক্রিয় প্রতিরক্ষা (Passive immunity)

এটি এমন ধরনের অর্জিত প্রতিরক্ষা যাতে অ্যান্টিবডি এক ব্যক্তির দেহ থেকে অন্যের দেহে বা প্রাণিদেহ থেকে মানবদেহে প্রবেশ করানো হয়। এটি নিচে বর্ণিত দুধরনের।

i. **প্রাকৃতিক অক্রিয় প্রতিরক্ষা** (Natural Passive Immunity) : এ ধরনের প্রতিরক্ষায় অমরা বা কলোস্ট্রাম (শাল দুধ)-এর মাধ্যমে অ্যান্টিবডি মায়ের শরীর থেকে শিশুদেহে প্রবেশ করে। এভাবে স্থানান্তরিত অ্যান্টিবডি কয়েক সপ্তাহমাত্র টিকে থাকে। এ সময়ের মধ্যে শিশুদেহে নিজের অ্যান্টিবডি উৎপন্নের জন্য নিজস্ব প্রতিরক্ষাতন্ত্র গড়ে উঠে।

ii. **কৃত্রিম অক্রিয় প্রতিরক্ষা** (Artificial Passive Immunity) : এ ধরনের প্রতিরক্ষায় ইনজেকশনের মাধ্যমে দেহে অ্যান্টিবডি প্রবেশ করানো হয়। যেমন-রোগ ভোগের পর সেরে ওঠা ব্যক্তির সিরাম আক্রান্ত অন্য ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করিয়ে চিকিৎসা করানো। কোথাও একটি নতুন বা অত্যন্ত ক্ষতিকর রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে এবং সে মুহূর্তে সঠিক চিকিৎসার অভাবে এমন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

অর্জিত প্রতিরক্ষার ধাপসমূহ (Steps of Acquired Immunity)

কোষ–নির্ভর প্রতিরক্ষা ও অ্যান্টিবডি-নির্ভর প্রতিরক্ষায় অণুজীব বা বহিরাগত কণা (বিজাতীয় পদার্থ) ধ্বংসে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হলেও সাধারণ ধাপ উভয় ক্ষেত্রেই এক রকম। সাধারণভাবে অর্জিত প্রতিরক্ষার ধাপগুলো নিচে বর্ণিত ৭টি শিরোনামের অধীনে ব্যাখ্যা করা যায়।

১. **ভীতি** (Threat) : যখন MHC (Major Histocompatibility Complex) পরিচয়বিহীন একটি অণু বা অণুজীব (অ্যান্টিজেন) প্রথম ও দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা স্তর অতিক্রম করে দেহে প্রবেশ করে তখন থেকেই অর্জিত প্রতিরক্ষার সূত্রপাত ঘটে।

২. **সন্ধান** (Detection) : ম্যাক্রোফেজ জাতীয় ফ্যাগোসাইটিক কোষ সারাদেহে সংবহিত হয় এবং চলার পথে বহিরাগত পদার্থ বা অণুজীব পেলে গ্রাস করে। ম্যাক্রোফেজের অভ্যন্তরে ভক্ষিত পদার্থ পরিপাকের পর অতিক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়।

৩. **সতর্ক** (Alert) : দেহে একটি অ্যান্টিজেন রয়েছে তা বোঝানোর জন্যে পরিপাককৃত বহিরাগত পদার্থের কিছু

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কণা ম্যাক্রোফেজের কোষঝিল্লিতে MHC স্বচিহ্নিতকারী অংশে বাহিত হয়। ফলে ইমিউনতন্ত্রের প্রধান কোষ হেলপার T-কোষ সতর্ক হয়ে যায়। এভাবে ম্যাক্রোফেজ একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টিজেন-উপস্থাপক কোষ (antigen-presenting cell, সংক্ষেপে APC) হিসেবে কাজ করে। লসিকা গ্রন্থির B-কোষ ও ডেন্ড্রাইটিক কোষ নামক আরও দুধরনের কোষ APC হিসেবে কাজ করে। ম্যাক্রোফেজ সঠিক ধরনের রিসেপ্টরযুক্ত হেলপার T-কোষের কাছে অ্যান্টিজেনকে উপস্থাপন করে। T-কোষ সমগ্র অর্জিত প্রতিরক্ষা সাড়ার মেইন সুইচের মতো কাজ করে এবং সঠিক হেলপার T-কোষ না পাওয়া পর্যন্ত অ্যান্টিজেন নিয়ে পরিভ্রমণ করে। সঠিক T-কোষ পেলে ম্যাক্রোফেজ তার সাঙ্গে যুক্ত হয়ে রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে, ফলে T-কোষ উদ্দীপ্ত হয়।

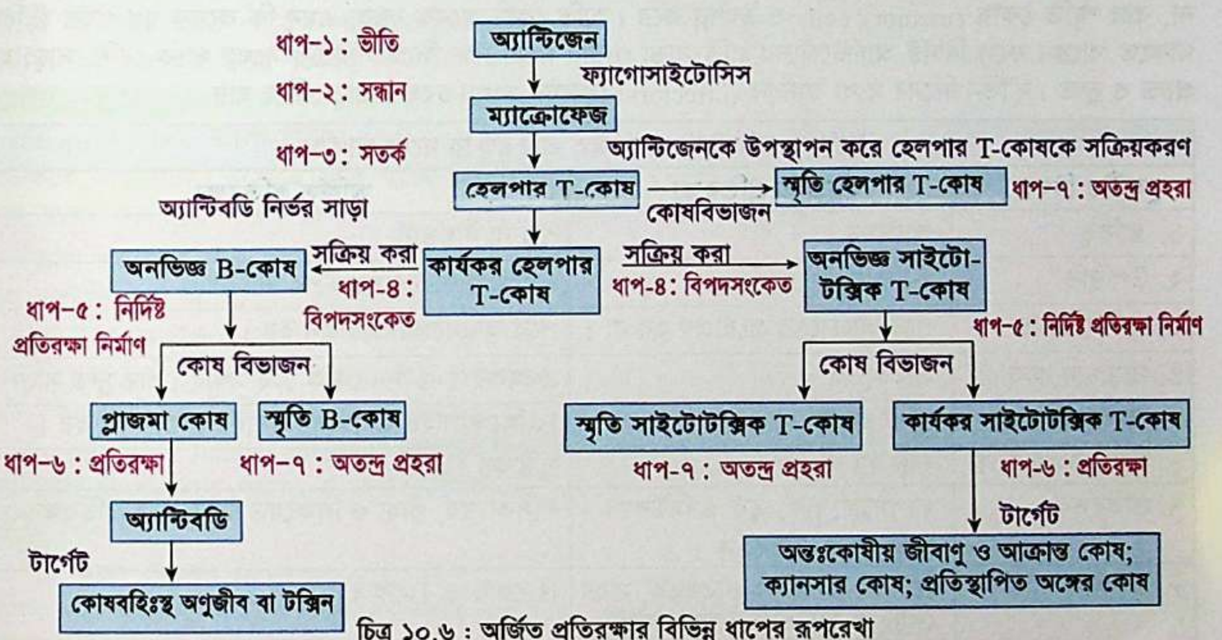

চিত্র ১০.৬ : অর্জিত প্রতিরক্ষার বিভিন্ন ধাপের রূপরেখা

৪. বিপদ সংকেত (Alarm) : কয়েক ঘন্টার মধ্যে সক্রিয় হেলপার T-কোষ তার নিজস্ব রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। সেই ক্ষরণে উদ্দীপ্ত সঠিক B-কোষ ও সাইটোটক্সিক T-কোষ নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনকে আটকাতে এগিয়ে আসে।

৫. নির্দিষ্ট প্রতিরক্ষা নির্মাণ (Building Specific Defense) : উদ্দীপ্ত সঠিক B–কোষ ও T–কোষগুলো সক্রিয় হয়ে দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাতে শুরু করে, ফলে জিনগত সদৃশ কোষগুচ্ছ গড়ে ওঠে। এর নাম **ক্লোন** (clone)। বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রত্যেক মানবদেহে ১০০ মিলিয়নেরও বেশি (১০ কোটির বেশি) লিম্ফোসাইট ক্লোন রয়েছে। ক্লোনে দুধরনের কোষ সৃষ্টি হয়। এক ধরনের কোষ নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে সক্রিয় হয়ে দেহরক্ষায় কাজ করে। এগুলোকে **কার্যকর কোষ** (effector cells) বলে। আরেক ধরনের কোষ নির্দিষ্ট ঐ অ্যান্টিজেনের স্মৃতি বহন করে ভবিষ্যতে ঐ অ্যান্টিজেন দেহে প্রবেশ করলে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এসব কোষের নাম **স্মৃতি কোষ** (memory cells)। যে প্রক্রিয়ায় এমন বিশেষায়িত ক্লোনের সৃষ্টি হয় তাকে **ক্লোনাল সিলেকসন** (clonal selection) বলে।

৬. প্রতিরক্ষা (Defense) : অর্জিত প্রতিরক্ষায় দুধরনের **প্রতিরক্ষা সাড়া** (immune response)-র মাধ্যমে মানবদেহে প্রতিরক্ষা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ও বজায় থাকে।

- **অ্যান্টিবডি-নির্ভর সাড়া** (Antibody-Mediated Response) : এ ধরনের সাড়ায় B-কোষ বিভাজিত হয়ে যে কার্যকর (effector) কোষ উৎপন্ন হয় সেগুলোকে **প্লাজমা কোষ** (plasma cell) বলে। প্লাজমা কোষ রক্তস্রোতে মুক্ত নির্দিষ্ট গড়নের অ্যান্টিজেনের বিপক্ষে প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার জন্য নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে।
- **কোষ-নির্ভর সাড়া** (Cell-Mediated Response) : সাইটোটক্সিক T–কোষ হচ্ছে কোষ নির্ভর সাড়া দানে কার্যকর T-কোষ। এসব কোষ অ্যান্টিজেনবাহী কোষগুলোকে ধ্বংস করে। যখন ২টি ঘটনা যুগপৎ সংঘটিত হয় তখন সাইটোটক্সিক T-কোষ টার্গেট কোষ ধ্বংসে সক্রিয় হয় : (ক) সাইটোটক্সিক T–কোষ যখন অ্যান্টিজেন উপস্থাপনকারী কোষের (APC, যেমন-ম্যাক্রোফেজের) সম্মুখীন হয় এবং (U) যখন একটি হেলপার T-কোষ সাইটোটক্সিক T-কোষকে সক্রিয় করতে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে। সাইটোটক্সিক T–কোষ সক্রিয় হলে বিভাজিত হয় এবং স্মৃতিকোষ ও কার্যকর সাইটোটক্সিক T– কোষ উৎপন্ন হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৭. অতন্দ্র প্রহরা (Continuous surveillance) : একটি অ্যান্টিজেন যখন প্রথমে দেহে প্রবেশ করে তখন কয়েকটিমাত্র লিম্ফোসাইট সেটাকে শনাক্ত করতে পারে। সেই লিম্ফোসাইটগুলো খুঁজে বের করে বিভাজনে উদ্দীপ্ত করে অগণিত লিম্ফোসাইট উৎপন্ন করতে হয়। এ কারণে নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে **মুখ্য সাড়া** (primary response) ধীরে সংঘটিত হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই অ্যান্টিবডির পরিমাণ বেড়ে যায় এবং অ্যান্টিজেন দেহে প্রবেশের ১ বা ২ সপ্তাহ পর চরম মাত্রায় পৌঁছায়। দেহে যদি আবারও (অনেক বছর পর বা কয়েক যুগ পর হলেও) একই অ্যান্টিজেনের অনুপ্রবেশ ঘটে তাহলে সাড়াদান ঘটে দ্রুত ও শক্তিশালী। এটি **গৌণ সাড়া** (secondary response) নামে পরিচিত। মুখ্য সাড়ায় B–কোষ ও T–কোষগুলো উদ্দীপ্ত ও বিভাজিত হয়ে কেবল অ্যান্টিজেন বিরোধী **কার্যকর কোষ** (effector cells) সৃষ্টি করে না, বরং **স্মৃতি কোষ** (memory cells)ও উৎপন্ন করে। স্মৃতি কোষ অনেক বছর, এমন কি কয়েক যুগ পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারে। ফলে নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের প্রতি সাড়া দেয়ার মতো দক্ষ লিম্ফোসাইটের সংখ্যা থাকে বেশি, সাড়া হয় প্রচন্ড ও দ্রুত। দু'তিন দিনের মধ্যে কার্যকর (effectors) কোষের সংখ্যা চরম মাত্রায় পৌঁছে যায়।

সহজাত প্রতিরক্ষা ও অর্জিত প্রতিরক্ষার মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	সহজাত প্রতিরক্ষা	অর্জিত প্রতিরক্ষা
১. স্থায়িত্ব	আজীবন।	স্বল্প বা দীর্ঘস্থায়ী।
২. উপস্থিতি	সবসময় উপস্থিত।	উপস্থিতি পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।
৩. পূর্ব অভিজ্ঞতা	পূর্বে আক্রান্তের প্রয়োজন হয় না।	পূর্বে আক্রান্তের প্রয়োজন হয়।
৪. সাড়াদান কাল	তাৎক্ষণিক	প্রথমবার ৫-৬ দিন থেকে ১-২ সপ্তাহ। পরে দ্রুত সাড়া।
৫. স্মৃতিকোষ	সৃস্টি হয় না।	B-লিম্ফোসাইট ও T-লিম্ফোসাইট থেকে সৃষ্টি হয়।
৬. অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া	সৃষ্টি হয় না।	সৃষ্টি হয়।
৭. প্রতিবন্ধক	তাপমাত্রা, pH, ত্বক ও মিউকাস ঝিল্লি হচ্ছে প্রতিবন্ধক।	লসিকা পর্ব, প্লীহা ও লিম্ফয়েড টিস্যু হচ্ছে প্রতিবন্ধক।
৮. উপাদান	ভৌত ও রাসায়নিক প্রতিবন্ধক, মারণ কোষ, প্লাজমাপ্রোটিন, ফ্যাগোসাইট, ডেনড্রাইট কোষ।	B-কোষ ও T-কোষ

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় অ্যান্টিবডির ভূমিকা
(Role of Antibody in Immune System)

দেহের প্রতিরক্ষাতন্ত্র (immune system) থেকে উৎপন্ন এক ধরনের দ্রবণীয় গ্লাইকোপ্রোটিন যা রোগ-ব্যাধি সৃষ্টিকারী নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনকে (যেমন-ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া) ধ্বংস করে তাকে **অ্যান্টিবডি** বলে। প্রত্যেকটি অ্যান্টিবডি হচ্ছে **ইমিউনোগ্লোবিউলিন** (সংক্ষেপে Ig) নামে বিশেষ ধরনের একেকটি প্রোটিন অণু।

শ্বেত রক্তকণিকার অন্যতম প্রধান কণিকা **লিম্ফোসাইট**। লিম্ফোসাইট দুধরনের : (১) **T-কোষ** ও (২) **B-কোষ**। B-লিম্ফোসাইট কয়েক উপধরনে বিভক্ত যার একটি হচ্ছে **প্লাজমা B-কোষ**, সংক্ষেপে **প্লাজমা কোষ** নামে পরিচিত। প্লাজমা কোষ থেকে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হয়। প্রয়োজনে প্রত্যেক প্লাজমা কোষ প্রতি সেকেন্ডে কয়েক হাজার অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করতে পারে। মানুষের দেহে প্রায় ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হতে পারে।

অ্যান্টিবডির গঠন (Structure of Antibody)

প্রত্যেক অ্যান্টিবডির মৌলিক গঠন এক। গাঠনিক অংশগুলো নিম্নরূপ:

১. ভারী ও হালকা শৃঙ্খল (Heavy and light chains) : প্রত্যেক অ্যান্টিবডিতে দুজোড়া পলিপেপটাইড শৃঙ্খল থাকে। এর মধ্যে সদৃশ একজোড়া লম্বা ও ভারী শৃঙ্খল এবং অন্য জোড়া সদৃশ হালকা শৃঙ্খল। ভারী ও হালকা শৃঙ্খলের আণবিক ওজন হচ্ছে যথাক্রমে ৫০–৭০ kD ও ২৩ kD (kiloDaltons)।

২. ডাইসালফাইড বন্ড (Disulfide bonds) : প্রত্যেক অ্যান্টিবডিতে অন্তত ৩টি আন্তঃশৃঙ্খল ডাইসালফাইড বন্ড রয়েছে। একটি বন্ড থাকে দুই-ভারী শৃঙ্খলের মাঝে, বাকি দুটি থাকে দুপাশে ভারী ও হালকা শৃঙ্খলের মাঝে। অ্যান্টিবডির গড়ন দেখতে Y-আকৃতির মতো। আন্তঃশৃঙ্খল ডাইসালফাইড বন্ডের সংখ্যা বিভিন্ন অ্যান্টিবডিতে বিভিন্ন হতে পারে। প্রত্যেকটি পলিপেপটাইড শৃঙ্খল আবার অন্তঃস্থভাবে অন্তশৃঙ্খল (intra-chain) ডাইসালফাইড বন্ডে যুক্ত থাকে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৩. **স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল অঞ্চল** (Constant and variable regions) : প্রত্যেক অ্যান্টিবডি দুই অঞ্চলবিশিষ্ট গঠনে নির্মিত: একটি **স্থায়ী অঞ্চল,** অন্যটি **পরিবর্তনশীল অঞ্চল**। ধরন অনুযায়ী প্রত্যেক অ্যান্টিবডির ভারী ও হালকা শৃঙ্খলে অ্যামিনো এসিড **ক্রম** (sequence) অনুযায়ী ওই দুটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ধরনের মিউনোগ্লোবিনের (যেমন-IgG-তে কিংবা IgA-তে) স্থায়ী অঞ্চলে অ্যামিনো এসিড ক্রম একই থাকে। কিন্তু পরিবর্তনশীল অংশকে অ্যান্টিজেন (জীবাণু) ধরার জন্য আকৃতির পরিবর্তন ঘটিয়ে খাপ খাওয়াতে হয় বলে ক্রমের পরিবর্তন হতে পারে। পরিবর্তনশীল অঞ্চল নির্মাণে ভারী ও হালকা উভয় শৃঙ্খলই অংশ গ্রহণ করে। অ্যান্টিজেন ধরার এ অংশটির নাম **প্যারাটপ** (paratope)। এটি **তালা-চাবি** (lock and key) পদ্ধতিতে কাজ করে। এক্ষেত্রে 'চাবি' হচ্ছে প্যারাটপ, আর 'তালা' অ্যান্টিজেন (জীবাণু)।

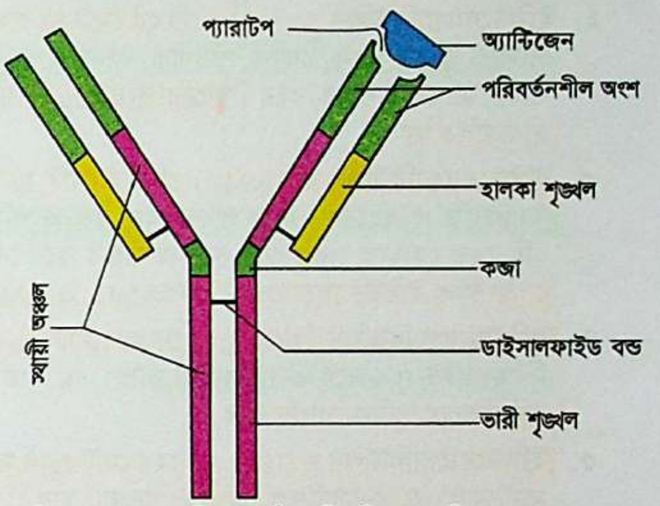

চিত্র ১০.৭ : একটি আদর্শ অ্যান্টিবডির রেখাচিত্র

ভারী শৃঙ্খলের স্থায়ী অঞ্চলে অ্যামিনো এসিডের ক্রম-এর ভিত্তিতে অ্যান্টিবডি মাত্র ৫ ধরনের হলেও পরিবর্তনশীল অঞ্চলের (ভারী ও হালকা শৃঙ্খলের) প্যারাটপে যখন জরুরী অবস্থায় বিশেষ বিশেষ জিনখন্ডের (subgene) এলোপাথাড়ি (random) সম্মিলনের ফলে পরিবর্তন ঘটে তখন কোটি কোটি ভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবডির সৃষ্টি হয়। [এ প্রক্রিয়ার নাম **VDJ রিকম্বিনেশন**। V= Variable, D = diversity, J = Joining subgene] বিজ্ঞানীদের ধারণা মানুষের দেহে প্রায় ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হতে পারে। আমাদের জীবদ্দশায় ১০ কোটি অ্যান্টিজেন দেহে প্রবেশ করবে বা করতে পারে তা অকল্পনীয়।

৪. **কব্জা অঞ্চল** (Hinge region) : অ্যান্টিবডি অণুর বাহুদুটি যে সংযোগস্থল থেকে দুভাগ হয়ে যায় তা কব্জা অঞ্চল। অংশটি অ্যান্টিবডিকে কিছুটা নমনীয়তা দান করে। বাহুদুটির দুপ্রান্তে অবস্থিত একটি করে মোট দুটি প্যারাটপে দুটি অ্যান্টিজেনকে আটক করা যায়।

অ্যান্টিবডির প্রকারভেদ (Types of Antibody)

অ্যান্টিবডির গড়নে যে ভারী শৃঙ্খল রয়েছে তাতে অ্যামিনো এসিডের ক্রমের (sequence) ভিত্তিতে ভারী শৃঙ্খল ৫ ধরনের: γ-(gamma), α (alpha), μ (mu), ϵ (epsilon) এবং δ (delta)। এ পাঁচ ধরনের ভারী শৃঙ্খলবিশিষ্ট অ্যান্টিবডিগুলো নিচেবর্ণিত ৫টি শ্রেণিতে বিভক্ত।

১. **ইমিউনোগ্লোবিউলিন G(IgG)** : দেহের মোট ইমিউনোগ্লোবিউলিনের (Ig) 75% IgG। রক্ত, লসিকা, অন্ত্র ও টিস্যু তরলে এ Ig বিস্তৃত থাকে। কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমিক সক্রিয় করে এবং অনেক বিষাক্ত পদার্থকে প্রশমিত

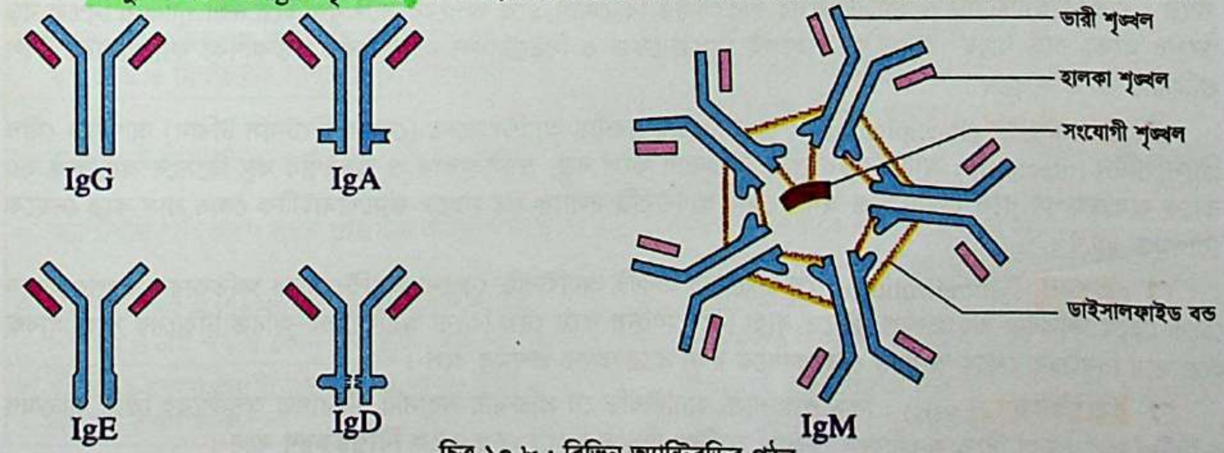

চিত্র ১০.৮ : বিভিন্ন অ্যান্টিবডির গঠন

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

করে। IgG ই একমাত্র অ্যান্টিবডি যা গর্ভাবস্থায় অমরা অতিক্রম করে মায়ের অর্জিত প্রতিরক্ষাকে ভ্রূণদেহে বাহিত করে।

২. **ইমিউনোগ্লোবিউলিন A (IgA) :** দেহের মোট Ig-র মধ্যে ১৫% হচ্ছে IgA। এ ধরনের অ্যান্টিবডি মিউকাস ঝিল্লিতে আবৃত থাকে, যেমন–পরিপাক, জনন ও শ্বসনতন্ত্রে বিস্তৃত হয় এবং সেখানে রোগ সৃষ্টিকারী অণুজীব ও অণুকণাকে প্রশমিত করে। মায়ের দুধেও IgA পাওয়া যায় এবং বুকের দুধ খাওয়ানোর সময় শিশুদেহে স্থানান্তরিত হয়।

৩. **ইমিউনোগ্লোবিউলিন M (IgM) :** দেহের মোট Ig-এর ৫-১০% IgM। ABO ব্লাড গ্রুপের রক্তকণিকার অ্যান্টিবডি এ ধরনের। IgM পাওয়া যায় রক্ত ও লসিকায়। এটি কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমকে সক্রিয় করে এবং বহিরাগত কোষকে পরস্পরের সঙ্গে আসঞ্জিত করে দেয়। অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়া ও কিছু ভাইরাসের বিরুদ্ধে স্পেসিফিক ইমিউন সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে IgG ও IgM একত্রে কাজ করে।

৪. **ইমিউনোগ্লোবিউলিন D (IgD) :** দেহের মোট Ig-র মধ্যে ১%-এরও কম হচ্ছে IgD। রক্ত, লসিকা ও লিম্ফোসাইট B-কোষে এ Ig পাওয়া যায়। এর কাজ অজ্ঞাত হলেও বিজ্ঞানিদের ধারণা, IgD B– কোষকে সক্রিয়করণে ভূমিকা পালন করে।

৫. **ইমিউনোগ্লোবিউলিন E (IgE) :** দেহের মোট Ig-র মধ্যে প্রায় ০.১% হচ্ছে IgE। এটি দুর্লভ Ig। B–কোষ, মাস্টকোষ ও বেসোফিলে এ Ig পাওয়া যায়। হিস্টামিন ক্ষরণকে উদ্দীপ্ত করে এটি প্রদাহ সাড়া (inflammatory response) সক্রিয় করে। বিভিন্ন অ্যালার্জিক সাড়া দানে (যেমন-সন্ধিবাতে) এ অ্যান্টিবডির ভূমিকা বেশ নেতিবাচক প্রমাণিত হয়েছে।

অ্যান্টিবডির কার্যপদ্ধতি

মানবদেহকে সুস্থ-সবল-সচল রাখতে বিভিন্ন শ্রেণির অ্যান্টিবডি অব্যাহতভাবে যে অনন্য গুরুদায়িত্ব পালন করে চলেছে সে সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন। কোনো অ্যান্টিজেন দেহের ১ম ও ২য় প্রতিরক্ষা স্তর অতিক্রম করে অবশেষে ৩য় স্তরে প্রবেশ করলে অ্যান্টিবডির সুসমঞ্জস্য কাজের ধারায় তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অ্যান্টিবডির কাজের পদ্ধতিকে ৩টি প্রধান শিরোনামভুক্ত করা যায়: **১. অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ, ২. কমপ্লিমেন্ট প্রোটিন সক্রিয়করণ** এবং **৩. সংক্রমণের বিস্তার প্রতিরোধ**। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আক্রমণ : রোগ সৃষ্টিকারী বহিরাগত অণুজীব বা অণুকণাকে সরাসরি আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করা অন্যতম প্রধান কার্যপদ্ধতি। নিচে বর্ণিত বিভিন্নভাবে অ্যান্টিবডি প্রত্যক্ষ আক্রমণ পরিচালনা করে।

❒ **স্তূপীকরণ বা অ্যাগ্লুটিনেশন** (Agglutination) : যে প্রক্রিয়ায় রক্ত বা লসিকায় সুনির্দিষ্ট অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে রোগ সৃষ্টিকারী বহিরাগত অণুজীব বা অণুকণা দলা পাকিয়ে নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তাকে **স্তূপীকরণ** বলে। প্রত্যেক অ্যান্টিবডি নির্দিষ্ট অ্যান্টিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। দেহে অণুজীব বা অণুকণার অনুপ্রবেশ ঘটলে সেই বহিরাগত পদার্থের গায়ে উপস্থিত অ্যান্টিজেনের প্রতি সাড়া দিয়ে অ্যান্টিবডি ক্রিয়াশীল হয়। প্রত্যেক অ্যান্টিবডিতে দুটি করে অ্যান্টিজেন-বাঁধনস্থল থাকে, অতএব একটি অ্যান্টিবডি দুটি অ্যান্টিজেনকে আটকাতে পারে। এভাবে অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেনের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দলা পাকিয়ে নিশ্চল বড় স্তূপের মতো পড়ে থাকে। ফলে খুব সহজেই ম্যাক্রোফেজ ও নিউট্রোফিল নামক শ্বেত রক্তকণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় তা গ্রাস করে।

❒ **অধঃক্ষেপন** (Precipitation) : যে প্রক্রিয়ায় দ্রবণীয় অ্যান্টিজেনের (যেমন–টিটেনাস টক্সিন) আণবিক যৌগ **প্রিসিপিটিন** (precipitin) অ্যান্টিবডির সঙ্গে বিক্রিয়ার ফলে বড়, জালিকাকার ও অদ্রবণীয় বস্তু হিসেবে অধঃক্ষিপ্ত হয় তাকে **অধঃক্ষেপণ** বলে। অধঃক্ষিপ্ত অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি দলাকে খুব সহজে ফ্যাগোসাইটিক কোষ গ্রাস করে দেহকে রোগমুক্ত রাখে।

❒ **প্রশমন** (Neutralization) : যে প্রক্রিয়ায় একটি অ্যান্টিবডি কোনো অ্যান্টিজেনের ক্ষতিকারক অংশগুলোকে ঢেকে রেখে ক্ষতিকর বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে বাধা দিয়ে নিষ্ক্রিয় করে দেয় কিংবা অ্যান্টিজেন–ক্ষরিত টক্সিনের সঙ্গে আবদ্ধ হয়ে তার বিষক্রিয়া থেকে অন্যান্য দেহকোষকে রক্ষা করে তাকে **প্রশমন** বলে।

❒ **বিশ্লিষ্টকরণ** (Lysis) : কিছু শক্তিশালী অ্যান্টিবডি যে প্রক্রিয়ায় সরাসরি বহিরাগত অণুজীবের ঝিল্লি আক্রমণ ও বিদীর্ণ করার মধ্য দিয়ে অণুজীবের দেহকে ফাটিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেয় তাকে **বিশ্লিষ্টকরণ** বলে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. কমপ্লিমেন্ট প্রোটিন সক্রিয়করণ : অন্তত ২০ ধরনের প্লাজমা প্রোটিনে গঠিত এমন একটি আন্তঃসম্পর্কিত গ্রুপ যা নিষ্ক্রিয়ভাবে রক্তে সংবহিত হয়ে বিভিন্ন প্রতিরক্ষা পদ্ধতিকে সাহায্য করে তাকে **কমপ্লিমেন্ট সিস্টেম বা কমপ্লিমেন্ট** বলে। অ্যান্টিবডির কাজের ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত। কমপ্লিমেন্ট প্রোটিন সক্রিয়করণের মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিভিন্ন উপায়ে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় থাকে।

- **অপসোনাইজেশন** (Opsonization) : দেহে অনুপ্রবিষ্ট ব্যাকটেরিয়ার গায়ে অ্যান্টিজেন–অ্যান্টিবডি কমপ্লেক্স যুক্ত হলে কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রোটিন নিউট্রোফিল ও ম্যাক্রোফেজকে প্রচণ্ডভাবে ফ্যাগোসাইটোসিসে উদ্বুদ্ধ করে তুলে। এ প্রক্রিয়াকে **অপসোনাইজেশন** বলে। এভাবে কম সময়ে শতগুণ বেশি সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া গ্রাসে ফ্যাগোসাইটগুলো ভূমিকা পালন করে।

- **বিশ্লিষ্টকরণ** (Lysis) : কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনেক ধরনের কমপ্লিমেন্টে গঠিত **লাইটিক কমপ্লেক্স** (lytic complex) নামে একটি বিশেষ গ্রুপ। এ গ্রুপভুক্ত কমপ্লিমেন্ট বহিরাগত ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য অণুজীবের কোষঝিল্লি বিদারণের মাধ্যমে অণুজীব ধ্বংসে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে।

- **স্তুপীকরণ** (Agglutination) : কমপ্লিমেন্ট থেকে উৎপন্ন পদার্থের বিক্রিয়ায় বহিরাগত অণুজীবের ঝিল্লি এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যার ফলে অণুজীবগুলো পরস্পর সংলগ্ন হয়ে নিষ্ক্রিয় নিশ্চল স্তুপের মতো পড়ে থাকে।

- **ভাইরাসের প্রশমন** (Neutralization of Viruses) : কমপ্লিমেন্ট থেকে ক্ষরিত এনজাইম ও অন্যান্য পদার্থ ভাইরাসের গঠনকে আক্রমণ করে ভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

- **কেমোট্যাক্সিস** (Chemotaxis): অণুজীবের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত রক্তকণিকা, টিস্যু, রক্তজমাট ও ব্যাকটেরিয়ার নানা রাসায়নিক ক্ষরণে উদ্দীপ্ত হয়ে ফ্যাগোসাইটগুলো সেখানে (ক্ষতস্থানে) ধাবিত হয়। এভাবে রাসায়নিক সংবেদের প্রতি সাড়া দেয়াকে **কেমোট্যাক্সিস** বলে। কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের কিছু প্রোটিন ফ্যাগোসাইটকে কেমোট্যাক্সিসের প্রতি সাড়া দিতে আকৃষ্ট করায়। গন্তব্যে পৌঁছে ফ্যাগোসাইট কমপ্লিমেন্টের সহযোগিতায় অনুপ্রবেশকারী ব্যাকটেরিয়া শনাক্ত করতে পারে।

- **মাস্টকোষ ও বেসোফিলের সক্রিয়করণ** (Activation of Mast-cells and Basophils): কমপ্লিমেন্ট সিস্টেমের কিছু প্রোটিন মাস্টকোষ ও বেসোফিলকে আশপাশের তরলে হিস্টামিন, হেপারিন ও অন্যান্য পদার্থ ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে। ফলে স্থানীয় রক্তপ্রবাহ, টিস্যুতে তরল পদার্থ ও প্লাজমা প্রোটিনের প্রবেশ এবং স্থানীয় টিস্যুর বিক্রিয়া বেড়ে যায়। এসব কারণে সৃষ্ট প্রদাহ সাড়ায় জীবাণু নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

৩. সংক্রমণের বিস্তার প্রতিরোধ : কিছু অ্যান্টিবডি, বিশেষ করে IgE প্রদাহ সাড়ার বিষয়টি ত্বরান্বিত করে। যে কোনো ক্ষতস্থানে প্রদাহের যে ৪টি মৌলিক ও ধারাবাহিক বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশিত হয় তা হচ্ছে:

(i) ক্ষতস্থানটি লাল হয়ে যায় ; (ii) জায়গাটি গরম হয়; (iii) ফুলে যায় এবং (iv) সবশেষে ব্যথার প্রকাশ ঘটায়। প্রদাহের কারণে ক্ষতস্থানে এমনভাবে পরিবর্তন ঘটে যার ফলে বহিরাগত জীবাণু আর ছড়াতে পারে না। এভাবে মাস্টকোষ ও বেসোফিলের ক্ষরণে প্রদাহ সৃষ্টি হয়ে সংক্রমণের বিস্তার রুদ্ধ করে দেয়।

অ্যান্টিবডি ও অ্যান্টিজেন এর মধ্যে পার্থক্য

অ্যান্টিবডি	অ্যান্টিজেন
১. অ্যান্টিবডি বহিরাগত ক্ষতিকর বস্তুর (অ্যান্টিজেন) উপস্থিতি ও মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট প্রতিরোধী বস্তু।	১. অ্যান্টিজেন বহিরাগত বস্তু যা প্যাথোজেন নামে পরিচিত এবং পোষকের দেহে অনুপ্রবেশ করে।
২. অ্যান্টিবডি রাসায়নিক প্রকৃতিতে কেবলমাত্র প্রোটিন।	২. অ্যান্টিজেন রাসায়নিক প্রকৃতিতে প্রোটিন, পলিস্যাকারাইড এবং গ্লাইকোপ্রোটিন। পরাগরেণু, ডিমের সাদা অংশ, রক্তকণিকা ইত্যাদিও অ্যান্টিজেন বলে বিবেচিত হয়।
৩. অ্যান্টিবডি অধিকাংশ সময় প্লাজমায় অবস্থান করে।	৩. অবস্থানগতভাবে অ্যান্টিজেন লোহিত কণিকার উপরিতলে বা অণুজীবের উপরিতলে অবস্থিত।
৪. অ্যান্টিজেনের উপস্থিতিতেই কেবল অ্যান্টিবডির সৃষ্টি হয়। এর স্বকীয় কোন উপস্থিতি নেই।	৪. অ্যান্টিজেনের সক্রিয় অবস্থান রয়েছে। এরা মূলত অণুজীব বা প্রকৃত বস্তু।
৫. জীবদেহ রক্ষায় অ্যান্টিবডি ভূমিকা পালন করে। এগুলো রক্ষণাত্মক।	৫. জীবদেহে অনাক্রম্যতা সৃষ্টিতে অ্যান্টিজেন উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এগুলো ধ্বংসাত্মক।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় টিকার ভূমিকা (Role of Vaccine in Immune System)

রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু বা জীবাণুর নির্যাস বা জীবাণু সৃষ্ট পদার্থ (টক্সিন) কিংবা সংশ্লেষিত বিকল্প পদার্থ থেকে উৎপন্ন যে বস্তু অ্যান্টিজেনের মতো আচরণ করে দেহে অ্যান্টিবডি উৎপন্নে উদ্দীপনা জোগায় এবং এক বা একাধিক রোগের বিরুদ্ধে দেহকে অনাক্রম্য করে তোলে তাকে **ভ্যাক্সিন** (vaccine) বলে। শরীরে মারাত্মক রোগের ভ্যাক্সিন দেয়া থাকলে ভবিষ্যতে ঐসব রোগ দেহকে অসুস্থ করতে পারে না। ভ্যাক্সিন প্রয়োগ **টিকা দেয়া** নামে পরিচিত।

ভ্যাক্সিনের প্রভারভেদ

উৎপাদনের ধরনের উপর ভিত্তি করে ভ্যাক্সিন নিচে বর্ণিত ৫ প্রকার :

১. **নিষ্ক্রিয়** (Inactivated) : রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকে রাসায়নিক, তাপ, বিকিরণ বা অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে নিষ্ক্রিয় জীবাণু থেকে উৎপন্ন। যেমন–ইনফ্লুয়েঞ্জা, কলেরা, পোলিও, হেপাটাইটিস A, র‍্যাবিস প্রভৃতি ভ্যাক্সিন।

২. **শক্তি হ্রাস** (Attenuated) : কালচার করা, ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্রিয় বা দুর্বল করে দেয়া জীবিত জীবাণু দিয়ে উৎপন্ন। যেমন–মিজলজ (হাম), মাম্পস, পানিবসন্ত (চিকেন পক্স), টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের ভ্যাক্সিন।

৩. **টক্সোয়ড** (Toxoid) : জীবাণুর নিষ্ক্রিয় বিষাক্ত পদার্থ থেকে উৎপন্ন। যেমন-টিটেনাস (ধনুষ্টংকার), ডিপথেরিয়া প্রভৃতির ভ্যাক্সিন।

৪. **সাবইউনিট** (Subunit) : জীবাণুগাত্রের সামান্য অংশ (নির্দিষ্ট প্রোটিনের অংশ) থেকে উৎপন্ন। যেমন–হেপাটাইটিস B ভ্যাক্সিন, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস ভ্যাক্সিন প্রভৃতি।

৫. **কনজুগেট** (Conjugate) : দুটি ভিন্ন উপাদানে গঠিত ভ্যাক্সিন [ব্যাকটেরিয়ার দেহ আবরণের অংশ+ বাহক প্রোটিন]। যেমন-হিমোফাইলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ B (Haemophilus influenzae type-b, Hib) ভ্যাক্সিন।

ভ্যাক্সিনেশন (Vaccination)

ভ্যাক্সিন প্রয়োগের মাধ্যমে অণুজীবের, বিশেষ করে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস-এর সংক্রমণ প্রতিরোধের উপায়কে **ভ্যাক্সিনেশন** বলে। প্রক্রিয়াটি সাধারণভাবে **টিকা দেয়া** (inoculation) নামে পরিচিত। নির্দিষ্ট রোগের ভ্যাক্সিন নির্দিষ্ট জীবাণু থেকেই সংগ্রহ ও উৎপন্ন করা হলেও প্রক্রিয়াগত কারণে এ পদার্থ মানবদেহে কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বা রোগ সৃষ্টির পরিবর্তে দেহকে রোগমুক্ত রাখতে, রোগ প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। রোগের চিকিৎসায় ভ্যাক্সিনের ব্যবহার পদ্ধতিকে ভ্যাক্সিনোথেরাপি (vaccinotherapy) বলে।

ড. এডওয়ার্ড জেনার (Dr. Edward Jenner) ১৭৯৬ খ্রিস্টাব্দে **সর্বপ্রথম গুটিবসন্তের** (small pox) ভ্যাক্সিন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে যুগান্তকারী 'ভ্যাক্সিন বিপ্লব' ঘটিয়ে মানুষের রোগমুক্ত দীর্ঘ সুন্দর জীবনের যে প্রত্যাশা জাগিয়েছেন তার ধারাবাহিকতায় আজ **দ্বিতীয় জেনারেশন** (Second Generation) ভ্যাক্সিন হিসেবে হেপাটাইটিস B ভ্যাক্সিন উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু AIDS ভ্যাক্সিন আজও আবিষ্কৃত হয়নি।

ভ্যাক্সিনেশনের ফলে মানবদেহ এমন সব রোগ থেকে রক্ষা পায় যা থেকে শুধু অসুখ-বিসুখই নয়, দেহ পঙ্গু হয়ে যেতে পারে, মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের ইমিউনতন্ত্রকে বাড়তি শক্তি যোগাতে ভ্যাক্সিন নিম্নোক্তভাবে সক্রিয় থাকে।

১. অধিকাংশ ভ্যাক্সিনে রোগসৃষ্টিকারী মৃত বা দুর্বল জীবাণুর সামান্য অংশ থাকে। দেহে রোগসৃষ্টি করতে পারে এমন সক্রিয় জীবাণু থাকে না। কোন কোন ভ্যাক্সিনে জীবাণু একেবারেই থাকে না।

২. জীবাণুর অংশবিশেষসহ ভ্যাক্সিন যে দেহে প্রবেশ করে অ্যান্টিবডি সৃষ্টির মাধ্যমে ওই নির্দিষ্ট জীবাণুর প্রতি দেহকে অনাক্রম্য করে তোলে। এসব অ্যান্টিবডি নির্দিষ্ট রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুকে ফাঁদে ফেলে হত্যা করে।

৩. মানবদেহে দুভাবে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হতে পারে: (ক) অসুস্থ হলে এবং (খ) ভ্যাক্সিন নিলে। জীবাণুর আক্রমণে অসুস্থ হয়ে রোগে ভুগে কষ্ট শেষে অ্যান্টিবডি উৎপাদনের চেয়ে আগেভাগেই সম্ভাব্য রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর ভ্যাক্সিন গ্রহণ করা বেশি নিরাপদ। কারণ জীবাণুর আক্রমণে দেহ অসুস্থ হলে সম্পূর্ণ নিরোগ হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কারণ দেহ বিকলাঙ্গ হতে পারে, শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কুৎসিত দাগ হতে পারে, কিংবা জীবনহানিও ঘটতে পারে। অতএব, ভ্যাক্সিনের মতো অস্ত্র থাকতে আমরা কেন দুর্ভোগ পোহাব?

৪. ভ্যাক্সিন গ্রহণের ফলে সৃষ্ট অ্যান্টিবডি দেহে দীর্ঘদিন বা আজীবন উপস্থিত থাকে। অ্যান্টিবডিগুলো জানে কিভাবে জীবাণুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হতে হয়। অতএব, ভ্যাক্সিন নেয়ার পর ভবিষ্যতে যদি আসল জীবাণু দেহে প্রবেশ করে তাহলে অ্যান্টিবডির কৌশলে দেহের প্রতিরক্ষাতন্ত্র জীবাণু ধ্বংসে সক্রিয় হবে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৫. অনেক ভ্যাক্সিন আছে যা একবার নিলে আজীবন দেহে কর্মক্ষম থাকে। মাঝে-মধ্যে **অতিরিক্ত ডোজ** (booster shot) নিতে হয়।

৬. কিছু ভ্যাক্সিন রয়েছে যা **মিশ্র ভ্যাক্সিন** নামে পরিচিত। এক্ষেত্রে কয়েকটি রোগের ভ্যাক্সিন যুক্ত করে দেহে প্রবেশ করানো হয়, যেমন-MMR (Measles, Mumps and Rubella) ভ্যাক্সিন।

৭. প্রতিটি মানবদেহ (শিশু বা বয়স্ক) নির্দিষ্ট রোগ-ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় পূর্ণ থাকে। কিন্তু সবার প্রতিরক্ষাতন্ত্র এক ও সবল নয় বলে ভ্যাক্সিনের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সবল করা হয়। শিশু বয়সে কয়েকটি রোগের ভ্যাক্সিন নেয়া থাকলে পরিবারও থাকে নিশ্চিন্ত।

ভ্যাক্সিনের গুরুত্ব / প্রয়োজনীয়তা (Importance of Vaccines)

শৈশব ও কৈশোরকালীন সময়ে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হয়। পোলিও, টাইফয়েড, ডিপথেরিয়াসহ অন্যান্য মারাত্মক জীবন ঝুঁকিপূর্ণ ও আজীবন কষ্টকর রোগ-ব্যাধির কবল থেকে নিজের বংশধরকে বাঁচাতে সবাই তৎপর থাকেন। সুস্থ পরিবার ও জাতি গড়তে সুস্থ-সবল বংশধর প্রয়োজন। এ কারণে শৈশবেই ভ্যাক্সিন দেয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সবদেশের সরকার বিবেচনা করে থাকে।

ভ্যাক্সিন সুষ্ঠুভাবে কাজ করে, এর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সামান্য। পৃথিবীতে প্রতিবছর ৩ মিলিয়ন লোকের জীবন রক্ষা হয় এবং রোগের কষ্ট থেকে ও স্থায়ী বিকলাঙ্গ হওয়া থেকে রক্ষা পায় আরও কয়েক মিলিয়ন মানুষ। ভ্যাক্সিনে প্রতিরোধযোগ্য হাম, হুপিংকাশি, পোলিও, টাইফয়েড প্রভৃতি যে সম্ভাব্য জটিলতা (হাসপাতালে ভর্তি, অঙ্গচ্ছেদ, মস্তিষ্কের ক্ষতি, পঙ্গুত্ব, মেনিনজাইটিস, বধিরতা, এমনকি মৃত্যু) সৃষ্টি করে তা থেকে মুক্তি পায়। শিশু যদি ভ্যাক্সিন না নিয়ে থাকে তাহলে রোগ ব্যাধি অন্য শিশুতে ছড়াতে পারে। এমন শিশু রোগাক্রান্ত হতে পারে যার দেহে ভ্যাক্সিন প্রয়োগ সম্ভব নয় (যেমন-লিউকেমিয়া বা অন্য কোনো ক্যান্সার আক্রান্ত, কিংবা অনাক্রম্যতন্ত্রে সমস্যা আছে এমন)। শিশুকে ভ্যাক্সিন না দিলে রোগ-ব্যাধি প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আবার সমাজে ফিরে আসবে। ভ্যাক্সিনেশনের ফলে শিশু থাকবে সুস্থ-সবল, হাসি-খুশি। অসুখে ভুগে মনমরা হয়ে ঘরে বসে থাকবে না। প্রত্যেক পিতা-মাতাই সন্তানের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। এ আশা পূরণে ভ্যাক্সিনেশন হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা।

অতএব, দুশ্চিন্তাহীন জীবন যাপনের জন্য শুধু নিজের সন্তানকেই নয়, সমাজের প্রত্যেক পিতা-মাতার কাছে ভ্যাক্সিনেশনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা প্রয়োজন।

দেহের প্রতিরক্ষায় স্মৃতিকোষের ভূমিকা (Role of Memory Cell in Immune System)

কিছু জমা রাখা এবং প্রয়োজনে তা স্মরণ করার ক্ষমতাকে **স্মৃতি** (memory) বলে। স্মৃতি সংরক্ষণ এবং যথাসময়ে পুনর্ব্যবহার দেহরক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি মানুষ প্রতিনিয়ত নানান প্রাকৃতিক আক্রমণকারীর শিকার হচ্ছে। মানবদেহ চোখের আড়ালে সে সব আক্রমণ থেকে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করছে তা আমাদের জানা দরকার। আমাদের দেহ প্রতিরক্ষায় কীভাবে, কোন লেভেলে, কোন প্রহরী ক্লান্তিহীন কাজ করে যাচ্ছে তা জানতে পারলে নিরোগ দেহের প্রয়োজনীয়তা ও দেহ নিরোগ রাখার উপায় উদ্ভাবন সহজতর হবে।

প্রতিরক্ষাতন্ত্রের প্রধান কাজ হচ্ছে অণুজীবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। যুদ্ধের সাফল্য নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর: (১) সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুপ্রবেশকারী জীবাণুর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট **প্রতিরক্ষা সাড়া** (immune response) দান করা; এবং (২) অনুপ্রবেশকারীর কথা **মনে রাখা**। দুধরনের কোষ এ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। কোষগুলো সারা দেহে সংবহিত হয়ে অনুপ্রবেশকারী জীবাণু খুঁজে বেড়ায় এবং আগের কথা মনে রেখে দ্রুত জীবাণুধ্বংসে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। জীবাণু সম্বন্ধে আগে থেকেই ধারণা থাকায় রোগ সৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হয় কিংবা প্রকাশ ঘটলেও তার মাত্রা থাকে সামান্য, অক্ষতিকর পর্যায়ের। দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় **স্মৃতিকোষ** অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো অ্যান্টিজেনকে চিহ্নিত ও মোকাবিলা করে। স্মৃতিকোষ হচ্ছে লিম্ফোসাইট নামক অদানাদার শ্বেত রক্তকণিকা। লিম্ফোসাইট দুধরনের : **T-লিম্ফোসাইট** ও **B-লিম্ফোসাইট**।

T-লিম্ফোসাইট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে এবং জীবাণুকে সরাসরি আক্রমণ করে। অন্যদিকে, B-লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি উৎপন্ন করে যা জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় বা ধ্বংস করে। এসব কোষ অস্থিমজ্জায় **স্টেমকোষ** (stem cell) থেকে সৃষ্টি হয় এবং লসিকা বাহিকার মাধ্যমে থাইমাস, লসিকাপর্ব, প্লীহা ও হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি রক্ত সংবহতন্ত্রে পৌঁছে পরিণত হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

স্মৃতিকোষের (memory T-cell, memory B-cell) প্রধান ভূমিকা হচ্ছে দেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে অনুপ্রবেশিত জীবাণুর বিরুদ্ধে দেহকে অনাক্রম্য করে তোলা। এভাবে গড়ে উঠে **অর্জিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা**। প্রথমবার কোনো জীবাণু দেহে সংক্রমণ ঘটালে দেহ তার বিরুদ্ধে সাড়া দিয়ে যেভাবে রোগমুক্ত হয় তাকে **প্রাইমারি সাড়া** (primary response) বলে। আবারও যদি ঐ জীবাণু আক্রমণ করে তখন স্মৃতিকোষগুলো প্রাইমারি সাড়ার স্মৃতিকথা মনে করে দ্রুততর সাড়া দিয়ে দেহকে রোগমুক্ত রাখে। দ্বিতীয়বারের সাড়াকে **সেকেন্ডারি সাড়া** (secondary response) বলে। সেকেন্ডারি সাড়ার কারণে আমরা প্রথম একবার ঘটে যাওয়া সংক্রমণ আর তেমন টের পাই না, কিংবা একেবারেই টের পাই না।

দ্বিতীয়বার কোনো জীবাণুর প্রবেশ ঘটলে স্মৃতি T-কোষ আর স্বাভাবিক না থেকে অতিদ্রুত বিপুল সংখ্যক ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরনের T-লিম্ফোসাইট সৃষ্টি করে জীবাণু ধ্বংসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্যদিকে, স্মৃতি B-কোষ মানবদেহের রক্তপ্রবাহে দীর্ঘদিন অতন্দ্র প্রহরীর মতো সতর্ক থাকে। এ কোষ স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে না কিন্তু সেকেন্ডারি সাড়ায় অ্যান্টিবডি ক্ষরণকারী বিপুল সংখ্যক কোষ সৃষ্টি করে দেহকে রোগমুক্ত রেখে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

প্যাথোজেন : প্যাথোজেন বলতে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুকে বুঝায়। ব্যাকটেরিয়া, ফানজাই, ভাইরাস, প্রোটোকটিস্ট ইত্যাদি প্যাথোজেনের উদাহরণ।

B-কোষ এবং T-কোষ : B-কোষ এবং T-কোষ প্রকৃতপক্ষে লিম্ফোসাইট। T-কোষ ভ্রূণের থাইমাস গ্রন্থিতে এবং B-কোষ যকৃত ও প্লীহাতে এসে পরিণতি লাভ করে। T-কোষ কোষভিত্তিক অনাক্রম্যতা এবং B-কোষ রসভিত্তিক অনাক্রম্যতার জন্য দায়ী।

অ্যান্টিজেন : যে সকল বিজাতীয় জীবাণু বা টক্সিক বস্তু দেহে প্রবেশ করলে অ্যান্টিবডি সৃষ্টি হয় তাকে অ্যান্টিজেন বলে।

অ্যান্টিবডি : অণুজীবসদৃশ অ্যান্টিজেনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধী প্রোটিন অণুর আবির্ভাব ঘটলে অথবা প্রতিবিষ/টক্সিসিটি (toxicity) বিনষ্টকারীকে অ্যান্টিবডি বলে।

সহজাত প্রতিরক্ষা : সহজাত প্রতিরক্ষা দেহের কোষ নিয়ন্ত্রিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যা বংশগতির সাথে সম্পর্কযুক্ত ও প্রজাতি নির্দিষ্ট।

অর্জিত প্রতিরক্ষা : অর্জিত প্রতিরক্ষা অ্যান্টিজেন সুনির্দিষ্ট যা দেহ প্রতিরক্ষার স্মৃতি থেকে প্রাপ্ত হয় ও দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় কার্যকর থাকে।

ইমিউনোলজি : জীববিজ্ঞানের যে শাখায় মানবদেহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা করা হয় তাকে অনাক্রম্যবিদ্যা বা ইমিউনোলজি বলে।

সাইটোকাইনস : যেসব বিশেষ ধরনের প্রোটিন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণের মাধ্যমে অনাক্রম্যতন্ত্রের কোষসমূহ একে অপরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে তাদের সাইটোকাইনস বলে।

ফ্যাগোসাইটস : দেহের কিছু কোষ বিভিন্ন অণুজীব ও ভাইরাসকে ভক্ষণের মাধ্যমে ধ্বংস করে। এদের ফ্যাগোসাইটস বলে। যে প্রক্রিয়ায় শ্বেত রক্তকণিকাসমূহ অণুজীব ভক্ষণ করে তাকে ফ্যাগোসাইটোসিস বলে।

অপসোনিন : যে অ্যান্টিবডি দ্বারা কোনো অ্যান্টিজেনকে ফ্যাগোসাইটোসিসের জন্য সংবেদনশীল করা হয় তাকে অপসোনিন বলে।

ইপিটোপ : অ্যান্টিজেনধর্মী জটিল প্রোটিনের যে অংশ অনাক্রম্যতন্ত্রের অ্যান্টিবডি বা B কোষ বা T কোষ দ্বারা শনাক্ত হয় তাকে **ইপিটোপ** বা **অ্যান্টিজেনিক ডিটারমিনেট** বলে। একটি অ্যান্টিজেনধর্মী প্রোটিনের একাধিক ইপিলোপ থাকতে পারে।

ভ্যাক্সিন : যখন কোনো অণুজীব বা অণুজীবঘটিত পদার্থ শরীরে ঢুকিয়ে অনাক্রম্যতা জাগানো হয় তখন তাকে টিকা বা ভ্যাক্সিন বলে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

লাল-সবুজে দাগানো

TEXT BOOK

প্রাণিবিজ্ঞান

উন্মেষ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১১ জিনতত্ত্ব ও বিবর্তন
Genetics & Evolution

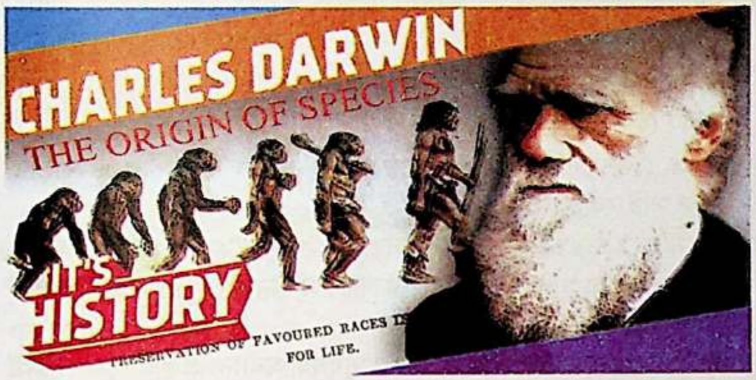

প্রধান শব্দাবলি (Key words)

▢ অসম্পূর্ণ প্রকটতা	▢ বিবর্তনের মতবাদ
▢ এপিস্ট্যাসিস	▢ পুনরাবৃত্তি মতবাদ
▢ লিথাল জিন	▢ আর্কিওপটেরিক্স

বংশবিস্তারের মাধ্যমে জীবের বংশধারা অক্ষুন্ন থাকে। পিতামাতা ও পূর্বপুরুষদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বংশপরম্পরায় সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়। জীব তার নিজের আকৃতিবিশিষ্ট ও গুণসম্পন্ন অপত্য জীবের জন্ম দেয়, তাই কুকুরের শাবক কুকুরের মতো, গরুর শাবক গরুর মতোই হয়। এক প্রজন্ম (generation) থেকে পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে জীবের বৈশিষ্ট্যাবলি সঞ্চারিত হয়। যে প্রক্রিয়ায় পিতামাতার আকার, আকৃতি, চেহারা, দেহের গঠন-প্রকৃতি, শারীরবৃত্ত, আচরণ ইত্যাদি নানাবিধ বৈশিষ্ট্য বংশানুক্রমিকভাবে তাদের সন্তান-সন্ততির দেহে সঞ্চারিত হয় তাকে **বংশগতি** (heredity) বলে।

বংশগতির ধারাবাহিক পরিক্রমার সময় বিভিন্ন কারণে জীবদেহে কিছু আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটে। কালক্রমে এ পরিবর্তনগুলো ঐ জীবের জিনগত বৈচিত্র্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হলে সৃষ্টি হয় নতুন প্রজাতি। এ জন্যে প্রয়োজন সুদীর্ঘ কালব্যাপী অতিমন্থর গতির বিবর্তন। এ অধ্যায়ে জীবের বংশগতি এবং বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পিরিয়ড সংখ্যা-১৫ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স সূত্রাবলী ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ইনহেরিট্যান্সের ক্রোমোজোম তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. মেন্ডেলের সূত্রের ব্যতিক্রমসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. সেক্স লিঙ্কড ডিসঅর্ডার এর কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. রক্তের বংশগতিজনিত সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৮. বিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. বিবর্তনের মতবাদসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ বর্ণনা করতে পারবে। ১১. প্রজাতির ধারাবাহিকতা রক্ষায় বিবর্তনের অবদান উপলব্ধি করতে পারবে।	● মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স ○ মেন্ডেলের প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্র ● ইনহেরিট্যান্স এর ক্রোমোজোম তত্ত্ব ● মেন্ডেলের সূত্রসমূহের ব্যতিক্রম ○ অসম্পূর্ণ প্রকটতা ○ সমপ্রকটতা ○ লিথাল জিন ○ পরিপূরক জিন ○ এপিস্ট্যাসিস ● পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স ● লিঙ্গ নির্ধারণ (xx-xy, xx-xo) নীতি ● সেক্স লিঙ্কড ডিসঅর্ডার ○ বর্ণান্ধতা, হিমোফিলিয়া, মাসকুলার ডিস্ট্রফি ● ABO রক্তগ্রুপ ও Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা ○ রক্ত সঞ্চালন জটিলতা ○ গর্ভধারণজনিত জটিলতা (এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস) ● বিবর্তনতত্ত্বের ধারণা ● বিবর্তনের মতবাদ ○ ল্যামার্কিজম ○ ডারউইনিজম ○ নব্য ডারউইনবাদ ● বিবর্তনের প্রমাণাদি

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১১.১ : জিনতত্ত্ব (Genetics)

জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জিনের গঠন, কাজ, বংশপরম্পরায় সঞ্চারণের ধরণ ও ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তাকে বংশগতিবিদ্যা বা জিনতত্ত্ব বা জেনেটিক্স (Genetics) বলে। উইলিয়াম বেটসন (William Bateson, 1861—1926) ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম Genetics শব্দ প্রচলন করেন। Genetics শব্দটি গ্রিক শব্দের মূল রূপ 'gen' শব্দ থেকে উদ্ভূত যার প্রকৃত অর্থ হলো পরিণতি স্বরূপ ঘটা (to become) অথবা কোনো কিছুতে উদ্ভূত হওয়া (to grow into)।

জিনতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা

মানবকল্যাণে নিয়োজিত জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর শাখা হলো জিনতত্ত্ব। জিনতত্ত্বের প্রয়োজনীয়তার বিশেষ কয়েকটি দিক নিম্নরূপ :

- জিনের প্রয়োজনীয় গাঠনিক ও পরিমাণগত (পলিপ্লয়ডি) পরিবর্তনের মাধ্যমে অধিক ফলনশীল ও বাড়তি পুষ্টিমানসম্পন্ন উৎকৃষ্ট জাতের ফসলী উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হচ্ছে।
- জিনতত্ত্বের জ্ঞানের আলোকে সংকরায়নের মাধ্যমে উন্নতজাতের গৃহপালিত পশু-পাখি উদ্ভাবন অব্যাহত আছে।
- ত্রুটিপূর্ণ জিন অপসারণ ও উপযুক্ত জিন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশের সাথে মানানসই, সুস্থ, দ্রুত বর্ধনশীল এবং রোগ প্রতিরোধক্ষম উদ্ভিদ ও প্রাণী সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে।
- বংশগতির ধারা পর্যালোচনা করে নিয়ন্ত্রিত উপায়ে সংকরায়নের মাধ্যমে মানুষসহ অন্যান্য প্রজাতির উৎকর্ষতা বাড়ানো সম্ভব।
- মানুষের বিভিন্ন রোগের (যেমন, ক্যান্সার) জেনেটিক কারণ উদঘাটন ও নিরাময় সম্পর্কে মানুষ অত্যন্ত আশাবাদী।
- অণুজীবের জেনেটিক পরিবর্তন ঘটিয়ে এগুলোর সংক্রমণ ক্ষমতা রহিত করা হচ্ছে।
- অপরাধী শনাক্তকরণে, পিতৃত্ব কিংবা মাতৃত্বের সম্পর্ক যাচাইয়ে জিনতত্ত্বের জ্ঞান প্রয়োগ করা হচ্ছে।
- শ্রেণিবিন্যাসকরণে প্রাণিদের বিভিন্ন ট্যাক্সনে স্থাপন করতে ও জ্ঞাতিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে জিনতত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পারন করে।

গ্রেগর জোহান মেন্ডেল–জিনতত্ত্বের জনক

মেন্ডেল কে ছিলেন ? জিনতত্ত্বের জনক বলে পরিচিত গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (১৮২২–১৮৮৪) অস্ট্রিয়াবাসী একজন ধর্মযাজক ছিলেন। দীর্ঘ সাত বছর বিভিন্ন মটরশুঁটি (Pea) গাছের উপর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তিনি বংশগতির দুটি "সূত্র" প্রবর্তন করেন। তাঁর সূত্রগুলোকে মেন্ডেলের সূত্র বা মেন্ডেলিজম বলে আখ্যায়িত করা হয়। মেন্ডেল প্রদত্ত তত্ত্ব বর্তমান জিনতত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

মেন্ডেলের সংক্ষিপ্ত জীবনী : কৃষকের সন্তান জোহান মেন্ডেল (Johann Mendel)-এর জন্ম ১৮২২ সালে অস্ট্রিয়ায়। তাঁর স্বপ্ন ছিল শিক্ষক ও বিজ্ঞানী হবেন। কিন্তু দারিদ্র্যের কষাঘাতে তাঁর সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ ত্যাগ করে তিনি অস্ট্রিয়ার ব্রুন (Brunn) শহরে অবস্থিত গির্জায় শিক্ষানবিশ হিসেবে যোগ দেন।

১৮৫৭ সালে মেন্ডেল ৩৪ প্রকার মটরশুঁটি (*Pisum sativum*) সংগ্রহ করে গির্জা সংলগ্ন বাগানে উদ্ভিদের বংশগতি রহস্য উদঘাটনের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। দীর্ঘ সাত বছরের কঠিন ও শ্রমসাধ্য পরীক্ষা শেষে তিনি বংশগতির দুটি সূত্র (Law) আবিষ্কার করেন। তাঁর পরীক্ষার সমস্ত কাগজপত্র ১৮৬৬ সালে ব্রুন ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি (Natural History Society of Brunn)-তে জমা দেন। আপাতদৃষ্টিতে অতি সাধারণ এ পরীক্ষার গুরুত্ব উনবিংশ শতাব্দীতে কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি। ১৮৮৪ সালের ৬ই জানুয়ারি, তাঁর সূত্রগুলো প্রতিষ্ঠা লাভের অনেক আগেই, মেন্ডেল মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর ১৬ বছর পর অর্থাৎ ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তিন ভিন্ন দেশের তিন বিজ্ঞানী পৃথকভাবে

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কিন্তু একই সময়ে মেন্ডেলের গবেষণার ফলাফল পুনরাবিষ্কার করেন। বিজ্ঞানীরা হলেন :

১. নেদারল্যান্ডসের উদ্ভিদবিজ্ঞানী **হিউগো ডে ভ্রিস** (Hugo de Vries, 1848–1935),
২. জার্মানির উদ্ভিদবিজ্ঞানের অধ্যাপক **কার্ল করেন্স** (Carl Correns, 1864–1933) এবং
৩. অস্ট্রিয়ার কৃষিবিজ্ঞানী **এরিক শের্মেক** (Erich Tschermak, 1871–1962)।

আশ্চর্যের বিষয় হলো এ বিজ্ঞানীরা তাঁদের সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষ করেই মেন্ডেলের গবেষণা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। এভাবে মেন্ডেলের গবেষণার মাধ্যমে বংশগতির মৌলিক সূত্রের আবিষ্কার ও প্রকাশের মাধ্যমে যে ভিত্তি রচিত হয় তার উপর নির্ভর করে জীববিজ্ঞানে **বংশগতিবিদ্যা** বা **জিনতত্ত্ব** নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখার বিকাশ ঘটে। এ কারণে মেন্ডেলকে **বংশগতিবিদ্যার জনক** (Father of Genetics) বলে অভিহিত করা হয়।

মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স (Mendelian Inheritance)

মেন্ডেল বিপরীত বৈশিষ্ট্য (alternative character)-যুক্ত দুধরনের মটরশুঁটি গাছ (*Pisum sativum*) নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন। এক ধরনের উদ্ভিদ ছিল **লম্বা** (tall), অন্য শ্রেণির উদ্ভিদ ছিল **খাটো** (dwarf)। পরীক্ষা শুরুর আগে তিনি মটরশুঁটি গাছের বিশুদ্ধতা পর্যবেক্ষণ করেন। এরপর শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত (হোমোজাইগাস) একটি **লম্বা** উদ্ভিদের সঙ্গে শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত একটি **খাটো** উদ্ভিদের কৃত্রিম পরাগসংযোগ ঘটান। লম্বা উদ্ভিদের **পরাগরেণু** (pollen) নিয়ে খাটো উদ্ভিদের গর্ভমুন্ডে স্থাপন করা হয়। পরাগসংযোগের ফলে উৎপন্ন বীজ থেকে যে সব উদ্ভিদ আবির্ভূত হয় তার **সবই লম্বা**। প্রথম পরাগসংযোগের ফলে সৃষ্ট উদ্ভিদগুলোকে মেন্ডেল **প্রথম বংশধর** (first filial generation) বা F_1 জনুরূপে চিহ্নিত করেন। পরে মেন্ডেল F_1 জনুর উদ্ভিদগুলোর মধ্যে সংকরায়ন (hybridization) ঘটান। দ্বিতীয়বার পরাগসংযোগের ফলে সৃষ্ট **দ্বিতীয় বংশধর** (second filial generation)-এ বা **F_2 জনুর** মোট ১০৬৪ উদ্ভিদের মধ্যে ৭৮৭টি লম্বা এবং ২৭৭টি খাটো পাওয়া গেল, অর্থাৎ লম্বা ও খাটো উদ্ভিদের অনুপাত দাঁড়ালো ৩ : ১। এভাবে মেন্ডেল মটরশুঁটি গাছের নির্বাচিত সাতজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য (প্রকট ও প্রচ্ছন্ন) নিয়ে সংকরায়ন ঘটান।

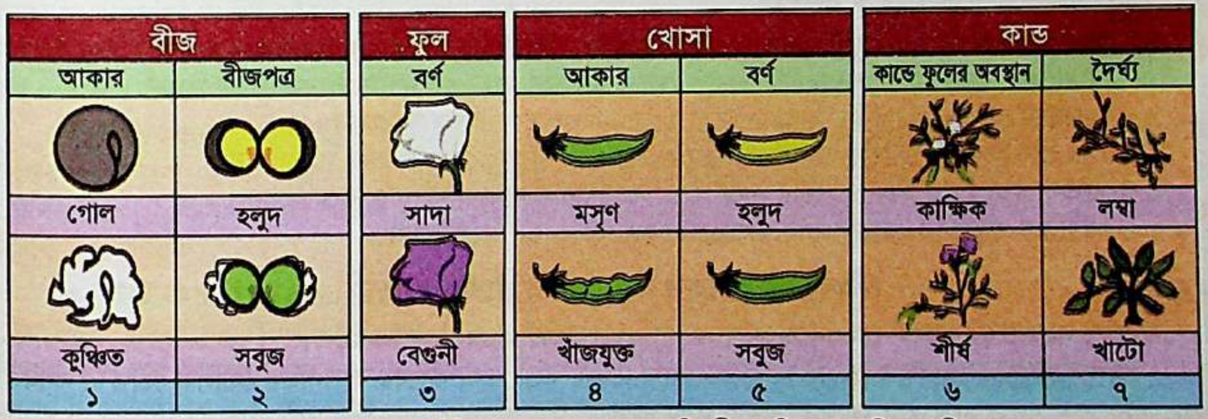

চিত্র ১১.১.২ : মেন্ডেল মটরশুঁটির উপরোক্ত ৭ জোড়া বিপরীত চরিত্রলক্ষণ নিয়ে পরীক্ষা চালান

মেন্ডেলের উপরোক্ত পরীক্ষাগুলো (প্রতিক্ষেত্রে) একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত মটরশুঁটি গাছের মধ্যেই সংঘটিত হয় এবং এ ধরনের পরীক্ষাকে **মনোহাইব্রিড ক্রস** (monohybrid cross) বা **একলক্ষণ সংকরায়ন** বলে।

পরবর্তীতে মেন্ডেল দুজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত মটরশুঁটি গাছ নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেন। একটি শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত **হলুদ-গোল বীজ** উৎপন্নকারী উদ্ভিদের সাথে অপর একটি শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত **সবুজ-কুঞ্চিত বীজ** উৎপন্নকারী উদ্ভিদের পরাগসংযোগ ঘটানোর পর দেখা গেল F_1 জনুর সবগুলো উদ্ভিদই **হলুদ-গোল বীজ** উৎপন্ন করতে সক্ষম। কিন্তু F_2 জনুতে ১৬টি বংশধরের মধ্যে ৯টি হলুদ-গোল, ৩টি হলুদ-কুঞ্চিত, ৩টি সবুজ-গোল ও ১টি সবুজ-কুঞ্চিত বীজ উৎপন্নকারী উদ্ভিদ পাওয়া গেল। মেন্ডেলের এ পরীক্ষাকে (দুজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যযুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে সংঘটিত) **ডাইহাইব্রিড ক্রস** (dihybrid cross) বা **দ্বিলক্ষণ সংকরায়ন** বলে। মেন্ডেলের উপরোল্লিখিত গবেষণা ও ফলাফল সামগ্রিকভাবে **মেন্ডেলিয়ান ইনহেরিট্যান্স** নামে পরিচিত।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

পরীক্ষার জন্য মেন্ডেলের মটরগাছ বেছে নেয়ার কারণ

বাগানের মটরগাছে (garden pea) নিম্নোক্ত কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হওয়ায় মেন্ডেল তাঁর পরীক্ষার জন্য মটর গাছকে নমুনা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন।

১. মটরগাছ **একবর্ষজীবী** হওয়ায় খুবই সহজেই বাগানের জমিতে ও টবে ফলানো যায়।

২. মটরগাছের প্রতিটি জনুর **আয়ুষ্কাল অল্প** হওয়ায় খুব কম সময়ের মধ্যেই সংকরায়ন পরীক্ষার ফল পাওয়া যায়।

৩. মটরফুল **উভলিঙ্গ** হওয়ায় সহজেই স্ব-পরাগায়ন ঘটে।

৪. মটরফুল **স্ব-পরাগী** হওয়ায় বাইরে থেকে আসা অন্য কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সহজে মিশে যেতে পারে না, ফলে বংশপরম্পরায় নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শুদ্ধ সন্তান-সন্ততি উৎপাদন সম্ভব।

৫. ফুলগুলো আকারে বড় হওয়ায় মটর গাছে খুব সহজেই পরপরাগায়নও ঘটানো সম্ভব হয়।

৬. মটরগাছে সুস্পষ্ট তুলনামূলক বংশগতি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়–এ জন্য মটর গাছের বহু প্রকরণ (varieties) উপস্থিত।

৭. সংকরায়নের ফলে সৃষ্ট বংশধরগুলো **উর্বর** (fertile) হয়; অর্থাৎ এগুলো জননক্ষম হওয়ায় নিয়মিত বংশবৃদ্ধি করতে পারে।

মেন্ডেলের সাফল্যের বা কৃতকার্য হওয়ার কারণ (Reasons behind Mendel's success)

মেন্ডেলের আগেও অনেক বিজ্ঞানী সংকরায়ন পরীক্ষা করেছিলেন। কিন্তু মেন্ডেলই প্রথম এ ধরনের পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে কতকগুলো নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। তাঁর এই সাফল্যের মূল কারণগুলো হচ্ছে–

১. তিনি মটরশুঁটি গাছ নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন, এ গাছ স্বপরাগী। ফুলের বিশেষ গঠনের জন্য বিপরীত পরাগায়নের সম্ভাবনা কম থাকায় পরীক্ষায় ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম।
২. তিনি বিভিন্ন পরীক্ষায় যে সব উদ্ভিদ ব্যবহার করেছিলেন সেগুলো খাঁটি (pure) অর্থাৎ হোমোজাইগাস ছিল।
৩. তাঁর বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রতিজোড়া জিনের একটি জিন অন্য জিনের উপর সম্পূর্ণ প্রকট (dominant) ছিল।
৪. মটরশুঁটির ডিপ্লয়েড কোষে সাতজোড়া ক্রোমোজোম আছে।
৫. মেন্ডেল যে সাতজোড়া চরিত্র নিয়ে কাজ করেছিলেন, সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন ক্রোমোজোমে অবস্থিত বলে কোন লিংকেজ সংক্রান্ত ঝামেলা ঘটেনি।
৬. কোন লিংকড চরিত্রের সম্মুখীন হলে মেন্ডেল হয়তোবা দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা দানে ব্যর্থ হতেন। কিন্তু অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় মেন্ডেলের নির্ধারিত সাত জোড়া চরিত্রের মধ্যে কোনটাই লিংকড চরিত্র ছিলনা।
৭. সংকরায়ন করার আগে তিনি বারবার উদ্ভিদগুলোর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করেছেন।
৮. কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য তিনি কয়েক বংশধরে উদ্ভিদগুলোর প্রজনন ঘটিয়েছেন।
৯. মেন্ডেল অত্যন্ত সতর্কতা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর গবেষণার ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছিলেন।
১০. গাণিতিক পদ্ধতিতে মেন্ডেল তাঁর ফলাফলের অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা করেছিলেন।

জিনতত্ত্বে ব্যবহৃত কতকগুলো শব্দের ব্যাখ্যা

জিনতত্ত্ব সহজভাবে বুঝতে হলে নিম্নোক্ত শব্দগুলো সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে।

১. **ফ্যাক্টর** (Factor) বা **জিন** (Gene) : DNA অণুর একটি খন্ডাংশ যা জীবের বংশগতির মৌলিক ভৌত ও কার্যিক একক এবং বংশ থেকে বংশান্তরে জীবের বৈশিষ্ট্য বহন করে।

২. **লোকাস** (Locus) : ক্রোমোজোমে জিনের নির্দিষ্ট স্থান-এর নাম **লোকাস**। একটি নির্দিষ্ট জিনের অ্যালিলগুলো সমসংস্থ ক্রোমোজোমের একই লোকাসে অবস্থান করে।

৩. **অ্যালিল বা অ্যালিলোমরফ** (Allele or Allelomorph) : সমসংস্থ (homologous) ক্রোমোজোম জোড়ের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থানকারী নির্দিষ্ট জিন-জোড়ার একটিকে অপরটির **অ্যালিল** বলে। অ্যালিলদুটি একই ধর্মী (যেমন—TT) অথবা একে অপরের বিপরীত ধর্মী (যেমন—Tt) হতে পারে। যখন দুটি বিপরীতধর্মী অ্যালিল থাকে তখন একটিকে **প্রকট অ্যালিল** (অর্থাৎ T), অন্যটিকে **প্রচ্ছন্ন অ্যালিল** (t) বলে।

৪. **হোমোজাইগাস** (Homozygous) : কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিলদুটি সমপ্রকৃতির হলে, তাকে **হোমোজাইগাস** বলে। যেমন-BB = কালো পশম, bb = বাদামী পশম ইত্যাদি।

৫. **হেটোরোজাইগাস** (Heterozygous) : কোনো জীবে একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী অ্যালিলদুটি অসমপ্রকৃতির হলে, তাকে **হেটোরোজাইগাস জীব** বলে। যেমন T এবং t অর্থাৎ Tt-ধারী জীবটি লম্বা হলেও তা হেটোরোজাইগাস।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৬. প্রকট বৈশিষ্ট্য (Dominant character) : একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হোমোজাইগাস জীবে (TT এবং tt) সংকরায়ন ঘটালে F_1 জনুতে সৃষ্ট হেটারোজাইগাস জীবে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, তাকে **প্রকট বৈশিষ্ট্য** বলে। যেমন- F_1 জনুর মটরগাছে লম্বা ও খাটো উভয় ধরনের লক্ষণের জন্যে একটি করে জিন থাকলেও (Tt) শুধুমাত্র লম্বা বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয়। অতএব মটরগাছে **লম্বা** বৈশিষ্ট্যটি প্রকট ।

৭. প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য (Recessive character) : হেটারোজাইগাস জীবে দুটি বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপাদান একত্রে থাকলেও একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়, অন্যটি অপ্রকাশিত থাকে। জীবের অপ্রকাশিত বৈশিষ্ট্যকে **প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য** বলে। যেমন- F_1 জনুর মটরগাছে লম্বা ও খাটো উভয় ধরনের বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি করে জিন থাকলেও (Tt) শুধুমাত্র লম্বা বৈশিষ্ট্যই প্রকাশিত হয়। অতএব মটরগাছে খাটো বৈশিষ্ট্যটি প্রচ্ছন্ন।

৮. ফিনোটাইপ (Phenotype) : জিনোটাইপ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবের বাহ্যিক লক্ষণকে **ফিনোটাইপ** বলে। এটি জীবের আকার, আকৃতি, বর্ণ প্রভৃতি প্রকাশ করে। সদৃশ ফিনোটাইপধারী দুটি জীবের জিনোটাইপ একই রকম বা ভিন্ন হতে পারে। যেমন–বিশুদ্ধ লক্ষণযুক্ত লম্বা ও খাটো মটর গাছের মধ্যে পরাগসংযোগ ঘটালে F_1 জনুতে সবগুলো উদ্ভিদই লম্বা আকৃতির হয় যদিও এদের মধ্যে দুধরনের ফ্যাক্টরই (Tt) থাকে। এখানে ফিনোটাইপ হলো **লম্বা**।

৯. জিনোটাইপ (Genotype) : কোনো জীবের লক্ষণ নিয়ন্ত্রণকারী জিন যুগলের গঠনকে **জিনোটাইপ** বলে। একটি জীবের জিনোটাইপ তার পূর্ব বা উত্তর পুরুষ থেকে জানা যায়। সদৃশ জিনোটাইপধারী জীবেরা যদি একই পরিবেশে বাস করে তাহলে ওদের ফিনোটাইপও সদৃশ হবে। একটি লম্বা গাছের জিনোটাইপ হতে পারে TT বা Tt আর খাটো গাছের জিনোটাইপ হবে tt।

১০. প্যারেন্টাল জেনারেশন ও অপত্য বংশ (Parental generation & Filial generation) : কোন ক্রসে ব্যবহৃত পিতা-মাতাকে "প্যারেন্টাল জেনারেশন" বা P_1 এবং উৎপন্ন সন্তান-সন্ততিকে প্রথম **অপত্য বংশ** বা **F_1 জনু** বলে। আবার F_1 সন্তান-সন্ততির মধ্যে ক্রস করলে উৎপন্ন সন্তান-সন্ততিকে **দ্বিতীয় অপত্য বংশ** বা **F_2 জনু** বলে।

১১. একসংকর বা মনোহাইব্রিড ক্রস (Monohybrid cross) : জীবের একজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি রেখে যে সংকরায়ন বা ক্রস ঘটানো হয়, তাকে একসংকর ক্রস বা মনোহাইব্রিড ক্রস বলে। যেমন–কালো ও বাদামী বর্ণের গিনিপিগের মধ্যে ক্রস। মনোহাইব্রিড ক্রসে ২য় বংশধরে (F_2 জনু) প্রকট ও প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যের অনুপাত সাধারণত ৩ : ১ হয়। মেন্ডেল তাঁর প্রথম সূত্রটি একসংকর ক্রসের উপর ভিত্তি করেই প্রণয়ন করেছিলেন।

১২. দ্বিসংকর বা ডাইহাইব্রিড ক্রস (Dihybrid cross) : জীবের দুজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের উপর দৃষ্টি রেখে সংকরায়ন বা ক্রস। যেমনঃ কালোবর্ণ–ছোটলোমধারী ও বাদামীবর্ণ–লম্বালোমযুক্ত গিনিপিগের ক্রস। ডাইহাইব্রিড ক্রসে ২য় বংশধরে (F_2 জনু) জিনের স্বাধীন সঞ্চারণের ফলে সাধারণত ৯ : ৩ : ৩ : ১ অনুপাতে চার ধরনের বৈশিষ্ট্যসমন্বিত সন্ততি পাওয়া যায়।

১৩. টেস্ট ক্রস (Test cross) : F_1 বা F_2 জনুর বংশধরগুলো হোমোজাইগাস না হেটারোজাইগাস তা জানার জন্য সেগুলোকে মাতৃবংশের বিশুদ্ধ প্রচ্ছন্ন লক্ষণবিশিষ্ট জীবের সাথে সংকরায়ন বা ক্রস। এভাবে এদের F_1 এবং F_2 জনুর জিনোটাইপ বের করা যায়। যেমন–সংকর লম্বা মটরগাছ (Tt) এবং বিশুদ্ধ খাটো মটরগাছ (tt) এর সংকরায়ন ঘটালে এদের ফিনোটাইপিক এবং জিনোটাইপিক অনুপাত হবে ১ : ১।

১৪. ব্যাক ক্রস (Back cross) : F_1 জনুর একটি হেটারোজাইগাস জীবের সাথে পিতৃ-মাতৃবংশীয় এক সদস্যের সঙ্গে সংকরায়ন।

১৫. জিনোম (Genome) : জীবের একটি জননকোষের ক্রোমোজোমে বিদ্যমান জিনের সমষ্টি।

মেন্ডেল-এর সূত্র (Mendel's Law)

প্রকৃতপক্ষে মেন্ডেল নিজে কোনো মতবাদ বা সূত্র প্রবর্তন করেননি। তিনি তাঁর গবেষণাপত্রে সংকরায়ন সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের তত্ত্বীয় ও পরিসংখ্যানিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে কার্ল করেন্স (যিনি ১৯০০ সালে মেন্ডেলের অনুরূপ গবেষণা–ফলাফল প্রকাশ করেছিলেন) মেন্ডেলের আবিষ্কারকে বংশগতির মৌলিক দুটি সূত্র হিসেবে উপস্থাপনের যোগ্য বলে প্রচার করেন। যেহেতু সূত্রদুটি মেন্ডেলের গবেষণার উপর ভিত্তি করে রচিত, তাই সূত্রদুটিকে **মেন্ডেল-এর সূত্র** নামে অভিহিত করা হয়। নিচে মেন্ডেল–এর সূত্র দুটি ব্যাখ্যা করা হলো।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মেন্ডেলের প্রথম সূত্র বা পৃথকীকরণ সূত্র (Law of Segregation)

সূত্র : সংকর (hybrid) জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ফ্যাক্টরগুলো (জিনগুলো) মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং গ্যামেট সৃষ্টির সময় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেটে প্রবেশ করে।

এ সূত্রকে মনোহাইব্রিড ক্রস সূত্র (Law of Monohybrid cross) বা জননকোষ শুদ্ধতার সূত্র (Law of Purity of Gamates)-ও বলা হয়।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

গিনিপিগে **কালো** বর্ণের জন্য দায়ী জিনকে B এবং **বাদামী** বর্ণের জন্য দায়ী জিনকে b প্রতীকে চিহ্নিত করলে বিশুদ্ধ (হোমোজাইগাস) কালো বর্ণের গিনিপিগের জিনোটাইপ হবে **BB** এবং বিশুদ্ধ বাদামী বর্ণের গিনিপিগের জিনোটাইপ হবে **bb**.

একটি হোমোজাইগাস বা বিশুদ্ধ **কালো** (BB) বর্ণের স্ত্রী গিনিপিগের সাথে অপর একটি বিশুদ্ধ **বাদামী** (bb) বর্ণের পুরুষ গিনিপিগের সংকরায়ন ঘটালে F_1 জনুতে সকল অপত্য গিনিপিগের বর্ণই হবে **কালো** (Bb) কারণ, কালো বর্ণের অ্যালিল (B) বাদামী বর্ণের অ্যালিল (b)-এর উপর প্রকট গুণসম্পন্ন। উভয় জিন দীর্ঘকাল একসঙ্গে থাকলেও বিনষ্ট বা একীভূত হয়ে যায় না বরং স্বকীয়তা বজায় রেখে অক্ষুন্ন থাকে।

F_2 জনুতে উৎপন্ন অপত্য গিনিপিগের মধ্যে ৩টি কালো এবং ১টি বাদামী বর্ণের গিনিপিগের সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ ফিনোটাইপের ভিত্তিতে F_2 জনুতে গিনিপিগের কালো ও বাদামী বর্ণের অনুপাত হয় যথাক্রমে **৩ : ১**।

F_2 জনুর সদস্যদের জিনোটাইপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ৩টি প্রকট বৈশিষ্ট্যধারী (কালো) গিনিপিগের মধ্যে মাত্র ১টি হোমোজাইগাস (BB), বাকি দুটি হেটারোজাইগাস (Bb)। যে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটি (বাদামী) F_1 জনুতে অবদমিত ছিল, F_2 জনুতে তার পুনরাবির্ভাব ঘটেছে (bb)। অনুরূপভাবে, যে শুদ্ধ প্রকট বৈশিষ্ট্য (BB) F_1 জনুতে অনুপস্থিত ছিল, সেটিও F_2 জনুতে ফিরে এসেছে। এ থেকেই প্রমাণ হয় যে প্রথম জনুতে B ও b একসঙ্গে থাকলেও পরস্পরের স্বকীয়তা বিনষ্ট হয়নি বরং গ্যামেট সৃষ্টির সময় পৃথক হয়ে গেছে। নিচের ছকে ফলাফল দেখানো হলো।

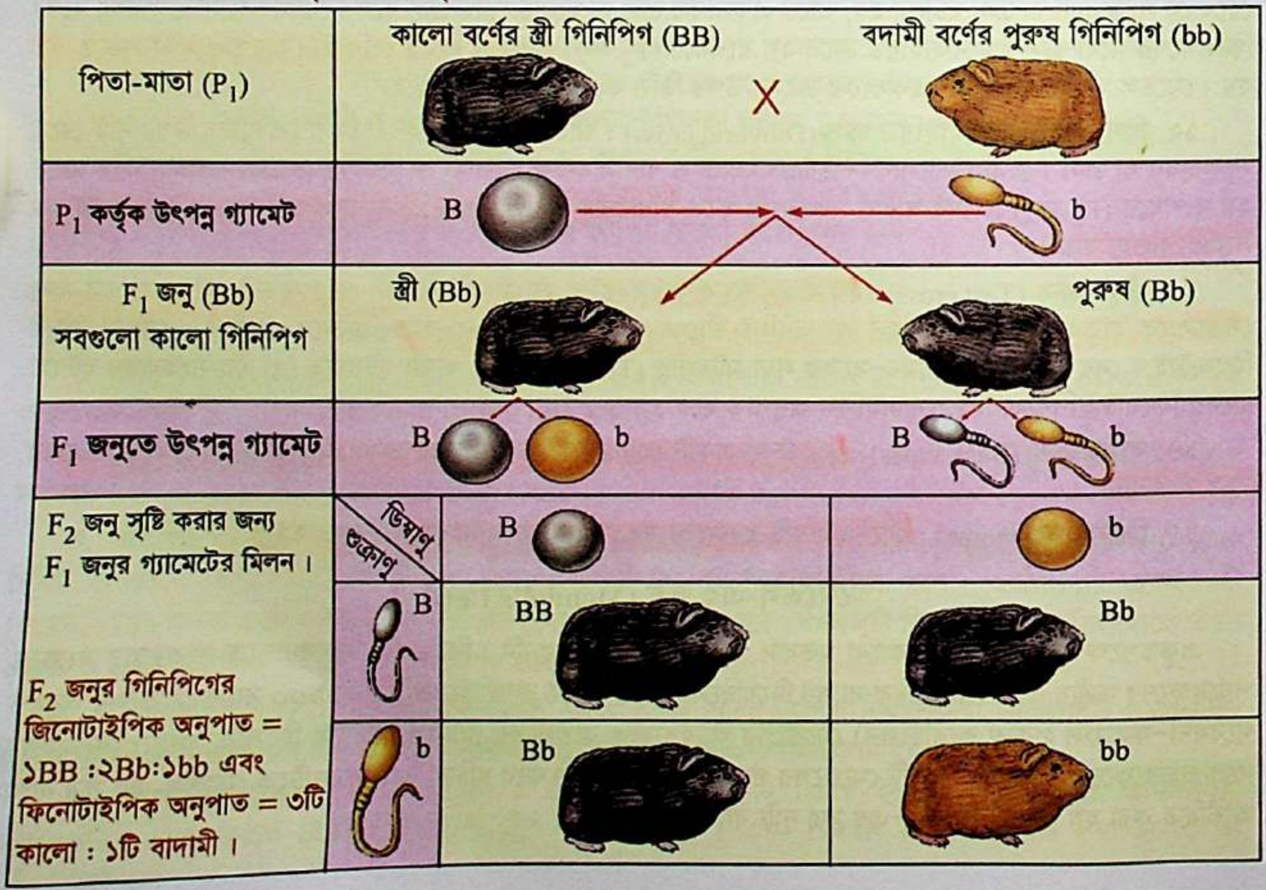

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্র বা স্বাধীনভাবে মিলনের সূত্র (Law of Independent Assortment)

সূত্র : দুই বা ততোধিক জোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবে সংকরায়ন ঘটালে প্রথম বংশধরে (F_1) কেবল প্রকট বৈশিষ্ট্যগুলোই প্রকাশিত হবে, কিন্তু গ্যামেট সৃষ্টির সময় বৈশিষ্ট্যগুলো জোড়া ভেঙ্গে পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র বা স্বাধীনভাবে বিন্যস্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেটে প্রবেশ করবে। এধরনের সংকরায়নে নতুন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবের উৎপত্তি হয়।

অন্যভাবে বলা যায়– একটি জীবের দুই বা ততোধিক জোড়া বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী ফ্যাক্টরগুলো (জিনগুলো) গ্যামেট সৃষ্টির সময় সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্তভাবে বিন্যস্ত হয়। এ ব্যাপারে এক জোড়া অন্য জোড়ার উপর নির্ভরশীল নয়।

এ সূত্র প্রমাণের জন্য মেন্ডেল দুজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মটরশুঁটি উদ্ভিদের মধ্যে পরাগসংযোগ ঘটান। দুজোড়া বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি রেখে যে সংকরায়ন (ক্রস) ঘটানো হয়, তাকে দ্বিলক্ষণ সংকরায়ন বা ডাইহাইব্রিড ক্রস (dihybrid cross) বলে।

এমন দুটি শুদ্ধ লক্ষণযুক্ত (হোমোজাইগাস) মটরশুঁটি গাছ (*Pisum sativum*) নেয়া হলো যার একটি গোল ও হলুদ বর্ণের বীজ এবং অন্যটি কুঞ্চিত ও সবুজ বর্ণের বীজ উৎপাদনে সক্ষম।

ধরা যাক, বীজের গোল লক্ষণের প্রতীক R, কুঞ্চিত লক্ষণের প্রতীক r, হলুদ লক্ষণের প্রতীক Y (বড় অক্ষরের), সবুজ লক্ষণের প্রতীক y (ছোট অক্ষরের), প্রথম বংশধর F_1 জনু এবং দ্বিতীয় বংশধর F_2 জনু।

মেন্ডেল-এর মতে, প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের জন্য দুটি করে ফ্যাক্টর (জিন) দায়ী। অতএব, গোল ও হলুদ বর্ণের বীজযুক্ত উদ্ভিদের জিনোটাইপ হবে RRYY এবং কুঞ্চিত ও সবুজ বর্ণের বীজযুক্ত উদ্ভিদের জিনোটাইপ হবে rryy.

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা–

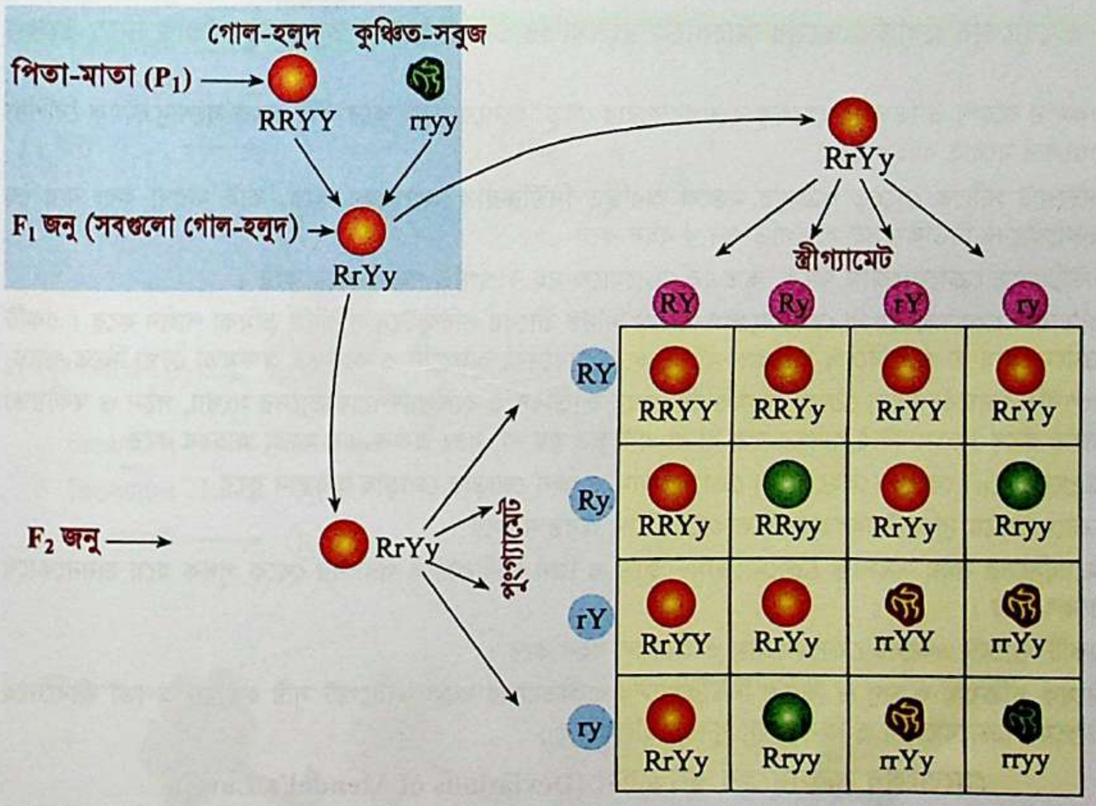

ফলাফল : গোল-হলুদ = ৯টি, গোল–সবুজ = ৩টি, কুঞ্চিত–হলুদ= ৩টি এবং কুঞ্চিত–সবুজ = ১টি

অনুপাত = ৯ : ৩ : ৩ : ১

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব (Chromosomal Theory of Inheritance)

মেন্ডেল তাঁর সংকরায়ন পরীক্ষার ফল থেকে বুঝতে পারেন যে কোনো জীবের প্রতিটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য একটি উপাদান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। এ উপাদান জীবদেহে জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে এবং হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট গঠনকালে ঐ উপাদান সংখ্যায় অর্ধেক হয়ে যায়। কিন্তু উপাদানটি কী, গ্যামেটের কোথায় এটি অবস্থিত এবং এসব উপাদান কীভাবে বংশপরম্পরায় বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এসব বিষয়ে মেন্ডেল অবগত ছিলেন না।

১৯০০ সালে মেন্ডেল তত্ত্বের পুনরাবিষ্কারের পর ক্রোমোজোম ও মেন্ডেলের উপাদানের মধ্যে বেশ কিছু মিল দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমের আকৃতি ও দৈর্ঘ্য আলাদা আলাদা এবং দেহকোষে জোড়ায় জোড়ায় থাকে। জোড়ার একটি পিতার কাছ থেকে, অপরটি মায়ের কাছ থেকে পাওয়া। অর্থাৎ মানুষের দেহকোষের ৪৬টি ক্রোমোজোমের ২৩টি আসে পিতার কাছ থেকে, বাকি ২৩টি মায়ের কাছ থেকে। ২৩টি করে ক্রোমোজোম শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যে থাকে, দুটি কোষের মিলনে ৪৬টি ক্রোমোজোম নিয়ে **জাইগোট** কোষের সৃষ্টি হয়। মেন্ডেল একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একজোড়া উপাদানের কথা বলেছিলেন, যার একটি পিতা ও একটি মাতার কাছ থেকে আসে, যেমনটি ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রেও ঘটে থাকে।

১৯০২ সালে আমেরিকান জিনতত্ত্ববিদ **সাটন** (W. S. Sutton, 1877-1916) ও জার্মান জীববিজ্ঞানী **বোভেরি** (Theodor Boveri, 1862-1915) পৃথকভাবে ক্রোমোজোম ও মেন্ডেলের উপাদানের মধ্যে মিলের কথাটি সুস্পষ্ট উল্লেখ করেন। এ নিয়ে প্রায় এক যুগ ধরে বিভিন্ন জীবজন্তুর উপর গবেষণা চলেছে। পরে জানা গেল যে মেন্ডেলের উপাদান বা জিনের অবস্থান ক্রোমোজোমে, তাই বংশানুক্রমিক গতিপ্রকৃতির বিষয়ে ক্রোমোজোম আর উপাদানের মধ্যে এত সাদৃশ্য। গবেষণার ফলাফল থেকে তাঁরা সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জিন ও ক্রোমোজোম অনেক দিক দিয়ে একই রকম আচরণ করে। তা ছাড়া বংশগতি নির্ধারণের সময় জিন ও ক্রোমোজোম সমান্তরাল আচরণ প্রদর্শন করে। একেই **বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্ব** বলা হয়।

সাটন ও বোভেরি প্রবর্তিত তত্ত্বের আলোকে বংশগতির ক্রোমোজোম তত্ত্বের মূল ভিত্তি নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. একমাত্র শুক্রাণু ও ডিম্বাণুই যেহেতু বংশপরম্পরার সেতু হিসেবে কাজ করে তাই সমস্ত বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্য এগুলোর মধ্যেই বাহিত হয়।

২. জাইগোট সৃষ্টিতে যেহেতু শুক্রাণুর মস্তকে অবস্থিত **নিউক্লিয়াস** অংশগ্রহণ করে, তাই ধারণা করা যায় যে জননকোষের নিউক্লিয়াসই বংশগতি পদার্থ বহন করে।

৩. নিউক্লিয়াসে **ক্রোমোজোম** থাকে, অতএব ক্রোমোজোমই বংশগতি পদার্থ বহন করে।

৪. প্রত্যেকটি ক্রোমোজোম বা ক্রোমোজোম-জোড় নির্দিষ্ট জীবের পরিস্ফুটনে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। একটি ক্রোমোজোম বা অংশবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হলে জীবদেহে অঙ্গহানি ও কার্যগত অক্ষমতা দেখা দিতে পারে।

৫. বংশগতি পদার্থের মতো ক্রোমোজোমও জীবদেহে আজীবন ও বংশপরম্পরায় তাদের সংখ্যা, গঠন ও স্বকীয়তা বজায় রাখে। কোনোটাই হারিয়ে যায় না বা একীভূত হয় না, বরং একক-এর মতো আচরণ করে।

৬ ডিপ্লয়েড (2n) কোষে (দেহকোষে) ক্রোমোজোম ও জিন জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে।

৭. ক্রোমোজোমে সুনির্দিষ্ট অবস্থানে (লোকাসে) জিন অবস্থান করে।

৮. মিয়োসিসের সময় সমসংস্থ ক্রোমোজোম-জোড় ও জিন স্বাধীনভাবে পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে জননকোষে প্রবেশ করে।

৯. একটি গ্যামেট একসেট ক্রোমোজোম ও অ্যালিল বহন করে।

১০. নিষেক প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসের একীভবনের ফলে জাইগোট সৃষ্টি হওয়ায় অপত্য জীবদেহে ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম ও জিনসংখ্যা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মেন্ডেলের সূত্রসমূহের ব্যতিক্রম (Deviations of Mendel's Laws)

মেন্ডেলের বংশগতি সম্বন্ধীয় সূত্র আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন জীবে ঐ একই ধরনের পরীক্ষা করে দেখেন যে প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে মেন্ডেলের পরীক্ষার ফলাফলের অনেক ক্ষেত্রে মিল নেই। এসব ফলাফল মেন্ডেলের পৃথকীকরণ ও স্বাধীনভাবে মিলন সূত্রের সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। নিচে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ব্যতিক্রমের বর্ণনা দেয়া হলো।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

প্রথম সূত্রের ব্যতিক্রম

১. অসম্পূর্ণ প্রকটতা (Incomplete Dominance) – ফলাফল ১ : ২ : ১

যখন একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটি জীবে সংকরায়ন (ক্রস) ঘটে কিন্তু প্রথম বংশধরে (F_1 জনুতে) প্রকট ফিনোটাইপ পূর্ণ প্রকাশে ব্যর্থ হয় এবং উভয় বৈশিষ্ট্যের মাঝামাঝি এক বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে তখন তাকে **অসম্পূর্ণ প্রকটতা** বলে। অসম্পূর্ণ প্রকটতার জন্য দায়ী জিনগুলোকে **ইন্টারমিডিয়েট জিন** (intermediate gene) বলে। অসম্পূর্ণ প্রকটতার কারণে মেন্ডেলের মনোহাইব্রিড ক্রসের অনুপাত ৩ : ১ এর পরিবর্তে ১ : ২ : ১ হয়।

উদাহরণ : সন্ধ্যামালতী (*Mirabilis jalapa*)-র **লাল ফুল**বিশিষ্ট উদ্ভিদ এবং **সাদা ফুল**বিশিষ্ট উদ্ভিদের সংকরায়ন ঘটালে প্রথম বংশধরে গোলাপী (pink) বর্ণের ফুল পাওয়া যায়। প্রথম বংশধরের উদ্ভিদের মধ্যে সংকরায়নের ফলে উৎপন্ন দ্বিতীয় বংশধরে লাল, গোলাপী ও সাদা ফুলের অনুপাত দাঁড়ায় ১ : ২ : ১।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা–

ধরা যাক– ফুলের লাল বর্ণের প্রতীক = R, সাদা বর্ণের প্রতীক = W

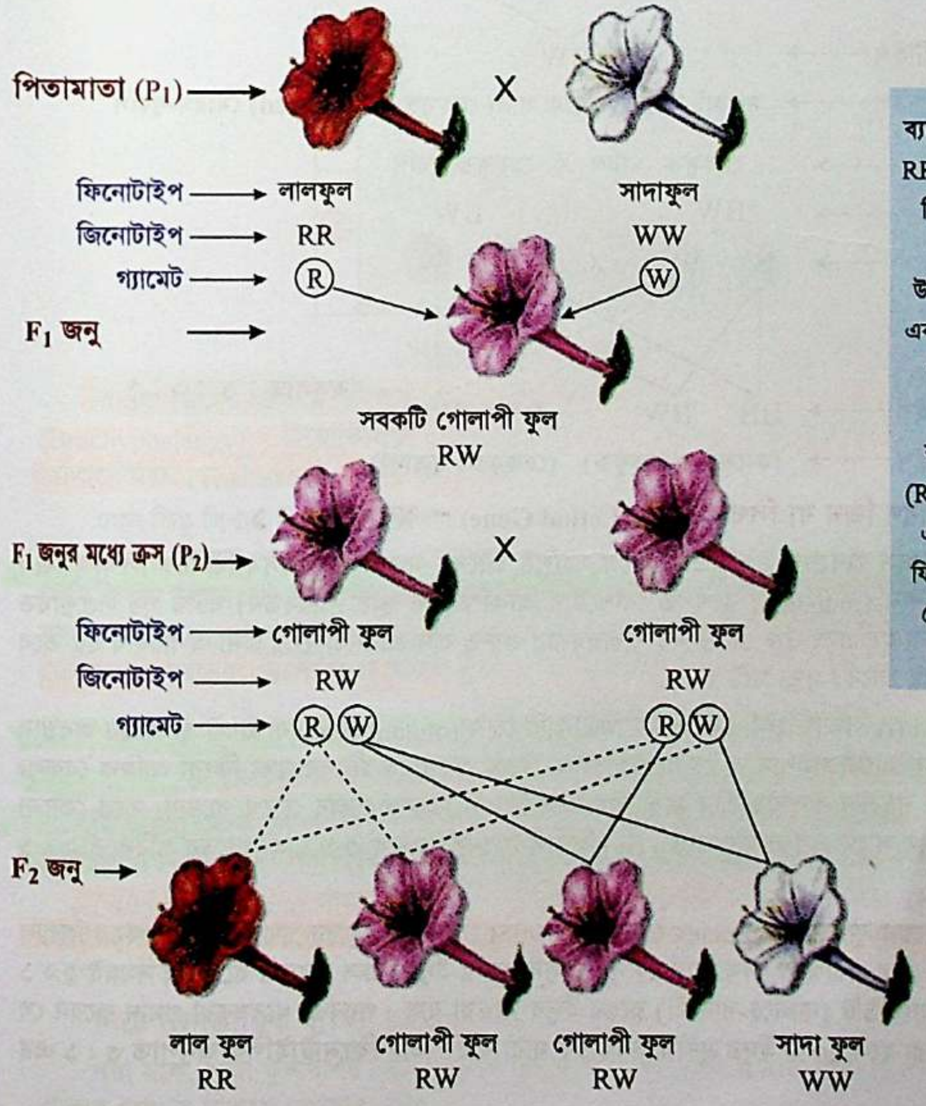

ব্যাখ্যা : এখানে লাল ফুলের জন্য RR এবং সাদা ফুলের জন্য WW জিন দেখানো হয়েছে। R-এর সম্পূর্ণ প্রকটতা থাকলে F_1 উদ্ভিদের ফুল লাল রং-এর হতো এবং F_2 বংশধরের ফিনোটাইপিক অনুপাত হতো ৩ : ১। কিন্তু R-এর অসম্পূর্ণ প্রকটতার কারণেই F_1 হেটারোজাইগাস (RW)- এর বর্ণ গোলাপী (Pink) এবং F_2 বংশধরে ১ : ২ : ১ ফিনোটাইপিক অনুপাতের (লাল, গোলাপী, সাদা) সৃষ্টি হয়েছে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. সমপ্রকটতা (Co-dominance) – ফলাফল ১ : ২ : ১

সমসংস্থ ক্রোমোজোমের একই লোকাসে অবস্থিত বিপরীত বৈশিষ্ট্যের দুটি অ্যালিল হেটারোজাইগাস অবস্থায় যখন প্রকট-প্রচ্ছন্ন সম্পর্কের পরিবর্তে উভয়েই সমানভাবে প্রকাশিত হয়, তখন জিনের এ ধরনের স্বভাবকে **সমপ্রকটতা** বলে। অন্যভাবে বলা যায়, সংকর জীবে যখন দুটি বিপরীতধর্মী জিনের দুটি বৈশিষ্ট্যই সমানভাবে প্রকাশিত হয় তখন তাকে সমপ্রকটতা বলে। এতে মেন্ডেলিয়ান ৩ : ১ অনুপাতটি পরিবর্তিত হয়ে ১: ২ : ১ রূপে প্রকাশ পায়।

কালো ও সাদা বর্ণের আন্দালুসিয়ান মোরগ-মুরগির মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে সমপ্রকটতা লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে **কালো পালক** (BB) এবং **সাদা পালক** (WW)-এর মোরগ-মুরগিতে ক্রস ঘটানো হলে F_1 জনুর সকল মোরগ-মুরগিই কালো বা সাদা না হয়ে সমপ্রকটতার কারণে **কালোর মাঝে সাদা চেকযুক্ত** (BW) হয়।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা–

পিতা–মাতা (P_1) : ⟶ কালো বর্ণের মোরগ X সাদা বর্ণের মুরগি

জিনোটাইপ ⟶ BB WW

গ্যামেট ⟶ (B) (W)

F_1 জনু : জিনোটাইপ ⟶ BW

ফিনোটাইপ ⟶ সবকটি কালোর মাঝে সাদা চেকযুক্ত (checkered) মোরগ-মুরগি

পিতা–মাতা (P_2) : ⟶ চেকযুক্ত মোরগ X চেকযুক্ত মুরগি

জিনোটাইপ ⟶ BW BW

গ্যামেট ⟶ (B) (W) X (B) (W)

F_2 জনু : জিনোটাইপ ⟶ BB BW BW WW

ফিনোটাইপ ⟶ (কালো) (চেকযুক্ত) (চেকযুক্ত) (সাদা)

অনুপাত : ১ : ২ : ১

৩. মারণ জিন বা লিথাল জিন (Lethal Gene) – অনুপাত ২ : ১

যেসব জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় উপস্থিত থাকলে সংশ্লিষ্ট জীবের মৃত্যু ঘটে সেসব জিনকে লিথাল জিন বলে। কোনো জিনের **মিউটেশন** (mutation; বংশগত বৈশিষ্ট্যের আকস্মিক ও স্থায়ী পরিবর্তন) ঘটার পর সংশ্লেষিত প্রোটিন (এনজাইম) যদি নিষ্ক্রিয় হয় এবং উক্ত প্রোটিনের শারীরবৃত্তীয় গুরুত্ব যদি জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য হয় তবে হোমোজাইগাস অবস্থায় সংশ্লিষ্ট জীবের মৃত্যু ঘটে।

লিথাল জিনের বৈশিষ্ট্য : (i) লিথাল জিন একধরনের **মিউট্যান্ট জিন** (mutant gene) যা প্রকট বা প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। (ii) প্রকট লিথাল জিন হোমোজাইগাস বা হেটারোজাইগাস উভয় অবস্থায়ই জীবের মৃত্যু কিংবা আঙ্গিক বৈকল্য ঘটাতে পারে। (iii) জাইগোট বা ভ্রূণ অবস্থায় জীব মারা যায় বলে লিথান জিনের প্রভাব চোখে পড়েনা, তবে কোনো ক্ষেত্রে জীবের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এর প্রকাশ ঘটে। (iv) লিথাল জিনের প্রভাবে ৩ : ১ অনুপাতের পরিবর্তে ২ : ১ অনুপাত প্রকাশিত হয়।

ফরাসী জিনতত্ত্ববিদ **লুসিয়েন ক্যুয়েনো** (Lucien Cuetnot, 1905) সর্বপ্রথম ইঁদুরের গায়ের বর্ণের ক্ষেত্রে লিথাল জিনের উপস্থিতি লক্ষ করেন। তাঁর পরীক্ষায় দেখা যায় যে দুটি **হলুদ** বর্ণের ইঁদুরে ক্রস করানো হলে সব সময়ই ২ : ১ অনুপাতে যথাক্রমে হলুদ ও অ্যাগাউটি (কালচে-বাদামী) রঙের ইঁদুর পাওয়া যায়। পরবর্তী গবেষকরা প্রমাণ করেন যে দুটি হলুদ বর্ণের ইঁদুরে ক্রস করা হলে ২৫% ইঁদুর ভ্রূণীয় অবস্থায়ই মারা যায়। তাই **ফিনোটাইপিক অনুপাত ৩ : ১** এর পরিবর্তে **২ : ১** হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা–

ধরা যাক, ইঁদুরের গায়ের **হলুদ** বর্ণের লোমের জন্য দায়ী প্রকট জিন **Y** এবং অ্যাগাউটি বর্ণের লোমের জন্য দায়ী প্রচ্ছন্ন জিন y.

মেন্ডেলের সূত্র অনুযায়ী বিশুদ্ধ বা হোমোজাইগাস হলুদ বর্ণের ইঁদুরের জিনোটাইপ হবে YY এবং বিশুদ্ধ অ্যাগাউটি বর্ণের ইঁদুরের জিনোটাইপ হবে yy. কিন্তু প্রকৃতিতে যে সব হলুদ বর্ণের ইঁদুর পাওয়া যায় তার কোনটিই বিশুদ্ধ বা হোমোজাইগাস (YY) জিনোটাইপধারী নয়। কারণ Y জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় লিথাল জিন হিসেবে কাজ করে ভ্রূণ অবস্থায় ইঁদুরের মৃত্যু ঘটায়। তাই প্রকৃতিতে যেসব হলুদ বর্ণের ইঁদুর পাওয়া যায় তারা সবাই হেটারোজাইগাস অর্থাৎ সংকর (Yy) প্রকৃতির।

পিতা-মাতা : ফিনোটাইপ → পুরুষ হলুদ ইঁদুর (সংকর) X স্ত্রী হলুদ ইঁদুর (সংকর)

জিনোটাইপ → Yy Yy

গ্যামেট → Y y X Y y

নিষেকের ফলাফল চেকারবোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো

♀\♂	Y	y
Y	মৃত YY 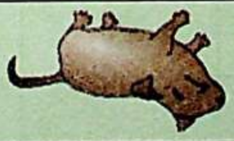	হলুদ Yy
y	হলুদ Yy 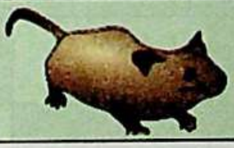	অ্যাগাউটি yy

অনুপাত = ২টি হলুদ (Yy) : ১টি অ্যাগাউটি (yy)

লিথাল জিনের প্রভাবে ক্রীপার (Creeper) মুরগী, পা-বিহীন (Amputed) বাছুর এবং মানুষে ব্র্যাকিফ্যালাঞ্জি (Brachyphalangy), হিমোফিলিয়া (Haemophilia), জন্মগত ইকথিওসিস (Congenital Ichthyosis) এবং থ্যালাসেমিয়া (Thalassemia) হতে দেখা যায়।

এমন কিছু লিথাল জিনও পাওয়া যায়, যার প্রভাবে বাহক জীব একেবারে ছোট অবস্থায় মারা যায় না। তারা বড় হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বংশবৃদ্ধিও ঘটায়। যে সব লিথাল জিনের প্রভাবে ৫০% এর বেশি জীব মারা যায় সেগুলোকে **সেমিলিথাল জিন** (semilethal gene) বলে। অন্যদিকে, যেসব লিথাল জিনের প্রভাবে ৫০% এর কম সংখ্যক জীব মারা যায় সেগুলোকে **সাবভাইটাল জিন** (subvital gene) বলে। মানুষে **হিমোফিলিয়া** রোগ সৃষ্টিকারী লিথাল জিন সেমিলিথাল ধরনের। **ড্রসোফিলা** মাছির লুপ্তপ্রায় ডানা সৃষ্টিকারী লিথাল জিন সাবভাইটাল ধরনের।

মেন্ডেলের দ্বিতীয় সূত্রের ব্যতিক্রম

১. পরিপূরক জিন (Complementary Gene) – ফিনোটাইপিক অনুপাত ৯ : ৭

ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রকট জিনের উপস্থিতির কারণে যদি জীবের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তখন জিনদুটিকে পরস্পরের পরিপূরক জিন বলে এবং এ অবস্থাকে সহপ্রকটতা বলা হয়।

Lathyrus odoratus নামক মিষ্টি মটর উদ্ভিদে সাদা ফুলবিশিষ্ট দুটি আলাদা **স্ট্রেইন** (strain) পাওয়া যায়। এ স্ট্রেইনদুটির মধ্যে সংকরায়ন করলে F_1 জনুর সব উদ্ভিদের ফুল বেগুনি হয়। কিন্তু F_2 জনুতে বেগুনি ও সাদা ফুলের অনুপাত দাঁড়ায় ৯ : ৭।

নিচে জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া হলো–

ধরা যাক, সাদা ফুলবিশিষ্ট স্ট্রেইন দুটির জিনোটাইপ যথাক্রমে AAbb এবং aaBB। এদের সংকরায়নের ফলাফল চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

পিতা-মাতা (P_1): ফিনোটাইপ ⟶ ♂ সাদা ফুলযুক্ত মিষ্টি মটর X ♀ সাদা ফুলযুক্ত মিষ্টি মটর

জিনোটাইপ ⟶ AAbb X aaBB

গ্যামেট ⟶ Ab Ab X aB aB

F_1 জনু : জিনোটাইপ ⟶ AaBb AaBb AaBb AaBb

ফিনোটাইপ ⟶ সবগুলো বেগুনি ফুলযুক্ত মিষ্টি মটর

F_1 জনুর মধ্যে ক্রস (P_2) : ফিনোটাইপ ⟶ ♂ বেগুনি ফুল X ♀ বেগুনি ফুল

জিনোটাইপ ⟶ AaBb AaBb

গ্যামেট ⟶ AB Ab aB ab X AB Ab aB ab

F_2 জনু ⟶

স্ত্রীগ্যামেট \ পুংগ্যামেট	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB বেগুনি ফুল	AABb বেগুনি ফুল	AaBB বেগুনি ফুল	AaBb বেগুনি ফুল
Ab	AABb বেগুনি ফুল	AAbb সাদা ফুল	AaBB বেগুনি ফুল	Aabb সাদা ফুল
aB	AaBB বেগুনি ফুল	AaBb বেগুনি ফুল	aaBB সাদা ফুল	aaBb সাদা ফুল
ab	AaBb বেগুনি ফুল	Aabb সাদা ফুল	aaBb সাদা ফুল	aabb সাদা ফুল

ফিনোটাইপের অনুপাত = ৯টি বেগুনি ফুল : ৭টি সাদা ফুল

ব্যাখ্যা : এক্ষেত্রে প্রকট জিন A ও B একত্রে ক্রিয়া করে থাকে। উপরের চেকার বোর্ডে দেখা যায় যেসব জিনোটাইপে A ও B একত্রে আছে সেসব ক্ষেত্রেই ফিনোটাইপ বেগুনি হয়েছে এবং যেসব ক্ষেত্রে A বা B অর্থাৎ ঐ দুটি জিনের মাত্র একটি আছে বা কোনটিই নেই সেসব ক্ষেত্রে ফিনোটাইপ সাদা হয়েছে। পরিপূরক জিনের ক্রিয়ার ফলেই F_2 জনুর অনুপাত ৯ : ৩ : ৩ : ১ এর ব্যতিক্রম ঘটে। এখানে ৯ : ৭ অনুপাত সৃষ্টি হয়েছে।

২. এপিস্ট্যাসিস (Epistasis)

কিছু ক্ষেত্রে দুটি পৃথক জিন জীবের একটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে অংশগ্রহণ করে এবং এদের একটি জিন অপর জিনের প্রকাশকে বাধা দেয়। এভাবে, **একটি জিন যখন অন্য একটি নন-অ্যালিলিক (non-allelic) জিনের কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে।** যে জিনটি অপর জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় সে জিনকে **এপিস্ট্যাটিক জিন** (epistatic gene), আর যে জিনটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায় সে জিনটিকে **হাইপোস্ট্যাটিক জিন** (hypostatic gene) বলে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ক. প্রকট এপিস্ট্যাসিস (Dominant Epistasis) – অনুপাত ১৩ : ৩

যখন একটি প্রকট জিন অন্য একটি নন-অ্যালিলিক প্রকট জিনের কার্যকারিতা প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে প্রকট এপিস্ট্যাসিস বলে।

১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে বেটসন (Bateson) এবং পানেট (Punnett) পরিচালিত এক পরীক্ষায় আবিষ্কৃত হয় যে সাদা লেগহর্ণ (Leghorn) গোষ্ঠীর মোরগ-মুরগীতে রঙিন পালক সৃষ্টির জন্য দায়ী একটি প্রকট জিন (C) থাকে। কিন্তু এপিস্ট্যাটিক জিন (I)-এর কারণে রঙিন পালক সৃষ্টি হতে না পারায় পালকগুলো সাদা হয়। F_1 জনুতে সব সাদা পালক-বিশিষ্ট হলেও F_2 জনুতে ১৩ : ৩ অনুপাতে সাদা ও রঙিন পালক-বিশিষ্ট মোরগ-মুরগী সৃষ্টি হয়।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

ধরা যাক, সাদা লেগহর্ণের রঙিন পালকের জন্য দায়ী প্রকট জিন C এবং
সাদা লেগহর্ণের রঙিন পালকের বাধাদানকারী প্রকট জিন I।
অতএব, সাদা লেগহর্ণের জিনোটাইপ হবে **CCII** এবং সাদা ওয়াইনডটের জিনোটাইপ হবে ccii।
অর্থাৎ এক্ষেত্রে C হচ্ছে প্রকট **হাইপোস্ট্যাটিক জিন** এবং I প্রকট **এপিস্ট্যাটিক জিন**।

পিতা – মাতা (P_1) : ♂ সাদা লেগহর্ণ × ♀ সাদা ওয়াইনডট
জিনোটাইপ → CCII ccii
গ্যামেট → CI ci
F_1 জনু → CcIi (সাদা)
F_1 জনুর মধ্যে ক্রস (P_2) : ♂CcIi (সাদা) × ♀CcIi (সাদা)

F_2 জনু →

♀ \ ♂	CI	Ci	cI	ci
CI	CCII সাদা	CCIi সাদা	CcII সাদা	CcIi সাদা
Ci	CCIi সাদা	CCii রঙিন	CcIi সাদা	Ccii রঙিন
cI	CcII সাদা	CcIi সাদা	ccII সাদা	ccIi সাদা
ci	CcIi সাদা	Ccii রঙিন	ccIi সাদা	ccii সাদা

অনুপাত = ১৩ (সাদা) : ৩ (রঙিন)

সাদা লেগহর্ণ এবং সাদা ওয়াইনডট-এর মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে বিস্ময়কর ফলাফল লক্ষ করা গেছে। একটি সাদা **পালকযুক্ত লেগহর্ণ–এর সাথে সাদা পালকযুক্ত ওয়াইনডট–এর ক্রস ঘটালে প্রথম বংশধরে (F_1 জনু) সবগুলো শাবকই সাদা পালকযুক্ত** পাওয়া যাবে।

F_1 জনুর মোরগ–মুরগীর মধ্যে ক্রস ঘটিয়ে দেখা গেছে F_2 জনুতে সাদা ও রঙিন উভয় ধরনের পাখিরই আবির্ভাব ঘটে এবং এদের অনুপাত দাঁড়ায় ১৩ : ৩। উপরের চেকার বোর্ডে ফলাফল দেখানো হয়েছে।

চেকার বোর্ডে দেখানো সাদা ও রঙিন পালকের জন্য দায়ী জিনসমূহের ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জিন I এর উপস্থিতি C জিন কর্তৃক রঙিন পালক প্রকাশে সবসময় বাধাদান করে। কেবল I এর অনুপস্থিতিতেই C জিনের বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে। জিন I বিশেষ ধরনের এনজাইম উৎপন্ন করে যার ফলে C জিনের বাহ্যিক প্রকাশ সম্ভব হয় না, দমিত থাকে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

খ. দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস (Duplicate Recessive Epistasis) — অনুপাত ৯ : ৭

দুটি ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত দুটি প্রচ্ছন্ন অ্যালিল যখন পরস্পরের (একে অপরের) প্রকট অ্যালিলকে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয়, তখন তাকে দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিস বলে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে কেবল হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে।

মানুষে জন্মগত মূক-বধিরতা দ্বৈত প্রচ্ছন্ন এপিস্ট্যাসিসের অন্যতম উদাহরণ। দুটি ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন এর জন্য দায়ী। এ দুটি জিনের একটি যখন হোমোজাইগাস প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে তখন অন্য প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায়। অর্থাৎ উল্লিখিত দুজোড়া প্রচ্ছন্ন জিনের যেকোনো একজোড়া থাকলে এবং অন্য জোড়ার প্রকট জিন থাকলেও যেকোনো ব্যক্তি জন্মগত মূকবধির (deaf-mute) হবে। এক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন জিন-জোড় প্রকট জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দিচ্ছে।

জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : মনে করি d ও e দুটি প্রচ্ছন্ন জিন। অতএব ddEE ও DDee জিনোটাইপধারী ব্যক্তি মূকবধির হবে। এক্ষেত্রে এপিস্ট্যাটিক প্রচ্ছন্ন জিন d ও e হোমোজাইগাস অবস্থায় থাকায় প্রকট হোমোজাইগাস জিন EE ও DD বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায়। তাই মূকবধিরতা প্রকাশ পায়।

পিতা–মাতা (P_1) : ফিনোটাইপ → ♂ মূকবধির × ♀ মূকবধির
জিনোটাইপ → DDee ddEE
গ্যামেট → De dE

F_1 জনু : জিনোটাইপ → DdEe
ফিনোটাইপ → সবাই স্বাভাবিক বাক–শ্রবণক্ষম

F_1 জনুর মধ্যে ক্রস (P_2) : ♂ স্বাভাবিক বাক–শ্রবণক্ষম × ♀ স্বাভাবিক বাক–শ্রবণক্ষম
জিনোটাইপ → DdEe DdEe
গ্যামেট → DE De dE de × DE De dE de

F_2 জনু →

পুংগ্যামেট / স্ত্রীগ্যামেট	DE	De	dE	de
DE	DDEE স্বাভাবিক	DDEe স্বাভাবিক	DdEE স্বাভাবিক	DdEe স্বাভাবিক
De	DDEe স্বাভাবিক	DDee মূকবধির	DdEc স্বাভাবিক	Ddee মূকবধির
dE	DdEE স্বাভাবিক	DdEe স্বাভাবিক	ddEE মূকবধির	ddEe মূকবধির
de	DdEe স্বাভাবিক	Ddee মূকবধির	ddEe মূকবধির	ddee মূকবধির

ফলাফল : ৯ সন্তান স্বাভাবিক বাক–শ্রবণক্ষম এবং ৭ সন্তান মূকবধির

একজন মূকবধির পুরুষের (DDee) সাথে একজন মূকবধির মহিলার (ddEE) বিয়ে হলে তাদের সকল সন্তান স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম হবে। ঐ সন্তানদের জিনোটাইপের অনুরূপ জিনোটাইপধারী পুরুষ ও মহিলার বিয়ে হলে (কারণ মানুষে ভাই-বোনের বিয়ে হয় না) তাদের সৃষ্ট পরবর্তী বংশধরে স্বাভাবিক বাক-শ্রবণক্ষম ও মূকবধির সন্তান ৯ : ৭ অনুপাতে প্রকাশ পাবে। উপরে ছকের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স (Polygenic Inheritance) বা বহুজিনীয় উত্তরাধিকার

মেন্ডেলের মতে জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য একজোড়া **ফ্যাক্টর** বা **জিন** দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু কোন কোন জীবের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিভিন্ন লোকাসে অবস্থানকারী (নন-অ্যালিলিক) একাধিক জিন জীবের একটিমাত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। যেমন-মানুষের উচ্চতা, গায়ের রং, চোখের রং, গাভির দুধ, ভুট্টা বা গমের দানার রং ইত্যাদি **পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য** (quantitative traits) একাধিক জিনের সমন্বিত প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল হয়।

ভিন্ন ভিন্ন লোকাসে অবস্থিত নন-অ্যালিলিক জিনের একটি গ্রুপ সম্মিলিতভাবে কোন জীবের একটি পরিমাণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করলে তখন সেই জিন-গ্রুপকে **পলিজিন** (polygene) বলে। **পলিজিনে নিয়ন্ত্রিত পরিমাণগত বৈশিষ্ট্যের বংশগতিকে পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স বলা হয়।** জিনতত্ত্ববিদ K. Mather, ১৯৫৪ সালে পলিজিন নামকরণ করেন। পলিজিনের প্রভাব **ক্রমবর্ধিষ্ণু** (cumulative) হওয়ায় এমন বৈশিষ্ট্যকে **মাত্রিক চরিত্র** (quantitative character) বলা হয়।

পৃথিবীতে নিগ্রোদের মতো **কুচকুচে কালো** থেকে শুরু করে ককেশীয়দের মতো **ধবধবে ফর্সা** তথা **শ্বেতাঙ্গ** পর্যন্ত নানা প্রকার গায়ের বর্ণবিশিষ্ট মানুষ দেখা যায়। নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গের মধ্যে বিয়ে হলে এদের সন্তানদের গায়ের বর্ণ মাঝামাঝি অর্থাৎ **মিউল্যাটো** (mulatto) হয়। মিউল্যাটোদের মধ্যে বিয়ে হলে নানা ধরনের বর্ণবিশিষ্ট মানুষ দেখা যায়। নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ মানুষের মধ্যে বিয়ের ফলে সৃষ্ট মিউল্যাটোদের (মাঝারি বর্ণ) গায়ের বর্ণের উত্তরাধিকার পলিজেনিক উত্তরাধিকারের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

একজন নিগ্রো পুরুষের সাথে একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলার বিয়ে হলে F_1 ও F_2 জনুর ফলাফল অপর পৃষ্ঠায় চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো।

ধরি, নিগ্রোদের বর্ণ সৃষ্টিকারী দুজোড়া জিন হচ্ছে $B_1 B_1 B_2 B_2$ এবং শ্বেতাঙ্গদের এ রকম দুজোড়া জিন $b_1 b_1 b_2 b_2$। এধরনের নিগ্রো পুরুষ ও শ্বেতাঙ্গ মহিলার মধ্যে বিয়ে হলে তাদের ক্রসের ফলে সৃষ্ট F_1 জনুর জিনোটাইপ হয় $B_1 b_1 B_2 b_2$ এবং ফিনোটাইপ হয় **মিউল্যাটো** বা মাঝামাঝি। F_1 জনু মিউল্যাটো বা মাঝামাঝিদের মধ্যে ক্রস করলে F_2 তে নানা রকম গায়ের রংবিশিষ্ট মানুষ দেখা যায়। এসব জিনের ক্ষেত্রে কোনো প্রকটতা (dominance) নেই। **প্রকট জিনের সংখ্যা যত বেশি হবে গায়ের রং-এর গাঢ়ত্ব তত বেড়ে যাবে।**

C. B. Davenport ১৯১৩ সালে প্রমাণ করেন যে, নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গদের গায়ের রং-এর বংশগতি দুজোড়া জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। নিগ্রোদের দুজোড়া বর্ণ সৃষ্টিকারী জিন রয়েছে যা **মেলানিন** (melanin; মেরুদণ্ডী প্রাণীর ত্বকে উপস্থিত কালো বা গাঢ় বাদামী বর্ণের রঞ্জক) সঞ্চয়ে সাহায্য করে। এসব জিনে কোনো প্রকটতা দেখা যায় না। তবে এদের সমপরিমাণ ও ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাব দেখা যায়। শ্বেতকায়দের ক্ষেত্রে এ জিনগুলোর অ্যালিল মেলানিন সঞ্চয়ে সাহায্য করে না।

১৯০৮ সালে সুইডিস বিজ্ঞানী Nilsson-Ehle গমের বীজের রং নিয়ে পরীক্ষা করার সময় **লাল** বীজযুক্ত গমের সাথে **সাদা** বীজযুক্ত গমের সংকরায়ন ঘটান। F_1 বংশধরে তিনি সকল গমের রং **মধ্যম লাল** পেলেও F_2 বংশধরে **১৫টি লাল** এবং **১টি সাদা** শস্যযুক্ত উদ্ভিদ পান। তিনি ১৫টি লাল শস্যযুক্ত উদ্ভিদের মধ্যে লালবর্ণের গাঢ়ত্বের তারতম্য লক্ষ করেন। প্রকৃতপক্ষে এই তারতম্য বিচার করে তিনি ১ : ৪ : ৬ : ৪ : ১ (গাঢ় লাল : লাল : মধ্যম লাল : ফিকে লাল : সাদা) অনুপাত পেয়েছিলেন।

কাজ : মনে করি, গমের দানার লাল রং সৃষ্টিকারী দুটি ডুপ্লিকেট জিন হচ্ছে R_1r_1 এবং R_2r_2। **অত্যন্ত গাঢ় লাল** দানাযুক্ত ($R_1R_1R_2R_2$) উদ্ভিদের সাথে **সাদা** দানাযুক্ত ($r_1r_1r_2r_2$) উদ্ভিদের সংকরায়ন ঘটালে F_1 এবং F_2 বংশধরে যে যে ধরনের বর্ণবিশিষ্ট গমের দানা পাওয়া যাবে তা চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখাও।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

পলিজেনিক ইনহেরিট্যান্স-এর জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

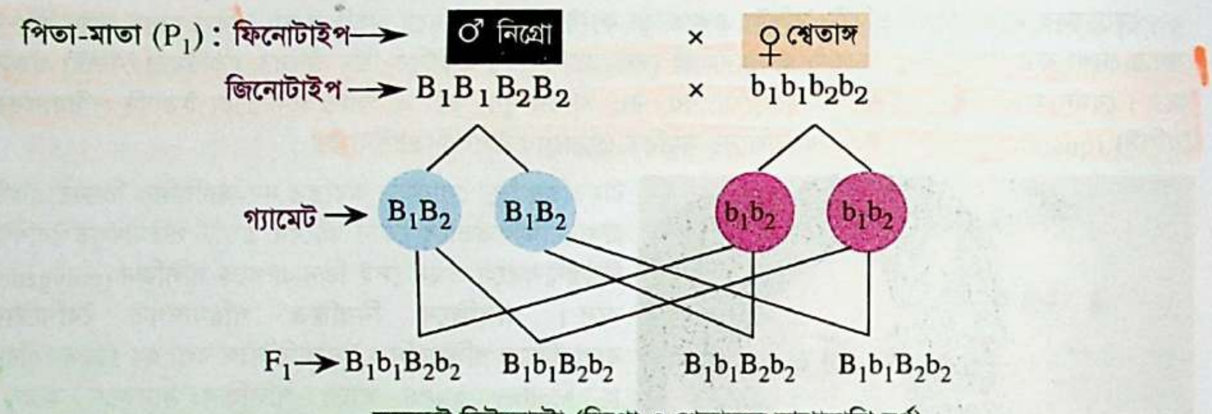

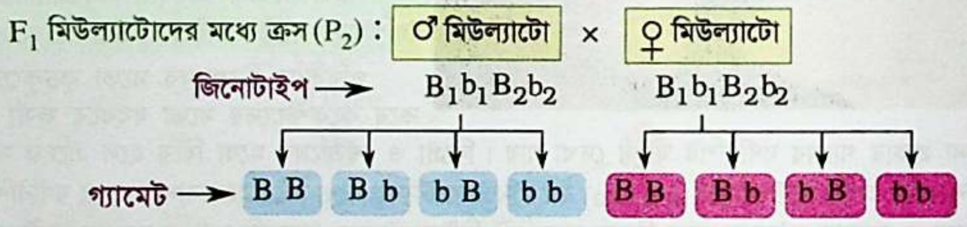

F_2 জনুর ফলাফল চেকার বোর্ডের মাধ্যমে দেখানো হলো–

F_2 জনু →

পুংগ্যামেট / স্ত্রীগ্যামেট	B_1B_2	B_1b_2	b_1B_2	b_1b_2
B_1B_2	$B_1B_1B_2B_2$ ১ নিগ্রো	$B_1B_1B_2b_2$ ২ গাঢ় বর্ণ	$B_1b_1B_2B_2$ ৩ গাঢ় বর্ণ	$B_1b_1B_2b_2$ ৪ মিউল্যাটো
B_1b_2	$B_1B_1B_2b_2$ ৫ গাঢ় বর্ণ	$B_1B_1b_2b_2$ ৬ মিউল্যাটো	$B_1b_1B_2b_2$ ৭ মিউল্যাটো	$B_1b_1b_2b_2$ ৮ হালকা বর্ণ
b_1B_2	$B_1b_1B_2B_2$ ৯ গাঢ় বর্ণ	$B_1b_1B_2b_2$ ১০ মিউল্যাটো	$B_2B_2b_1b_1$ ১১ মিউল্যাটো	$b_1b_1B_2b_2$ ১২ হালকা বর্ণ
b_1b_2	$B_1b_1B_2b_2$ ১৩ মিউল্যাটো	$B_1b_1b_2b_2$ ১৪ হালকা বর্ণ	$b_1b_1B_2b_2$ ১৫ হালকা বর্ণ	$b_1b_1b_2b_2$ ১৬ শ্বেতাঙ্গ

নিগ্রো = ১ জন : গাঢ় = ৪ জন : মিউল্যাটো = ৬ জন : হালকা = ৪ জন : শ্বেতাঙ্গ = ১ জন
অর্থাৎ ১ : ৪ : ৬ : ৪ : ১

চেকার বোর্ডটির ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এখানে ১৬ জনের মধ্যে

৪টি বর্ণ সৃষ্টিকারী জিনবিশিষ্ট (১ নং ছকে) ১ জন নিগ্রো ;
৩টি বর্ণ সৃষ্টিকারী জিনবিশিষ্ট (২,৩, ৫, ৯ নং ছকে) ৪ জনের গায়ের রং গাঢ় বর্ণ ;
২টি বর্ণ সৃষ্টিকারী জিনবিশিষ্ট (৪, ৬, ৭, ১০, ১১, ১৩ নং ছকে) ৬ জন মিউল্যাটো বা মাঝারি বর্ণ;
১টি বর্ণ সৃষ্টিকারী জিনবিশিষ্ট (৮, ১২, ১৪, ১৫ নং ছকে) ৪ জনের গায়ের রং হালকা বর্ণ।
বর্ণ সৃষ্টিকারী জিনবিহীন (১৬ নং ছকে) ১ জন শ্বেতাঙ্গ।

উপরোক্ত ফলাফল থেকে দেখা যায়, এখানে ১৬ জনের মধ্যে একজন ($B_1 B_1 B_2 B_2$) নিগ্রো এবং একজন ($b_1 b_1 b_2 b_2$) শ্বেতাঙ্গ হয়। ফলাফল থেকে আরো দেখা যায় যে, বর্ণ সৃষ্টিকারী প্রকট জিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ফিনোটাইপের বহিঃপ্রকাশের তীব্রতা বৃদ্ধি পায় আবার এ সকল জিনের সংখ্যা কম হলে ফিনোটাইপের বহিঃপ্রকাশের তীব্রতা হ্রাস পায়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

লিঙ্গ নির্ধারণ নীতি (Sex Determination, XX–XY, XX–XO)

যে ক্রোমোজোমের মাধ্যমে জীবের লিঙ্গ নির্ধারিত হয়, তাকে **সেক্স ক্রোমোজোম** বলে। এ ক্রোমোজোমগুলোকে সাধারনত X ও Y বা O ক্রোমোজোম নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

মানুষের প্রতিকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম রয়েছে। এগুলোর মধ্যে **২২ জোড়া** উভয় লিঙ্গে একই রকম এবং সেগুলোকে **অটোজোম** (autosome) বলে। কিন্তু **২৩তম জোড়ার ক্রোমোজোম নারী ও পুরুষ সদস্যে ভিন্নতর** এবং এগুলোকে **হেটারোজোম** (heterosome) বা **সেক্স ক্রোমোজোম** (sex chromosome) বলা হয়।

নারী সদস্যে যেসব গ্যামেট সৃষ্টি হয় তাতে শুধু X ক্রোমোজোম থাকে। এ কারণে নারীকে **হোমোগ্যামেটিক সেক্স** এবং এসব গ্যামেটকে **হোমোগ্যামেট** বলে। অন্যদিকে, পুরুষ সদস্যে দুধরনের গ্যামেট সৃষ্টি হয়। এক ধরনের গ্যামেটে থাকে X ক্রোমোজোম, অন্যধরনের গ্যামেটে থাকে Y ক্রোমোজোম। পুরুষকে তাই **হেটারোগ্যামেটিক সেক্স** এবং এসব গ্যামেটকে **হেটারোগ্যামেট** বলে।

পুরুষ হেটারোগ্যামেসিস প্রক্রিয়া নিচে বর্ণিত দুই প্রকার।

১. XX–XY পদ্ধতি

(মানুষ, ড্রসোফিলাসহ বিভিন্ন ধরনের পতঙ্গ এবং গাঁজা, তেলাকুচা প্রভৃতি উদ্ভিদের লিঙ্গ নির্ধারণ)

এ পদ্ধতি অনুযায়ী স্ত্রী **হোমোগ্যামেটিক** বা XX এবং পুরুষ **হেটারোগ্যামেটিক** বা XY। স্ত্রী মাত্র এক ধরনের ডিম্বাণু (X) উৎপন্ন করে। কিন্তু পুরুষ দুরকমের শুক্রাণু (X এবং Y) সৃষ্টি করে। X-বাহী ডিম্বাণুর সাথে X-বাহী শুক্রাণুর মিলন হলে **কন্যা** (XX) সন্তান এবং X-বাহী ডিম্বাণুর সাথে Y-বাহী শুক্রাণুর মিলন হলে **পুরুষ** (XY) সন্তান জন্ম হবে।

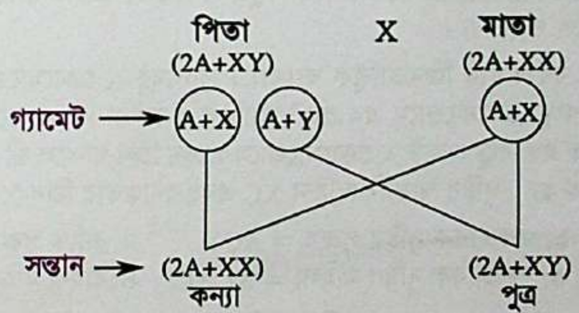

চিত্র : XX-XY পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারণ

২. XX–XO পদ্ধতি

(ফড়িং, ছারপোকা প্রভৃতি পতঙ্গ ও Dioscorea শ্রেণির উদ্ভিদের লিঙ্গ নির্ধারণ)

ফড়িং, ছারপোকা প্রভৃতি পতঙ্গে XX–XO পদ্ধতির লিঙ্গ নির্ধারণ হয়। এখানে স্ত্রী হোমোগ্যামেটিক অর্থাৎ XX সেক্স-ক্রোমোজোমবিশিষ্ট। কিন্তু পুরুষে Y ক্রোমোজোম অনুপস্থিত। স্ত্রীর ক্রোমোজোম 2A + XX এবং পুরুষের ক্রোমোজোম 2A + XO (Y না থাকায় 'O' শূন্য লেখা হয়)। স্ত্রী হোমোগ্যামেটিক, কাজেই সমস্ত ডিম্বাণু একই ধরনের (A + X)। কিন্তু পুরুষে দুধরনের গ্যামেট [(A + X) এবং (A + O)] উৎপন্ন হয়।

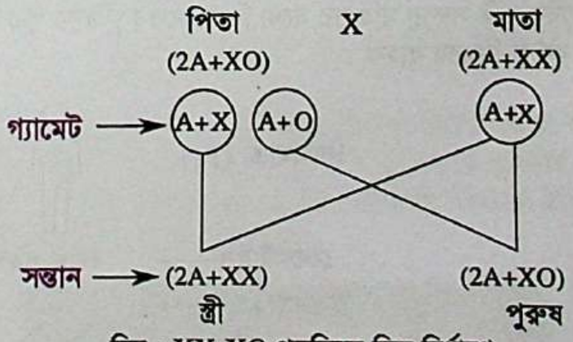

চিত্র : XX-XO পদ্ধতিতে লিঙ্গ নির্ধারণ

প্রথম প্রকারের শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলনে স্ত্রী সন্তান (2A + XX), কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শুক্রাণুর সাথে ডিম্বাণুর মিলনে পুরুষ সন্তানের (2A + XO) সৃষ্টি হয়।

উদ্ভিদে সচরাচর এ ধরনের লিঙ্গ নির্ধারণ দেখা যায় না। তবে *Dioscorea sinuata* উদ্ভিদে এ ধরনের লিঙ্গ নির্ধারণ দেখা যায়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

সেক্স-লিঙ্কড ডিসঅর্ডার (Sex-linked Disorders)

প্রাণীর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা সেক্স ক্রোমোজোমে উপস্থিত জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। সেক্স ক্রোমোজোম দিয়ে নিয়ন্ত্রিত এসব বৈশিষ্ট্যকে **সেক্স-লিংকড বৈশিষ্ট্য** (sex linked characters) বলে। এসব বৈশিষ্ট্য সেক্স ক্রোমোজোমের সঞ্চারণ অনুযায়ী বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। **সেক্স ক্রোমোজোমের মাধ্যমে সেক্স-লিঙ্কড বৈশিষ্ট্যের বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হওয়াকে সেক্স-লিংকড ইনহেরিট্যান্স** (Sex linked inheritance) বলে। মানুষে এ পর্যন্ত প্রায় ৬০টি সেক্স-লিকড জিন পাওয়া যায়। মানুষের যেসব জিন নিয়ন্ত্রিত বংশগতিয় রোগ সেক্স ক্রোমোজোমের (X ও Y) মাধ্যমে বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় তাদের **সেক্স লিঙ্কড ডিসঅর্ডার** বা **অস্বাভাবিকতা** বলে। মানুষের X জিন নিয়ন্ত্রিত এরকম কয়েকটি রোগ হলো লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা (red-green color blindness), হিমোফিলিয়া (hemophilia), ডুসেন মাসকুলার ডিস্ট্রফি (Duchenne Muscular Dystrophy)। মানুষের Y জিন নিয়ন্ত্রিত একটি বৈশিষ্ট্য হলো কানের লোম।

লাল সবুজ বর্ণান্ধতা (Red green color blindness)

মানুষের চোখের রেটিনাতে কিছু বর্ণ সংবেদী কোষ আছে যেগুলো বর্ণ শনাক্ত করে। মানুষের X ক্রোমোজোমে দুটি জিন আছে যা বর্ণ সংবেদী কোষ গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ জিনের প্রচ্ছন্ন অ্যালিল বর্ণ সংবেদী কোষ গঠন ব্যাহত করে। ফলে এ প্রচ্ছন্ন জিন বিশিষ্ট মানুষ কতকগুলো বিশেষ বর্ণের পার্থক্য বুঝতে পারে না। একে **বর্ণান্ধতা** (color blindness) বলে। **লাল সবুজ বর্ণান্ধতা একটি সেক্স লিঙ্কড রোগ**। এক্ষেত্রে মানুষ লাল সবুজ বর্ণের পার্থক্য বুঝতে পারে না।

বর্ণান্ধতার জিনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা : পুরুষের X ক্রোমোজোমে বর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী প্রচ্ছন্ন জিন থাকলে পুরুষ বর্ণান্ধ হয় কারণ Y ক্রোমোজোমে এর প্রকট অ্যালিল থাকে না। অপরপক্ষে, স্ত্রীর ক্ষেত্রে দুটি X ক্রোমোজোমে প্রচ্ছন্ন জিন থাকলে স্ত্রী বর্ণান্ধ হয় কিন্তু একটি X ক্রোমোজোমে প্রচ্ছন্ন জিন থাকলে স্ত্রী বর্ণান্ধ হয় না, স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হয় কিন্তু বর্ণান্ধতা জিনের বাহক হয়। দৃষ্টির স্বাভাবিক জিন XC এবং বর্ণান্ধতার জিন Xc হলে মানুষের দৃষ্টিশক্তির জিনোটাইপ নিম্নরূপ হবে।

১. স্বাভাবিক দৃষ্টির পুরুষ = XCY
২. বর্ণান্ধ পুরুষ = XcY
৩. স্বাভাবিক দৃষ্টির মহিলা = XCXC
৪. বাহক মহিলা = XCXc
৫. বর্ণান্ধ মহিলা = XcXc

বর্ণান্ধ পুরুষ ও স্বাভাবিক মহিলার মধ্যে বিয়ে : মানুষের স্বাভাবিক দৃষ্টির জিন XC এবং বর্ণান্ধতার জিন Xc। তাহলে বর্ণান্ধ পুরুষের জেনোটাইপ হবে XcY ও স্বাভাবিক মহিলার জেনোটাইপ হবে XCXC। বর্ণান্ধ পুরুষ ও স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন মহিলার মধ্যে বিয়ে হলে F_1 জনুর পুত্র কন্যা সকলেই স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন হলেও কন্যাদের সবাই হবে বর্ণান্ধ জিনের বাহক।

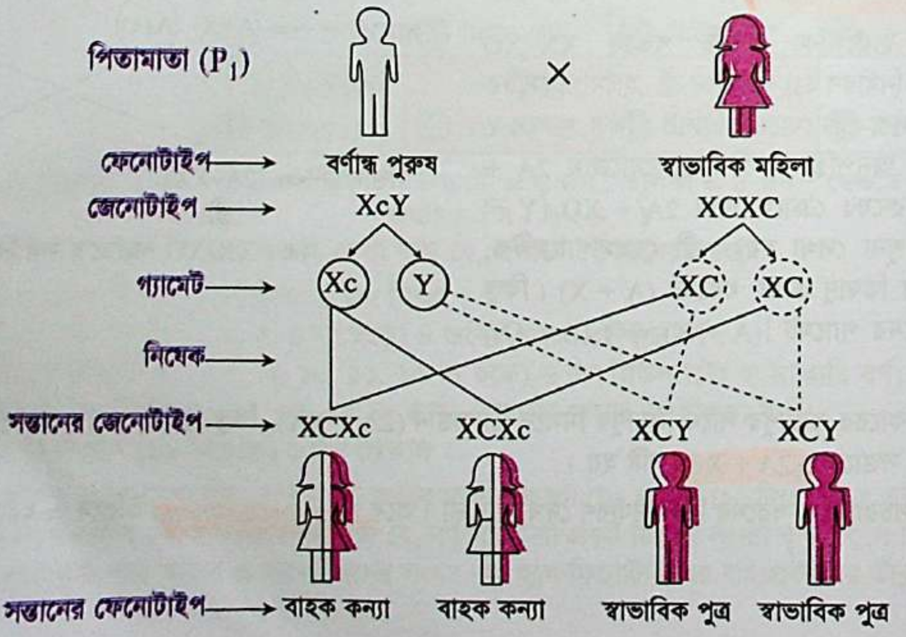

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

F_1 জনুর সন্তানদের অনুরূপ জিনোটাইপধারী (কারণ মানুষে ভাই-বোনের বিয়ে হয় না) স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষের সাথে বর্ণান্ধবাহক মহিলার বিয়ে হলে ঐ মহিলার চার সন্তানের মধ্যে দুজন স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন কন্যা (এদের মধ্যে এক কন্যা বর্ণান্ধতার বাহক), একজন স্বাভাবিক দৃষ্টি সম্পন্ন পুত্র এবং একজন বর্ণান্ধ পুত্র জন্ম লাভ করবে।

বর্ণান্ধতা রোগের প্রচ্ছন্ন জিনটি বংশপরম্পরায় পিতা থেকে কন্যার মাধ্যমে পৌত্রকে আক্রান্ত করে। একে **ক্রিসক্রস ইনহেরিট্যান্স** (criss cross inheritance) বলে।

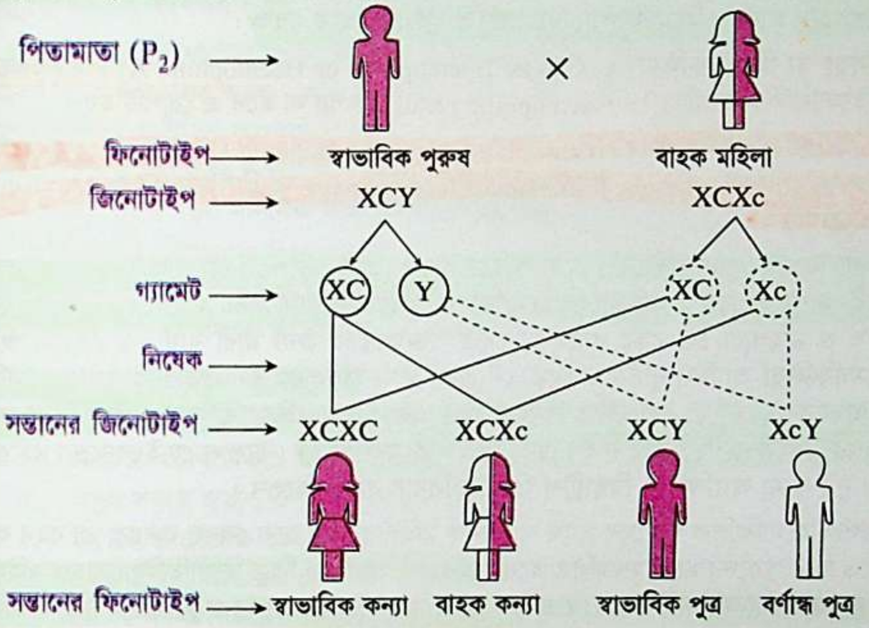

সুতরাং বিয়ের আগে বর্ণান্ধতার বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। কারণ রাস্তায় যান চলাচলে লাল ও সবুজ আলো গুরুত্বপূর্ণ ট্রাফিক সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া পছন্দের ফুল উপহার দিতে কিংবা বাজার থেকে কাঁচা-পাকা ফল বা জামা-কাপড় কিনতেও বর্ণান্ধদের বেশ বিব্রত হতে হয়।

মহিলাদের তুলনায় পুরুষরা বেশি বর্ণান্ধ হওয়ার কারণ

পরিসংখ্যানে দেখা গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৮% পুরুষ এবং ০.৫% মহিলা বর্ণান্ধ। কারণ–

১. বর্ণান্ধতার জিন X ক্রোমোজোমে অবস্থিত ও প্রচ্ছন্ন প্রকৃতির হওয়ায় মহিলাদের ক্ষেত্রে কেবল হোমোজাইগাস অবস্থায় (XcXc) বর্ণান্ধতা প্রকাশ পায় কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে X ক্রোমোজোমে বর্ণান্ধের জিন থাকলেই (XcY) বর্ণান্ধতা প্রকাশ পায়।

২. মহিলাদের ক্ষেত্রে দুটি X ক্রোমোজোমের একটিতে বর্ণান্ধের জিন থাকলে (XCXc) তা বর্ণান্ধ প্রকাশ ঘটাতে পারে না ফলে মহিলা স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন হয় কিন্তু বর্ণান্ধতার জিন বহন করে। এ কারণে মহিলাদের তুলনায় পুরুষ বেশি বর্ণান্ধ হয়। বর্ণান্ধতার কোনো চিকিৎসা নেই এবং বর্ণান্ধ রোগী কখনই সুস্থ হয় না। চিকিৎসা বিজ্ঞানে **ইশিহারা কালার টেস্ট** (Ishihara color test) দ্বারা লাল সবুজ বর্ণান্ধতা রোগটি শনাক্ত করা যায়।

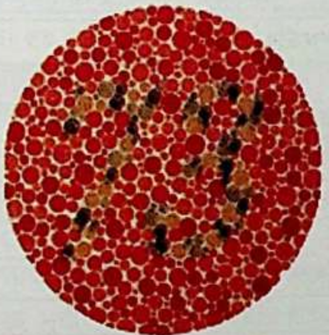

চিত্র : যদি কেউ 73 সংখ্যাটি পড়তে না পারেন তাহলে বুঝতে হবে, তিনি লাল-সবুজ বর্ণান্ধ

চিত্র : স্বাভাবিক ও বর্ণান্ধ মানুষ যে ভাবে আপেলের রং দেখতে পান

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

হিমোফিলিয়া (Haemophilia)

হিমোফিলিয়া হচ্ছে বংশগতভাবে সঞ্চারণশীল বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একপ্রকার রক্ত তঞ্চনঘটিত ত্রুটি বা অস্বাভাবিকতা। আক্রান্ত ব্যক্তিদের রক্ত তঞ্চিত হয় না এবং রক্ত ক্ষরণজনিত কারণে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুও হতে পারে। বর্ণান্ধতার কারণে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জীবনহানির আশঙ্কা থাকে না কিন্তু হিমোফিলিয়ার ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তি মারাও যেতে পারে। X-ক্রোমোজোমের একটি প্রচ্ছন্ন **মিউট্যান্ট জিন** (mutant gene; প্রাকৃতিক বা কৃত্রিমভাবে পরিব্যক্ত কোন জিন)-এর কারণে হিমোফিলিয়া হয়ে থাকে। হিমোফিলিয়া নিচে বর্ণিত দুধরনের হয়ে থাকে :

১. **ক্লাসিক হিমোফিলিয়া বা হিমোফিলিয়া A** (Classic Haemophilia or Haemophilia A) : রক্ততঞ্চনের VIII নম্বর ফ্যাক্টর বা অ্যান্টিহিমোফিলিক ফ্যাক্টর (Antihaemophilic factor) উৎপন্ন না হলে এ রোগটি হয়।

২. **খ্রিস্টমাস ডিজিজ বা হিমোফিলিয়া B** (Christmas Disease or Haemophilia B): রক্ততঞ্চনের IX নম্বর ফ্যাক্টর বা প্লাজমা থ্রম্বোপাস্টিন কমপোনেন্ট (Plasma thromboplastin component) বা খ্রিস্টমাস ফ্যাক্টর (christmas factor) অনুপস্থিত থাকলে এ রোগটি হয়।

হিমোফিলিয়া রোগে মহিলা অপেক্ষা পুরুষরাই বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। প্রতি ১০,০০০ জন পুরুষের মধ্যে একজন হিমোফিলিয়ায় আক্রান্ত হবার আশঙ্কা থাকে। অধিকাংশ হিমোফিলিক ব্যক্তি হিমোফিলিয়া-A রোগে আক্রান্ত হয়। সাধারণত হিমোফিলিক পুরুষ ও মহিলারা ১৬ বছর বয়সের মধ্যেই রক্তক্ষরণের জন্য মারা যায়। X-ক্রোমোজোমে অবস্থিত **স্বাভাবিক** এবং **হিমোফিলিয়া** অ্যালিল দুটি যথাক্রমে X^H এবং X^h। মহিলারা তিন প্রকার জিনোটাইপ বিশিষ্ট হতে পারে–X^HX^H (সম্পূর্ণ স্বাভাবিক), X^HX^h (স্বাভাবিক কিন্তু বাহক) এবং X^hX^h (হিমোফিলিক)। পুরুষদের ক্ষেত্রে দুধরনের জিনোটাইপ হতে পারে, যেমন–X^HY (স্বাভাবিক) এবং X^hY (হিমোফিলিক)। উল্লেখ্য যে ইংল্যান্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার চার কন্যার মধ্যে দুই কন্যা **অ্যালিস** ও **বিয়াট্রিশ** হিমোফিলিয়ার বাহক ছিলেন।

হিমোফিলিয়া আক্রান্ত অর্থাৎ হিমোফিলিক পুরুষের সাথে স্বাভাবিক মহিলার বিয়ে হলে কেবল কন্যারা তা বহন করে এবং কন্যার মাধ্যমে পরবর্তীতে তার পুত্রদের মধ্যে সঞ্চালিত হবে। একজন স্বাভাবিক কিন্তু হিমোফিলিয়া বাহক মহিলার সাথে স্বাভাবিক পুরুষের বিয়ে হলে, সকল কন্যা সন্তান স্বাভাবিক হবে কিন্তু পুত্র সন্তানদের মধ্যে ৫০% হিমোফিলিক হবার সম্ভাবনা থাকে। নিচে উদাহরণসহ দেখানো হলো।

পিতা-মাতা → স্বাভাবিক পুরুষ × স্বাভাবিক কিন্তু বাহক মহিলা

জিনোটাইপ → X^HY × X^HX^h

গ্যামেট → X^H, Y × X^H, X^h

F_1 জনু →

স্ত্রীগ্যামেট / পুংগ্যামেট	X^H	X^h
X^H	X^HX^H (স্বাভাবিক কন্যা)	X^HX^h (স্বাভাবিক কিন্তু বাহক কন্যা)
Y	X^HY (স্বাভাবিক পুত্র)	X^hY (হিমোফিলিক পুত্র)

মানুষের কয়েকটি সেক্স-লিঙ্কড ডিসঅর্ডার

সেক্স-লিঙ্কড ডিসঅর্ডার	লক্ষণ
১. লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা	লাল ও সবুজ বর্ণের পার্থক্য বুঝতে পারে না।
২. হিমোফিলিয়া	রক্ততঞ্চন বিলম্বিত হয়, ফলে ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্ত ক্ষরিত হয়।
৩. মাসকুলার ডিস্ট্রফি	বিভিন্ন অঙ্গের পেশির সঞ্চালন ও স্বাভাবিক কাজ কর্মের সক্ষমতা কমিয়ে দেয়।
৪. রাতকানা	রাতে কোন কিছু দেখতে পায় না।
৫. ডায়াবেটিস ইনসিপিডাস	অস্বাভাবিক মূত্র ত্যাগ, শারীরিক অক্ষমতা।
৬. ফ্রাজাইল X সিনড্রম	অটিজম ও মানসিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়।
৭. হাইপারট্রাইকোসিস	সমগ্র দেহে ঘন লোমের উপস্থিতি।
৮. টেস্টিকুলার ফেমিনাইজেশন	পুরুষ ধীরে ধীরে স্ত্রীতে পরিণত হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মাসক্যুলার ডিসট্রফি (Muscular Dystrophy)

মানুষে অনেক ধরনের বংশগত রোগ দেখা যায়। এসব রোগ জেনেটিক বা জিনঘটিত রোগ-ব্যাধি নামে পরিচিত। মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিও একটি জিনঘটিত রোগ। প্রধানত কঙ্কালিক ও হৃৎপেশি এবং কিছু ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে এ রোগ দেখা যায়। একটি সেক্স-লিংকড জিনের বিশৃঙ্খলার কারণে প্রধানত শিশুদেহে প্রকাশিত হাত, পা, দেহকান্ড, হৃৎপিন্ড ও আন্ত্রিক পেশির সঞ্চালন ও স্বাভাবিক কাজকর্মের সক্ষমতা কমিয়ে দিয়ে যে দুর্বিসহ জীবনের সূত্রপাত ঘটায় সেটি হচ্ছে মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি নামে এ বংশগত রোগ। অসুখটি ছেলে শিশুদের বেশি হয়।

তিরিশের বেশি ধরনের মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি দেখা যায়। এর মধ্যে ৯টি হচ্ছে প্রধান বাকিগুলো দুর্লভ। দেহের আক্রান্ত ও আশ-পাশের অংশ, পেশি দুর্বলতার ধরণ, কোন বয়সে দেখা দেয় এবং রোগের গতিধারা একেক রকম। রোগের সাধারণ শারীরিক লক্ষণগুলো হচ্ছে– পেশির দুর্বলতা ও সমন্বয়ের অভাব; স্থূলতা দেখা দেওয়া; দ্রুত পেশিক্ষয়, দুর্বলতা ও পেশি অকার্যকর হওয়া; অস্থিসন্ধির কুঞ্চন; কপালের উপরে টাক হওয়া (frontal baldness); চোখে ছানি পড়া; চোখের পাতা ঝুঁকে পড়া; মানসিক অস্বাভাবিকতা; জননাঙ্গের ক্ষয়িষ্ণুতা প্রভৃতি।

মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিযুক্ত শিশুদের বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালীন শিশুদের মানসিক উঠা-নামা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তখন সব শিশুর জন্যই কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসার দরকার পড়ে না। নিম্নোক্ত আচরণগত বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে অভিভাবককে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে :

১. স্কুলে আচরণগত সমস্যা ও দীর্ঘক্ষণ মনোযোগ দিয়ে কাজ করার সমস্যা সম্বন্ধে শিক্ষকদের রিপোর্ট।
২. অভিভাবক বা সেবাদানকারীর উপর বেশি মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়া।
৩. মেজাজ খিটখিটে হয়ে যাওয়া, হাঁটতে না চাওয়া।
৪. অসুখ সম্বন্ধে হতাশ ও আবেগতাড়িত হয়ে পড়া।
৫. ঘন ঘন বদমেজাজ দেখানো।
৬. ওষুধ খাওয়া বা ডাক্তারের কাছে যাওয়ার ব্যাপার প্রতিরোধ করা বা এড়িয়ে চলা এবং
৭. নিজের বয়সী শিশুদের কর্মকান্ডে অংশ না নেওয়া বা জমায়েতে অংশগ্রহণ না করা।

মাসকুল্যার ডিস্ট্রফি একটি দুর্লভ জিনঘটিত অসুখ। আগেই বলা হয়েছে যে তিরিশেরও বেশি ধরনের মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি রয়েছে। এর মধ্যে **ডুশেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি** (Duchenne Muscular Dystrophy সংক্ষেপে DMD) হচ্ছে ভয়াবহতম ডিস্ট্রফি। পঞ্চাশ হাজারে মাত্র একজনে এ রোগটি দেখা যেতে পারে। অন্য ডিস্ট্রফিগুলো আরও দুর্লভ। মাসক্যুলার ডিস্ট্রফির সঙ্গে বোধশক্তিজনিত প্রতিক্রিয়ার সামান্য সম্পর্ক রয়েছে। কোনো শিশু যদি **অনুগ্র মানসিক প্রতিবন্ধী** (mild intellectual disable) বিশিষ্ট হয় এবং মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিতে ভোগে তাহলে সে স্বাভাবিক মানুষের মতোই লেখা-পড়া ও চাকুরি করতে পারবে, এমনকি সাধারণ মানুষের মতো যানবাহনে চলাফেরাও করতে পারবে। **মাঝারি** (moderate) ধরনের মানসিক প্রতিবন্ধী হলে ওসব কাজে সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। কিন্তু **তীব্র** (very) মানসিক প্রতিবন্ধী বিশিষ্ট মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিতে ভোগে এমন শিশু **অটিজম** (autism)-এর দিকে ধাবিত হতে পারে।

সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, জেনেটিক বিশৃঙ্খলজনিত এ রোগটির কোনো চিকিৎসা নেই। গবেষকরা মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি সৃষ্টিকারী **পরিব্যক্ত** (mutated) জিন সংশোধনের জন্য জেনেটিক থেরাপি আবিষ্কারের উদ্দেশে গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। গবেষণার লক্ষ হচ্ছে অস্থিসন্ধির বিকৃতিরোধ করা, সঞ্চালন ক্ষমতা বাড়ানো এবং রোগীকে যন্ত্রণামুক্ত দীর্ঘায়ু করে তোলা। তবে বর্তমানে পেশির দুর্বলতা, আক্ষেপ, কাঠিন্য প্রভৃতি উপশমে বিভিন্ন ওষুধের প্রচলন রয়েছে (যেমন মেক্সিলেটিন, ব্যাকলোফেন, কার্বঅ্যামেজপাইন ইত্যাদি)।

X ক্রোমোজোমে অবস্থিত কোনো জিন যদি পরিব্যক্ত হয়ে অপত্য বংশে সঞ্চারিত হয় এবং রোগের প্রকাশ ঘটায় তবে সে ব্যক্তিকে X-লিংকড ব্যাধি নামে অভিহিত করা হয়। পুরুষে যেহেতু একটিমাত্র X ক্রোমোজোম থাকে তাই এসব রোগ-ব্যাধি কেবল পুরুষেই সীমাবদ্ধ থাকে। পুরুষে আরেকটি X ক্রোমোজোমের পরিবর্তে যেহেতু Y ক্রোমোজোম থাকে তাই মাসুক্যলার ডিস্ট্রফির জন্য দায়ী **ডিস্ট্রফিন জিন**-এর আর কপি থাকে না।

নারীদেহে দুটি X ক্রোমোজোম (XX) থাকে। অতএব একটি X ক্রোমোজোমের জিন বিকৃত হলে অন্য X ক্রোমোজোমে অবস্থিত স্বাভাবিক জিনটি **ব্যাকআপ কপি** হিসেবে কাজ করে। নারী পরিব্যক্ত X-লিংকড জিন বহন

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

করলেও তার দেহে X-লিংকড রোগের কোনো লক্ষণ প্রকাশ পাবে না, তবে ঐ নারী রোগের বাহক হিসেবে কাজ করবে এবং ওই জিন তার পুত্র-সন্তানে সঞ্চারিত করবে। প্রত্যেক পুত্র সন্তান অস্বাভাবিক এ জিন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়ার এবং রোগগ্রস্ত হওয়ার ৫০% ঝুঁকি বহন করে। কন্যা সন্তানদের উত্তরাধিকার সূত্রে বহন এবং রোগের বাহক হিসেবে ভূমিকা পালনের ঝুঁকি থাকবে ৫০%।

X ক্রোমোজোমে স্বতঃস্ফূর্ত পরিব্যক্তি (mutation)-র ফলে পুত্র সন্তানে X-লিংকড প্রচ্ছন্ন রোগের সৃষ্টি করে।

মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিতে জিনের ভূমিকা : দেহে প্রায় ৩ হাজার পেশি-প্রোটিন রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রোটিন একেকটি জিন-এ রক্ষিত থাকে। কিছু পেশি-প্রোটিন পেশিতন্তুর গাঠনিক অংশ, অন্যগুলো পেশিতন্তুতে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। একটি পেশি-প্রোটিন জিনে সামান্য বিকৃতিও পেশিরোগের প্রকৃতি ও ভয়াবহতাকে প্রভাবিত করে। যেমন-ডিস্ট্রফিন প্রোটিন উৎপন্নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত জিনে কিছু বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটার ফলে তীব্র পেশি-ক্ষয়িষ্ণুতার প্রকাশ ঘটে। এ ধরনের অবস্থাকে **ডুসেনি মাসক্যুলার ডিস্ট্রফি** বলে। অন্য ক্ষেত্রে হয়তো রোগের অবস্থা তেমন ব্যাপক হয় না। আবার অন্যান্য ধরনের মাসক্যুলার ডিস্ট্রফিতে ডিস্ট্রফিন জিনে নয় বরং অন্যান্য জিনে মিউটেশন (পরিব্যক্তি) ঘটতে দেখা যায়।

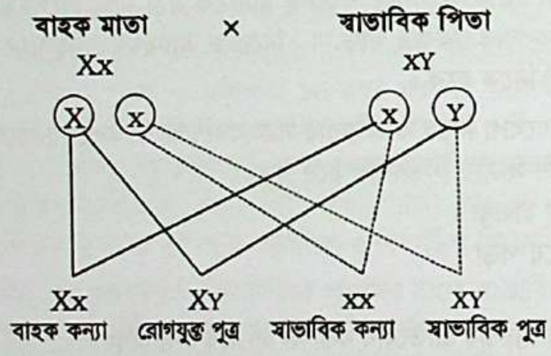

X = রোগের জিনবাহী x ক্রোমোজোম

x = স্বাভাবিক x ক্রোমোজোম

Y = Y ক্রোমোজোম

ABO ব্লাড গ্রুপ ও Rh ফ্যাক্টর-এর কারণে সৃষ্ট সমস্যা
(ABO Blood Group and Problems due to Rh Factor)

ABO ব্লাড গ্রুপ

লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমামেমব্রেনে অবস্থিত বিভিন্ন অ্যান্টিজেনের উপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের শ্রেণিবিন্যাসকে **ব্লাড গ্রুপ** বলে। অস্ট্রিয়ায় জন্ম গ্রহণকারী আমেরিকান জীববিজ্ঞানী **কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার** (Karl Landsteiner) ১৯০১ সালে মনুষ্য রক্তের শ্রেণিবিন্যাস করেন। রক্তকণিকায় কতকগুলো **অ্যান্টিজেন** (antigen)-এর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানী ল্যান্ডস্টেইনার মানুষের রক্তের যে শ্রেণিবিন্যাস করেন, তা ABO **ব্লাড গ্রুপ** বা সংক্ষেপে **ব্লাড গ্রুপ** (blood group) নামে পরিচিত। অনেক সময় একে **ল্যান্ডস্টেইনার-এর ব্লাড গ্রুপ** (Landsteiner blood group)-ও বলে। বিজ্ঞানীদের প্রচন্ড আগ্রহের ফলে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত আরও ১৩টি ব্লাড গ্রুপ আবিষ্কৃত হয়।

মানুষের রক্তে A ও B-এই দুরকম অ্যান্টিজেন থাকতে পারে। অ্যান্টিজেন A ও B-র সাথে রক্তরসে কতকগুলো স্বতঃস্ফূর্ত অ্যান্টিবডি রয়েছে। এগুলোকে বলে a (বা anti-A) এবং b (anti-B)। এভাবে অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির উপস্থিতির ভিত্তিতে সমগ্র মানবজাতির রক্তকে চারটি গ্রুপে ভাগ করা যায়, যথা-A, B, AB ও O।

A ব্লাড গ্রুপে A অ্যান্টিজেন, B ব্লাড গ্রুপে B অ্যান্টিজেন এবং AB ব্লাড

অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডির উপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের চারটি গ্রুপ

	ব্লাড গ্রুপ A	ব্লাড গ্রুপ B	ব্লাড গ্রুপ AB	ব্লাড গ্রুপ O
লোহিত রক্ত কণিকা				
প্লাজমাতে অ্যান্টিবডি	অ্যান্টিবডি B	অ্যান্টিবডি A	কোনটিই নেই	অ্যান্টিবডি A ও অ্যান্টিবডি B
লোহিত কণিকায় অ্যান্টিজেন	A অ্যান্টিজেন	B অ্যান্টিজেন	A ও B অ্যান্টিজেন	A ও B কোন অ্যান্টিজেন নেই

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

গ্রুপে A ও B উভয় অ্যান্টিজেন থাকে। O ব্লাড গ্রুপে রক্তের কণিকাঝিল্লিতে কোনো অ্যান্টিজেন নেই কিন্তু রক্তরসে a ও b দুরকম অ্যান্টিবডিই থাকে।

A-গ্রুপের রক্তের অ্যান্টিবডি B ব্লাড গ্রুপের লোহিত কণিকাকে জমিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে, B গ্রুপের রক্তের অ্যান্টিবডি A গ্রুপের রক্তের লোহিত কণিকাকে জমিয়ে দেয়। কিন্তু AB গ্রুপের রক্ত অন্য গ্রুপের রক্তকে জমাতে পারে না, কারণ সেখানে কোনো অ্যান্টিবডি নেই। একই কারণে O গ্রুপের রক্ত নিজের গ্রুপের রক্ত ছাড়া অন্য ৩টি গ্রুপের রক্তকে জমিয়ে দেয়। অর্থাৎ **কারও দেহে O গ্রুপের রক্ত থাকলে তিনি কেবল O গ্রুপের রক্ত নিতে পারবেন কিন্তু দেওয়ার সময় সব গ্রুপকেই রক্ত দিতে পারবেন।**

[অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি সম্পর্কে দশম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে]

Rh ফ্যাক্টর

১৯৪০ সালে **কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার** এবং **উইনার** (Karl Landsteiner and Wiener) **রেসাস** বানরের *(Macaca mulatta)* রক্ত খরগোসের শরীরে প্রবেশ করিয়ে খরগোসের রক্তরসে এক ধরনের অ্যান্টিবডি উৎপাদনে সক্ষম হন। এ ফলাফল থেকে বিজ্ঞানী দুজন ধারণা করেন যে, মানুষের লোহিত কণিকার ঝিল্লিতে রেসাস বানরের লোহিত কণিকার ঝিল্লির মতো এক প্রকার অ্যান্টিজেন রয়েছে। রেসাস বানরের নাম অনুসারে ঐ অ্যান্টিজেনকে **রেসাস ফ্যাক্টর** (Rhesus factor) বা সংক্ষেপে Rh factor বলে।

লোহিত রক্তকণিকার প্লাজমামেমব্রেনে Rh ফ্যাক্টরের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির ভিত্তিতে রক্তের শ্রেণিবিন্যাসকে **Rh ব্লাড গ্রুপ** বলে। Rh ফ্যাক্টরবিশিষ্ট রক্তকে **Rh^+** (Rh পজিটিভ) এবং Rh ফ্যাক্টরবিহীন রক্তকে **Rh^-** (Rh নেগেটিভ) রক্ত বলে।

বিজ্ঞানী Fisher মত প্রকাশ করেন যে, Rh ফ্যাক্টর মোট ৬টি সাধারণ অ্যান্টিজেনের সমষ্টি বিশেষ। এদের ৩ জোড়ায় ভাগ করা যায়, যেমন–C, c; D, d; E, e। এদের মধ্যে C, D, E হচ্ছে মেন্ডেলীয় **প্রকট** এবং c, d, e হচ্ছে মেন্ডেলীয় **প্রচ্ছন্ন**। মানুষের লোহিত কণিকায় এক সংগে ৩টি অ্যান্টিজেন থাকে কিন্তু প্রতি জোড়ার দুটি উপাদান কখনও একসাথে থাকে না, যেমন-CDE, CDe, cDE এমন সন্নিবেশ সম্ভব, CDd অসম্ভব। মেন্ডেলীয় প্রকট অ্যান্টিজেন (C, D, E) যে রক্তে থাকে তাকে **Rh^+** রক্ত বলে। যে রক্তে মেন্ডেলীয় প্রচ্ছন্ন অ্যান্টিজেন (c, d, e) থাকে তাকে Rh^- রক্ত বলে।

বিভিন্ন ব্লাড গ্রুপের বৈশিষ্ট্য

ব্লাড গ্রুপের নাম	যাদেরকে রক্ত দান করতে পারে	যাদের রক্ত গ্রহণ করতে পারে
A^+	A^+ AB^+	A^+ A^- O^+ O^-
O^+	O^+ A^+ B^+ AB^+	O^+ O^-
B^+	B^+AB^+	B^+ B^- O^+ O^-
AB^+	AB^+	সব গ্রুপের
A^-	A^+ A^- AB^+ AB^-	A^- O^-
O^-	সব গ্রুপকে	O^-
B^-	B^+ B^- AB^+ AB^-	B^- O^-
AB^-	AB^+ AB^-	AB^- A^- B^- O^-

Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা (Problems due to Rh Factor)

১. **রক্ত সঞ্চালনে জটিলতা** (Complexity in Blood Transfusion) : Rh^- রক্তবিশিষ্ট ব্যক্তির রক্তে Rh^+ বিশিষ্ট রক্ত দিলে প্রথমবার গ্রহীতার দেহে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না, কিন্তু গ্রহীতার রক্তরসে ক্রমশ Rh^+ অ্যান্টিজেনের বিপরীত অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হবে। এই অ্যান্টিবডিকে **অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর** বলে।

গ্রহীতা যদি দ্বিতীয়বার দাতার Rh^+ রক্ত গ্রহণ করে তা হলে গ্রহীতার রক্তরসের অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টরের প্রভাবে দাতার লোহিত রক্তকণিকা জমাট বেঁধে পিন্ডে পরিণত হবে। তবে একবার সঞ্চারণের পর যদি গ্রহীতা আর ঐ রক্ত গ্রহণ না করে তা হলে ধীরে ধীরে তার রক্তে উৎপন্ন সমস্ত অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর নষ্ট হয়ে যায় এবং গ্রহীতা স্বাভাবিক রক্ত ফিরে পায়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. গর্ভধারণজনিত জটিলতা (Complexity in Pregnancy): সন্তানসম্ভবা মহিলাদের ক্ষেত্রে Rh ফ্যাক্টর খুব গুরুত্বপূর্ণ। একজন Rh^- (Rh নেগেটিভ) মহিলার সঙ্গে Rh^+ (Rh পজিটিভ) পুরুষের বিয়ে হলে তাদের প্রথম সন্তান হবে Rh^+, কারণ Rh^+ একটি প্রকট বিশিষ্ট। ভ্রূণ অবস্থায় সন্তানের Rh^+ ফ্যাক্টরযুক্ত লোহিত কণিকা অমরার মাধ্যমে মায়ের রক্তে এসে পৌছাবে, ফলে মায়ের রক্ত Rh^- হওয়ায় তার রক্তরসে অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর (অ্যান্টিবডি) উৎপন্ন হবে।

অ্যান্টি Rh ফ্যাক্টর মায়ের রক্ত থেকে অমরার মাধ্যমে ভ্রূণের রক্তে প্রবেশ করলে ভ্রূণের লোহিত কণিকাকে ধ্বংস করে, ভ্রূণও বিনষ্ট হয় এবং গর্ভপাত ঘটে। এ অবস্থায় শিশু জীবিত থাকলেও তার দেহে প্রচন্ড রক্তাল্পতা এবং জন্মের পর জন্ডিস রোগ দেখা দেয়। এ অবস্থাকে এরিথ্রোব্লাস্টোসিস ফিটালিস (erythroblastosis foetalis) বলে।

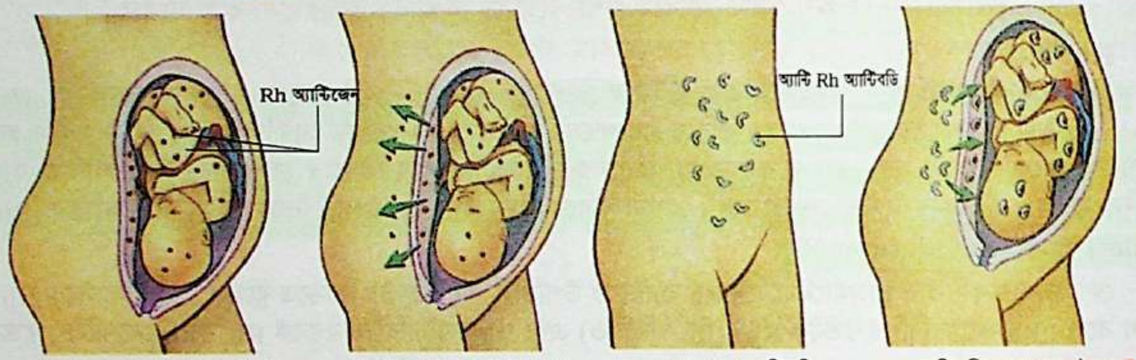

ভ্রূণের রক্ত Rh^+; মায়ের রক্ত Rh^- | অমরার মাধ্যমে RBC, ভ্রূণদেহ থেকে মাতৃদেহে পরিবাহিত হচ্ছে | মাতৃদেহে অ্যান্টিবডি উৎপন্ন হচ্ছে | অ্যান্টিবডি ভ্রূণের Rh^+ যুক্ত RBC.-কে আক্রমণ করছে

চিত্র : Rh ফ্যাক্টরের কারণে সৃষ্ট সমস্যা

যেহেতু Rh বিরোধী অ্যান্টিবডি মাতৃদেহে খুব ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয় তাই প্রথম সন্তানের কোনো ক্ষতি হয় না এবং সুস্থই জন্মায়। কিন্তু পরবর্তী গর্ভাধান থেকে বিপত্তি শুরু হয় এবং ভ্রূণ এ রোগে ভুগে মারা যায়। তাই বিয়ের আগে হবু বর-কনের রক্ত পরীক্ষা করে নেয়া উচিত এবং একই Rh ফ্যাক্টরভুক্ত (হয় Rh+ নয়তো, Rh—) দম্পতি হওয়া উচিত। তবে সুখের কথা এই যে, পৃথিবীর বেশীর ভাগ অংশে Rh— বৈশিষ্ট্য দুর্লভ।

১১.২ : বিবর্তন বা অভিব্যক্তি (Evolution)

বিবর্তনতত্ত্বের ধারণা (The concept of Evolution)

কোনো জীবের জনগোষ্ঠীর উত্তরাধিকারযোগ্য বৈশিষ্ট্যে (জিনগত বৈশিষ্ট্য) বংশপরম্পরায় পরিবর্তন, সঞ্চারণ ও অভিযোজনের প্রক্রিয়াকে **বিবর্তন** বলে।। বিবর্তনের ইংরেজী Evolution শব্দটি প্রকৃত পক্ষে ল্যাটিন শব্দ "evolvere" অর্থ বিকশিত হওয়া বা ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হওয়া শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

জীবজগতে যে বিবর্তন ঘটছে এ প্রত্যয় জীববিজ্ঞানীদের মধ্যে জন্মেছে বহু আগেই। কিন্তু ঠিক কীভাবে বিবর্তন হচ্ছে এ ব্যাপারে কেউ ঐকমত্যে পৌছাতে পারেননি। এ মতানৈক্যের মূল কারণ হলো বিবর্তন অত্যন্ত ধীর প্রক্রিয়া যা সহজে অনুধাবন ও অবলোকন করা যায় না এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করাও সম্ভব নয়। কয়েকজন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক তাঁদের লেখায় বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু কাল্পনিক ধারণা রেখে গেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানীরা সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন যে বিবর্তনের ফলেই নতুন নতুন জীবের সৃষ্টি হয়েছে। বিবর্তনের ধারণা আধুনিককালের হলেও দেখা যায় প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকরা বিবর্তন সম্বন্ধে অনেক আগেই চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। এম্পেডোক্লিস (Empedocles, 495–435 B.C)-কে বিবর্তনের জনক বলে অভিহিত করা হয়। যোগ্যতমের আকস্মিক সৃষ্টি এবং অযোগ্যের বিলুপ্তি সম্বন্ধে তিনি জোরালো ধারণা পোষণ করতেন। ডেমোক্রিটাস (Democritus, 460–357 B.C.) এ ধারণা পোষণ করতেন যে শরীরের যে কোন অঙ্গ পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়। বিখ্যাত দার্শনিক **অ্যারিস্টটল** (Aristotle, 384-322 B.C)-এর মনেও এ ধারণা জন্মেছিল যে নিম্নস্তরের জীব কতকগুলো ধারাবাহিক নিয়মের মধ্য দিয়ে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছে। অ্যারিস্টটলের পরে ফরাসি বিজ্ঞানী **বুফোন** (Buffon, 1707-1788) মত প্রকাশ করেন যে পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবেরও পরিবর্তন হচ্ছে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

পরিবেশের প্রভাবে প্রথমে জীবদেহে সামান্য আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটতে পারে এবং পরে ঐ পরিবর্তন বহুকাল ধরে বংশানুক্রমে পুঞ্জীভূত হয়ে ক্রমে বড় রকমের প্রভেদ সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে কয়েকজন বিজ্ঞানী উপযুক্ত তথ্য প্রমাণসহ বিবর্তনের কলা-কৌশল সম্বন্ধে মতবাদ প্রচার করেন। এগুলোর মধ্যে ফরাসি প্রকৃতিবিদ **জ্যা ব্যাপটিস্ট ল্যামার্ক**, ইংরেজ প্রকৃতিবিদ **চার্লস ডারউইন**, ডাচ বিজ্ঞানী **ডে ভ্রিস** (de Vries), জার্মান বিজ্ঞানী **আগস্ট ভাইজম্যান**-এর মতবাদ ও **সংশ্লেষ** মতবাদই প্রধান।

বিবর্তনের মতবাদসমূহ (Theories of Evolution)

বিবর্তনের বাস্তবতা প্রমাণিত হওয়ার পর দ্বিতীয় যে প্রাসঙ্গিক বিষয় এসে পড়ে তা হচ্ছে বিবর্তনের **পদ্ধতি** অর্থাৎ **কীভাবে বিবর্তন ঘটে**। এ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করার জন্য বিজ্ঞানের অগ্রগতির উপর নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একাধিক মতবাদ প্রচলিত হয়েছে। নিচে জৈব বিবর্তনের প্রধান দুটি মতবাদ, **ল্যামার্কবাদ** ও **ডারউইনবাদ** এবং **নব্য-ডারউইনবাদ** সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ল্যামার্কিজম বা ল্যামার্কবাদ বা অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার মতবাদ (Lamarckism or Theory of Inheritance of Acquired Characters)

ল্যামার্ক একজন ফরাসী দার্শনিক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম **জাঁ বাপ্টিস্ট পিয়েরে এন্টোইনে দ্য মনেট শেফালিয়ের দ্য ল্যামার্ক** (Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de Lamarck. 1744-1829)। প্রথমে তিনি ফরাসী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন, তারপর উদ্ভিদবিজ্ঞানী হিসেবে জীবন শুরু করেন। কিন্তু পরবর্তী জীবনে প্রাণীর উপর গবেষণা করেই বেশি সময় ব্যয় করেছেন। তিনি **বায়োলজি** (Biology) শব্দের প্রবর্তক এবং প্রাণিজগতকে **মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী** এ দুভাগে বিভক্ত করেন। একটি সুসংগঠিত জৈব বিবর্তনবাদের প্রথম প্রবক্তা হিসেবে ল্যামার্ক সুপরিচিত। তাঁর মতবাদটি, **অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার মতবাদ** নামে অভিহিত।

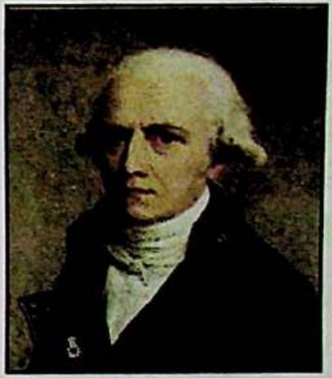
J.B. Lamarck

ল্যামার্ক-এর সূত্রসমূহ

ডডসন (Dodson) ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে বিবর্তন সম্বন্ধে ল্যামার্ক-এর বিস্তৃত ধারণাকে ৪টি সূত্রের অধীন করে ব্যাখ্যার সুবিধা করে দেন। নিচে সূত্রগুলো উল্লেখ করা হলো:

ক. প্রথম সূত্র-**বৃদ্ধি** : প্রত্যেক জীব তার জীবনকালে অন্তঃজীবনী শক্তির প্রভাবে দেহের আকার এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি ঘটাতে চায়।

খ. দ্বিতীয় সূত্র-পরিবেশের প্রভাব এবং জীবের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও আঙ্গিক পরিবর্তন : সদা পরিবর্তনশীল পরিবেশে অভিযোজনের জন্য সৃষ্ট অভাববোধের উদ্দীপনা এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে দেহের আঙ্গিক পরিবর্তন ঘটে।

গ. তৃতীয় সূত্র-ব্যবহার ও অব্যবহার : ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে দেহের একটি বিশেষ অঙ্গ সুগঠিত, কার্যক্ষম ও বড় হতে পারে, আবার অব্যবহারে অঙ্গটি ক্রমশ ক্ষুদ্র হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

ঘ. চতুর্থ সূত্র-অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার : প্রতিটি জীবের জীবদ্দশায় অর্জিত সকল বৈশিষ্ট্য ভবিষ্যৎ বংশধরে সঞ্চারিত হয়।

ল্যামার্ক-এর সূত্রগুলোর ব্যাখ্যা

ক. বৃদ্ধি : জীবের জীবদ্দশায় অন্তঃজীবনী শক্তির প্রভাবে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত দেহের আকার এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উভয়েরই বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে। শ্রেণিবিন্যাসের বিভিন্ন ধাপ লক্ষ করলেও এ সত্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন-Cnidaria থেকে Chordata পর্যন্ত প্রাণিগোষ্ঠির প্রত্যেক ধাপেই দেখা যায় দেহাকৃতি বৃদ্ধির একটি সাধারণ প্রবণতা।

খ. পরিবেশের প্রভাব এবং জীবের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও আঙ্গিক পরিবর্তন : পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল। এ পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার জন্য যে অভাববোধের সৃষ্টি হয় তা পূরণের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করায় এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে জীবদেহে নতুন অঙ্গের সৃষ্টি হয় বা অঙ্গের পরিবর্তন ঘটে।

ল্যামার্ক মনে করতেন, পরিবেশ উদ্ভিদকে সরাসরি প্রভাবিত করে ফলে নতুন পরিবেশে দেখা দেয় উদ্ভিদের নতুন

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

অঙ্গ। প্রাণীর বেলায় পরিবেশ প্রাণিদের মস্তিষ্ক বা স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে পরিচালিত করে, তখন প্রাণী যা চায় তাই পায়। যেমন-জিরাফের স্নায়ুতন্ত্রই তাকে বাধ্য করেছে ঘাড় উঁচু করে গাছের পাতা খাওয়ার জন্য।

গ. ব্যবহার ও অব্যবহার : পরিবর্তনশীল পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার জন্য নতুন সৃষ্ট বা পরিবর্তিত অঙ্গটি যদি জীবদ্দশার পরবর্তী সময়ে ক্রমাগত ব্যবহৃত হয় তা হলে তা সুগঠিত, কার্যক্ষম ও বড় হবে। অন্যদিকে, জীবদ্দশার পরবর্তী সময়ে অঙ্গটির অব্যবহারে তা ক্রমশ কার্যক্ষমতা হারিয়ে ছোট হতে থাকে, অবশেষে বিলুপ্ত হয়ে যায়। নিচে ব্যবহার ও অব্যবহারের উদাহরণ দেয়া হলো।

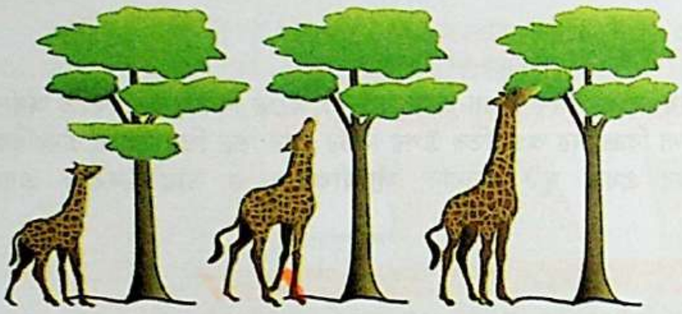

চিত্র ১১.২.২ : জিরাফের গলা লম্বা হওয়ার ল্যামার্কীয় ব্যাখ্যা

ব্যবহার : (i) জিরাফের আদি পুরুষের গলা ও সামনের পা দুটি এখনকার ঘোড়ার মত খাটো ছিল এবং এরা ঘাস বা ছোট ছোট গাছ আহার করতো। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে চারণভূমির অভাব ঘটলে এরা গাছের উঁচু শাখা-প্রশাখার পাতা খেতে শুরু করে। উঁচু ডাল-পালা থেকে পাতা খাওয়ার জন্য সৃষ্ট ইচ্ছা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী গলার দৈর্ঘ্য বংশ পরম্পরায় একটু করে বাড়তে থাকে। এভাবে খাটো গ্রীবাধারী পূর্বপুরুষ থেকে বর্তমান যুগের লম্বা গ্রীবাধারী জিরাফের উদ্ভব ঘটেছে। (ii) হাঁস, পেলিকান, হাড়গিলা প্রভৃতি পাখি আদিকালে স্থলচর ছিল। খাদ্য সংগ্রহের জন্য পানিতে সাঁতারের প্রয়োজনে পায়ের অধিক ব্যবহারের ফলে পায়ের আঙ্গুলের গোড়া থেকে চামড়া বৃদ্ধি পেয়ে লিপ্তপদ (webbeed feet) বিশিষ্ট পাখির উদ্ভব ঘটায়।

অব্যবহার : (i) উটপাখির পূর্ব পুরুষেরা আগে উড়তে পারত। কিন্তু ওদের ডানাদুটি ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হয়েছে। (ii) মানুষের পূর্বপুরুষের লেজ ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে কক্কিক্স (coccyx)-এ রূপান্তরিত হয়েছে।

ঘ. অর্জিত বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকার : প্রতিটি জীবের জীবদ্দশায় অর্জিত সকল বৈশিষ্ট্য ভবিষ্যৎ বংশধরে সঞ্চারিত হবে। এভাবে, বংশ পরম্পরায় পরিবর্তিত চরিত্র সঞ্চারিত হতে থাকে এবং নতুন নতুন পরিবর্তিত বৈশিষ্ট্য অর্জিত হতে থাকে। ফলে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একটি প্রজাতির সদস্যদের সাথে এদের পূর্ব পুরুষের আর তেমন মিল থাকে না। অর্থাৎ উদ্ভব ঘটে এক নতুন প্রজাতির।

ল্যামার্কিজমের সমালোচনা

ল্যামার্কের সমকালীন অনেকে সাময়িক স্বীকৃতি দিলেও এ মতবাদ বিজ্ঞানীমহলে অনেক কারণে সমর্থনযোগ্য হয়নি, যেমন: ল্যামার্কের ব্যবহার ও অব্যবহার তত্ত্বটি সত্য নয়; কারণ, শিরা ও ধমনি ক্রমাগত ব্যবহৃত হলেও এদের আকার ও আয়তন কখনো বৃদ্ধি পায় না; বারংবার ব্যবহারের ফলে কোন অঙ্গের বৃদ্ধি হয়ত হতে পারে। কিন্তু ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে কোন অঙ্গের নিষ্ক্রিয়তা কিংবা অবলুপ্তির ঘটনাও বিরল নয়; অর্জিত গুণের বংশানুক্রম সমর্থনযোগ্য নয়। লেজ কাটা কুকুরের বাচ্চা জন্মসূত্রে কখনই লেজবিহীন হয় না; অভাব বোধ ও প্রয়োজনের তাগিদে অঙ্গ সৃষ্টির ধারণা সমর্থনযোগ্য নয়। আকাশে উড়বার আকাঙ্ক্ষায় কোন মানুষের মনে পাখির মত ডানার জন্য অভাব বোধ মানুষের দেহে কখনো ডানা গজাবে না; ইন্দ্রিয় সৃষ্টির পূর্বে কোন ইন্দ্রিয়ের জন্য অভাব অনুভূত হওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না; ল্যামার্ক ধারণা করতেন ক্রিয়ার ফলেই কোন অঙ্গের সৃষ্টি হয়। কিন্তু অঙ্গ না থাকলে তার ক্রিয়ার প্রশ্ন অবান্তর।

ডারউইনিজম বা প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ
(Darwinism or Theory of Natural Selection)

চার্লস রবার্ট ডারউইন (১৮০৯–১৮৮২) একজন ব্রিটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী (naturalist) ছিলেন। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত "Origin of Species By Means of Natural Selection" নামক গ্রন্থে তিনি অভিব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত ও জোরালো মতবাদ প্রকাশ করেন। এ মতবাদ **প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ** বা **ডারউইনিজম** নামে পরিচিত। এ মতবাদের মাধ্যমে তিনি অভিব্যক্তির কলাকৌশল ও প্রবাহ সম্পর্কে বাস্তব তথ্যাবলী প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি উদ্ভিদ, প্রবাল, মানুষের উদ্ভব, আগ্নেয়গিরির ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণমূলক গ্রন্থও প্রণয়ন করেন।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

আধুনিক চিন্তা জগতের অন্যতম মহাস্থপতি ছিলেন **চার্লস রবার্ট ডারউইন** (Charles Robert Darwin)। তিনিই সর্বপ্রথম আপন অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে গভীর নিষ্ঠা ও মনোযোগের সাথে বিবর্তনের ঘটনাবলিকে যুক্তিনিষ্ঠ ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তোলেন।

১৮৩১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর **এইচ. এম. এস. বিগল** (Her Majestic Service Beagle) নৌজাহাজের একজন অবৈতনিক প্রকৃতিবিদ হিসেবে **দক্ষিণ আটলান্টিক** এবং **প্রশান্ত মহাসাগর** জরীপদলের সাথে ইংল্যান্ডের **ডেভেনপোর্ট** (Devenport) থেকে যাত্রা শুরু করেন।

প্যাটাগোনিয়া, ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ, গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জ, সেন্ট জাগে দ্বীপ, ব্রাজিল, তাহিতি থেকে অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ড হয়ে ভারত মহাসাগর ও উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়ে সুদীর্ঘ পাঁচ বছর (১৮৩১-১৮৩৬) পর বিগল ইংল্যান্ডে ফিরে আসে। এ সমুদ্র ভ্রমণে ডারউইন অসংখ্য জীবাশ্ম, খনিজ পদার্থ ও পাথর সংগ্রহ করেন।

চিত্র ১১.২.৩ : এইচ. এম. এস. বিগল

সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে তিনি কয়েক খন্ড বই রচনা করেন। পরবর্তী প্রায় ২০ বছর ধরে তিনি প্রজাতি উৎপত্তির সমস্যা-ঘটিত হাজারো প্রমাণ সংগ্রহ করে প্রজাতি উদ্ভবের খসড়া রচনা করেন। পরবর্তী সময়ে প্রাকৃতিক নির্বাচনের যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ ও প্রমাণাদিসহ ১৮৫৯ সালের ২৪শে নভেম্বর "On the Origin of Species by Means of Natural Selection" শিরোনামে ডারউইনের বিশ্ব কাঁপানো, যুগান্ত সৃষ্টিকারী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

১৮৮২ সালের ১৯ এপ্রিল ৭৩ বছর বয়সে ডারউইন মারা যান। ওয়েস্টমিনিস্টার এবিতে বিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ডারউইনবাদ বা ডারউইনিজম (Darwinism)

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে **ডারউইন** ও **ওয়ালেস** (Wallace) জৈব বিবর্তন সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তাই পরবর্তীতে ডারউইনবাদ নামে পরিচিতি পেয়েছে। এ মতবাদের ভিত্তি দুটি; যথা- (১) জীবজগতের কতগুলো বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণ এবং (২) এ বাস্তব ঘটনাবলীর ফলাফল প্রকাশ। ভিত্তিমূলদুটির উপর প্রতিষ্ঠিত ডারউইনবাদ বিবর্তন প্রক্রিয়াকে ৬টি ধাপে ভাগ করেছে। প্রত্যেক জীব ঐ ধাপগুলো অতিক্রম করেই একেকটি প্রজাতিতে পরিণত হয়। সর্বশেষ ধাপটির বক্তব্য অনুযায়ী ডারউইনবাদকে **প্রাকৃতিক নির্বাচন** মতবাদ বলা হয়, কারণ **প্রজাতি উদ্ভবের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রকৃতিই নির্বাচন করে থাকে কারা টিকে থাকতে সমর্থ বা অসমর্থ।**

নতুন প্রজাতি সৃষ্টিতে প্রয়োগযোগ্য ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ কয়েকটি পৃথক ও বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণ ও পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের পারস্পরিক সম্পর্কের সার্থক সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। নিচের ছকে মৌলিক সিদ্ধান্তগুলো তুলে ধরা হলো।

ঘটনা প্রবাহ	সিদ্ধান্ত
১. বংশবৃদ্ধির উচ্চহার (Prodigality of production) ২. খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা (Limitation of food and space)	জীবন সংগ্রাম
৩. জীবন সংগ্রাম (Struggle for existence) ৪. পরিবৃত্তির অসীম ক্ষমতা (Omnipotence of variation amongst the individual)	যোগ্যতমের জয়
৫. যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the fittest) ৬. প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection)	নতুন প্রজাতির উৎপত্তি

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

নিচে সংক্ষেপে ডারউইন-এর মতবাদের ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

১. বংশবৃদ্ধির উচ্চহার (Prodigality of production) : প্রাণী–উদ্ভিদ নির্বিশেষে **জ্যামিতিক হারে** (geometrical progression) বংশবৃদ্ধির প্রবণতা দেখায়। ফলে বাঁচার সম্ভাবনা সম্পন্ন জীবের সংখ্যার চেয়ে জন্ম নেওয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় বহুগুণ বেশি। উদাহরণস্বরূপ-একটি স্যামন মাছ (Salmon fish) এক ঋতুতেই দুই কোটি আশি লক্ষ ডিম পাড়ে। সমস্ত ডিম যদি পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিণত হয় এবং অনুরূপভাবে ডিম পাড়ে তবে, পৃথিবীর জলভাগ কয়েক বছরের মধ্যে কেবল এক প্রজাতির প্রাণী দিয়েই পূর্ণ হয়ে যাবে।

২. খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা (Limitation of food & space) : প্রাকৃতিক খাদ্যের উৎপাদন হার এবং ভূপৃষ্ঠের আয়তন সীমিত। এ অবস্থায় জীবের জ্যামিতিক হারে বংশবৃদ্ধির ফলে এদের ভিতর পর্যাপ্ত আহার ও যোগ্য বাসস্থানের জন্য প্রতিযোগিতা শুরু হবে অর্থাৎ এরা প্রাকৃতিক বাধার সম্মুখীন হবে।

৩. জীবন সংগ্রাম (Struggle for existence) : ডারউইনের মতে, প্রাকৃতিক বাধা কার্যকর হয় জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে। একদিকে ক্রমাগত বংশবৃদ্ধি অন্যদিকে পরিমিত খাদ্য ও বাসস্থানের যোগান জীবনকে প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দেয়। এতে বেঁচে থাকার উপযুক্ত জীব বাছাই হয়ে যায়। এটিই **জীবন সংগ্রাম** বা অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম। জীবন সংগ্রাম প্রধানত নিচে বর্ণিত তিন ভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে।

ক. অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (Intra-specific struggle) : একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের খাদ্য ও বাসস্থান একই রকম হওয়ায় এদের সদস্য সংখ্যা বেড়ে গেলে নিজেদের মধ্যেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। একেই **অন্তঃপ্রজাতিক** বা **স্বপ্রজাতির** সঙ্গে সংগ্রাম বলা হয়। যেমন– বট গাছের নিচে লক্ষ লক্ষ বীজ পতিত হলেও এ গাছের নিচে সাধারণত বটের চারা দেখতে পাওয়া যায় না। কেননা এত বিপুল সংখ্যক বীজের অঙ্কুরোদগমের জন্য পর্যাপ্ত উপাদান গাছ তলায় অল্প জায়গায় থাকেনা। বরং কিছু সংখ্যক বীজ পাখি ও অন্য মাধ্যমে বাহিত হয়ে কোনো ফাঁকা জায়গায় পতিত হলে সেখানে চারা গজায় ও পরিণতি লাভ করে। আরেকটি উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, একটি দ্বীপে নির্দিষ্ট প্রজাতির তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে গেলে খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত হওয়ায় এরা নিজেদের মধ্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। সবল প্রাণিগুলো দুর্বল প্রাণিদের প্রতিহত করে, ফলে দুর্বল প্রাণিগুলো কিছু দিনের মধ্যেই অনাহারে মারা যায়।

খ. আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম (Inter-specific struggle) : যে কোন দুটি বা ততোধিক প্রজাতির মধ্যে বাঁচার জন্য যে প্রতিযোগিতা ঘটে তাকেই **আন্তঃপ্রজাতিক** বা **বিষম প্রজাতির সঙ্গে সংগ্রাম** বলা হয়। যেমন- ব্যাঙ একদিকে কীটপতঙ্গ ভক্ষণ করে, অন্যদিকে ব্যাঙ সাপ কর্তৃক ভক্ষিত হয়। আবার ময়ুর কর্তৃক ব্যাঙ ও সাপ উভয়েই ভক্ষিত হয়। এভাবে নিতান্ত জৈবিক কারণে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে **খাদ্য-খাদক** সম্পর্কযুক্ত এক নিখুঁত বাস্তব জীবন সংগ্রাম গড়ে উঠে।

গ. পরিবেশগত সংগ্রাম (Environmental struggle) : জীব যে পরিবেশে বাস করে এবং সেখানে যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, তা থেকে রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম করতে হয় তাকে **পরিবেশগত সংগ্রাম** বলে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, অধিক তাপ ও শৈত্য, মহামারী, প্লাবন ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় জীবকূলের ব্যাপক ক্ষতি করে। বরফ যুগের কবলে পড়ে **ম্যামথ** (mammoth) সহ অনেক প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রকৃতি তার ভারসাম্য বজায় রাখতে এ ব্যবস্থা নিয়ে থাকে।

৪. সার্বজনীন পরিবৃত্তি বা প্রকরণের উপস্থিতি (Universal occurrence of variations) : বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে কোন দুটি জীবই হুবহু একরকম নয়। এমনকি একই পিতামাতার সন্তানাদির মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও তারা কখনই হুবহু এক রকম নয়, তাদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকেই। আর এই পার্থক্যগুলোই **পরিবৃত্তি** বা **প্রকরণ** নামে পরিচিত। ডারউইন মনে করতেন যে, জীবন সংগ্রামের ফলে জীবদেহে যে পরিবৃত্তি ঘটে তা বংশগতির মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়। পরিবৃত্তি দুধরনের : যথা–**ধারাবাহিক পরিবৃত্তি** এবং **অধারাবাহিক পরিবৃত্তি**। ধারাবাহিক পরিবৃত্তিতে জীবের এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ঘটে। এসব পরিবর্তন পারিপার্শ্বিকতার সাথে অভিযোজিত হয়ে ক্রমশ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং নতুন প্রজাতি সৃষ্টির লক্ষে এগিয়ে যায়। **ডারউইন** তাই পরিবৃত্তিকে বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল হিসেবে বিবেচনা করেন। অধারাবাহিক পরিবৃত্তি আকস্মিক, অনিয়মিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্ষতিকর। কাজেই, প্রজাতি সৃষ্টির ব্যাপারে পরিবৃত্তির তেমন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৫. যোগ্যতমের উদ্বর্তন (Survival of the fittest) : জীবন সংগ্রামে যে জীব যোগ্য ও অনুকূল প্রকরণ গ্রহণ করতে সমর্থ হবে শুধু সেই প্রতিদ্বন্দ্বী জীবই জীবন সংগ্রামে টিকে থাকবে। পক্ষান্তরে জীবন সংগ্রামে যে অযোগ্য সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই দেখা যায় যে, অনুকূল প্রকরণের ফলে জীব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে যোগ্যতম বলে বিবেচিত হয়। প্রকরণ সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যগুলো সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চারিত হলে সে জীব জীবন সংগ্রামে টিকে যায়। যেসব জীবে সুবিধাজনক/অনুকূল প্রকরণ ঘটে না সেগুলো ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ কারণে ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়েছে।

৬. প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection) : যে সব জীবের মধ্যে অনুকূল পরিবৃত্তি আছে প্রকৃতি তাদের নির্বাচন ও লালন করে। সুবিধাজনক পরিবৃত্তিধারী জীব পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে এবং অযোগ্যদের তুলনায় বেশি হারে বংশবিস্তার করতে পারে। এদের বংশধরের মধ্যে পরিবৃত্তিগুলো উত্তরাধিকার সূত্রে পরিবাহিত হয়। যাদের সুবিধাজনক পরিবৃত্তি বেশি থাকে প্রকৃতি পুনরায় তাদের নির্বাচন করে। এভাবে যুগ-যুগ ধরে প্রকৃতির মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে প্রাণী ও উদ্ভিদের **নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়**।

ডারউইনবাদ-এর সমালোচনা (Criticism of Darwinism)

বিবর্তনের ক্ষেত্রে ডারউইনের মতবাদ নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ও সাড়া জাগানো অবদান। বিশ্বব্যাপী সমর্থিত হলেও মতবাদটি সর্বজনস্বীকৃত নয়। কারণ এ মতবাদে যেমন কতকগুলো যৌক্তিক ও প্রশংসনীয় দিক আছে তেমন কতকগুলো অযৌক্তিক দিকও রয়েছে। নিচে যৌক্তিক ও অযৌক্তিক দিকগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

যৌক্তিক দিক বা সফলতা

১. ডারউইনবাদের মূল বক্তব্যগুলো (যেমন–বংশবৃদ্ধির উচ্চহার, জীবন সংগ্রাম ইত্যাদি) অনেকাংশেই বাস্তব।
২. বিবর্তনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আজ পর্যন্ত যেসব প্রমাণ পাওয়া গেছে তা ডারউইনবাদের সমর্থক।
৩. অতীতের অনেক বিশালদেহী জীব জীবন সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে প্রকৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।
৪. অভিযোজনে ব্যর্থ বহু প্রাণী ও উদ্ভিদের বিলুপ্তি ডারউইনবাদকে সমর্থন যোগায়।
৫. প্রকৃতিতে একই প্রজাতির দুটি জীব হুবহু একরূপ নয়। এটিই প্রকৃতিতে প্রকরণের উপস্থিতি প্রমাণ করে।

অযৌক্তিক দিক বা দুর্বলতা

১. জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তনের কথা বলা হলেও, কিভাবে উপযুক্ত প্রকরণের উদ্ভব হয় সেকথা বলা হয়নি।
২. জীবজগতের সব নির্বাচন প্রাকৃতিক নির্বাচন নয়।
৩. প্রাকৃতিক নির্বাচন কোন জীবদেহে নিষ্ক্রিয় অঙ্গের উপস্থিতি ব্যাখ্যা করতে অক্ষম।
৪. ডারউইন যে কোন ধরনের প্রকরণ বা পরিবৃত্তিকে বংশগত বলে মনে করতেন। কিন্তু আমরা জানি কেবল জননকোষে সংঘটিত প্রকরণগুলোই বংশানুসরণযোগ্য।
৫. একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তার ভিত্তিতে নতুন প্রজাতি সৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম।

নব্য-ডারউইনবাদ (Neo-Darwinism)

ডারউইনের মতবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর দেড়শ বছরের বেশি অতিবাহিত হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে জীব বিজ্ঞানের গবেষণায় অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান মিলেছে। বিশেষ করে বিগত শতাব্দীতে জিন, ক্রোমোজোম ও মিউটেশন সম্পর্কে ব্যাপক চর্চা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় প্রাথমিক পর্যায়ে **ভাইজম্যান** (August Weismann) ও তাঁর অনুগামীরা ডারউইনের মতবাদের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে নতুন জ্ঞানের আলোকে সবল করে তোলেন। ভাইজম্যান ও তাঁর অনুগামীদের মাধ্যমে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনবাদের এ নবমূল্যায়নকে **নব্য-ডারউইনবাদ** বলা হয়।

ভাইজম্যানের গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয় যে জীবদেহে পরিবেশ থেকে উদ্ভূত বাহ্য প্রভাব বংশানুসৃত হয় না। তিনি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ইঁদুর ছানার লেজ কেটে কোনো প্রজন্মে ছানার লেজের দৈর্ঘ্য কমতে দেখেননি। ১৮৯৬ সালে তিনি তাঁর **জার্মপ্লাজম-সোমাটোপ্লাজম** (Germplasm-Somatoplasm) তত্ত্বে উল্লেখ করেন যে জীবের জননাঙ্গে অবস্থিত জননকোষে থাকে জার্মপ্লাজম, আর দেহের অবশিষ্ট কোষে (somatic cell) থাকে **সোমাটোপ্লাজম**। পরিবেশের প্রভাবে সোমাটোপ্লাজমে পরিবর্তন ঘটলেও জার্মপ্লাজমে কোন পরিবর্তন নাও ঘটতে পারে। তাই কেবল সোমাটোপ্লাজমে সংঘটিত পরিবর্তন বংশগতি লাভে সমর্থ হয় না। সুতরাং পরিবেশের সব প্রত্যক্ষ প্রভাবই বিবর্তনের শর্ত হতে পারে না।

নব্য-ডারউইনবাদীদের মধ্যে ভাইজম্যান ছাড়া **হাক্সলি** (T.H. Huxley), **স্পেনসার** (H. Spencer), **জর্ডান** (B.S. Jordan), **গ্রে** (Asa Gray) এবং **হেকেল** (E. Haeckel) এর নাম উল্লেখযোগ্য। নব্য-ডারউইনবাদ এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে–

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

১. প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে পপুলেশন পর্যায়ে।
২. অভিযোজনের কারণ একাধিক, প্রাকৃতিক নির্বাচন এগুলোর মধ্যে একটি।
৩. প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে জীবের জার্মপ্লাজম স্তরে। আর জার্মপ্লাজমে সংঘটিত পরিবর্তনই বংশগতি লাভে সমর্থ হয়।
৪. জার্মপ্লাজম তত্ত্বের আলোকে কেবল গোনাড থেকে জননকোষে জেনেটিক বস্তু গঠিত হয়।
৫. এ মতবাদে প্রকরণের ব্যাখ্যায় বলা হয় যে জনন কোষে অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনার ফলেই পরবর্তি বংশধরে প্রকরণের উদ্ভব ঘটে, এর ফলে নতুন প্রজাতি সৃষ্টি হয়।

ল্যামার্ক ও ডারউইন-এর মতবাদের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	ল্যামার্কবাদ (Lamarckism)	ডারউইনবাদ (Darwinism)
১. মতবাদের নাম	অর্জিত গুণের উত্তরাধিকার মতবাদ।	প্রাকৃতিক নির্বাচন মতবাদ।
২. প্রবর্তনকাল	১৮০৯ খ্রিস্টাব্দ।	১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ।
৩. যে গ্রন্থে প্রকাশিত	Philosophic Zoologique	Origin of Species by means of Natural Selection
৪. মূল প্রতিপাদ্য	অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি, পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব এবং জীবের সক্রিয় প্রচেষ্টা ও আঙ্গিক পরিবর্তন, অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার এবং অর্জিত গুণাবলির উত্তরাধিকার প্রভৃতি।	বংশবৃদ্ধির উচ্চহার, খাদ্য ও বাসস্থানের সীমাবদ্ধতা, জীবন সংগ্রাম, প্রকরণ, যোগ্যতামের জয়, প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং নতুন প্রজাতির সৃষ্টি প্রভৃতি।
৫. বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির কারণ	প্রচেষ্টা, ব্যবহার ও অব্যবহার।	প্রকরণ।
৬. বৈশিষ্ট্য নির্বাচনের জন্য দায়ী	জীবসত্তা।	প্রকৃতি।
৭. অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম	মান্য করা হয় না।	মান্য করা হয়।
৮. গ্রহণযোগ্যতা	কম (অনাদৃত ও পরিত্যক্ত)।	অধিক (সমাদৃত ও গ্রহণযোগ্য)।

বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রমাণসমূহ (Evidences of Evolution)

বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রাপ্ত প্রমাণগুলো একত্র করলে কারও পক্ষে এর বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি উথাপন করা সম্ভব হবে না। হয়তো কোনো ক্ষেত্রে কিছু প্রমাণ পাওয়া বাকি রয়েছে। সে স্থানটুকু কল্পনামিশ্রিত চিন্তা ধারায় কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে যাওয়া উপন্যাসের মত মূল বক্তব্যটি কারো বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আলোচনার সুবিধার জন্য বিবর্তনের প্রমাণগুলোকে নিম্নোক্ত শাখাসমূহে ভাগ করা হয়েছে।

বিবর্তনের প্রমাণগুলো হচ্ছে –

১. অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ, ২. ভ্রূণতত্ত্বীয় প্রমাণ, ৩. জীবাশ্মগত প্রমাণ, ৪. শ্রেণিবিন্যাসগত প্রমাণ, ৫. শারীরবৃত্তীয় প্রমাণ, ৬. কোষতাত্ত্বিক প্রমাণ, ৭. জিনতত্ত্বীয় প্রমাণ এবং ৮. ভৌগোলিক প্রমাণ।

১. অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণ (Morphological Evidences)

জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবের গঠন ও আকৃতি (বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ) সম্বন্ধে আলোচিত হয় তাকে **অঙ্গসংস্থান** (morphology) বলে। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর বাহ্যিক ও অন্তর্গঠন পর্যালোচনা করলে সুস্পষ্ট মনে হবে নিম্নশ্রেণির প্রাণী থেকে উচ্চশ্রেণির প্রাণিদেহে অঙ্গসংস্থানজনিত জটিলতা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিবর্তনের স্বপক্ষে অঙ্গসংস্থানিক প্রমাণকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শিরোনামে আলোচনা করা যায়।

ক. তুলনামূলক শারীরস্থান (Comparative Anatomy)

❑ **মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ :** বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের গঠনের তুলনামূলক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, মাছে দুইপ্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড, উভচরে তিনপ্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট, সরিসৃপে আংশিক চারপ্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট হলেও পাখি ও স্তন্যপায়ীতে সম্পূর্ণ চারপ্রকোষ্ঠ-বিশিষ্ট হৃৎপিণ্ড রয়েছে।

চিত্র ১১.২.৪ : বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

❑ **মেরুদন্ডী প্রাণীর মস্তিষ্ক :** বিভিন্ন শ্রেণির মেরুদন্ডী প্রাণীর মস্তিষ্কের গঠন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মাছ থেকে শুরু করে স্তন্যপায়ী প্রাণীর মস্তিষ্ক পাঁচটি ভাগে বিভক্ত। বিবর্তনের সোপানে যতই উপর দিকে উঠা যায়, ততই অপেক্ষাকৃত সরল গঠনের মূল কাঠামোটির ক্রমিক জটিলতা দেখা যায়, বিশেষ করে **সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার** (cerebral hemisphere) এবং **সেরেবেলাম** (cerebellum)-এর।

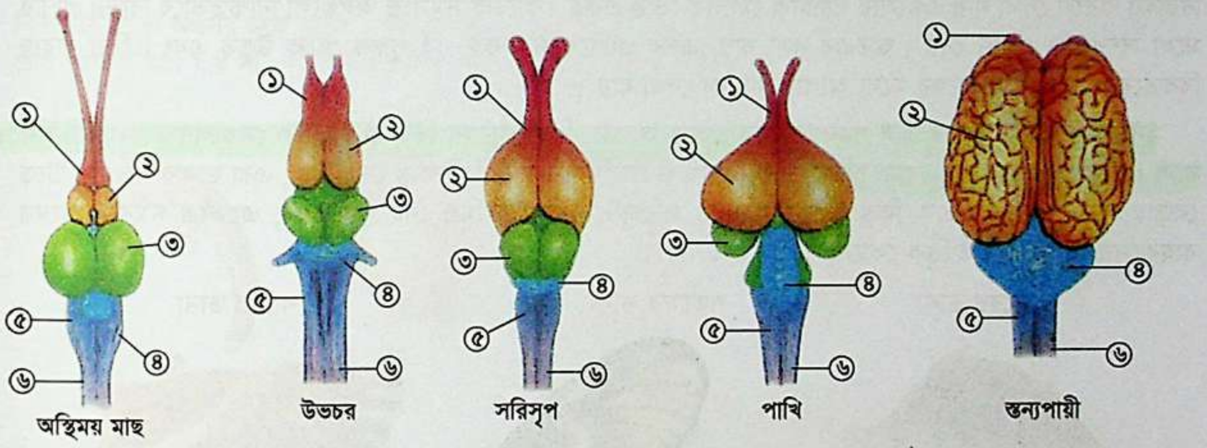

(১) অলফ্যাক্টরী লোব, (২) সেরেব্রাম, (৩) অপটিক লোব, (৪) সেরেবেলাম, (৫) মেডুলা, (৬) স্নায়ুরজ্জু

চিত্র ১১.২.৫ : বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর মস্তিষ্কের গঠন

খ. সমসংস্থ ও সমবৃত্তি অঙ্গ (Homologous organs and Analogous organs)

সমসংস্থ অঙ্গ : যেসব অঙ্গের উৎপত্তি ও অভ্যন্তরীণ গঠনের ভিত্তি এক সেসব অঙ্গকে **সমসংস্থ অঙ্গ** বলে। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর অগ্রপদ, যেমন-পাখির ডানা, বাদুড়ের ডানা, তিমি বা সীল-এর ফ্লিপার (দাঁড়ের মতো হাত), ঘোড়া বা বিড়ালের অগ্রপদ, মানুষের হাত সমসংস্থ অঙ্গের উদাহরণ। এসব অঙ্গের উৎপত্তি ও অভ্যন্তরীণ গঠন একই রকম। বাহ্যিক বিভিন্নতার জন্য আপাতদৃষ্টিতে এসব অঙ্গের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে বলে মনে হলেও অভ্যন্তরীণ গঠন থেকে বলা যায়, এগুলো মূলত **পাঁচ আঙ্গুল বিশিষ্ট** (pentadactyle) **অগ্রপদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ**। অগ্রপদে যেসব অস্থি পর্যায়ক্রমে সাজানো থাকে সেগুলো হচ্ছে হিউমেরাস, রেডিয়াস ও আলনা, কারপাল, মেটাকারপাল ও ফ্যালাঞ্জেস।

চিত্র ১১.২.৬ : সমসংস্থ অঙ্গসমূহ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

উল্লিখিত প্রাণিদের অগ্রপদে এসব অস্থি পর্যায়ক্রমে পাওয়া যায়। উড়ার সুবিধার জন্য বাদুড়ের অগ্রপদের চারটি আঙ্গুল খুব লম্বা হয়ে ডানায় পরিণত হয়েছে। পানিতে সাঁতারের জন্য সীলের অগ্রপদের অস্থিগুলো খাটো ও চওড়া হয়ে বৈঠার মতো হয়েছে। দৌড়ানোর সুধার জন্য ঘোড়ার অগ্রপদের রেডিয়াস ও আলনা একীভূত হয়েছে এবং ফ্যালাঞ্জেসের মাঝের তিনটি অঙ্গুলি কার্যকরী ক্ষুরে পরিণত হয়েছে। পাখির অগ্রপদ ডানায়, এবং মানুষের অগ্রপদ বিভিন্ন কাজ করার উপযোগী পাঁচ আঙ্গুলবিশিষ্ট হাতে পরিণত হয়েছে। আকার আকৃতির যতোই পার্থক্য থাকুক না কেন সমসংস্থ অঙ্গগুলোর নিরীক্ষা করলে দেখা যায় এগুলোর গাঠনিক মৌলিক ভিত্তি একই। কাজেই সমসংস্থ অঙ্গগুলো নিশ্চিতভাবে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে সম্পর্কের প্রমাণ দেয়। অতএব বলা যায়, এসব প্রাণিগোষ্ঠি একই পূর্ব পুরুষ থেকে উদ্ভূত এবং বিভিন্ন ধারায় বিবর্তনের জন্য এসব অঙ্গের মধ্যে আপাত পার্থক্য দেখা যায়।

সমবৃত্তি অঙ্গ : যেসব অঙ্গ গঠনগত দিক থেকে আলাদা কিন্তু কাজের দিক থেকে এক সেগুলোকে **সমবৃত্তি অঙ্গ** বলে। যেমন- পাখির ডানা, প্রজাপতির ডানা। পাখি ও প্রজাপতির ডানা নিরীক্ষায় দেখা যায়, এরা ডানার সাহায্যে উড়ে বেড়ায়, ডানার কাজও এক কিন্তু এদের গঠন ও পরিস্ফুটনে কোনো মিল নেই। অতএব, এক্ষেত্রে সমবৃত্তি অঙ্গের বাহকদের মধ্যে জ্ঞাতিতাত্ত্বিক কোনো সম্পর্ক নেই।

চিত্র ১১.২.৭ : সমবৃত্তি অঙ্গসমূহ

গ. নিষ্ক্রিয় অঙ্গসমূহ (Vestigeal organs)

প্রচলিত ধারণায়, যে সব অঙ্গ একসময় পূর্বপুরুষের দেহে সুগঠিত ও কার্যক্ষম ছিল, কিন্তু পরবর্তী বংশধরের দেহে গুরুত্বহীন, অগঠিত এবং অকার্যকর অবস্থায় রয়েছে সেগুলোকে **নিষ্ক্রিয় অঙ্গ** বলে। মানবদেহে শতাধিক নিষ্ক্রিয় অঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেছে। যেমন (i) চোখের ভিতরের দিকের কোণায় **উপপল্লব** (nictitating membrane), (ii) **আক্কেল দাঁত**সহ কয়েক ধরনের দাঁত; (iii) গায়ের **লোম**; (iv) বহিঃকর্ণের তিনটি করে **কর্ণপেশি**; (v) লেজ না থাকলেও **পুচ্ছাস্থি**; (vi) বৃহদান্ত্রের সাথে যুক্ত **অ্যাপেন্ডিক্স** ইত্যাদি। বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীতে এগুলোর সক্রিয় ভূমিকা এখনও দেখা যায়। গরু কান নাড়াতে পারে কিন্তু মানুষ তা পারে না। মানুষের লেজের কশেরুকাগুলো একত্রিত হয়ে ছোট অস্থি পিণ্ড বা কক্কিক্স হিসেবে মেরুদণ্ডের পশ্চাৎপ্রান্তে এখনও অবস্থান করে। পরিবেশগত কারণে মানুষে এসব অঙ্গ কোন প্রয়োজনে না আসায় বিবর্তনের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় অঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে।

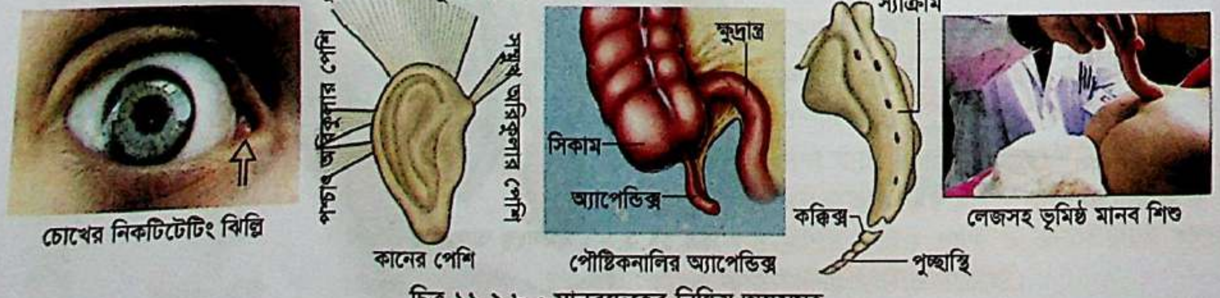

চিত্র ১১.২.৮ : মানবদেহের নিষ্ক্রিয় অঙ্গসমূহ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. ভ্রূণতত্ত্বীয় প্রমাণ (Embryological Evidences)

ভ্রূণতত্ত্ব, তুলনামূলক ভ্রূণতত্ত্ব এবং পরীক্ষামূলক ভ্রূণতত্ত্ব জৈব বিবর্তনের অন্যতম প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে অনেকে মনে করেন। প্রতিটি বহুকোষী প্রাণী একটি জাইগোট (একটি একক কোষ) থেকে পরিস্ফুটিত হয়। মানুষসহ সকল বহুকোষীতেই জাইগোটের বিভাজন মূলত এক রকম। যে সব পূর্ণাঙ্গ প্রাণী গঠনগত সম্বন্ধপরতায় আবদ্ধ তাদের পরিস্ফুটন পদ্ধতিও সদৃশ। পরে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে পরিস্ফুটনরীতি বিভিন্ন রূপ নেয়। এ বিভিন্নতা অনেকটা গাছের শাখা-প্রশাখা বিস্তারের মতো অগ্রসর হতে থাকে। মাছ, উভচর, সরিসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ীর ভ্রূণগুলোকে প্রথম অবস্থায় পরস্পর থেকে প্রায় পৃথকই করা যায় না। পরিস্ফুটনের পরবর্তী পর্যায়ে প্রত্যেক শ্রেণির বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশিত হয়।

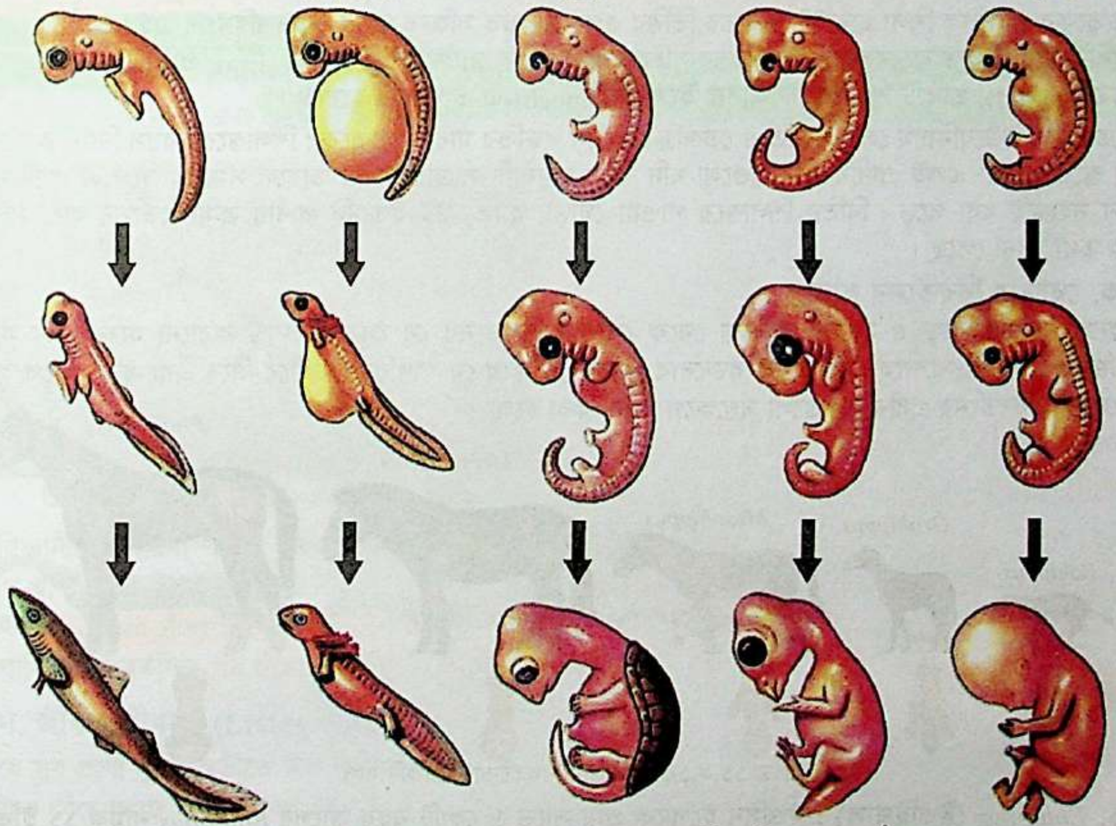

চিত্র ১১.২.৯ : বিভিন্ন ধরনের মেরুদণ্ডী প্রাণিদের ভ্রূণের সাদৃশ্য

ভ্রূণের এ সাদৃশ্য লক্ষ করে জার্মান বিজ্ঞানী **কার্ল ভন বেয়ার** (Karl von Baer, 1818) বলেছেন যে **ভ্রূণাবস্থায় একটি জীব তার আদি ইতিহাসকে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করে থাকে।** তাঁর মতে– (i) বিশেষ বৈশিষ্ট্য আবির্ভাবের আগে সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহের উদ্ভব ঘটে; (ii) সাধারণ বৈশিষ্ট্য থেকে অবশেষে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো উদ্ভূত হয়; (iii) ভ্রূণাবস্থায় একটি প্রাণী তাড়াতাড়ি অন্যান্য প্রাণীর গঠন ত্যাগ করে; এবং (iv) একটি শিশু প্রাণীকে তার নিম্নস্তরের প্রাণিগোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ দশার মতো নয় বরং শিশু বা ভ্রূণীয় দশার মতো দেখায়। অতএব বলা যায় যে, **সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী একই পূর্বপুরুষ থেকে সৃষ্টি হয়ে পরে বিভিন্নভাবে বিকশিত ও অভিযোজিত হয়েছে।**

পরবর্তীকালে **আনেস্ট হেকেল** (Ernest Haeckel-1834-1919) ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন প্রাণীর জীবন-ইতিহাস এবং ভ্রূণের পরিস্ফুটন পর্যবেক্ষণ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাকে **পুনরাবৃত্তি মতবাদ** (Recapitulation Theory) নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ মতবাদ অনুযায়ী, **ব্যক্তিজনি জাতিজনির পুনরাবৃত্তি করে** (Ontogeny Recapitulates Phylogeny); অর্থাৎ একটি জীবের ভ্রূণের পরিস্ফুটনকালে তার পূর্বপুরুষের ক্রমবিকাশের ঘটনাবলি পুনরাবৃত্ত হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৩. জীবাশ্মঘটিত বা ভূতত্ত্বীয় প্রমাণ (Geological Evidences)

জীবাশ্ম বা ফসিল (Fossil) : ল্যাটিন *fossilis* শব্দ থেকে ইংরেজি fossil শব্দের উৎপত্তি। *Fossilis* শব্দের অর্থ হলো dug out বা খুড়ে তোলা। আগে মাটি খুড়ে যা কিছু তোলা হতো তাকেই জীবাশ্ম বা ফসিল বলা হতো। বর্তমানে, পৃথিবীর ভূত্বকে (crust) প্রাকৃতিক উপায়ে সংরক্ষিত প্রাগৈতিহাসিক জীবের দেহ, দেহাবশেষ বা দেহের কোন অংশের চিহ্ন বা সাক্ষ্যকে জীবাশ্ম বা ফসিল বলে। জীববিজ্ঞানের যে শাখায় জীবাশ্ম আহরণ, বয়স ও বিবর্তনের ধরন নির্ধারণসহ বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয় তাকে প্যালিওন্টোলজী (Palaeontology) বা জীবাশ্মবিদ্যা বলে।

বিবর্তনের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য এবং প্রামাণিক সাক্ষ্য (উপাদান) হচ্ছে জীবাশ্ম। জীবাশ্ম সম্পর্কিত জ্ঞান সংগ্রহ করতে হলে ভূ-পৃষ্ঠের শিলাস্তর সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করতে হয় বলে বিবর্তনের এ প্রমাণকে ভূতত্ত্বীয় প্রমাণ (geological evidence)-ও বলা হয়।

ভূত্বকের পাললিক শিলা গ্রানাইট পাথরের ভিত্তির ওপর স্তরিভূত সজ্জিত থাকে। ভূতত্ত্ববিদগণ এই পাললিক শিলাকে ৫টি প্রধান স্তরে চিহ্নিত করেছেন। প্রত্যেক স্তর সৃষ্টিতে যতো সময় লেগেছে তাকে এরা (Era), প্রতিটি এরাকে একাধিক পিরিয়ড (period), প্রতিটি পিরিয়ডকে আবার ইপোক (Epoch)-এ ভাগ করা হয়েছে।

তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম লেড পদ্ধতি ও তেজস্ক্রিয় কার্বন পদ্ধতির মাধ্যমে ভূত্বকের শিলাস্তরের বয়স নির্ণয় করা যায়। বিভিন্ন স্তরে পাওয়া একই প্রাণীর জীবাশ্মগুলো যদি বয়স অনুযায়ী সাজানো যায় তাহলে সময়ের সঙ্গে ঐ প্রাণিগুলোর বিবর্তন সহজেই ধরা পড়ে। বিভিন্ন শিলাস্তরে পাওয়া ঘোড়া, হাতি, উট ইত্যাদি প্রাণীর ক্রমবিবর্তনের ধারা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গেছে।

ক. ঘোড়ার বিবর্তনের ধারা

হাজার হাজার হাড় ও দাঁতের জীবাশ্ম থেকে ঘোড়ার বিবর্তনের যে কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে তা সত্যিই আশ্চর্যজনক এবং নিঃসন্দেহে সেই একই বক্তব্যের পুনরুল্লেখ করে যে "পরিবর্তন ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে হয়।" নিচে ঘোড়ার বিবর্তনের প্রধান ধাপগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

চিত্র ১১.২.১০ : ঘোড়ার বিবর্তনের কয়েকটি ধাপ

১. *Eohippus* (ইওহিপ্পাস) : ইওসিন ইপোকে প্রায় সাড়ে ৬ কোটি বছর আগের *Eohippus* নামক ১১ ইঞ্চি উঁচু আকৃতির প্রাণীটিকে ঘোড়ার পূর্ব পুরুষ হিসেবে ধরা হয়। বিবর্তনবিজ্ঞানীদের ধারণা, এটি পাঁচ আঙ্গুলবিশিষ্ট প্রাণীর উত্তরসূরী, কিন্তু এর সামনের পায়ে ছিল ৪টি এবং পিছনের পায়ে ৩টি আঙ্গুল। আঙ্গুলগুলো ছিল ক্ষুরাকার ও নখরযুক্ত।

২. *Orohippus* (অরোহিপ্পাস) : ঘোড়ার এই পুরুষের পা ৫ম আঙ্গুলের অবশিষ্টাংশ বর্জিত, সামনের পায়ের মধ্য আঙ্গুলের বৃদ্ধি এবং পাশের আঙ্গুলের খর্বাকায় ধারণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটিও ইওসিন ইপোকের সদস্য।

৩. *Mesohippus* (মেজোহিপ্পাস) : ওলিগোসিন ইপোকে (সাড়ে ৪ কোটি বছর আগে)-এ ঘোড়ার উচ্চতা হয় ২৪ ইঞ্চি। প্রত্যেক পা ৩টি সক্রিয় আঙ্গুলবিশিষ্ট।

৪. *Merychippus* (মেরিচিপ্পাস) : মায়োসিন ইপোকে (সাড়ে ৩ কোটি বছর আগে) ঘোড়া দৃশ্যত ৩ আঙ্গুলবিশিষ্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে মাত্র একটি আঙ্গুলই কার্যক্ষম ছিল।

৫. *Pliohippus* (প্লিওহিপ্পাস) : প্লিওসিন ইপোকের (২ কোটি বছর আগে) ঘোড়ার পায়ে একটি আঙ্গুল ছাড়া আর কোন আঙ্গুলের চিহ্ন পাওয়া যায় না। এদের খুলি এবং দাঁতের বৈশিষ্ট্যও আধুনিক ঘোড়ার মতই ছিল।

৬. *Plesihippus* (প্লেসিহিপ্পাস) : *Pliohippus*-এর আরও একধাপ উন্নতি ঘটে এ জাতীয় ঘোড়ায় এবং এ থেকেই প্লিস্টোসিন ইপোকে (১০ লক্ষ বছর আগে) আধুনিক ঘোড়া *Equus* (ইকুয়াস)- এর উৎপত্তি হয়েছে।

ইওহিপ্পাস→অরোহিপ্পাস→মেজোহিপ্পাস→মেরিচিপ্পাস→প্লিওহিপ্পাস→প্লেসিহিপ্পাস→ইকুয়াস (আধুনিক ঘোড়া)।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

খ. সংযোগকারী যোগসূত্র (Connecting Link)

দুটি কাছাকাছি শ্রেণিবদ্ধগত গোষ্ঠী যেমন– পর্ব বা শ্রেণির মধ্যবর্তী দশার জীবাশ্মকে সংযোগকারী যোগসূত্র বলে। *Archaeopteryx* (আর্কিওপটেরিক্স) এ ধরনের একটি জীবাশ্ম। আদি পাখির নাম আর্কিওপটেরিক্স (*Archaeopteryx lithographica* যার অর্থ ancient wing inscribed in stone)। এদের কোন সদস্য বর্তমানে জীবিত নেই। আজ থেকে ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ বছর আগে জুরাসিক যুগে এর আবির্ভাব হয়েছিল। এই পাখির ধ্বংসাবশেষ জার্মানীর ব্যাভেরিয়ার বিখ্যাত সোলেনহোপেন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়। মোট ১০টি জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয় যার মধ্যে সর্বশেষটি আবিষ্কৃত হয়েছে ২০০৭ সালে। *Archaeopteryx*-এর মধ্যে সরিসৃপ ও পাখি উভয় শ্রেণির কিছু বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতির জন্য একে সংযোগকারী যোগসূত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

Archaeopteryx-এ সরিসৃপীয় বৈশিষ্ট্য –	*Archaeopteryx*-এ পাখির বৈশিষ্ট্য–
১. দেহ সরিসৃপের মতো লম্বা এবং শুষ্ক আঁইশযুক্ত।	১. দেহের গঠন পাখির মতো এবং লেজ ও ডানা পালকযুক্ত।
২. দেহকঙ্কাল পুরু ও ভারী হাড় দিয়ে গঠিত।	২. দেহে হাড়ের সংস্থাপন পাখির মতো।
৩. ডানার অগ্রভাগে নখর এবং চোয়ালে দাঁত রয়েছে।	৩. পাখির মতো ডানা বিশিষ্ট এবং ঠোঁট চঞ্চুতে পরিবর্তিত।

চিত্র ১১.২.১১ : *Archeopteryx*- এর জীবাশ্ম

চিত্র ১১.২.১২ : জীবাশ্ম পুনর্গঠন করলে যেমনটা দেখাত

বিজ্ঞানীদের ধারণা পাখির উৎপত্তি হয়েছে সরিসৃপ ও পাখিদের মধ্যবর্তী প্রাণী *Archaeopteryx* থেকে। নিম্নতর সরিসৃপ প্রাণী থেকে উন্নত পাখিদের বিবর্তনের ক্ষেত্রে *Archaeopteryx* একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী। বিজ্ঞানী Huxley যথার্থই বলেছেন Birds are glorified reptiles অর্থাৎ পাখিরা হলো মহিমান্বিত সরিসৃপ।

পাখিদের বিবর্তনিক পথ হচ্ছেঃ সরিসৃপ→*Archaeopteryx*→ পাখি।

গ. জীবন্ত জীবাশ্ম (Living Fossil)

যে সব প্রাণী সুদূর অতীতে উৎপত্তি লাভ করে আজও অঙ্গসংস্থানিক ও শারীরবৃত্তীয় কাজের অপরিবর্তিত রূপ নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে আছে অথচ এদের সমসাময়িক ও সমগোত্রীয় প্রায় সবাই বহু আগে বিলুপ্ত হয়েছে এবং যারা পর্ব থেকে পর্বের বা শ্রেণি থেকে শ্রেণির উদ্ভবের নিদর্শন বহন করে চলেছে সেগুলোকে জীবন্ত জীবাশ্ম বা লিভিং ফসিল বলে। *Platypus* (প্লাটিপাস) এ ধরনের একটি জীবন্ত জীবাশ্ম। এর কিছু বৈশিষ্ট্য (যেমন-ডিম, রেচন-জননতন্ত্র) সরিসৃপ শ্রেণির মতো, আবার কিছু বৈশিষ্ট্য (যেমন-স্তনগ্রন্থি, লোম) স্তন্যপায়ীর মতো। এ ছাড়া *Limulus* (আর্থ্রোপোড), *Sphenodon* (সরিসৃপ), *Latimaria* (মাছ)-ও জীবন্ত জীবাশ্ম।

Limulus

Latimaria

Platypus

চিত্র ১১.২.১৩ : তিনটি জীবন্ত জীবাশ্ম

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ভূতাত্ত্বিক কালক্রম (Geological Time Scale)

এরা (Eras)	পিরিয়ড (Period)	ইপোক (Epoch)	বছর পূর্বে	প্রধান প্রাণী (Dominant Animals)	মন্তব্য (Remarks)
সিনোজয়িক (Cenozoic)	কোয়াটারনারি (Quaternary)	রিসেন্ট (Recent)	২৫ হাজার	আধুনিক মানুষ ও সভ্যতার উদ্ভব।	
		প্লিস্টোসিন (Pleistocene)	১০ লক্ষ	মানুষের প্রথম সামাজিক জীবন; বহু স্তন্যপায়ী লুপ্ত।	
		প্লিওসিন (Pliocene)	২ কোটি	মানুষের উদ্ভব।	
	টারশিয়ারি (Tertiary)	মায়োসিন (Miocene)	সাড়ে ৩ কোটি	স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য।	
		ওলিগোসিন (Oligocene)	সাড়ে ৪ কোটি	নানা ধরনের স্তন্যপায়ী।	স্তন্যপায়ীর যুগ (Age of Mammals)
		ইওসিন (Eocene)	সাড়ে ৬ কোটি	আদি স্তন্যপায়ী লুপ্ত; অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য।	
		প্যালিওসিন (Paleocene)	সাড়ে ৭ কোটি	আদিম স্তন্যপায়ীর প্রাধান্য।	
মেসোজয়িক (Mesozoic)	ক্রিটেসিয়াস (Cretaceous)		সাড়ে ১৩ কোটি	ডাইনোসরের প্রাধান্য ও বিলুপ্তি, বর্তমান পাখির উদ্ভব; আদি স্তন্যপায়ী।	সরিসৃপের যুগ (Age of Reptiles)
	জুরাসিক (Jurassic)		সাড়ে ১৬ কোটি	বিভিন্ন প্রজাতির ডাইনোসর; দাঁতযুক্ত প্রথম পাখি।	
	ট্রায়াসিক (Triassic)		সাড়ে ২২ কোটি	ডাইনোসরের উদ্ভব; স্তন্যপায়ী-সদৃশ সরিসৃপের প্রাধান্য।	
প্যালিওজয়িক (Paleozoic)	পারমিয়ান (Permian)		২৪ কোটি	বর্তমান পতঙ্গ; বহু আদি প্রাণী লুপ্ত; স্থলে প্রাণীর আবির্ভাব।	উভচরের যুগ (Age of Amphilia)
	কার্বনিফেরাস (Carboniferous)		২৯ কোটি	পতঙ্গ, কন্টকত্বক প্রাণী, হাঙ্গর, আদি সরিসৃপ।	
	ডেভোনিয়ান (Devonian)		সাড়ে ৩৭ কোটি	বহু প্রজাতির মাছ; উভচরের আবির্ভাব।	মাছের যুগ (Age of Pisces)
	সিলুরিয়ান (Silurian)		সাড়ে ৪২ কোটি	কাঁকড়া, বিছা, মাছ।	
	অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician)		সাড়ে ৫০ কোটি	প্রবাল; মাছের উদ্ভব।	সামুদ্রিক অমেরুদণ্ডী (Marine Invertebrates)
	ক্যামব্রিয়ান (Cambrian)		সাড়ে ৫৮ কোটি	অমেরুদণ্ডী; ট্রাইলোবাইট ইত্যাদি।	
প্রোটেরোজয়িক (Proterozoic)			২৫০ কোটি	আদ্যপ্রাণী।	
আরকিওজয়িক (Archeozoic)			৪০০ কোটি	কোন জীবাশ্ম নেই।	

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৪. শ্রেণিবিন্যাসগত প্রমাণ (Taxonomical Evidencences)

সমগ্র জীবজগতকে প্রধানত **প্রাণী** ও **উদ্ভিদ**-জগতে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো আবার **পর্ব** (Phylum), **শ্রেণি** (Class), **বর্গ** (Order), **গণ** (Genus), **প্রজাতি** (Species) ইত্যাদি উপবিভাগে বিভক্ত। এ ভাগগুলো খেয়াল খুশীমত করা হয়নি। ভাগগুলো প্রকৃতই সম্পর্ক নির্ভর। একই রকম বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণিদের একটি প্রজাতিভুক্ত করা হয়। একই ধরনের অনেক প্রজাতি মিলে একটি "গণ", কয়েকটি গণের সমষ্টি একটি "বর্গ", অনেক বর্গের সমষ্টি মিলে একটি "শ্রেণি" এবং কয়েকটি শ্রেণি মিলে "পর্ব" এবং কয়েকটি "পর্ব" একত্র করে প্রাণিদের ক্ষেত্রে "প্রাণিজগত" এবং উদ্ভিদের ক্ষেত্র "**উদ্ভিদজগত**" সৃষ্টি করা হয়েছে। বিবর্তনবিজ্ঞানীদের ধারণা জীবজগতে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বৈশিষ্ট্যসমূহের সমতার কারণ হচ্ছে বৈশিষ্ট্যগুলো একই পূর্বপুরুষ থেকে বংশাধিকার সূত্রে পাওয়া।

৫. শারীরবৃত্তীয় ও জীবরসায়নঘটিত প্রমাণ (Physiological and Biochemical Evidences)

নিচুশ্রেণির প্রাণীর জৈবনিক প্রক্রিয়া উচ্চ শ্রেণির প্রাণীর মত জটিল নয়। তথাপিও একই শ্রেণির প্রাণিদের শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপ বহুলাংশে একই ধরনের। এদের খাদ্যগ্রহণ, খাদ্য পরিপাক, রেচন, শ্বসন প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়।

জীব রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সকল প্রাণী ও উদ্ভিদের একই ধরনের কতকগুলো জৈবিক উপাদান রয়েছে। যেমন–আমিষ, নিউক্লিক এসিড, এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি। এসব উপাদানের আণবিক গঠনগত মিলও লক্ষণীয়। আদিতম জীব থেকে জটিলতম জীবে এসব উপাদানের উপস্থিতিই বিতর্তনের প্রমাণ বহন করে।

৬. কোষতাত্ত্বিক প্রমাণ (Cytological Evidences)

উদ্ভিদ ও প্রাণীর কোষের মৌলিক গঠন ও বিভাজন পদ্ধতি প্রায় একই রকম। আণবিক পর্যায়ে সজীব কোষ–অঙ্গাণুগুলো, যেমন-মাইটোকন্ড্রিয়া, রাইবোজোম, লাইসোজোম, গলজি বস্তু, ক্রোমোজোম প্রভৃতির গঠন প্রায় সদৃশ। তাই বলা যায়, উদ্ভিদ ও প্রাণী একই পূর্বপুরুষ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

৭. জিনতাত্ত্বিক প্রমাণ (Genetical Evidences)

বিভিন্ন জীবের মধ্যে সমতা ও বৈষম্যের কারণ যে **জিনগত গড়ন** (genetic consitution) তা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত। জিনগত এ বৈশিষ্ট্যই বিবর্তনের ভিত্তি এবং কীভাবে এটি পরিবর্তিত হয়ে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় তাও বিজ্ঞানীদের কাছে আর অজানা নয়। *Drosophila* (ড্রসোফিলা)-র বিভিন্ন প্রজাতির ক্রোমোজোমগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তাদের পূর্বপুরুষ নির্ধারণ করা যায় এবং এ সত্যই প্রকাশিত হয় যে ওরা একই পূর্বপুরুষের বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করছে।

৮. ভৌগোলিক বিস্তৃতিগত প্রমাণ (Evidence from Geographical Distribution)

প্রাণিদের বিস্তারের উপর ভিত্তি করে প্রকৃতিবিজ্ঞানী **আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস** (Alfred Russel Wallace 1823-1913) ১৮৭০ সালে পৃথিবীকে ৬টি অঞ্চলে ভাগ করেছেন। একটি অঞ্চলের জীবের সাথে অন্যটির সাদৃশ্য খুব কমই। জীবের এমন ভৌগোলিক বিস্তার অভিব্যক্তিরই ধারা নির্দেশ করে।

একমাত্র অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে প্রাপ্ত **মারসুপিয়াল** (marsupial) স্তন্যপায়ীদের উপস্থিতি ও অতীত বিস্তারকে বিবর্তনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করা যায়। ভূতাত্ত্বিক তথ্য থেকে জানা গেছে যে, অস্ট্রেলিয়া অন্যান্য ভূখণ্ড থেকে এমন এক সময় আলাদা হয়ে গিয়েছিল যখন মারসুপিয়ালরা পৃথিবীর অনেকাংশে বিস্তৃত ছিল এবং তখনও **অমরাধর** (placental) স্তন্যপায়ীদের উদ্ভব ঘটেনি। সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ার পর অস্ট্রেলিয়ায় সম্ভবত গুটিকয়েক ধরনের আদি স্তন্যপায়ী বাস করত। মূল ভূখণ্ডে তখন অমরাধর স্তন্যপায়ীদের আবির্ভাবের ফলে আদি প্রাণীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। অমরাধর প্রাণী অস্ট্রেলিয়ায় প্রবেশ করতে না পারায় মারসুপিয়ালরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিভিন্নভাবে বিবর্তিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে পরিবেশের প্রতিটি অংশে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে সক্ষম হয়েছে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

জিনতত্ত্ব

অ্যালিল : হোমোলোগাস ক্রোমোজোম জোড়ের নির্দিষ্ট লোকাসে অবস্থানকারী নির্দিষ্ট জিন জোড়ার একটিকে অপরটির অ্যালিল বলে।

টেস্ট ক্রস : F_1 জনুর কোনো সদস্যকে তার প্রকৃত প্রচ্ছন্ন প্যারেন্ট এর সাথে ক্রস করানোকে টেস্ট ক্রস বলে। টেস্ট ক্রসের সাহায্যে F_1 জনুর জিনোটাইপ নির্ণয় করা যায়। যেমন– সংকর মটরশুঁটি (Tt) এবং বিশুদ্ধ খাটো মটরশুঁটি (tt) গাছের মধ্যে সংকরায়ন ঘটালে এদের ফিনোটাইপিক ও জিনোটাইপিক অনুপাত হবে ১ : ১।

ব্যাক ক্রস : F_1 জনুর একটি হেটারোজাইগাস জীবকে তার প্যারেন্ট সদস্যের যে কোনোটির (প্রচ্ছন্ন বা প্রকট) সাথে ক্রস করানোকে ব্যাক ক্রস বলে।

অসম্পূর্ণ প্রকটতা : দুটি বিপরীতধর্মী বিশুদ্ধ গুণসম্পন্ন জীবের সংকরায়নের ফলে উৎপন্ন অপত্যে যখন কোনো বৈশিষ্ট্যই প্রকটভাবে প্রকাশিত হয় না বরং উভয় বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে কোনো অন্তর্বর্তী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তখন তাকে অসম্পূর্ণ প্রকটতা বলে।

সহপ্রকটতা : হোমোলোগাস ক্রোমোজোমের একই লোকাসে অবস্থিত বিপরীত বৈশিষ্ট্যের দুটি অ্যালিল হেটারোজাইগাস অবস্থায় যখন প্রকট প্রচ্ছন্ন সম্পর্কের পরিবর্তে উভয়ই সমভাবে প্রকাশিত হয় তখন জিনের এ ধরনের স্বভাবকে সহপ্রকটতা বলে।

লিথাল জিন : যে সব জিন হোমোজাইগাস অবস্থায় উপস্থিত থাকলে সংশ্লিষ্ট জীবের মৃত্যু ঘটে সেসব জিনকে লিথাল জিন বলে।

পরিপূরক জিন : একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যখন দুটি নন অ্যালিলিক জিনের একত্রে সহাবস্থানের প্রয়োজন হয় তখন তাদেরকে পরিপূরক জিন বলে।

এপিস্ট্যাসিস : পরস্পরের অ্যালিল নয় এমন একটি জিন যখন অন্য একটি জিনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয় তখন এ প্রক্রিয়াকে এপিস্ট্যাসিস বলে। যে জিনটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা দেয়, সে জিনকে **এপিস্ট্যাটিক জিন** বলে এবং যে জিনটি বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বাধা পায় সে জিনকে বলা হয় **হাইপোস্ট্যাটিক জিন**।

বর্ণান্ধতা : যে রোগের ফলে মানুষের চোখের রেটিনা লাল-সবুজ বর্ণ পৃথক করতে পারে না, তাকে বর্ণান্ধতা বা লাল-সবুজ বর্ণান্ধতা বলে।

বিবর্তন

বিগল : H.M.S বিগল নামের জাহাজে চড়ে চার্লস ডারউইন প্রায় ৫ বছর ধরে আটলান্টিক মহাসাগরের কতগুলো দীপপুঞ্জ, বিশেষ করে গ্যালাপ্যাগোজ দীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করেন এবং জরিপ কাজ চালান।

নিষ্ক্রিয় অঙ্গ : প্রাণিদেহে এমন কতকগুলো বিলুপ্ত প্রায় অঙ্গ দেখা যায় যেগুলো বিশেষ কোনো প্রাণীতে অকেজো বা নিষ্ক্রিয় কিন্তু অন্য প্রাণীতে সক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে। এ সকল অঙ্গগুলোকে নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে।

জীবাশ্ম : আদি শিলাস্তরে প্রস্তরীভূত অথবা পাললিক শিলাস্তরে জীবদেহের ছাপ বা রাসায়নিক পদার্থে সৃষ্ট জীবের অনুরূপ কাঠামোকে জীবাশ্ম বলে।

জীবন্ত জীবাশ্ম : যে সব প্রাণী সুদূর অতীতে উৎপত্তি লাভ করে এখনো তাদের আদিম বৈশিষ্ট্যসহ বেঁচে আছে অথচ এদের সমসাময়িক ও সমগোত্রীয় সকলেরই বহু পূর্বে বিলুপ্তি ঘটেছে তাদেরকে জীবন্ত জীবাশ্ম বলে। এদের সংখ্যা একেবারেই হাতে গোনা। উদাহরণ- *Limulus, Latimaria, Peripatus, Sphenodon* ইত্যাদি।

আর্কিওপটেরিক্স : আনুমানিক ১৪-১৫ কোটি বছর পূর্বের **জীবাশ্ম পাখি**। পাখির মতো পালক আবৃত দেহ ও ডানা থাকলেও অস্থিময় দীর্ঘ লেজ, চঞ্চুতে দাঁত এবং ডানায় নখরযুক্ত তিনটি অঙ্গুলি থাকায় এদের সরিসৃপ ও আধুনিক পাখির মধ্যে **যোগসূত্রকারী প্রাণী** বলে বিবেচনা করা হয়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

লাল-সবুজে দাগানো

TEXT BOOK

প্রাণিবিজ্ঞান

উন্মেষ

মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল এডমিশন কেয়ার

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৮ মানব শারীরতত্ত্ব : সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ
Human Physiology : Coordination & Control

প্রধান শব্দাবলি (Key words)
- নিউরন
- সিন্যাপস
- মেনিনজেস
- নিউরোট্রান্সমিটার

উদ্দীপনা বা সংবেদনা (irritability or sensitivity) জীবের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। বহিঃস্থ বা অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে দেহের অন্তঃস্থ কর্মকাণ্ডকে সমন্বয় করার সামর্থ্যও জীবের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি জীব তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পরিবেশের প্রতি সার্বক্ষণিকভাবে হুঁশিয়ার ও তৎপর থাকে। জীবদেহের ভিতরে ও বাইরে সংঘটিত যেকোনো পরিবর্তন শনাক্তযোগ্য ও সাড়াদান উপযোগী হলে তাকে **উদ্দীপনা** (stimuli; একবচন stimulus) বলে। উদ্দীপনা গ্রাহক অঙ্গ বা **রিসেপ্টর** (receptor)-এ গৃহীত হয়। স্নায়ু বা নিউরন দ্বারা বাহিত হয় এবং **ইফেক্টর** (effector) এর সাহায্যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে।

আমরা যখন আহার করি তখন চোখ দিয়ে খাবারটি আগে দেখি, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নেই, হাত তুলে খাবারটি মুখে পুরি, জিহ্বা দিয়ে স্বাদ নেই, চোয়ালের পেশি দিয়ে খাদ্য চিবাই, গলাধঃকরণ, পেরিস্ট্যালসিসসহ লালাক্ষরণ থেকে শুরু করে পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের এনজাইম ইত্যাদি ক্ষরিত হয়। নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এমন কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হতে পারে না। বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কাজের মাধ্যমে দেহের সকল কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে **সমন্বয়** (coordination) বলে। প্রাণিদেহে দুটি সমন্বয়কারীতন্ত্র রয়েছে: একটি ভৌত **সমন্বয়তন্ত্র** যা স্নায়ুতন্ত্রের মাধ্যমে ঘটে, অন্যটি রাসায়নিক **সমন্বয়তন্ত্র** যা অন্তঃক্ষরাতন্ত্রের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। এ অধ্যায়ে মানবদেহে সংঘটিত বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজের সমন্বয় প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বিভিন্ন অঙ্গ ও তন্ত্রের গঠন এবং সেগুলোর কর্ম কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পিরিয়ড সংখ্যা-১২ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. স্নায়বিক সমন্বয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. মস্তিষ্কের প্রধান ভাগের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. মানুষের বিভিন্ন জৈবিক কার্যক্রমে করোটিক স্নায়ুর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. মানব সংবেদী অঙ্গসমূহের গঠনের সাথে কাজের সম্পর্ক তুলনা করতে পারবে। ৫. রাসায়নিক সমন্বয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. মানবদেহের বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহের অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. দেহের বৃদ্ধি ও আচরণ পরিবর্তনে হরমোনের প্রভাব ও এর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবে।	● স্নায়বিক সমন্বয় ○ প্রধান ভাগ ○ মস্তিষ্ক (গঠন, অংশ, কাজ) ○ করোটিক স্নায়ু (উৎপত্তি, প্রকৃতি ও কাজ) ● মানব সংবেদী অঙ্গ ○ চোখ (গঠন ও কাজ) ○ কান (গঠন ও কাজ) ● রাসায়নিক সমন্বয় ● অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া ○ পিটুইটারি ○ থাইরয়েড ○ প্যারাথাইরয়েড ○ অ্যাড্রেনাল ○ গোনাড ○ অগ্ন্যাশয় (আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স) ● হরমোনের প্রভাব ও অনিয়ন্ত্রিত হরমোন ব্যবহারের ফলাফল

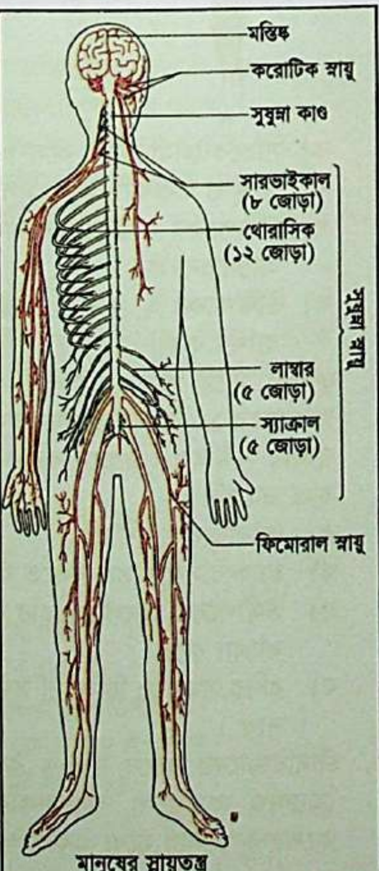

মানুষের স্নায়ুতন্ত্র

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

স্নায়বিক সমন্বয় (Nervous Coordination)

উদ্দীপনায় সাড়া দেয়ার ক্ষমতা প্রত্যেক জীবের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বিবর্তনের গতিপথে এককোষী জীব যখন এক সময় বহুকোষী জীবে পরিণত হয়েছে তখন দেহের সবখানে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে থাকা অগণিত কোষের বৈচিত্র্যময় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করা এবং পরিবেশের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করার উদ্দেশে আবির্ভূত হয়েছে দ্রুত যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকারী **স্নায়ুতন্ত্র**। স্নায়ুতন্ত্র এমন এক বিশেষ অঙ্গতন্ত্র যা দেহের অন্যসব অঙ্গতন্ত্রের কাজে অন্যতম প্রধান সমন্বয়ক ও নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে।

নিউরন সমন্বিত যে তন্ত্রের সাহায্যে দেহ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় সাড়া দিয়ে বিভিন্ন দৈহিক ও শারীরবৃত্তিক কাজের সামঞ্জস্য রক্ষা করে দেহকে পরিচালিত করে তাকে স্নায়ুতন্ত্র বলে। ভ্রূণীয় এক্টোডার্ম থেকে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র উৎপত্তি লাভ করে।

স্নায়ুতন্ত্রের কাজ (Functions of Nervous System)

১. পরিবেশের যে কোন প্রভাবককে উপলব্ধি করে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা। পরিবেশের সঙ্গে দেহের সমন্বয় রক্ষা প্রধান উদ্দেশ্য।

২. দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এগুলো সুনিয়ন্ত্রিত করা। যেমন– গমনকালে চলন অঙ্গগুলোর সঙ্গে মাথা, ঘাড়, চোখ, কান প্রভৃতি অঙ্গ একই সঙ্গে সমন্বিত হয়।

৩. ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশির নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রন্থির ক্ষরণের মতো চেষ্টীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্য বাইরের উদ্দীপনা গ্রহণ করে।

৪. স্নায়ুকোষের উদ্দীপনাকে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পরিচালনা করে সংবেদী অঙ্গগুলোকে সক্রিয় করে।

৫. বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে আচরণকে পরিবর্তিত করে।

স্নায়ুতন্ত্র সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে যে বিষয়গুলো জানা থাকা প্রয়োজন সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো।

১. নিউরন (Neurone/Neuron) : স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কার্যকরী একক

মানুষের স্নায়বিক সমন্বয়ের প্রধান সমন্বয়কারী স্নায়ুতন্ত্রের গঠন ও কার্যকরী একককে **নিউরন** বলে। নিউরনের দুটি প্রধান অংশ হচ্ছে **কোষদেহ** (cell body) এবং প্রলম্বিত অংশ বা **নিউরাইট** (neurite)। নিউরাইট দুধরনের অংশ নিয়ে গঠিত: বহু শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট ছোট ছোট প্রলম্বিত অংশ বা **ডেনড্রাইট** (dendrite) এবং শাখা-প্রশাখাবিহীন দীর্ঘ প্রলম্বিত অংশ বা **অ্যাক্সন** (axon)। পূর্বের শ্রেণিতে নিউরন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রলম্বিত অংশের বা প্রবর্ধকের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে নিউরন পাঁচ ধরনের:

১. **অ্যাপোলার** (Apolar) বা **মেরুহীন নিউরন** : কোষদেহে কোন প্রলম্বিত অংশ থাকে না। সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের বহিঃস্তরে এবং চোখের রেটিনার মধ্যবর্তী নিউক্লিয়ার স্তরে মেরুবিহীন নিউরন পাওয়া যায়।

২. **ইউনিপোলার** (Unipolar) বা **একমেরুযুক্ত নিউরন** : কোষদেহ থেকে একটি মাত্র প্রলম্বিত অংশ সৃষ্টি হয় যা পরে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে একটি ডেনড্রাইটে ও অন্যটি অ্যাক্সনে পরিণত হয়। মেরুদণ্ডী প্রাণির প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রে এ নিউরন থাকে। এগুলো প্রধানত সেনসরি (সংবেদী)।

৩. **বাইপোলার** (Bipolar) বা **দ্বিমেরুযুক্ত নিউরন** : কোষদেহ থেকে সৃষ্ট প্রলম্বিত অংশের সংখ্যা ২টি: একটি ডেনড্রাইট, অন্যটি অ্যাক্সন। মানব ভ্রূণে স্নায়ুতন্ত্রের সব কোষই বাইপোলার। পরবর্তীকালে এগুলো ইউনিপোলার অথবা মাল্টিপোলার নিউরনে পরিণত হয়। রেটিনা, কক্লিয়া ও নাকে এ ধরনের নিউরন পাওয়া যায়।

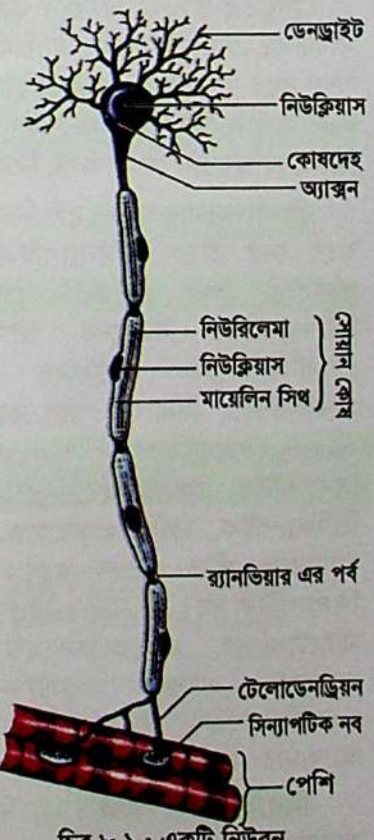

চিত্র ৮.১ : একটি নিউরন

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৪. মাল্টিপোলার (Multipolar) বা বহুমেরুযুক্ত নিউরন : কোষদেহে অনেক প্রলম্বিত অংশ থাকে। এদের একটি অ্যাক্সন ও অন্যগুলো ড্রেনড্রাইট। স্তন্যপায়ীদের মস্তিষ্ক ও স্পাইনাল কর্ডে এসব নিউরন থাকে।

৫. সিউডোইউনিপোলার (Psedounipolar) বা ছদ্ম মেরুযুক্ত : প্রাথমিক অবস্থায় দুটি প্রলম্বিত অংশ থাকে যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মিলিত হয়ে একটিতে পরিণত হয়। দেখতে ইউনিপোলার হলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো বাইপোলার নিউরন থেকে সৃষ্ট। স্পাইনাল গ্যাংলিয়া ও করোটিক স্নায়ু গ্যাংলিয়ায় এ ধরনের নিউরন অবস্থিত।

চিত্র ৮.২ : বিভিন্ন প্রকার নিউরন

২. নিউরোগ্লিয়া (Neuroglia)

নিউরন যে যোজক টিস্যুর ভিতরে সুরক্ষিত থাকে তাকে নিউরোগ্লিয়া বলে। নিউরোগ্লিয়া চার রকম:

(i) অ্যাস্ট্রোসাইটস, (ii) অলিগোডেনড্রোসাইটস, (iii) মাইক্রোগ্লিয়া এবং (iv) এপেনডাইমা।

৩. নিউরোট্রান্সমিটার (Neurotransmitters)

যে রাসায়নিক পদার্থ সিন্যাপসের মধ্য দিয়ে এক নিউরন থেকে অন্য নিউরন বা পেশি বা গ্রন্থিতে স্নায়ু উদ্দীপনা বহন করে তাকে নিউরোট্রান্সমিটার বলে। এ পদার্থ প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের ভেসিকলে জমা থাকে ও প্রয়োজনে সিন্যাপটিক ক্লেফটে মুক্ত হয়। অ্যাসিটাইল কোলিন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত নিউরোট্রান্সমিটার। এর প্রকারভেদ নিম্নরূপ:

i. **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোট্রান্সমিটার :** ডোপামিন, GABA, গ্লাইসিন, গ্লুটামেট প্রভৃতি।
ii. **প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্রের নিউরোট্রান্সমিটার :** অ্যাসিটাইল কোলিন, অ্যাড্রেনালিন, নর অ্যাড্রেনালিন, হিস্টামিন প্রভৃতি।

৪. সিন্যাপস (Synapse)

স্নায়ুতন্ত্র অসংখ্য নিউরনে গঠিত হলেও নিউরনগুলোর মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ প্রোটোপ্লাজমীয় সংযোগ থাকে না। সাধারণত একটি নিউরনের অ্যাক্সন-প্রান্ত অন্য নিউরনের ডেনড্রাইট-প্রান্তের খুব কাছে অবস্থান করে কিন্তু কেউ কাউকে স্পর্শ করে না। এভাবে, দুটি স্নায়ুর মধ্যে সূক্ষ্ম ফাঁকযুক্ত সংযোগস্থল যেখানে একটি নিউরনের অ্যাক্সনের প্রান্ত শেষ হয় এবং অন্য একটি নিউরন শুরু হয়, তাকে সিন্যাপস বলে। স্নায়ু উদ্দীপনা সিন্যাপসের মাধ্যমে কেবল একদিকে (এক নিউরনের অ্যাক্সন থেকে অপর নিউরনের ডেনড্রাইট বা কোষদেহে) পরিবাহিত হয়।

সিন্যাপস এর গঠন : দুটি নিউরনের অংশ মিলিত হয়ে সিন্যাপস গঠন করে। যে নিউরনের অ্যাক্সন সিন্যাপস গঠনে অংশ নেয় তাকে **প্রিসিন্যাপটিক নিউরন** বলে। সিন্যাপস গঠনকারী অন্য নিউরনটি পোস্টসিন্যাপটিক নিউরন। প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের প্রিসিন্যাপটিক ঝিল্লি এবং পোস্টসিন্যাপটিক নিউরনের পোস্টসিন্যাপটিক ঝিল্লি সম্মিলিতভাবে সিন্যাপস গঠন করে। এ দুটি ঝিল্লির মাঝে ২০nm (ন্যানোমিটার) – ৩০nm ফাঁক থাকে। এ ফাঁকটি **সিন্যাপটিক ক্লেফট** (synaptic cleft) নামে পরিচিত। প্রিসিন্যাপটিক ঝিল্লি প্রকৃতপক্ষে প্রিসিন্যাপটিক নিউরনের অ্যাক্সনের স্ফীত প্রান্তের অংশ। অ্যাক্সনের স্ফীত প্রান্তকে **সিন্যাপটিক নব** (synaptic knob) বলে। নবের ভিতরে অসংখ্য মাইটোকন্ড্রিয়া, মাইক্রোফিলামেন্ট ও নিউরোট্রান্সমিটারযুক্ত ভেসিকল থাকে। পোস্টসিন্যাপটিক ঝিল্লি হচ্ছে পোস্টসিন্যাপটিক নিউরনের কোষদেহ বা ডেনড্রাইট বা অ্যাক্সনের অংশ।

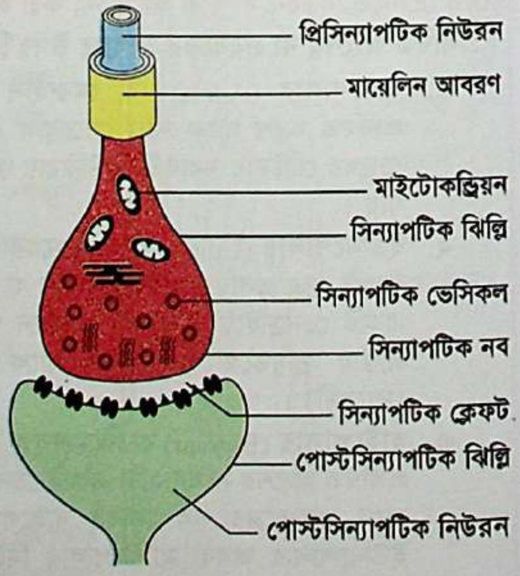

চিত্র ৮.৩ : সিন্যাপস এর গঠন

সিন্যাপস-এর কাজ : (i) নিউরন থেকে নিউরনে তথ্য স্থানান্তর করে (প্রধান কাজ)। (ii) স্নায়ু-উদ্দীপনাকে কেবল

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

একদিকে প্রেরণ করে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌছাতে সাহায্য করে। (iii) বিভিন্ন নিউরনের প্রতি সমন্বিত সাড়া দেয়। (iv) অতি নিচু মাত্রার উদ্দীপনাকে বাছাই করে বাদ দিয়ে দেয়। (v) প্রচন্ড স্নায়ু-উদ্দীপনায় নিউরোট্রান্সমিটার পদার্থের ক্ষরণ কমিয়ে অতি-উদ্দীপনা প্রবাহে বাধা দেয়, ফলে কার্যকর (effector) অংশ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়।

সিন্যাপসের মাধ্যমে স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহনের প্রবাহ চিত্র নিচে দেখানো হলো।

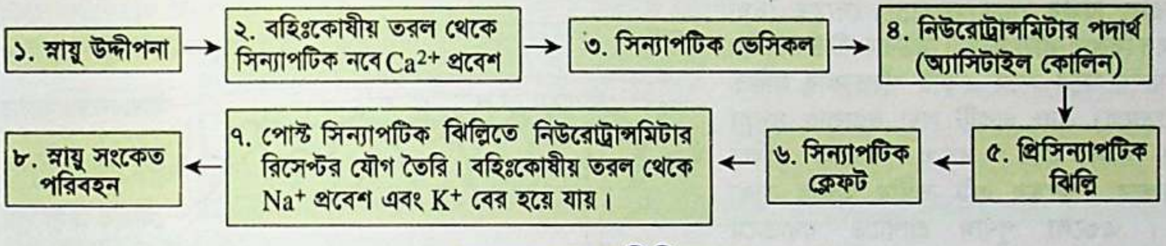

স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস

সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ১. কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ও ২. প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র।

১. **কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** (Central nervous system) : এটি মস্তিষ্ক (brain) ও সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) নিয়ে গঠিত।

২. **প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র** (Peripheral nervous system) : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে কতকগুলো স্নায়ু জোড়ায় জোড়ায় উৎপন্ন হয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। এসব জোড় স্নায়ুকে প্রান্তীয় স্নায়ু বলে। প্রান্তীয় স্নায়ুর সমন্বয়ে প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র গঠিত। প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র দুভাগে বিভক্ত: **ক. ঐচ্ছিক স্নায়ুতন্ত্র** ও **খ. স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র**।

ক. **ঐচ্ছিক স্নায়ুতন্ত্র** (Voluntary nervous system) : এটি ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ু ও ৩১ জোড়া সুষুম্না স্নায়ু নিয়ে গঠিত।

খ. **স্বয়ংক্রিয় বা আন্তরযন্ত্রীয় স্নায়ুতন্ত্র** (Autonomic nervous system) : এগুলো কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রধানত দেহের অনৈচ্ছিক গঠনের সাথে সম্পর্কযুক্ত আন্তরযন্ত্রের (visceral organs) বিভিন্ন কাজ, যেমন- হৃৎস্পন্দন, পেরিস্ট্যালসিস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র দুরকম। যথা-**সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র** (Sympathetic nervous system) ও **প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুতন্ত্র** (Parasympathetic nervous system)। নিচের ছকে স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণিবিন্যাস দেখানো হলো-

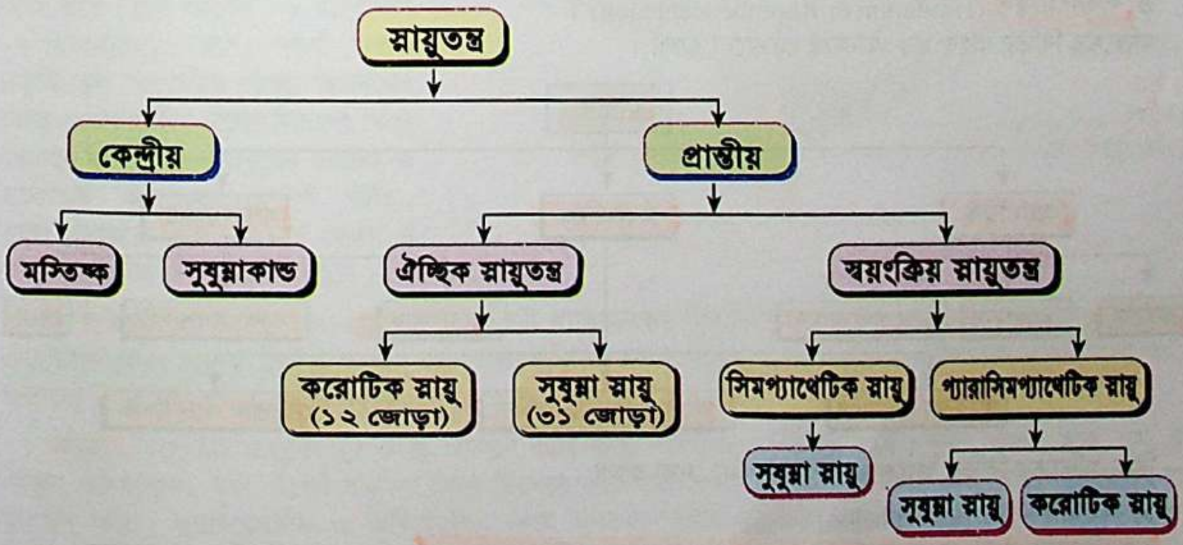

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System – CNS)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র **মস্তিষ্ক** (brain) ও **সুষুম্নাকাণ্ড** (spinal cord) নিয়ে গঠিত। ভ্রূণের এক্টোডার্মের কুঞ্চনের মাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্র বিকাশ লাভ করে। **নটোকর্ড**– যা থেকে মেরুদণ্ড সৃষ্টি হয় ঠিক তার উপরে স্নায়ুতন্ত্রের অবস্থান। এক্টোডার্ম ভিতরের দিকে ভাঁজ খেয়ে একটি ফাঁপা **নিউরাল টিউব** (neural tube) দেহের দৈর্ঘ্য বরাবর বিস্তার লাভ করে। নিউরাল টিউব ভ্রূণীয় বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটি স্ফীতাকার **মস্তিষ্ক** (অগ্রভাগে) এবং একটি লম্বা দণ্ডাকার **সুষুম্না কাণ্ড** গঠন করে। সম্মুখ নিউরাল নালির অভ্যন্তরে মস্তিষ্কের ৩টি ভ্রূণীয় অঞ্চল দেখা যায়। এগুলো পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে যথাক্রমে **অগ্রমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক** ও **পশ্চাৎমস্তিষ্ক** গঠন করে।

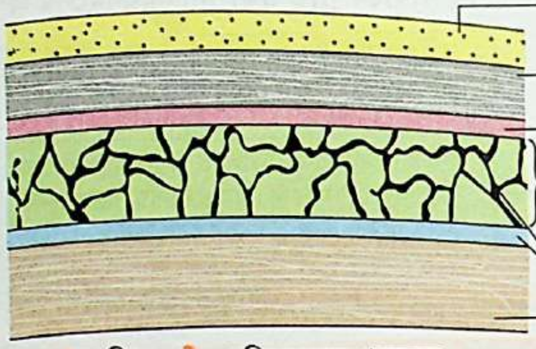

চিত্র ৮.৪ : মেনিনজেসের প্রস্থচ্ছেদ

সমগ্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড একটি দৃঢ় ও মজবুত আবরণে আবৃত থাকে। একে মেনিনজেস ((meninges) বলে। মেনিনজেস ৩টি তন্তুময় ঝিল্লি নিয়ে গঠিত। যথা- বাইরের ড্যুরা ম্যাটার, মধ্যবর্তী অ্যারাকনয়েড ম্যাটার এবং ভিতরের পায়া ম্যাটার।

মস্তিষ্ক : গঠন, অংশ ও কাজ (Brain : Structure, Parts and Functions)

সুষুম্নাকাণ্ডের শীর্ষে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের যে স্ফীত অংশ করোটির মধ্যে অবস্থান করে তাকে **মস্তিষ্ক** বলে। ভ্রূণ অবস্থায় সুষুম্নাকান্ডের অগ্রবর্তী দন্ডাকার অংশ ভাঁজ হয়ে পর পর ৩টি বিষমাকৃতির স্ফীতি গঠন করে। স্ফীতি ৩টি মিলে গঠিত হয় মস্তিষ্ক। সামনের দিক থেকে স্ফীত অংশ তিনটি হচ্ছে **অগ্রমস্তিষ্ক, মধ্যমস্তিষ্ক** ও **পশ্চাৎমস্তিষ্ক**। ভ্রূণ যত পরিণত হতে থাকে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের জটিলতাও তত বাড়তে থাকে।

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষে মস্তিষ্কের আয়তন প্রায় ১৫০০ ঘন সেন্টিমিটার, গড় ওজন প্রায় ১.৩৬ কেজি এবং এতে প্রায় ১০০ বিলিয়ন নিউরন থাকে। মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রের সবচেয়ে বড়, জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

মানুষের মস্তিষ্ক ৩টি প্রধান ভাগে বিভক্ত :
১. **অগ্রমস্তিষ্ক** (Forebrain or Prosencephalon),
২. **মধ্যমস্তিষ্ক** (Midbrain or Mesencephalon) এবং
৩. **পশ্চাৎমস্তিষ্ক** (Hindbrain or Rhombencephalon)।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ছক আকারে দেখানো হলো।

নিচে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

১. অগ্রমস্তিষ্ক (Prosencephalon)

অগ্রমস্তিষ্কের প্রধান অংশ হচ্ছে সেরেব্রাম, থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস। নিচে এদের বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. সেরেব্রাম (Cerebrum) : দুটি পাশাপাশি অবস্থিত, বড়, কুন্ডলি পাকানো ও খাঁজবিশিষ্ট খন্ড নিয়ে সেরেব্রাম গঠিত। খন্ডদুটিকে **সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার** (cerebral hemisphere) বলে। সেরেব্রাম মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

(মস্তিষ্কের ওজনের ৮০%-ই হচ্ছে সেরেব্রাম) এবং মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশকে আবৃত করে রাখে। খন্ডদুটি ভিতরের দিকে **কর্পাস ক্যালোসাম** (corpus callosum) নামে চওড়া স্নায়ুগুচ্ছ দিয়ে যুক্ত। পৃষ্ঠতল নানা স্থানে ভাঁজ হয়ে উঁচু নিচু অবস্থায় থাকে। উঁচু জায়গাকে **জাইরাস** (gyrus) এবং নিচু জায়গাকে **সালকাস** (sulcus) বলে।

কয়েকটি ভাঁজ সুগঠিত ও গভীর হয়ে ৪টি প্রশস্ত ফিসার (fissure) সৃষ্টি করে (যথা–সেন্ট্রাল, প্যারাইটো-অক্সিপিটাল এবং ল্যাটেরাল ফিসার)। প্রতিটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার **ফ্রন্টাল লোব** (frontal lobe), **প্যারাইটাল লোব** (parietal lobe), **অক্সিপিটাল লোব** (occipital lobe), **টেম্পোরাল লোব** (temporal lobe) এ চারটি খণ্ডে বিভক্ত।

সেরেব্রামের বহিঃস্তর ৩ সে.মি. পুরু ও **গ্রে ম্যাটার** (grey matter)-এ গঠিত। এর নাম **সেরেব্রাল কর্টেক্স** (cerebral cortex)। এর নিচের স্তরটি অর্থাৎ সেরেব্রামের অন্তঃস্তর **হোয়াইট ম্যাটার** (white matter)-এ গঠিত এবং **সেরেব্রাল মেডুলা** (cerebral medulla) নামে পরিচিত। (উল্লেখ্য যে সুষুম্নাকান্ডের ক্ষেত্রে হোয়াইট ম্যাটার থাকে বাইরের দিকে, আর গ্রে ম্যাটার থাকে ভিতরের দিকে)। ডান সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ার দেহের বাম পাশ এবং বাম হেমিস্ফিয়ার দেহের ডান পাশ নিয়ন্ত্রণ করে।

> Grey matter = কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ধূসর বর্ণের অংশ যা স্নায়ুকোষ, নিউরোগ্লিয়া ও সিন্যাপস নিয়ে গঠিত।
> White matter = কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের টিস্যু যা মূলত মায়েলিনযুক্ত স্নায়ুতন্তু দিয়ে গঠিত। মায়েলিনযুক্ত থাকার কারণে টিস্যুটিকে সাদা চকচকে দেখায়।

কাজ : সংবেদী অঙ্গ থেকে আসা অনুভূতি গ্রহণ ও বিশ্লেষণ করে। চিন্তা, বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, উদ্ভাবনীশক্তি প্রভৃতি উন্নত মানসিক বোধের নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। বাকশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। দেহের সব ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

খ. থ্যালামাস (Thalamus) : প্রতিটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের সেরেব্রাল মেডুলায় অবস্থিত এবং গ্রে ম্যাটারে গঠিত একেকটি ডিম্বাকার অঞ্চল। দুটি থ্যালামাই (বহুবচন) একটি যোজক দিয়ে যুক্ত।

কাজ : এটি সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর (sensory nerve) **রিলে স্টেশন** হিসেবে কাজ করে (স্নায়ু আবেগ → থ্যালামাস → সেরেব্রাম)। চাপ, স্পর্শ, যন্ত্রণা প্রভৃতি স্থূল অনুভূতির কেন্দ্র, আবেগের কেন্দ্র ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গের নিয়ন্ত্রক কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়। ঘুমন্ত মানুষকে হঠাৎ জাগিয়ে তোলা ও পরিবেশ সম্বন্ধে সতর্ক করে তোলে।

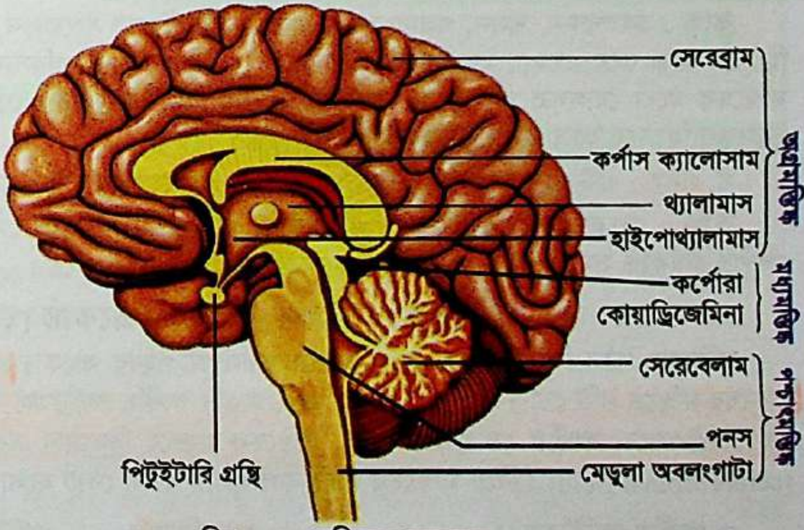

চিত্র ৮.৫ : মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ

গ. হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus): এটি থ্যালামাসের ঠিক নিচে অবস্থিত, গ্রে ম্যাটার নির্মিত এবং অন্ততঃ এক ডজন পৃথক অঞ্চলে বিভক্ত অংশ। অংশগুলো সুনির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকে। হাইপোথ্যালামাস একটি সূক্ষ্ম অংশের সাহায্যে পিটুইটারি গ্রন্থির সংগে সংযুক্ত।

কাজ : স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুকেন্দ্রের কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ঘাম, ঘুম, রাগ, পীড়ন, ভালোলাগা, ঘৃণা, উদ্বেগ প্রভৃতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। ভ্যাসোপ্রেসিন ও অক্সিটোসিন নামে দুরকম নিউরোহরমোন সরাসরি ক্ষরিত হয় এবং তা পশ্চাৎ পিটুইটারির মধ্যে জমা থাকে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২. মধ্যমস্তিষ্ক (Mesencephalon)

হাইপোথ্যালামাসের নিচে এবং সেরেবেলামের সম্মুখে অবস্থিত ছোট ও সঙ্কুচিত অংশটি **মধ্যমস্তিষ্ক** বা **মেসেনসেফালন**। এটি অঙ্কীয়দিকে দুটি নলাকার ও পুরু স্নায়ুরজ্জু এবং পৃষ্ঠদিকে দুটি গোলাকার খণ্ড নিয়ে গঠিত। প্রথম দুটি **সেরেব্রাল পেডাঙ্কল** (cerebral peduncle) এবং শেষের দুটি **কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা** (corpora quadrigemina)। প্রতিটি কর্পোরা কোয়াড্রিজেমিনা আড়াআড়িভাবে বিভক্ত হয়ে মোট চারটি খণ্ড গঠন করে। মধ্যমস্তিষ্কের অন্তর্ভাগের তরলপূর্ণ সরু নালি হচ্ছে **সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট** (cerebral aquiduct)। এটি ৩য় ও ৪র্থ ভেন্ট্রিকলকে (মস্তিষ্কের গহ্বর) যুক্ত করে।

কাজ : এটি অগ্র ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে। দর্শন ও শ্রবণ তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।

৩. পশ্চাৎমস্তিষ্ক (Rhombencephalon)

এটি মস্তিষ্কের পশ্চাৎঅংশ এবং ৩টি প্রধান অংশ দিয়ে গঠিত, যথা–সেরেবেলাম (cerebellum), **মেডুলা অবলংগাটা** (medulla oblongata) এবং **পনস** (pons)।

ক. সেরেবেলাম : এটি পশ্চাৎমস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ যা সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের নিচে অবস্থিত, কুন্ডলিকৃত ও দুটি সমগোলার্ধে গঠিত। গোলার্ধদুটি **ভার্মিস** (vermis) নামে একটি ক্ষুদ্র যোজকের সাহায্যে যুক্ত। সেরেবেলামের বাইরের অংশ গ্রে ম্যাটার-এ এবং ভিতরের অংশ হোয়াইট ম্যাটার-এ গঠিত। পূর্ণ বয়স্ক মানুষে সেরেবেলামের গড় ওজন প্রায় ১৫০ গ্রাম।

কাজ : ঐচ্ছিক চলাফেরাকে নিয়ন্ত্রণ করে। ঐচ্ছিক পেশির পেশিটান নিয়ন্ত্রণ করে। দেহের ভারসাম্য ও দেহভঙ্গি বজায় রাখে। চলাফেরার দিক নির্ধারণ করে।

খ. মেডুলা অবলংগাটা : এটি পনস-এর নিচের কিনারা ঘেঁষে প্রসারিত, অনেকটা পিরামিড আকৃতির দন্ডাকার অংশ যা লম্বায় প্রায় ৩ সেমি. চওড়ায় ২ সেমি. এবং স্থূলত্বে ১.২ সেমি.।

কাজ : হৃৎস্পন্দন, শ্বসন, গলাধঃকরণ, কাশি, রক্তবাহিকার সংকোচন, লালাক্ষরণ প্রভৃতির স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে। বমন, মল-মূত্রত্যাগ, রক্তচাপ, পৌষ্টিকনালির পেরিস্ট্যালসিস প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে। সুষুম্না কান্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি করে। মেডুলা অবলংগাটা V, VI, VII, VIII, IX, X, XI ও XII নং করোটিক স্নায়ুর উৎসস্থল হিসেবে কাজ ও সংশ্লিষ্ট স্নায়ুর কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।

গ. পনস : এটি মেডুলা অবলংগাটার উপরের অংশের মেঝেতে অবস্থিত এবং আড়াআড়ি স্নায়ুতন্তু নির্মিত একটি পুরু ব্যান্ড।

কাজ : সেরেবেলাম, সুষুম্না কান্ড ও মস্তিষ্কের অংশের মধ্যে রিলে স্টেশন হিসেবে কাজ করে। দেহের দুপাশের পেশির কর্মকান্ড সমন্বয় করে। স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করে।

মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল / গহ্বর / প্রকোষ্ঠ (Ventricles of Brain)

মস্তিষ্কের গঠন নিরেট নয়, এর অভ্যন্তরে তরলপূর্ণ গহ্বর থাকে। গহ্বরগুলোকে **ভেন্ট্রিকল** (ventricle) বলে। মানুষের মস্তিষ্কে ৪টি ভেন্ট্রিকল দেখা যায়। এগুলো ২টি পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল, ৩য় ও ৪র্থ ভেন্ট্রিকল নামে পরিচিত। ১ম ও ২য় ভেন্ট্রিকলকে **পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল** বলে। মস্তিষ্কের গহ্বরে বিদ্যমান তরল পদার্থের নাম **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড** (cerebrospinal fluid)। নিচে মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকলগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো।

- **পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল** (Lateral Ventricles): অগ্রমস্তিষ্কের দুটি সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারের কেন্দ্রভাগে অবস্থিত ভেন্ট্রিকল দুটিকে **পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল** বলে।

- **তৃতীয় ভেন্ট্রিকল** (Third Ventricle) : অগ্রমস্তিষ্কের দুটি থ্যালামাসের মধ্যবর্তী গহ্বরকে **৩য় ভেন্ট্রিকল** বলে। **ইন্টারভেন্ট্রিকুলার ফোরামিনা**-র সাহায্যে এটি পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল দুটির সাথে যুক্ত থাকে।

- **চতুর্থ ভেন্ট্রিকল** (Fourth Ventricle) : এটি পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে অবস্থান করে। সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট-এর মাধ্যমে এটি তৃতীয় ভেন্ট্রিকলের সাথে যুক্ত থাকে।

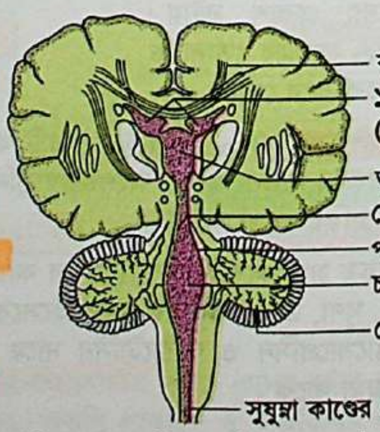

চিত্র ৮.৬ : মস্তিষ্কের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ বা ভেন্ট্রিকলসমূহ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

সেরেব্রাম ও সেরেবেলামের মধ্যে পার্থক্য

তুলনীয় বিষয়	সেরেব্রাম	সেরেবেলাম
কিসের অংশ	অগ্রমস্তিষ্কের অংশ।	পশ্চাৎমস্তিষ্কের অংশ।
আকার ও খণ্ড	মস্তিষ্কের অংশগুলোর মধ্যে বড় ও চারটি খণ্ড বা লোব আছে।	পশ্চাৎমস্তিষ্কের বড় অংশ ও কোন খণ্ড বা লোব নেই।
যোজক	কর্পাস ক্যালোসামের সাহায্যে যুক্ত।	ভার্মিসের সাহায্যে যুক্ত।
কাজ	ঘ্রাণ, শ্রবণ, দৃষ্টি, কথন, স্পর্শ, স্মৃতি, বুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, কর্মপ্রেরণা ইত্যাদির কেন্দ্রবিন্দু।	ভারসাম্য, মাথা ও চোখের সঞ্চালন, পেশি টান, দেহের ভঙ্গি ও স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রক।

মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ ও এদের কাজ ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো

ভ্রূণীয় মস্তিষ্ক	প্রাপ্তবয়স্কের মস্তিষ্ক	কাজ
অগ্রমস্তিষ্ক (প্রোসেনসেফালন)	সেরেব্রাম	দৃষ্টি, শ্রবণ, ঘ্রাণ, কথন, স্পর্শানুভূতি, বুদ্ধিবৃত্তি, স্মৃতিশক্তি, বিচারবুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, কর্মপ্রেরণা ইত্যাদির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।
	থ্যালামাস	গন্ধ ছাড়া অন্যান্য সংবেদী উপাত্তকে সমন্বিত করে সেরেব্রামে প্রেরণ করে; স্পর্শ, ব্যথা, চাপ, ক্রোধ, আবেগ ইত্যাদি অনুভূতির কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে; ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়; এবং সামাজিক আচরণের প্রকাশ ঘটায়।
	হাইপোথ্যালামাস	স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু এবং দেহের আন্তঃসাম্য রক্ষা করে; পিটুইটারি গ্রন্থির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে; ক্রোধ, ভীতি, দেহতাপ নিয়ন্ত্রণ, পরিপাক, চলন ও নিদ্রার ছন্দ এবং প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানসিক ও দৈহিক কাজের সমন্বয় সাধন করে।
মধ্যমস্তিষ্ক (মেসেনসেফালন)	মেসেনসেফালন	অগ্র ও পশ্চাৎমস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করে; বিভিন্ন দর্শন ও শ্রবণ তথ্যের সমন্বয় ঘটায় এবং প্রতিবেদন সৃষ্টি করে।
পশ্চাৎমস্তিষ্ক (রম্বেনসেফালন)	সেরেবেলাম	দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে; মাথা ও চোখের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে; পেশির টান ও দেহভঙ্গিমা রক্ষা করে; দেহের সবধরনের স্বয়ংক্রিয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।
	মেডুলা অবলংগাটা	প্রতিবর্ত কেন্দ্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করে; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, শ্বসন, চর্বণ, খাদ্য গলাধঃকরণ, পরিপাক রস ক্ষরণ, ঘাম নিঃসরণ ইত্যাদি ঘটায়। পৌষ্টিকনালির স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তনালির সংকোচন- প্রসারণ, লালা নিঃসরণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।
	পনস	সেরেবেলাম ও মেডুলাকে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সাথে যুক্ত করে; মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশে সংবেদ প্রবাহের প্রেরণ কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে।

মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহ (Cranial nerves of Man)

যেসব স্নায়ু মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ থেকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়ে করোটিকার বিভিন্ন ছিদ্রপথে বেরিয়ে দেহের বিভিন্ন অঙ্গে বিস্তৃত হয় সেগুলোকে করোটিক স্নায়ু বলে। মানুষের মস্তিষ্কে বারো জোড়া করোটিক স্নায়ু আছে। সম্মুখ অংশ থেকে পরপর এদের রোমান সংখ্যা (I–XII) দিয়ে সূচিত করা হয়। জোড়া স্নায়ুর প্রতিটি প্রতিপাশের অনুরূপ অঙ্গে বিস্তার লাভ করে।

কাজের প্রকৃতিভেদে করোটিক স্নায়ুকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

১. **সংবেদী স্নায়ু** (Sensory nerve) : যেসব স্নায়ু দেহের প্রান্তীয় অঙ্গাদী বা সংবেদী অঙ্গ থেকে স্নায়ু উদ্দীপনা বহন করে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে নিয়ে যায় সেসব স্নায়ুকে সংবেদী স্নায়ু বলে। এ ধরনের স্নায়ু বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন-অন্তর্বাহী, সংজ্ঞাবাহী, অনুভূতিবাহী ইত্যাদি।

২. **চেষ্টীয় স্নায়ু** (Motor nerve) : কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে নির্দেশ বহন করে যেসব স্নায়ু নির্দিষ্ট অঙ্গে পৌঁছে দেয় সেগুলোকে চেষ্টীয় স্নায়ু বলে। এগুলো বহির্বাহী, আজ্ঞাবাহী ইত্যাদি নামেও পরিচিত।

৩. **মিশ্র স্নায়ু** (Mixed nerve) : যেসব স্নায়ুর এক বা একাধিক গুচ্ছ সংবেদী স্নায়ু এবং এক বা একাধিক গুচ্ছ চেষ্টীয় স্নায়ু নিয়ে গঠিত সেসব স্নায়ুকে মিশ্র স্নায়ু বলে। এগুলো সংবেদী ও চেষ্টীয় উভয় প্রকার স্নায়ু উদ্দীপনা পরিবহন করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহের নাম, উৎস, শাখা, বিস্তার, প্রকৃতি ও কাজ

ক্রমিক সংখ্যা	স্নায়ুর নাম	উৎস	শাখা (যদি থাকে)	বিস্তার	প্রকৃতি	কাজ
I	অলফ্যাক্টরি	অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ	–	নাসিকার মিউকাস ঝিল্লি	সংবেদী (sensory)	ঘ্রাণ অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছানো।
II	অপটিক	অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ	–	চোখের রেটিনা	সংবেদী	দর্শন অনুভূতি মস্তিষ্কে পৌছানো।
III	অকুলোমোটর	মধ্যমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ	–	অক্ষিগোলকের পেশি, উর্ধ্ব নেত্রপল্লব উত্তোলন-কারী পেশি ও পিউপিল সংকোচনকারী পেশি	চেষ্টীয় (motor)	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন।
IV	ট্রকলিয়ার	মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশ	–	চোখের সুপিরিয়র অবলিক পেশি	চেষ্টীয়	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন।
V	ট্রাইজেমিনাল	মেডুলা অবলংগাটার অগ্র-পার্শ্বদেশ	অপথ্যালমিক	অক্ষিপল্লব, নাসিকার মিউকাস	সংবেদী	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে প্রেরণ।
			ম্যাক্সিলারি	অক্ষিপল্লব, উর্ধ্ব ও নিম্নচোয়াল	সংবেদী	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে সংবেদ মস্তিষ্কে প্রেরণ।
			ম্যান্ডিবুলার	মুখবিবরের অঙ্কীয়-দেশের পেশি	মিশ্র (mixed)	সংশ্লিষ্ট অঙ্গ সঞ্চালন এবং তাপ, চাপ ও স্পর্শ সংবেদ বহন।
VI	অ্যাবডুসেন্স	মেডুলা অবলংগাটার অঙ্কীয়দেশ	–	বহিঃরেক্টাস নামের চক্ষুপেশি	চেষ্টীয়	অক্ষিগোলকের সঞ্চালন।
VII	ফ্যাসিয়াল	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	প্যালাটাইন	মুখবিবরের ছাদ	সংবেদী	স্বাদ গ্রহণ।
			হায়োম্যান্ডি-বুলার	মুখবিবর ও নিম্নচোয়াল	মিশ্র	চর্বন, গ্রীবা সঞ্চালন।
VIII	ভেস্টিব্যুলোকক্লিয়ার বা অডিটরি	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	–	অন্তঃকর্ণ	সংবেদী	শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষা।
IX	গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	–	জিহ্বা ও গলবিলের মিউকাস পর্দা	মিশ্র	স্বাদগ্রহণ, জিহ্বা ও গলবিলের সঞ্চালন।
X	ভেগাস (নিউমোগ্যাস্ট্রিক)	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	ল্যারিঞ্জিয়াল	স্বরযন্ত্র	মিশ্র	স্বরযন্ত্রের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
			কার্ডিয়াক	হৃৎপিণ্ড	মিশ্র	হৃৎপিন্ডের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
			গ্যাস্ট্রিক	পাকস্থলি	মিশ্র	পাকস্থলির কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
			পালমোনারি	ফুসফুস	মিশ্র	ফুসফুসের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
XI	অ্যাকসেসরি	মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ	–	গলবিল, স্বরযন্ত্র, গ্রীবা ও কাঁধ	চেষ্টীয়	মাথা ও কাঁধের সঞ্চালন।
XII	হাইপোগ্লোসাল	মেডুলা অবলংগাটার অঙ্কীয়দেশ	–	জিহ্বা ও গ্রীবা	চেষ্টীয়	জিহ্বার বিচলন।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

মানুষের ১২ জোড়া করোটিক স্নায়ুর বর্ণনা নিম্নরূপ।

I. অলফ্যাক্টরি (Olfactory) **স্নায়ু :** অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ (অলফ্যাক্টরি লোবের শীর্ষদেশ) থেকে সৃষ্টি হয়ে নাসিকার মিউকাস ঝিল্লিতে বিস্তৃত হয়। এগুলো সংবেদী স্নায়ু এবং মস্তিষ্কে ঘ্রাণ উদ্দীপনা বহন করে।

II. অপটিক (Optic) **স্নায়ু :** অগ্রমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ (অপটিক লোবের অঙ্কীয়দেশ) থেকে সৃষ্টি হওয়ার পর ডান ও বাম অপটিক স্নায়ুদুটি পরস্পরকে আড়াআড়িভাবে ছেদ ও অতিক্রম করার মাধ্যমে ইংরেজি "X" আকৃতির **অপটিক কায়াজমা** (optic chiasma) গঠন করে। এরপর চোখে প্রবেশ করে রেটিনায় বিস্তৃত হয়। এগুলো সংবেদী স্নায়ু। চোখ থেকে দর্শনের অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে আনে।

III. অকুলোমোটর (Oculomotor) **স্নায়ু :** মধ্যমস্তিষ্কের অঙ্কীয়দেশ থেকে উৎপন্ন হয়ে চোখে প্রবেশ করে এবং চোখের ইনফিরিয়র অবলিক ও তিনটি রেকটাস পেশিতে বিস্তৃত হয়। এগুলো চেষ্টীয় স্নায়ু। চক্ষুপেশির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অক্ষিগোলকের সঞ্চালনে সহায়তা করে।

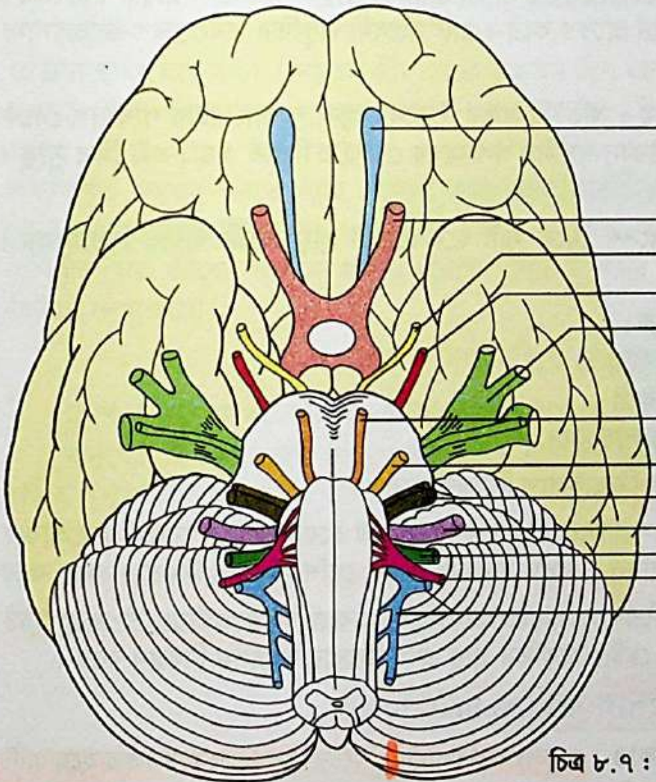

চিত্র ৮.৭ : মানুষের করোটিক স্নায়ুসমূহ

IV. ট্রকলিয়ার (Trochlear) **স্নায়ু (প্যাথেটিক স্নায়ু) :** মধ্যমস্তিষ্কের পৃষ্ঠ-পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে সুপিরিয়র অবলিক নামক চক্ষুপেশিতে বিস্তার লাভ করে। এগুলোও চেষ্টীয় স্নায়ু এবং অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।

V. ট্রাইজেমিনাল (Trigeminal) **স্নায়ু :** মেডুলা অবলংগাটার অগ্র-পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়। যথা–

ক. অপথ্যালমিক (Opthalmic) **:** এটি সবচেয়ে ছোট শাখা। ঊর্ধ্বঅক্ষিপল্লব, মস্তকের অগ্রভাগের ত্বক এবং নাসিকার মিউকাস ঝিল্লিতে বিস্তৃত হয়। শাখাটি সংবেদী প্রকৃতির এবং উল্লেখিত অংশ থেকে মস্তিষ্কে অনুভূতি বহন করে।

খ. ম্যাক্সিলারি (Maxillary) **:** এ শাখা নিম্ন অক্ষিপলব, ঊর্ধ্ব ওষ্ঠ ও ঊর্ধ্ব চোয়ালের মিউকাস ঝিল্লিতে বিস্তৃত হয়। এটিও সংবেদী স্নায়ু এবং সংশ্লিষ্ট অঙ্গ থেকে মস্তিষ্কে অনুভূতি বহন করে।

গ. ম্যান্ডিবুলার (Mandibular) **:** এ শাখা নিম্নচোয়াল, মুখবিবরের তলদেশের পেশি ও ত্বকে বিস্তৃত হয়। এটি একটি মিশ্র স্নায়ু। নিচের চোয়ালের পেশি ও চামড়ার অনুভূতি বহন করে কিন্তু মুখবিবরের পেশিতে চেষ্টীয় স্নায়ুরূপে কাজ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

VI. অ্যাবডুসেন্স (Abducens) **স্নায়ু :** মেডুলা অবলংগাটার অঙ্কীয়দেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে অক্ষিগোলকের বহিঃরেকটাস পেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি চেষ্টীয় স্নায়ু। অক্ষিগোলকের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা এর কাজ।

VII. ফ্যাসিয়াল (Facial) **স্নায়ু :** ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুর ঠিক পিছনে মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে এ স্নায়ুজোড়া সৃষ্টি হয়। এটি একটি মিশ্র প্রকৃতির স্নায়ু। উৎপত্তির পর এ স্নায়ু দুটি শাখায় ভাগ হয়। যথা–

ক. প্যাল্যাটাইন (Palatine) : এর শাখা মুখবিবরের ছাদে বিস্তার লাভ করে। এটি একটি সংবেদী স্নায়ু এবং স্বাদ গ্রহণে কাজ করে।

খ. হায়োম্যান্ডিবুলার (Hyomandibular) : এ শাখা মুখবিবরের তলদেশ বরাবর অগ্রসর হয়ে কানের পর্দা, নিম্নচোয়ালের সংযোগস্থল, মুখবিবরের তলদেশের মিউকাস পর্দা ও পেশিতে স্নায়ু সরবরাহ করে। এটি একটি মিশ্র স্নায়ু। আস্বাদন, মুখের অভিব্যক্তি এবং গ্রীবাপেশির সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করা এর কাজ।

VIII. ভেস্টিব্যুলোকক্লিয়ার বা অডিটরি (Vestibulocochlear or Auditory) **স্নায়ু :** ফ্যাসিয়াল স্নায়ুর পশ্চাৎভাগে মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে। এটি সংবেদী প্রকৃতির এবং শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষার অনুভূতি মস্তিষ্কে বহন করে।

IX. গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল (Glossopharyngeal) **স্নায়ু :** অডিটরি স্নায়ুর পিছনে মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে এ স্নায়ুজোড়া সৃষ্টি হয়। এ স্নায়ু জিহ্বা ও গলবিলের মিউকাস পর্দাসহ গলবিলের পেশিতে বিস্তৃত হয়। এটি **মিশ্র স্নায়ু**। স্বাদগ্রহণ, জিহ্বা ও গলবিলের সঞ্চালনে সহায়তা করে।

X. ভেগাস (Vagus) : মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে প্রতিটি স্নায়ু চারটি শাখায় বিভক্ত হয়। শাখাগুলো হচ্ছে:

ক. **ল্যারিঞ্জিয়াল** (Laryngeal) : স্বরযন্ত্রে বিস্তৃত হয়।
খ. **কার্ডিয়াক** (Cardiac) : হৃৎপিণ্ডে স্নায়ু সরবরাহ করে।
গ. **গ্যাস্ট্রিক** (Gastric) : পাকস্থলিতে স্নায়ু প্রদান করে।
ঘ. **পালমোনারি** (Pulmonary) : ফুসফুসে বিস্তার লাভ করে।

ভেগাস একটি মিশ্র স্নায়ু। শাখাগুলো সংশ্লিষ্ট অঙ্গের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

XI. অ্যাকসেসরি (Accessory) **স্নায়ু :** মেডুলা অবলংগাটার পার্শ্বদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে গলবিল, স্বরযন্ত্র এবং গ্রীবার পেশিতে স্নায়ু সরবরাহ করে। এটি চেষ্টীয় স্নায়ু এবং গলবিল, স্বরযন্ত্র ইত্যাদি অঙ্গের পেশি সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে।

XII. হাইপোগ্লোসাল (Hypoglossal) **স্নায়ু :** সর্বশেষ এ স্নায়ুজোড়া মেডুলা অবলংগাটার অঙ্কীয়দেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে জিহ্বা ও গ্রীবার পেশিতে স্নায়ু প্রদান করে। এটিও চেষ্টীয় প্রকৃতির স্নায়ু এবং জিহ্বার সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

সুষুম্নাকাণ্ড বা স্পাইনাল কর্ড (Spinal cord)

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের পিছনের প্রলম্বিত অংশটি **সুষুম্নাকাণ্ড**। মেডুলা অবলংগাটার নিচের অংশ থেকে উদগত হয়ে এটি **ফোরামেন ম্যাগনাম** (foramen magnum) নামক করোটির পশ্চাৎভাগে অবস্থিত একটি বড় গোল ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে মেরুদণ্ডের নিউরাল নালির মাধ্যমে পিছনে লাম্বার কশেরুকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সুষুম্না কাণ্ড মস্তিষ্কের মতো **মেনিনজেস** দিয়ে আবৃত থাকে। এর বাইরের আবরণকে **ডুরা ম্যাটার**, এবং ভিতরের আবরণকে **পায়া ম্যাটার** বলে। উভয় পর্দার মাঝখানে তৃতীয় আরেকটি পর্দাকে **অ্যারাকনয়েড ম্যাটার** বলে। মস্তিষ্কের মতো সুষুম্নাকাণ্ডের অভ্যন্তরেও গহ্বর আছে। মস্তিষ্কের গহ্বরকে ভেন্ট্রিকল বলা হলেও সুষুম্নাকাণ্ডের গহ্বরকে **কেন্দ্রীয় নালি** (central canal) বলা হয়। এ কেন্দ্রীয় নালির নিচের প্রান্তে একটু স্ফীত অংশ থাকে যা **টারমিনাল ভেন্ট্রিকল** নামে পরিচিত। গহ্বরের মধ্যে **সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড** নামক তরল পদার্থ থাকে। কেন্দ্রীয় নালির

চিত্র ৮.৮ : সুষুম্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

চারদিকে নিউরনের কোষদেহ, ডেনড্রাইট এবং সিন্যাপসে গঠিত ইংরেজি 'H' আকৃতির বা প্রজাপতি আকৃতির গ্রে ম্যাটার (grey matter) অঞ্চল অবস্থিত। বস্তুত স্নায়ুকোষ দিয়ে গঠিত হওয়ায় এমন ধূসর বর্ণের হয়। গ্রে ম্যাটার অঞ্চল হোয়াইট ম্যাটার (white matter) অঞ্চল দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকে। বাইরের হোয়াইট ম্যাটার স্তরে কোন কোষবস্তু নেই, শুধু স্নায়ুসূত্র (অ্যাক্সন) রয়েছে। সুষুম্না কাণ্ড থেকে ৩১ জোড়া **সুষুম্না স্নায়ু** (spinal nerves) উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক স্নায়ুর দুটি করে মূল থাকে, যথা- **পৃষ্ঠীয় মূল** (dorsal root) এবং **অঙ্কীয় মূল** (ventral root)। পৃষ্ঠীয় মূলে **পৃষ্ঠীয় মূল গ্যাংগ্লিয়া** (dorsal root ganglia) থাকে যা সংবেদী নিউরনের কোষদেহ নিয়ে গঠিত।

কাজ : সুষুম্নাকান্ড সরল **স্পাইনাল প্রতিবর্ত** (simple spinal reflex) সমূহের সমন্বয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে, যেমন- হাঁটু ঝাঁকুনি প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি। আবার মূত্রথলির সংকোচনের মতো স্বয়ংক্রিয় প্রতিবর্ত সুষুম্না কাণ্ডের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া সুষুম্না স্নায়ু ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগাযোগ মাধ্যম হচ্ছে সুষুম্নাকাণ্ড।

মানব সংবেদী অঙ্গ (Human Sensory Organs)

প্রত্যেক জীব নিজ পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতন। সতর্ক না হলে নিজের এবং নিজ প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়া স্থবির হয়ে যাবে। নিচুতম জীব থেকে উচ্চতম জীব মানুষ পর্যন্ত সবাই পরিবেশ সম্বন্ধে সজাগ। সংবেদন শক্তির মাধ্যমে জীব পরিবেশগত অবস্থার পরিবর্তন বুঝতে পারে। উচ্চতর মেরুদণ্ডী প্রাণীতে সংবেদন শক্তি বেশি সুগঠিত। কারণ এদের রয়েছে উন্নত স্নায়ুতন্ত্র ও সংজ্ঞাবহ ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র। সংবেদী অঙ্গের মাধ্যমে আমরা বাহ্যজগত অনুভব করতে পারি। চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক-এ পাঁচটি হচ্ছে মানুষের সংবেদী অঙ্গ। সাধারণ ভাষায় এগুলো **পঞ্চ-ইন্দ্রিয়** নামে পরিচিত। উন্নত স্নায়ুতন্ত্র, অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র, সংবেদী অঙ্গ নিয়ে মানুষ সর্বোতভাবে পৃথিবীর সেরা জীবের আসনে আসীন হয়েছে। নিচে মানুষের দর্শন এবং শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষাকারী সংবেদী অঙ্গের বিবরণ দেয়া হলো।

চোখ – দর্শনেন্দ্রিয় (Eye – Organ of Vision)

চোখ এমন এক সংবেদী অঙ্গ যা আলোকের মাধ্যমে দৃষ্টি সঞ্চার করে।

মানুষের চোখদুটি মাথার দুপাশে বহিঃকর্ণ ও নাসারন্ধ্রের প্রায় মধ্যবর্তী অংশে অবস্থিত। চোখ গোল **অক্ষিগোলক**-এ গঠিত। কয়েকটি আনুষঙ্গিক অঙ্গও চোখের সাথে জড়িত। চোখের মাত্র ১/৬ অংশ বাইরে উন্মোচিত, বাকি ৫/৬ অংশই কোটরের ভিতরে অবস্থান করে। চোখের পর্দায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত রসে চোখ সিক্ত থাকে।

মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন-**অক্ষিগোলক** (eye ball) ও **আনুষঙ্গিক অংশ** (accessory parts)। নিচে মানুষের চোখের বিভিন্ন অংশের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হলো।

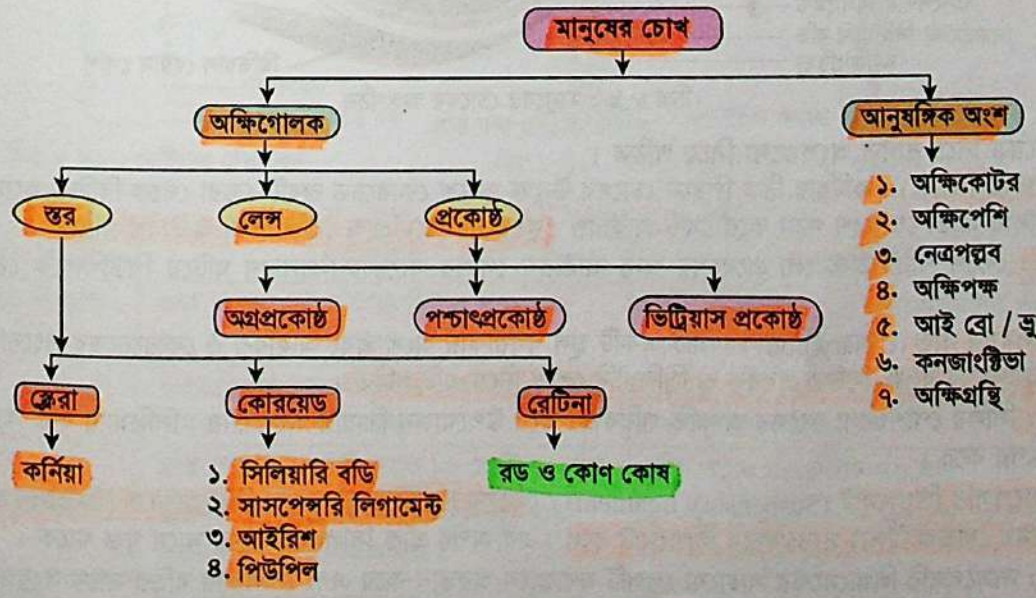

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

অক্ষিগোলক (Eye ball)

মানুষের চোখ দেখতে গোল বলের মতো হওয়ায় অক্ষিগোলক নামে পরিচিত। প্রত্যেক গোলক তিনটি প্রধান অংশ নিয়ে গঠিত–A. অক্ষিগোলকের স্তর, B. লেন্স ও C. প্রকোষ্ঠ। নিচে অংশগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো।

A. অক্ষিগোলকের স্তর (Layers of Eye ball)

১. স্ক্লেরা (Sclera) বা স্ক্লেরোটিক স্তর (Sclerotic layer) : এটি অক্ষিগোলকের বাইরের সাদা, অস্বচ্ছ ও তন্তুময় স্তর। এটি অস্বচ্ছ হলেও চোখের সামনের দিকে খুব পাতলা ও স্বচ্ছ পর্দায় পরিণত হয়েছে। স্বচ্ছ পর্দাটির নাম **কর্নিয়া** (cornea)। কর্নিয়ায় রক্ত সরবরাহ নেই। এটি অ্যাকুয়াস হিউমার থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে। আইরিশের উপরের অংশ ছাড়া স্ক্লেরার সম্মুখের সাদা অংশ একটি পাতলা স্বচ্ছ পর্দা বা **কনজাংক্টিভা** (conjunctiva)-য় আবৃত। পর্দাটি স্ক্লেরাকে স্ক্লেরা ও কর্নিয়ার সংযোগস্থল (sclero-corneal junction) পর্যন্ত আবৃত করে এবং চোখের পাতার ভিতরেও বিস্তৃত থাকে। **কনজাংক্টিভা কর্নিয়াকে আবৃত করে না।**

কাজ : স্ক্লেরা চোখের আকৃতি বজায় রাখে, চোখকে সংরক্ষণ করে ও পেশি সংযুক্ত রাখে। কর্নিয়ার মধ্য দিয়ে চোখের ভিতর আলো প্রবেশ করে। কনজাংক্টিভা –(i) চোখের সম্মুখতল আর্দ্র ও পিচ্ছিল রাখে, (ii) অক্ষিপল্লবের ভিতরের তল সিক্ত ও পিচ্ছিল রাখে এবং (iii) চোখকে ধূলাবালি ও জীবাণু থেকে রক্ষা করে।

২. কোরয়েড (Choroid) : এটি স্ক্লেরার নিচে অবস্থিত রক্তবাহিকাসমৃদ্ধ ও **মেলানিন** (melanin) **রঞ্জকে রঞ্জিত স্তর**। মেলানিন রঞ্জক থাকায় এটি কালো দেখায়।

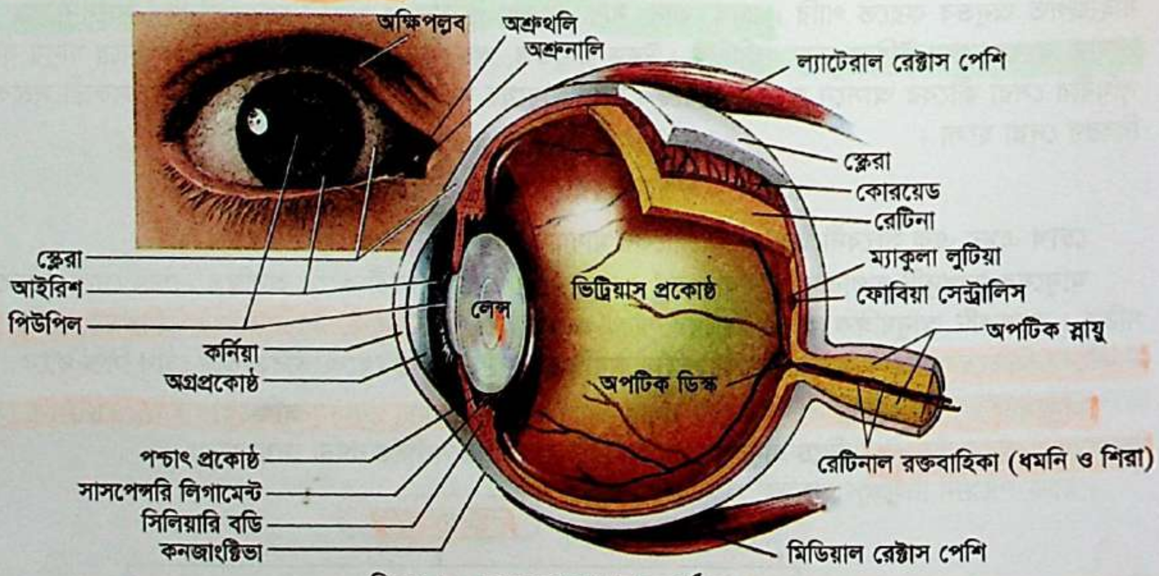

চিত্র ৮.৯ : মানুষের চোখের অন্তর্গঠন

কোরয়েড নিচে বর্ণিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত।

□ **আইরিশ** (Iris) : কর্নিয়ার ঠিক পিছনে চোখের উন্মুক্ত অংশে কোরয়েড স্তরটি স্ক্লেরা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি বৃত্তাকার থালার মতো যে অংশ গঠন করে সেটি আইরিশ। দুধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দিয়ে আইরিশ গঠিত।

কাজ : লেন্সে পরিমিত আলো প্রবেশের জন্য আইরিশ পেশির সংকোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে পিউপিলকে ছোট-বড় করে।

□ **সিলিয়ারি বডি** (Ciliary body) : এটি একটি স্থূল বলয়াকার অংশ এবং আইরিশ ও কোরয়েডের সংযোগ স্থলে অবস্থিত। সিলিয়ারি বলয়, সিলিয় প্রবর্ধক ও সিলিয়ারি পেশি নিয়ে এটি গঠিত।

কাজ : সিলিয় পেশিগুলো লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করে উপযোজন ক্রিয়ায় অংশ নেয়। সিলিয়ারি বডি অ্যাকুয়াস হিউমার উৎপন্ন করে।

□ **সাসপেন্সরি লিগামেন্ট** (Suspensory ligament) : লেন্সের চতুর্দিক বেষ্টনকারী লিগামেন্টকে (ফিতাসদৃশ দৃঢ় ও নমনীয় তন্তুময় যোজক টিস্যু) সাসপেন্সরি লিগামেন্ট বলে। এর অপর প্রান্ত সিলিয়ারি বডির সাথে যুক্ত থাকে।

কাজ : সাসপেন্সরি লিগামেন্টের সাহায্যে লেন্সটি যথাস্থানে অবস্থান করে এবং সিলিয়ারি বডির সাথে সংযুক্ত থাকে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

❐ **পিউপিল** (Pupil) : পিউপিল হচ্ছে আইরিশের কেন্দ্রে অবস্থিত এবং বৃত্তাকার ও অরীয় পেশিতে বেষ্টিত একটি ছোট ছিদ্রবিশেষ। আলোকের তীব্রতা অনুযায়ী আইরিশের অরীয় ও বৃত্তাকার পেশির সংকোচন-প্রসারণের মাধ্যমে পিউপিলটি প্রয়োজন মতো ছোট-বড় করা যায়। অরীয় পেশি সংকুচিত হলে পিউপিল প্রসারিত হয়, বৃত্তাকার পেশি সংকুচিত হলে পিউপিল সংকুচিত হয়।

কাজ : পিউপিলের মধ্য দিয়ে চোখে আলো প্রবেশ করে। মৃদু আলোতে পিউপিল বড় এবং উজ্জ্বল বা তীব্র আলোতে পিউপিল ছোট হয়।

৩. রেটিনা (Retina) : রেটিনা হচ্ছে অক্ষিগোলকের প্রাচীরের সর্বাপেক্ষা ভিতরের স্তর এবং একমাত্র আলোক সংবেদী অংশ। এটি ১০টি উপস্তরে গঠিত। বাইরের কোরয়েড সংলগ্ন স্তরটি রঞ্জক পদার্থবিশিষ্ট আলোক সংবেদী কোষস্তরে নির্মিত। চোখের সামনের দিকে রেটিনা সিলিয়ারি অঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত। রেটিনার একটি স্থানে **অপটিক করোটিক স্নায়ু** প্রবেশ করে। রেটিনায় দুধরনের আলো-সংবেদী কোষ আছে, যথা-রড (rod) ও **কোণ** (cone) কোষ। রডকোষগুলোর বাইরের খণ্ড রড আকৃতির। এতে **রডোপসিন** (rhodopsin) নামক আলোক সংবেদী রঞ্জক পদার্থ ও ভিটামিন A থাকে। কোণকোষগুলোর বাইরের খন্ড কোণাকার ও এতে **আয়োডপসিন** (iodopsin) নামক আলোক সংবেদী রঞ্জক পদার্থ উপস্থিত। এছাড়া এটি **ফটোপসিন** (photopsin) নামক প্রোটিন সমৃদ্ধ। চোখে রডকোষের সংখ্যা ১২ কোটি থেকে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ, অন্যদিকে কোণকোষের সংখ্যা ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ। কোণকোষগুলো উজ্জ্বল আলো ও রঙিন বস্তু দর্শনের জন্য এবং ছবির সঠিক বিশ্লেষণের জন্য উপযোগী। রডকোষগুলো অনুজ্জ্বল আলোতে (dim light) দর্শনের উপযোগী। উভয় কোষের ভিতরের খন্ডে প্রচুর পরিমাণ মাইটোকন্ড্রিয়া থাকে। কোষের প্রান্তীয় সিন্যাপটিকাল অংশ স্ফীত হয়ে **বাল্ব** (bulb) গঠন করে যা দ্বিমেরু নিউরনের সাথে সিন্যাপস গঠন করে।

তিন ধরনের কোণকোষ আছে বলে মনে করা হয়। প্রথম ধরনের কোণকোষ লাল রং, দ্বিতীয় ধরন সবুজ রং এবং তৃতীয় ধরন নীল রঙের জন্য। তিন ধরনের কোষের সবই সমানভাবে উদ্দীপ্ত হলে সাদা রং দৃষ্ট হয়।

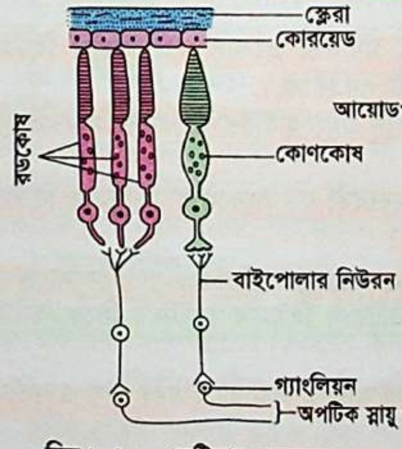

চিত্র ৮.১০ : রেটিনার প্রস্থচ্ছেদ

চিত্র ৮.১১ : কোণকোষ (বায়ে) এবং রডকোষ (ডানে)

রডকোষ ও কোণকোষের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	রডকোষ	কোণকোষ
১. আকার-আকৃতি	লম্বা ও সরু; ২ মাইক্রোমিটার পুরু এবং ৫০ মাইক্রোমিটার লম্বা।	খাটো ও প্রশস্ত; ৩-৫ মাইক্রোমিটার পুরু ও ৪০ মাইক্রোমিটার লম্বা।
২. গঠন	বাইরের খণ্ড রড আকৃতির এবং রডোপসিন নামক রঞ্জক পদার্থসমৃদ্ধ।	বাইরের খন্ড কোণ আকৃতির এবং আয়োডপসিন নামক রঞ্জক পদার্থসমৃদ্ধ।
৩. সংখ্যা	প্রতি চোখে ১২ কোটি থেকে ১২ কোটি ৫০ লক্ষ।	প্রতি চোখে ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ।
৪. সংবেদনশীলতা	আলোর প্রতি অধিক সংবেদনশীল, তাই রাতের দর্শনে ব্যবহৃত হয়।	আলোর প্রতি কম সংবেদনশীল, তাই দিনের দর্শনে ব্যবহৃত হয়।
৫. প্রতিবিম্ব	বস্তুর সাদাকালো প্রতিবিম্ব তৈরি করে।	বস্তুর রঙিন প্রতিবিম্ব তৈরি করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

রেটিনায় নিচে বর্ণিত অংশগুলো পাওয়া যায়।

- **অপটিক ডিস্ক** (Optic disc) : অক্ষিগোলকের যে বিন্দুতে নিউরনের অ্যাক্সনগুলো মিলিত হয়ে **অপটিক স্নায়ু** গঠন করে তার নাম অপটিক ডিস্ক। এখানে কোন রড ও কোণকোষ না থাকায় এটি আলোক সংবেদী নয়। তাই একে **অন্ধবিন্দু** (blind spot)-ও বলা হয়।
- **ম্যাকুলা লুটিয়া** (Macula lutea) : অপটিক ডিস্কের উপর দিকে একটি ডিম্বাকার ও হলদে অঞ্চল থাকে। একে ম্যাকুলা লুটিয়া বলে। এর কেন্দ্রে ছোট একটি গর্ত (pit) থাকে যার নাম **ফোবিয়া সেন্ট্রালিস** (fovea centralis) বা **পীতবিন্দু**। এ অংশে কিছু সংখ্যক রডকোষ কিন্তু প্রচুর কোণকোষ দেখা যায়।
- **অপটিক স্নায়ু** : রেটিনা স্তরে গ্যাংলিয়নসমৃদ্ধ নিউরনের অ্যাক্সনগুলো একত্রিত হয়ে **অপটিক স্নায়ু** গঠন করে। রেটিনায় সৃষ্ট প্রতিবিম্ব অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছায়।

রেটিনার কাজ : রেটিনায় বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। এর কোণকোষগুলো তীব্র আলোয় ও রডকোষগুলো অল্প আলোয় প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। পীতবিন্দুতে দর্শনীয় বস্তুর সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়।

B. লেন্স (Lens)

পিউপিলের পিছনে অবস্থিত ও সিলিয়ারি বডির সাথে সাসপেন্সরি লিগামেন্টযুক্ত হয়ে ঝুলে থাকা একটি স্বচ্ছ স্থিতিস্থাপক ও দ্বিউত্তল চাকতির মতো অংশকে **লেন্স** বলে। লেন্সের পিছনের চেয়ে সামনের দিক বেশি চাপা, নরম ও কিছুটা হলুদ। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এটি আরো চাপা, হলদে ও দৃঢ় হয়, ফলে এর স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়। লেন্সে রক্ত সরবরাহ নেই। সিলিয় পেশির সংকোচন-প্রসারণে লেন্সও সংকুচিত-প্রসারিত হয়। লেন্সের সাহায্যে আলোক রশ্মি বক্রতা প্রাপ্ত হয়ে রেটিনায় নিক্ষিপ্ত হয়। বস্তু থেকে আগত আলোক রশ্মি লেন্সের মাধ্যমে রেটিনার নির্দিষ্ট অংশে প্রতিফলিত হয়।

C. অক্ষিগোলকের গহ্বর বা প্রকোষ্ঠ (Chambers)

অক্ষিগোলকে তরল পদার্থ পূর্ণ তিনটি গহ্বর বা প্রকোষ্ঠ আছে।

i. **অগ্রপ্রকোষ্ঠ** (Anterior chamber) : এটি কর্নিয়া ও আইরিশের মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠ। **অ্যাকুয়াস হিউমার** (aquous humour) নামক পানির মতো তরল পদার্থ দিয়ে প্রকোষ্ঠটি পূর্ণ থাকে।

ii. **পশ্চাৎপ্রকোষ্ঠ** (Posterior chamber) : এটিও অ্যাকুয়াস হিউমারে পূর্ণ এবং আইরিশ ও লেন্সের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত প্রকোষ্ঠ।

iii. **ভিট্রিয়াস প্রকোষ্ঠ** (Vitreous chamber) : এটি লেন্স ও রেটিনার মধ্যবর্তী বড় প্রকোষ্ঠ যা **ভিট্রিয়াস হিউমার** (vitreous humour) নামক জেলির মতো স্বচ্ছ চটচটে পদার্থে পূর্ণ।

ভিট্রিয়াস হিউমার প্রকৃতপক্ষে ডিমের সাদা অংশের মতো ঘন কিন্তু স্বচ্ছ। ৯৯% পানি এবং ১% কোলাজেন ও হায়াল্যুরোনিক এসিড (hyaluronic acid)-এ ভিট্রিয়াস হিউমার গঠিত। ভিট্রিয়াস হিউমার রেটিনার দিকে আলোর প্রতিসরণে সাহায্য করে এবং অক্ষিগোলকের আকৃতি বজায় রাখে।

অ্যাকুয়াস হিউমার আলোর প্রতিসরণে সাহায্য করে, চোখের সম্মুখ অংশের আকৃতি ঠিক রাখে এবং লেন্স ও কর্নিয়ায় পুষ্টি জোগায়।

চোখের আনুষঙ্গিক অংশ (Accessory Parts of Eye)

১. **অক্ষিকোটর** (Orbit) : এটি মস্তক ও মুখমন্ডলের অস্থি দিয়ে নির্মিত প্রাচীরে আবদ্ধ একটি ফাঁপা গর্তবিশেষ। এতে অক্ষিগোলক সুরক্ষিত থাকে।

২. **অক্ষিপেশি** (Eye muscle) : প্রতিটি অক্ষিগোলক ৬টি করে অক্ষিপেশির সাহায্যে অক্ষিকোটরের মধ্যে অবস্থান করে। এর মধ্যে ৪টি **রেক্টাস** (rectus) পেশি এবং ২টি **অবলিক** (oblique) পেশি। পেশিগুলো নিম্নরূপ:

- **মিডিয়াল রেক্টাস পেশি** : অক্ষিগোলককে ভিতরের দিকে ঘুরতে সাহায্য করে।
- **ল্যাটেরাল রেক্টাস পেশি** : অক্ষিগোলককে বাইরের দিকে ঘুরতে সাহায্য করে।
- **সুপিরিয়র রেক্টাস পেশি** : অক্ষিগোলককে উপর দিকে ঘুরতে সাহায্য করে।
- **ইনফিরিয়র রেক্টাস পেশি** : অক্ষিগোলককে নিচের দিকে ঘুরতে সাহায্য করে।
- **সুপিরিয়র অবলিক পেশি** : অক্ষিগোলককে অপটিক স্নায়ু ও কর্নিয়ার মধ্যবর্তী অক্ষ বরাবর ঘুরতে সাহায্য করে।
- **ইনফিরিয়র অবলিক পেশি** : সুপিরিয়র অবলিক পেশির ঠিক বিপরীতধর্মী একটি পেশি।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

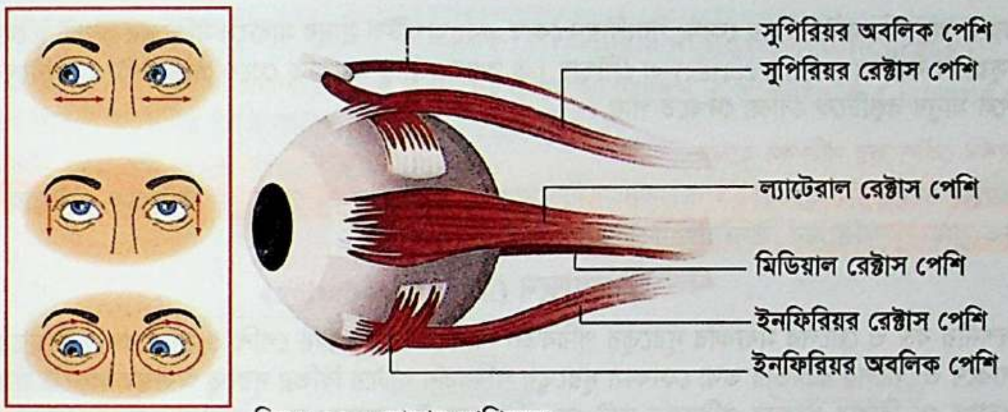

চিত্র ৮.১২ : চোখের পেশিসমূহ

উপরোক্ত পেশিগুলো চোখকে অক্ষিকোটরের স্বস্থানে আটকে রাখে এবং অক্ষিগোলককে ঘুরতে সাহায্য করে।

৩. **অক্ষিপল্লব বা চোখের পাতা** (Eyelid) : প্রত্যেক চোখের উপরে ও নিচে রোমযুক্ত পেশিবহুল পাতার মতো দুটি পর্দা থাকে। উপরেরটি **ঊর্ধ্ব অক্ষিপল্লব** ও নিচেরটি **নিম্ন অক্ষিপল্লব**। এছাড়া আরো একটি অক্ষিপত্র রয়েছে যা **উপ-অক্ষিপল্লব** বা **নিকটিটেটিং পর্দা** (nictitating membrane) নামে পরিচিত। এটি মানুষের একটি **লুপ্তপ্রায় নিষ্ক্রিয়** (vestigeal organ) অঙ্গ হিসেবে উভয় চোখের ভিতরের কোণায় অবস্থিত এবং দেখতে লালচে রঙের মাংসপিণ্ডের মতো। অক্ষিপল্লব ধূলাবালি, তীব্র আলো ও বাতাস থেকে চোখকে রক্ষা করে।

৪. **অক্ষিপক্ষ** (Eyelash) : চোখের পাতার লোমকে **অক্ষিপক্ষ** বলে। এগুলো চোখে ধূলাবালি প্রবেশে বাধা দেয়।

৫. **আই ব্রো** (Eye brow) : চোখের পাতার উপর অংশের লোমকে **আই ব্রো** বলে। কপাল থেকে গড়িয়ে আসা ঘামের চোখে প্রবেশ প্রতিহত করাই এর কাজ।

৬. **অক্ষিগ্রন্থি** (Eye glands) : প্রত্যেক চোখে ৩ ধরনের গ্রন্থি থাকে, যথা-**অশ্রুগ্রন্থি** (lacrimal gland), **হার্ডেরিয়ান গ্রন্থি** (harderian gland) এবং **মেবোমিয়ান গ্রন্থি** (meibomian gland)। হার্ডেরিয়ান ও মেবোমিয়ান গ্রন্থি নিঃসৃত তৈলাক্ত ক্ষরণ অক্ষিপল্লব ও কর্নিয়াকে পিচ্ছিল রাখে। অশ্রুগ্রন্থি নিঃসৃত **অশ্রু** নামে এক ধরনের লবণাক্ত (সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বনেট ও পানি) ও জীবাণুরোধক তরল (লাইসোজাইম এনজাইম) ক্ষরণ করে কনজাংক্টিভাকে নরম, সিক্ত, পরিচ্ছন্ন ও জীবাণুমুক্ত রাখে।

৭. **কনজাংক্টিভা** (Conjunctiva) : অক্ষিপল্লবের ভিতরের অংশ এবং স্ক্লেরার অগ্রাংশ (সাদা অংশ) যে স্বচ্ছ পাতলা মিউকাস স্তরে আবৃত থাকে তার নাম কনজাংক্টিভা। এটি চোখকে ধূলাবালি ও জীবাণু থেকে রক্ষা করে। চোখের সম্মুখতল এবং অক্ষিপল্লবের ভিতরের তল আর্দ্র ও পিচ্ছিল রাখে।

প্রতিবিম্ব গঠন ও দর্শন প্রক্রিয়া (Formation of Image and Mechanism of Vision)

দর্শন প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং পাঁচটি ধাপে সংঘটিত হয়, যথা–

১. চোখে আলোর প্রবেশ,
২. রেটিনায় প্রতিবিম্ব গঠন,
৩. প্রতিবিম্ব গঠনকারী রশ্মির বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তর,
৪. প্রতিবিম্ব সম্পর্কে স্নায়ু অনুভূতি (impulse) মস্তিষ্কে প্রেরণ এবং
৫. মস্তিষ্কের মাধ্যমে স্নায়ু অনুভূতির বিশ্লেষণ ও দর্শন।

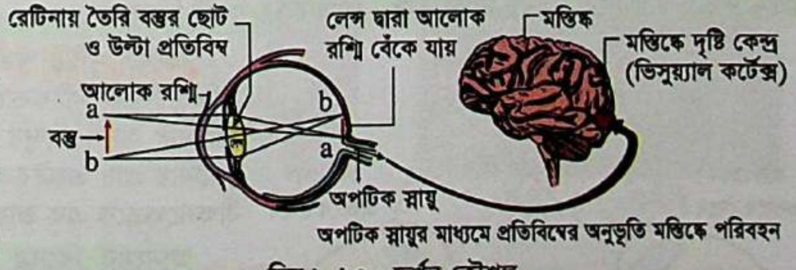

চিত্র ৮.১৩ : দর্শন কৌশল

আমরা যে বস্তুকে দেখি, আলোকিত সে বস্তু থেকে আলোক রশ্মি প্রথমে কর্নিয়ার উপর পড়ে। স্বচ্ছ কর্নিয়ায় প্রতিসরিত আলোক রশ্মি পিউপিলের মাধ্যমে লেন্সে এসে পড়ে। দ্বিউত্তল লেন্স এ আলোক রশ্মিকে পুনরায় প্রয়োজনমত প্রতিসরণের মাধ্যমে রেটিনায় প্রতিফলিত করে। ফলে রেটিনার উপর বস্তুর একটি উল্টা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। রেটিনায় সৃষ্ট প্রতিবিম্ব রেটিনার আলোক সংবেদী কোষ (রডকোষ ও কোণকোষ)-কে উদ্দীপ্ত (stimulate) করে। আলোক সংবেদী

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কোষের এ অনুভূতি বাইপোলার কোষ, গ্যাংলিয়ন কোষ এবং অপটিক স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের অপটিক লোবের দৃষ্টি কেন্দ্র বা **ভিসুয়্যাল কর্টেক্স** (visual cortex)-এ পৌছায়। এ অঞ্চলে স্নায়ু অনুভূতি থেকে প্রাপ্ত উল্টা প্রতিবিম্বের তথ্য বিশ্লেষণ হয় ফলে মানুষ বস্তুটিকে সোজা দেখতে পায়।

দর্শন কৌশলের গতিপথ হচ্ছে–

আলোকরশ্মি → কর্নিয়া → অ্যাকুয়াস হিউমার → পিউপিল → লেন্স → ভিট্রিয়াস হিউমার → রেটিনা → অপটিক স্নায়ু → মস্তিষ্কের ভিস্যুয়াল কর্টেক্স।

উপযোজন (Accommodation)

দর্শনীয় বস্তু ও লেন্সের মধ্যকার দূরত্বের পরিবর্তন না করেই সিলিয়ারি পেশি ও সাসপেন্সরি লিগামেন্টের সংকোচন বা প্রসারণে ও লেন্সের বক্রতার তথা ফোকাস দূরত্বের পরিবর্তন ঘটিয়ে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বস্তুকে সমান স্পষ্ট দেখার জন্য চোখে যে বিশেষ ধরনের পরিবর্তন ঘটে সে প্রক্রিয়াকে উপযোজন বলে। চোখ থেকে ৬ মিটার দূরত্বে অবস্থিত কোনো বস্তুর প্রতিবিম্ব স্বাভাবিকভাবে রেটিনায় প্রতিফলিত হয়। এ দূরত্বের কম বেশি হলে বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনায় ফোকাসের জন্য উপযোজন প্রয়োজন। মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীতে উপযোজন একটি বৈশিষ্ট্য। এ সময় সিলিয়ারি বডির বৃত্তাকার পেশির সংকোচনের ফলে সাসপেনসরি লিগামেন্টের প্রসারণ ঘটে। ফলে লেন্সের বক্রতা বাড়ে ও খাটো হয়। লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কমে গিয়ে কাছের বস্তুটি দৃষ্টিগোচর হয়। দূরের বস্তু দেখার সময় এর উল্টোটি ঘটে। অর্থাৎ সিলিয়ারি বডির বৃত্তাকার পেশির প্রসারণ, সাসপেনসরি লিগামেন্টের সংকোচনে লেন্সের বক্রতা কমে, লেন্স সরু ও লম্বা হয় এবং ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যায় এবং দূরের বস্তু থেকে আলোকরশ্মি রেটিনায় পতিত হয়ে প্রতিবিম্ব গঠন করে। তখন বস্তুটি দৃশ্যমান হয়। যে দৃষ্টিতে কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখা যায় না তাকে **হাইপারমেট্রোপিয়া** (hypermetropia) বলে। উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহারে এ রোগ সেরে যায়। যদি দূরের বস্তু দেখতে সমস্যা হয় তবে তাকে **মায়োপিয়া** (myopia) বলে। অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহারে এ সমস্যা দূরীভূত হয়।

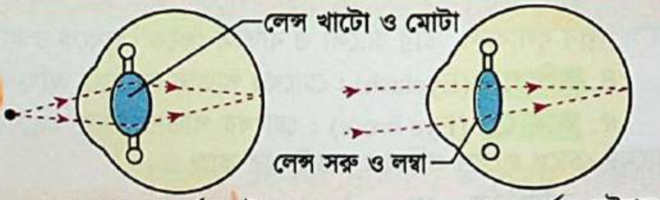

চিত্র ৮.১৪ : মানুষের চোখের উপযোজন

দ্বিনেত্র দৃষ্টি (Binocular vision) বা স্টেরিওস্কোপিক দৃষ্টি (Sterioscopic vision)

মানুষের দৃষ্টিকে **দ্বিনেত্র দৃষ্টি** বলে। কারণ আমরা কোনো দৃশ্যযোগ্য বস্তু একই সাথে দুচোখের সাহায্যে এককভাবে দেখতে পাই। কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি রেটিনায় পড়লে যে স্নায়ু উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মস্তিষ্কের দৃষ্টিকেন্দ্রে (visual cortex) একটি মাত্র প্রতিবিম্বে একত্রীভূত হয়, ফলে আমরা দুচোখে একটি বস্তুকে এককভাবে দেখি।

মানুষের চোখদুটি মাথার সামনে ৬.৩ সেন্টিমিটার দূরত্বে অবস্থিত। ফলে কোনো বস্তু দেখার সময় প্রত্যেক চোখ বস্তুটির একটি করে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। প্রতিবিম্ব দুটির একটি থেকে অন্যটি কিছুটা আলাদা। উভয় উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রেরিত হয়। মস্তিষ্ক দুটি উদ্দীপনাকে সমন্বয় সাধন করে। ফলে বস্তুর একটি **ত্রিমাত্রিক** (three dimensional) চিত্র দেখা যায়।

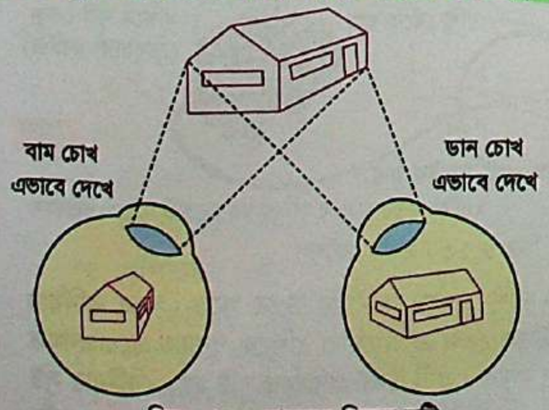

চিত্র ৮.১৫ : মানুষের দ্বিনেত্র দৃষ্টি

দ্বিনেত্র দৃষ্টির শর্ত : ১. নির্দিষ্ট বস্তুতে নিবদ্ধ করার জন্য অক্ষিপেশিকে সঠিকভাবে সংকুচিত হতে হবে। ২. দুচোখের রেটিনায় সদৃশ বিন্দুর উপস্থিতি থাকতে হবে। ৩. দুচোখের রেটিনায় প্রায় একইরকম প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হতে হবে। ৪. দুটি বীক্ষণক্ষেত্রকে এক জায়গায় পরস্পর মিলে যেতে হবে।

মানুষের দ্বিনেত্র দৃষ্টি থাকার সুবিধা : ১. দুচোখের সাহায্যে একই সাথে কোনো বস্তুকে একইভাবে দেখে। ২. কোনো বস্তুকে গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারে। ৩. দৃষ্টিক্ষেত্র অনেক বড় হয়। ৪. বস্তু ও চোখের মধ্যবর্তী দূরত্বকে সূক্ষ্মভাবে মূল্যায়ন করতে পারে। ৫. বিভিন্ন কাজ সুনিপুণভাবে সম্পন্ন করতে পারে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

কান– শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষাকারী অঙ্গ (Ear– Hearing and Equilibrium organ)

কান এমন এক বিশেষ ইন্দ্রিয় যা একাধারে **শ্রবণ** ও দেহের **ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ**-এ অংশগ্রহণ করে। মানুষের মাথার দুপাশে ও চোখের পিছনে করোটির শ্রুতিকোটরে দুটি কান অবস্থান করে।

মানুষের প্রতিটি কান ৩টি অংশে বিভক্ত, যথা–**বহিঃকর্ণ** (External ear), **মধ্যকর্ণ** (Middle ear) ও **অন্তঃকর্ণ** (Internal ear)। কানের অংশগুলো নিচে ছক আকারে দেখানো হলো।

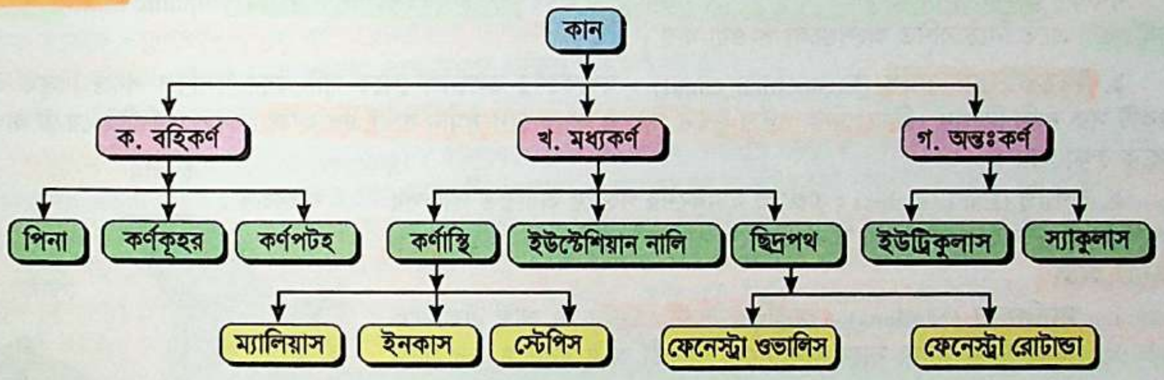

নিচে কানের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দেয়া হলো।

ক. বহিঃকর্ণ (External ear)

বাইরের দিক থেকে এটি কানের প্রথম ভাগ এবং নিম্নোক্ত ৩টি অংশ নিয়ে গঠিত।

১. **পিনা** (Pinna) বা **অরিকল** (Auricle) বা **কর্ণছত্র** : এটি মাথার দুপাশে অবস্থিত ও তরুণাস্থি নির্মিত কানের বাইরের প্রসারিত ও লোমশ অংশ। এর অভ্যন্তরে পেশিতন্তু থাকলেও মানুষ কান নাড়াতে পারে না। কোনো শব্দ ভালভাবে শোনার জন্য যে দিক থেকে শব্দ আসে সেদিকে মাথাসহ কানের ছিদ্রকে ঘোরাতে হয়। শব্দতরঙ্গ সংগ্রহ ও কেন্দ্রীভূত করে বহিঃঅডিটরি মিটাস বা কর্ণকুহরে প্রেরণ করা পিনার কাজ।

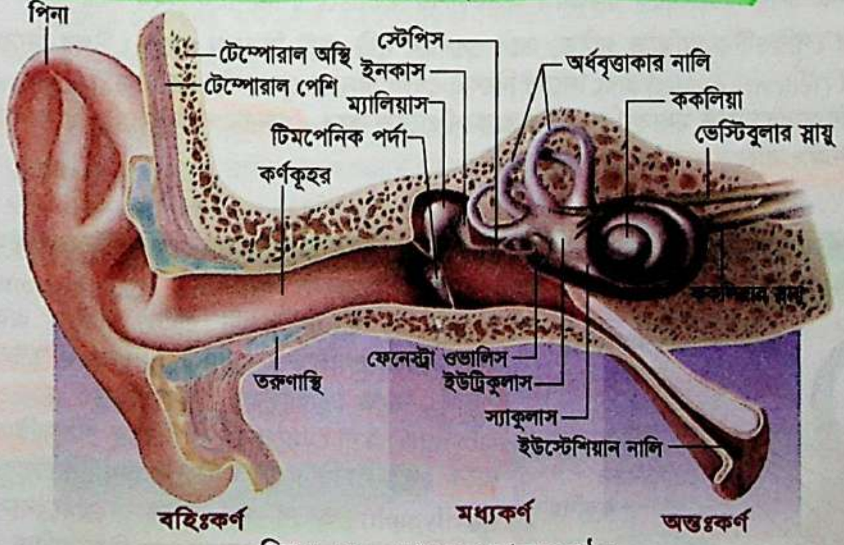

চিত্র ৮.১৬ : মানুষের কানের গঠন

চিত্র ৮.১৭ : কর্ণাস্থি

২. **বহিঃঅডিটরি মিটাস** (External auditory meatus) **বা কর্ণকুহর** : পিনার কেন্দ্রে কানের বহিঃছিদ্র থেকে যে সরু নালিপথ কানের টিমপেনিক পর্দা পর্যন্ত বিস্তৃত তার নাম বহিঃঅডিটরি মিটাস। এর বাইরের এক-তৃতীয়াংশ তরুণাস্থি দিয়ে এবং ভিতরের দুই-তৃতীয়াংশ অস্থিতে (temporal bone) গঠিত। এটি মোমগ্রন্থি ও সূক্ষ্ম রোমযুক্ত ত্বকে আবৃত। এর মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ লম্বভাবে টিমপেনিক পর্দায় পৌছে। এতে অবস্থিত মোম ও লোম কানের ভিতরে ধুলাবালি প্রবেশে বাঁধা দেয় এবং জীবাণু নাশ করে। এটি টিমপেনিক পর্দার অনুকূল উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বজায় রাখে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৩. টিমপেনিক পর্দা (Tympanic membrane) **বা কর্ণপটহ :** বহিঃঅডিটরি মিটাসের শেষ প্রান্তে এবং মধ্যকর্ণের মুখে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত ডিম্বাকার, স্থিতিস্থাপক পর্দাকে টিমপেনিক পর্দা বলে। এর বাইরের দিক অবতল, ভিতরের দিক উত্তল। এর সাথে মধ্যকর্ণের **ম্যালিয়াস** অস্থি যুক্ত থাকে। বহিঃকর্ণকে মধ্যকর্ণ থেকে পৃথক করে রাখা, শব্দতরঙ্গে কেঁপে উঠা এবং শব্দতরঙ্গকে সমতলে মধ্যকর্ণে পরিবহন করা টিমপেনিক পর্দার কাজ।

খ. মধ্যকর্ণ (Middle ear)

মধ্যকর্ণ একটি অসম আকৃতির বায়ুপূর্ণ প্রকোষ্ঠ বিশেষ এবং করোটির **টিমপেনিক বুলা** (tympanic bulla)-র ভিতর অবস্থিত। এতে নিচে বর্ণিত অংশগুলো পাওয়া যায়।

১. ইউস্টেশিয়ান নালি (Eustachian canal) : মধ্যকর্ণের তলদেশ থেকে সৃষ্টি হয়ে গলবিল পর্যন্ত বিস্তৃত এটি একটি সরু নালি বিশেষ। টিমপেনিক পর্দার উভয় পাশের বায়ুর চাপ সমান রাখা এর কাজ। ফলে কর্ণপটহ ফেটে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়।

২. কর্ণাস্থি (Ear ossicles) : এগুলো মধ্যকর্ণের গহ্বরে অবস্থিত পরস্পর পেশি দিয়ে যুক্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে সুনির্দিষ্টভাবে সাজানো ৩টি ছোট অস্থি। অস্থি তিনটি হচ্ছে:

i. **ম্যালিয়াস** (Malleus) : হাতুড়ির মতো দেখতে এ অস্থি একদিকে টিমপেনিক পর্দার সাথে অন্যদিকে পরবর্তী অস্থি ইনকাস-এর সাথে যুক্ত।

ii. **ইনকাস** (Incus) : এ অস্থিটি দেখতে নেহাই (anvil)-এর মতো এবং ম্যালিয়াস ও স্টেপিসকে যুক্ত করে।

iii. **স্টেপিস** (Stapes) : এ অস্থিটি দেখতে ঘোড়ার জিনের পাদানির মতো (ত্রিকোণাকার)। অস্থিটি একদিকে ইনকাসের সাথে অন্যদিকে, ফেনেস্ট্রা ওভালিস নামে ছিদ্রের গায়ে বসানো থাকে। এটি মানবদেহের ক্ষুদ্রতম অস্থি।

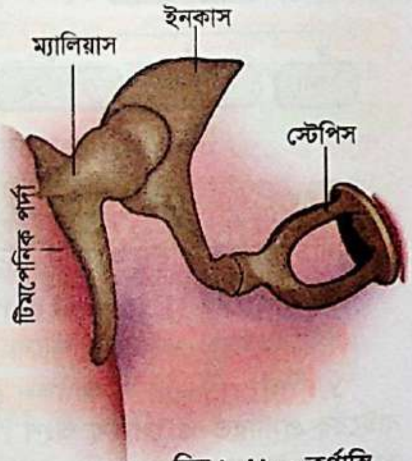

চিত্র ৮.১৮ : কর্ণাস্থি

কাজ:অস্থিগুলো বহিঃকর্ণের টিমপেনিক পর্দা থেকে শব্দতরঙ্গ অন্তঃকর্ণের অভ্যন্তরে পেরিলিম্ফে বহন করে।

৩. ছিদ্রপথ : মধ্যকর্ণের প্রাচীর পেরিওটিক অস্থিতে গঠিত, তবে সেখানে দুটি ছোট ছিদ্রপথ থাকে। উপর দিকে ডিম্বাকার ছিদ্রকে **ফেনেস্ট্রা ওভালিস** (fenestra ovalis) এবং নিচের দিকের গোল ছিদ্রকে **ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা** (fenestra rotunda) বলে। ফেনেস্ট্রা ওভালিসের মাধ্যমে শব্দ মধ্যকর্ণ থেকে অন্তঃকর্ণে প্রবেশ করে। শব্দতরঙ্গ ককলিয়ায় প্রবেশের পর অবশেষে ফেনেস্ট্রা রোটান্ডার মাধ্যমে বাইরে চলে আসে।

গ. অন্তঃকর্ণ (Inner ear)

প্রত্যেক অন্তঃকর্ণ করোটির **শ্রুতিকোটর বা অডিটরি ক্যাপসুল** (auditory capsule)-এর পেরিওটিক অস্থির (periotic bone) অভ্যন্তরে অবস্থান করে। অন্তঃকর্ণের প্রধান অংশ হলো **মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ** (membranous labyrinth) নামক একটি জটিল গঠন। এর অভ্যন্তরে এন্ডোলিম্ফ (endolymph) নামক তরল পদার্থ থাকে। **অস্থিময় ল্যাবিরিন্থ** (bony labymph) দ্বারা মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ পরিবেষ্টিত থাকে। দুই ল্যাবিরিন্থের মধ্যবর্তী স্থান পেরিলিম্ফ (perilymph) তরলে পূর্ণ থাকে। মেমব্রেনাস ল্যাবিরিন্থ ভারসাম্য ও শ্রবণের অঙ্গ নিয়ে গঠিত।

চিত্র ৮.১৯ : অন্তঃকর্ণ

❑ **ভারসাম্য অঙ্গ** (Organ of balance) : মানুষের ভারসাম্যের অঙ্গকে **ভেস্টিবিউলার অ্যাপারেটাস** (vestibular apparatus) বলে। এটি **ইউট্রিকুলাস** (utriculus) ও **স্যাকুলাস** (sacculus) নামক দুটি ছোট গহ্বর এবং তিনটি

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

অর্ধবৃত্তাকার নালি (semicircular canal) সমন্বয়ে গঠিত। ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাস এন্ডোলিম্ফ তরলে পূর্ণ এবং গহ্বরের ভিতরে **ম্যাকুলা** (macula) নামক অঙ্গ বিদ্যমান। এগুলো ইউট্রিকুলাসের মেঝেতে অনুভূমিকভাবে এবং স্যাকুলাস প্রাচীরের গাত্রে উলম্বভাবে অবস্থান করে। ম্যাকুলায় **সংবেদী রোমকোষ** থাকে এবং এসব কোষের রোমগুলো **অটোলিথ** (otolith; ক্যালসিয়াম কার্বনেট কণিকা, $CaCO_3$) সমৃদ্ধ অটোলিথিক মেমব্রেনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে থাকে।

অর্ধবৃত্তাকার নালিগুলো ইউট্রিকুলাস থেকে বিকশিত হয় আবার ইউট্রিকুলাসেই উন্মুক্ত হয়। দুটি নালি উলম্বভাবে এবং একটি অনুভূমিকভাবে অবস্থান করে। নালিগুলো পরস্পর সমকোণে অবস্থান করে এবং এক একটি নালি ঘূর্ণনের এক একটি অক্ষ নির্দেশ করে। নালিগুলো এন্ডোলিম্ফ পূর্ণ এবং প্রতিটির একটি প্রান্ত স্ফীত হয়ে **অ্যাম্পুলা** (ampulla)-য় পরিণত হয়েছে। অ্যাম্পুলায় **সংবেদী রোমকোষ** বিদ্যমান। রোমকোষগুলো **কুপুলা** (cupula) নামক জিলাটিন পর্দায় গভীরভাবে প্রোথিত এবং এর রোমগুলো এন্ডোলিম্ফে প্রক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে।

কাজ : ইউট্রিকুলাস, স্যাকুলাস ও অর্ধবৃত্তাকার নালিকাগুলো সম্মিলিতভাবে দেহের ভারসাম্য বজায় রাখে।

❑ **শ্রবণ অঙ্গ** (Organ of hearing) : মানুষের শ্রবণের সাথে সংশ্লিষ্ট অঙ্গকে **ককলিয়া** (cochlea) বলে। স্যাকুলাসের অংকীয়দেশ থেকে বের হওয়া এ অঙ্গটি শামুকের খোলকের মতো প্যাঁচানো। ককলিয়া দুটি পর্দা দিয়ে তিনটি সমান্তরাল অণুদৈর্ঘ্য প্রকোষ্ঠে বিভক্ত : উপরে পেরিলিম্ফে পূর্ণ **স্ক্যালা ভেস্টিবুলি** (scala vestibuli), মাঝে এন্ডোলিম্ফে পূর্ণ **স্ক্যালা মিডিয়া** (scala media) এবং নিচে পেরিলিম্ফে পূর্ণ **স্ক্যালা টিমপেনি** (scala tympani)। স্ক্যালা মিডিয়া উপরে **রেসনার-এর ঝিল্লি** (reissner's membrane) ও নিচে **বেসিলার ঝিল্লি** (basilar membrane)-তে আবদ্ধ। বেসিলার ঝিল্লির উপরের কিছু এপিথেলিয়াল কোষ রূপান্তরিত হয়ে সংবেদী **অর্গ্যান অব কর্টি** (organ of corti) গঠন করেছে। একেবারে শীর্ষে ককলিয়ার উর্ধ্ব ও নিম্ন প্রকোষ্ঠ একটি সরু নলাকার অংশের সাহায্যে পরস্পর যুক্ত। এর নাম **হেলিকোট্রিমা** (helicotrema)।

কাজ : ককলিয়া শ্রবণ উদ্দীপনা গ্রহণ এবং তা স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রেরণ করে।

শ্রবণ ও ভারসাম্য রক্ষায় কানের ভূমিকা

মানুষের কান একই সাথে দুটি ভিন্নধর্মী কাজ সম্পাদন করে থাকে। এদের একটি **শ্রবণ** ও অন্যটি **ভারসাম্য রক্ষা**। এ দুটি কাজের একটির সাথে অন্যটির কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রবণ কৌশল (Mechanism of Hearing)

পিনায় সংগৃহীত শব্দতরঙ্গ বহিঃঅডিটরি মিটাসে প্রবেশ করে টিমপেনিক পর্দাকে আঘাত করলে তা কেঁপে উঠে। কাঁপনে, মধ্যকর্ণে অবস্থিত ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস অস্থি তিনটি এমনভাবে আন্দোলিত হয় যার ফলে প্রথমে ফেনেস্ট্রা ওভালিসের পর্দা ও পরে অন্তঃকর্ণের ককলিয়ার পেরিলিম্ফে কাঁপন সৃষ্টি হয়। পেরিলিম্ফে কাঁপন হলে ককলিয়ার **অর্গান অব কর্টি**-র সংবেদী রোম কোষগুলো উদ্দীপ্ত হয়ে স্নায়ু আবেগের সৃষ্টি করে। এ আবেগ অডিটরি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রে বাহিত হলে মানুষ শুনতে পায়। এরপর বাকি শব্দ তরঙ্গ ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা পর্দার মাধ্যমে মধ্যকর্ণে চলে আসে এবং প্রশমিত হয়ে যায়।

মাত্রা অনুযায়ী শব্দ উচ্চ, মধ্যম ও নিম্নমাত্রার হয়ে থাকে। এসব মাত্রা গ্রহণের জন্য ককলিয়ার স্ক্যালা মিডিয়ায়

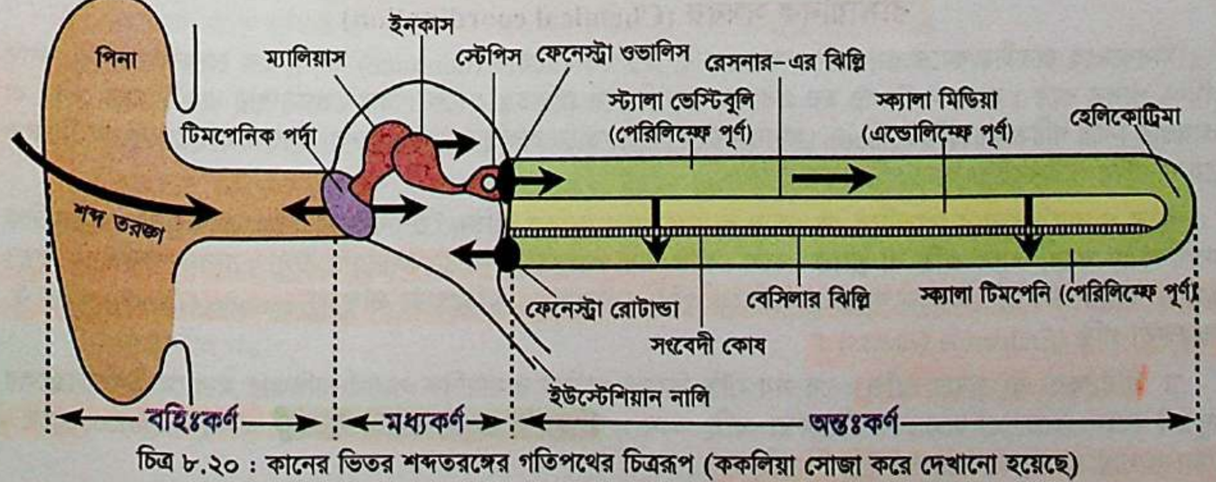

চিত্র ৮.২০ : কানের ভিতর শব্দতরঙ্গের গতিপথের চিত্ররূপ (ককলিয়া সোজা করে দেখানো হয়েছে)

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

(বেসিলার ও রেসনার-এর ঝিল্লিতে) বিশেষ স্থান রয়েছে। স্থানগুলো হচ্ছে- উচ্চ মাত্রা গ্রহণে ফেনেস্ট্রা রোটান্ডা সংলগ্ন অংশ; মধ্যম মাত্রা গ্রহণে মাঝামাঝি অংশ; এবং নিম্ন মাত্রা গ্রহণে শীর্ষের কাছাকাছি অংশ।

শ্রবণ প্রক্রিয়ার গতিপথ–

শব্দ তরঙ্গ ⟹ পিনায় বাধা ⟹ কর্ণকুহরে প্রবেশ ⟹ টিম্পেনিক পর্দায় কাঁপন

পেরিলিম্ফ ⟸ ককলিয়া ⟸ ফেনেস্ট্রা ওভালিস ⟸ (স্টেপিস ⟸ ইনকাস ⟸ ম্যালিয়াস) মধ্যকর্ণ

এন্ডোলিম্ফ ⟹ অর্গান অব কর্টি ⟹ সংবেদী কোষে উত্তেজনা ⟹ স্নায়ু স্পন্দন মস্তিষ্কে প্রেরণ ⟹ **শ্রবণ**

ভারসাম্য রক্ষা কৌশল (Mechanism of maintaining Balance)

অন্তঃকর্ণের অর্ধবৃত্তাকার নালির মূলে অবস্থিত অ্যাম্পুলা এন্ডোলিম্ফে পরিপূর্ণ ও সংবেদী রোমকোষ সম্পন্ন। এ রোমগুলোর সাথে **ক্যুপুলা** নামক জেলীর মতো বস্তু সংযুক্ত থাকে। মানুষ মাথা ঘোরালে বা কোনো দিকে দেহ বাঁকালে, সেদিকে অ্যাম্পুলার এন্ডোলিম্ফ প্রবাহিত হয়ে ক্যুপুলার অবস্থান পরিবর্তিত হয়। এ অনুভূতি সংবেদী কোষগুলো গ্রহণ করে মস্তিষ্কে পাঠায়। এন্ডোলিম্ফে পূর্ণ ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাসে **স্যাকুলা** নামক এক অঙ্গ থাকে যা $CaCO_3$–সমৃদ্ধ **অটোলিথিক মেমব্রেন** (otolithic membrane)-এ আবদ্ধ সংবেদী রোমকোষ বহন করে। মানুষের মাথা কোনো এক দিকে হেলে গেলে অটোলিথিক মেমব্রেন রোমকোষের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে রোমকোষ উদ্দীপিত হয় এবং স্নায়ুর মাধ্যমে এ অনুভূতি মস্তিষ্কে পাঠায় ও মাথাকে সঠিক অবস্থানে রাখতে সাহায্য করে। ইউট্রিকুলাস ও স্যাকুলাস মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (gravity) অনুভূতি শনাক্ত করে। অন্যদিকে অ্যাম্পুলা ঘূর্ণনের অনুভূতি সংগ্রাহক (rotatory receptor) হিসেবে কাজ করে। এ দুই অনুভূতি স্নায়ুর মাধ্যমে অনবরত মস্তিষ্কে পৌছায়। অতঃপর মস্তিষ্ক তা বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে যার ফলে মানুষ নিজেকে সোজা রাখতে অর্থাৎ ভারসাম্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

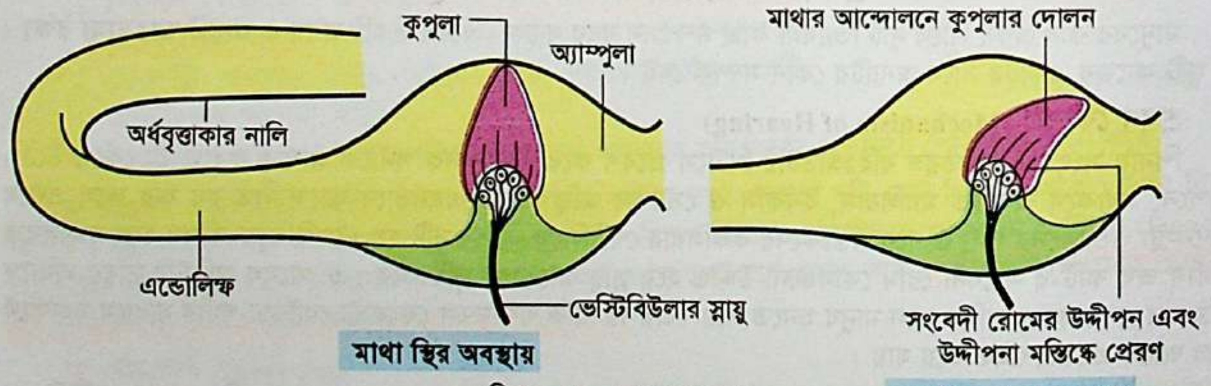

চিত্র ৮.২১ : ভারসাম্য রক্ষা

রাসায়নিক সমন্বয় (Chemical coordination)

মানবদেহে যাবতীয় কাজে রাসায়নিক সমন্বয়কারী হিসেবে **হরমোন** (hormone) নামক এক জৈবরাসায়নিক পদার্থ ভূমিকা পালন করে। হরমোন উৎপন্ন হয় প্রধানত এক বিশেষ গ্রন্থিতন্ত্র থেকে। ক্ষরণ গুণসম্পন্ন একটি মাত্র কোষ বা কোষগুচ্ছ নিয়ে গঠিত হয় **গ্রন্থি** (gland)। মানবদেহের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত নানা ধরনের অসংখ্য গ্রন্থি থেকে রস নিঃসৃত হয়ে যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় কাজ পরিচালনা করে।

গঠন ও কার্যগতভাবে বিশেষিত যে কোষ বা কোষগুচ্ছ দেহের বিভিন্ন জৈবনিক প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে, তাকে **গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ড** বলে। গ্রন্থি এক ধরনের রূপান্তরিত আবরণী টিস্যু। ক্ষরণ পদ্ধতি ও ক্ষরণ নির্গমন নালির উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ভিত্তিতে গ্রন্থি দুধরনের-১. **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** (Exocrine Glands) এবং ২. **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** (Endocrine Glands)।

□ **বহিঃক্ষরা বা সনাল গ্রন্থি** : যে সব গ্রন্থি নিজের ক্ষরিত রাসায়নিক পদার্থ নালিকার মাধ্যমে উৎপত্তিস্থলের অদূরেই বহন করে, সেগুলোকে **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** বলে। বহিঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণকে **রস** বা **জুস** (juice) বলে। যেমন-লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয় ইত্যাদি গ্রন্থি।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

❑ **অন্তঃক্ষরা বা অনাল গ্রন্থি :** যে সব গ্রন্থি নালিবিহীন, তাই ক্ষরণ সরাসরি রক্ত বা লসিকার মাধ্যমে বাহিত হয়ে দূরবর্তী সুনির্দিষ্ট অঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়, সে সব গ্রন্থিকে **অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি** বা **অনাল গ্রন্থি** (ductless gland) বলে। উদাহরণ-পিটুইটারি, থাইরয়েড, অ্যাড্রেনাল ইত্যাদি গ্রন্থি। অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্ষরণকে **হরমোন** বলে।

অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা গ্রন্থির মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি	বহিঃক্ষরা গ্রন্থি
১. সংজ্ঞা	মানবদেহে নালিবিহীন গ্রন্থিসমূহকে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি বলে।	মানবদেহে নালিযুক্ত গ্রন্থিসমূহকে বহিঃক্ষরা গ্রন্থি বলে।
২. নিঃসরণ	এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পদার্থের নাম হরমোন।	এসব গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত পদার্থের নাম রস, জুস, এনজাইম।
৩. পরিবহন	রক্তে পরিবাহিত হয়।	নালির মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।
৪. ক্রিয়াস্থল	হরমোন দূরবর্তী টার্গেট স্থলে কাজ করে।	এটি নিকটবর্তী বা দূরবর্তী উভয় টার্গেট স্থলে কাজ করে।
৫. উদাহরণ	পিটুইটারি গ্রন্থি, থাইরয়েড গ্রন্থি, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি ইত্যাদি।	যকৃত, অগ্ন্যাশয়, লালাগ্রন্থি ইত্যাদি।

অন্তঃক্ষরা বা অনাল গ্রন্থি (Endocrine Glands)

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি **হরমোন** নামক জৈব রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন করে। এটি নালিবিহীন গ্রন্থি হওয়ায় হরমোন সরাসরি রক্তপ্রবাহে ক্ষরিত হয়। এসব গ্রন্থি রক্তবাহিকা-সমৃদ্ধ জালিকায় পরিবৃত থাকে।

কিছু গ্রন্থি আছে যা একাধারে অন্তঃক্ষরা ও বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। **অগ্ন্যাশয়** এমনি একটি গ্রন্থি। এ গ্রন্থির কিছু বিশেষিত কোষ থেকে **ইনসুলিন** ও **গ্লুকাগন** হরমোন উৎপন্ন ও রক্তে ক্ষরিত হয়। অন্যদিকে, এ গ্রন্থি থেকেই **প্যানক্রিয়াটিক জুস** (অগ্ন্যাশয়িক রস) উৎপন্ন হয়ে অগ্ন্যাশয়িক নালিতে বাহিত হয়ে অন্ত্রে পৌঁছায়।

নামকরণ : অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র সম্পর্কিত বিজ্ঞানের সূত্রপাত বেশ আগে থেকেই। এ বিদ্যার সূত্রপাত চীনদেশে। সেখানে খৃষ্টপূর্ব ২০০ সালে অভিনব উপায়ে মানুষের মূত্র থেকে যৌন ও পিটুইটারি হরমোন সংগ্রহ করে চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত হতো। তবে সুনির্দিষ্টভাবে হরমোন (সিক্রেটিন) শনাক্ত করেন ১৯০২ সালে দুই ব্রিটিশ শারীরতত্ত্ববিদ William Bayliss এবং Ernest Starling। তাঁরা ১৯০৫ সালে এ রাসায়নিককে **হরমোন** নামে অভিহিত করেন। গ্রিক শব্দ *hormao* (to excite = উদ্দীপ্ত/ উত্তেজিত করা) থেকে হরমোন শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

হরমোনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Hormone)

হরমোন দেহের **রাসায়নিক দূত** (chemical messenger) হিসেবে সুপরিচিত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে-

i. হরমোন এক ধরনের ক্ষুদ্র জৈব অণু।
ii. হরমোন রক্তে বাহিত হয়।
iii. উৎপত্তিস্থল থেকে (নির্দিষ্ট কোষ বা কোষগুচ্ছ বা গ্রন্থি থেকে) সংবহনতন্ত্রের মাধ্যমে দেহের দূরবর্তীস্থানে পরিবাহিত হয়ে নির্দিষ্ট অংশে (target) কাজ করে।
iv. হরমোন এক ধরনের দ্রবণীয় জৈব অনুঘটকের কাজ করে কিন্তু কাজ শেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।
v. হরমোন স্বল্প মাত্রায় বা ঘনত্বে কার্যকর হয় এবং ক্রিয়ার স্থায়িত্বকাল অনেকদিন বজায় থাকে।
vi. হরমোন সাধারণত ভবিষ্যতের জন্য জমা থাকে না।
vii. অধিকাংশ হরমোনের ক্রিয়া ধীরে সংঘটিত হয়।
viii. একটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে একাধিক হরমোন ক্ষরিত হতে পারে কিন্তু এগুলোর কাজ বা ক্ষরণ পরস্পর নির্ভরশীল নয়।
ix. স্নায়ুতন্ত্রের সাথে সম্পর্ক রেখে হরমোন বিভিন্ন দৈহিক ও শারীরবৃত্তিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে।
x. হরমোন জীবদেহের কোষে কোষে রাসায়নিক সংযোগ সাধন করে এবং রাসায়নিক বার্তা প্রেরণ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

ছক আকারে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর অবস্থান, নিঃসৃত হরমোন ও কাজ দেখানো হলো

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি		নিঃসৃত হরমোন	প্রধান কাজ
১. পিটুইটারি [অবস্থান-মস্তিষ্ক]	A. অগ্রভাগ	i. বৃদ্ধিপোষক হরমোন (STH) (Growth hormone) ii. থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন (TSH) iii লুটিনাইজিং হরমোন (LH) iv ফলিকল উদ্দীপক হরমোন (FSH) v. প্রোল্যাকটিন (PRL) vi অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন (ACTH)	i. অস্থি ও কোমল টিস্যুর বৃদ্ধি; প্রোটিন সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ। ii. থাইরয়েড গ্রন্থির বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ। iii. নারীদেহে ডিম্বপাত ও দুগ্ধ ক্ষরণ এবং পুরুষে টেস্টোস্টেরন ক্ষরণ উদ্দীপ্ত করা। iv. ডিম্বাশয়ে ফলিকলের পূর্ণতা দান। v. স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি ও দুগ্ধ ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ। vi. অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির কর্টেক্স অঞ্চলের বৃদ্ধি, ক্ষরণ ও কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ।
	B. মধ্যভাগ	i. মেলানোসাইট উদ্দীপক হরমোন (MSH)	মেলানোফোর কোষের বিস্তৃতি ঘটিয়ে ত্বক ও চুলের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ।
	C. পশ্চাদ্‌ভাগ	i. অ্যান্টি ডাই-ইউরেটিক হরমোন (ADH) ii. অক্সিটোসিন	i. বৃক্কীয় নালির পানি পুনঃশোষণ ক্ষমতা এবং রক্তবাহিকার প্রাচীর সংকোচন নিয়ন্ত্রণ। ii. জরায়ু-সংকোচন ও দুগ্ধক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করা।
২. থাইরয়েড [অবস্থান-শ্বাসনালি]		i. ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন (T_3) ii. থাইরক্সিন (T_4) iii ক্যালসিটোনিন (CT)	i. বিপাক হার, হৃৎস্পন্দন ও প্রোটিন সংশ্লেষ নিয়ন্ত্রণ। i. বিপাকীয় প্রক্রিয়া ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ। ii. রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ।
৩. প্যারাথাইরয়েড [অবস্থান-থাইরয়েডের পৃষ্ঠদেশে]		i. প্যারাথরমোন (PTH)	ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের বিপাক নিয়ন্ত্রণ।
৪. থাইমাস [অবস্থান-শ্বাসনালির নিচে]		i. থাইমোসিন	লিম্ফোসাইট প্রস্তুতি ও অ্যান্টিবডি গঠন।
৫. আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস [অবস্থান-অগ্ন্যাশয়]		i. ইনসুলিন ii. গ্লুকাগন iii সোমাটোস্ট্যাটিন iv প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড	i. রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে তা কমানো। ii. রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে তা বাড়ানো। iii. অগ্ন্যাশয়িক হরমোন নিঃসরণে ভূমিকা রাখা। iv. খাদ্য গ্রহণের পর ক্ষরিত হয়ে ক্ষুধা হ্রাস করা।
৬. অ্যাড্রেনাল বা সুপ্রারেনাল [অবস্থান- প্রতিটি বৃক্কের ঊর্ধ্ব প্রান্তে]	A. কর্টেক্স	i. গ্লুকোকর্টিকয়েড ii. মিনারেলোকর্টিকয়েড	i. শর্করা ও আমিষ বিপাক নিয়ন্ত্রণ। ii. খনিজ লবণের বিপাক নিয়ন্ত্রণ।
	B. মেডুলা	i. অ্যাড্রেনালিন ii. নর-অ্যাড্রেনালিন	i. গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ মুক্ত করে বিপাকীয় হার নিয়ন্ত্রণ, হৃৎগতি বৃদ্ধি ও দেহের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ। ii. হৃৎপেশি উদ্দীপ্ত হয়, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।
৭. পিনিয়াল [অবস্থান- মস্তিষ্কের ৩য় প্রকোষ্ঠে]		i. মেলাটোনিন	i. ঘুম-জাগরণ চক্র নিয়ন্ত্রণ করা। ii. যৌন অঙ্গের সক্রিয়তা ঘটানো।
৮. শুক্রাশয় [অবস্থান-পূর্ণাঙ্গ পুরুষদেহের স্ক্রোটাম নামক থলির মধ্যে]		i. টেস্টোস্টেরন	পুরুষদেহের যৌনাঙ্গের বৃদ্ধি ঘটানো, গৌণ যৌন লক্ষণ প্রকাশে সহায়তা করা এবং শুক্রাণু উৎপাদন ক্রিয়া অব্যাহত রাখা।
৯. ডিম্বাশয় [অবস্থান–স্ত্রীদেহের শ্রোণিগহ্বরের পৃষ্ঠপ্রাচীরের গায়ে জরায়ুর দুপাশে]		i. ইস্ট্রোজেন ii. প্রোজেস্টেরন	i. বয়ঃসন্ধিকালে স্ত্রীদেহের বিভিন্ন যৌনলক্ষণ প্রকাশে সহায়তা এবং রজঃচক্র নিয়ন্ত্রণ। ii. স্ত্রীদেহে গর্ভাবস্থায় জরায়ু, ভ্রূণ, অমরা ইত্যাদির বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

অন্তঃক্ষরা বা এন্ডোক্রিন গ্রন্থির অবস্থান, নিঃসরণ ও ক্রিয়া (Location, Secretion and Function of Endocrine Glands)

হরমোন শুধু অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির কোষ থেকে নয় বরং দেহের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত কতকগুলো বিশেষায়িত কোষ থেকেও নিঃসৃত হয়। নিম্নে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো।

১. পিটুইটারি গ্রন্থি,
২. থাইরয়েড গ্রন্থি,
৩. প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি,
৪. অ্যাড্রেনাল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি,
৫. থাইমাস গ্রন্থি,
৬. আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স,
৭. পিনিয়াল গ্রন্থি,
৮. গোনাড,
৯. অমরা এবং
১০. বিভিন্ন টিস্যুস্থিত বিশেষায়িত কোষ।

নিচে অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ করা হলো।

পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary gland)

পিটুইটারি গ্রন্থিকে হরমোন সৃষ্টিকারী **প্রধান গ্রন্থি বা প্রভু গ্রন্থি** (Principal / Master gland) বলে। কারণ একদিকে, পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনের সংখ্যা যেমন বেশি, অন্যদিকে বিভিন্ন গ্রন্থির উপর এসব হরমোনের প্রভাবও বেশি। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী কিন্তু সবচেয়ে ছোট গ্রন্থি।

অবস্থান ও আকৃতি : এ গ্রন্থি চোখের পিছনে মস্তিষ্কের পাদদেশে একটি ক্ষুদ্র বৃন্তের সাহায্যে যুক্ত থাকে। পিটুইটারি গ্রন্থি প্রায় ১ সে.মি. ব্যাস সম্পন্ন লালচে ধূসর, দেখতে মটর দানার মতো, ০.৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট একটি গ্রন্থি।

পিটুইটারি গ্রন্থি ৩টি খন্ডে বিভক্ত, যথা– **ক. সম্মুখ পিটুইটারি, খ. মধ্য পিটুইটারি এবং গ. পশ্চাৎ পিটুইটারি।**

ক. সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থি : এ গ্রন্থি থেকে ৬টি **ট্রপিক হরমোন** (tropic hormone) ক্ষরিত হয়। যে হরমোন অন্য অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিকে তার হরমোন ক্ষরণে উদ্বুদ্ধ করে সেগুলো হচ্ছে ট্রপিক হরমোন। এমন ৬টি ট্রপিক হরমোন সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থিতে উৎপন্ন ও জমা হয় এবং প্রয়োজনে রক্তবাহিকায় ক্ষরিত হয়ে সারা দেহে প্রভাব বিস্তার করে।

১. **বৃদ্ধিপোষক হরমোন** (Somatotropic Hormone, STH) : অস্থি ও কোমল টিস্যুর বৃদ্ধি, প্রোটিন সংশ্লেষ, গ্লাইকোজেনের সঞ্চালন ও চর্বি সঞ্চয়কে উদ্দীপ্ত করে।

২. **থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন** (Thyroid Stimulating Hormone, TSH): থাইরয়েড গ্রন্থিকে থাইরয়েড হরমোন সংশ্লেষ ও ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে।

৩. **ল্যুটিনাইজিং হরমোন** (Luteinizing Hormone, LH): নারীদেহে ডিম্বপাত, কর্পাস ল্যুটিয়াম সৃষ্টি, এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন সংশ্লেষকে উদ্দীপ্ত করে। পুরুষে টেস্টোস্টেরন ক্ষরণেও LH উদ্দীপ্ত করে।

৪. **ফলিকল উদ্দীপক হরমোন** (Follicle Stimulating Hormone, FSH) : এর প্রধান কাজ হচ্ছে নারীদেহে ডিম্বাশয়ে ফলিকলের পূর্ণতা বা পরিপক্কতা দান করা এবং ইস্ট্রোজেন সংশ্লেষে উদ্দীপনা জোগানো।

৫. **প্রোল্যাকটিন** (Prolactin, PRL) : সম্মুখ পিটুইটারি গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত এ হরমোনের প্রভাবে স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি, দুগ্ধ উৎপাদন, অনাক্রম্যের প্রতি সাড়াদান, সন্তানের প্রতি বাৎসল্য ও পরিস্ফুটনের সময় নতুন রক্তকণিকা সৃষ্টিতে অবদান রাখে।

৬. **অ্যাড্রেনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন** (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH): অ্যাড্রেনাল কর্টেক্সকে গ্লুকোকর্টিকয়েড (যেমন-কর্টিসল) স্টেরয়েড হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে।

খ. মধ্যপিটুইটারি গ্রন্থি : এ গ্রন্থি থেকে মেলানোসাইট স্টিমুলেটিং হরমোন (Melanocyte Stimulating Hormone – MSH) নিঃসৃত হয়। এ হরমোন মেলানোফোর কোষের বিস্তৃতি ঘটিয়ে ত্বক ও চুলের বর্ণ নিয়ন্ত্রণ করে।

গ. পশ্চাৎ পিটুইটারি গ্রন্থি : এ গ্রন্থি থেকে দুটি হরমোন নিঃসৃত হয়।

১. **অক্সিটোসিন** (Oxytocin) **হরমোন :** স্তনের পেশি সংকোচন ঘটিয়ে দুগ্ধ ক্ষরণে সাহায্য করে ও প্রসবের সময় জরায়ুর সংকোচন ত্বরান্বিত করে।

২. **ভেসোপ্রেসিন** (Vasopressin) বা **অ্যান্টি ডাইইউরেটিক হরমোন** (Anti Diuretic Hormone– ADH) রক্তচাপ বৃদ্ধি করে ও বৃক্কের পানি শোষণ ক্ষমতা বাড়ায়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland)

অবস্থান ও আকৃতি : ট্রাকিয়ার (শ্বাসনালি) উভয় পাশে অবস্থিত। প্রজাপতি আকৃতির গ্রন্থি।

নিঃসরণ : এ গ্রন্থি থেকে নিচে বর্ণিত ৩টি সক্রিয় হরমোন নিঃসৃত হয়।

১. **ট্রাইআয়োডোথাইরোনিন** (Triiodothyronin, T_3) : মৌলিক বিপাক হারকে উদ্দীপ্ত করে; হৃৎস্পন্দন হার, প্রোটিন সংশ্লেষ ও প্রোটিন বিনাশ, গ্লুকোজ সংশ্লেষ, লাইপোলাইসিস প্রভৃতির হার বৃদ্ধি করে। এ হরমোন ভ্রূণ ও শিশুর পরিস্ফুটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. **থাইরক্সিন** (Thyroxine, T_4) : বিপাকীয় প্রক্রিয়ার হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। এ হরমোন প্রোটিন সংশ্লেষে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে দৈহিক বৃদ্ধি নির্ধারণ করে।

৩. **ক্যালসিটোনিন** (Calcitonin, CT) : এর প্রভাবে অন্ত্র ক্যালসিয়াম শোষণ করে রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা কমায়; বৃক্ককে ক্যালসিয়াম শোষণে বাধা দিয়ে মূত্রের মাধ্যমে ক্যালসিয়াম মোচন করিয়ে রক্তে এর সঠিক মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে; হাড়ে ক্যালসিয়াম সঞ্চয়ে; এবং ভিটামিন D নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে।

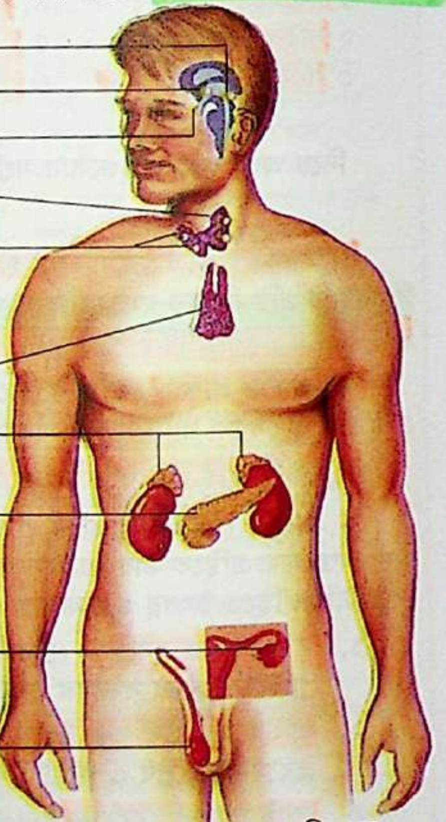

চিত্র ৮.২২ : মানবদেহের প্রধান অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিসমূহ

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland)

অবস্থান : দুজোড়া প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থাইরয়েড গ্রন্থির পিছনে এবং আংশিকভাবে থাইরয়েডের মধ্যে অবস্থিত।

নিঃসরণ : প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোনটি প্যারাথাইরয়েড হরমোন (Parathyroid Hormone, PTH) বা প্যারাথরমোন (Parathormone) বা প্যারাথাইরিন (Parathyrin) নামে পরিচিত।

ক্রিয়া : প্যারাথরমোন রক্তে ক্যালসিয়ামের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং বৃক্কে ক্যালসিয়ামের পুনঃশোষণ বাড়িয়ে দেয়। রক্ত, হাড়, পেশি ও স্নায়ু উদ্দীপনা প্রবাহে ক্যালসিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া পেশির সংকোচন ও রক্ত জমাট বাঁধায়ও ক্যালসিয়ামের সঠিক মাত্রা প্রয়োজন। রক্তে ফসফেটের মাত্রা কমিয়ে দিতে এবং ভিটামিন D-কে সক্রিয়করণে ভূমিকা পালন করে। ভিটামিন D-র অভাবে বাচ্চাদের **রিকেটস** (rickets) রোগ দেখা দেয়। বয়স্কদের হয় **অস্টিওম্যালাসিয়া** (osteomalacia)।

অ্যাড্রেনাল বা সুপ্রারেনাল গ্রন্থি (Adrenal or Supra-renal gland)

অবস্থান ও আকৃতি : প্রতিটি বৃক্কের মাথায় টুপির মতো একটি করে মোট দুটি অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থাকে। প্রত্যেক গ্রন্থির বাইরের হলুদ অংশকে **কর্টেক্স** (cortex) এবং ভিতরের পিঙ্গল বর্ণের অংশকে **মেডুলা** (medulla) বলে। এদের ওজন ৩-৫ গ্রাম।

নিঃসরণ : অ্যাড্রেনাল গ্রন্থির উভয় অংশ থেকেই হরমোন নিঃসৃত হয় এবং এদের কাজও ভিন্ন।

ক. কর্টেক্স নিঃসৃত হরমোন

অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে তিন ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয়, **১. গ্লুকোকর্টিকয়েড, ২. মিনারেলোকর্টিকয়েড ও ৩. যৌন কর্টিকয়েড হরমোন।**

১. **গ্লুকোকর্টিকয়েড** (Glucocorticoids) : শর্করা জাতীয় খাদ্যের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

২. **মিনারেলোকর্টিকয়েড** (Mineralocorticoids) : খনিজ লবণের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. **যৌন হরমোন** (Sex hormone) : অ্যান্ড্রোজেন, ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন নামক যৌন হরমোনগুলো যৌনাঙ্গের বর্ধন ও যৌন লক্ষণ প্রকাশে সাহায্য করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

খ. মেডুলা নিঃসৃত হরমোন

অ্যাড্রেনাল মেডুলা থেকে ২টি হরমোন নিঃসৃত হয়।

১. অ্যাড্রেনালিন (Adrenalin) : এর অপর নাম এপিনেফ্রিন (Epinephrine)। যকৃতে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ অবমুক্ত করে বিপাকের হার বাড়িয়ে দেয়। এছাড়া হৃৎপিণ্ড ও ধমনির অনৈচ্ছিক পেশির সংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভয়, আনন্দ ও শোক প্রকাশে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

২. নর অ্যাড্রেনালিন (Nor adrenalin) : এর অপর নাম নরএপিনেফ্রিন (Nor epinephrine)। দেহের অতিরিক্ত গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত করে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা এর কাজ।

থাইমাস গ্রন্থি (Thymus gland)

বক্ষদেশে, হৃৎপিণ্ডের ঠিক উপরে এ গ্রন্থি অবস্থিত। ভ্রূণ অবস্থায় এর কাজ শুরু হয় এবং জন্মের সময় এবং জন্মের পরপরই সবচেয়ে সক্রিয় থাকে, মায়ের বুকের দুধ ভিন্ন অন্য খাবারে অভ্যস্থ হবার পরপরই এটি হ্রাস পেতে শুরু করে। ইম্যুন রেসপন্স (immune response) বিকাশে এ গ্রন্থি গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্রন্থি বেশ কয়েকটি থাইমিন হরমোন (যথা- থাইমোসিন আলফা) তৈরি করে যা থাইমাসে T-কোষ তৈরিতে ভূমিকা রাখে।

অগ্ন্যাশয়ের আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স (Islets of Langerhans in Pancreas)

আকৃতি ও অবস্থান : অগ্ন্যাশয় একটি মিশ্রগ্রন্থি। বহিঃক্ষরা অংশের মধ্যে কিছু কোষ একত্রিত হয়ে বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত কতক কোষগুচ্ছ একেকটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি সৃষ্টি করে। এগুলো **আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স**। আবিষ্কারক Pauel Langerhans (1869) এর নামানুসারে এ কোষগুচ্ছ "আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যানস" নামে পরিচিত। এসব গ্রন্থিকোষের সম্মিলিত আয়তন মোট অগ্ন্যাশয় আয়তনের ১–২%। প্রতিটি দ্বীপগ্রন্থির কোষ দানাদার, বহুভূজাকার ও রক্তবাহিকা সম্বলিত। আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স চার ধরনের কোষে গঠিত।

(i) আলফা কোষ থেকে **গ্লুকাগন**,
(ii) বিটা কোষ থেকে **ইনসুলিন**,
(iii) ডেল্টা কোষ থেকে **সোমাটোস্ট্যাটিন** হরমোন নিঃসৃত হয় এবং
(iv) PP কোষ থেকে প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড ক্ষরিত হয়।

কাজ :
- **ইনসুলিন** রক্তে গ্লুকোজ বা শর্করার পরিমাণ হ্রাস করে। ইনসুলিনের অভাবে রক্তে গ্লুকোজ লেভেল বেড়ে গেলে ডায়াবেটিস রোগ হয়।
- **গ্লুকাগন** দেহে সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।
- **সোমাটোস্ট্যাটিন** ইনসুলিন ও গ্লুকাগন সহ বিভিন্ন অগ্ন্যাশয়িক হরমোনের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।
- **প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড** হরমোনের কাজ হলো খাদ্য গ্রহণের পর ক্ষরিত হয়ে ক্ষুধা হ্রাস করে।

গোনাড বা জননাঙ্গ (Gonad)

জননকোষ উৎপাদনকারী অঙ্গকে **গোনাড বা জননাঙ্গ** বলে। **গোনাড দুধরনের– শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয়**। এগুলো গ্রন্থিরূপী অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি নয় কিন্তু এসব অঙ্গের অভ্যন্তরীণ কিছু টিস্যু অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে কাজ করে। পুরুষ ও নারীদেহে যথাক্রমে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয় রয়েছে। এসব অঙ্গের অবস্থান, হরমোন ও ক্রিয়ার বর্ণনা নবম অধ্যায়ে দেয়া হলো।

দেহের বৃদ্ধিতে হরমোনের প্রভাব (Effect of Hormone in the growth of the body)

মানবদেহের বৃদ্ধিতে দুটি হরমোন প্রধান ভূমিকা পালন করে। একটি হচ্ছে পিটুইটারি গ্রন্থি নিঃসৃত **গ্রোথ হরমোন** (Growth Hormone-GH) এবং অন্যটি থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত **থাইরক্সিন** (Thyroxine T_4)।

গ্রোথ হরমোনের ভূমিকা

১. তরুণাস্থি ও অস্থির কোষগুলোর পূর্ণতা প্রাপ্তিসহ এগুলোর বৃদ্ধি, অস্থিতে ক্যালসিয়াম আয়ন সঞ্চয় ইত্যাদি কাজে ভূমিকা রাখে।

২. কোষের অ্যামিনো এসিড গ্রহণ ও প্রোটিন সংশ্লেষণ হার বৃদ্ধি করে, ফলে দেহের পেশির বৃদ্ধি ঘটে।

৩. ক্ষুধার্ত অবস্থায় রক্তে গ্লুকোজ ও মুক্ত ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ বাড়িয়ে দেহের ক্ষয়-রোধ করে।

৪. অন্ত্র থেকে ক্যালসিয়াম আয়ন শোষণ ও বৃক্ক থেকে বিভিন্ন আয়ন পুনঃশোষণ করে দেহের বিভিন্ন আয়নের পরিমাণ বর্ধন ও দৈহিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৫. দেহের সকল নরম অঙ্গের (মস্তিষ্ক ছাড়া) আকার বৃদ্ধি ও স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখে।
৬. বেশি দুধ উৎপাদনে স্তনগ্রন্থিকে প্রভাবিত করে যা শিশুর দৈহিক বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা রাখে।
৭. এরিথ্রোপোয়েসিস (erythropoiesis) প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে রক্তের লোহিত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

থাইরক্সিন হরমোনের ভূমিকা

১. পিটুইটারি গ্রন্থিকে গ্রোথ হরমোন ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে।
২. প্রোটিন সংশ্লেষের হার বাড়িয়ে দেহের বৃদ্ধি ঘটায়।
৩. কঙ্কাল পেশির বৃদ্ধি ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করে।
৪. বিভিন্ন টিস্যুর বিভেদ ও পরিপক্কতার জন্য এটি অত্যাবশ্যক।
৫. খাদ্যের বিপাকীয় হার বৃদ্ধি করে।

শারীরবৃত্তীয় কাজে হরমোনের প্রভাব

১. পৌষ্টিকনালির অন্তঃক্ষরা কোষ থেকে নিঃসৃত গ্যাস্ট্রিন, সিক্রেটিন ও কোলেসিস্টোকাইনিন হরমোন পরিপাক ক্রিয়ার সাথে সংশিষ্ট এনজাইমগুলোর ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

২. থাইরক্সিন, ইনসুলিন, গ্লুকাগন, গ্লুকোকর্টিকয়েড হরমোন শর্করা বিপাক করে।

৩. থাইরক্সিন হরমোন প্রোটিন, স্নেহদ্রব্য ও খনিজ আয়ন বিপাক এবং টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন হরমোন প্রোটিন বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. এপিনেফ্রিন, নরএপিনেফ্রিন হরমোন হৃৎক্রিয়া ও রক্তচাপ বৃদ্ধি করে।

৫. অ্যাড্রেনাল কর্টেক্স থেকে ক্ষরিত অ্যালডোস্টেরন Na^+, K^+ আয়নের সমতা রক্ষা করে।

৬. স্টেরয়েডধর্মী হরমোনগুলো প্রোটিন সংশ্লেষণে, গ্রোথ হরমোন ফ্যাটকে ভেঙ্গে শক্তি উৎপাদনে প্রভাবিত করে।

৭. ADH হরমোন পানি শোষণ ও পানি সাম্য বজায় রাখে। বৃক্ক থেকে ক্ষরিত এরিথ্রোপোয়েটিন হরমোন লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে।

৮. ইস্ট্রোজেন ঋতুচক্র ও স্তনগ্রন্থির বিকাশ নিয়ন্ত্রণ করে, প্রোজেস্টেরন জরায়ুর প্রাচীরে নিষিক্ত ডিম্বাণু স্থাপন এবং গর্ভাবস্থায় স্তনগ্রন্থির বিকাশ ঘটায়, টেস্টোস্টেরন শুক্রাণুজনন (spermatogenesis)-এ শুক্রাশয়কে উদ্বুদ্ধ করে।

৯. প্রসবের সময় রিলাক্সিন শ্রোণিদেশীয় লিগামেন্ট ও পেশির প্রসারণ ঘটিয়ে এবং অক্সিটোসিন জরায়ুর সঙ্কোচন ঘটিয়ে প্রসব ত্বরান্বিত করে।

১০. টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন হরমোন গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়।

১১. গ্রোথ হরমোন, থাইরক্সিন, ইস্ট্রোজেন, প্রোল্যাকটিন সন্তান প্রসবকারী মায়ের স্তনগ্রন্থির বৃদ্ধি ও দুধ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

আচরণ পরিবর্তনে হরমোনের প্রভাব

মানবদেহের যে কোনো আচরণের রহস্য উদঘাটনে অবাক হতে হয় কতো নিখুঁত, সঠিক ও পরিমিত হরমোনের মিশ্রণে দেহ পরিচালিত হচ্ছে। এর জন্যে রয়েছে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি। জীবনের প্রত্যেক ধাপে বিভিন্ন উপায়ে নারী, পুরুষ ও শিশুদেহের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনে হরমোনের প্রভাব রয়েছে।

নারীদের আচরণগত পরিবর্তন

১. রজঃচক্র চলাকালীন সময় নারীর দেহের কিছু হরমোন ক্ষরণে তারতম্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে নারীদের মধ্যে পুরুষের সামনে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার প্রবণতা বেড়ে যায়, খাদ্য গ্রহণ কমে যায় ইত্যাদি। সাধারণত নারীর দেহে ডিম্বপাতের সময় এগিয়ে আসলে এ ধরনের আচরণ করে থাকে।

২. রজঃচক্র বন্ধকালীন সময় এগিয়ে আসলে ডিম্বাশয়ে প্রোজেস্টেরন, ইস্ট্রোজেন ও অ্যান্ড্রোজেন হরমোন কম মাত্রায় ক্ষরিত হয়। এ পরিবর্তনের ফলে নারীরা অল্প কিছুতে রেগে যায়, ঘুম ঠিকমতো হয় না, অনেকে আবার বিষণ্নতায় ভুগে থাকে।

৩. গর্ভকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের হরমোন যেমন–hCG (Human Chorionic Gonadotropin), প্রোজেস্টেরন, রিলাক্সিন ইত্যাদি হরমোন ক্ষরণে তারতম্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলে দেখা যায় অনেকে অল্পতে রেগে উঠে, হঠাৎ কেঁদে ফেলে ইত্যাদি নানান পরিবর্তন দেখা যায়।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

৪. অনেক সময় দেখা যায় সন্তান প্রসবের পর হরমোন ক্ষরণের তারতম্যের জন্য নারীরা নানান মানসিক রোগে ভোগেন। একে প্রসবোত্তর সাইকোসিস বলে।

পুরুষদের আচরণগত পরিবর্তন

১. টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ বেড়ে গেলে যৌন আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়।

২. অতিরিক্ত টেস্টোস্টেরন হরমোন ক্ষরণে স্বভাবে হিংস্রতা সৃষ্টি হয় এবং শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়।

৩. টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ কমে গেলে বিষন্নতায় ডুবে যায়।

৪. শুক্র নিবৃত্তি বা অ্যান্ড্রোপজের সময় কাছে চলে আসলে যৌন আকাঙ্ক্ষা কমে যায়।

শিশুদের আচরণগত পরিবর্তন

শিশু যখন বয়ঃসন্ধিকালীন অবস্থায় উপনীত হয় তখন হরমোনের আচরণগত প্রভাব স্পষ্ট হয়। হরমোনের প্রভাবে বয়ঃসন্ধিকালীন নারী-পুরুষে বিভিন্ন পরিবর্তন নবম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

অনিয়ন্ত্রিত হরমোন ব্যবহারের ফলাফল (Result of uncontrolled use of Hormone)

দেহ সচল, কর্মক্ষম রাখতে অতি অল্প ও নির্দিষ্ট পরিমাণ হরমোন দেহে প্রয়োজন হয়। কারও দেহে পরিমিত হরমোন ক্ষরিত না হলে নানা জটিল অবস্থা দেখা দিয়ে জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলতে পারে। এমন অবস্থায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় নির্দিষ্ট হরমোন ব্যবহার করতে হয়। হরমোনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার কষ্টদায়ক জীবনের অবসান ঘটালেও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারটি উল্টো ফল বয়ে আনে। নিচে কয়েকটি প্রধান হরমোনের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলাফল উলেখ করা হলো।

১. বৃদ্ধি হরমোন : দেহকে স্থিতিশীল ও বৃদ্ধিসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে অতিরিক্ত বৃদ্ধি হরমোন ব্যবহারের ফলে উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে প্রচুর ফ্যাট, ডায়াবেটিস, সন্ধিব্যথা, হৃৎপিন্ড বড় হয়ে যাওয়ায় হার্ট ফেইলিউর এবং হাত, পা, মাথার হাড় অস্বাভাবিক বড় হয়ে যাওয়া।

২. থাইরক্সিন : থাইরক্সিনের স্বল্পতা পূরণে যে সংশ্লেষিত হরমোন (Levothyroxine) ব্যবহার করা হয় তাতে কেবল থাইরয়েড হরমোন স্বল্পতাই পূরণ হয় না, সে সঙ্গে থাইরয়েড ক্যান্সার এবং গলগণ্ড প্রতিরোধেও সহায়ক হয়। কিন্তু অতিমাত্রায় ব্যবহার হলে যে সব জটিলতা দেখা দেয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: ছদ্ম-গলগন্ড হতে পারে; তা ছাড়া দ্রুত হৃৎস্পন্দন, উদরীয় ব্যথা, চিন্তাগ্রস্ততা, খিটখিটে মেজাজ, ওজন কমে যাওয়া, ক্ষুধাবৃদ্ধি প্রভৃতি। অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়ায় শ্বাসকষ্ট, ঘন ঘন শ্বাস নেয়া এবং মুখমন্ডল ও জিহ্বা ফুলে যায়। হার্ট ফেইলিউর এবং রক্তে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস মাত্রার অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে।

৩. এপিনেফ্রিন (অ্যাড্রেনালিন) : ফুসফুসের ভিতরে বাতাস চলাচলের নালি খুলতে, রক্তবাহিকা সংকীর্ণ করতে এবং বিভিন্ন মারাত্মক অ্যালার্জিক ক্রিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করতে সংশ্লেষিত এপিনেফ্রিন ব্যবহৃত হয়। অতিমাত্রায় ব্যবহৃত হলে দেখা দেয় উচ্চ রক্তচাপ, সঙ্গে মাথাব্যথা, ঝাপসা দৃষ্টি, দুঃশ্চিন্তা, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, বুকব্যথা, অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন, হঠাৎ দুর্বলতা, কথাবলা বা হাঁটাচলায় ভারসাম্যহীনতা, ঘনঘন শ্বাস নেয়া প্রভৃতি।

৪. টেস্টোস্টেরন : এটি পুরুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হরমোন। এর স্বাভাবিক ক্ষরণে পুরুষ যৌনাঙ্গ সুগঠিত রাখে, গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটিয়ে পৌরুষ প্রদর্শন করে। বড়ি বা ইনজেকশনের মাধ্যমে টেস্টোস্টেরনের অভাব পূরণে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কিন্তু এর অতিব্যবহারে প্রথমে দুর্বলতা, নিদ্রালুভাব, গায়ে ব্যথা, চামড়ায় জ্বালাপোড়া ভাব, মনোযোগহীনতা, হাত-পায়ের আঙুল ঠান্ডা হয়ে আসা প্রভৃতি দেখা দেয়। পরে শুক্রাশয়ে ব্যথা, দ্রুত বা মন্থর হৃৎস্পন্দন, রক্তময় মলত্যাগ, মূত্রথলিতে ব্যথা, পিঠের দুপাশে বা মাঝখান ধরে ব্যথা, ডায়ারিয়া প্রভৃতি জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়।

৫. ইস্ট্রোজেন : ইস্ট্রোজেন নারীদেহের গুরুত্বপূর্ণ হরমোন। পরিমিত ইস্ট্রোজেন নারীদেহকে সুস্থ, সবল ও সুদর্শন রাখে। কোনো কারণে দেহে অপর্যাপ্ত হরমোন উৎপন্ন হলে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ইস্ট্রোজেনবাহী বড়ি বা ইনজেকশন ব্যবহারের পরামর্শ দেন। এসব সামগ্রীর অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারে নারী বিভিন্ন জটিলতায় ভুগে, যেমন- স্তন দৃঢ় হয়ে যাওয়া, ঢুলুঢুলুভাব, অতিরিক্ত রক্তস্রাব, মাথাব্যথা, মানসিক ভাবের পরিবর্তন, বমিভাব, ত্বকে ফুসকুড়ি, মূত্রের রং পরিবর্তন ইত্যাদি।

৬. ইনসুলিন : আজকাল অনেকেই ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন নিয়ে জীবনযাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু এর ব্যবহার কঠোর নিয়ন্ত্রণে না থাকলে নতুন নতুন জটিলতায় ভোগার আশঙ্কা থাকে, যেমন হাইপোগ্লাইসেমিয়া, অবসাদ, ঢুলুঢুলুভাব, মাথাব্যথা, ক্ষুধা, মনযোগে ব্যর্থ হওয়া, বমিভাব, স্নায়ুদৌর্বল্য, ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন, দ্রুত হৃৎস্পন্দন, ঘুমে ব্যঘাত, খিঁচুনি, ত্বক ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF

Download More PDF www.bdniyog.com www.bdniyog.com

২৪. T_4 হরমোন কম ক্ষরিত হলে, যে সমস্যার সৃষ্টি হয়– [চ.বো. ১৭]

i) গয়টার ii) ক্রেটিনিজম iii) থাইরোটক্সিকোসিস

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৫ ও ২৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: [সি.বো. ১৭]

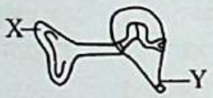

২৫. উদ্দীপকের 'X' চিহ্নিত অংশ কোন ধরনের তরুণাস্থি দ্বারা গঠিত ?

ক) হায়ালিন খ) পীত তন্তুময় গ) শ্বেত তন্তুময় ঘ) ক্যালসিফাইড

২৬. 'Y' চিহ্নিত নালির জন্য কোনটি সঠিক ?

i) মধ্যকর্ণ বায়ুপূর্ণ করে
ii) কর্ণপটহের উভয় পাশে বায়ুচাপ সমান রাখে
iii) পেরিলিম্ফ থেকে আগত শব্দ তরঙ্গ প্রশমিত করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১।

ক) উপযোজন কী ?
খ) পিটুইটারি গ্রন্থিকে প্রভুগ্রন্থি বলা হয় কেন ?
গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত 'A' অংশটির গঠন বর্ণনা কর।
ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি কিভাবে শ্রবণে ভূমিকা পালন করে – বিশ্লেষণ কর।

২.

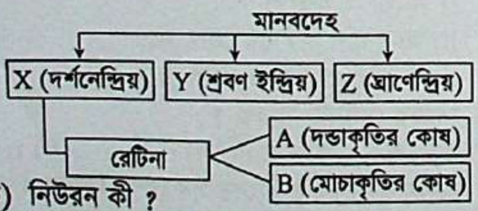

ক) নিউরন কী ?
খ) পিউপিল বলতে কী বোঝ ?
গ) A ও B এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ কর।
ঘ) মানুষের ভারসাম্য রক্ষায় Y-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৩. A = স্ক্লেরা, আইরিশ, অপটিক স্নায়ু নিয়ে গঠিত ইন্দ্রিয়
B = ম্যালিয়াস, ইনকাস ও স্টেপিস নিয়ে গঠিত ইন্দ্রিয়

ক) পিনা কী ?
খ) মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল বলতে কী বোঝায় ?
গ) উদ্দীপকে 'A' এর লম্বচ্ছেদের চিহ্নিত চিত্র অঙ্কন কর।
ঘ) উদ্দীপকের 'B' চিহ্নিত অংশটি একত্রে দুটি কাজ করে– আলোচনা কর।

৪. [সকল বোর্ড ১৮]

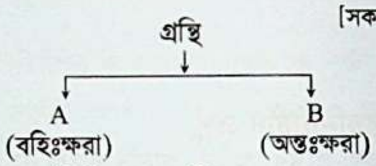

ক) ইমালসিফিকেশন কী ?
খ) নিউরেট্রান্সমিটার বলতে কী বোঝ ?
গ) উদ্দীপকে A গ্রন্থি খাদ্য পরিপাকে কী ভূমিকা রাখে ব্যাখ্যা কর।
ঘ) উদ্দীপকে B গ্রন্থি দেহের শারীরবৃত্তীয় কাজে অংশগ্রহণ করে- তা আলোচনা কর।

সৃজনশীল জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

জ্ঞানমূলক

১. সিন্যাপস কী ? [চ.বো. ১৭; য.বো. ১৫]
২. করোটিক স্নায়ু কী ? [য.বো. ১৭]
৩. ব্যারোরিফ্লেক্স কী ? [সি.বো. ১৭]
৪. অন্ধবিন্দু কী ? [সি.বো. ১৬]
৫. কনজাংক্টিভা কী ?
৬. রেটিনা কী ?
৭. ফোবিয়া সেন্ট্রালিস কী ?
৮. উপযোজন কী ? [কু.বো., চ.বো. ১৭]
৯. 'অর্গান অব কর্টি' কী ?
১০. বহিঃক্ষরা গ্রন্থি কী ?
১১. হরমোন কী ? [ব. বো. ১৭]
১২. ট্রপিক হরমোন কী ?
১৩. মানবদেহের সর্ববৃহৎ গ্রন্থি কোনটি ? [ঢা.বো. ১৫]

অনুধাবনমূলক

১. নিউরোট্রান্সমিটার বলতে কী বোঝায় ?[সকল.বো. ১৮]
২. মেনিনজাইটিস কেন হয় ? [সি.বো. ১৭]
৩. ট্রাইজেমিনাল স্নায়ু বলতে কী বোঝায় ?
৪. স্ক্লেরার অংশগুলো বুঝিয়ে লেখো।
৫. উপযোজন বলতে কী বোঝায় ? [চ.বো., য.বো.১৭]
৬. 'দ্বিনেত্র দৃষ্টি' বলতে কী বোঝায় ? [ব.বো.১'৭
৭. কোন অবস্থায় চোখ দিয়ে সাদা রং দৃষ্ট হয় ?
৮. ককলিয়া বলতে কী বোঝায় ?
৯. হরমোন ও এনজাইমের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।
১০. পিটুইটারি গ্রন্থিকে প্রভুগ্রন্থি বলা হয় কেন ? [ঢা.বো., দি.বো. ১৭, রা.বো. ১৫]
১১. স্নায়বিক সমন্বয় বলতে কী বোঝায় ?
১২. অনিয়ন্ত্রিত হরমোন ক্ষরণের ফলে কী হয় ?
১৩. রড কোষ ও কোণকোষের মধ্যে পার্থক্য লিখ।
১৪. অ্যাক্সন ও ডেন্ড্রাইটের মধ্যে পার্থক্য কী ?
১৫. মস্তিষ্কের ভেন্ট্রিকল বলতে কী বোঝায় ?

www.bdniyog.com www.bdniyog.com Download More PDF